বনফুল রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উ প ন্যা স

উদয় অস্ত

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

॥ ১ ॥

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিতেই কুমার উঠিয়া বসিল, নূতন করিয়া যেন আবিষ্কার করিল রাত অনেক হইয়াছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সকালেই সে সব জায়গায় টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিয়া দুইবার দেখিয়া গিয়াছেন। সে পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনগুলিতেও তেল ভরাইয়া রাখিয়াছে যদি দরকার হয়। শান্তা, মধু, ল্যাংড়া, বোধিয়া এই চারিজন বলিষ্ঠ ভৃত্যকে বাড়ি যাইতে দেয় নাই, তাহারা রাত্রে এখানেই খাইবে এবং থাকিবে। তাছাড়া গঙ্গা তো আছেই। ঊর্মিলা সকাল হইতে বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। মাঝে শুধু একবার উঠিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। সবই ঠিক আছে, এখানে যাহা করিবার সে করিয়াছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। একবার সে উৎকর্ণ হইয়া স্টেশনের দিকে চাহিল। গাড়ির শব্দ কি ? না, হাওয়া। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠিয়াছে। কুমারের মনে হইল একটা ভালো বই পাইলে রাত জাগিবার সুবিধা হইত। যে নূতন বইটা সে স্টেশন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তারবাবু লইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কোন বইয়ের সন্ধানে সে সন্তর্পণে পাশের ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ চোখে পড়িল বাবার আলমারির চাবিটা দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। চাবিটা লইয়া সে বাবার আলমারিটাই খুলিল। বাবার আলমারিতে অনেক পুরাতন বই আছে। বাবা নিজের আলমারি কাহাকেও খুলিতে দিতেন না। আলমারিটা খুলিয়া কুমার কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনে হইল বাবা যাহা পছন্দ করেন না তাহা করা উচিত হইবে কি ? কিন্তু এ সংকোচভাব কাটিয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হইল না, মনে হইল বই পড়িব তাহাতে দোষ কি, নষ্ট না করিলেই হইল। টর্চের সাহায্যে সে বইগুলি কৌতূহলভরে দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি বই সযত্ন-রক্ষিত, মলাট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বইটিতে বাবার নাম লেখা। কোন তারিখে কেনা হইয়াছিল তাহাও লেখা আছে। কুমার গীতা, রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (যাহা বহুকাল পূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত), দামোদর গ্রন্থাবলী, গ্যারিবল্‌ডির জীবনচরিত, ফলের বাগান, পশুপালন প্রভৃতি বইগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোমত একটা বইও নজরে পড়িল না। হঠাৎ এককোণে একটা মোটা খাতা দেখিতে পাইল সে। খাতাটা খুলিয়া দেখিল প্রথম পাতাতেই লেখা—'স্মৃতিকথা'। উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিল বাবারই হস্তাক্ষর। কৌতূহল সহকারে পড়িতে লাগিল।

"আমার জীবন-চরিতে লিখিবার মতো কি-ই বা আছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ, দরিদ্রের ঘরেই জন্ম। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান পাইয়াছি। ইহার বেশী আর কোন কৃতিত্বের দাবী আমার নাই। ইহাও জানি যতটুকু করিয়াছি তাহাও ভগবানের দয়ায়। ভগবান আমার উপর দয়া করিয়া-ছিলেন এ গর্বটুকু অবশ্য আমি করিতে পারি। আর একটা গর্বও আমার আছে। যে সব মহাপুরুষ বাঙালী জাতির এবং ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহারা সমগ্র

মানবজাতিরই অলংকার স্বরূপ, স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহাদের নাম কাব্যে, ইতিহাসে বহুভাবে বহুবার কীর্তিত হইত, আমি তাঁহাদের সমসাময়িক। তাঁহাদের তুলনায় যদিও আমি নিতান্ত নগণ্য, তবু এই গর্বটুকু আমার আছে যে তাঁহাদের অনেককে আমি দেখিয়াছি, অনেকের কথা শুনিয়াছি।

আমার এ জীবন-চরিত আমি লিখিতাম না। আগাগোড়া জীবনের সব কথা লেখা সম্ভবও নহে। যাহা লিখিতেছি তাহা সামান্য স্মৃতিকথা মাত্র। শৈশবের ঘটনা কিছুই আমার মনে নাই। বড় হইয়া মাতামহীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও আমি লিখিতাম না, আমার বড় ছেলের অনুরোধে লিখিতেছি। সে-ই আমাকে এই খাতাখানা কিনিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার হাতেও এখন প্রচুর সময়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। তাই অনেকটা সময় কাটাইবার জন্যও নিজের জীবনকথা নিজেই লিপিবন্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অতিশয় সসঙ্কোচেই করিতেছি। ভরসা আছে ইহা বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর নয়নগোচর হইবে না, আমার সন্ততিদের মধ্যেই নিবন্ধ থাকিবে…"

উর্মিলা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কুমার টের পায় নাই। তাহার কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"বাবার গলাটা ঘড় ঘড় করছে। তুমি মাথাটা একটু ঠিক করে দিয়ে যাও। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে একটু।"

খাতাটা বাহিরে রাখিয়া কুমার সন্তর্পণে আলমারিটা বন্ধ করিয়া দিল। বাবার মাথাটা সত্যই বালিশ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

সূর্যসুন্দর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাড়ানাড়িতে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রশ্ন করিলেন, "কে বীরু ?"

"আমি কুমার। দাদা এখনও আসে নি।"

"উশনা ?"

"সবাইকে খবর দিয়েছি। এই ট্রেনেই হয়তো আসবে।"

"হরিবোল, হরিবোল।"

সূর্যসুন্দর ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজিলেন। উর্মিলা আবার মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। গঙ্গা নীরবে বসিয়া পা টিপিতেছিল। কুমার ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

"কি বলছ।"

"স্টেশনে দুটো গাড়ি পাঠিয়েছিস তো ?"

"হ্যাঁ। চারজন চাকরও গেছে।"

"খেয়েছিস ?"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে তো কিছু। তখন আমি হালুয়াটা খাই নি, ওঘরে কোণে ঢাকা দেওয়া আছে, সেইটে খেয়ে নে—"

গঙ্গা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। হালুয়ার খোঁজে গেল না, পুনরায় সূর্যসুন্দরের পদসেবা করিতে লাগিল।

গঙ্গার সহিত ইহাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। গঙ্গা বিহারী বৈশ্য। গঙ্গার বাবা হরিচাঁদ বহুকাল পূর্বে সূর্যসুন্দরের চাকর ছিল। গঙ্গা যখন দশ বছরের বালক তখন সে-ও একবছরের শিশু কুমারের বাহন ছিল। সেজন্য অনেকে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ময়ূর' বলিত। গঙ্গা এখন ব্যবসায় করে, অর্থাভাব নাই, তাহার ছেলে আই. এ. পাস করিয়াছে কিন্তু এখনও সে নিজেকে এ বাড়ির চাকর বলিয়াই পরিচয় দেয়। এখন সে কুমারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু ; দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পিছু পিছু কুমার আবার আসিয়া বাবার ঘরে ঢুকিল।

"খেলি না ?"

"বললাম তো খাবার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু শুয়ে পড়। মধুকে না হয় পা টিপতে বসিয়ে দে।"

"দেখি।"

গঙ্গা উঠিল না। কুমার তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কোণে টেবিলের ধারে একটা ক্যাম্পচেয়ার ছিল তাহারই উপর বসিয়া পড়িল সে। টেবিলের উপর যে বাতিটা কমানো ছিল তাহা বাড়াইয়া দিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"বাংলা ১২৭২ সালে পয়লা বৈশাখ মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আমার মাতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন সূর্যসুন্দর। মাতামহীর সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল, মাতামহ ছিলেন টোলের ন্যায়রত্ন। মাতামহীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল দশবৎসর মাত্র। মাতামহীর ছিল চার। বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হয় নাই। এখন এসব গল্পের মতো শোনায় কিন্তু তখন ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। আমার মাতামহ আমার মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন বারাহী এবং মামার নাম শক্তিনারায়ণ। আমার মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। বারাহী নামের অর্থ কি তাহা আমি অনেকদিন জানিতাম না। পরে জানিয়াছি ইহা দুর্গার নাম। পঞ্চসাগরে যে পীঠস্থান আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারাহী। আমার পিতার নাম কেদারনাথ। আমার পিতার বিবাহ সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প মাতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম। গ্রামের জমিদার তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের আহ্বান করেন। সেই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার পিতাও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত একজন সেতারীর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে নিজে আসিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতাই সেই শিষ্য। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বছর। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ ছিল তাঁহার। সত্যই রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। জনতার মধ্যেও তাঁহার চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বাজনা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইল অনেকে। কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে প্রশ্নও করিল। খবরটা মাতামহীর কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব

হইল না। মাতামহী যখন শুনিলেন যে তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশের, তখন তাঁহার মনে হইল যে সমস্যায় তিনি পীড়িত হইতেছেন মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার সমাধান বুঝি করিয়া দিলেন। কন্যা বারাহীর বিবাহের জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনোমত সৎপাত্র কোথাও মিলিতেছিল না, সুন্দর, সুগায়ক, পণ্ডিতবংশের কেদারনাথকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাই করিবার জন্য তিনি মনে মনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অরক্ষণীয়া কন্যা লইয়া তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন. মায়ের বয়স বারো পার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে আগাইয়া গিয়া সম্বন্ধ করিবে? কিছুকাল পূর্বে আমার মাতামহ মারা গিয়াছিলেন, আমার মামার বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। আট বৎসরের বালকই শেষে অভিভাবকের কাজ করিল। সে-ই গিয়া তরুণ সেতারী কেদারনাথকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিল। দিদিমা নানারকম রান্না করিয়াছিলেন, কিশোরী কন্যা বারাহী সেগুলি পরিবেশন করিল। কথায় কথায় দিদিমা জানিতে পারিলেন যে বাবারও কোনও অভিভাবক নাই। তিনি বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন! অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে আর কাহারও অনুমতি বা মতামত লইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। সুতরাং আহারাদির পর দিদিমা সসংকোচে তাঁহারই নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি করিলেন।

বাবা নাকি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার তো একটি বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন, "বিয়ে হয়ে গেছে! কোথায়?"

"আমার সেতারের সঙ্গে।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বাবা বলিলেন, "হাসির কথা হ'তে পারে, কিন্তু মিছে কথা নয়। সেতার নিয়েই দিনরাত থাকি। অন্যদিকে মন দিতে পারি না। রোজগার তো কিছু নেই।"

দিদিমা ইহাতে দমিলেন না। বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। টাকার ভাবনা আমরা ভাবব। আমার কন্যাদায়টি তুমি উদ্ধার করে দাও।"

"কিন্তু পরিবার পালন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই।"

"পরিবার তোমাকে পালন করতে হবে না, সে ভার আমি নিচ্ছি।"

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঘরজামাই হ'য়ে থাকাও আমার পোষাবে না। আমি গানের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াই। আজ কাশী, কাল মুঙ্গের, পরশু লখনউ—"

"বেশ তো তাতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার যখন যেখানে খুশী যেও।"

"ছেলেমেয়ে হ'লে আপনারাই তাদের ভার নেবেন?"

"নেব।"

বাবা ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আমার মতো ভবঘুরেকে আপনি জামাই করতে চাইছেন কেন?"

"তুমি বড় বংশের ছেলে বলে। অধ্যাপকের বংশধর তুমি। এ রকম বংশ আর কোথায় পাব। আমার কন্যাদায়, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। মনে হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই তোমার মতো সৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে দায় থেকে উদ্ধার কর তুমি বাবা—"

"আমি সংসারের কোন ভার নিতে পারব না, এ শুনেও আপনার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই ?"

"কিছুমাত্র না।"

"বেশ, তাহলে আয়োজন করুন।"

কিছুদিন পরেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই কিন্তু বাবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বছরখানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, সপ্তাহখানেক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে তিনি আসিতেন, আবার উধাও হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, কারণ এই শর্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

আমার মাতুল গ্রামের পাঠশালাতেই বাংলা পড়াশোনা করিয়াছিলেন। তখন গ্রামে ইংরেজি পড়াশোনার তত সুবিধা ছিল না। কেহ ইংরেজি পড়িতে চাহিলে তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইত। মামার অর্থাভাব, কলিকাতায় যাইবার সংগতি ছিল না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এককালে খুব বর্ধিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও অচলা হইয়া থাকেন না। ইংরেজি শাসন বিস্তারের সংগে সংগে গ্রামের সকলেই প্রায় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারে লোকসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিষয়সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া ইংরেজি শিখিয়া চাকরি বা ইংরেজের অধীনে ব্যবসা করাই তখন অর্থোপার্জনের উপায় ছিল। গ্রামে যাহাদেরই সংগতি ছিল তাহারাই কলিকাতার সহিত নিজেকে কোন না কোন ভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। মামার সে সংগতি ছিল না। আর একটা বাধাও ছিল, সেটা আর্থিক নয়, মানসিক। তখন অনেক হিন্দুসন্তান খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছিল। মাতামহীর ভয় ছিল ছেলে কলিকাতায় গেলে হয় খৃষ্টান, না হয় ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে। গ্রামের মধ্যেই উদাহরণও ছিল। দুলে পাড়ার একটি ছেলে কলিকাতায় গিয়া খ্রীষ্টান হইয়া এক নীচজাতীয়া খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং মামার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। তিনি বাংলা লেখাপড়া গ্রামে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিকটবর্তী হিজলী গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারের অধীনে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ ডাক্তার দিদিমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাশ করেন, ইচ্ছা করিলে শহরে খুব বড় চাকরি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। গ্রামেই প্র্যাকটিস করিতেন। তাঁহার মধ্যে তৎকালসুলভ সাহেবিয়ানাও কিছু ছিল না, গলাবন্ধ কোট এবং ধুতি, এই ছিল তাঁহার পোষাক। সাহেবিয়ানার মধ্যে ছিল দাড়িটি, সুচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাঁহার খুব পশার ছিল। দশটা বারোটা গ্রাম জুড়িয়া তিনি প্রাকটিস করিতেন। যান ছিল পালকি এবং ঘোড়া। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মামা তাঁহারই অধীনে কম্পাউন্ডারি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাংলা পুস্তকের সহায়তায় ডাক্তারি বিদ্যাটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি প্রায় বছর দশেক তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন। এই দশবৎসরে তিনি ডাক্তারি বিদ্যাটা যে ভালভাবেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পরবর্তী জীবন। তাঁহার ভারাক্রান্ত নিমজ্জমান

সংসার-তরণীটিকে তিনি টানিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এই ডাক্তারির প্রভাবেই। শুধু যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, কিছু দিনের জন্য তাহাকে ময়ূরপংখীর মর্যাদাও দিয়াছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব, শিব-প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ব্রাহ্মণ-অতিথিসেবা কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। ভাগ্যান্বেষণের জন্য কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাসতুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুসকরায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুসকরায় গেলেন। প্রথমে মাসীমার বাড়িতেই রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাক্‌টিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোন পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, দুই চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), দুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্‌করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজগার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশমর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি

সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশিদিন থাকিতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি ব্যবসায়ের পক্ষে গুসকরা অপেক্ষা সাহেবগঞ্জ প্রশস্ততর ক্ষেত্র। সেখানে অনেক ধনী মাড়োয়ারী আছে, অনেক বাঙালীর বাস, শহরটিও গঙ্গার তীরে, গঙ্গার দুই পারে বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডাক্তার হিসেবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। মামার গুস্‌করায় প্রাকটিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে সহসা তিনি আসিতে রাজী হন নাই। কিছুদিন পরে যোগাযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। নামজাদা সিনেমার ছবি এখন যেমন যুবকযুবতীদের লোলুপ করিয়া তোলে, তখন নামজাদা যাত্রার দল তেমনি সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিত। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলের তখন খুব নাম-ডাক ছিল। এই সব দল সাধারণত পুজা-পার্বণ বা বিবাহ উপলক্ষে কোনও বড়লোকের আহ্বানে আসিয়া একাদিক্রমে তিনচার রাত্রি পালা-গান গাহিতেন। দশবিশ ক্রোশ দূর হইতে লোকে দল বাঁধিয়া যাত্রা শুনিতে আসিত। আমার মামার যাত্রা শোনার খুব শখ ছিল। তিনি একদিন যাত্রা শুনিবার জন্যই গুসকরা হইতে সাহেবগঞ্জে চলিয়া আসিলেন। হাতে কঠিন রোগী ছিল, একরাত্রির বেশী সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা তাঁহাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল, গুস্‌করায় ফিরিয়া গিয়া তাই তিনি স্থির করিলেন—গুস্‌করাতেই মতি রায়ের দলকে আনাইতে হইবে। ডাক্তার হিসাবে কয়েকজন ধনী মহাজনের উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, অর্থ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। তিনদিন পরেই তিনি যাত্রার বায়না করিবার জন্য পুনরায় সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহারই এক দাদা মধু ঘটক তখন সাহেবগঞ্জে গোলাদারি করিতেন। নুনের গোলা ছিল তাঁহার। ইহা ছাড়া ধান, চাল, পাট প্রভৃতিরও কারবার করিতেন। অনেক ব্যাপারী তাঁহার কাছে আসিত। ব্যাপারী এবং অতিথিদের জনা তাঁহার আলাদা একটি বাসাই ছিল। যাত্রার বায়না করিতে আসিয়া মামা মধু ঘটকের এই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরিচয় পাইয়া মধু ঘটকও তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন দৈবাৎ আর একটি ঘটনাও ঘটিল। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পেটের ব্যথায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। সাহেবগঞ্জে তখন সুরথ বসু নামে এক সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জনের বেশ পসার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘটক মহাশয়ের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি আসিয়া উক্ত ব্যাপারীটির চিকিৎসার ভার লইলেন। রোগের কিন্তু উপশম হইল না। ব্যথা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আমার মামা তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন,

আমি এঁকে একটা ওষুধ দিতে পারি, আমার বিশ্বাস সে ওষুধে ওঁর ব্যথা কমে যাবে।" ঘটক মহাশয়ের সম্মতি পাইয়া মামা ঔষধটি দিলেন, অদ্ভুত ফলও ফলিল। ব্যবসায়ীটি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সাহেবগঞ্জ ছোট শহর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মামার নাম রটিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—সুরথবাবুর মতো ডাক্তার যে রোগকে কায়দা করিতে পারে নাই এই ছোকরা ডাক্তার একদাগ ঔষধেই তাহা সারাইয়া দিয়াছে। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! একদিনেই মামার অনেক রোগী জুটিয়া গেল। যাত্রার বায়না শেষ করিয়া মামা যখন গুস্‌করায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন ঘটক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "এ সুযোগ তুমি ছেড় না। গুস্‌করার চেয়ে সাহেবগঞ্জ অনেক বড় জায়গা। এইখানে এসেই তুমি বসে পড়। আমি তোমাকে থাকবার জায়গা দেব, যতদিন না তোমার ভালো প্র্যাকটিস জমে আমার বাসাতেই তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে। গুস্‌করা থেকে তুমি এখানেই চলে এস।"

শিবু ঘটকও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহার দাদাও দিলেন। তাছাড়া মামা স্বচক্ষেই দেখিলেন যে একদিনের মধ্যেই সাহেবগঞ্জে তাঁহার যেরূপ নাম-ডাক হইয়া গেল তাহা অভাবনীয়। তাঁহার মনে হইল বিধাতার কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়তো ইহার মধ্যে আছে। এখানে প্র্যাকটিস জমিয়া গেলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। সাহেবগঞ্জ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আর একটি কাজ করিলেন, ডাক্তার সুরথ বসুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, তাঁহার মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তাহা হইলেই তিনি সাহেবগঞ্জে আসিবেন, নতুবা নয়। তাঁহার মতো কৃতবিদ্য চিকিৎসকের বিরোধিতা করিবার সাহস তাঁহার নাই। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীটি ঘটনাচক্রে দৈবাৎ সারিয়া গিয়াছে, হয়তো সুরথবাবুর ঔষধই একটু দেরীতে কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিজে তিনি কোনও কৃতিত্ব বা চিকিৎসানৈপুণ্য দাবী করেন না। ডাক্তার সুরথ বসু উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মামার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আপনি এখানেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি একা সব রোগী সামলাইতে পারি না। মফঃস্বলের অনেক রোগীকে ফিরাইয়া দিতে হয়, আপনি যদি এখানে আসেন ভালই হয়, আমারই অনেক রোগী আপনি পাইবেন—"

কুমার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল।

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পাইয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে ভৃত্য শান্তা দাঁড়াইয়া আছে। শান্তা চাকরটি ঈষৎ স্থূলকায়, মুখটা থ্যাবড়া গোছের। ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি ভাবলেশহীন, মনে হয় জীবন্ত নয়, যেন মুখোশের চোখ।

"কি রে—"

খাতা বন্ধ করিয়া কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শান্তা আর একটু আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আলুকা খেত'পর সিহাই আইলোছে।" অর্থাৎ আলুর ক্ষেতে শজারু আসিয়াছে।

কুমার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণে বন্দুক ছিল, তাহাতে টোটা পুরিয়া সন্তর্পণে সে পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তাও তাহার পিছু পিছু গেল, যাইবার পূর্বে টেবিল হইতে টর্চটি তুলিয়া লইল। একটু পরেই টর্চের প্রয়োজন হইবে তাহা সে জানিত।

মিনিট দশেক পরেই দুম দুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সূর্যসুন্দর আচ্ছন্নের মতো পড়িয়াছিলেন। বন্দুকের শব্দে তাঁহার আচ্ছন্নভাব কাটিল না, তিনি কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রায় মশায়, আপনার সিপাহীই বন্দুক চালাচ্ছে না কি"—বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। গঙ্গা কিছু না বলিয়া একটু মৃদু হাসিল।

ঊর্মিলা হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা, কিছু বলছেন?" সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কুমারের লক্ষ্য অব্যর্থ। বেশ বড় একটা শজারু ঘায়েল হইয়াছিল। ওজনে প্রায় দশ বারো সের হইবে। শান্তা মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, সে জানিত ইহার অর্ধেকটা অন্তত তাহারা পাইবে। কিন্তু তাহার চোখে মুখে সে আনন্দ প্রতিফলিত হইতেছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে কুমারের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমার বলিল, "এটাকে পরিষ্কার করে তৈরি করে ফেল্। ঠাকুরকে বল খানিকটা রেঁধে রাখুক। দাদারা যদি এসে পড়ে খেতে পারবে। এখুনি চড়িয়ে দিতে বল। বাইরের উনুনটায় আঁচ দিয়ে দে—"

উত্তেজিত হইয়াছিল ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচ্কি, কুমারের দেশী কুকুর দুইটা। কুমারের দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘনঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল। মাঝে মাঝে মুখ নীচু এবং কান খাড়া করিয়া ছুঁচ্কি মৃত রক্তাক্ত শজারুটার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইতেছিল না, একটু আগাইয়াই আবার পিছাইয়া আসিতেছিল। ওই কণ্টকিত বীভৎস জানোয়ারের খুব কাছে যাওয়া নিরাপদ কি না তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ল্যাংল্যাং আগাইবার চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছিল। দুই একবার ভেক্ ভেক্ শব্দ করিয়া সে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, ছুঁচকি কুঁই কুঁই করিতে লাগিল।

আদেশ পাইয়াও শান্তা নড়ে নাই। কতটা মাংস রান্না করিবার জন্য আলাদা করিয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজের দায়িত্বে তাহা ঠিক করা সে সমীচীনও মনে করিতেছিল না। কুমার তাহার মুখের দিকে এক নজর চাহিয়াই সমস্যাটা বুঝিতে পারিল।

বলিল, "সের তিনেক রান্না করতে বল। বাকীটা তোরা ভাগ করে নিয়ে নে"—শান্তা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। মৃত শজারুটাকে সে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকিও অনুসরণ করিল। হঠাৎ একযোগে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালের ডাক থামিতে না থামিতে পাখীদের সম্মিলিত কাকলীও শোনা গেল। কুমার টর্চ ফেলিয়া নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজিয়াছে। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিল, মনে হইল দূর প্রান্তরে কে যেন বিলাপ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণশশী বকুল গাছের মাথার উপর দেখা দিল। কুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বাবার এই অসুখই যে শেষ অসুখ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; ডাক্তারবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাবার বয়স বিরাশী পার হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন হইতে তিনি অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছেন, এখন যদি তাঁহার মৃত্যু হয় নালিশ করিবার কিছু নাই, বরং তাহাই কাম্য। কিন্তু তবু সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দাদারা আসিয়া পড়িলে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়। যদিও সে জানে দাদারা এখানে আসিয়া বেশী কিছুই করিতে পারিবেন

না, বিদেশে নিজ নিজ কর্মস্থলে তাঁহারা সক্ষম ব্যক্তি, এখানে যত ঝঞ্ঝাট কুমারকেই পোহাইতে হইবে, তবু তাহার মনে হইতেছিল দাদারা আসিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে, অনেকটা বল পাইবে, দায়িত্বের বোঝা কমিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

উর্মিলা বাবার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বন্দুকের আওয়াজ হলো কেন, কিছু মারলে না কি?"

"একটা শজারু—"

"এখন না মারলেই পারত! বাবার অসুখ—"

"কিন্তু আলুর ক্ষেত যে শেষ করে দিলে!"

"মা—"

সূর্যসুন্দরের ডাকে উর্মিলা তাড়াতাড়ি আবার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া যেমন শুইয়াছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন।

"বাবা, কিছু বলছেন?"

মাথার শিয়রে বসিয়া খুব আস্তে আস্তে প্রশ্নটি করিল। সূর্যসুন্দর কোনও উত্তর দিলেন না। উর্মিলা তখন গঙ্গার দিকে চাহিল অর্থাৎ এ অবস্থায় কি করা যায়, আবার ডাকিবে কি? গঙ্গা হাত নাড়িয়া কথা কহিতে বারণ করিল। উর্মিলা তখন ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল, তাহার আর কিছু করিবার ছিল না। শ্বশুরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের বিবাহের কথাটা সহসা আবার মনে পড়িয়া গেল। তাহার বাবা যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পাগলের মতো বহুলোকের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাকে তেমন আশ্বাস দেন নাই যেমন ইঁনি দিয়াছিলেন। কেহ চাহিয়াছিলেন রূপ, কেহ পণ, কেহ ডিগ্রি, কেহ সব। ইঁনিই কেবল বলিয়াছিলেন "আমার ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ হয় আর কিছুরই জন্য আটকাবে না।" সত্যই আটকায় নাই, নির্বিঘ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন আবার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া ঝিল্লী-ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটার বেগও যেন বাড়িতেছিল ক্রমশ। গঙ্গার মনে হইতেছিল প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করিতেছে। সূর্যসুন্দরের পদপ্রান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে কত কথাই জাগিতেছিল। এই লোকের কি প্রতাপই না ছিল এককালে। বড় বড় দুর্ধর্ষ জমিদারেরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল-সার্জনরা খাতির করিত। এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া কি মহিমাময় জীবনই না উনি যাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই লোকই এখন অসহায় অসমর্থ, দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত নড়াইবার শক্তি নাই। হঠাৎ গঙ্গার মনে পড়িয়া গেল সূর্যসুন্দরের হাতে সে কত মারই না খাইয়াছে। কথাটা মনে হওয়াতে তাহার ভারী আনন্দ হইল, মনে হইল এটা যেন তাহার জীবনের পরমলাভ। সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আর একটা কথা মনে হওয়াতে সে উঠিয়া পড়িল এবং উর্মিলার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"কুমার এত রাত্রে মাংস রাঁধতে বলছে। পেঁয়াজ আছে তো? কাল হাটে পাওয়া যায় নি।"

"না পেঁয়াজ নেই।"

"দেখি যদি পাই কোথাও।"
গঙ্গা নিঃশব্দে উঠিয়া কুমারের ঘরে প্রবেশ করিল।
"তোর বাইকটা নিয়ে আমি বেরুচ্ছি একবার।"
"কোথায়।"
"পেঁয়াজ নেই, মাংস রান্না হবে কি করে, তুমি তো হুকুম দিয়েই খালাস।"
"বিনা পিঁয়াজেই হোক। একটু বেশী করে রসুন আর আদা দিতে বল।"
"দেখি যদি পাই কোথাও।"
"এতরাত্রে কোথা পাবি।"
"জহিরুদ্দিনের বাড়িতে পাব।"
"দেখ তাহলে।"
গঙ্গা বারান্দা হইতে বাইকটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।
কুমার পুনরায় জীবন-চরিতে মন দিল।

"আমার মামা অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়াই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য তিনি মধু ঘটকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে বাজারের কাছে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই উঠিয়া গেলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্র্যাক্‌টিস জমিয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাহেবগঞ্জে একটি বাড়িও কিনিতে সমর্থ হইলেন। নিজের গ্রাম হইতে এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারবর্গকেও আনিতে হইল, কারণ তাহার মা (আমার দিদিমা) ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। শুনিয়াছি আমার বাবাই নাকি ইহার কারণ; বাবা কিছুতেই সংসার-বন্ধনে ধরা দিতেছিলেন না। বিবাহের পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিতেছিলেন। সংসারের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন নাই। সেতারটি লইয়া কোথায় যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একখানা পত্র লিখিতেন—কখনও কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ, কখনও বা দিল্লী হইতে। শহরের নাম ছাড়া আর কোনও ঠিকানা তাহাতে থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকাও পাঠাইতেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা ক্বচিৎ। নিজে কখনও আসিতেন না। এ দুঃখ দিদিমার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়াছিল। যুবতী কন্যার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এইজন্যই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মামা যখন তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। মামার পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মা, তাঁহার দিদি (আমার মা) এবং তাঁহার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। আমার মামীমার বয়স তখন বারো কিম্বা তেরো। মামীমার পিতামাতা কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। তাই মামীমার শিশু ভ্রাতা নকুলও মামার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসবাস করিবার মাস ছয়েক পরেই একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাবা হঠাৎ সাহেবগঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নাই, কিন্তু যোগাযোগ এমনই হইল যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। মামা যে সাহেবগঞ্জে আছেন এখবরও তিনি জানিতেন না। তিনি মুঙ্গের যাইতেছিলেন

একজন ওস্তাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে আর একজন ওস্তাদ-শিকারী ধূর্জটি বাগচীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পূর্ব পরিচয় ছিল, উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধাও করিতেন। বাগচী মহাশয় বাবাকে জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। বাগচী মহাশয়ের বাড়ি মামার বাড়ির কাছেই ছিল, সেখানেই তিনি বাবাকে লইয়া আসিলেন। বাবা যে শান্তিবাবু ডাক্তারের ভগ্নীপতি একথা তিনিও জানিতেন না। কিন্তু জানিতে বিলম্ব হইল না। ধূর্জটিবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মামারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। একটু পরেই মামা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন সব জানাজানি হইয়া গেল।···বাবা সেবার কিছুদিন সাহেবগঞ্জ থাকিয়া গেলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে এবং দিদিমার চোখের অবস্থা দেখিয়া থাকিয়া গেলেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু আমি বাবার সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা হইতে আমার মনে হয় বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাগচী মহাশয়। শুনিয়াছি অধিকাংশ সময় তিনি বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটাইতেন। বাগচী মহাশয় সাহেবগঞ্জের মিউনিসিপালিটিতে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং যে বেতন তিনি পাইতেন তাহাতেই সেই সস্তা-গণ্ডার যুগে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবার তেমন উৎসাহও তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসাহ ছিল সেতারে। সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত সেতারের দিকে। আমার মনে হয় এমন একজন সুর-তপস্বীর সঙ্গলাভেই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ধূর্জটিবাবুর সেতার-সাধনা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তিনি গৎ লইয়া বেশী মাতামাতি করিতেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেতারটি কেবল বাঁধিতেন। তাহার প্রিয় তবলচী সখীচাঁদ পাশে বসিয়া তবলা টুংটাং করিত, বাগচী মহাশয় সেতারের তারগুলিতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে প্রয়োজন মতো সেগুলি ঢিলা করিতেন বা কষিয়া দিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। আমরা যখন স্কুলের ছুটির পর মাঠে খেলিতে যাইতাম তখন দেখিতাম তিনি সেতার লইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যায় যখন ফিরিতাম তখনও দেখিতাম তিনি বসিয়া আছেন, নিবিষ্টচিত্তে সুর মিলাইতেছেন। রাত্রি নটা পর্যন্ত তিনি তন্ময় হইয়া কেবল সুর মিলাইতেন। সুর মিলিয়া গেলেই তাঁহার মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিত, সেতারটি রাখিয়া তিনি পুলকিতচিত্তে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, তাহার পর সেইটি খোলে পুরিয়া তুলিয়া রাখিতেন, যেন সেদিনের মতো তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। আমার বাগচী মহাশয়ের স্মৃতির সহিত একটা পবিত্র শুভ্রতার অনুভূতি বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার গায়ের রং ধপধপে ফরসা ছিল, মাথার চুলও ছিল শাদা, স্কন্ধে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইত। থান পরিতেন, পায়ের চটি জোড়াও ছিল শাদা কটকী চটি। আহার শ্বেতপাথরের থালায় আলো-চালের ভাত, কিছু সিদ্ধ তরকারী এবং শ্বেতপাথরের বাটিতে একবাটি দুধ। বাগচী গৃহিণী সুরসিকা ছিলেন, বলিতেন "মহাদেব কি না, তাই সব সাদা। বাড়ির সামনে একটা সাদা ষাঁড়ও এসে বসতে আরম্ভ করেছে।" আমার বিশ্বাস এই বাগচী মহাশয়ের জন্যই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে ছিলেন, মামার বাড়িতে তিনি কেবল আহার ও শয়ন করিতেন বাকি সময়টা তাঁহার বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটিত। শুনিয়াছি—দিদিমা যখন মায়ের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেন বাবা চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেন, কোন জবাব দিতেন না। একদিন কেবল মৃদু

হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—'আমি তো আগেই বলেছিলাম।' এই সময় বাবার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া সকলকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবা যে একজন তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন—একথা পূর্বে কেহ জানিত না। প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিকট একটি কালীর পট আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর প্রত্যহ তিনি সেটির পূজা করেন, পূজার সময় 'কারণ' পানও করেন। সাহেবগঞ্জে একটি কালিবাড়ি ছিল। অমাবস্যা-রাত্রে কালিবাড়িতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন তাঁহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া পড়িত। গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, পরিধানে রক্তাম্বর, চোখ দুটি টকটকে লাল। বাবার এই উগ্র শাক্ত-আচরণ কিন্তু বাগচী মহাশয়কে একটুও বিচলিত করে নাই। বরং বাবার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইতেন বাবা তাঁহার কাছে ততক্ষণ নীরবে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, মনে হইতে বুঝি ধ্যান করিতেছেন। বাগচী মহাশয়ের সুর মেলানো শেষ হইয়া গেলে বাহির হইত বাবার সেতার। বাবা তখন আলাপ শুরু করিতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিত। তবলচী সখীচাঁদের নয় বৎসরের মেয়েটি তাহার বাবাকে ডাকিবার জন্য প্রত্যহ একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিত এবং লণ্ঠনটি একধারে কমাইয়া রাখিয়া তন্ময়চিত্তে বাবার আলাপ শুনিত। সখীচাঁদ পাঠকের কন্যা মুনিয়াকে আমি পরে দেখিয়াছি, ডাক্তার হইয়া তাহার নাতি-নাতিনীর চিকিৎসাও করিয়াছি। সে-ই আমাকে বাবার সেতার বাজানোর গল্প করিত। বলিত, বাবা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিলে এমন একটা গম্ভীর অদ্ভুত পরিবেশ গড়িয়া উঠিত যে তাহার জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলিবার সাহস হইত না। মনে হইত সামান্য শব্দ করিলেই বুঝি সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যে সুরের প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। তাই যতক্ষণ বাবার আলাপ চলিত সে চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া থাকিত। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িত, ঘুমের মধ্যেও কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সেতারের আলাপে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিত যেন বিচিত্র বর্ণের অপ্সরীরা চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের পায়ে নূপুর, গায়ে নানা রঙের ওড়না।

আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাবা ছিলেন না। তিনি সাহেবগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া আবার সহসা একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই, এমন কি আমার মাকেও না। দোল উপলক্ষে মামা সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন। আমার মা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং মামা পরিবার-বর্গকে দেশের বাড়িতে রাখিয়া একাই সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। আমার জন্ম মামার দেশের বাড়িতেই হইয়াছিল।

শুনিয়াছি আমার মা দুইদিন প্রসব-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা ছিলেন তিনি, পাড়ার সকলেও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার প্রসব-বেদনা তাই অনেকের কষ্টের এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ (খেতু-মামা) খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পালকি পাঠাইয়া হিজলা গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারকে আনাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আর দেখা যায় না। আপনি যেমন করে হোক

ওকে খালাস করে দিন। অন্তত ওষুধবিষুদ দিয়ে কষ্টটা লাঘব করে দিন। এর জন্যে যদি কিছু অর্থব্যয় করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। ছিমু গয়লা আমার বাছুর দুটো নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। পঁচিশ টাকা এখ্খুনি দিয়ে দেবে—"

প্রবীণ শ্রীনাথ ডাক্তার মৃদু হাসিয়া খেতু-মামাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "টাকা খরচ করলেই যদি সব কষ্টের লাঘব হতো তাহলে বড়লোকেরা কেউ কষ্ট পেত না। ভয়ের কোনও কারণ নেই, প্রথম পোয়াতি তাই একটু দেরি হচ্ছে, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"

আমি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনাথ ডাক্তার অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাল হরণ করিবার জন্য আধসের অম্বরি তামাক পোড়াইয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর একটা আশ্চর্য যোগাযোগ সেদিন ঘটিয়াছিল। যে কয়জন লোক আমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মামার বাড়ির উঠানে। উঠানের একধারে গোয়ালঘর ছিল, সেইখানেই আমার জন্ম হয়, আমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কেহই উঠান ত্যাগ করেন নাই। আমার মামী ও দিদিমা তো ছিলেনই, খেতু মামাও ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন মামার এর জ্যাঠতুতো দাদা (বঙ্কু মামা) এবং একজন দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি উমেশ ঘোষাল। আমার মায়ের সই ভবিও (ভবতারিণী দেবী) একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার জন্মের প্রায় বছর খানেক পূর্বে তাঁহার প্রথম সন্তান সন্তোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই সন্তোষের সহিত কিছুদিন আমি গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াও ছিলাম; পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরও হইয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব··"

বাবার গলার স্বর শুনিয়া কুমার খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হরিবোল, হরিবোল—"

উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কিছু বলছেন ?"

"না।"

"ঘাড়ের কাছে লাগছে না তো।"

"না। বেশ আছি। বীরু আসেনি এখনও ?"

"না। ট্রেন বোধহয় লেট আসছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরেনি এখনও।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার ?"

"বুধবার।"

"আজ নবাবগঞ্জের হাট, না ?"

"হ্যাঁ।"

"হাটে কেউ গিয়েছিল ?"

"গিয়েছিল।"

"মাছ পেয়েছে ?"

"পেয়েছে, পাকা রুই মাছ।"

"ভালই হয়েছে। মাছ মাংস না হলে বীরুর খাওয়া হয় না।"

"মাংসও হচ্ছে। উনি শজারু মেরেছেন একটা।"

"মেরেছে ? বেশ করেছে। আলুর ক্ষেতটা একেবারে তছনছ করে দিচ্ছিল।"
কুমার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বেশী কথা বোলো না বাবা, দুর্বল লাগবে।"
মৃদু হাসিয়া সূর্যসুন্দর চোখ বুজিলেন।
কুমার চুপি চুপি ঊর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গা কি বাড়ি গেছে ?"
"না। পশ্চিম বারান্দায় কি করছে যেন।"
কুমার গিয়া দেখিল গঙ্গা ছেঁড়া বোরা মেরামত করিতেছে।
কুমারকে দেখিয়া বলিল, "চাকরগুলো সব শজারু নিয়ে মেতেছে। মধুকে বলেছিলাম বোরাগুলো মেরামত করে রাখতে। কাল লাদুরামকে পঁচিশ বোরা মকাই পাঠাতে হবে। সে নগদ দাম দিয়ে দেবে বলেছে। কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল আমার। গুণে দেখি মাত্র ষোলটি ভালো বোরা আছে আমাদের। বাকীগুলো সব ছ্যাঁদা। সেগুলো সেরে রাখছি তাই। বাবা উঠেছেন নাকি। গলা শুনলাম মনে হলো—"
"দাদার কথা জিগ্যেস করছিলেন।"
"ট্রেনটা খুব 'লেট' আজকে। বাইরে কে ডাকছে যেন—"
গঙ্গা উঠিতে যাইতেছিল, কুমার বাধা দিল।
"তুই যা কচ্ছিস কর্, আমি দেখছি।"
কুমার বাহিরে গিয়া দেখিল—মুশিদপুরের রাধানাথ গোপ আসিয়াছেন।
"আমি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলাম যে ডাক্তারবাবুর পক্ষাঘাত হয়েছে। তাই আর থাকতে পারলাম না, চলেই এলাম। কি ব্যাপার, কেমন আছেন, কি ব্যবস্থা হয়েছে।"
কুমার তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল।
"এখন ঘুমুচ্ছেন ?"
"হ্যাঁ।"
"আচ্ছা, আমি কাল আবার আসব।"
"এত রাত্রে আবার ফিরে যাবেন ? তার চেয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে এখানেই শুয়ে পড়ুন।"
"আজ আমাকে ফিরতেই হবে। কাল ভোরেই আবার চলে আসব। এ অঞ্চলের অনেকেই আসবে, আর সেটাও একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল এসে তার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। করেছ কিছু ?"
"না। কি করতে হবে বলুন তো।"
"একটু ফালাও করে বসবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা করতে হবে আর কি। লোক অনেক জুটবে তো। আমি কাল এসে করব সে সব। এখন চলি।"
কুমার আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল। তিনি মহিষের গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। রাধানাথ গোপ মুশিদপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রায় এক হাজার বিঘা জমি আছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কর্মী এবং সূর্যসুন্দরের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। কুমার ফিরিবার সময় দেখিল গ্রামের আরও দুই চারিজন লোক বৈঠকখানার বারান্দায় সূর্যসুন্দরের খবর লইবার জন্য বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত, ডাক্তারবাবুর খবর জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ইহারাও অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে এবং

অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে। গরীব মুসলমান চাষী কয়েকজন। কুমার সহসা অনুভব করিল—সূর্যসুন্দর এ অঞ্চলের সকলেরই পিতৃস্থানীয়, সুতরাং যে কোন সময়ে এ বাড়িতে আসিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ বাড়ি কেবল তাহাদেরই নয়, সকলের। এ বাড়িতে তাহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে অন্যায় হইবে।

"তোমরা খেয়ে এসেছ?"

"না বাবু। বাড়ি গিয়ে খাব।"

"এইখানেই খেয়ে নাও। এত রাত্রে বাড়ি ফিরে যাবে? দরকার থাকে যেতে পার, আর তা না থাকলে এইখানেই শুয়ে পড়।"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

কুমার ভিতরে গিয়া গঙ্গাকে বলিল, "সীতারামপুরের জনকয়েক চাষী বাবার খবর নিতে এসেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

গঙ্গা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখন কত লোক খবর নিতে আসবে তার ঠিক আছে? কত লোককে খাওয়াব আমরা।"

"এদের ব্যবস্থাটা তো কর এখন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।"

গঙ্গা উঠিয়া গেল। মনে হইল চটিয়াছে। চটিলে গঙ্গা নীরব হইয়া যায়।

॥ ২ ॥

সূর্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরু, ওরফে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় কিউল প্ল্যাটফর্মে সস্ত্রীক বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুধু ট্রেনের নয়, নিজের ছেলে-মেয়েদেরও। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। বড় ছেলে লক্ষ্ণৌ শহরে ডাক্তারি করে, ছোট ছেলে অধ্যাপক, কাশীতে থাকে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, ছোট মেয়ের কলিকাতায়। ছোট জামাই পুলিসে বড় চাকরি করে। ইহাদের মধ্যে যে কেহ কিম্বা সকলেই যে কোনও ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে! বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির স্ত্রী পুরসুন্দরী তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও ট্রেন আসিলেই প্রতি কামরায় উঁকি দিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিল কি না। বৃহস্পতি নিজে আসিয়াছেন দিল্লী হইতে। কিউল হইতে তাঁহাকে লুপ লাইনের ট্রেন ধরিতে হইবে। কিন্তু সে ট্রেনটির এন্‌জিন্‌ কোন একটা স্টেশনে নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ট্রেনটা কখন যে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে সাহেবগঞ্জে বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ সক্‌রিগলি ঘাটে যাইবার গাড়িটা সম্ভবত পাওয়া যাইবে না। ইহার জন্য বীরু খুব যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। তিনি জানেন, যাহা ঘটিবার যথাসময়ে তাহা ঘটিবে। যদি ধীরে ধীরে ঘটে—তাহাকে দ্রুততর করিবার জন্য চেষ্টা মাত্র করা যাইতে পারে, ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র, মানব জাতির অতীত ইতিহাসের সন্ধানে অনেক কবর খুঁড়িয়াছেন, অনেক খনিত কবর পরিদর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট পূর্ব বহু সহস্র বৎসরের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মনে অন্তত একটা দার্শনিক প্রশান্তি থাকা উচিত, এ জ্ঞান তাঁহার আছে। ট্রেনের একটু-আধটু 'লেট' হওয়া বা পিতার অসুখের

সংবাদ তাই যাহাতে তাঁহাকে খুব বেশী বিচলিত করিয়া না ফেলে সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কর্তব্য সম্বন্ধে অবশ্য তিনি উদাসীন হন নাই। ট্রেন লেট দেখিয়া কিউল হইতেই তিনি কয়েকটি টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন। পত্নী পুরসুন্দরীকেও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লী হইতে আসিবার পথে একটু ঘুরিয়া লক্ষ্ণৌয়ে নামিয়া গগনকে (বড় ছেলেকে) সঙ্গে করিয়া আনিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা অবশেষে তিনি দমন করিয়াছিলেন। এই অসুখই যে বাবার জীবনের শেষ অসুখ তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহাকে বাবার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, পথে কোন কারণেই বিলম্ব করা চলিবে না। তাই তিনি গগনের নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ছেলে দিগন্তকেও টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই জামাই সুব্রত এবং সোমনাথকেও করিয়াছেন। তিনি জানেন কুমারও নিশ্চয়ই সকলকে খবর দিয়াছে। তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনিও প্রায় সকলকেই একটা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন! এমন কি তাঁহার দুই বোন ঊষা এবং সন্ধ্যাকেও। কিরণের বর্তমান ঠিকানা জানা নাই বলিয়া তাহাকে খবর দিতে পারেন নাই। ঊষার শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়, সন্ধ্যার দেওঘরে। বীরু আশা করিতেছিলেন সন্ধ্যা ঊষা নিশ্চয়ই এতক্ষণ পেঁছিয়া গিয়াছে। চিত্রাও—বীরুর ছোট মেয়ে—হয়তো পিসিদের সহিত আসিয়া গিয়াছে। ছুটি পাইলে ছোট জামাই সুব্রতও নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু তাহার ছুটি পাওয়াই মুশকিল।

পুরসুন্দরীর সহিত এই সব আলোচনা করিয়া বীরু পুনরায় স্টেশন মাস্টারের নিকট গিয়াছিলেন ট্রেনের খবরটা লইবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ট্রেনের এখন অনেক দেরি। কোনও খবরই নেই। এখন যে ট্রেনটা আসছে—স্বাতী আর সোমনাথ যদি পলেজা ঘাট পেরিয়ে পাটনা হ'য়ে আসে, সেটা ধরতে পারবে। ওরা আসতে পারে এ ট্রেনে। গগন আর দিগন্ত তো পারেই। আসল কথা হচ্ছে ওরা খবরটা পেয়েছে কি না। চারিদিকে যে রকম মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট, টেলিগ্রাম পেঁচেছে কি না কে জানে। দ্বারভাঙ্গায় সোমনাথ আছে কি না তা-ও অনিশ্চিত। তাকে টুরে বেরুতে হয় তো। সে না এলে স্বাতীও আসতে পারবে না—"

স্বাতী বীরুর বড় মেয়ে, সোমনাথ বড় জামাই।

মুকুন্দ নামক যে বালক ভৃত্যটি ময়দা বাহির করিয়া লুচি ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল একথা শুনিয়া সে থামিয়া গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুরসুন্দরীর দিকে চাহিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ট্রেনটা দেখেই তাহলে ময়দা মাখিস। তুমি এখন বিস্কুট দিয়েই চা খাও তাহলে—"

বীরু বলিলেন, "বেশ। ক্ষিধেও পায় নি তেমন—"

"চা খাবে, না, কফি। চা-তো এই একটু আগেই খেলে—"

"বেশ কফিই কর।"

বীরুর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে সময়টা এখানে অনিবার্যভাবে থাকিতেই হইবে যে সময়টা কোনও কিছু করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। মনটা যেন নিযুক্ত থাকে, পিতার অসুখের সংবাদ ফাঁক পাইয়া তাঁহাকে যেন অশোভনভাবে চঞ্চল করিয়া না তোলে। হঠাৎ তিনি একটা বড় তোরঙ্গের উপর বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। পায়ে

নূতন জুতা ছিল, কোঁচ-কোঁচ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিনিসপত্রগুলো আর একবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। সব ঠিকই আছে। জিনিসপত্র অনেক। দুইটা ট্রাঙ্ক, চারটি হোল্ড-অল্, গোটা ছয়েক সুট-কেস, ছোট বিছানা গোটা চারেক, মুখ-বাঁধা ফলের ঝুড়ি গোটা চারেক, মুখ-খোলা একটা, দুইটি বিরাটকায় টিফিন কেরিয়ার, একটা বড় হট্ কেস, মুখ-বাঁধা সন্দেশের হাঁড়ি গোটা দুই, গোটা দুই 'থারমস্', দুইটি বড় বড় কেরাসিন কাঠের বাক্সে রন্ধনের সরঞ্জাম, তাছাড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন একটা। বীরু বাজারের খাবার খাইতে পারেন না তাই যখনই বাহিরে যান সঙ্গে রন্ধনের সব ব্যবস্থা লইয়া যান, এমন কি বঁটি-শিল-নোড়া পর্যন্ত। মুকুন্দ রন্ধন ব্যাপারে সুদক্ষ। পুরসুন্দরীর সহকারিণী পার্বতীও ভাল রাঁধিতে পারে। সে-ও সঙ্গে আসিয়াছে। ভোরেই সে স্নান সরিয়া লইয়া দূরে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। মেয়েটা রোগা, কিন্তু একপিঠ চুল। পার্বতী বীরুর বৃদ্ধ চাপরাশি হরদৎ সিংয়ের একমাত্র কন্যা। হরদৎ সিং সপরিবারে বীরুর কাছেই থাকিত। তাহার পত্নী-বিয়োগের পর পুরসুন্দরীই পার্বতীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে হরদৎ সিংও মারা গেল। অনেক খরচ করিয়া বীরু পার্বতীর বিবাহও দিলেন। কিন্তু মেয়েটা দুর্ভাগিনী, বিবাহের ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়া গেল। তখন হইতেই সে পুরসুন্দরীর কাছে আছে। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। পার্বতীর বয়স এখন ত্রিশ, কিন্তু এমন রোগা ছিপছিপে চেহারা যে দেখিলে মনে হয় কুড়ি বছরের বেশী নয়। খুব আদুরে। পুরসুন্দরীর দুই কন্যা চিত্রা ও স্বাতীর অপেক্ষাও বেশী প্রতাপ তাহার। হরদৎ সিং ছাপরা জেলার লোক ছিল, কিন্তু পার্বতীকে দেখিয়া সে কথা বুঝিবার উপায় নাই। সে একেবারে বাঙালিনী হইয়া গিয়াছে। পুরসুন্দরী লোকের কাছে তাহাকে চাকরাণী বলিয়া পরিচয়ও দেন না, বলেন ও আমার মেয়ে।

মুকুন্দ কফির সরঞ্জাম বাহির করিয়া কফি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বীরু তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পায়চারি শুরু করিলেন। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। দুই হাত পিছনে দিয়া মাথা হেঁট করিয়া তিনি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া হাজির হইলেন। মুকুন্দ যে কফি করিতেছে সে কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কোন একটা বইয়ে তিনি ইজিপ্টের এক ফারাওয়ের মমির যে ছবি দেখিয়াছিলেন সেই ছবিটা তাঁহার মানস পটে সহসা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল বাবাকে তিনি যে খাতাখানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাবা কিছু লিখিয়াছেন কি? তিনি ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের ছাত্র, ভাবিতে চেষ্টা করিলেন কি ভাবে লিখিলে জীবন-চরিত ঠিক ভাবে লেখা যায়। হিটাইট সিউমেরিয়ান মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির ইতিহাস কি কি উপাদানের অভাবে অসম্পূর্ণ···চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, মুকুন্দের ডাক শোনা গেল।

"বাবু, কফি ভিজিয়েছি—"

বীরু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পুরসুন্দরী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছেন। দৃশ্যটি দেখিয়া তিনি যেন একটু আরাম পাইলেন। কাঁদা উচিত বই কি। পিতৃতুল্য শ্বশুরের সাংঘাতিক অসুখের সংবাদে বাড়ির বড় বউ যদি না কাঁদে তাহা হইলে ··তাহা হইলে ঠিক যে কি হয় তাহা বীরু সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তাহার মনে হইল—শোকে বেসামাল হইয়া পড়াটা কি খুব শোভন? তিনি নিজে

তো এখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কফির কাপে এক চুমুক দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। রোরুদ্যমানা পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকাটাও তাহার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, কফিতে আর এক চুমুক দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া পুনরায় হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। জুতা পুনরায় কোঁচকোঁচ শব্দ করিতে লাগিল। জুতাজোড়ার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু অস্বস্তিকর শব্দটা পুনরায় তাহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। মুকুন্দের হাতে কফির কাপটা দিয়া বলিলেন, "চল্ ওই ফলের ঝুড়িগুলোর মুখ খুলে দি। একটু হাওয়া লাগুক, তা না হলে পচে যাবে হয়তো। ঘণ্টাখানেক পরে আবার শেলাই করে নিলেই হবে। গুনছুঁচ আছে তো?"

"আছে।"

"চল তবে।"

পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পর ফলের ঝুড়িগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন।

...পুরসুন্দরী কাঁদিতেছিলেন। অশ্রুজলে তাহার কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গিয়াছিল, ক্রন্দনাবেগে সমস্ত দেহটাই কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিছুতেই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যই এ ক্রন্দন, ইহাতে কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামি কিছুই ছিল না, কিন্তু একথাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যে শোকে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সমস্ত বুকের ভিতরটা যেমন ভাবে মুচড়াইয়া উঠিয়াছিল এখন ঠিক তেমনটা হইতেছে না। দুই চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, সূর্যসুন্দরের প্রশান্ত মুখটাও মনের মধ্যে বারবার ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু তিনি অনুভব করিতেছেন এ ক্রন্দন যেন স্বতোৎসারিত নয়। বিবাহের পর হইতে যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাহা নিজের জীবন নয়, পরের জীবন। যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা একদা তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চের নির্দেশ অনুসারে সারাজীবন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অভিনয় মাত্র। অভিনয় করিতে করিতে ক্রমশ অভিনয়টাকেই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অপরের সুখদুঃখ কালক্রমে এমনভাবে নিজের সুখদুঃখে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের সুখদুঃখের কথা আর মনে নাই। বিবাহের আগে কখনও ঠাণ্ডা ভাত খাইতে পারিতেন না, কিন্তু বিবাহের পর ঠাণ্ডা ভাত খাওয়াটাই দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া চুকিয়া গেলে তবে মেয়েদের খাওয়া হয়, ডাক্তার শ্বশুর দিনের বেলা একটা দেড়টা এবং রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার আবার থিয়েটারের শখ ছিল, কোনও কোনও দিন আরও বেশী রাত হইয়া যাইত। পুরসুন্দরী প্রায়ই না খাইয়া ঘুমাইতেন। কোন কোনদিন তিনি আড়াল হইতে গানও শুনিতেন। বাহিরের ঘরটায় এক-একদিন গানের আসর বসিত। পুরসুন্দরী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারা বন্ধ হইয়া গেল। অর্ধ-বিস্মৃত বধূ জীবনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। উঠানের উপরে স্তূপীকৃত গম, বারান্দার

একধারে মকাই, বাড়ির বাহিরের জমিটাতে সবজির বাগান, শাক বেগুন কপি লাউ কুমড়া অফুরন্ত! কত লোক যে লইয়া যাইত। জংলি গাইটার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরের কত অদ্ভুত খেয়ালই যে ছিল। জংলি গাই পুষিয়াছিলেন। গাইটা নাকি ধরা পড়িয়াছিল নেপালের জঙ্গলে। যে জমিদারের লোকজন উহাকে ধরিয়াছিল শ্বশুর মহাশয় ছিলেন তাঁহার বাড়ির ডাক্তার। জমিদার মহাশয় দুর্দান্ত জংলি গাইটির গল্প শ্বশুর মহাশয়ের নিকট করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয় একদিন গিয়া গাইটি দেখিয়াও আসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল তাঁহার। কিছুদিন পরে জমিদার-বাবু শ্বশুর মহাশয়কে জানাইলেন ওই বন্য-গাভীকে পোষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, সামর্থ্যে কুলাইতেছে না। দুধ দুহিতে গিয়া দুইটি গোয়ালা গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। মোটা মোটা দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। যে ঘরের খুঁটায় উহাকে বাঁধা হইয়াছে সে ঘরটির চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গাইটি তিনি জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। গাইটি ডাক্তারবাবুর পছন্দ হইয়াছিল, তিনি যদি চান তাহা হইলে অবশ্য গাইটি তাঁহার নিকটই পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার সানন্দ সম্মতি জানাইয়া পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার দিন কয়েক পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে এখন হাসি পায়। কিন্তু সে রাত্রে পুরসুন্দরীকে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। পুরসুন্দরীর তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, বয়স খুব কম, বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল, সন্ধ্যার পরে এমনিই গা ছম্ ছম্ করে। হঠাৎ গভীর রাত্রে 'রে রে রে রে' শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। পরে জানা গেল ডাকাত নয়, জংলি গাই আসিতেছে। তাহার শিঙে, নাকে এবং গলায় শক্ত দড়ি বাঁধা, তবু সে জন দশেক বলিষ্ঠ লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে। বাছুরটি বেশ বড়, এদেশের ছোট দেশী গরুর মতো, অথচ বয়স মাত্র ছয়মাস। সে রাত্রে, সে কি কাণ্ড। বাড়িসুদ্ধ লোক উঠিয়া পড়িল, যতগুলি লণ্ঠন ছিল সব জ্বালা হইল! বাড়ির সম্মুখে যে আমগাছটা ছিল তাহাতে ভারী লোহার শিকল দিয়া জংলি গাইকে শক্ত করিয়া বাঁধিবার পর শাশুড়ি বলিলেন, "ওর কপালে সিঁদুর আর খুরে জল দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা কর। তা নাহলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে—।" শ্বশুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। কিম্বা পিচ্‌কিরি করেও দিতে পার। কিন্তু সিঁদুর দিতে হলে ওই আমগাছে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। ওই নীচু ডালটায় যদি উঠতে পারে তাহলে ওখান থেকে ওর মাথার উপর সিঁদুর লাগানো শক্ত হবে না। পারবে উঠতে? এককালে তো পারতে—" শ্বাশুড়ি ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় পারতাম বলে এই বুড়ো বয়সেও পারব না কি। পা হড়কে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—"

"তাহলে উদিৎ সিং উঠে দিয়ে দিক।"

উদিৎ সিং ছিল বাড়ির রক্ষক, সমস্ত চাকরদের কামতি অর্থাৎ সরদার। উদিৎ সিংয়ের চেহারাটা পুরসুন্দরীর মনে পড়িল! রোগা পাতলা ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তাহার। গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ন সরু, চটিয়া গেলে ছোট চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের ফুলকি বাহির হইত যেন। রগের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিত। নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয় ছিল সে। কাহারও ছোঁয়া-জলে স্নান পর্যন্ত করিত না। একটি কুঁড়ে ঘরে সে আলাদা থাকিত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইত। দিনের বেলা রাঁধিত না। চিঁড়ে দই,

ছাতু বা বেলের সময় বেল, আমের সময় আম বা ওই ধরনের কিছু খাইয়া কাটাইয়া দিত। রান্না করিত সন্ধ্যার পর। শাশুড়ি তাহাকে এক ঘটি দুধ রোজ দিতেন। তখন বাড়িতে দশ বার সের দুধ হইত। দুধটাই ছিল উদিৎ সিংয়ের প্রধান আহার। গোয়ালার পিছনে মোতায়েন হইয়া প্রত্যহ সে দুধ দুহাইত। শ্বশুরমহাশয়কে দেবতার মতো ভক্তি করিত সে। তাঁহার আদেশে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে আপত্তি ছিল না তাহার। বরং বিপদ যত বেশী হইত তাহার উৎসাহ তত বাড়িত। জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিতে হইবে এবং সে গুরু-ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে এই আনন্দে সে সগর্বে আগাইয়া আসিল। শাশুড়ি কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত গাভীকে, এমন কি মহিষকেও, তিনি স্বহস্তে সিন্দুর দিয়া বরণ করিয়াছেন; অন্যরূপ করিলে অমঙ্গল হইবে না তো। উদিৎ সিংই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করিল। সে বলিল, মাইজি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া গাছের উপরে উঠিয়া যান, আমরা সিঁড়িটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেছি। তাহাই হইল, শাশুড়ি গাছের উপর উঠিয়াই জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁদুর দিলেন।

পুরসুন্দরীর হঠাৎ দুর্গাদাস এবং জাম্বুবানের কথা মনে পড়িল। দুর্গাদাস কাকাতুয়া এবং জাম্বুবান অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তাহাদের সঙ্গেই লইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বীরু রাজি হইলেন না। পুরসুন্দরীর আর একবার মনে হইল তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য কেহ কখনও দেয় না; এমন কি তাঁহার ছেলেমেয়েরাও না। সকলেই নিজের খুশী অনুসারে সব কিছু করিতে চায়। এই কিছুদিন আগেই গগন কি কাণ্ডটাই না করিল। তরকারিটা স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অথচ ধনে পাতা তাহার নিজের খুব প্রিয়। বীরুও প্রথমে ধনেপাতা পছন্দ করিতেন না, এখন একটু একটু খান। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে তাঁহাকেও 'চীজ' খাইতে হয়—কি দুর্গন্ধ জিনিসটা, ঠিক পচা সরের মতো। কিন্তু তবু খাইতে হয়, উপায় নাই। ননদরাও তাই। উহাকে ভালো একটা পানের বাটা কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উহার পছন্দ হয় নাই; অমন সুন্দর মিনার-কাজ জিনিসটা না কি জবড়জং। সন্ধ্যার পছন্দও ঠিক [illegible] মতো। বউদিদির যাহা ভালো লাগে তাহাদের তাহা ভালো লাগে না। পূজার সময় [illegible] বেনারসী শাড়িটা কিনিয়া দিলেন, সন্ধ্যার নাকি পছন্দ হয় নাই। রং নাকি বেশী ঘোরালো। (অমন চমৎকার মেরুন রঙের বেনারসী দেখা যায় না প্রায়), পাড় নাকি বেশী চওড়া (আজকাল সরু পাড়ই না কি ফ্যাসন), তা ছাড়া কাপড়টা নাকি বড় ভারী। শুনিলে হাসি পায়। আসল জরির কাজ করা বেনারসী শাড়ি, হালকা হয় কখনও। তাই আজকাল আর কাহাকেও কিছু কিনিয়া পাঠান না তিনি, টাকা পাঠাইয়া দেন। ছোট-ছেলে দিগন্ত অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বড় একটা করে না। যাহা খাইতে দেন তাহাই খায়, যাহা পরিতে বলেন তাহাই পরে। কিন্তু পুরসুন্দরীর মনে হয়—খাওয়া পরার দিকে তাহার তেমন লক্ষ্যই নাই, ওসব বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায়, করিতে হয় বলিয়া করে। তাহার মন কেবল বইয়ে। যখনই যেখানে থাকে, বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকে। কাপড় জামা জুতা কিছুরই শখ নাই, শখ কেবল বই কেনার। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভালো একটা চাকরি ছাড়িয়া তাই প্রফেসারি করিতেছে। সহসা তাহার জন্য পুরসুন্দরীর মন কেমন করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। পূজার ছুটির সময় আসিয়া মাত্র দিন কয়েক ছিল। এই প্রসঙ্গে ললিতবাবুর

মেয়ে নন্দার কথাও মনে পড়িল। নন্দার সহিত দিগন্তের বিবাহ দিবার জন্য ললিতবাবু অনেকদিন হইতেই অনুরোধ করিতেছেন। নন্দা মেয়েটিও ভালো, বি-এ পড়িতেছে, সুশ্রী। কিন্তু দিগন্ত এখন কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। বলিতেছে ডক্টরেটের জন্য একটা থিসিস লইয়া সে ব্যস্ত আছে, তাহা শেষ না করিয়া আর কোনদিকে সে মন দিবে না। আজকালকার ছেলেদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।···একটা খাবারের ফেরিওলা খাবারের গাড়িটা ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য-ভাজা জিলাপিগুলি দেখিয়া তাঁহার স্বাতীর কথা মনে হইল। মেয়েটা গরম গরম জিলাপি খাইতে বড় ভালবাসে। চিত্রাও বাসে। ডালমুটও চিত্রার খুব প্রিয়। অথচ উনি বাজারের জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। তাই তাঁহাকে বাড়িতে ময়রা ডাকাইয়া জিলাপি ও ডালমুট তৈরী শিখিতে হইয়াছে। ওঁরও খাওয়ার শখ কম ছিল না। কিন্তু বাজারের বা হোটেলের কোনও জিনিস কখনও খান নাই, সবই তাঁহাকে বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার জন্য কত বই পড়িয়াছেন, কত বাবুর্চি (এমন কি গোয়ানিজ বাবুর্চি পর্যন্ত) রাখিয়াছেন, কত লোকের কাছে কত খোশামোদ করিয়া নূতন নূতন রান্না শিখিয়াছেন। অনেকে আবার শিখাইতে চায় না। মিসেস রায়ের কথা মনে পড়িল। সামান্য ফ্রেঞ্চ কাটলেট শিখাইতে কি বেগই না দিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত শিখানই নাই—ফিরপোর এক রাঁধুনী শেষে তাঁহাকে শেখায়। মনে পড়িল ইদানিং শ্বশুর তাঁহার হাতের নিরামিষ রান্না খুব পছন্দ করিতেন। যখনই শ্বশুরের কাছে থাকিয়াছেন তহাঁকে প্রত্যহ সুক্‌তো ও ঘণ্ট রাঁধিতে হইয়াছে। শ্বশুর ইদানিং মাছ-মাংস প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন কিন্তু পুরসুন্দরী প্রথমে যখন বধূ হইয়া আসেন তখন বাড়িতে মাছ-মাংসের খুব ধুম, তাল তাল মশলা বাটা, পেঁয়াজ রসুন গরম মশলার গন্ধে বাড়ি ভরপুর। শ্বশুর গরগরে মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল মাংস পছন্দ করিতেন। কোথায় গেল সে সব দিন। পুরসুন্দরীর মনে অতীত-জীবনের নানা ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্টেশন ইয়ার্ডের একধারে যে মালগাড়িটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মাল-গাড়িটা দেখিতেছিলেন না, ভাবিতেছিলেন গগন কি চম্পাকে লইয়া আসিবে? সে আসন্নপ্রসবা, বাপের বাড়িতে আছে, এ অবস্থায় তাহাকে না আনাই উচিত, কিন্তু গগন যে রকম গোঁয়ার তাহাকে হয়তো লইয়া আসিবে। ট্রেনে যা ভীড় আজকাল···। কিন্তু এ চিন্তা তিনি বেশীক্ষণ করিতে পাইলেন না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পশ্চিম হইতে একটা গাড়ি আসিতেছে।

বীরু ফলের ঝুড়িগুলি খুলিয়া ফলগুলিতে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তিনি ডিস্‌ট্যান্ট সিগনালের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া ফেলিলেন। ফলের ঝুড়িগুলি লইয়া টানাটানি করিবার সময় বোতামগুলি নিজেই তিনি খুলিয়াছিলেন। মুকুন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই ফলগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গাড়িটা দেখি কেউ এল কিনা।" পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া কিছুদূর তিনি আগাইয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুরসুন্দরীর কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি গাড়িটা দেখি গিয়ে।

ওরা যদি কেউ আসে ওদের সামনে কান্নাকাটি কোরো না। কাঁদবার কি আছে এতে। তোমাকে কাঁদতে দেখলে সবাই মুষড়ে পড়বে। বাবার কঠিন অসুখ তো আর একবার হয়েছিল, গিয়ে দেখবে হয়তো সেরে গেছে সব" গলার বোতামটা আবার তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। গলার কাছটায় কেমন যেন আঁট আঁট মনে হইতেছিল। আর কিছু না বলিয়া তিনি হন হন করিয়া ওদিকে প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

…গাড়িতে অসম্ভব ভীড়। গগন, দিগন্ত, স্বাতী বা সোমনাথ কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেহই আসে নাই। না আসিবার মানে? গগন বৌমাকে আনিবার জন্য পাটনায় নামিয়া পড়িল না কি। দিগন্তকে গগন হয়তো খবর দিয়াছিল। স্বাতী-সোমনাথ হয়তো কাটিহার দিয়া গিয়াছে। কয়েকটা 'হয়তো'র কবলে পড়িয়া বীরু একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। ভীড় বাঁচাইয়া হুইলার কোম্পানীর দোকানের কোণে দাঁড়াইয়া তিনি হাত দুইটি মুঠা করিতেছিলেন এবং খুলিতেছিলেন। সারাজীবন তিনি নানা রকম 'হয়তোকে' কেন্দ্র করিয়াই গবেষণা করিয়াছেন। একটা মাথার খুলি বা বাসনের টুকরামাত্র সম্বল করিয়া তিনি প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কখনও বিব্রত বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তিনি বেশ একটু বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা শেষ পর্যন্ত যদি না আসে বড় বিশ্রী ব্যাপার হইবে। আর একবার তাহাদের টেলিগ্রাম করিবেন কিনা একথাও তাঁহার মনে হইল।

"এই যে দাদা এখানে—"

বীরু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বোন কিরণ। অবাক হইয়া গেলেন। কিরণের স্বামী মাত্র একমাস আগে বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঠিকানা বীরু জানিতেন না, তাই তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে পারেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে কিরণ আসিয়া গেল। কিরণের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। কিরণের মাথার সামনের দিকে চুলে কি লাগিয়াছে? চুন? পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। চুল পাকিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য, একধারে চুল অমনভাবে পাকিয়া গেল কেন। অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। কিরণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কি দাদা?" তখন তিনি আত্মস্থ হইলেন।

"কি জানি। আমি তো এখানে ট্রেনের গোলমালে আটকে পড়েছি। তুই খবর পেলি কি করে। আমি তো তোদের নূতন ঠিকানা জানতাম না তাই খবর দিতে পারি নি।"

"আমি কুমারের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কুমার ঠিকানা জানত।"

"কোথায় বদলি হয়েছিস আজকাল।"

"দেরাদুনে।"

"কার সঙ্গে এলি? ঘন্টুর সঙ্গে?"

"না, ঘন্টু তো মিলিটারিতে জয়েন করেছে শোন নি? তাকে একটা খবর দিয়ে আমরা চলে এসেছি, ও'র সঙ্গেই এসেছি, উনি ছুটি নিয়েছেন।"

"কেষ্টও এসেছে না কি, কই?"

"জিনিসপত্তর নামাচ্ছেন বোধহয়। ওই যে।"

কুলির সারির পিছনে কিরণের স্বামী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্থকনামা ব্যক্তি। কুচকুচে কালো রং, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। ফরেস্ট ডিপার্মেন্টে চাকুরি করেন। বীরুকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন। সাহেবী পোষাক পরা ছিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যান্টের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল।

বীরু বলিলেন, "আমরা ওধারের প্ল্যাটফর্মে আছি। তোমরাও চল। এখন কতক্ষণ পরে যে সাহেবগঞ্জের গাড়ি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলতে পারছে না।"

॥ ৩ ॥

বীরু রাত্রের গাড়িতে তো আসেনই নাই, সকালের গাড়িতেও আসিলেন না। আর কেহও আসিল না। মনে মনে একটু চিন্তিত হইলেও কুমার খুব বেশী দমিয়া যায় নাই, কারণ বাবা আজ সকাল হইতে অনেকটা ভাল আছেন। অনেকটা ফলের রস খাইয়াছেন, বেশ ভালো ভাবে কথা বলিয়াছেন, কথার জড়তা-ভাব অনেকটা কমিয়াছে। পায়ের দুই একটা আঙুলও নাড়াইতে পারিয়াছেন। কুমার বাবাকে ফলের রস খাওয়াইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিল। সম্মুখে উৎসুকদৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল ছুঁচকি ও ল্যাংল্যাং। কুমার মাঝে মাঝে তাহাদের রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া দিতেছিল এবং বকিতেছিল।

"এতো লোভী কেন! শজারুর মাংস তো একগাদা খেয়েছ। দাদারা কেউ এল না, দুপুরেও তো অনেক খাবে—"

ছুঁচকি তাহার সুচালো মুখটা আরও সুচালো করিয়া কান দুইটি খাড়া করিয়া কুমারের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইল। মনে হইল এখনি যেন কথা কহিবে। ল্যাংল্যাং কিন্তু অন্য ভাব প্রকাশ করিল। তাহার সমস্ত মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহর্ষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, তাহার কোমরটা পর্যন্ত দুলিতে লাগিল। ভাবটা কুমার যেন একটা রসিকতা করিয়াছে এবং সে তাহা সানন্দে উপভোগ করিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু দুই জনে ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পিওন। লোকটা নূতন আসিয়াছে, ছুঁচকি ল্যাংল্যাং এখনও তাহাকে ভাল করিয়া চেনে না, তাছাড়া লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ থাকাতে চেহারাটাও দুষমনের মতো।

পিওন বলিল, "টেলিগ্রাম—"

কুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িল। কিউল হইতে বীরু টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ট্রেনের গোলমালের জন্য এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছি, বাবা কেমন আছেন অবিলম্বে জানাও। আরজেন্ট রিপ্লাই-প্রিপেড টেলিগ্রাম। কাল সন্ধ্যা-বেলাই আসিয়াছিল। এত বিলম্বে দিল কেন?

"টেলিগ্রাম কাল রাত্রে এসেছে, এতক্ষণে দিচ্ছ?"

পিওন বলিল, "রাত্রে কোনও পিওন থাকে না। কে নিয়ে আসবে।"

কুমারের মনে পড়িল পোস্টাফিসে পোস্টমাস্টারও নূতন লোক আসিয়াছেন। আগের পোস্টমাস্টার থাকিলে নিজেই আসিয়া টেলিগ্রামটি দিয়া যাইতেন। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহি করিয়া দিল, কিছু বলিল না। যাহা করিবার সে যথাসময়ে করিবে।

পিওন চলিয়া গেল।

"গঙ্গা, গঙ্গা—"

গঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল না।

সামনের ফুলবাগানে মধুর ছোট ছেলে 'এতবারিয়া' গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল। সে ছুটিয়া আসিল।

"গঙ্গা চৌকি নামাচ্ছে।"

"চৌকি ! কোথাকার চৌকি ?"

"রাধাবাবু কোথা থেকে আনিয়েছেন, ঠিক জানি না।"

রাধানাথ গোপ নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে খুব ভোরে আসিয়া কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির সম্মুখে যে মাঠটা পড়িয়া আছে তাহাতে আট দশটা চালা করিয়া দেওয়া হোক, প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙাইয়া তাহার নীচে কতকগুলি চৌকিও তিনি পাতিয়া দিতে চান। দূর হইতে বাহিরের লোক যদি আসে, আসিবেই, তাহারা বসিবার শুইবার জায়গা পাইবে। আত্মীয় স্বজন যাহারা আসিবেন তাহাদের জন্য গোটা দশ বারো তাঁবুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ সকলে আসিলে বাড়িতে কুলাইবে না। বাড়িতে মাত্র পাঁচখানি ঘর। ডাক্তারবাবুর নিজের ছেলেমেয়েরা আছে, ভাই আছে, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা আছে, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা আছে। এ খবর পাইলে সকলেই আসিবে, সকলকে স্থান দিতে হইবে তো। দূরদর্শী রাধানাথ ভোরে আসিয়াই কুমারকে একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনা শুনিয়া কুমার একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধাবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি সব করব। আমারও কর্তব্য এটা—"

সুতরাং কুমারকে বলিতে হইয়াছিল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন তাহলে। আমাকে যা বলবেন তাই করব।"

"তুমি বাবার কাছে বসে থাক কেবল, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে তিনি একটি প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন।

"এখানকার নতুন ডাক্তারবাবুটির উপর তোমাদের বিশ্বাস আছে তো ? না থাকে তো কোলকাতা থেকে কাউকে আনাও। যা হবার অবশ্য তাই হবে, ওঁর আশীর উপর বয়স হয়েছে—এখন যদি উনি যানও আমাদের ক্ষোভের কিছু থাকবে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়।"

"না, নতুন ডাক্তারবাবুটিকে তো ভালই মনে হচ্ছে। বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন। ওঁর চিকিৎসায় কিছু ফলও হয়েছে, বাবা আজ অনেকটা ভালে আছেন।"

"বাঃ, তাই না কি।"

রাধানাথ গোপ বাম করতলটি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমার মনে হয় তবু সিভিল সার্জনকে খবর দাও একবার, তিনি এসে দেখে যান।"

"বেশ। দশটার ট্রেনে লোকই পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা।"

"তাই দাও। আমি গিয়ে ওদিককার কাজে লেগে পড়ি তাহলে।"

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন, কিছুদূরে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"তোমাদের বাঁশ আছে?"

"আছে কিছু।"

"কিছু আছে তো? আমিও দু'গাড়ি বাঁশ আর কিছু খড় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে! দরকার হয় যদি তোমার কাছ থেকেও কিছু বাঁশ নেব। জনমজুর এসে গেছে, আমি ততক্ষণ জায়গাটা সাফ করিয়ে ফেলি।"

রাধানাথ গোপ তখন হইতেই জনমজুর লইয়া ব্যস্ত আছেন। কুমার আর ওদিকে যায় নাই, বাবার মুখ-ধোয়ানো প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। গঙ্গা চৌকি নামাইতেছে শুনিয়া কুমার উঠিয়া পড়িল। গঙ্গাকে এখনি পোস্টাফিসে পাঠাইতে হইবে। চাকর দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে রাধানাথবাবু যদি কিছু মনে করেন তাই নিজেই সে গেল।

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আসিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইতেছে।

রাধানাথবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেনের কনেক্‌শন পান নি। টেলিগ্রামটা কাল সন্ধে-বেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারে নি। আগের পোস্টমাস্টারবাবু থাকলে নিজেই এসে দিয়ে যেতেন।"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এও যাবে। যে লোক সদরে সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাচ্ছে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব।"

"আচ্ছা। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে দিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড্‌ টেলিগ্রাম করেছেন।"

"সেখানে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে?"

"কেয়ার অফ্‌ স্টেশন মাস্টার।"

"বীরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড!"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস জাগিল।

"গঙ্গাকে একটু ছুটি দেবেন? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে আসুক।"

"হ্যাঁ, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো নাবাও।"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন।"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে বসে থাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি দেখ শুধু বসে বসে। ভালো কথা, চন্দরবাবুকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দেখি নি তাঁকে।"

"পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ও'র ছাত্র তা জান তো, এখানে যখন প্রথম মাইনার স্কুল হয়, তখন উনিই হেড মাস্টার হ'য়েছিলেন। ও রকম মাস্টার আমি দেখি নি। দু' ভাইই অদ্ভুত—"

চন্দ্রসুন্দর সূর্যসুন্দরের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়।"

গঙ্গা এতক্ষণ নীরব ছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে এবার সে বলিল, "রাধানাথবাবু যা কাণ্ড লাগিয়েছেন শেষে তোমাকে বিপদে না ফেলেন।"

"কি বিপদ।"

"শেষকালে যদি বলেন এসব করতে দু'শ পাঁচশ' টাকা খরচ পড়েছে—"

"না, না—তা কি বলেন কখনও।"

"কিছুই আশ্চর্য নয়। খগেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিয়েছিলেন। বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ'মাস পরে উনি খগেনবাবুকে জানালেন যে বরযাত্রীদের জন্য তাঁর তিনশ' টাকা খরচ হয়েছে। খগেনবাবু বেচারাকে দিতে হলো টাকাটা। অথচ বরযাত্রী ছিল মাত্র পঁচিশ জন—"

"খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—"

"তুমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাদুরি করে এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টা করবেন।"

"কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে।"

"দেখো শেষে—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল—"বাবার অসুখ করেছে তাতে এমন ধুমধাম করে ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। কেউ যদি আসে, বাইরের বৈঠকখানায় বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে। এত ঘর বানাবার দরকার কি।"

"দরকার আছে। ঘর না থাকলে বেশী লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশী কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—"

"তাহলে এক কাজ কর তুমি। ঘর তৈরী করতে যা খরচ হচ্ছে তা নগদ হিসেব করে এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না।"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেনের গোলমালে দাদাকে নিশ্চয় অনেকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্ট-মাস্টারটি লোক সুবিধের নয়।"

"তাই না কি!"

গঙ্গা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতেছিল কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল না, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর বাইকে চড়িয়া সুকুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন আজ।"

"কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। খেয়েওছেন।"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার বসে আছে। চলুন না, যাবেন?"

"এখন কি করে যাই বল।"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন।"

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্বদা। দাদারা আসুক, তারপর যাওয়া যাবে একদিন।"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু।"

"বেশ।"

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে।"

"এখন তো কোন দরকার নেই, হলে নিশ্চয় খবর পাঠাব।"

"আচ্ছা।"

সুকুমার আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। যদিও স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তবু সুকুমার যখনই আসে বাইকে চড়িয়া আসে। বাইকটি নূতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। ঊর্মিলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া সূর্যসুন্দরের চোখের কোণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া সূর্যসুন্দর ঘাড় ফিরাইলেন।

"বীরুর কোন খবর আসে নি?"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেন মিস্ করে দাদা টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে এসে পড়বে নিশ্চয়।"

"আর কারু খবর আসে নি?"

"না।"

সূর্যসুন্দর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়াও পড়িলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, শেষ সময়ে সকলের সহিত দেখা হইবে তো—অন্তরের ভিতর হইতে কে তাঁহাকে আশ্বাস দিল, হইবে। পৃথ্বীশও আসিবে। পৃথ্বীশ প্রায় সাত-আট বছর আগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না। কোথায় আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্যসুন্দরের মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আজ অনেকটা ভালো আছি।"

"রাধাবাবু এসেছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকে আনিয়ে একবার দেখাতে। আজ এগারোটার ট্রেনে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি।"

"ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে।"

"তবু একবার দেখে যান।"

"হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুকে জিগেস করে তিনি যদি মত দেন, তাহলেই সিভিল-সার্জনকে খবর দিও। তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং।"

"আচ্ছা।"

কুমার অনুভব করিল—বাবার মনে প্রফেসনাল এটিকেটের কথা যখন জাগিতেছে তখন জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও আবিলতা নাই। কাল সন্ধ্যার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্কার ছিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর সহিত

কথাবার্তা কহিয়া তাঁহার চিঠি লইয়া সিভিলসার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কুমার চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দর ঊর্মিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এস। সারারাতই তো মাথার শিয়রে বসে আছ।"

"না, আমি ঘুমিয়েছি তো।"

"কোথায় ঘুমুলে।"

"আপনার মাথার শিয়রেই ঘুমিয়েছিলাম। এখানে অনেকটা জায়গা আছে যে।"

"চা খেয়েছ?"

"এইবার খাব। বিজলী আসছে, সে এলে তাকে বসিয়ে যাব।"

"বিজলী কে?"

"রমেশ কাকার নাতনী।"

"ও, সে এসেছে নাকি।"

"পরশু এসেছে।"

সূর্যসুন্দর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিলেন, কথা কহিয়া তিনি যেন একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে বিজলীর ছেলে-বেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ফ্রক-পরা বিনুনি-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাড়িতে তখন একটি টিয়া পাখী ছিল, টিয়া পাখীর খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিত। চন্দরের বন্ধু রমেশ। সূর্যসুন্দরই তাহাকে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশের ছেলে সুখেন্দু (কোথায় আছে সে এখন?)—রমেশ যখন প্রথম এখানে আসে সুখেন্দুর বয়স একবৎসর। সেই সুখেন্দুর মেয়ে বিজলী এখন যুবতী। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়···সূর্যসুন্দর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নবীনকে সিভিলসার্জনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিয়া তাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্বদা লোক থাকা দরকার। অক্লান্তকর্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা দুই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিছু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে যাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, সুতরাং সে পূর্বদিকে পেয়ারা গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক' চেয়ার পাতিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"মামার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মামা কেবল মামীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গেলেন না। মামার খুড়তুতো ভাই দুইটি চাকরি পাইয়া পূর্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ঘরের গাই কালীর অনেক দুধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে ধানও আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গেলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই

থাকুন, খেতু দেখাশোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব। সুতরাং আমার বাল্যকালের প্রথম কয়েক বৎসর মামার দেশের বাড়িতে শঙ্করা গ্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট বৎসর পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ের স্মৃতি আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা মা এবং দিদিমাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া নিজের বউটিকে লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মায়ের মা) খুব সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অবশ্য মুখে তিনি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না ; আমার মা তো নীরবতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বুজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একের পর এক করিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই ! ঘর-দুয়ার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, পুকুর হইতে জল আনিতেছেন, রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চা করিতেছেন এরূপ একটি ছবিও আমার স্মৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মামা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে যে ঈষৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা খেতু-মামার আলাপে বুঝিতাম। খেতু-মামা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে এসব প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনও মনে আছে।

একদিন খেতু-মামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। মাঠের ফেরতই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আসিতেন। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন দুপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়া মাথার টোকাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হাতের কাটারিটা উঠানের একধারে রাখিলেন, তাহার পর হাঁকিলেন—"কই বারাহী, এক ঘটি জল দে তো—"

মা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেবু-তলার ওপাশে। উঠানে দুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাড়ির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ ! চমৎকার নির্জন জায়গাটি, অথচ উঠানের মধ্যেই। আমি সেইখানেই খেলা করিতে ভালবাসিতাম। আমার সঙ্গী ছিল সন্তোষ। সন্তোষের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের সখী ছিলেন, ইঁহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইঁটের টুকরা ও কাদা দিয়া শিব-মন্দির গড়িতেছিলাম।

মা খেতু-মামাকে জল আনিয়া দিলে খেতু-মামা পা দুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তামাকটি তোর মতন কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক সেজে খাইয়েছিলি একদিনও ? খাওয়াস নি ? খাওয়ালে তোকে ফেলে যেতে পারত না।"

আমি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা খেতু-মামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট রেকাবী ও এক ঘটি জল আনিয়া দিলেন। রেকাবীতে সম্ভবত বাতাসা ছিল। বাতাসাগুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া খেতু-মামা আলগোছে ঢক্‌ঢক্ করিয়া সমস্ত জলটুকু

পান করিলেন, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু পরেই দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছেন। খেতু-মামার কোমরে পিছন দিকে সর্বদা একটি হুঁকা গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকায় জল ভরিলেন। খেতু-মামা দু'একবার টানিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিলেন। তাহার পরই হুঁকার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

দিদিমার দৃষ্টি তখনও একেবারে লোপ পায় নাই। খেতু-মামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ দুপুরে তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইতেন।

খেতু-মামা বলিলেন, "খুড়িমা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যে। চেঁচামেচি করে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি।"

"না। ঘুম আমার হ'য়ে গেছে। বারাহী খেয়েচিস ?"

"এইবার খাব।"

"কি যে সমস্ত দিন ঘুটঘুট করিস রান্না ঘরে। আমার খাওয়া তো সেই কখন হ'য়ে গেছে।"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিদিমার চওড়া কাঠের পিঁড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দিদিমা বসিতেই খেতু-মামা প্রশ্ন করিলেন, "শক্তির খবর পেয়েছ ? সব ভালো আছে তো।"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বৌমার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওখানে থাকলেই ভালো হতো।"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভদ্রলোকরা দেখছি বউ নিয়ে একা একা থাকাটাই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আত্মীয়-স্বজনদের ঘেঁষটা পছন্দ করছেন না। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্তব্য সমাপন হলো।"

খেতু-মামা মাঝে মাঝে খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

দিদিমা বলিলেন, "সন্তোষের বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করে, সেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বৌকে তো নিয়ে যায় নি। বৌ তো মায়ের কাছে আছে।"

"তোমার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়।"

খেতু-মামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

"কি সন্দেহ হয়।"

"ও একটু স্ত্রৈণ।"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "না তা ঠিক নয়! নিজের বৌকে কে না ভালবাসে, বাসাই তো উচিত।"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে বউকে নিয়ে মজা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত ?"

"কিন্তু এখানকার বিষয়-আশয় কে দেখে বল।"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের দুখীরাম আর ছিরু, আর সামলাই আমি।

তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাও না আজকাল, আর বারাহী তো ছেলেমানুষ, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই জানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতু-মামার কথায় তিনিও যেন সায় দিতেছেন।

…কতদিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে! বড় বয়সের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথাগুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামে কোথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জাঁকাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমরা বড্ড গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে।"

আমি সকলের হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর আমরা গোলমাল করিব না!

"তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসবে এখানে।"

চৌধুরীরা গ্রামের জমিদার ছিল। যাত্রার আসরে তাহাদেরই স্থান যে সর্বাগ্রে এ জ্ঞান তখন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা আমরা বিকেল থেকে জায়গা দখল করে বসে আছি—"

"ওঠ ওঠ উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। ওই পটল কর্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীরা একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্তা কে তাহা আমি জানিতাম না।

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে রইলে কেন খোকা ওঠে পড় উঠে পড়।"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন।"

পর মুহূর্তেই পটলকর্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া আমার কান দুইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন।

"দূর হ'য়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন — ।"

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্তা আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির, হাতে একটি সোনার তৈরি পাখী।

"ও বারাহী তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কান মলে চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে— ।"

সোনার সুন্দর পাখীটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দেশে তাঁহাকে প্রণামও করিলাম। পটলকর্তা সত্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে থাকিতেন না, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্তার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে কিছু নাই। খুব ধপধপে ফরসা রং ছিল। ডান পায়ে

ছিল গোদ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোখ দুইটি খুব ছোট ছোট ছিল। নাকটি খাঁদা, চিবুকের নীচে বেশ থল্‌থলে চর্বি। গোঁফ-দাড়ি ছিল না। বেঁটে মোটা চিনেম্যান গোছের চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এমনি একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। গ্রামের কুম্ভকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্তা নিজের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়া। একবার অসুস্থতার জন্য কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিল না। অগত্যা পটলকর্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। বলিলেন, "মজুরী তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়তে পারবে তো—"

পঞ্চানন বলিল, "পারব।"

"বেশ, তাহলে গড়। জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন আমি কোলকাতা থেকে আসব। এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমাটি তৈরি আছে, নিখুঁত প্রতিমা চাই।"

পটলকর্তা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকর্তা যখন স্টেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পারিষদ ভোলানাথের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্যই স্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি স্টেশনে থাকিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে?"

"নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—"

"তার মানে? ভালো হয় নি?"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি।"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না।"

"পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে।"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একথা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছন্দ হয়নি তাহলে।"

"পূজো করবে তুমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি।"

পটলকর্তার গৃহিণীও (সকলে তাঁহাকে পটল-গিন্নি বলিয়া ডাকিত) ট্রেন হইতে নামিয়াছিলেন। তিনি মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া বলিলেন. "তখনই বলেছিলাম কেষ্টনগর থেকেই কারিগর আনাও। একজনেরই না হয় অসুখ করেছে, আর কারিগর ছিল না সেখানে? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল।"

পটলকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পঞ্চা আমাকে বললে কেষ্টনগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রতিমা ওই তো গড়ে ফি বছর।"

ভোলানাথ বলিলেন, "এবার গড়ে নি। সোনারবেনারা এবার কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমৎকার প্রতিমা হয়েছে তাদের।"

"তাই নাকি ?"

পটলকর্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনারবেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বংশপরম্পরাগত শত্রুতা। এই সুবর্ণ-বণিকরা মকোর্দমা করিয়া পটলকর্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্বস্বান্ত করিয়াছিল। পটলকর্তা বলিলেন—উহারা জাল হ্যাণ্ডনোট তৈয়ারী করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্তার ধারণা সেই মকোর্দমার ফলেই তাঁহাকে আজ বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্ব-পুরুষদের বিষয়-আশয় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈন্য সত্ত্বেও পটলকর্তা পূর্বপুরুষদের জগদ্ধাত্রী পূজাটা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনারবেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেক্কা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনারবেনেরা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাত্রা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্তার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অন্ততঃ যাহাতে সোনারবেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভালো হয়; প্রতি বৎসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বলিত এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা!

বাড়িতে ঢুকিয়াই তাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত। হাবু পাড়ারই ছেলে এবং সম্পর্কে তাঁহার নাতি।

"হাবু, প্রতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয়নি দাদু। কান দুটো ইঁদুরের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্তা ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বসিয়া তখনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্তা দালানের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—"পঞ্চা! এ কি করেছিস? এই কি সিংহের কান?"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্তা যাহা করিলেন তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পঞ্চাননকে না পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে, কাল যে পুজো—"

পটল-গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া মুক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সন্তোষের মায়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি খুব চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্তার সহিত দেখা আরও দুই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে

বলিব। পটলকর্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দূর-সম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বৎসল ছিলেন। অনেক গরীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম…”

এই পর্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখী সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুচ্ছটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীষ্মকালে কি চমৎকার ডাকে। তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যাহার গলায় অত সুর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখীদের কি পক্ষাঘাত হয়? দোয়েলটা উড়িয়া গেল। কুমারও উঠিয়া পড়িল। খাতাটি বগলে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।

পিছনের ঘরে বসিয়া কুমার আবার স্মৃতিকথায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

“আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সন্তোষের মাকে, আমার সই-মাকে। আমার শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম। সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বসিয়া আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন বুঝিতাম না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোর-ঠাকুরপো, মহেশমামা, মহেন্দ্রদাদা এমনি সব কত নাম। খেতুমামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, ‘সন্ধের সময় খুড়ি অতীতে ফিরে যান।’ হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত। সেই সময় যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বহুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আমরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধ্যার সময় সই-মার কাছে গিয়া আশ্রয় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার আরও দুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের আড্ডা বসিত রান্নাঘরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রান্নাঘর সংলগ্ন ভাঁড়ার ঘরে। সই-মা রাঁধিতে রাঁধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখু-দুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমৎকার একটি বিশেষত্ব ছিল তাঁহার। এমন ভাবে গল্প বলিতেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেখিয়া ছেলে-মেয়েরা আজকাল যে আনন্দ পায় আমরা তাহার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার সিনেমায় আমরা মনে মনে যে ছবি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় তাহা সম্ভবে না। একই গল্পকে কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখিতাম। সই-মার গল্পস্রোত কখনও মন্থর গতিতে চলিত, কখনও দ্রুতগতিতে।

কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সহিত সই-মা যেন একাত্ম হইয়া যাইতেন। রাক্ষসীর কথা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষসী, পরীর কথা যখন বলিতেন তখন তিনিই যেন পরী। আমরা রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গল্প-শোনায় বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ছিল। তাই আশেপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সই-মার ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্‌কি পাঠাইয়া তাঁহাকে তাহারা লইয়া যাইত। কয়েকটি বিশেষ রান্নায় সই-মার খুব নাম ছিল। লাউঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্‌তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের টক প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাড়িতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন সসম্মানে লইয়া যায়, সেকালে সইমাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে দুই একটা তরকারি রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। গায়ক-গায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহারা আসেন, কিন্তু সই-মা যাইতেন স্নেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দূরের একটি গ্রামে একবার একজনের অসুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না। সই-মার সহিত তাহাদের সামান্য একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সন্তোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রান্না খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমৎকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সই-মা সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং তাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অতুলের অরুচি সারাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষও তাহার মায়ের সহিত গিয়াছিল, আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই। সই-মার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু সই-মা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রঙের ছোট্ট একটি উল্‌কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সন্তোষ ছাড়া তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শক্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপর্যুপরি তিনটি কন্যা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল।... চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্বে যে মহিষটা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে নাকি সমীপবর্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—'যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ।' কুমার প্রত্যাশা করে নাই যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না, বেশীর ভাগই কাদা। সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকর দড়ি লইয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে বাঁধিবার জন্য গুড়ি মারিয়া আসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না এইখানেই চরুক—"

পাশের একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল। কুমারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে ঢুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিষটা এমনভাবে ফসল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বুক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক যখন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুমার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল বাবা দিদিমার কথা আর লেখেন নাই, অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন।

"...সেই সময়ের আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতেছে, গোলক পণ্ডিতকে, যিনি আমার এবং সন্তোষের হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদূর লেখা-পড়া জানিতেন জানি না, কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকও খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সাধারণত যেরূপ উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীনু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশালা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নয়। সন্তোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, নুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমরা চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতাম। তিনি সরস্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, স্তোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বারান্দার উপর খড়ি দিয়া অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ বুলাইতাম। ক্রমশ অক্ষরগুলি স্থূলাকৃতি হইয়া উঠিত, আমাদের হাত মুখ জামা কাপড়ও খড়ির গুঁড়ায় শাদা হইয়া যাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিতেন—"এইবার ডাল দিয়ে সাজাও—"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মশায় ?"

"মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ।"

আমরা তখন মশুর ডাল অক্ষরগুলির উপর নিপুণভাবে সাজাইতাম। দেখিতে দেখিতে মশুর-ডালে-লেখা 'অ' 'আ' হইয়া যাইত। নিজেদের কৃতিত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। বৈচিত্র্য করিবার জন্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাল ব্যবহার করা হইত। ডাল আমরা কিনিতাম পণ্ডিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। পাঁচটি ছোট ছোট মাটির-ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল থাকিত। ইহার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে

সবশুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিতেন। ডালের বদলে কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ সবের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অনুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা হইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে শুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদ্দার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন না, আমাদের বাড়িতে তাঁহার খাইবার নিমন্ত্রণ হইত। খাওয়ার খুব যে একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন হইত তাহা নয়, সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেবল পায়েস। আহারের শেষে খুব বড় একটি জামবাটি-পূর্ণ পায়েস পণ্ডিত মহাশয় পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিতেন। সেদিন তিনি পানও খাইতেন। অন্যদিন তাঁহাকে পান খাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুখে দিতে দেখিয়াছি। এই ঠানদিও একটি চমৎকার চরিত্র। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই ঠানদির বাড়ি ছিল, ঠানদির বাড়িতে দুইবেলা তাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। ঠানদির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারও সহিত ঠানদির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রকম তরিতরকারিই না হইত। কুমড়া, ঝিঙা, ধুঁধুল, বেগুন, নানারকম শাক, লঙ্কা, পুদিনা সব ছিল। তাঁহার বাড়ির উঠানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠানদি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোষো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে মরবি যে।" ঢিলনিক্ষেপ-কারীকে কোনদিন তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পড়িলেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহার পর মুচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। ওই মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। দুষ্ট ছেলেরা যে তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছুটিয়া পালায়, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্বও করিতেন। তাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমুক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক দিকি'। তাঁহার বদান্যতাও ছিল। নিজের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি খায় নাই এমন লোক শঙ্করা গ্রামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত শঙ্করা গ্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় দুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন। তিনি রান্নাবান্না সব করিতেন স্বহস্তে। ইহার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দোকান হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠানদিরও কুলাইয়া যায়। ঠানদির চেহারা অদ্ভুত ছিল। মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু স্থূলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্তু শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কূপ ছিল, সেই কূপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কূপটি ঝালাইবার জন্য গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি, বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা ব্যাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। যে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুক্ করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবুড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকগুলো কুয়ার ভিতর নামিতেছে, সর্বাংগে কাদা মাখিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠানদির সহিত গ্রামের কাহারও রক্তের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সন্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটুজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবন হইতে সংগে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্মভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যে মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রান্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাটুজ্যেপাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না, এটুকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সহ্য করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাও তাঁহার বোধহয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার

পাঁচ জনের বিচারবুদ্ধির উপরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল এক অদ্ভুত ঘটনার ফলে। গোলক পণ্ডিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাঙ্গুলীর রাধাশ্যাম বিগ্রহের পূজারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে আসেন। শিবরাম গাঙ্গুলীর বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্বশুরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিন্ধ্যবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোঁটেরও প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক হইলেন তখনই ঠানদি মধু চাটুজ্যের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া শঙ্করা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। শুরু করিবামাত্র অনেকেরই বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণকমলের অভিসন্ধি ছিল যে নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যের বিষয়টি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই ক্রমশ হস্তগত করিয়া ফেলিবেন। অসম্ভবও হইত না, কারণ ঠিক তাঁহার জমির পাশেই মধু চাটুজ্যের জমি, আল ক্রমশ সরাইয়া লইলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু মধু চাটুজ্যের উইল বাহির হইতেই সব গোলমাল হইয়া গেল। ঠানদির উপর তিনি জাত-ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে ধমক দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া ঠানদিকে গ্রাম ছাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন ঠানদি অত সহজে হঠিবার পাত্রী নন, বেশ প্রতাপশালিনী। আইনও তাঁহার স্বপক্ষে ছিল। তিনি একেবারে সোজা চলিয়া গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন একটি সদ্য-পাস-করা ছোকরা সাহেব। অবলাদের প্রতি সাহেবদের সৌজন্য সুবিদিত। তিনি নিজে আসিয়া সব অনুসন্ধান করিলেন এবং ঠানদিকে অভয় দিয়া গেলেন। কৃষ্ণকমলকে অনুভব করিতে হইল আইনের দিক দিয়া সুবিধা হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায় গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের জন্মদিনে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু গোলক পণ্ডিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি। এইজন্য তাঁহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল তাঁহাকে পূজারীপদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য লোক বাহাল করিলেন। গোলক পণ্ডিত দেশেই ফিরিয়া যাইতেন কিন্তু ঠানদি তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বাড়ির পাশে তোমাকে একটুকরো জমি দিচ্ছি, তুমি তার উপর একটা দোকান কর, মাথা গোঁজবার জায়গাও কর একটা। মুখপোড়াদের হুমকিতে পালিয়ে যাবে কেন পুরুষ মানুষ হয়ে! এটা কি মগের মুলুক নাকি। তুমি বিয়ে-থা কর নি, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই,

তোমার একটা পেট চলে যাবেই। এইখানেই থাক।" গোলক পণ্ডিত থাকিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা ঠানদির পুকুরও বন্ধ করিয়াছিল। ঠানদি তাহাতেও দমেন নাই। তাঁহার কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তিনি নিজের উঠানে পাকা ইঁদারা করাইয়া লইলেন। যতদিন সে ইঁদারা না হইল ততদিন তিনি তিন-ক্রোশ-দূরবর্তী একটি নদী হইতে জল আনাইতেন, এজন্য তিনি একজন বাঁকী (যাহারা বাঁকে করিয়া জল বহন করে) মাহিনা দিয়া বাহাল করিয়াছিলেন। আমার জন্মের বহুপূর্বে এসব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অনেক বড় হইয়া আমি এসব কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশবে যখন আমি ঠানদি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত গ্রামের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্তে হৃদ্যতাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই কৃষ্ণকমল মারা গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি যে সকলেই সানন্দে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি না জানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার ফল বীভৎসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। আমি শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক পণ্ডিতও। আমি যখন ঠানদির মৃত্যুসংবাদ পাই তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও নাকি ঠানদির মড়া তুলিতে আসে নাই। মড়া তিন দিন পড়িয়াছিল। গোলক পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদির ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোলক পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিয়ামত আলি। সে-ই কেবল লাঠি উঁচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলির সহায়তায় গোলক পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোলক পণ্ডিতকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর পর গোলক পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে থাকেন নাই। তিনি ঠানদির সমস্ত সম্পত্তি নিয়ামত আলিকে দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নিয়ামত আলির সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আসিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই, ঠানদির প্রেতাত্মার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে দুপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ির দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে অনেক ফসল ফলিয়াছে, চারিদিকে সবুজে সবুজ; যমুনী মনের আনন্দে একটা ক্ষেতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সত্যই কি ভুত আছে? মা কি

কোথাও বাঁচিয়া আছেন? মুক্তি মোক্ষ এসব কি ধরনের অবস্থা! আমাদের কথা মায়ের কি আর একটুও মনে নাই? বাবার কথাও না? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মন দুই চিঁড়ে আনতে বলে দিয়েছিলাম। সেটা এসে পেঁছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাও। কত লোক আসবে তো, 'রেডিমেড' খাবার কিছু থাকা ভাল। রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

দুইটি বস্তা মাথায় করিয়া দুইজন মজুরনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়া মৃদু হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তখন কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বড়টি হইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ বাড়ির সব তাহার চেনা। দ্বিতীয় মজুরনীটি অনুসরণ করিল তাহার।

"ওগুলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চললুম। দেখো যেন ড্যাম্প না লাগে।"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন।

কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল অবশেষে।

"ওর দামটা কি এখনই দিয়ে দেব।"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবা দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের সুরে বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে যেও না। সে অঙ্ক তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্‌সে অনার্স ছিল—।"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা দুইটি ভাঁড়ার ঘরে মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

...মজুরনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অসুখের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া হইয়াছে কিনা, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে। তাহার পর ম্লান হাসিয়া বলিল, "তোদের দেখেই আমার আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে কয়লা সবে জোয়ান হয়ে উঠেছিল, গতবার কলেরায় সে-ও গেল। রাধাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, খেটে খেটে সেইটেই উশুল করছি এখন—"

কুমার ঊর্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে দাও।"

"আচ্ছা—"

মজুরনী দুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল সে।

"...আজ শেষ বয়সে শঙ্করা-গ্রামে-অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা

স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, সেটি গ্রামের পূজো পার্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা। বৈশাখের নববর্ষ হইতে শুরু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরী পূজো, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, নীলষষ্ঠী, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজো, সরস্বতীপূজো, দুর্গোৎসব, কালী পূজো, জগদ্ধাত্রী পূজো, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তাছাড়া সীতানবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, উমা চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, দুর্বাষ্টমী, তালনবমী, সত্যনারায়ণ পূজা, ললিতা সপ্তমী, পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট উৎসবেও আমাদের বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙীন পতাকার সারি, রঙীন কাগজ আর রাংতায় তৈরি মন্দিরের মতো প্রকাণ্ড 'তাজিয়া', মনুষ্যবেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীৎকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমাদের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরাইয়া আনে। মনে পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভৃতি দেখাইয়াছিল। রাত্রে সে যখন আমাকে লইয়া ফিরিল তখন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।

"সমস্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য দুর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম যেন মাতিয়া উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই দুর্গোৎসব হইত। সে কি সমারোহ। পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা গড়িতে শুরু করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা, পাড়ার ছেলেরা, সর্বক্ষণ তাহার নিকটেই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন গড়িত, মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়েরা পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাঁধিতেন, কেহ পূজার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনের দিকে গোটা দুই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকিত, যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিধ আয়োজন করিতেন কর্মকর্তারা। যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের তত রেওয়াজ নাই। খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তিভোজনে বসিয়াও আমরা ভূরি-ভোজন করিতাম। খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাদ্য থাকিত না, থাকিত ভাল সুগন্ধ আলোচালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রকম নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, দই এবং পায়েস। মায়ের সম্মুখে একটি ছাগ-শিশুকে বলিদান দেওয়া হইত, তাহা রান্নাও হইত, সকলকে তাহা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার আমিষত্বের প্রমাণ বড় একটা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারি টুকরা আলু, দুই চারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিষ রান্নাগুলি কিন্তু অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ব হইত। ওরূপ

সুমিষ্ট নিরামিষ রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সন্তোষের মা নিজের হাতেই দুই তিনটা তরকারি রাঁধিতেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও তিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্তাব্যক্তিরা বলিতেন—আমরা কিছু জানি না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সন্তোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভুজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জন্য খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচ শরিক ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত। ভার খুব গুরুভার ছিল না। পূর্বপুরুষেরা এজন্য প্রচুর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোগের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে জমি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্যে পূজার সময় যত দুধ দই লাগিত তাহা সরবরাহ করিত। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজনাদার বাজনা বাজাইত বিনামূল্যে, তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল, পুরোহিতেরও জমি ছিল। দুলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্য ছাগ-শিশু সরবরাহ করিত, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস খাটিত, শম্ভু ময়রা ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জন্য কেহ দুই বিঘা, কেহ পাঁচ বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত। প্রতি শরিক পূজা-বাবদ দশ-পনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই মহাসমারোহে পূজা সম্পন্ন হইয়া যাইত। যে সব শরিকের অবস্থা ভালো তাঁহারা বাহির হইতে যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি আনাইতেন। চাটুজ্যেদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল, যাত্রার দল বা কীর্তনীয়ারা সেখানেই থাকিত। মনে আছে কলিকাতা হইতে একবার একজন যাদুকর আসিয়াছিলেন, খুব একটা মজা হইয়াছিল সেবার। তিনি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান পুরোহিত মহাশয়ের চাদরের ভিতর হইতে মুরগীর ডিম বাহির করিয়া তিনি তুমুল হাসির তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। পুরোহিত রাধু ভট্চাজ কিন্তু ব্যাপারটাকে নিছক প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, চটিয়া গেলেন। এত চটিয়া গেলেন যে মুক্তকচ্ছ হইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। যাদুকর অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন!

আমার মনে এই ধরনের বহু স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। সব স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খেতু-মামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খেতু-মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকুর বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খেতু-মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় ভালবাসিতেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি সব মানুষেরই অল্প-বিস্তর থাকে, পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগে খেতু-মামা এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিকতার সহিত হাঁক-ডাক করিয়াই করিতেন। শুধু মামার নয়, বিদেশবাসী আরও অনেকের বিষয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বঙ্কু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয়েরও ভার ছিল খেতু-মামার উপর। গ্রামের

আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার প্রতাপ খুব ছিল! তিনি এমন-ভাবে কথাবার্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—"এই খেতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে মাছ, গাছে ফল-পাকড়, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরী, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কোলকাতা, মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারী চালাচ্ছে কে—এই খেতু চাটুজ্যে। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই ম্যানেজার, কিন্তু আসলে আস্ত একটি জরদ্গব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর জমিদারি থাকত? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ধরে বসে আছে এই খেতু চাটুজ্যে!" খেতু-মামাকে প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকোর্দমার তদ্বির করিবার জন্য। নিজের মকোর্দমা নয়, পরের মকোর্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিল। গ্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খেতু-মামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খেতু-মামার দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল এবং সকলের পুকুর হইতে মাছ নিয়মিত ভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল, খেতু-মামা তাহাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরীদের বাগানে ঢুকিয়া ডাব পাড়িতেছিল। খেতু-মামা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন—বাজার করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল নারিকেল গাছে কেহ চড়িয়াছে। মাথার পাগড়ি এবং গায়ের ফতুয়া দেখিয়া মনে হয় কমল পাশি। সে-ই সাধারণত সকলের ডাব পাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে তো তাঁহার নিকট অনুমতি লয় নাই। বিনা অনুমতিতে সে ডাব পাড়ে কেন।

খেতুমামা হাঁক দিলেন—"ডাব পাড়ে কে—"

"আমি কমল।"

"কার হুকুমে ডাব পাড়ছ।"

"ম্যানেজারবাবুর হুকুমে।"

খেতুমামা একথা শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু হটিবার পাত্র নন তিনি। বাগানে ঢুকিয়া নারিকেল গাছের নীচে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর ঘোষাল বিপদে পড়িল। সে কমল পাশির পাগড়ি এবং ফতুয়া পরিয়াই ডাব চুরি করিতে আসিয়াছিল, এই কৌশলে সে ইতিপূর্বে বহুবার ডাব পাড়িয়াছে, কমল পাশির সহিত তাহার ষড় ছিল। খেতু-মামা যে এমনভাবে নারিকেল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবেন তাহা সে কল্পনা করে নাই। গাছের উপর সে যতটা পারিল দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু খেতু-মামা অনড়। অবশেষে নামিতে হইল তাহাকে। খেতু-মামা দুর্মুখ ছিলেন। বিশুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা তুই। কমল পাশি সেজে এসেছিস। তোর বাপও পাশি নাকি।"

বিশুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

খেতু-মামা মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "নারকোল গাছে উঠেছিলি কেন—অ্যাঁ—"

"আমার খুশী।"

"তোমার খুশী ?"

খেতু-মামা তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিলেন।

এইবার বিশুর মুখ ছুটিল।

"আপনি মারবার কে। আপনার বাপের গাছ ?"

এইবার খেতু-মামার অদৃশ্য পুচ্ছটিতে পা পড়িল। তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে একটি বেঁটে লাঠি সর্বদা থাকিত, সেইটি তিনি সজোরে বিশুর মাথায় বসাইয়া দিলেন। মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল।···

খানিকক্ষণ পরে ফুল-মামী (খেতু-মামার স্ত্রী) কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, খেতু-মামাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

"উনুন ধরিয়ে বসে আছি, বাজার করে আনবে তবে রান্না করব, একি কাণ্ড মা—"

খেতু-মামা জামিনে খালাস পাইলেন না। মকোর্দমা হইল। আদালতে চৌধুরীদের ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ তরফদার হলফ করিয়া বলিয়া আসিলেন যে তিনি বিশু ঘোষালকে ডাব পাড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বিনোদ চৌধুরী স্বয়ং সাক্ষী দিয়া বলিয়া গেলেন যে তিনি খেতু-মামাকে তাঁহার বাগানের বা বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। খেতু-মামার দুইমাস জেল হইয়া গেল। বিনোদ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। পারিষদ মহলে নাকি বলিয়াছিলেন—সম্ভব হইলে তিনি খেতু-মামার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহা সম্ভব ছিল না। ঘোষাল পরিবারের বিশু ছেলেটা বখাটে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশুর দাদা একজন রায় বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আজ না হয় খুলনায় আছে কাল যদি এখানে আসে ? কুম্ভীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা যায় না। এই কারণে অতবড় একজন গভর্নমেণ্ট অফিসারের কোপদৃষ্টিতে পড়িতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

খেতু-মামার জেল হওয়াতে শুধু ফুল-মামী নয়, আমরাও অসহায় হইয়া পড়িলাম। খেতু-মামা সত্যই গ্রামের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে গ্রামে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দিদিমা ফুল-মামীকে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় দিলেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া আমাদের বাড়িতেই আহার এবং শয়ন করিতে লাগিলেন। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অনুরোধ করিলেন—"খেতুর জেল হওয়াতে আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তুমি বাবা রাত্তিরে এখানে এসে শুয়ো। যদি অসুবিধে না হয় এখানেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়াও কোরো—"

গোলক পণ্ডিত যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "শোব, নিশ্চয়ই শোব। খাওয়ার হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি খেয়ে-দেয়েই আসব, নিশ্চয়ই আসব।"

দিদিমা বললেন, "খাওয়ার আর হাঙ্গামা কি। আমাদের এত লোকের রান্না তো হবেই—"

গোলক পণ্ডিত কুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, "না না, সে থাক। ঠানদি আবার কি মনে করবেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোব এসে এখানে।"

গোলক পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ফুল-মামী দিদিমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া যাইবার পর অসংকোচে মন্তব্য করিলেন, "মাগী পণ্ডিতকে গুণ করেছে। হরিদাস বলছিল মাগী সন্ধের পর যখন রান্নাবান্না করে তখন পণ্ডিত নাকি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে ভাগবত শোনায় ওকে। না রে হরিদাস?"

হরিদাস খেতু-মামার বড় ছেলে। বয়স বারো তেরো। সে উঠানে বসিয়া ধনুক করিবার জন্য বাঁখারি চাঁছিতেছিল। সে আরও নূতন খবর দিল। বলিল, "পণ্ডিত মশায় ঠানদির উনুন ধরিয়ে দেয়, কুয়া থেকে জল তুলে দেয়। একদিন দেখলাম মশলাও বাটছে।"

ফুল-মামী নাম কুঁচকাইয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! কালে কালে কতই যে দেখব!"

ফুল-মামীর রাগের কারণ ছিল। গোলক পণ্ডিত হরিদাসকে নিজের পাঠশালায় পড়াইতে রাজি হন নাই। তিনি তিন চারটি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং সেগুলিকে নিজে নির্বাচন করিয়া লইতেন। হরিদাসকে তিনি নির্বাচন করেন নাই।

দিদিমা ফুল-মামীর সহিত একমত হইলেন না।

বলিলেন, "গোলক যা-ই করুক, লোকটি অতি সজ্জন। তা না হলে ওকে রাত্রে এখানে শুতে ডাকতাম না।"

ফুল-মামী ইহার উত্তরে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

গোলক পণ্ডিতের শুইতে আসিবার দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বহুবার গলা-খাঁকারি দিতেন। রাস্তার মোড় হইতেই তাঁহার গলা-খাঁকারি শোনা যাইত। শুধু গলা-খাঁকারি নয়, মাঝে মাঝে—"এই—এইও" বলিয়া হুংকারও ছাড়িতেন। সম্ভবত তাঁহার মনে হইত কাছে-পিঠে চোর বা ডাকাত নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে, তাঁহার সাড়া পাইলেই তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে। সুতরাং সাড়া দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। আর একটা কাজও তিনি সঙ্গে-সঙ্গে করিতেন। তাঁহার লিকলিকে সরু একটি বেত ছিল। পাঠশালা করিবার সময় প্রয়োজনীয় আসবাব হিসাবে সম্ভবত তিনি সেটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠশালার কোনও ছাত্রের অঙ্গে তাহা তিনি ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সেই বেতটিকে এই ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাইয়া ছিলেন। পথ চলিতে চলিতে বেতটিকে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচাইয়া ধরিয়া "এই—এই" করিতে করিতে তিনি বেতটিকে ঘন-ঘন নাড়িতে নাড়িতেই পথ চলিতেন। মনে হইত তিনি যেন সেটি কোন অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখে আস্ফালন করিতেছেন। তাঁহার বাম হস্তে থাকিত ছোট একটি লণ্ঠন। আমাদের বাড়িতে ভাণ্ডার ঘরের সংলগ্ন ছোট যে কুঠুরিটি ছিল তাহাতেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি গলা-খাঁকারি দিয়া বেত্র আস্ফালন করিতে করিতেই আমাদের উঠানে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার জন্য বারান্দায় এক ঘটি জল আগে হইতেই রাখা থাকিত। তিনি লণ্ঠনটি বারান্দায় রাখিয়া কোটের পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একজোড়া খড়ম বাহির করিতেন। মায়ের আদেশে আমি তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া

দিতাম। পা দুইটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তিনি খড়ম পরিতেন। তাহার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, এবার তোমরা শুয়ে পড় সব। আমি রইলাম কোন ভয় নেই।" তাহার পর কোটটি খুলিয়া আলনায় রাখিতেন এবং বিছানায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেন। কাহাকে প্রণাম করিতেন জানি না। তাঁহার এই প্রণত অবস্থার ছবিটিই আমার মনে আঁকা আছে। তাহাকে শায়িত অবস্থায় কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি যখন প্রণাম করিতেন, মা তখনই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন, তাই তাঁহার শোয়াটা দেখিতে পাইতাম না। খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি নিজের দোকানে চলিয়া যাইতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতাম—দেখিতাম তিনি স্নান করিয়াছেন, দোকানে ধূপধুনা জ্বলিতেছে, দুই চারিটি খরিদ্দার আসিয়াছে। আমাদের কার্যক্রমও শুরু হইয়া যাইত।

…খেতু-মামার জেল হওয়াতে দিদিমা পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছিরুকে প্রায়ই বলিতেন—দেখতো, কেনারাম বাড়িতে এসেছে কিনা, থাকলে ডেকে আনিস। কেনারাম সরকার ছিলেন দিদিমার বাপের বাড়ির লোক, তাঁহার সহিত হয়তো আত্মীয়তাও ছিল, ঠিক জানি না। কেনারামের বোনের শ্বশুরবাড়ি শঙ্করায়। কেনারাম ভগ্নীপতির কাছেই থাকিতেন, চাকুরি করিতেন পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। দিদিমার চিঠি লিখাইবার দরকার হইলে কেনারামের ডাক পড়িত। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে দিদিমা নিজে চিঠি লিখিতে পারিতেন না। আমার মা-ও নিরক্ষরা ছিলেন না। কিন্তু মাকে দিয়া দিদিমা চিঠি লেখানো পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, ও বড্ড তড়বড় করে লেখে। চিঠি একটু গুছিয়ে লিখতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, কেনারাম বেশ গুছাইয়া বাগাইয়া চিঠি লিখিতে পারে। তাহার হাতের লেখাটিও ভালো। কেনারামকে কিন্তু প্রায়ই বাড়িতে পাওয়া যাইত না। কারণ তাহাকে প্রায়ই তাহার ভগ্নীপতির ফরমাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাদের চাষী ছিরুর অন্তত তাহাই ধারণা ছিল। যাই হোক ছিরু একদিন কেনারামকে ধরিয়া আনিল, দিদিমা তাহাকে দিয়া মামাকে চিঠিও লিখাইলেন। চিঠির মর্ম, ক্ষেত্রনাথের জেল হওয়াতে তাঁহারা বড়ই বিচলিত এবং ভীত হইয়াছেন, গ্রামে দুষ্টলোকের উপদ্রবও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাঁহারা এখন সাহেবগঞ্জেই যাইতে চান। ধানের বিলি-ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। দুই সপ্তাহ পরে মামার উত্তর আসিল। তিনি মাতৃভক্ত লোক ছিলেন, উত্তরে জানাইলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পত্র পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন ; কিন্তু হাতে দুই তিনটি শক্ত রোগী থাকায় আসিতে পারিলেন না। আরও মাসখানেক কাটিল, কিন্তু মামা আসিলেন না। তখন দিদিমা স্থির করিলেন গ্রামের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই সাহেবগঞ্জ চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাও খুব সহজসাধ্য হইল না। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—ট্রেনে বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহার মাথা ঘোরে, 'বমনেচ্ছাও' হয়। এই কথাটিই তিনি বলিয়াছিলেন আমার বেশ মনে আছে। বলিলেন এই কারণেই তিনি নিজের দেশেও যাইতে পারেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় দেশে যাইবার তাঁহার প্রয়োজনও হয় না। একথা শুনিবার পর দিদিমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি তখন পটলকর্তাকে একটি পত্র লিখাইলেন যে তিনি

যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিবেন তখন ফিরিবার পথে তাঁহাদের যেন সাহেবগঞ্জে রাখিয়া যান। পটলকর্তা সম্মতি জানাইয়া উত্তরও দিলেন, কিন্তু লিখিলেন যে দুই মাসের পূর্বে তাঁহার ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ততদিন যদি দিদিমারা শংকরায় থাকেন ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে পেঁীছাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। একদিন অভাবিত উপায়ে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল একটি।

…একদিন সকালে দুইটি কালো বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ আমাদের বাড়ির উঠানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, আরক্তিম আয়ত নয়ন, তৈলহীন অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম, গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের তিলক, প্রশান্ত ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডল, ধূলিধূসরিত নগ্নপদ, একহাতে প্রকাণ্ড একটি সেতার, অন্য হাতে একটি পুঁটুলি। আমি নেবুতলার আড়াল হইতে নির্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। বাবাকে সেই আমি প্রথম দেখিলাম। দিদিমা বারান্দায় বসিয়াছিলেন, বাবা তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। দিদিমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনিও বাবাকে চিনিতে পারেন নাই।

"কে বাবা তুমি—"

"আমি কেদার।"

"কেদার! এ সময়ে কোথা থেকে এলে বাবা।"

"আমি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মৃণালপুর গ্রামে একটা গানের আসরে এসেছিলাম। সেখান থেকেই এখানে এলাম। আপনাদের বাড়িটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনারা যে এখানে আছেন তা জানতাম না।"

"বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। আমাদের যে কিভাবে দিন কাটছে।"

দিদিমার গলা কাঁপিয়া গেল, তিনি চোখে আঁচল দিলেন।

বাবার সঙ্গে যে লোক দুইটি আসিয়াছিল বাবা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "এইবার তোমরা যেতে পার। আমি ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এই নাও—"

বাবা মেরজাইয়ের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিতে গেলেন। তাহারা কিন্তু কিছুতেই টাকা লইতে চাহিল না। উভয়েই হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি আমরা নিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিসে দিয়ে দিন—"। বাবাও দেখিলাম না-ছোড়, তাহাদের কিছু দিবেনই। অনেক বলা-কহার পর তাহারা অবশেষে একটি করিয়া টাকা লইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দিদিমা চোখে কম দেখিতেন বলিয়াই বোধহয় কানে বেশী শুনিতেন। উঠানের একপ্রান্তে লোক দুইটির সহিত বাবার যে বাদানুবাদ চলিতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলে, পুলিসের কথা বলছিল কেন, কে ওরা।"

বাবা সংক্ষেপে বলিলেন. "ডাকাত—"

"ডাকাত! বল কি!"

বাবা যাহা বলিলেন তাহা রোমাঞ্চকর।

"কাল বিকেলের দিকে মৃণালপুর থেকে বেরিয়েছিলাম। মঙ্গল গাঁয়ে পেঁীছুতে

সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্ষিধে পেয়েছিল, একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে তাকে জিগ্যেস করলাম—শংকরা যেতে হলে কোন রাস্তা সোজা হবে। সে বললে—মানুষ-লোটান মাঠটা পার হয়ে দাবিরগঞ্জ, সেখান থেকে আশনা, আশনা থেকে শংকরা দুক্রোশের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ-লোটান মাঠে ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে, রাত্রে ও-মাঠ পেরুনো ঠিক হবে না ঠাকুর। তার চেয়ে রাত্রে এইখানেই শুয়ে থাকুন, ভোর-বেলা বেরিয়ে যাবেন। আমি দেখলাম রাত্রের মধ্যেই যদি আশনা পেঁছে যেতে পারি তাহলে সকালে এখানে পেঁছে যাব। আরও ভাবলাম, সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটতেও পারব। মায়ের নাম করে বেরিয়েই পড়লাম। বিপদটি কিন্তু ঘটল। মানুষ-লোটন মাঠের মাঝামাঝি যখন এসেছি গুটি চারেক কালো কালো মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন বললে—এই চল্ আমাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম কে তোমরা। বললে, আমরা মায়ের অনুচর, বলির পশু সন্ধান করতে বেরিয়েছি, তোকেই বলি দেব, চল্। বললাম, তোমাদের মা কোথায় আছেন। দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল সেই দিকে দেখিয়ে বললে—ওই গাছতলায়। বুঝলাম, আপত্তি করলে এইখানেই মেরে ফেলবে। গেলাম তাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। গোটা দুই লণ্ঠনও রয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকটি লোকের দুষমনের মতো চেহারা, গাঁট্টা গোঁট্টা, কালো মুশ্‌কো, মাথায় বাবরি চুল, প্রত্যেকের হাতে বেঁটে মোটা লাঠি একটি করে। আর গাছের ডালে সত্যিই দেখি মা কালীর পট টাঙানো রয়েছে একটি। পটটি ঘিরে জবাফুলের মালা দুলছে। আমি বুঝলাম আজ আর নিস্তার নেই—”

দিদিমা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলেন।

“তারপর—?”

“মৃত্যুর জন্যেই তৈরি হলাম। তাদের বললাম, আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল, মরবার আগে প্রাণভরে মায়ের নাম গান করতে দাও আমাকে। আমি ছেলেবেলা থেকে মায়ের নামই গান করেছি, শেষ সময়েও তাই করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধটি তোমরা রাখবে। একথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করে পরামর্শ করলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে—বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। হোক মায়ের নাম একখানা। আমি ঠিক কালীর পটটির নীচে গিয়ে বসলাম। তারপর সেতারটি বেঁধে ধরলাম একখানা শ্যামাসংগীত দরবারি কানাড়ায়। ডাকাতের দল চুপচাপ বসে শুনতে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু আর এক কাণ্ড হলো। প্রকাণ্ড গাছ, অনেক পাখী ছিল তাতে। তারাও সব একযোগে সঙ্গত করতে লাগল আমার সঙ্গে। সেই অন্ধকার মহাশূন্য সুরে সুরে ভরে উঠল যেন হঠাৎ। অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হলো একটা। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম, তারপর ঠিক যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না, আমার গান যখন শেষ হলো তখন চোখ খুলে দেখি সেই পঞ্চাশ জন ডাকাত হাত জোড় করে আমার সামনে বসে আছে। আর মা কালীর পটে যে জবাফুলের মালাটা ছিল সেটা আমার গলায় রয়েছে। আমি যখন তন্ময় হয়ে গান গাইছিলাম তখন মালাটি আপনি নাকি ওপর থেকে আমার গলায় এসে পড়েছে। কখন পড়েছে, কি করে পড়েছে তা আমি বুঝতে পারি নি। ডাকাতদের বললাম,

আমার গান শেষ হয়েছে, মায়ের কাছে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি, এবার তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারা বলতে লাগল, আপনাকে আমরা চিনতে পারিনি ঠাকুর, আমাদের মাপ করুন। আমরা ভক্ত নই, আমরা ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে। পেটের দায়ে এই মহাপাপ করি। কিন্তু আসল ভক্তকে আমরা চিনতে পারি। আপনার গায়ে আমরা হাত দিতে পারব না। স্বয়ং মা যখন আপনাকে অভয় দিয়ে আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমরা কি আর কিছু করতে পারি? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পেঁৗছে দিয়ে আসব। কারণ কিছুদূরে গিয়ে আমাদের আর একটা ঘাঁটি আছে, তারা হয়তো আপনাকে আটকাতে পারে। ওরাই আমাকে সঙ্গে করে পেঁৗছে দিয়ে গেল—। সবই মায়ের ইচ্ছে—"

বাবা উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন। যাহা বলিতেছিলেন তাহা এতই চমকপ্রদ যে তাঁহাকে দিদিমা বসিতে পর্যন্ত বলেন নাই। এইবার তাঁহার হুঁশ হইল।

মা কালীর উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, "—সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া, তিনিই রক্ষে করেছেন। তুমি বাবা উঠে এস, এখানে বসো। হাত পা মুখ ধোও। ও বারাহী, কোথা গেলি তুই, কেদার এসেছে, জল নিয়ে আয়, পা ধুইয়ে দে, পেন্নাম কর—

আমি লেবু গাছের আড়াল হইতেই সব শুনিতেছিলাম ও দেখিতেছিলাম। মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তিনি রান্নাঘর হইতে একগলা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইলেন। মাকে এত বড় ঘোমটা দিতে আগে কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। যদিও একটু অবান্তর হইবে তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। মা খুব ভালো অভিনয় করিতে পারিতেন। একবার লুকাইয়া মায়ের অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। দুপুরবেলা সই-মার বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের আড্ডা জমিত। একদিন সন্তোষ ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি আমাকে বলিল, মায়েরা থিয়েটার করছে, দেখবি তো আয়। গিয়া দেখিলাম সই-মার শুইবার ঘরে খিল-লাগানো। কিন্তু কপাটের ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, মা চমৎকার একখানা শাড়ি পরিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। সই-মাও আর একটি শাড়ি পরিয়া মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া পদ্যে কি বলিতেছেন। সইমার বলা শেষ হইলে মা শাড়ির আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সই-মার মুখের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর তিনিও কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। উত্তেজিত হইয়া আমি মা-কে ডাকিতে যাইতেছিলাম কিন্তু সন্তোষ আমাকে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং চোখের ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেলাম। সন্তোষ বলিল, তোর মা সীতা সেজেছে, আমার মা সরমা। কাউকে বলিস না যেন। জানাজানি হয়ে গেলে মা ভয়ানক রাগ করবে। মায়ের একগলা ঘোমটা দেখিয়া সেদিনকার কথা মনে পড়িল। মনে হইল মা সেদিন যেমন সীতা সাজিয়াছিলেন আজ বোধহয় তেমনি কনে বউ সাজিয়াছেন। বাবা বারান্দায় তাঁহার ধুলিধুসরিত পা দুইটি ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন। মা প্রথমে গিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর ঘটি ঘটি জল ঢালিয়া তাঁহার পা দুইটি ধুইয়া দিলেন, তাহার পর একটি টুকটুকে লাল গামছা দিয়া পা দুইটি মুছাইয়া দিলেন। বাবা নির্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কোন মহারাজা তাঁহার প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম এই আগন্তুক কে! তখনও তাঁহাকে আমি বাবা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। চেনা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এত দিন পরে ফিরিলেন।

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পড়িল।

বলিলেন, "সূয্যি গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে।"

মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু দেখ তো সূয্যি কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে।"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু নাকি!"

ছিরু বাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "সূয্যি ওই যে নেবুতলার পিছন থেকে উঁকি মারছে। এদিকে আয়—"

আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

"দেখছ, ছেলের কাণ্ড।"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর মেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে নাকি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্য তিনি একখানি লাল পাড় শাড়ি, দিদিমার জন্য একটি ছিটের দোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা যেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেইখানেই আস্তানা গাড়িলেন। ছিরু চৌকির উপর শতরঞ্জি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুঁটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাছেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল, কিন্তু ইহাও বুঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা।"

"আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—।"

"আমি এবার চান করব। তেল নিয়ে আয়।"

ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া আসিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিলেন। কানের গর্তে দিলেন, নস্যের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি দুই চোখেও এক ফোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অশ্রুপাত

হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে এমন করিয়া তেল মাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করিয়াছিলাম বাবার গায়ের রং কত ফরসা, বুকের মাঝখানটায় কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম স্তোত্র-আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনকার কার্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্যায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে' দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে।"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। সুষি, যা পঞ্চাননকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার লইল। সেই পঞ্চানন, যে পটলকর্তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। সই-মা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁধিতে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট্ট একটি কাঁচপোকার টিপ। মায়ের কোনও আপত্তি তিনি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি খড়কে-ডুরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজহস্তে মায়ের পা ঝামা দিয়া ঘসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রূপ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না, তাঁহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা আড়ময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন। দিনরাত সংসারের নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন··· বাসন মাজিতেন, ঘুঁটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমন কি দুধ পর্যন্ত দুহিতেন—তাই তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সই-মা সন্ধ্যার সময় আসিয়া পালঙ্কের উপর ফরসা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, "তুই আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি সন্তোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ।" আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সই-মার কাছে সন্ধ্যার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা একটু নূতন ধরনের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে।" সই-মা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলোয় কখনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সন্তোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকখানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং একের পর এক রাগ-রাগিনী আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। সহসা সই-মার কণ্ঠস্বরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সই-মা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখ মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো।"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন। তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "আমি পালাবার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না।"

সই-মা কথায় হটিবার পাত্রী নন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অনুমতি দিন, ভাত বাড়ব?"

"বাড়ুন।"

পালা-ঘটিত কথা-বার্তা তখন বুঝি নাই, কথাটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সই-মাই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সই-মা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সই-মাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়। রান্না করা সার্থক হলো!"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। আমি সই-মার বাড়িতে চলিয়া গেলাম। সই-মা গল্প শুরু করিলেন। সেদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মানুষের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়ন্তী নামটাও কম অদ্ভুত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহংস আসিয়া আমাকে বলিতেছে 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্তোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সই-মা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জ্বলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দিক নিস্তব্ধ, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। স্বপ্ন সত্য হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল যে কিছু একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠনখানার ঘরটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আম গাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা খোলা। সই-মার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী দূরে নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্য সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে

পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দরজা খোলা। লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট ঠেসানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতো বয়স আমার নয়, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরমূর্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সই-মার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সই-মা আর মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সই-মা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সই-মা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। ওঠে এলি কেন রে—।"

"ঘুম ভেঙে গেল।"

"খিদে পায় নি তো, সন্ধেবেলা খেলি না তো ভাল করে। পায়েস খাবি একটু?"

"না।"

"তাহলে শুবি চল।"

সই-মার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দ্বার খোলা, প্রদীপের মৃদু আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বসিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরনে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তন্ময় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গম্ভীর মাধুর্য তখন ভালো করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম মা দুঃখ পাইয়াছেন। দুঃখটা কেন এবং কিসের তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুতে আসে নি কেন সইমা।"

"পুজো করছেন।"

"এত রাত্রে কিসের পুজো।"

"কালীপুজো।"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সই-মা আর আমি জাম-তলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু দুই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজন জামতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার আসর বেশ জমকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সংগীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পাইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র আসিয়া জুটিল। কণ্ঠ-সংগীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অন্য পাড়ার ছেলেমেয়েরাও দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। দুই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, তথাকার সংগীতজ্ঞ গুণীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সংগীতশাস্ত্রে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সংগীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল। মায়ের মুখেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে। সই-মা বাবাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রান্নার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য বাড়ির রন্ধন-পারদর্শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চাননও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিমা আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত করাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ববিধ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি নিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালী-প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একের পর এক শ্যামা সংগীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। আনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাঁধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভালো করিয়া মাংস আহার করিলাম। বাবা চমৎকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবারই তাঁহার হাতের রান্না খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহাপ্রসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন দুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন,

"এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই।"

"কোথা যাবে, দেশে ?"

"না। নলহাটিতে যেতে হবে একবার। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব।"

"তাহ'লে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পেঁছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছি না—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বাল্যজীবনের আর একটা অধ্যায় শুরু হইল।

"একবার শোন—"

কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল ঊর্মিলা তাহাকে ডাকিতেছেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"কি—"

"পেচ্ছাপ করে বাবা বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি।"

চাদর বদলাইয়া কুমার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণও প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্তই অসহায়। কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক করিয়া লইতে পারেন না।

"কুমারবাবু আছেন?"

বাহিরের দরজায় ডাক শুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আসুন, কি খবর।"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন?"

"একটু ভালো বলেই বোধ হচ্ছে।"

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে কুমার বুঝিল বাবার খবর লইবার জন্য তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি কুমারবাবু। গঙ্গার বাড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্য দুধ নিতাম রোজ! গঙ্গা খবর পাঠিয়েছে যে সে আর দুধ দিতে পারবে না। কারু গোয়ালা কর্পূর গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ দুধ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা দুধ চাই আপনার।"

"আধসেরটাক হ'লেই হ'য়ে যাবে।"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্টমাস্টারবাবুর জন্যে এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি?"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি যায়।"

"সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তখনও সে টেলিগ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ খবর গঙ্গা একটু পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্টমাস্টারবাবুর দুধ পাঠাস নি কেন আজ।"

গঙ্গা একটু ঝাঁঝের সহিত উত্তর দিল, "ওকে আমি আর দুধ দেব না। গোয়ালা-টোলার কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায় নি।"

"জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টমাস্টারবাবু এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে গেছে।"

"মিথ্যুক লোকটা। ঝক্সু বললে টেলিগ্রাম যায় নি।"

ঝক্সু পোস্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোস্টাফিসে থাকে, কারণ পোস্ট-মাস্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে করিতে হয়। সুতরাং সে যখন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে কি আমাদেরও ছোটলোক হ'তে হবে?"

গঙ্গা কোনও উত্তর না দিয়া গজগজ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফিরিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই শ' টাকা লাদুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে রেখে দাও। একটু পরেই সে মাল নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এখুনি।"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও, বৌমাকে দিয়ে আসি।"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রামচরিত্র তেওয়ারি মহাশয় আসিতেছেন। চোখো-চোখি হইতেই নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে আসিয়া বলিলেন, "পিতাজি আজ কৈসে হ্যঁয়?"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা।"

"খুশী কি বাত হ্যয়।"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালকসমিতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দুইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসাইকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্বদা থাকিবে, কারণ 'বখত্পর' কখন যে কি দরকার হয় বলা তো যায় না, সর্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধন্যবাদ তিনি লইবেন না। কর্তব্য করার জন্য আবার ধন্যবাদ কেন? কুমার বলিতে পারিত যে 'বালকসমিতি'র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমারবাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ

বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচ্‌কি ঘাড় কামড়া-কামড়ি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায় যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া।

কুমার ধমক দিল—"এই ল্যাংল্যাং ছুঁচ্‌কি কি হচ্ছে।"

ল্যাংল্যাংয়ের চক্ষু দুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হ্যা হ্যা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচ্‌কির বয়স কম, ধমক খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সত্যিই রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, ছুঁচ্‌কিও সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিল তাহার। কুমার ছুঁচ্‌কির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজারুর মাংস খেয়ে খুব ফুর্তি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচ্‌কি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আস্তে আস্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে?"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়।"

"হ্যাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌঁছে দেয়।"

"আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট কে?"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি।"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতো ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হ'য়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্যে রান্না করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—"

"না, না, সে হবে না। আমি আপনার জন্যে অন্য ঘরে আলাদা করে রামভুজকে দিয়ে রান্না করাচ্ছি। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অসুখের বাড়িতে—"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

॥ ৪ ॥

বীরুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশংকা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকান্ত স্টেশন-প্লাটফর্মটি বার দুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমে ইজিচেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বীরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেন্ট।"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু দুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখে এলাম। বলেন তো তাই কিছু কিনে আনি।"

পুরসুন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বীরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি ডিম খেয়ে পেট ভরে নি বুঝি।"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্যেই? গরম গরম জিলিপি খাওয়ার বিশেষ একটা আনন্দ আছে।"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহ্যই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পেঁছিবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।"

এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়ে কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কখন গাড়ি?"

"শুনেছি ছ'টার সময়। বাড়ি পেঁছিতে বারোটা একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বীরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

কিরণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবা-মার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বন্দেমাতরম্ টুপি বলে একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে, রঙীন সিল্কের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি দেখে এসে ঝোঁক ধরলে পুজোর সময় আমরাও ওই টুপি চাই। কাটিহারে পূর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে।"

পার্বতী ঘরের একধারে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আলু-পটল তো কুটলাম। শাকগুলো শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব? গরম গরম বড়া ভেজে নিলেই হবে।"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "অত হাঙ্গামা করবার দরকার কি মা এখন।"

পার্বতী ঝাঁজিয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও আমি বড়া করব।"

পার্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের সুর ফুটিয়া উঠিল।

পুরসুন্দরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন একটু। কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা।"

কি যে জ্বালায় মেয়েটা। পুরসুন্দরী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফাস্টক্লাস ওয়েটিং রুমে উনুন জ্বালতে দেবে না। বেকার এসব বার করছ।"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফির-খানায় যাব, যেখানে পকৌড়ি ভাজছে।"

পুরসুন্দরী পার্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্বতী ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া মুসাফিরখানার দিকে গেল।

কিরণ বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"পার্বতীটা তোমায় খুব জ্বালায় দেখছি।"

"জ্বালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর।"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"ভারী তো সংসার, তুমি আর দাদা। ছেলে মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘ-বর্কারিও খেলে যেতে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার? তোমার বউ কেমন হয়েছে? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো?"

পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেয়েরা অতটা পারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। শৌখীন কাজকর্ম অনেক জানে। লেখা পড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে চায় না। খুব বড়লোকের মেয়ে তো; বাপের বাড়িতে আদরে মানুষ হয়েছে। একটু বেশী খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হ'য়ে আছি আমি। দিন রাত খালি বই নিয়ে বসে থাকে।"

কিরণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরসুন্দরীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতূহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি। কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিন রাত বসে থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডাক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হলো, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার স্বাস্থ্য কেমন?"

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। কলেজে যখন পড়ত তখন না কি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল

সহ্য করতে পারে না মোটে। দুটি প্রাণীর জন্য গগনকে একটা ঠাকুর, দুটো চাকর, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। এছাড়া মোটরের ড্রাইভার আর ডিস্‌পেনসারির কম্পাউণ্ডার তো আছেই।"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে ?"

"করবে কোত্থেকে। যত্র আয় তত্র ব্যয়। কত রোজগার করে তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ।"

"আর দিগন্ত।"

"সে প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকে কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা-অন্ত প্রাণ তো।"

হঠাৎ 'ফু ফু ফু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের ঠোঁট দুইটি বায়ু সহযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অদ্ভুত মানুষ, যেমন অসুরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে। বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেনে অসম্ভব ভীড় ছিল। আমি বসে জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই খাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ক্ষমতা।"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল। তিনি যখন ঘুমাইতেছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃদুতম কণ্ঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কখনও ঘড়িতে এলার্ম দিয়া শোন না, যখন উঠিবেন মনে করেন তখনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেস্ট-অফিসার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন, বাঘ কাছাকাছি আসিবামাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেন্‌জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাদ্যা-খাদ্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন! আহার এবং নিদ্রার অসুবিধার জন্য সাধারণত লোকে যে সব কষ্ট ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি সুখী পুরুষ। কিরণের সহিত তাঁহার সম্পর্কটাও একটু অদ্ভুত গোছের। বড় ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণত সংসারে জটিলতা সৃষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্যজীবনকে কখনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘণ্টু ওরফে ঘনশ্যাম জন্মগ্রহণ বরে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেরা কিরণের টিউব দুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে আর সন্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যখন আট কি নয় বৎসর তখনই কৃষ্ণকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সন্তানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বহুরকম বাংলা সাময়িক পত্রিকার

গ্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল সংসারের কাজ করিতে হইত না। দিনকতক পরেই কিন্তু তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন ভরে না। তখন মন দিল নানা রকম রান্নায়। ইংরেজি বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম জ্যাম জেলি আচার চাটনি, বিদেশী নানা রকম অদ্ভুত রান্না করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্শেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিসের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তারিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরণের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃষ্ণকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির দ্রৌপদীই বলিয়া বসিলেন। রান্না লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশী দিন নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। উল বোনায় মন দিল, মেমসাহেব রাখিয়া সেলাই শিখিল। তারপর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত্র। অন্তর্নিহিত একটা ক্ষুধার তৃপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে ক্ষুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে। এটা কোরো না, এমন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাওয়া ভালো নয়—এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড় সুখ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল সে, এমন কি আপিসের ব্যাপারেও কি করা উচিত কি অনুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহার নাম দিলেন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড়-সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কসুর করিতেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাড়ির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া যাইতেন, ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে দুইজনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই সুরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজিয়া শুনিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোখের পাতা দু'টি ঈষৎ কাঁপিতেছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিরণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাগিয়াছেন।

"মটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোথা গেল। বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে দাদা, একটু গল্প সল্প করে অন্যমনস্ক করে রাখ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ওগো শুনছ—"

"অ্যাঁ, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"কি বলছ বল।"

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছদ্ম কোপ চকচক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে পড়ে থাকার দরকার কি। গল্প-সল্প করে দাদাকে একটু ভুলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাঘ ভালুকের গল্প আছে।"

"এখনকার বাঘ ভালুকের গল্প দু'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে কি। সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরসুন্দরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন—"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাত্রের গাড়িতে যদি গগন আর দিগন্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও।"

"এত সকালে ঘুমই আসবে না আমার। তুমি শোও", তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগন্তকে যে কতদিন দেখি নি।"

পুরসুন্দরী কোন জবাব দিলেন না।

কিরণ নিজের স্যুটকেস হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীরবে আলাপ করিতেছে। কখনও ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, কখনও বা উল্টানো নীচের ঠোঁটটি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

পার্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পা টিপিয়া রাঁধিবার কিছু সরঞ্জাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্বতীকে বাধা দিলেন না, যা খুশী করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাখিয়া কি ভাবে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করেন তাহারই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল।

পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া একেবারে অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। পার্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্য আর কেহ না বুঝুক তিনি বুঝিয়াছিলেন। দিগন্ত মটর ডালের বড়া খাইতে খুব ভালবাসে। সে হয়তো রাত্রের ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্বতী এত কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার মনে আছে ভগবানই জানেন। দুর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগন্ত যে উহার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে। কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার বাধা পড়িবে, এক বৎসর কালাশৌচ। মানুষের কিছুই হাত নাই। চক্ষু বুজিয়া পুরসুন্দরী নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও বুঝিলেন না। আজকাল কারণে অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

"বউদি ঘুমিয়ে পড়লে না কি—"

পুরসুন্দরী শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে তাঁহার ভালো লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় বাক্সে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল স্তূপকরা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে, সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাফিরখানাটা কোন দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোষাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি, আপনিও এসেছেন!"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্টদাকে খুঁজছেন? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন। ডেকে দেব?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা! তুমি রেলে ঢুকেছ বুঝি।"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল তো?"

"মা মারা গেছেন গেল বছর।"

"ও—"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে ফরসা থান-পরা ধপধপে সাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, খর্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারাটা কিরণের চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রবধূর মতোই ভালবাসিতেন। তখনও ঘণ্টুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্রী কেমন আছে।"

যতীশের দাদা সতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও সখী ছিল।

"বৌদির থাইসিস হয়েছে।"

"ও! কোথা আছে সে? হাজারিবাগে?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে দিয়েছি। বৌদি ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেরা বলছেন সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে।"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয় নি?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বৌদির অসুখ হয়, ছেলেটি বাঁচে নি।"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্তা কিরণ নির্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবন্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি-আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা?"

"দাদা সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন তিনি। ছেলেও হয়েছে দুটি।"

"আবার বিয়ে করেছেন? বিয়ে না করলেই পারতেন।"

যতীশ কুণ্ঠিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে যে।

বলিল, "বৌদিকে একথা জানাই নি আমরা—"

"তুমি বিয়ে করেছ?"

"না। বৌদির স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন।"

যদিও ইহাদের সংসারের সুখ-দুঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সর্বপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে সাবিত্রীর চিকিৎসার খরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া।"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হই নি।"

"কেন।"

যতীশ কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বহুকাল পূর্বে দশবারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

"কতক্ষণ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেনটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিংরুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

"না। আচ্ছা আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন।"

কিরণ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চত্বরে বহুযাত্রী। একটি পান সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্বতী পকৌড়ী-ওলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ী-ওলা চিরনজিপ্রসাদও ছাপরা জেলার লোক। পার্বতীর চাল চলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কায়দা দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল সে অবাক হইয়া গেল এবং আত্মহারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাতেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরনজি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ গিয়া দেখিল পার্বতী একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে. মুকুন্দ বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুন্দের হাতে একঠোঙা পকৌড়ী। সানন্দে সে পকৌড়ী ভক্ষণ করিতেছে। চিরনজি তাহার তোলা-উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর জামাইবাবুকে দেখেছিস—"

"ওই যে—"

মুচকি হাসিয়া পার্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণকান্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল যুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকী সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকান্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দাজ করিল, কোনও রসের গল্প ফাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে ওস্তাদ তো! সে দলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে—"

"এরা ? এরা সাঁওতাল, আমার আলাপী লোক। মুংলিকে তুমিও তো দেখেছ ? সেই যে ডালটানগঞ্জে আমাদের বাংলার মাঠে মাঠে পাতা কুড়োতে আসত ছোট মেয়েটা। কত বড় হয়েছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

পিঠে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাড়ির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আড্ডায় বসে গেছ।"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বুধুমাঝির সঙ্গে কত হুঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।"

এমন সময় প্রকান্ড একটা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হ্যায় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ছিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অনুমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়িয়া গেল যেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল—"কম বয়সী ছুঁড়ি দেখলে আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না।"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল।"

মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের দিকে আড়চোখে একবার চাহিলেন। দেখিলেন কিরণও হাসিতেছে।

"গুণের আর শেষ নেই। কি বলে অতগুলো জিলিপি ওদের সব দিয়ে দিলে। নিজেদের জন্যও কিছু রাখতে হয়—"

"খাবে ? গরম গরম ভাজিয়ে নি চল না। চল, দোকানে বসেই খাওয়া যাক।

ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। দাদা বৌদি তো খাবে না। পার্বতী আর ওই ছোঁড়া চাকরটা তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি, কি বল—"

"নাও—"

পার্বতী খাইতে চাহিল না। পকৌড়ি খাইয়া মুকুন্দেরও পেট ভরিয়া গিয়াছিল।

"আমরা দুজনেই খাই চল তাহলে—"

"আমার লজ্জা করবে ভারি।"

"এতে লজ্জা কি। জিলিপি খাওয়া অন্যায় নয়।"

একটু পরেই দেখা গেল, কিরণ আর কৃষ্ণকান্ত দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া দুইটি শিশুর মতো জিলিপি ভক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলিপি নয়, গরম গরম কচুরীও। তাহার পর ভাঁড়ে করিয়া চা।

"তোমার জেদেই কতকগুলো অখাদ্য গিলতে হলো।"

"কুচ্‌পরোয়া নাই। হজমি ওষুধ আছে আমার সঙ্গে—আগে চল দাদার খোঁজটা করি। কোথায় গায়েব হ'লেন ভদ্রলোক—"

বীরুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিরণ শেষে অনুমান করিল, "দাদাতো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয়তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিংরুমে ফিরবে? তার চেয়ে চল ওই ওভার ব্রিজটায় ওঠা যাক—যাবে?"

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

"এই গরমে—?"

"গরম বলেই যেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে একটু।"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টংএর ওপর।"

"দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব।"

"বুড়ো বয়সে শখও কম নয়।"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণ-ভাবে সেটি ধরাইলেন। তাহার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অনুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি সব ছেলেমানুষী এই রাত দুপুরে।

...বীরুবাবু ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁধা লোক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পরে জানা গেল সে নৌকার মাঝি। বিরুবাবু ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই ঝক্সু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বীরুকে বাড়ি পেঁাছাইয়া দিবে। বাতাস অনুকূল আছে, হয়তো পাঁচটার আগেই পৌঁছিয়া যাইবেন। বিরুবাবু মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেনের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। ঝক্সু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন।

বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্‌ক'ও তো আছে। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

ঝকস্থু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে-প্রতিবাদ করিল. মনে হইল একটা বাঘ বুঝি গর্জ্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব যে বলিষ্ঠ তাহা নয়, যুবকও নয়। দোহারা চেহারা, কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুচ্ছে পাক ধরিয়াছে, গোঁফও কাঁচাপাকা। সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দীতে যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই যে, কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আশ্বাস দিত না। সে রেল-কোম্পানীর মতো বেইমান নয় যে অগ্রিম ভাড়া লইয়া যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আজ রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির কোন আশংকা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়বৃষ্টি হয় বা নৌকা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরন্তু কান কাটিয়া 'জরমানা' (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল।" বীরুবাবু কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেনে এদের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন করে হোক আমি সেখানে পেঁছিতে চাই।"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বীরুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এক সহকর্মীর সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বীরুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন "আরো পাঁচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!—" সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা বৃথা।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"

পুরসুন্দরী এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই এক কোণে বসিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ফাঁড়া আছে শুনেছি। তোমাকে এই রাত্রে একা আমি নৌকায় যেতে দেব না।"

"পাগল না কি! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে? আমাকে যেতেই হবে।"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

"তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি—"

পুরসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড় গামছা সেমিজ ব্লাউজ পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে পারব না। তার চেয়ে চল সঙ্গেই যাই।"

"চল—"

কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

"নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবেনা? সবাই গেলে কেমন হয়।"

"না সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক। গগন দিগন্তও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেনে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্বতী ?"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রান্না নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি, সে কথা ওকে জানাবারও দরকার নেই। যদি জেদ ধরে বসে যে যাব— তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

"যা করবে তাড়াতাড়ি করে ফেল। এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।"

"চল, আমি তো প্রস্তুত।"

পুরসুন্দরী ব্যাগটি হাতে ঝুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণ বলিল, "আমার দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না ?"

বীরু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"তোরা পরে যাস—"

তিনি ঝক্‌সুর মাথায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পুরসুন্দরীও পিছু পিছু গেলেন। স্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় দুই মাইল দূরে। রাস্তাও ভালো নয়; মিউনিসিপালিটির রাস্তা অত্যন্ত বেমেরামত। মিউনিসি-পালিটির বাহিরের রাস্তাও সুগম নয়, ধূলিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে খানাখন্দও আছে। বীরুবাবুর হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কষ্ট হইতেছিল না, তাছাড়া তিনি খালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরসুন্দরীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুঁইতে দেন না, বরাবর নিজেই বহন করেন। পুরসুন্দরীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল খুবই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বীরুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে যে ট্রেনটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিস বোস আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি খাটাইয়া দিয়া একটি টেবল্‌ ফ্যান পর্যন্ত লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতটুকু তাহারা আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়া-ছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র পাহারা দিতেছিল পার্বতী আর মুকুন্দ। পকৌড়ি-ওলা চিরনজিও ওয়েটিংরুমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্বতী হুকুম দিলেই বড়া ভাজিতে আরম্ভ করিবে। পার্বতী মুখ-ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরসুন্দরী যে তাহাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না। প্রতিশোধস্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না। যাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবে তিনিই তো নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরসুন্দরীর সহিত দেখা না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে।

...ট্রেনটা যখন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকান্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে অবতীর্ণ যাত্রী

চতুষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন দিগন্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ হইতেছিল, কারণ দ্বিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগন্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারা তাহা ভাবা শক্ত। অথচ মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত বচসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম—"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্বতী দ্রুতপদে আসিতেছে। কথাগুলি সে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন ভরসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে? পারছ না নিশ্চয়ই।"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো পড়িয়াছিল। তাহা সরাইয়া সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গগনও তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল।

"বড় পিসেমশাই। বড় পিসিমাও এসেছেন।"

তখন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।

পার্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ আবার কে! গগনকে চোখের ইসারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে।

গগন বলিল, "উনি একজন মিড-ওয়াইফ। শ্বশুর মশাই সঙ্গে দিয়েছেন।"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়াছিলেন. পার্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমমে চলো—"

কুলিদের লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পার্বতী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোষাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপসী। ফরসা রং, অদ্ভুত কালো চোখ, দেহ সৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্বতী প্রশ্ন করিল—"খৃষ্টান না কি—"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোষাক কেন তবে?"

"আমিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোষাক থাকলে ঢের সুবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকি মিলিটারি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেলট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চমৎকার মানাইয়াছিল তাঁহাকে। দিগন্ত বেশ পরিবর্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, পায় একজোড়া স্যান্ডাল। বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর সে বারবার সেটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত সানন্দে ইঁহাদের দেখিতেছিলেন। চম্পাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া

গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। চম্পা তো চম্পাই। কনকচাঁপার মতো গায়ের রং। ফিকে নীল শাড়িটি কি চমৎকারই না মানাইয়াছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে! কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যেন দেবীদর্শন করিতেছেন। আসন্ন-প্রসবা? কই দেখিয়া তো মনে হয় না।

গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনারা বসেছেন কোথা—"

"ওয়েটিং রুমেই।"

"বাবা মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি?"

"তারা কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকা করে চলে গেছেন।"

"কেন! দাদুর অবস্থা খুব খারাপ না কি?"

"না, সে রকম কোনও খবর আসে নি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিন্তু উত্তর আসেনি। তাই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন।"

পার্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি মুসাফিরখানায় গিয়ে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব অন্যায় করেছেন। তোমার অনুমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

পার্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। দাঁড়াও না আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি—"

"নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মজাই তো জানা আছে তোমার—উপোস—"

গগনের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি—"

পার্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

দুইজনে সমবয়সী, একসঙ্গে মানুষ হইয়াছে।

"কি রান্না করে রেখেছ।"

"কিছু করি নি—"

"চল, ওয়েটিং রুমে বসেই ঝগড়া করা যাক।"

গগন, পার্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।

কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড-ওয়াইফ নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি?"

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড়।"

এই পর্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল। হাসির দ্বারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়া ঝাঁটি করে এসেছ?"

"না, তা হয় নি।"

দিগন্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"কি হলো তাহলে "

"যা বরাবর হয়, দাদা ঝড়াৎ করে আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বসল—কাম শার্প। গেলাম। দাদা বললে—চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তখন দাদার শ্বশুর শাশুড়ীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছে তখন আপনাদের ভাবনা কি। দাদুরও খুব কষ্ট হবে বৌদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ভরা পোয়াতি রাস্তায় যদি কিছু হ'য়ে যায় তখন সামলাতে পারবে? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নার্স কিম্বা মিড-ওয়াইফ সঙ্গে চলুক। আপনাদের যার উপর বিশ্বাস বলুন—তাকেই নিয়ে যাই। যাঁর উপর তাঁদের বিশ্বাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই মিস্ বোস্‌কে রেকমেণ্ড করলেন। মেয়েটি নাকি বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি দাদার শ্বশুর বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শ্বশুর-শাশুড়িও হয়তো দাদুকে দেখতে আসতে পারেন—"

"জমজমাট ব্যাপার তাহলে বল—"

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার টি পট সুদ্ধ উল্‌টে, চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড।"

"তাই না কি! কি হলো শেষ পর্যন্ত—"

"কি আর হবে। ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে, তা না হলে লাভ হয় না, কেলনার তো উঠে গেছে—"

"না, তা বলছি না। পুলিস কেস হয় নি তো—"

"না। আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা দুই টাকা দিয়ে দিয়েছি।"

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে হইল বেশ চটিয়াছে।

"ও, এরা সব এসে গেছে বুঝি। বাঃ, তুমি বেশ লোক তো, একলা উঠে চলে এলে, আমাকে ডাকলে না।"

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথাটি বলিলেন।

"দু'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা টাথা ধরবে, তাই আর বেশী ডাকলাম না।"

"মিথ্যুক কোথাকার। একবারও ডাকনি আমাকে।"

কৃষ্ণকান্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্‌টার যতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্য চা করতে বলেছি। ক'কাপ আনতে বলব।"

কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল ব'লে গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে এসেছে।"

"কে বললে।"

"দিগন্ত।"

কিরণকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আলকাতরার মতো রং—"

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভালো চা করাচ্ছি, যতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

যতীশ বলিল, "আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি ওঁদের সঙ্গে যান না।"

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

"আমাদের সঙ্গে ভালো দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ ডিসও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্বতী। কোথা গেল, পার্বতী—"

মুকুন্দ ওয়েটিংরুমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "চিরনজীকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে—"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে—"

যতীশ বলিল, "আমি তাহলে গরম জল নিয়ে আসি। দুধও চাই বোধহয়।"

"হ্যাঁ, তা চাই—"

যতীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। উভয়ের থুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে রাজলক্ষ্মী দেখছি। ট্রেনে ঘুম হয় নি নিশ্চয়, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি দেখি যতীশ চা-য়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটন্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া একটি ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ শশব্যস্ত হইয়া মুসাফির-খানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একটু আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগন্ত প্রবেশ করাতে মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশী চেয়ার ছিল না। গগন দিগন্তকে বলিল, "দেখতো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ ওয়েটিংরুম থেকে যে ক'টা পাস টেনে বার কর। প্ল্যাটফর্মেই বার কর। বাইরেই বসা যাক—।"

দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে সে একজন গণ্যমান্য প্রফেসার।

পরদিন সকালে গগনরা চলিয়া যাইবার দুইঘণ্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেনটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেন হইতে সূর্যসুন্দরের একমাত্র ভ্রাতা চন্দ্রসুন্দর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ভীড়ের মধ্যে ব্রজগোপালবাবুকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তিনি যেমন শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের মতো ধপধপে শাদা। বৃদ্ধ নন, অকালে চুল পাকিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর ট্রেন হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং খুশী হইলেন। ব্রজগোপাল আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল যে বিলকুল শাদা হ'য়ে গেল রে, অ্যাঁ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকে নি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিষ্ট—"। সুদৃশ্য কাপড়ের-তৈরি মণি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজগোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, মানে ছাত্রের মেয়ে—আমাকে ক'রে দিয়েছে। আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হতো, না ?" ব্রজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি ট্রেনে উঠিয়া গেলেন এবং লিষ্ট মিলাইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রসুন্দর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রসুন্দরের বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাখেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রসুন্দর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু. সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে খুব খাতির করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা উদ্ভব হইয়াছিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ, এমন কি কুসংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন, চন্দ্রসুন্দর সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কণ্ডাকটার, সূর্যগ্রহণের সময় হাঁড়ির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইতেছিলেন তখন চন্দ্রসুন্দর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানন্দের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রসুন্দর কিন্তু সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ববোধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন তিনি ? বার তিনেক ফার্ষ্ট আর্টস (সেকালে আই, এ বা আই, এস-সি ছিল না) ফেল করিয়া অবশেষে তিনি স্কুল মাস্টারি গ্রহণ করেন। ধর্ম বিষয়ে বরাবরই তিনি গোঁড়া। ছাত্র জীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, দুইবেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাহিক করেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছেন। সুতরাং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেন, কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মান্যগণ্য। এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্থস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান—তখন পথে-নিবার্য কোন কষ্ট-ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক

পোষ্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার হালে আসিয়াছেন। জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলমান ছাত্র হাওড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অসুখের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিয়াছিলেন। জলিল স্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট চেকারটি ট্রেনে যাইতেছিল তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—সে যেন পথে মাস্টার মশাইয়ের খোঁজ খবর লয়। নরেশ রামপুরহাটে থাকে। সে রাত্রি তিনটার সময় আসিয়া তাঁহাকে শুদ্ধাচারে প্রস্তুত বাড়ির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজগোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চন্দ্রসুন্দর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাধ্য ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসংকোচে ফাইফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছে ফাইফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রসুন্দর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাইফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র কার্তিক-গণেশের মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, ততদিন বালক-ভৃত্যের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহার স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে দুইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কারণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের সকলের মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভালো নয়'। চন্দ্রসুন্দরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার না কি স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে। মাথা ঘোরে, হাত পা ঝিন ঝিন করে, মাঝে মাঝে হাত-পা অসাড়ও হইয়া যায়, অকস্মাৎ সারা গায়ে আমবাত বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শরীর ভালো থাকে চন্দ্রবাবুর তাহা নাই। সেইজন্য কখনও বায়ু, কখনও পিত্ত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে তাই সর্দি হয়, একটু গরমেই সর্বাঙ্গে ফোড়া বাহির হইয়া পড়ে। কার্তিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধাক্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চন্দ্রসুন্দরের পত্নী চিন্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্যে তিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। ছেলেরাই বাবার সেবা করিত। চন্দ্রসুন্দরের একটিমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাকে তিনি দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসন্ধ্যা করিত, নিরামিষাশী ছিল, বেশ বড় একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রসুন্দর ফার্স্ট আর্টস পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের হেডমাস্টার হইয়া ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বেশী পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশী বেতনের সন্ধান পাইতেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভাবে বহু স্কুলে তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিন্ময়ী এই অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য

করিতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ সূর্যসুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার ছিল না। যখনই সে চেষ্টা করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোষ করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না তাঁহার। ইহার প্রধান কারণ বোধহয় সূর্যসুন্দরকে ঠিক তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বার বার ফেল করা সত্ত্বেও তাঁহার পড়ার খরচ জোগাইয়াছেন—একথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্যসুন্দরের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাস্টারি এবং তাহার পর পোস্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেষোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই; পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিত না। অর্থাভাবে পড়িলে সূর্যসুন্দরই বরাবর তাঁহাকে টাকা যোগাইয়াছেন। তাই সূর্যসুন্দরকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে এমন একটা নিগূঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার অসুখের সংবাদ পাইয়াই তিনি সুদূর উড়িষ্যা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনের নেপথ্যে একটা অনুপাতের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি দাদার সহিত ঠিক আদর্শ অনুজোচিত ব্যবহার করেন নাই। এজন্য দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—একথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন—যাইতে হইবে, যত কষ্ট যত অসুবিধাই হউক— যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফার্স্ট আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"টাকার জন্য তুমি ভাবিও না। আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে সে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামী বারে নিশ্চয় পাস করিবে।" কার্তিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোস্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্তিক-গণেশ কেহই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিতে পারে নাই। কার্তিককে তাঁহার এক গুরু-ভাই রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাঁহার এক বড় লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পত্নী চিন্ময়ী এবং কন্যা জামাতাকেও তিনি একটি করিয়া পোস্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাহারা যে আসিবে সে ভরসা তাঁহার নাই।

ব্রজগোপালবাবু জিনিসপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়া পুনরায় গণিয়া দেখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লিস্টে লিখিত একটি ছোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তখন চন্দ্রসুন্দরের

নিকট গিয়া বলিলেন, "একটি পঁটুলি ছাড়া আর সব জিনিস পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পঁটুলিটা নেই? নরেশ তাহলে তুলে দিতে ভুলে গেছে। নরেশ ভোর বেলা রামপুরহাটে আমার জন্যে চা এনেছিল। পঁটুলিতে নিমকি ছিল কিছু। পঁটুলি নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং রুমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে। গায়ত্রীটা জপে নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহয় পঁটুলিটা তুলে দেয় নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"কুলি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে তো কাছেই।"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্যার উদ্ভব হইল।

"কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

ডাক শুনিয়া চন্দ্রসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটাসোটা ফরসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী ঊষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই।

ঊষা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারেন নি, আমি ঊষা।"

চন্দ্রসুন্দর বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরে, সত্যিই আমি চিনতে পারিনি।"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন খবর তো জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে—"

"ও—"

ঊষা ঘাড় ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই তিন সরে আয় ওখান থেকে। গাড়ীর নীচে কি দেখছিস। ছোটদাদুকে প্রণাম কর এসে। দাদাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ঊষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেজটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, দুই, তিন। তিনজনই হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিনজনেরই চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রসুন্দর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি—"

"তা পারব। কিন্তু—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।"

চন্দ্রসুন্দর ইতস্তত করিতে লাগিলেন নিজের ভাইঝিদের স্টেশনে রাখিয়া আরামে থাকিবার জন্য ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টি-কটু—এই ধারণাটা তাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনি আমার ছাত্র। তোরা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন—"

ঊষা বলিল, "আমরা এখানকার এস. ডি. ও'র বাংলোয় যাব। রঙ্গনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রঙ্গনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একসঙ্গে বিলেতে ছিল—"

ব্রজগোপাল বলিল, "এস. ডি. ও'র কার বাইরে এসেছে।—তিনিও এসেছেন—"

"রঙ্গনাথ কে—"

"সন্ধ্যার স্বামী। তুমি সব ভুলে গেছ কাকাবাবু। এই যে ওরা—"

স্লিপিং-স্যুট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, মাথায় কাপড় নাই। কালো হইলে কি হয়, অপূর্ব সুন্দরী। তাহার পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে লিটারারি ডাইজেস্ট।

"—সন্ধ্যা, কাকাবাবুও যাচ্ছেন—"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল।

"হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—"

এস, ডি, ও সাহেব ভীড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্দন করিলেন।

"জিনিসপত্র নেবে গেছে সব ? তোমার সদানন্দদা কোথায়—"

"ওই যে—"

ঊষার স্বামী সদানন্দ ভীড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রোগা, লম্বা, ফরসা চেহারা। জুলফির চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। পরনে বাঙালী পোষাক। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গলায় পাকানো চাদর, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম-শু। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনিও আসিয়া চন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

সদানন্দকে চন্দ্রসুন্দর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্বে সম্প্রতি দুই একবার দেখা হইয়াছিল।

"এবার চলুন যাওয়া যাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি হয়ে যাবে—"

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—। আমি তাহলে চলি—"

ব্রজগোপালের সহিত চন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। স্টেশনের বাহিরেই দেখিলেন এস. ডি. ও. সাহেবের প্রকাণ্ড 'কার' টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস. ডি. ও. কি জাত ? ব্রাহ্মণ ? চেহারাটা তো ব্রাহ্মণের মতো—"

"উনি হিন্দুই নন, মুসলমান—"

"রাধামাধব, রাধামাধব—"

অকারণে চন্দ্রসুন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, অনেক মুসলমানের সহিত হৃদ্যতাও আছে, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন অথচ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা অসঙ্কোচে মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে ! তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই দুইটিও বিলাতফেরত। উহারা যে মুসলমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল—ব্রজগোপাল যদিও চুপ করিয়া আছে

কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চন্দ্রসুন্দরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মনে ম্লেচ্ছ মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অনেক মানা করিয়াছিলেন, দাদা শোনেন নাই। মেয়েদের বেথুনে লরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্তু তখনই মনে হইল—মুমূর্ষু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে ? চুপ করিয়া গেলেন।

ব্রজগোপালের বাসায় পৌঁছিয়া চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের স্ত্রীকে মা এবং তাঁহার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর-দা সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিলেন তিনি। ব্রজগোপাল যে ছাত্রজীবনে কতপ্রকার দুষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circum-navigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাক্সেণ্ট-সম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, তাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরু, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের স্ত্রী শিপ্রা।

চন্দ্রসুন্দর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল খাব মা। আমিও স্কুল-মাস্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান টান করুন। ছানার ডালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপনাকে।"

"ছানার ডালনা হচ্ছে না কি ? বাঃ।"

চন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু সুখাদ্যের দিকে বেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে—"

"কি তেল মাখেন ?"

"গায়ে সরষের তেলই মাখি। মাথায় মাখি একটা কবরেজি তেল, সেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোণের দিকে আছে।"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজী তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহার পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্ষপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাখিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রসুন্দর বামহাতের তালুতে কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সেটি মাথায় ঘষিতে লাগিলেন। ঘষিতে ঘষিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি আধ-বোজা হইয়া আসিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আসিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে তেল মাখুন। আমি রান্নাঘরে যাই ; ঘি-টা চড়িয়ে এসেছি—"

"যাও।"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পায়ে তেল মালিশ করিতে লাগিল। মটরু একধারে দাঁড়াইয়া নূতন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে এস দাদু। লিখতে শিখে গেছ ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিখিয়াছে।

"আচ্ছা। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটরু ঘাড়টি কাৎ করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জনীটি পুরিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"বাস, ওই পর্যন্ত ? ঈ ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না।"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ছিঃ মুখে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওই তিনটে আগে লিখে দেখাও দিকি আমাকে।"

মটরু একছুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরে শ্লেটে আঁকা-বাঁকা করিয়া অ-আ-ই লিখিয়া আনিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি। হ্রস্ব-ইটার ল্যাজটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি ভাল করে লিখতে পার তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা।"

"কি ?"

"চুরণ।"

"চুরণ কি ? লবেনচুস ?"

"না। তার চেয়েও ভালো।"

চন্দ্রসুন্দরের কাছে সুলেমানি লবণ, লেবুর রস এবং অন্যান্য জারক মশলা-যুক্ত এক-প্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কৌটা ভর্তি সর্বদা থাকে। বিহারীরা ইহাকে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিহারী কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন। ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমৎকার। চন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার শক্তিও ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রসুন্দর তাই প্রায় ইহাকে টোপস্বরূপ ব্যবহার করেন।·· ছোঁড়া চাকরটি পা দুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মালিশ করিতে যাইতেছিল. চন্দ্রসুন্দর বাধা দিলেন।

"পিঠে দুটো ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। বৌমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়।"

"আছে।"

"আর গোল-মরিচ ?"

"তা-ও আছে।"

"তাহলে খাওয়ার পর একটা ওষুধ করে দিও মা। চন্দন-পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-মরিচ ঘষে ঘষে দিলে একটা ক্বাথ মতন হবে। সেইটে আমার ফোড়া দুটোতে লাগিয়ে দেব। গোড়ায় গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে দেব।"

চন্দ্রসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "A stitch in time saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো—?"

"কিছু আছে—"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। পুরা খবরটা বলিল না। সে বি. এ. পাস।

আহারাদির পর পিঠের ব্রণ দুইটিতে গোলমরিচের মলম লাগাইয়া চন্দ্রসুন্দর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলেন। ঘুমাইবার পূর্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিখিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মটরু কোথা ?"

"পাড়ায় খেলতে গেছে।"

"খুব ব্রাইট বয়—"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্রজ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হয়ে যায়।"

"এত দেরি হয় কেন ?"

"স্কুলের কাছেই বোসবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। আপনাকে চা করে দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব।"

চন্দ্রসুন্দর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস ডি. ও সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারেন না ? ছেলেটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কাছে-পিঠে কোন ডাক্তার পর্যন্ত নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং দুএকজন পুলিস কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমেই একটি গেট। গেটের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর বারান্দা পর্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে সুদৃশ্য একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী না কি ? চন্দ্রসুন্দর চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রসুন্দর আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চন্দ্রসুন্দরের দিকে আগাইয়া আসিল।

"কাকাবাবু, আসুন—"

চন্দ্রসুন্দর যাহাকে এস. ডি. ও'র স্ত্রী ভাবিয়াছিলেন সে সন্ধ্যা। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো।"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং রুমেই আছেন ?"

চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাসাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—"

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব।"

"তুমি এখানে একা কেন।"

সন্ধ্যার মুখমণ্ডলে একটা লজ্জার আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"আমি প্রুফ দেখছি।"

"কিসের প্রুফ?"

"দৃশদ্বতী বলে আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তার প্রুফ—"

"তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না।"

"বসুন।"

চন্দ্রসুন্দরকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিল সে, তাহার হাতে দুইখানি দৃশদ্বতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর যদিও খুশী হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশদ্বতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—"তথা-কথিত সতীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি" তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাস তিনি এফ. এ. ফেল।

"পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস?"

"না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্ লোক খুব ভালো।"

"তোদের খাতির করে খুব। না?"

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধুত্ব।"

"গণেশটা বাঁকড়ো জেলার অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে আছে। রহমান সাহেবকে বলে ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস—"

"বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে—"

"ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি। উপর্যুপরি অসুখ, দু'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না"—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার।"

"টাইপ করতে পারে?"

"না। শেখবার সুযোগই পায় নি।"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বলিস একটু বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে।"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব।"

"তা যা ভালো বুঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হ'লে দেখবেন খুব ভালো লোক—"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে বসে আছে আমার জন্যে। আমি যাই এবার—"

"শিপ্রা কে?"

"আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি।"

চন্দ্রসুন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

"স্টেশনে দেখা হবে আবার। এখন চলি—"

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রসুন্দর নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর স্টেশনে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফলওয়ালা কমলালেবু, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্য এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাঁহার পিঠটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইয়া চিনিতে পারিলেন।

"আরে হাবুমামা যে—"

হাবুমামা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "চন্দর! সকালের ট্রেনে এসেছ বুঝি?"

"হ্যাঁ। দাঁতটা খুললে কেন—"

"নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা বলতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বুঝি—"

"তুমি কোন ট্রেনে এলে?"

"এখনি এলাম একটা মালগাড়িতে।"

"মালগাড়িতে?"

"হ্যাঁ, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেনবাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে—

"দাদার অসুখের খবর তুমি পেলে কি করে। কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল?"

"না। ওরা তো আমার ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পেলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড়ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো—"

"টেলিগ্রামে অসুখের খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানি না।"

হাবুমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি দুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাঁধালে কবে?"

"মাসখানেক হলো। মাড়ির ঘা এখনও শুকোয় নি।"

"কৌটায় পুরছ কেন?"

"অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো—গল্প করতে হবে তো। বললুম তো, দাঁত পরলে কথা বলতে পারি না, মনে হয় এখুনি পড়ে যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে। অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক।"

"অনর্থক কেন। ভালো করে চিবিয়ে খেতে পারবে, ভালো হজম হবে।"

"আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজমও খুব হয়। আমার মাড়ির

জোর খুব আছে। তোমার আঙুলটা আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে কেটে নেব।"

চন্দ্রসুন্দর হাসিলেন।

"এখনও মাংস টাংস চালাচ্ছ না কি?"

"খুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। পুজোতেও আজকাল লাউ কুমড়ো বলি দিচ্ছে।"

"লেবু কিনলে না কি?"

"হ্যাঁ অসুখের বাড়িতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম।"

"দুজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছি, তাহলে আমার আর আলাদা করে কিছু নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয়তো—"

হাবুমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশব্দে একবার নিঃশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

"দাদার মেয়ে জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ও'র ওখানে আছে।"

"হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। এক গ্লাশের ইয়ার নিশ্চয়।"

হাবুমামা মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইলেন।

"তুমি আজকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা?"

"না। হঠাৎ এ কথা মনে হলো কেন তোমার? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা বললে তুমি এই কোটটা পরে থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বুঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরিটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—"

"কোথা যাবে তুমি?"

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে।"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি।"

"চল তাহলে।"

উভয়ে কুলি পাড়ার দিকে অগ্রসর হইল!

॥ ৫ ॥

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ বিশ ক্রোশ দূরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেহ খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ গোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনরা এখনও সকলে আসিয়া পেঁছায় নাই। সূর্যসুন্দরের মেজ এবং সেজ ছেলে আসেন নাই এখনও। মেজছেলে পৃথ্বীশ আসিবেন কিনা তাহা

অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কন্ট্রাকটারি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সব সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাসখানেক পূর্বে নাগপুর হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পৌঁছিবেন, হয়তো একটু দেরি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বহুদিন পূর্বে তিনি বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তখন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্যসুন্দর তাঁহার সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার বুঝিতে পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমারের নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকানাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। সেজদা সপরিবারে আসিবেন; গগনের শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও আসিবেন খবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয়-স্বজন আসিবে। কিন্তু বাড়িতে আর স্থান কই? ইহার উপর আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সূর্যসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বৌয়ের সাধ দিতে হইবে। সুতরাং আরও জনসমাগম অনিবার্য। কুমার অগ্রসর হইয়া দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জন-মজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড়-গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাতত আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাইবে। বাঁশ খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল। কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ খড় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্বে পুরসুন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরসুন্দরী পোলাও-মাংসের আয়োজন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হলো—"

"এখানে যা কিসমিস রয়েছে তাতে চলবে না। জাফরান কি আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। যুগলের দোকান কি একটা দোকান। ভালো লবেঞ্চুস পর্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উষার ছেলেদের জন্য আনব কিছু।"

"কি হবে তাহলে—"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেনে চলে যাই। সাধের জন্যে কি কি লাগবে তার ফর্দটাও পেলে একসঙ্গে সব কিনে আনতাম।"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন—"

"বাঃ, বৌমার সাধ দেবেন না বলিস কি তুই। হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বৌদি একা কতদিক সামলাবেন। ঊর্মিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন বসে আছে, আর থাকতেই হবে। হ্যাঁ আর একটা সুখবর আছে—"

"কি—"

"নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেনে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না।"

"আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো।"

"নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তো যেতে দেখলাম। একটু খোসামোদ করতে গেছেন আর কি—"

"যাঃ। উনি শুধু শুধু নিখিলবাবুর খোসামোদ করবেন কেন ?"

"কেন আর, স্বভাব—"

মুচকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কুমার তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সূর্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকাবাবু গীত পাঠ করিতেছেন। চন্দ্রসুন্দরের ধারণা হইয়াছে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ইহাই একমাত্র পাথেয়। সূর্যসুন্দর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চন্দ্রসুন্দরের আত্মতৃপ্তির জন্যই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ত করিয়াছেন, একেবারে যেন পাঁচটি শ্লোকের বেশী পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশী পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তাছাড়া সকলের হয়তো ভালোও লাগিবে না। ঊর্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বসিয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল সে। মেঝেতে কম্বলের উপর চন্দ্রসুন্দরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল কিরণ। একটু দূরে ঊষা পান সাজিতেছিল। সন্ধ্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল সেদিনকার খবরের কাগজটা। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দিগন্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প চেয়ার, তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিল। গ্রামের নাপিত লোচন (তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গলগণ্ডের উপর একটি তুলসীর মালা) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল জামাইবাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দেশ। বীরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়েজামাইরা কেহই আসিয়া পৌঁছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেনের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পেঁছিতে পারে এইসব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। ঊষার ছেলে তিনটি এক-দুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পার্বতী পুরসুন্দরীর সহকারিণীরূপে রান্নামহলের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তম্বী করিতেছে। তাহার ধমকে সন্ত্রস্ত হইয়া একটি চাকর ঊর্ধ্বশ্বাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড় কাচিতেছে এবং আর একটি ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছে। ঊর্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্বতী যে এই বোকা-অথচ-পাজি চাকরগুলাকে দুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশীও হইয়াছে। হাবু মামা বাহির-বাড়িতে নূতন কম্পাউন্ডারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউন্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবু মামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই। গঙ্গা একনজরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রসুন্দর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পড়িতেছিল—

যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংযত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা, সর্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি কুর্বন্ অপি মানে কাজ করেও, ন লিপ্যতে, কাজে লিপ্ত হন না।

চন্দ্রসুন্দর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বউমা, বুঝতে পারছ তো? আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি—"

চম্পা সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল।

দিগন্ত নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছেন গেলবার। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন—"

"ও তাই না কি। তা তো জানতুম না…"

চন্দ্রসুন্দর চুপ করিয়া গেলেন।

পুনরায় তিনি গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি।"

চন্দ্রসুন্দর ইহাতে একটু মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা সেরে নিই গে। ওবেলা আবার হবে।"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ঊষা একসঙ্গে দুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে পুরিয়া গল্প করিবার জন্য সূর্যসুন্দরের বিছানায় আসিয়া বসিল। বসিয়াই বুঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তখনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ঊষা বলিল, "তুইই ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে বস না। দাঁড়িয়ে কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয় বাপু।"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে।"

কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্মৃতিকথা'টি লইয়া গেল।

"তোমার শরীর দুর্বল লাগছে না তো বাবা"—ঊষা জিজ্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভালো আছি। তোদের সবাইকে দেখে আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে সবাইকে একসঙ্গে এমনভাবে পেতাম কি—"

সূর্যসুন্দর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে ঊষার বিলম্ব হইল না।

"মেজদা সেজদার কোন খবর এখনও আসে নি, নয়?"

"না। উশন্ আসবে। পৃথু কি করবে কে জানে!"

"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"

"কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে।"

"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক।"

সূর্যসুন্দর চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্যসুন্দরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ চোখের স্বাভাবিক রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত অঙ্গের অবশ্য তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

উষার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুই ডায়েট কনট্রোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাস নি, দুর্বল হ'য়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মণ। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না।"

"তোমাদের সে যুগই আলাদা ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান? ফ্যাট ফ্যাক্টারি। এফ্ এফ্ বলে ডাকে। ওদের গুষ্টির সব ফড়িংয়ের মতো চেহারা। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকো মধ্যে হংস যথা। প্রত্যেকটি জায়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। আর জান বাবা, সবাই আমার চেয়ে বেশী খায়। সেজ-জা তো তিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা লিক্‌লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইয়া তাহা দিগন্তকে দেখাইল। দিগন্ত তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে তাহার কানে কানে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না।

সূর্যসুন্দর উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ভাসুরপোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হ'য়ে বসে আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িতে, আর প্রত্যেকটি ছেলে বায়নাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। কুটুমের ছেলেদের বকা-ঝকাও যায় না। ওরি মধ্যে আবার শ্বশুরের মামাশ্বশুরের আলাদা তত্ত্ব। শ্বশুর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় খাবেন, চার পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি চাই—ভাজাভুজি, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শ্বশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত রুটি খাবেন না। কখনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে পুরোনো ঝি চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিক মতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝক্কি আমার উপর—"

"বউ কেমন হলো—"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয় নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, সরু সরু হাত, মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেণ্টের উপরই আছে—। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্যন্ত—"

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ কন্যাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলেবেলায় নিজের পুতুলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঊর্মিলা, তুমি উঠে চান টান করে এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি।"

ঊর্মিলা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল।

"আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস খাবেন।"

"সে আমি করে দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না।"

উষা নিজে তখনও স্নান করে নাই। ঊর্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথরুমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথরুমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, ঊর্মিলার হইয়া গেলেই সে বাথরুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিসশাশুড়ীর কাছে শিখিয়াছে। তাহা অনুসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে ছুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চটচটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা শুকাইতে দেয়। তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার উক্ত চর্ম-রোগটি হইয়াছিল।

ঊর্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। ঊর্মিলা চলিয়া গেলে সন্ধ্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একটু, হাসিয়া দিগন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

"সন্ধ্যা কি বলছে রে দিগন্ত—"

দিগন্ত নিরীহ মুখভাব করিয়া বলিল, "হিন্দু কোডবিল নিয়ে আলোচনা করছি আমরা—"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচকি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগন্তর সঙ্গে যেমন নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। উষা হয়তো আরও কিছু বলিত কিন্তু মিস বোস প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। মিস বোসের পুরা নাম অনুপমা বসু। সকলে তাহাকে অনু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্য আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

অনু আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বৌদি, আসুন একটু আমার সঙ্গে এবার—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন থাক—"

অনু দিগন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আগেই জানতাম, বৌদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আজও ইউরিন রাখেন নি—"

চম্পার নত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

"চলুন ব্লাড প্রেসারটা নিয়ে নি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয় নি, আজও তাই হবে না কি। চলুন—"

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

ঊষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে দারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভালোই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিচ্ছু হতো না।"

"ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হতো না। আমাদের রোজ ব্লাড প্রেসারও কেউ মাপে নি, পেচ্ছাপও কেউ দেখে নি, অথচ তিন তিনটে সুস্থ ছেলে বেশ নির্বিঘ্নেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা—"

দিগন্তর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। তাহার ভয় হইল দুই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। সে সন্ধ্যাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে, যতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নেবে না—"

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্যক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্বে বিজয়িনীর মতো আর একবার ঊষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—শুনলে তো!

ঊষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, "বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝি না, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বশুর একটি আধলা দেবে না, দেখে নিও।"

এ আলোচনা কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখি।"

"দেখ—"

সূর্যসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাম্প চেয়ারে তিন জামাই বসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন, রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার পর তাহারাও একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও তিনি

কিছু শুনাইবেন কিন্তু সদানন্দ এবং রঙ্গনাথের সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-ফেরত বলিয়া ইঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কৌতূহলও ছিল। তাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কখনও জ্ঞাতসারে—কখনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি স্বদেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে বা শহরে কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করে না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের। তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আসল মৎস্যটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন শিকারী, শিকারীসুলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের। সাহেব মানুষ তোমরা, অসুবিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—"

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামুলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামুলি বিনয়-বচন নহে। তাহাতে একটা আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, মেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, "পাড়া গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন-কতকের জন্যে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। যে কদিন ছিলাম অতি কষ্টেই ছিলাম। বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওরা যত কেতা-দুরস্তই হোক না, ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখনও আপন বলে ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি হে রঙ্গনাথ—

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোখে ওরা ফিরিঙ্গি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘৃণা করি তার একটা সংগত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ডাকাতদের সম্বন্ধে কারও সম্ভ্রম থাকতে পারে না।"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দস্যুরাও আমাদের দেশকে এই কিছুদিন আগেই তছনচ্ করিয়াছিল, বর্গীদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছাড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্বে উচ্চারণ করি না কি? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সত্যই ভালো তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার বুঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশী। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভালো, তাছাড়া

পুরোপুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পরের দ্বারে হাত পেতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্যে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন—এ ছোকরা বেশ চতুর। চিতা-বাঘের মতো প্রকৃতি। সদানন্দের কথা শুনিয়া কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত স্বদেশী বক্তৃতায় ভুলিবার লোক নন। তিনি ভালো করিয়াই জানেন যে আমাদের দেশে স্বদেশীর ধুয়া প্রধানত বিলাত-ফেরতরাই তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও তাঁহার ধারণা যে ওটা তাহাদের আহত অহঙ্কারের আস্ফালন মাত্র। ওটা মুখোশ, আর ওই মুখোশের তলায় আছে নানাজাতের লোভ এবং মোহ। তাই তাঁহাদের মুখের বুলি সহজে কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না। এদেশের লোক অধঃপতিত বটে, কিন্তু আসল নকলের প্রভেদ তাহারা বোঝে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে চিনিতে তাহারা ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের মতে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক যুগের প্রবর্তক এবং একমাত্র স্বদেশী নেতা। সদানন্দের কথার সুরে তিনি কিন্তু বিস্মিত হইলেন, সুরটা মেকি মনে হইল না।

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে বারবার ঋতু পরিবর্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবী-কেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাম রাখিয়াছিলেন 'চ্যাটো ইনডাস্'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষীয়, ফার্মের নামে ইহাই তিনি বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফার্মের নাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের ঋতু-পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাপুরি স্বদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্ভ্রম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি সুখ পাইতেছেন এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বৎসর ফার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাদারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে এবং প্যারিতে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে তিনি বিলাতী-ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভতাকে প্রশ্রয় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিক হলে, ক্যাবারেতে যেসব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন সেসব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে রসে তাহাতে স্বদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশী দিন থাকিবে না, আবার নূতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে নূতন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিস্মিত হইলেন। তবু একটু টিপ্পনি কাটিতে ছাড়িলেন না।

"তোমার ও কৃচ্ছ্রসাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে"—

"কিছুমাত্র না। খুব ভালো লাগছে আমার এখানে। আর কিছু না হোক, কান আর চোখ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের মাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গনাথেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হচ্ছে—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্তনই আমার ভালো লাগে।"

হাস্যদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে এক নজর চাহিয়া আবার চীনা-গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের পুনরায় চিতাবাঘের কথা মনে হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। দাদুর পরীক্ষা শেষ করিয়া গগন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাদুকে ছোট ডাক্তারবাবু।"

"ভালোই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় চলে যাক কেউ।"

"কুমারকে বল—"

"ছোটকাকা কোথা।"

"মাঠে গেছে শুনলাম।"

"আচ্ছা আসুক।"

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেন।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, কথা বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক ঊর্মিলা ছাড়া আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। ঊর্মিলা চুপ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। সে-ও ক্রমশ ঢুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, বাবা ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের দিকে যে জায়গাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয়া মনে মনে তিনি অদ্ভুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন! প্রকাণ্ড একটা পথ যেন পূর্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিমদিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্ত কিছু নাই। সেই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পিছন দিক হইতে মাঝে মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজলক্ষ্মীর, বাবার, পৃথ্বীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদূর হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকে কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, সর্পিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিমদিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। দুইদিকে ধু ধু করিতেছে প্রান্তর, প্রান্তরও দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ একটি মনুষ্যমূর্তি। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু?

নিষ্পলক নয়নে সূর্যসুন্দর সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে ।

॥ ৬ ॥

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে সূর্যসুন্দরের জীবন-স্মৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবি-ফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্তূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অসুখের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু সূর্যসুন্দর এবং বৃদ্ধ সূর্যসুন্দর যেন এক বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

"সাহেবগঞ্জে আমাদের রাখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পেঁাছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন ; খাইবার সময় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্ধান করিলেন। দিদিমার-অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন। ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্বেসর্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে খুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিহিত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠিটি ছিল মামীরই হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জন করে স্বভাবত তাহার স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভাবেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভব্যতার একটা আবরণ থাকিত। আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, আমিও তাহা অনুভব করিতাম, নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যেভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলে না। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানও শক্ত। নিজের জন্য বা আমার জন্য মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভালো করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া

থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপর-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো? মা কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে অপূর্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কখনও ভুলিব না। দুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দেখিবেও না। তাঁহার কোনও ছবি নাই। তখন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বাবার ফোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোথাও বেশীদিন থাকিতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অন্যপ্রকার ছিল। তিনি সুরূপে শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোন-প্রকার আস্ফালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়ের ফোটো-তোলান হয় নাই, কারণ তখন মামার বাড়িতে পরদা-প্রথার বড়ই বাড়া-বাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফোটোগ্রাফারের সম্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভিনেত্রীর বা কুলটার সমপর্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তখন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তখন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফটোগ্রাফাররা কিছু অর্থোপার্জন করিতেন।

সাহেবগঞ্জে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক রোগী তাঁহার ডিসপেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যহ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপেঁতিতে, কখনও সকরিগলিতে। গঙ্গার ওপারে তাঁহার নাম ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও তাঁহাকে ডাকিতে আসিত। নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ও অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নূতন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়িতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল। সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত। মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠীও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরথবাবুও সে উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিতেছিলেন। বস্তুত, তাঁহারই আনুকুল্যে মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নূতন বাড়িটিও তিনি চেষ্টা করিয়া শস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের

কর্মচারীরা, পোস্টমাস্টারবাবু, থানার দারোগা ও কনেস্টবলগণ, মামার রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীনু পণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ও রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি বারান্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্য লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরনে থান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কালো সুতা দিয়া একটি মাদুলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল কদম ছাঁট। দীনু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি। তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে শাদা পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিষ্কার করিতেন না জানি না। সেকালে অনেকে দাড়ি কামাইত, কিন্তু যুগপৎ গোঁফদাড়ি কামানো প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য শ্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার চুলের সহিত গোঁফ-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড্ হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিল না ঃ দীনু পণ্ডিতের মুখে গোঁফ-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম—সম্ভবত উঁহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি মাকুন্দ এবং জাতিতে কৈবর্ত। দীনু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি ; যদিও দিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সে-ই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীনু পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ওই লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর খপ্পরে পড়তে হবে তোমাকে।"

"উনি কে—"

"দীনু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়।"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন ?"

"শালা মাকুন্দ, জাতে কৈবর্ত।"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে! দীনু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরও অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই শিক্ষকেরা শাস্তি দেন। দীনু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্য ; কথাটা অদ্ভুত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বাবু মুকুন্দবাবুকেও এবং থানার দারোগা কার্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আপিসের বড়বাবু ছিলেন জগন্ময় রায়। দীনু পণ্ডিত ইঁহাদের

গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীনু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড় অফিসারদের শত্রু দীনু পণ্ডিতেরও শত্রুস্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীনু পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবাবুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া দীনু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। সুতরাং মন্মথ এবং বসন্ত তাঁহার বেত্রাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্মথ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিনিত. কারণ চেয়ারম্যান হইবার পূর্বে বরদাবাবুর সহিত কার্তিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজস্বী লোক ছিলেন। কার্তিকবাবু একটি লোককে অন্যায়ভাবে গ্রেফ্‌তার করাতে বরদাবাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বরদাবাবু সেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকোর্দমা পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মোকর্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য বেচারা মন্মথকে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীনু পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাঁহার একটা সংগত কারণও ছিল। অপোগণ্ড পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিল না, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার। পরবর্তী জীবনে এই সব করিয়াই জীবিকা অর্জন করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সমবয়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমার স্মৃতি-পথে এখনও জাগরূক আছে। মামার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেবগঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইঁহার বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরনের। পরনে হাতকাটা লংক্লথের ফতুয়া এবং শাদা থান। কানে খড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘননিবদ্ধ নয়, যে গুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্যস্ত। পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, চোখের তারা নীল, চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। মুখটিও ছোট কিন্তু মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন, দুনিয়াটাকে সর্বদাই যেন ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মথই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মশাই। লোক খুব সাচ্চা কিন্তু বড় তিরিক্ষে। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁসি না। দেখা হইলে পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্থ—।"

একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রান্না বান্না কি সব রাঁধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন দুই আছে। উমেশ আর দুনিয়ালাল।"

"এত হৈ হৈ না করলেই পারতে। বৌমা চারটি শাকান্ন রেঁধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে খেতাম, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব।"

"আপনি খেয়ে যাবেন না ?"

"না, আমি রাঁধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক।"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে—"

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বৌমাকে একটু আলাদা করে চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই হইল। উৎসবের দিন মামীমা শৌখীন কাপড় গহনা পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সেসব ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে হইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাজল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্য নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইল। আমার মা অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন মামীমাকেই রাঁধিতে হইল। রান্না অতো ভালো হয় নাই, কিন্তু ঘটক মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভাল ছিলেন। নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে স্বমতের বিরুদ্ধে লওয়া যাইত না।

সেদিন আরও দুইটি অদ্ভুত ধরনের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। দুজনেই স্ত্রীলোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন অনেকেই। সে চেহারার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্‌টকে গৌরবর্ণ, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ। সম্ভবত পূর্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিদ্র ছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কোনরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল ; পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহেলিকার মতো রহস্যপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙুল বাঁকা ছিল,

শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি ঢাকা বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রীষ্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন, শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জ্বালাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন রান্না জিনিস খাইতেন না। সাধারণতঃ ফল মূল কাঁচা দুধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটে আমার ভাগ্না।"

"ও কেদারের ছেলে?"

"হ্যাঁ।"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে।"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্যে ফল আনা হয়েছে কি না।"

তাঁহার জন্য নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেন নি।"

ভৈরবী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবে আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও।"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও।"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী-মায়ের সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী-মা বাবাকে যখন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগূঢ় কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাকরুণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল। মন্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাকরুণ। জানিস, ও মেয়েমানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তাই না কি?"

"হ্যাঁ, লুকিয়ে পুলিসে কাজ করত, ধরা পড়ে গেছে।"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমানুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোষাকও পুরুষের পোষাক, ঢিলাহাতা, গেরুয়া-রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায় হলুদরঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতো পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল, ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উরুতে গুলি লাগিয়া সিপাহী ঠাকরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

স্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি স্ত্রীলোক। তাঁহার বীরত্বে সাহেব-জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন, তাঁহার একটা মোটা রকম পেনসন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাকরুণ এখানকার থানার জমাদার পাঁড়েজির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ কনেস্টবলদের সঙ্গে রাত্রে রোঁদও দেন। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন।

বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথাও বলেন। ড্যাম, স্টুপিড, ভেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়াছিল।

"ওই দীনু পণ্ডিতও ওঁকে ভয় খায়। যদু বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীনু পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না। যদু বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাকরুণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাকরুণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কালো রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দীনু পণ্ডিতের বাসায়। দীনু পণ্ডিতকে কান ধরে পঁচিশবার উঠবোস করিয়েছিলেন।"

মন্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে। কিন্তু দীনু পণ্ডিত যে সিপাহী ঠাকরুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজিটও করিতেন, অর্থাৎ সহসা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকরুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীনু পণ্ডিতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়-ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড়া কর বাবারা, আখেরে তোমাদের ভালো হবে।'—বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহী-ঠাকরুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখন ভুলি নাই। প্রথম লোকটি ফেলু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড় চোখ দুটি ঈষৎ কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা ফোলা। দুই গালে এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্য উত্তেজনাতেই, সেগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে সেগুলির ভিতরে জীবন্ত যেন কিছু আছে। মামা ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অনুরোধে অঘোরবাবু ফেলু পুরোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া ফেলু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মামার এক জেলে রোগী অনেক চিতল মাছ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিন চার মণ। ফেলু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানা চিতলমাছের পেটী উদরস্থ করিলেন। যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির

লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', 'আরও খান' বলিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।...পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা ফেলু পুরুতকে পুড়াইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই ফেলুর ভেদ বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শঙ্খ-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কসকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বসিয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারন্ধ্র হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শেঁকো। তুই এমনভাবে এখানে বসে কোঁতাচ্ছিস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শঙ্খমামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার দুই 'ও*' 'ও*' করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্খমামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ওঁ বৌঁদি দাঁদা শুঁতে ব'ললে আমাকে। খেঁতে দাঁও, খেঁয়ে শুঁয়ে পঁড়ি।" একটু পরেই মামিমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথা-ধরার জন্য তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শঙ্খমামাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরণ। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায় পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন সকলে তাঁহাকে 'দালাল মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য। মধু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল, তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘ ঋজু-দেহ গৌরবর্ণ। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও সূচ্যগ্র, চক্ষু বুদ্ধি-দীপ্ত, পাতলা ঠোঁটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল। কে একজন বলিল, 'বংশ্রীবাবু আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশ্রীবাবু একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাবুকে খুশী রাখিলে তাঁহারই সুবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে। উনি যে বদ্যি—" বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "শিক্ষিত সমাজে বৈদ্যও আজকাল ব্রাহ্মণ, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আজকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্যাকরাকে দিয়া একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে বেড়ান, আপনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দেবে?"

হরিহর দে লোকটি কুৎসিত-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব। সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ।"

হরিহর দে-কে মৃদুকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—"এই জন্যেই তো দলে দলে ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে সব।"

পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরনের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিয়া চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা ছিল তখন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলিন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙক্তিতে বসে, এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্‌ক্তির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য দিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্নেহের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাদুরি চালিয়াতির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নিজের গ্রামে তিনি এই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তখন ট্যাঁক ঘড়ি নামে এক প্রকার ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল! ছোটঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একটু চাপা দিলেই ডালাটা লাফাইয়া ওঠে। ঘড়িটা সাধারণত ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখা হইল। দালাল মশাই গ্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিতেছিলেন। গ্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঝপু আসিয়া উপস্থিত হইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জমিজমা কিছু ছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঝপু কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চাকরিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দয়-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গলায় ফুলদার কমফর্টার, পায়ে মোজা ও বুট জুতো।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই?"

"বেলা কত হলো তাই ঠিক করছি।"

"এই যে দেখে নিন।"

ঝপু ট্যাঁক হইতে ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। স্প্রিং টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশয়কে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দালাল মহাশয়ও

তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন, ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন···

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিল।

"দাদুকে পরীক্ষা করে দেখলুম। দাদুর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না।"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু।"

"বলা উচিত ছিল।"

"কাটিহারে বাবার রক্ত-পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। ব্লাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো ?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি ?"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার।"

কুমার অবাক হইয়া গেল।

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম বার করে দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে যাক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ ?"

"লোক আছে। চল্ দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো।"

কথাটা শুনিয়া সূর্যসুন্দর কিন্তু খুশী হইলেন।

"গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউবো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোণে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যান্ডগুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাদু আমার বুদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল।

॥ ৭ ॥

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড্ডা জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর আটচালায় জুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইঁহারা অনেকেই সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী। ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সূর্যসুন্দর জড়িত আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বুঝায় ইঁহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-মাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইঁহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম বাংলাতেই ব্যক্ত করিব।

প্রবীণ সুবাতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশী ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও

নাই। লাগামের বদলে আছে রঙীন পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধারণ সতরঞ্চি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে! সেই গদিতে বসিয়া সুবাতালী তহশিলদার সারা-জীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, সুবাতালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্লথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতো এবং মাথায় পাতলা-কাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি দড়ির খাটে বসিয়া আসর জমাইয়াছেন। সূর্যসুন্দরের বিষয়েই গল্প হইতেছে।

সুবাতালি বলিতেছিলেন "আমাদের ডাক্তারবাবু মানুষ নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরনের চিড়িয়া যে ওঁর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশমশাইকে মনে আছে রমেশ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খুব আছে। কেশমশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে।"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে সুবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাইকে চাকরি দিয়া সুবাতালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর খাতিরে। কিন্তু সে কি চাকরি করত? আফিংই খেত তিনবার করে—সকালে দুপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তারায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে। তবু ডাক্তারবাবুর খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মন্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। ঘুমের ব্যাঘাত হতো।"

একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

"না, না হাসির কথা নয়। কেউ খাদ্য-রসিক থাকে, কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুম-রসিক।"

চোখ বড় বড় করিয়া সুবাতালী বলিলেন, "লোকটা গুণী ছিল কিন্তু। আমার আসগরের বিয়ের সময় নেচে গেয়ে বাজিয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্যেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আর একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল—এর প্রথম ভিৎ পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। দুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হলো লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই—"

সুবাতালী ভ্রূকুঞ্চিত করিরা বলিলেন, "তারাপদ পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন।"

"সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর হাতখরচের মতো দু'চার টাকা যাতে হয়ে যায় তার জন্যেই ওই পাঠশালাটা বসিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু এক ইনেস্-পেক্টার সাহেবকে ধরে। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসাররা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উঠতেন, ডাক-বাংলা তো ছিল না। একবার এক ইনেস্পেক্টার অতিথি হয়েছিলেন

ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমি পাঠশালাটা দেখি একবার। তারপর আপনারা দরখাস্ত দিলেই হয়ে যাবে। ইনেস্‌পেক্‌টার নাম-মাত্র দেখলেন গিয়ে, পাঠশালাটার সামনে মিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তারবাবু গ্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশমশাই প্রথমে এতে রাজি হন নি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, 'আপনি ভুল করলেন ডাক্তারবাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে যচ্ছিল। এখন এই ইনেস্‌পেক্‌টার টিনেস্‌পেক্‌টার এসে রোজই একটা একটা বখেড়া বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ওরা বাঘ।' ডাক্তারবাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে যান না। কি করবে আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। যদি করে তখন দেখা যাবে। ভাল করে কাজ করলে এইটেই পরে আপার প্রাইমারি স্কুল হ'য়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তখন।' কেশমশাই কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন।"

সুবাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঢ়ি ছিল লোকটা।"

কোঢ়ি মানে কুঁড়ে।

"তারপর কি হলো ?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হলো মজার কাণ্ড একটি! সেই ইনেস্‌-পেক্‌টারটি বদলি হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নূতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আসেন নি কখনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন তুমুল বর্ষা। ট্রেন থেকে নেমেই বুঝতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না, আর তখন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্‌পেক্‌টার কি করবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব হলে স্কুলের পণ্ডিতকে খবর দিতে, তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিঙের নেশায় মশগুল হ'য়ে স্কুল ঘরেই বসে আছেন। তিনি বেরুতে পারেন নি। খানিকক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিজ্ঞেস করতে করতে হাজির হলো এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলে—"কে —"

"আমি ইনেস্‌পেক্‌টারের চাপরাশি—"

"এখানে কি চাই ?"

"আপনি কি পণ্ডিতজী ?"

"হ্যাঁ, কেন ?"

"ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন।"

"তা আমি কি করব ?"

"তিনি আপনার স্কুল দেখতে এসেছেন।"

"কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো।"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করে নি। অবাক হ'য়ে চলে গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত্রে থাকেন কোথা। ডাকবাংলা

নেই, স্টেশনে ওয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু ছিলেন তখন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চলে যান, সেখানে খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব ছপ ছপ করে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মর্জালশ বসত। অন্য রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি সুদ্ধ গান গাইতাম তখন। তবলা বাজাত কানা কার্তিক। তবলা বাজাতে বাজাতে তার কানা চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্‌পেক্‌টার আসতেই ডাক্তারবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব গানের মর্জালশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পেঁছিন নি। তিনি না আসাতে মর্জালশটা জমেও যেন জমছিল না। তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেয়ালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমৎকার। ওঁর এই সব গুণের জন্যই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দল ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি ফিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে—"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হয়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘে।

বললেন, "আগে বড়ো না ভাই। পহলে গপ খতম্‌ করো—"

"হ্যাঁ। তারপর গান-বাজনা যখন জমে উঠেছে, তখন কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, 'বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্‌পেক্‌টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি' বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। অচেনা জায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন।' ইনেস্‌পেক্‌টার মৃদু মৃদু হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে করজোড়ে বললেন, 'ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে কক্‌খনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা আপনাকে বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজুরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে।' এমনভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন কথাগুলো যে সবাই হেসে উঠল।

ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিচ্ছু মনে করি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বসুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাবু তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন, "ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন।" একটু পরেই কেশমশাই নেচে গেয়ে আর বেয়ালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্‌পেক্‌টার তার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—"

সুবাতালী বললেন, "বেশক্। আব্ উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিসপিট্টরও হোবে না।"

নবাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম, সীয়া রাম,—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাখিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, প্রশ্ন করিয়াছিল, "কোথায় রেখে দেব।"

"পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে' ফেলি—"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। খুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্যেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারদিকে—"

কুমার অবশেষে টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তখন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীয়া রাম, সীয়া রাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন। চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড পাকানো গোঁফ এবং জুলফি, দুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চক্ষু দুইটি টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে স্থানীয় গোলদার মহাজন ওঝাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওঝাজির চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাণ্ড টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা গলায় পৈতা, বুক ও পিঠ-ভরা লোম, আজানুলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাগত চেঁচামেচি করতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চিৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কনট্র্যাক্টারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওঝাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্য। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বৌয়ের সাধ-উপলক্ষে বধূকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওঝাজিকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওঝাজির মুনিমজি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওঝাজির রেলের পাস আছে, ওঝাজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওঝাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন। টি-আই আসিলে মুনিমজিকে এখানেই থাকিতে হইবে।

তখন তিনি অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে সুবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন"

নিখিলবাবুও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোট-খাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি। এখানেও কার্যত তিনিই জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতাবাসী। সবাই নিখিলবাবুকে খাতির করেন। সুবাতালী বয়োবৃদ্ধ বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। সুবাতালীও স্নেহ করেন তাঁহাকে। নিখিল-বাবুর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোনও ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্যন্ত সাজবে মহাদেব বারুই। দুনিয়ালাল মাংস রান্না করবে কুঠিতে। এ বাড়িতে মাংস এলে চন্দ্রবাবু খুঁত খুঁত করবেন। মুষণকে বলে দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাবু একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পড়িলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সমঝা। অংরেজি পঢ়তে পারি না।"

নিখিলবাবু মৃদু হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন।

বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার নেই। আপনার বাথানে ক'টার সময় দুধ দোয়া হবে বলুন।"

"ভোর তিন্ বাজে। দু'মণ দুধ এখানে আসবে আমি বলে দিয়েছি।"

"আমি রামটহলকে দুধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিষ্কার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে দেবেন তারা যেন দুধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয়, কারণ ওদের কেঁড়েতে দুইলে এমন ধোঁয়াগন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাতালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে। আমার উপর আর কোনও ফরমায়েস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীয়ারাম সীয়ারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাৎ সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিজের গোঁফে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই? নিখিলবাবু তাঁহার দৃষ্টির ভাবার্থ বুঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না বল—"

"হুকুম করুন।"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে, মশলাগুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। গোটা দশেক জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, তোমার পক্ষে দশটা লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্‌না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সন্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিও।"

"হাঁ হাঁ—ই কোন্ বড়ি বাত্ হ্যায়।"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল।"

নিখিলবাবু তারপর ওঝাজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওঝাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। ঝাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো, জল-তোলা—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আপনার কাছে কটা আছে—"

"দশঠো—"

"আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই ভারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জোড় করিয়া ওঝাজি বলিলেন, "লেঙ্গে—"

"আর রমেশ—"

নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—"

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আর নিরামিষ তিনটে ব্যাচ্ তিন জায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামিষ তারা একঘরে, যার মাছ আর নিরামিষ তারা একঘরে, আর যারা সব খাবে তারা এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা চোয়ারীতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ ছোকরা চাই—"

"'ছ' ব্যাচ্ চাই। তিন ব্যাচ্ পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে।"

রমেশবাবু একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা-সোটা, মুখখানিও গোলগাল। নিখিলবাবুর কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবে না?"

"পারব না বললে চলবে কেন, পারতেই হবে। আমি ভাবছি ছোঁড়াগুলোর কথা, জানেনই তো, আজকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পুবে যাবে, কিন্তু উত্তর দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি সুদো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—"

"আজ্ঞে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির আঁটিতে টক। সেদিন জ্ঞানচাঁদের ছেলে রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিড়িটি ফেলে দিলে অবশ্য, এ খাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাড়ি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপ্‌ন এয়ারে শরীর ভালো থাকে। তখন আমাকে বলতে হলো, ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুসিংয়ের নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই তো, তার নাক দিয়ে পাম্প্‌ ক'রে ঠাণ্ডা ঢোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কথাটা আমার—"

একটু থামিয়া চোখ বড় বড় করিয়া তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ডেঁপো—"

গোবিন্দ মণ্ডল বলিয়া উঠিলেন—"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম—"

নিখিলবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমাদেরই বংশধর তো সব।"

সুবাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা জোয়ানি ইয়াদ করো ভাই।"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্যসুন্দরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুর বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাবুর খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবুকে বাচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবুর ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের সৃষ্টি করিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "অনেক ভালো আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীরবাবার কৃপায়।"

সুবাতালী তহশিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই।"

"খুব মনে আছে। ব্যবস্থাও করেছি। এতো আমাদেরই নাতবোয়ের সাধ। এ কথা আর মনে থাকবে না? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উষার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাদুর চান খাওয়া সব হ'য়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে আসি আগে। এক সঙ্গে গিয়ে ভীড় করা ঠিক হবে না।"

"তাই যান।"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় আটচালাটিতে আড্ডা জমাইয়াছিল গ্রামের যুবকবৃন্দ। রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল তো ছিলই, তাছাড়া ছিল ওঝাজির তিন ছেলে শিউনাথ, দেবনাথ এবং জিলন। আর ছিল স্বর্গীয় ধাড়ী হালুয়াই-এর দুই পুত্র ঘোটন ও লোটন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ গল্প শুনিতেছিল।

কৃষ্ণকান্ত জমাইয়া শিকারের গল্প শুরু করিয়াছিলেন।

"বাঘ শিকারের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মাচায় বসে শিকার করা। যে জঙ্গলে বাঘের খবর পাওয়া যায় সেই জঙ্গলে প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কোন দিকে বাঘটার থাকা সম্ভব, কোন রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কোথায় ঘুমোয়, কোথায় জল খায়। এসব জানবার পর তার যাতায়াতের রাস্তায় একটা মোষ বেঁধে রাখা হয়। মোষটিকে যদি বাঘে মারে তাহলে সেই মরা মোষটার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটু উঁচু মাচা বেঁধে তার উপর বসে থাকতে হয়। বাঘের স্বভাব হচ্ছে—গরু বা মোষ মেরে তখখুনি তার সবটা খেয়ে ফেলে না, রক্তটা খেয়ে তারপর আধ-খাওয়া করে সেটাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যায়। তার পরদিন এসে বাকিটা খায়। সেই সময়ই তাকে মারতে হয়। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি তাতে মাচার ব্যাপার নেই। আমি একটা প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠে বসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল অ্যালফ্রেড। এ লোকটিকেও অ্যালফ্রেড দি গ্রেট বললে অন্যায় হয় না, যদিও সে সায়েব নয়। কুচকুচে কালো সাঁওতাল ক্রিশ্চান। আমার বেয়ারার পদে বাহাল ছিল সে, কিন্তু আসলে ছিল আমার শিকারের বন্ধু। চেহারাটা অনেকটা বাঁদরের মতো। বেঁটে, রোগা, তরতর করে গাছে উঠতে পারত, গাছের ডাল ধরে ঝুলে সড়াক করে অন্য গাছে চলে যেতে পারত। হাসলে চোখ-মুখের চামড়া কুঁচকে যেত, বুজে যেত চোখ দুটো, বেরিয়ে পড়ত হলদে দাঁতের সারি! চোখের রং কটা ছিল। তাকে দেখে সাঁওতাল মনেই হতো না! শুনেছিলাম তার বাপ না কি সায়েব ছিল। এই অ্যালফ্রেড ছিল জঙ্গলের একটি সেরা গোয়েন্দা। জঙ্গলের কোথায় কি হচ্ছে সব তার নখদর্পণে। কোথায় শম্বর আছে, কোন পাহাড় থেকে দুর্ধর্ষ বুনোশুয়াররা নাবে, কোথায় ভালুকের আস্তানা, ময়ালসাপ কবে কোথায় হরিণ ধরেছিল—সব খবর তার জানা! সে-ই আমাকে একদিন খবর দিলে যে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে নদীটা চলে গেছে তারই একটা বাঁকে একটা বাঘ প্রায়ই জল খেতে আসে সন্ধ্যা বেলা। বাঁকটার ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড একটা গাছও আছে, তাতে চড়ে যদি বসে থাকি, তাহলে বাঘটাকে অনায়াসে মারা যায়। অ্যালফ্রেড বললে, কাছাকাছি দ্বিতীয় আর একটা গাছও আছে সেটাতে সে থাকবে। লোভ হলো। একদিন গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। আমার বাংলো থেকে বেশ দূরে। মোটরে করে মাইল দশেক যেতে হবে, তারপর আর মোটর চলবে না। হাঁটতে হবে জঙ্গলের ভিতর। তা-ও প্রায় মাইল দুই। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে খুব ভালো লাগে। সরু সরু পথ আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কাঠুরেরা রোজ যায় সেই সব পথ দিয়ে সকাল বেলা। সমস্ত দিন বনে বনে কাঠ কাটে, সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসে আবার। চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব, মাঝে মাঝে রোদের আভাস, কোথাও আলো ছায়ার অদ্ভুত আলপনা, কাঠঠোকরার ডাক, বনমুরগীর ডাক,

তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে ; দু'পাশে মাথা উ'চু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণত আমাদের মনে যে রকম নরম-নরম রোগা পাতলা মেয়েলি ধারণা হয় এসব সেরকম লতা নয়। বেশ বলিষ্ঠ লতা সব, কাছির মতো শক্ত—"

"হাঁথীও বানহা যায়—?"

প্রিয়গোপাল সরল লোক। সে বিস্ফারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকান্তের অরণ্য বর্ণনা শুনিতেছিল। অনেক প্রশ্নই মনে জাগিতেছিল তাহার, কারণ শুধু সে সরল নয়, কৌতূহলীও। কিন্তু কাছির মতো লতার কথা শুনিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আধা-বাংলা আধা-হিন্দিতে উক্ত প্রশ্নটি করিয়া বসিল।

"হাতী বাঁধা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখিনি আমি। তবে খুব সম্ভবত যায়—"

রামপ্রসাদ একটু ফক্কোড় প্রকৃতির। সে হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়গোপালকে বলিল—"তাহলে তুই এক কাজ কর না। তোর ভুসির ব্যবসা ছেড়ে এই লতার ব্যবসা আরম্ভ করে দে। জামাইবাবুকে ধরলেই উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। অমন মজবুত লতা যখন, খুব বিক্রি হবে।"

প্রিয়গোপাল চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে।

"দেখো রামপ্রসাদ, ফাজলামি করিও না।"

স্থূলকায় শিউনাথ গল্পে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হইল।

"আরে ভাই কচ্-কচ্ নেহি করো। জামাইবাবু আপনি বলুন তারপর কি হলো।"

"তারপর একদিন গিয়ে সেই গাছে চড়লাম।"

"কখন গেলেন ? রাত্রে ?"

"না, সূর্যাস্তের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে গিয়েছিলাম। তার আগেরদিন ছোটখাটো একটা মাচাও বাঁধিয়ে রেখেছিলাম গাছের উপর।"

"কি দিয়ে বানালেন ?"—ঘোটন প্রশ্ন করিল।

ঘোটন হালুয়াই (ময়রা) এখন আর জাত-ব্যবসা করে না। সে এখন কণ্ট্রাক্টারি করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সে কৌতূহলী।

"খড় বাঁশ আর গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে। পাতা-সুদ্ধ ডাল কেটে আড়ালও তৈরি করতে হয়, যাতে বাঘ বুঝতে না পারে যে গাছের উপর কেউ বসে আছে, বা গাছের উপর মাচা বাঁধা হয়েছে।"

"ওতে কি মাচান বেশ মজবুত হয় - ?"

ঘোটন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ভ্রাতা লোটনের দিকে চাহিল। সে যে বোকা নয়, বুদ্ধিমান—তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোটনের নিকট জাহির করিবার কোনও সুযোগ সে ত্যাগ করে না। লোটনের ধারণা ঘোটন জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু উজবুক। কনিষ্ঠের এ ধারণা অপনোদন করিবার জন্য সে সর্বদা ব্যগ্র। দুই ভাই অনেকদিন পূর্বেই পৃথক হইয়া গিয়াছে।। কণ্ট্রাক্টারি করিতে গিয়া ঘোটন প্রায় সর্বস্বান্ত, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে লোটনের কাছে হাত পাতিতে হয়, লোটনও যতটা পারে জ্যেষ্ঠকে সাহায্যই করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে তাহার ধারণা উচ্চ নহে।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দিলেন, "যতটুকু হয় কাজ চলে যায় তাতে। একজন বা বড় জোর

দু'জন এক রাত্তির বা দু' রাত্তির কাটাতে পারলেই হলো। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া তো কাজ নেই। বেশী মজবুত করতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছিলাম একবার—"

"কি রকম—"

ঘোটনই প্রশ্ন করিল আবার।

রামপ্রসাদ অর্ধস্বগতোক্তি করিল—'লোটন এবার আর টাকা দিচ্ছে না।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একবার একটা গাছের উপর ছোট একটা চৌকি তুলিয়ে তার পায়াগুলো বেশ মজবুত করে বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম গাছের ডাল-পালার সঙ্গে। খুব মজবুত হয়েছিল। অনেকগুলো 'বাগ' মেরেছিলাম। প্রায় শতখানেক হবে।"

"বলেন কি ?"

"হ্যাঁ যে, অসংখ্য ছারপোকা ছিল চৌকিটাতে—"

জিলন এবং দেওনাথ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজি পড়িতেছে, 'বাগ' মানে যে ছারপোকা তাহা তাহারা জানে। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা ব্যাপারটার রস ঠিক উপভোগ করিতে পারিল না। জিলন জিজ্ঞাসা করিল—"আসল বাঘ শিকারের কি হলো ?"

"হলো না। বাঘ এল, সামনে দিয়ে হেলে দুলে চলে গেল। আমি রাইফেল তোলবার পর্যন্ত সময় পেলাম না। চৌকির বাগ সামলাতে আমি ব্যস্ত তখন। তারপর থেকে গাছের ডাল দিয়েই মাচা বানাই—"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

বলিল, "তারপর কি হলো বলুন। বিকেলে গিয়ে সেই মাচানে চড়লেন ?"

"আপনি গাছেও চড়তে পারেন বুঝি ?"

"পারি। কিন্তু ওটাতে চড়েছিলাম মই দিয়ে। অনেক উঁচুতে মাচা বাঁধতে হয় কিনা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচুতে—"

"অত উঁচুতে কেন ?"

"তা না হলে বাঘে ধরবার সম্ভাবনা থাকে। বাঘ উনিশ কুড়ি ফুট অনায়াসে উঠে পড়তে পারে—"

প্রিয়গোপাল বিস্মিত হইল এ কথায়।

"গাছে চড়ে যায় বিল্লিরই মতো !"

"হ্যাঁ, বিল্লিরই জাত তো।"

এইবার প্রিয়গোপাল অদ্ভুত প্রশ্ন করিল একটা।

"আচ্ছা, বাঘ বিল্লির মতো মুসা ভি খায় ?"

মুসা মানে ইঁদুর।

"বাঘ না খায় এমন জিনিস নেই। গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ, শম্বর, নীলগাই, শেয়াল কুকুর এমন কি বাঘ পর্যন্ত। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু বাঘের মাংস বাঘে খায়।"

"তা হলে মুসা ভি খায় জরুর—"

"এক-একবারে হাজার খানেক মুসা না খেলে তো ওর পেটই ভরবে না। মেহনতে পোষাবে না—"

"পেলে খায় জরুর।"

শিউনাথ ধমকাইয়া উঠিল।

"আরে ভাই বেকার কচকচ নেহি করো। বলুন আপনি গল্প বলুন—"

রামপ্রসাদ যোগেনের কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"মুসাতে ওর বোরা বোরা ভুসি কেটে সাফ করে দিচ্ছে। তাই বাচ্চুর মুসার উপর রাগ। তিনটে বিল্লি পুষেছে—"

উচ্চকণ্ঠে সে কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "জামাইবাবু আপনি এবার গিয়ে ওকে একটা বাঘের বাচ্চা পাঠিয়ে দিন। তা না হ'লে ওর ভুসির ব্যবসা তো গেল—"

"ফাজলামি করিও না রামপ্রসাদ বলে দিচ্ছি।"

"তোমরা গল্প শুনবে, না, ঝগড়া করবে"—আবার ধমকাইয়া উঠিল শিউনাথ। কৃষ্ণকান্ত ইতিমধ্যে একটি দিয়াশলাই কাঠি কানে ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিয়া কান চুলকাইতে ছিলেন। সকলে থামিয়া গেলে আবার শুরু করিলেন।

"তিনটে নাগাদ মাচার উপর গিয়ে উঠে বসলাম। বনের ভিতর তিনটের সময়ই মনে হয় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অ্যালফ্রেড উঠল আর একটা গাছে, সেটার উপরও মাচা বানানো হয়েছিল। তার কাছেও একটা রাইফেল ছিল।"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় কর্ণ-বিবরে কাঠি ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিলেন।

"তারপর?"

"তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। বাঘ-শিকারে এই বসে থাকাটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শুধু বসে থাকা নয় একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকা। অনড়, অচল হয়ে বসে থাকতে হবে। সিগারেট খাওয়া চলবে না, নস্যি নেওয়া চলবে না—"

"কেন—"

শিউনাথ প্রশ্ন করিল এবার। সে একটি পাকা সিগারেট-খোর। তখনও তাহার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট ছিল একটি। সিগারেট-হীন হইয়া এক নিদ্রা দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু করা সম্ভব তাহা তাহার চিন্তার অতীত।

"সিগারেটের গন্ধ পেলে বাঘ সরে পড়ে। তার সন্দেহ হয়। যে কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে সে। বড় বড় শিকারীরা আতর এসেন্স মেখেও শিকারে যেতে বারণ করেছেন। বাঘের ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুই-ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টিও। তাই, রঙচঙে ডগমগে জামা-কাপড় পরেও শিকারে যাওয়া মানা। খাঁকি কিম্বা পাঁশুটে রঙের পোষাক ছাড়া অন্য কিছু চলে না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাওয়া চাই। ঢিলে-ঢালা কাপড় পাঞ্জাবিও চলবে না, হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরতে হবে। বাঘ যদি গাছের দিকে তাকায় এবং শিকারীকে যদি দেখতে পায়—তা হলেও সে যেন ভাবে ওটা গাছেরই একটা অংশ। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।"

যোগেন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবার বলিল।

"এ তো তা হলে একটা তপস্যা বলুন।"

"নিশ্চয়, তপস্যা বই কি। একটু শুধু তফাত আছে, তপস্বী চায় ভগবান, শিকারী চায় বাঘ।"

এ রসিকতায় অনেকেই হাসিয়া উঠিল, হাসিল না প্রিয়গোপাল। তাহার কেমন যেন খটকা লাগিল। কোনও যুক্তির বা উক্তির খুঁত থাকিলে তাহার মন হোঁচট খায়। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "খালি বাঘ চায়? ভালুক, শুয়োর, ই সব?"

"হ্যাঁ, ইসবও চায়। আমারই ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল, শিকার চায়। তবে যে শিকারী বাঘের আশায় বসে আছে সে ভালুক বা শুয়োর দেখে ফায়ার করবে না। করলে বাঘ ভড়কে যাবে।"

"তারপর কি হলো বলুন—"

"গাছে মাচার উপর ঠায় বসে রইলুম ঘণ্টা দুই। তারপর হঠাৎ ময়ূরের ডাক শোনা গেল। বুঝলাম বাঘ বেরিয়েছে এবার—"

"বাঘ বেরুলে ময়ূর ডাকে নাকি।"

"হ্যাঁ, আর ডাকে এক রকম হরিণ, ইংরাজিতে তার নাম 'বার্কিং ডিয়ার', ওদেশে বলে কোটরা হরিণ। এদের ডাক শুনলে শিকারীরা বুঝতে পারে বাঘ বেরিয়েছে। অনেক সময় শম্বরের ডাকও শোনা যায়—"

"শম্বর কি ?"—প্রিয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল।

"এক জাতের বড় হরিণ।"

"ভঁইসের মতো ? না, তার চেয়েও বড়ো—"

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল শিউনাথ।

"কি পাগলের মতো যা তা জিজ্ঞেস করছ। আপনি গল্প বলুন জামাইবাবু। ওর কথায় কান দেবেন না।"

প্রিয়গোপাল রুখিয়া উঠিল।

"আমার যা জানবার তা জেনে লিব না ? তুমি আমাকে মানা করবার কে আছ। জামাইবাবুকে আর ক'দিন পাব। যা শিখবার শিখে লি—"

কলহের উপক্রম হইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "শম্বর বেশ বড় হরিণ। একটা গরুর মতো প্রায়। খুব প্রকাণ্ড শিং থাকে ওদের মাথায়। ডাল-পালা-ওলা চমৎকার শিং—"

রামপ্রসাদ ফোড়ন দিল—"তুই ভঁইস্ বেচে দিয়ে একটা শম্বর কেন গোপলা। জামাইবাবু, শম্বর কিনতে পাওয়া যায় কি—"

প্রিয়গোপাল রামপ্রসাদের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

"বলুন, আপনি তারপর কি হলো। এদের কথার জবাব দিতে গেলে আর গল্প বলা হবে না আপনার।"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

"একটু পরেই বাঘ দেখা গেল। অ্যাল্‌ফ্রেড্ ঠিক খবরই দিয়েছিল। নদীর বাঁকে এসে জল খাচ্ছে। করলাম ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বাঘটা, গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারলাম না, কারণ লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি মারবার আর ফুরসৎ পাওয়া গেল না।"

"গুলি নিশ্চয় লাগলে পড়ে যেত না কি।"

"গুলি যদি মাথায় লেগে ব্রেনে ঢোকে, কিংবা বুকে লেগে হার্টে ঢোকে—তাহলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। অন্য জায়গায় লাগলে পড়ে না। তখন একটা গুলিকে ওরা গ্রাহ্যও করে না। পায়ে কিংবা ঘাড়ে গুলি খেয়ে অনেক দূরে চলে যেতে পারে। আর সেই চোট্ খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে তখন—"

"কি করলেন আপনি—"

"দু'এক মিনিট চুপ করে বসে থেকে আর একটা ফায়ার করলাম যে বনে সে লাফিয়ে ঢুকেছিল সেই বনটাকে লক্ষ্য করে। অ্যালফ্রেডও তাই করলে।"

"কেন—"

"যদি বাইচান্স লেগে যায় আরও ঘায়েল হবে, কিম্বা তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চার্জ করবে, কিম্বা আরও দূরে যাবে—"

এইবার গল্পটা জমিয়াছিল।

উৎসুক শিউনাথ এমন মুখভাব করিয়া শুনিতেছিল যেন সে-ই এই দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।

"কি হলো দ্বিতীয়বার ফায়ারের পর।"

"সরেই পড়ল। আর দেখতে পেলাম না। তখন একটা 'সিটি' মেরে অ্যালফ্রেডকে ডাকলাম। সে-ও সিটি মেরে সাড়া দিলে—"

"সিটি ?"

"হ্যাঁ, মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে সিটি দেওয়া যায়। বনে জঙ্গলে মনে হয় কোনও পাখী বুঝি ডেকে উঠল। শিকারীরা সিটি দিয়ে পরস্পরের খবর নেয়। সিটি শুনে অ্যালফ্রেড্ নেবে এল, আমিও নাবলুম।"

"তারপর ?"

"তারপর বন্দুক রি-লোড করে রওনা দিলুম বাড়ির দিকে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার। একটা বাঘের উপর গুলি চলে গেছে কিন্তু সে মারা পড়েনি। এ অবস্থায় বনের ভিতর দিয়ে হাঁটা খুবই দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু প্রাণ হাতে করেও অনেক সময় এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়। অনেকে এই করতে গিয়ে মারাও পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা সেবার বেঁচে গেলাম। বরং জঙ্গল থেকে বেরিয়েই চিতল পেয়ে গেলাম একটা—"

"চিতল মাছ ?"

"না, চিতল হরিণ। রাত্রে গিয়ে মাংসের ঝোল আর ভাত খাওয়া গেল।"

"হরিণের নামও চিতল হয় না কি।"

"হ্যাঁ। গায়ে চিতা চিতা দাগ থাকে বলে ওদের নাম চিতল।"

"বাঘটাকে ছেড়ে দিলেন ?"

"পাগল ! ও বাঘকে কখনও ছেড়ে দেওয়া যায়। পরদিনই তার খোঁজ করবার জন্য লোক লাগালাম। বিকেলে অ্যাল্‌ফ্রেডের এক অনুচর এসে খবর দিলে যে সে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে, শুধু দেখতে পায়নি, রক্তের দাগ ধরে ধরে সে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছে। তার ধারণা নদীর ওপারে যে দুটো পাহাড় পাশাপাশি আছে বাঘটা সেই পাহাড় দুটোর মাঝখানের সংকীর্ণ গলির মতো জায়গায় ঢুকে বসে আছে। সে দুর্গম স্থান। দু' পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটুকু কাঁটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাছাড়া তার ভিতর দিয়ে একটা ঝরনার ধারাও বেরিয়ে আসছে। সেখানে ঢুকে বাঘ শিকার অসম্ভব।"

"কি করলেন তাহলে—"

"অবস্থা অন্য রকম হলে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু যে বাঘ গুলি খেয়েছে তাকে ছেড়ে

দেওয়া যায় না। তাকে মারতেই হবে এই শিকার-শাস্ত্রের আইন। ছেড়ে দিলে ওই জখম বাঘরাই শেষে মানুষ-খেকো বাঘ হবে। সুতরাং সেইখানে লোক মোতায়েন করে রাখা হলো বাঘটা বেরোয় কি না, দেখবার জন্য। কাছাকাছি সুবিধে মতো জায়গা বেছে মাচাও বাঁধা হলো একটা, আর একটা ছাগল বেঁধে রাখা হলো সেই মাচার কাছাকাছি। তার দিনরাত সেখানে বসে পাহারা দিতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন এল না, দ্বিতীয় দিনও এল না। তবু দোনো-মোনো করে তৃতীয় দিনও বসলাম গিয়ে মাচায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন পাত্তা নেই। ছাগলটা সমানে ডেকে চলেছে। মশার কামড় অগ্রাহ্য করে ঠায় বসে আছি। পাশে অ্যালফ্রেড। হঠাৎ ছাগলের ডাকটা পট করে থেমে গেল বাঘের গোঙরানি আওয়াজও পেলাম। অ্যালফ্রেড সঙ্গে সঙ্গেই spot light ফেলতেই দেখতে পেলাম বাঘটা ছাগলটাকে ধরেছে। ছাগলটা ছটফট করছে আর বাঘটা সেখানেই বসে তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটা, এবার কিন্তু আর পালাতে পারল না, পড়ে গেল সেখানেই। আর একটা ফায়ার করলাম। ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হলো তার—"

"প্রথম গুলিটা লাগেই নি ?"

"লেগেছিল, ভাল করে লাগে নি। ঘাড়ে লেগেছিল, কিন্তু বেঁধে নি! দ্বিতীয় গুলিটা মাথায় লেগেছিল, তৃতীয়টা পেটে।"

বাঘের গল্প আরও কিছুদূর হয়তো চলিত, কিন্তু পোস্টমাস্টারবাবু আসিয়া একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, ডাকের চিঠি-পত্র তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন। চিঠিগুলি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া সহসা তিনি করজোড়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, 'জামাইবাবু, আমি গরীব। আমাকে রক্ষা করুন—'

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন।

"কি ব্যাপার, কে আপনি ?"

"আমি এখানকার পোস্টমাস্টার। নতুন এসেছি বদলি হ'য়ে। এখানকার হাল-চাল কিছুই জানি না। বড়ই বিপদে পড়ে গেছি জামাইবাবু—"

"কেন, কি হলো।"

"একদিন রাত্রে একটা জরুরি তার এল কুমারবাবুর নামে। রাত্রে তার এলে এখানে রাত্রে সেটা ডেলিভারি হয় না, কারণ কোনও পিওন রাত্রে থাকে না। 'তার'টা সকাল বেলা পাঠিয়ে দিলাম। রাধানাথবাবু বলছেন—অত জরুরি তার আমার নিজেরই এসে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পোস্টমাস্টার নিজে বাড়িতে গিয়ে 'তার' দিয়ে আসবে এ রকম কানুন তা কোথাও নেই—"

শিউনাথ মন্তব্য করিল—"এখানকার কানুন আলাদা, আপনার দিয়ে আসাই উচিত ছিল। আপনার আগে ছিলেন নিয়ামৎআলী, জরুরি তার রাত্রে এলে নিজেই দিয়ে যেতেন বাড়িতে। দুঃসংবাদ থাকলে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা সে খবর

জেনে তবে দিতেন। ডাক্তারবাবুর বাড়ির 'তার', আপনার দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বই কি।"

"আমি নতুন লোক, কিছুই জানতাম না।"

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হয়েছে কি। আর আমাকেই বা এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন, আমি কি করতে পারি।"

"আপনি রাধানাথবাবুকে বলুন একটু, তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন। আপনি জামাই মানুষ, আপনার অনুরোধ উনি রাখবেন।"

"রাধানাথবাবুর রিপোর্ট কি খুব মারাত্মক হবে?"

"হবে। তিনি আমার নামে লিখেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, তিনি ওঁর জামাই। আর পোস্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার নামে লম্বা এক ডি. ও. এসেছে জবাবদিহি চেয়ে—আমি কেন পাবলিকের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করছি। তাতে আরও লেখা আছে—এন্‌কোয়ারি করবার জন্যে একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টার আসবেন, আমি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকি। দোষ সাব্যস্ত হ'লে শাস্তি হবে। মানে, রাধানাথবাবু যা বলবেন তাই হবে। আমি বীরুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই টেলিগ্রামটা করেছিলেন, তিনি খুব চটে আছেন দেখলাম। বললেন, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত। কুমারবাবু বললেন, আমি ওসবের মধ্যে থাকতেই চাই না। আমি রাধানাথবাবুকে কিছু বলতে গেলে তিনি আমাকেই ধমকে দেবেন। আপনি যদি কাকাবাবুকে দিয়ে বলাতে পারেন কাজ হবে, উনি কাকাবাবুর ছাত্র। চন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তিনি ভদ্র ব্যবহার করলেন খুব। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমি ব্রাহ্মণ শুনে আমার পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, অতিবৃদ্ধ-পিতামহের নাম এই সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরদার বাবা কিংবা ঠাকুরদার নাম আমি জানতাম না। এইতেই খুব চটে গেলেন তিনি মনে হলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—গায়ত্রী জানি কিনা। গায়ত্রী সেই বিশ বছর আগে শিখেছিলাম, তা কি আর মনে আছে? বললাম সে কথা। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন না রোজ? সত্যি কথাই বলতে হলো, করি না। এ শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার দিকে, তারপর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, সুবিধা হবে না। যোগেনবাবু তখন বলেন, আপনি জামাইবাবুদের মধ্যে কাউকে যদি অনুরোধ করেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। জামাইদের খাতির হয়তো উনি রাখবেন। আপনি যদি একটু দয়া করেন গরীবের উপকার হয়—"

কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

"আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো নেই ভদ্রলোকের, তবে আপনি যখন এত করে বলছেন তখন অনুরোধ করে দেখব। ওই যিনি মুখের সামনে মাঝে মাঝে হাত চাপা দেন, তিনিই তো রাধানাথবাবু—"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, তিনিই—"

"আচ্ছা, আমি বলব।"

পোস্টমাস্টারবাবু চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"লোকটা একের নম্বর হারামি। ঠিক করেছেন রাধানাথবাবু—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিছু তো দোষ করে নি বেচারা। আইনত ওর কোন দোষ নেই।"

"সব সময় আইন চালাতে গেলে কি চলে জামাইবাবু। সেদিন আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল, মনি-অর্ডারটা নিলে না।"

রমেশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, "এই রমেশবাবুকে জিগ্যেস করুন না।"

রমেশবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের মুখের উপর নিবন্ধ করিলেন।

"এই এখানকার পোস্টমাস্টারবাবুর কথা হচ্ছে।"

"এসেছিল বুঝি তোমার কাছে। তুমি রাধানাথকে বললে হয়তো বেঁচে যাবে বেচারা। তা না হলে ওর অদৃষ্টে দুঃখ আছে।"

"যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বেচারার তেমন দোষ নেই বিশেষ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিগ্রাম আর কোন পোস্টমাস্টার দিয়ে আসে বলুন—"

রমেশবাবু চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

রমেশবাবুর মুখখানা চাকার মতো গোল এবং তালের মতো নিভাঁজ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। বেশ ভারিক্কি গোছের চেহারা। যখন কাহারও সহিত কথা বলেন বাম হাতটি পিছন দিকে কোমর এবং পিঠের সন্ধিস্থলে স্থাপন করেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণকান্তের মন্তব্যটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর পুনরায় কৃষ্ণকান্তের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পৃষ্ঠস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একবার খুলিয়া আবার মুষ্টিবন্ধ করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত হইলে এরূপ করেন।

"দেখ বাবা, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। আমাদের এ গ্রামটি ছোট এবং সেকেলে। অনেক কিছুই নেই এখানে। ট্রাম, মোটর, ফোন, সিনেমা—এসব কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। এখনও আছে। এই গ্রামের ডাক্তার, মাস্টার, দারোগা, স্টেশন মাস্টার, পোস্টমাস্টার, কাছারির ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, মানে গ্রামের ছোট বড় সবাই আমরা একটি পরিবারের মতো বাস করি। এতকাল করে এসেছি, আর যতদিন আমরা থাকব ততদিন করব। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ নিতে হবে। এই এখানকার আইন—অন্য কোন আইন চলবে না এখানে। খোদ লাট সাহেবও যদি এখানে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও আমার দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানতে টানতে পাশার আড্ডায় বসতে হবে। এখনও এই ভাবটি বজায় আছে আমাদের। থাকবেও আমরা যতদিন আছি। ওই টেলিগ্রামটি রাত্রে না দিয়ে ওই পোস্টমাস্টার গ্রামসুদ্ধ লোককে চটিয়েছে। ওই বুড়ো ডাক্তারবাবু আমাদের গ্রামের মাথা। তাঁকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। শুধু আমরা কেন, এ অঞ্চলের সবাই করে। তাই তাঁর নাত-বোয়ের সাধ দেওয়া হবে বলে দশখানা গাঁয়ের মাতব্বরেরা মাথা ঘামাচ্ছে। ওঁর টেলিগ্রামটা আটকে রাখা উচিত হয় নি ছোকরার। ওঁর অপমানে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। কোনও গয়লা ওকে দুধ দেয় নি তা জান? কুমারই ওকে দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম ব্যাপার শুধু আজ নয়, বরাবরই চলে আসছে। ডাক্তারবাবুকে অপমান করে' কেউ রেহাই পায় নি কখনও। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শুনবে?"

"বলুন।"

"তখন আমি নেহাৎ ছেলে মানুষ, সবে এসে স্টেটের চাকরিতে বাহাল হয়েছি। ডাক্তারবাবুর তখন তুমুল প্র্যাকটিস্। তিনটে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা বাড়িতে। আর সে সব কি সাধারণ ঘোড়া? বড় বড় পাহাড়ী ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়া ওঁকে বইতেই পারত না। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে আর একটা ঘোড়ায় চড়তেন। সেটা ক্লান্ত হ'লে আর একটায়। এ অঞ্চলের সর্বত্র ডাক তখন ওঁর। মালদা থেকে পর্যন্ত কল আসত। হাতী আসত, নৌকো আসত, পাল্কি আসত, সে এক দিনই ছিল আলাদা। ডাক্তারবাবু প্রায় সমস্তদিন বাড়ির বাইরেই থাকতেন। ফিরতেন রাত্রি বেলা। ফিরেই থিয়েটারে রিহার্সালে আসতেন। ওঁর বাড়িতেই থিয়েটারের আখড়া ছিল তখন।"

"উনি থিয়েটার করতেন না কি।"

"করতেন মানে?"

রমেশবাবু সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন।

"উনি যদি ডাক্তারি না করে পেশাদার অভিনেতা হতেন তাহলে গিরিশ ঘোষ দানীবাবুর মতোনই হতে পারতেন। সীতার বনবাসে উনি রামের পার্ট যা করতেন তেমনটি আর কখনও দেখি নি। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে রোজ রিহার্সাল হতো। এ হাসপাতাল তখন ছিল না। তখন ছিল মাটির প্রকাণ্ড একটা চোয়ারি। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ঘর, চার-পাশে বড় বড় বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার কোণে কোণে ঘর। মাঝের বড় ঘরটায় রিহার্সাল হতো। রিহার্সাল দেবার জন্যে বাইরে থেকেও লোক আসত, কাটিহার থেকে সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায়ই আসত অনেক ছোকরা। বলাবাহুল্য, বিনা-টিকিটেই আসত সবাই। সবই তো চেনা-শোনা ছিল। এখানকার স্টেশনে এসে কেউ যদি বলত—'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাব'—কেউ আর টিকিট চাইত না। এই রেওয়াজ ছিল। হঠাৎ এক নূতন টিকিট কালেক্টার বদলি হ'য়ে এল। ছোকরা যেমন তিরিক্ষি মেজাজের, তেমনি দুর্মুখ। একদিন তার খপ্পরে পড়ে গেল কাটিহারের ভূষণ। আলিবাবার রিহার্সাল হচ্ছে তখন, ভূষণ আবদাল্লা সাজবে, সপ্তাহে দু'দিন রিহার্সাল দিতে আসে। যথারীতি সে উইদাউট্ টিকিটে এসেছে। নতুন টিকিট কালেক্টার টিকিট চাইতে সে যথারীতি বলেছে, ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব। নতুন টিকিট কালেক্টার কপালের উপর ভুরু তুলে ব'লে উঠল—'ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব মানে? ডাক্তারবাবু কি রেল-কোম্পানীর মালিক, না জামাই? ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বললেই ছেড়ে দিতে হবে!' ভূষণ রুখে উঠল এ কথায়। পকেট থেকে পেনালটি সুদ্ধ গাড়ি-ভাড়া বার করে বললে, 'ডাক্তারবাবু কে, তা দু'দিন পরে জানতে পারবেন। এই নিন্, ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন আমাকে।' রসিদটি পকেটে পুরে চলে এল ভূষণ। ডাক্তারবাবু সেদিন এক দূরের কলে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন—শক্ত রোগী, ফিরতে হয়তো দিন দুই দেরি হবে। তবু আমাদের রিহার্সাল বসল। ভূষণ আমাদের কারো কাছে কথাটি ভাঙলে না। চুপি চুপি ভাঙলে কেবল উদিৎ সিংয়ের কাছে। উদিৎ সিং নামে ডাক্তারবাবুর এক সিপাহী ছিল তখন। লিক্‌লিকে সরু চেহারা, কিন্তু খাপ-খোলা তরোয়াল একটি। সর্বদাই মারমুখী হ'য়ে থাকত। তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত সবাই। ডাক্তারবাবুর জমি বাগান ঘর দুয়ারের সেই ছিল রক্ষক। ডাক্তারবাবুকে ভক্তি করত দেবতার মতো। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল, যেই সে শুনলে যে টিকিটকালেকটার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা

বলেছে। তারপর দিন হাটবার ছিল। ডাক্তারখানার সামনেই হাট। তারপর দিন টিকিটকালেকটার এসেছে হাট করতে। আর যাবে কোথা, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর উদিৎ সিং, গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল তাকে হাসপাতালের সামনে। বললে, "ডাক্তারবাবুর নামে কাল কি বলেছ হারামজাদা, শুয়ার কি বাচ্ছা, এখন তোমার কোন বাপ তোমাকে বাঁচাবে—'। জুতিয়ে লোকটাকে শুইয়ে ফেললে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি কল থেকে। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া উদিৎ সিংকে রোখবার সামর্থ্য আর কারও ছিল না। উদিৎ সিং লোকটাকে জুতিয়ে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বললে, 'যাও শালা, আব্ ঘরমে যাকে হালুয়া খাও।' সে কিন্তু ঘরে গেল না, গেল থানায়। থানার দারোগা ছিলেন তখন হর্‌চন্দন সিং। ডাক্তারবাবুর পরম বন্ধু। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক তাঁর চাকরের নামে নালিশ করতে এসেছে দেখে একটু অবাক হলেন তিনি। তাঁর এক হাবিলদারকে ডেকে বললেন, তুমি একটু খোঁজ করে এসো তো, ব্যাপার কি। হাবিলদারের সঙ্গে উদিৎ সিংয়েরই দেখা হয়ে গেল। বন্ধুত্বও ছিল দু'জনের। তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে দারোগা হরচন্দন সিং উপরের ঠোঁটের উপর নীচের ঠোঁটটি চড়িয়ে দাড়ির ভিতর আঙুল চালালেন খানিকক্ষণ। চমৎকার চাপ-দাড়ি ছিল তাঁর। তারপর হাবিলদারকে আড়ালে ডেকে বললেন, "এই লোকটাকে আমি হাসপাতালে পাঠাব মেডিকেল রিপোর্টের জন্য। তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলে এস সে যেন এর জামায় খানিকটা অ্যালকোহল ঢেলে দেয়; আর আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায় যে লোকটা মত্ত অবস্থায় হাটে এসেছিল প্রথমে, তার পর হল্লা করতে করতে হাসপাতালে এল, তাই উদিৎ সিং ওকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই জন্যেই পড়ে গিয়ে নাকে লেগেছে ওর।" হাবিলদার ফিরে যাবার পর দারোগা সাহেব টিকিট-কালেকটারকে বললেন, "আপনি আগে হাসপাতালে যান, সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসুন, তারপর আপনার ডায়েরি লিখব।" হাসপাতালে ফিরে এল সে। হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার তখন হাবু মামা। ওই যে পাকা চাপ-দাড়ি, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই তখন ছিল কম্পাউণ্ডার। সে লোকটার ঘা ড্রেস করবার ছুতোয় তার জামায় কাপড়ে বেশ করে অ্যালকহল ঢেলে দিলে, আর দারোগা সাহেব যেমন লিখতে বলেছিল তেমনি লিখে দিলে। সেই রিপোর্টটি নিয়ে যেতেই দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন—একে অ্যারেস্ট করে 'ঠান্‌ডি' ঘরে রেখে দাও। আমি এন্‌কোয়ারি করে দেখি আগে কি হয়েছে। কম্পাউণ্ডারবাবু যা লিখেছেন তাতো ভয়ানক। 'ঠান্‌ডি' ঘর মানে ঠাণ্ডা ঘর, যে ঘরে ঢুকলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, অর্থাৎ গারদ। হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলে। কিছুক্ষণ পরেই কান্নাকাটি পড়ে গেল ছোকরার বাড়িতে। তার কচি বউ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো ডাক্তারবাবুর অন্দর-মহলে একেবারে বৌদির কাছে। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি। বৌদিও তখন ছেলেমানুষ। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে খেতে দিলেন। মেয়েটি বসে রইল। ডাক্তারবাবু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়েও গেল। তিনি ফিরে এসেই ছোকরাকে হরচন্দনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। উদিৎ সিং আর ভুষণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন আর একটা কাজও করলেন তিনি। ওই টিকিটকালেক্‌টার কোয়ার্টার পায় নি, তাকে একেবারে বাড়িতে নিয়ে এলেন। মানে,

একেবারে আপন করে নিলেন তাকে। সে এখন কোথায় আছে জানি না, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে আর খবর পায় যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গিন অসুখ তাহলে ঠিক ছুটে আসবে, যেখানেই থাকুক। এই হচ্ছে এখানকার দস্তুর। এই পোস্টমাস্টার টেলিগ্রাফটি আটকে রেখে বেদস্তুর কাজ করে ফেলেছে। তুমি যদি ওকে বাঁচতে পার বাঁচাও। কিন্তু রাধানাথ গোপ একটি জাঁতি-কল। ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তবে তুমি জামাই মানুষ, তোমার মান হয়তো রাখতে পারে। দেখ একবার বলে।"

রমেশবাবু এ প্রসঙ্গে হয়তো আরও বক্তৃতা দিতেন কিন্তু পিছন হইতে নিখিলবাবুর ধমক খাইয়া থামিয়া গেলেন।

"রমেশ তুমি এখানে বেশ আড্ডায় জমে গেছ দেখছি। আড্ডা পরে দিও, এখন পরিবেশনের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে ফেল দিকি। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, কোন ব্যাচে কাকে নেবে লিষ্ট কর আগে—"

"আজ্ঞে সেইজন্যেই তো এদের কাছে এসেছি। এখানে চাই ক'জন আছে কিনা। প্রিয়গোপাল, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন, রামপ্রসাদ—"

প্রিয়গোপাল বলিল, "হামাদের যা বলবেন তাই করব।"

এ আলোচনাতেও বাধা পড়িল। হাসপাতাল হইতে একটা বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সকলেই সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। দেখা গেল হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়া একটি যুবতী কাঁদিতেছে, তাহার কোলে একটি শিশু। সে যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। গতরাত্রে সে নাকি তাহার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া ঘরে শুইয়াছিল, একটি শৃগাল কখন যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটিকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানিতে পারে নাই। একটু পরেই বাহিরে ছেলের কান্না শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন বাহিরে গিয়া দেখে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ছেলের হাতের খানিকটা চিবাইয়া দিয়াছে, ঘাড়েও দাঁত বসাইয়াছে। ছেলেটি তখনও বাঁচিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন— বাঁচিবার আশা কম। খুব বেশী রক্তক্ষয় হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একধারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "বাঘ মানুষ খায় জানি. কিন্তু শেয়ালের এত বড় স্পর্ধা হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা—"। তিনি আরও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোরুদ্যমানা জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিখিলবাবু দাঁড়ান নাই, তিনি কাছারির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সাধারণত জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন। রমেশবাবু তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "ওহে, চল চল আর দেরি করা নয়। নিখিলবাবু চলে গেছেন, হয়তো অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য—"

"আমাকে কি করতে হবে ?"

"পরামর্শ ! তোমার মতো একটা মাথা সহায় থাকলে ভারী নিশ্চিন্ত হব আমি। নিখিলবাবু আমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছেন। নানা জাতের এতগুলি লোককে পরিবেশন করে খাওয়ানো, বুঝতেই পারছ। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, তুমি না সহায় হ'লে চলে ?"

বিনোদিত হইয়া শিউনাথ বলিল, "কিন্তু আমি মোটা মানুষ, আমি কি পরিবেশন করতে পারব ?"

"তোমাকে পরিবেশন করতে কে বলছে। তুমি পরামর্শ দাও, লোক জোগাড় করে দাও। চল, প্রিয়গোপাল, লোটন, ঘোটন তোমরাও এস—"

রামপ্রসাদ বলিল, "ডাক্তারবাবুর অসুখ, অথচ, বাড়িতে ধুম লেগে গেল দেখছি। অসুখের বাড়িতে সাধারণত কান্নাকাটি হয় এ ঠিক উল্টো হচ্ছে—"

"হবে না? পুণ্যাত্মা লোক যে। এখন পৃথ্বীশ আর উশনা এসে পৌঁছলে বাঁচা যায়। প্রথম নাতবৌয়ের সাধে ওরা থাকবে না। একথা ভাবাই যায় না। এসে পড়বে ঠিক।"

"সাধ কবে?"

"আগামী শুক্রবার। চল, চল, নিখিলবাবু চটছেন এতক্ষণ।"

সকলকে লইয়া রমেশবাবু কুঠির দিকে অগ্রসর হইলেন! জমিদারের কাছারি এখানে কুঠি নামে পরিচিত।

ভিতর হইতে গঙ্গা আসিয়া কৃষ্ণকান্তকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি আপনাকে ডাকছেন—'

কৃষ্ণকান্ত অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুঝিলেন অনেকক্ষণ অদর্শনের ফলে কিরণ চঞ্চল হইয়াছে।

॥ ১০ ॥

কৃষ্ণকান্ত সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন কিরণ ওদিকের বারান্দায় বসিয়া ফলের রস করিতেছে। কৃষ্ণকান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিরণ এমন ভাব দেখাইল যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই। যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগও তাহার নাই।

"দূতের মুখে অন্য রকম খবর পেলাম"—মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন।

এইবার তুবড়ির মতন ফাটিয়া পড়িল কিরণ।

"তোমাদের আক্কেলকে বলিহারি যাই। না হয় তোমরা এ বাড়ির জামাই-ই হয়েছ, কিন্তু গেরস্তর মুখের দিকে চাইবে না তা' বলে—"

"সর্বদাই তো চেয়ে আছি, এক দণ্ডও তো চোখ বুজি নি। চক্ষু কি আরও বিস্ফারিত করব?"

"ক'টা বেজেছে জান?"

"জানবার দরকার কি। আপিস তো নেই।"

"তা' বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না? বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে?"

"ওতে বাধা দিও না। বউদির ওটা শখ। তা না হ'লে দুটো ঠাকুর আছে, পার্বতী আছে…"

"যাও না উনুন ধারে খানিকক্ষণ বসে থাক না গিয়ে, তাহলে শখের মজাটা টের পাবে—"

"আমার শখের জন্যে আমিও মাচার উপর ঠায় বসে থেকেছি রাতের পর রাত মশার কামড় সহ্য করে।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। রান্না হ'য়ে গেছে চান কর গে যাও। বাবা গোঁ ধরে বসে আছেন তোমাদের সঙ্গে খাবেন। তাঁর পিত্তি পড়ে যাচ্ছে। তাই ফলের রস দিচ্ছি একটু। এত বেলা হলো ক্ষিদে পায়নি ?"

"ঘণ্টা দুই আগে যা খেয়েছি তা তো জানো। খান বারো লুচি, একবাটি আলুর দম, দুটো ডিম, তার উপর মিষ্টি। ক্ষিদে পায় কখনও ?"

"দিন দিন নতুন হচ্ছ দেখছি। ওই ক'টা ফুলকো লুচি খেয়ে ক্ষিধে হয়নি তোমার ! মিথ্যুক কোথাকার।"

সহাস্য সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ পুনরায় ফলের রসে মন দিল।

"সদানন্দ আর রঙ্গনাথ কোথা, ওদের দিকেও একটু মনোযোগ দাও না, অতটা একচোখো হ'লে লোকে কি বলবে। তা ছাড়া এক সঙ্গেই তো খাব সব। ওরা কি 'রেডি'—"

"রেডি না ছাই। সদানন্দ এতক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। রঙ্গনাথ, সন্ধ্যা আর স্বাতী সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সব বে-আক্কেলে তোমরা—"

"সোমনাথ কোথা।"

"সে উষার ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দিচ্ছে ওদিকের বারান্দায়।"

বীরুবাবুর বড় কন্যা স্বাতী ও বড় জামাই সোমনাথ আগের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছোট মেয়ে-জামাই এখনও আসে নাই। সে জন্য বীরুবাবু চিন্তিত আছেন বারবার স্টেশনে যাতায়াত করিতেছেন।

"যাই, বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে আসি। সত্যি তোমার ক্ষিধে পায় নি ? যাই হোক, বউদিকে এবার রেহাই দাও তোমরা রান্নাঘর থেকে।"

"একটা কথা বুঝছ না তুমি, বউদি রেহাই পেতে চান না। উনি রেঁধে আর পরিবেশন করে সুখ পান আর হাতে স্বর্গ পান রান্না ভালো হয়েছে বললে। তা বলব।"

কিরণ তাহার দিকে একটা হাস্যোজ্জ্বল তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাবাকে ফলের রস খাওয়াইতে গেল। কৃষ্ণকান্ত গেলেন দক্ষিণ বারান্দায় সোমনাথের কাছে।

॥ ১১ ॥

সূর্যসুন্দর সত্যই অনেকটা ভালো বোধ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন একটা নূতন ধরনের নব-জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি প্রিয়জনের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহাকে অসুখ না বলিয়া সুখ বলাই তো উচিত। কেবল একজনের অভাবে তাঁহার মনের ভিতরটা খচখচ করিতেছিল। পৃথ্বীশ আসিবে কি ? তাহাকে কি কুমার খবর দিতে পারিয়াছে ? অনেক দিন তো তাহার কোন খবর নাই। সেই চিঠিটির কথা তাঁহার বারবার মনে পড়িতেছিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে যে চিঠিটি সে লিখিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—"মা-ই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমিও বন্ধনমুক্ত হইয়াছি। তাই আমি এবার

ঈপ্সিত পথে চলিলাম। আপনার সেবা করিবার জন্য দাদা, উশনা, কুমার রহিল। আমি দূরে হইতে আপনার সংবাদ রাখিব এবং প্রয়োজন বুঝিলে ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা আমার নাই, আর ঘোর স্বার্থপর না হইলে গৃহস্থ হওয়া যায় না, তাই আমি সন্ন্যাস জীবন যাপন করিব ঠিক করিয়াছি। বাড়ির কোন সাহায্য আমি লইব না। আমি প্রায় নিঃস্ব হইয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। কেবল যে বেহালাটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেইটি লইয়া যাইতেছি।''…সাত বৎসর হইল পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সে কুমারকে চিঠি লেখে। সেসব চিঠি কুমার তাঁহাকে দেখাইয়াছে। চিঠিতে কোন ঠিকানা থাকে না। পোস্টাফিসের ছাপ হইতে একবার হরিদ্বারের নাম পড়া গিয়াছিল, আর একবার কটকের নাম। তবে অল্প কিছুদিন আগে সে কুমারকে পোস্টবক্সের একটা ঠিকানা জানাইয়াছে। লিখিয়াছে, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ওই ঠিকানায় পত্র দিলে সে পাইবে। পোস্ট বক্স বম্বেতে। কুমার সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করিয়াছে, চিঠিও দিয়াছে। কিন্তু কই পৃথ্বীশ এখনও তো আসিল না, কোন জবাবও আসে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর কথাটাও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর সংগে সংগে পৃথ্বীশ অজ্ঞান হইয়া যায়। বারো ঘণ্টার পর তাহার যখন জ্ঞান হয়, তাহার পর হইতে তিনদিন সে ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল, তাহার পর সাতদিন নির্বাক হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া যাইবার পাঁচদিন পরে হঠাৎ সে গৃহত্যাগ করে। সূর্যসুন্দর যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। মানুষের সবই সহিয়া যায়। এতবড় মর্মান্তিক ব্যাপারটাও সূর্যসুন্দরের সহিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। কল্পনার সহায়তায় তিনি ইহার একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সান্ত্বনা লাভও করিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার বাবাই পৃথ্বীশরূপে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছিল। পৃথ্বীশের মুখের আদলটা না কি তাঁহার বাবার মুখের মতো, বুকটাও ঠিক তেমনি লাল। বাবার মতোই তাহার সঙ্গীতানুরাগ এবং সংসারে অনাসক্তি। অনুপস্থিত পৃথ্বীশকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে তিনি একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিলেন। ইদানীং আর একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি পৃথ্বীশকে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ চেষ্টা আর করেন নাই। বোম্বের ঠিকানাটা পাইবার পর কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিল—"ঠিকানা তো একটা পাওয়া গেল, এবার আমি না হয় বম্বে গিয়ে মেজদাকে ধরে নিয়ে আসি। আমি গেলে ঠিক আনতে পারব!" সূর্যসুন্দর কিন্তু তাহাকে যাইতে দেন নাই। মুখে বলিয়াছিলেন বটে, "না থাক। কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ওর পিছনে। জোর করে কি কাউকে ধরে রাখা যায়? ও যদি আসে, আপনিই আসবে"– কিন্তু মনে মনে তাঁহার অন্য প্রকার যুক্তি ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "বাবা আমার জন্যই শেষ জীবনে নিজের খেয়াল খুশীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশরূপে আবার যদি আমার কাছে আসিয়াই থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জোর করিরা সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে? চলুন না তিনি নিজের পথে, নিজের খেয়ালে…"

তিনি চোখ বুজিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন। বাবার মুখটাই আবার তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত ঈষৎ রক্তাভ চোখের দিকে

/তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল একটা চাপা হাসি যেন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"না, এবার আর তোমায় কষ্ট দেব না"—হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন।

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে আনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না।

"বাবা, আমাকে কিছু বললেন ?"

"না।"

সূর্যসুন্দর আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যা ঊষা কোথা ?"

"মেজদি বাথরুমে। ছোটদি আর ছোট জামাইবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন সোমনাথকে নিয়ে।"

"কোথা গেছে—"

"বাহিতলায়।"

খবরটি শুনিয়া সূর্যসুন্দর প্রীত হইলেন। বাগানে কেহ গেলে তিনি বড় খুশী হন। বাহি নদীর ধারে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড আম বাগান আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘার বাগান। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কাজ। এই প্রসঙ্গে বন্ধু নীলকমলকে আর ভোজু নাপিতকে মনে পড়িল। বাগানটির সহিত ইহাদেরও স্মৃতি জড়িত আছে।

নীলকমলের বাড়ি ছিল মালদহ জেলার এক গ্রামে। সূর্যসুন্দর তাহাদের বাড়ির গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নীলকমল বহুদিন হইতে সূর্যসুন্দরকে অনুরোধ করিতেছিলেন, "আপনি যদি বলেন, আপনাকে কিছু ভালো আমের কলম পাঠিয়ে দিই। আপনার ওই জমিটায় চমৎকার বাগান হবে।" তিনি দুইবার অনেক কলম পাঠাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বশত সূর্যসুন্দর সেগুলি রোপণ করিতেও পারেন নাই। দুইবারই প্রায় শতাধিক কলম টবেই শুকাইয়া গিয়াছিল। নীলকমল তখন অনুভব করিলেন এই পন্থায় চলিলে গাছই মরিবে, বাগান হইবে না। তখন তিনি সূর্যসুন্দরকে পত্র লিখিলেন, "ডাক্তারবাবু, এবার কলমের গাছ লইয়া আমি নিজে যাইব এবং আপনার বাড়িতে গিয়া কিছুদিন থাকিব। আমার জন্য বাহিরের একটি ঘর এবং চাকর মজুত রাখিবেন।" বহু আমের কলম নইয়া নীলকমল একদিন আসিয়া হাজির হইলেন এবং সূর্যসুন্দরের বাড়িতে প্রায় ছয়মাস থাকিয়া বাগানটি সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন! তিনি না আসিলে বাহিতলার আমবাগানটি হইত না। এই প্রসঙ্গে ভোজু নাপিতের কথাও তাঁহার মনে পড়িল। ওই চল্লিশ বিঘা জমির মাঝখানে এক বিঘা জমি ছিল ভোজু নাপিতের। সূর্যসুন্দর ভোজু নাপিতের ওই এক বিঘা জমির পরিবর্তে তাহাকে অন্যত্র পাঁচ বিঘা জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজু তাহাতে রাজি হয় নাই। অন্যত্র এক বিঘা জমি লইয়াই সে তাঁহার ওই জমিটুকু দিয়াছিল। টাকা-কড়ির জোরে এসব হয় না, হয় প্রেমের জোরে। সূর্যসুন্দর নিজের জীবনে বারম্বার এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বাগানে গেছে ওরা ? বেশ হয়েছে। কুমার কোথা, সে থাকলে গাছগুলো চিনিয়ে দিতে পারত।"

"উনি একটা নৌকো করে বেরিয়েছেন পাখী শিকার করতে। চরে আজকাল খুব হাঁস বসছে তো।"

"ও, তা বেশ করেছে। যদি কিছু মেরে আনতে পারে, জামাইরা এসেছে খাবে আনন্দ করে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

ফলের রস লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল।

"রসটা খাও বাবা। লেবুগুলো ভালো আনে নি, সব শুকনো শুকনো—"

সূর্যসুন্দর অন্য জগতে ছিলেন, লেবুর বিষয়ে কোন মন্তব্য করিলেন না। হঠাৎ বলিলেন, "তুই জানিস কি, আমার বাবার বড় গেলাস আছে একটা, কাঠের সিন্দুকটায় আছে বোধহয়, খুঁজে দেখ তো।"

"ঠাকুরদার গেলাস ?"

"হ্যাঁ, দেখিস নি সেটা ?"

কিরণের মনে পড়িতেছিল না দেখিয়াছে কিনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পাত্রী সে নয়। খানিকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখেছি, মনে পড়েছে, খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। কেন, কি হবে সে গেলাস দিয়ে—"

"সেটা বার কর। দেখব একবার।"

"আচ্ছা, ঊর্মিলা, জানো কোথায় আছে সেটা ?"

"না, আমি তো দেখি নি। দিদি জানেন বোধহয়। পুরানো সব বাসন উনিই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা, ফলের রসটা খেয়ে নাও এখন, আমি দেখছি কোথা আছে সেটা—"

সে সন্তর্পণে সূর্যসুন্দরকে ফলের রস খাওয়াইতে লাগিল। কিরণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাবা হঠাৎ ঠাকুরদার কথা ভাবিতেছেন কেন! অসুখের সময় মৃতের কথা মনে করা তো ভালো লক্ষণ নয়।

রস খাওয়া শেষ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "চম্পা কোথা ?"

"সে ওই পিছনের ঘরে, গগনের ফরমাসে তোমার জন্যে স্টোভে কি কি একটা খাবার করছে।"

"কত আর খাব আমি। কি খাবার—"

"আপেল সেদ্ধ করে কি যেন করছে দু'জনে মিলে। আপেল স্টাফিং না, কি যেন বললে। আমিও ওসব শিখেছিলুম এককালে, এখন ভুলে গেছি। তোমার জামাইটির খাওয়ার শখ বলে তো কিছু নেই—যা সামনে ধরে দাও গপ গপ করে খেয়ে ফেলবে!"

"দুজনে মিলে করেছে ? গগনও আছে না কি ?"

"গগনই তো ফরকর্টটি তুলেছে। সকাল থেকে তিনজনে স্টোভ নিয়ে বসেছে। আপেল আনিয়েছে কাটিহার থেকে।"

"আর একজন কে।"

"ওই মিস্ বোস। ও তো ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরছে চম্পার সঙ্গে। খুব সেবা করে কিন্তু। ও সঙ্গে না এলে এই ভীড়ের বাড়িতে এত রকম হ'য়ে উঠত না। এখন ভালোয় ভালোয় সাধের ব্যাপারটা মিটলে বাঁচা যায়।"

"নিখিলবাবু যখন ভার নিয়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির সব ভোজ কাজ তো উনিই করিয়েছেন।"

"তুমুল আয়োজন হচ্ছে শুনছি—"

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনেছি। সুবাতালী, ওঝাজি, চমকলাল, গোবিন্দ মণ্ডল, নিখিলবাবু এরা সবাই যখন একজোট হয়েছে তখন তুমুল ব্যাপারই করে ছাড়বে।"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার চুল কুরিয়া দিতেছিল।

সে স্মিতমুখে বলিল, "ভালোই তো হচ্ছে। আমাদের প্রথম বউ—"

সাধের প্রসঙ্গে কাল হইতেই যে সমস্যাটা কিরণের মনে জাগিয়াছিল তাহা এইবার সে ব্যক্ত করিল।

"সাধে একটা কিছু তো দিতে হবে। এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, কি যে করব তাই ভাবছি। ঊর্মিলা তুই কি দিবি ?"

"আমার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি কেনা হয়েছিল, এখনও পরিনি সেটা, সেইটে দিয়ে দেব ভাবছি। মভ কলার, ওকে সুন্দর মানাবে—"

"আমি কি করি বল তো। আমি একটা সোনার হার দিতে চাই, কিন্তু এখানে তো তৈরি হার পাওয়া যাবে না।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "শিবু স্যাকরাকে বললে সে হয়তো করে দিতে পারে।"

"চার পাঁচ দিনের ভিতর কি পারবে ?"

"তা পারবে না কেন। কুমারকে বল তাকে ডেকে পাঠাক, আমাদের বাড়িতে বসেই করুক না। ঊর্মিলার একটা কি গয়না তো করেছিল।"

ঊর্মিলা বলিল, "আমার বাজু করিয়েছিলেন উনি ওকে দিয়ে। বেশ সুন্দর গড়েছিল। এই যে দেখুন না—"

ঊর্মিলা হাত তুলিয়া বাজু দেখাইল, তাহরে পর খুলিয়া দিল।

কিরণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া মন্তব্য করিল, "পালিশ ততো ভালো নয়।"

গগন শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

"পিসিমা, বাড়িতে 'নাট্‌মেগ্‌' আছে ?"

"জানি না তো। কি করবি ?"

"দাদুর জন্যে যে আপেল স্টাফিংটা করছি তাতে 'নাটমেগ' দরকার। দেখি, মাকে জিজ্ঞেস করি—"

গগন পুনরায় ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সূর্যসুন্দর ডাকিলেন।

"শোন। চম্পা নাকি ভালো গীটার বাজায় শুনলাম—"

"গীটার, বেহালা দুইই বাজায়—"

"সঙ্গে এনেছে যন্ত্রগুলো ?"

"হ্যাঁ—"

"তাই শোনাক না। খাবার-টাবার করে কি হবে।"

"খেতে খেতে গীটার শুনতে আরও ভালো লাগবে। যদি ঠিক মতো হয়, দেখো কি গ্র্যান্ড খেতে।"

গগন নাটমেগের খোঁজে চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, "চমৎকার ছেলে দুটি দাদার। দুটি হীরের টুকরো যেন।"

মেয়ে দুটিও ভালো। বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান।

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

"বউদি খুঁত খুঁত করছে তোমার খেতে বেলা হচ্ছে বলে। তুমি বলছ সকলের সঙ্গে খাবে, কিন্তু তোমার জামাইদের তো কারো এখনও চান পর্যন্ত হয়নি। কুমার শিকার থেকে ফেরেনি। দাদা পীর-পাহাড়ে গিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যারা বাগানে গেছে। ওদের সঙ্গে খেতে গেলে দুটো বেজে যাবে তোমার।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "দুটোই না হয় হলো, ক্ষতি কি তাতে। সকাল থেকে তো তিনবার খেলাম। আর কতটুকুই বা খাব আমি—?"

পার্বতী এককাপ্ ওভাল্টিন লইয়া প্রবেশ করিল।

"দাদু মা বললেন এটাও খেয়ে নিতে।"

"কি বিপদ। কতবার খাওয়াবি তোরা—"

"মা বললেন খেতে অনেক বেলা হবে, এটা খেয়ে নিন।"

ছোটছেলের মতো জেদ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "না, না, এখন আর খেতে পারব না। এক্ষুণি তো ফলের রস খেলাম।"

পার্বতী ওভাল্টিনের কাপটা পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া ঢাকা দিল, তাহার পর রাগতমুখে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই বারান্দায় তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"মা দাদু খাচ্ছেন না। যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন তা আর বলবার নয়। তুমি সামলাও এসে। আমার কথা শুনছেন না।"

"অতি দজ্জাল মেয়েটা"—কিরণ হাসিয়া সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "ওকে দেখে আমার উদিৎ সিংয়ের কথা মনে হচ্ছে। উদিৎ সিংকে মনে পড়ে তোর ?"

"না।"

"খুব ছোট ছিলি তুই তখন। ওরই মতো ছিপছিপে আর ফরসা ছিল উদিৎ সিং। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তার। বামুন দিদিকে মনে আছে ?"

"একটু একটু আছে। কুঁজে হ'য়ে লাঠি নিয়ে হাঁটত, না ?"

"হ্যাঁ কুঁজো হ'য়ে গিয়েছিল। সে-ও খুব প্রতাপী ছিল। আমার এক বন্ধু ওকে বলত কুকী।"

"কুকী মানে ?"

"মেয়ে-রাঁধুনী। কুক—কুকী। অখিলকে একদিন খুন্তি নিয়ে তাড়া করেছিল।"

"কেন ?"

"জুতো পরে রান্নাঘরে উঁকি দিয়েছিল বলে। অখিলকে বলত পোড়ামুহা। খুব কালো ছিল তো অখিল।"

পুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। যদিও বর্ষীয়সী হইয়াছেন, তবু শ্বশুরের সামনে এখনও তিনি ঘোমটা দিয়ে আসেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওভালটিনটা খেয়ে নিন। সকলের সঙ্গে খাবেন বলছেন, কিছু না খেলে পিত্তি পড়ে যাবে। ওটা খেয়ে ফেলুন, বেশী তো দিইনি।"

"এইমাত্র ফলের রস খাওয়ালে যে কিরণ—"

"ফলের রসটা ভাতের সঙ্গে খেলে হতো। কতটুকু দিয়েছে ?"

কিরণ বলিল, "খুব কম। আধ কাপও নয়।"

"তাহলে ওভালটিনটা খেয়ে নিন। ভাত না হয় কম খাবেন। গগন বলেছে ওভালটিনটা খাওয়া দরকার আপনার।"

সূর্যসুন্দর অনুভব করিলেন খাইতেই হইবে। বাড়ির মধ্যে একমাত্র পুরসুন্দরীকেই তিনি ভয় করেন, তাহার উপর ইহা যখন গগনের প্রেসক্রুপসন, তখন কোন প্রতিবাদই চলিবে না।

"ঠাকুরঝি খাইয়ে দাও ওটা।"

কিরণ সূর্যসুন্দরের গলায় ছোট লোম ওয়ালা তোয়ালেটা জড়াইয়া দিয়া ফিডিং কাপে করিয়া 'ওভালটিন' খাওয়াইতে লাগিল।

এক চুমুক দিয়াই সূর্যসুন্দরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"বাঃ খুব সুন্দর তো এটা খেতে।"

পুরসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গগন খুব ভালবাসে। বারো টিন কিনে এনেছে আপনার জন্যে।"

যতক্ষণ না ওভালটিন খাওয়ানো শেষ হইল ততক্ষণ পুরসুন্দরী আধঘোমটা টানিয়া প্রহরীর মতো এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাওয়া শেষ হইলে উর্মিলা উঠিয়া নীরবে ফিডিং কাপটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর মাথার শিয়রে বসিয়া চুলের ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল।

একটু পরে প্রবেশ করিল গঙ্গা একটা কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া। ধোপার বাড়ির কাপড়, তাগাদায় কাচিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গঙ্গা, তোকেই খুঁজছিলাম। বাজার থেকে চট্ করে গিয়ে কিছু জইত্রী কিনে আন তো। গগন চাইছে। বাইসাইকেলে করে যা বাবা, ও কি একটা রান্না করছে বাবার জন্যে।"

"ও, আচ্ছা—"

গঙ্গা কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "রতনা ধোপার কাছ থেকে তোমার তাগাদার কাপড়গুলো নিয়ে এলাম। ওদের বাড়িতে বিয়ে লাগছে, না নিয়ে এলে ওই দামী কাপড়গুলো পরতো সবাই মিলে। মিলিয়ে দেখে রেখে দাও এক্ষুণি। পরে আবার বোলো না যেন এটা নেই, সেটা নেই।"

বলিয়াই সে জইত্রী আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

পুরসুন্দরীও রান্নাঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বউমা শোন। আমার বাবার গ্লাসটা কোথা আছে বল তো।"

"বড় কাঠের সিন্দুকে আছে সেটা।"

"কাউকে দিয়ে বার করাও তো, দেখব একবার। এক্ষুনি বার করতে বল।"

"আচ্ছা।"

পুরসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর পার্বতী পুনরায় প্রবেশ করিল।

সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমার কথা শোনা হলো না। মায়ের কথা শোনা হলো। আমি যেন কেউ নই। আচ্ছা"—মাথা ঝাঁকাইয়া সে আবার বাহির হইয়া গেল।

॥ ১২ ॥

আমবাগানে তিনটি ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যা, স্বাতী এবং রঙ্গনাথ বেশ জমাইয়া আড্ডা দিতেছিল। বাগানের চাকরটি তাহাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিলও পাতিয়া দিয়াছিল। স্বাতী সন্ধ্যার চেয়ে বছর চারেকের ছোট হইলে কি হয়, দুজনে বন্ধুত্ব খুব। বিবাহের পর বয়সের এ পার্থক্যটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সাধারণত ইহাই হয়। তাহাদের মধ্যে পিসি-ভাইঝির দূরত্ব আর ছিল না। স্বাতীর রং খুব ধপধপে ফরসা, চোখ দুটি ছোট ছোট, মুখের উপর ঈষৎ তির্যকভাবে বসানো, মুখের ভাবটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের। খুব পাতলা ঠোঁট, চিবুকের মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো তিল।

স্বাতী বলিতেছিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কি তাড়াহুড়ো করে যে আমরা এসেছি ছোট পিসি—তা বলবার নয়। ভয় হচ্ছিল দাদুকে এসে দেখতে পাব কিনা। ওঁর ছুটি পেতে দু'দিন দেরি হ'য়ে গেল তো। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে আমরা যেন দাদুর অসুখের জন্যে আসি নি। এসেছি বউদির সাধ খেতে। দাদুকে তো খুব হাসি-খুশী দেখলুম, মনে হচ্ছে অসুখই হয়নি।"

"বাবা বরাবরই ওই রকম, অসুখ হ'লে কাউকে বুঝতে দেন না যে অসুখ হয়েছে। কিন্তু বাবার মনে সুখ নেই বুঝতে পারছি।"

"কেন।"

"মেজদার জন্যে। মনে মনে উনি মেজদার জন্যেই প্রতীক্ষা করছেন। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মেজদার নাম ধরে ডাকছিলেন।"

"সত্যি মেজকাকা যে কোথায় আছেন, কে জানে।"

রঙ্গনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তোমার শাড়ির আঁচলটা নতুন ধরনের দেখছি। হায়দ্রাবাদি বুঝি—"

"হ্যাঁ। হায়দ্রাবাদ থেকেই আনিয়েছি। আপনি বেশ পাড় চিনতে পারেন তো—"

রঙ্গনাথ সন্ধ্যার দিকে একবার চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা যাজ্ঞবল্ককেও মৈত্রেয়ীর জন্যে পাড়ের খবর রাখতে হতো, যদিও উপনিষদে এ কথা লেখা নেই—"

সন্ধ্যার মুখে হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আপনি তাহলে কি করে জানলেন এ কথা।"

"ক্ষিধে পেলে যাজ্ঞবল্ক খেতেন এ কথাও উপনিষদে লেখা নেই, কিন্তু আমি জানি খেতেন।"

সন্ধ্যা বলিল, "উনি আমার দৃষদ্বতীতে কাপড়ের পাড় সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা।"

"আচ্ছা, ছোট পিসি, দৃষদ্বতী মানে কি! অমন কটমট নাম রেখেছ কেন কাগজের।"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বল—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "কি দরকার ওসব ইতিহাস শুনে?"

"না বলুন। অনেকে জিগ্যেস করে—"

"তবে শোন। দৃষদ্বতী নদীর নাম। সেকালে আর্যরা যখন ব্রহ্মাবর্তে এসেছিলেন তখন দুটি নদীকে তারা দু-রকম মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটি সরস্বতী, আর একটি দৃষদ্বতী। সরস্বতী ছিল অন্তঃসলিলা, বাইরে থেকে দেখতে শুকনো, কিন্তু বালি একটু খুঁড়লেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল বেরুতো। ওই নদীতে ছোট বড় গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করত সবাই। গর্তগুলোকে তাঁরা বলতেন সরসী, মানে ছোট ছোট পুকুর। যে নদী সরসী-সমন্বিতা তার নাম দিলেন তাঁরা সরস্বতী। আর্যেরা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে পূজা করতেন ওই নদীকে। পরে যিনি জ্ঞানের দেবতা হলেন তাঁরও সম্ভবত ওই নদী থেকেই নামকরণ হল সরস্বতী। দ্বিতীয় নদীটি ছিল অন্য রকম। ছোট বড় অনেক পাথর অতিক্রম করে বইত সে নদী, যেন অনেক বাধা বিঘ্নও তাকে দমাতে পারে নি। ইজিপ্টে নীল নদের ক্যাটারাক্টগুলো অনেকটা ওই রকম। পাথরের সংস্কৃত হচ্ছে দৃষৎ, তাই তাঁরা সে নদীর নাম দিয়েছিলেন দৃষদ্বতী। সরস্বতী যেমন ছিল জ্ঞানের প্রতীক, দৃষদ্বতী তেমনি ছিল বীরত্বের প্রতীক। সরস্বতীকে পুজো করতেন ব্রাহ্মণেরা, আর দৃষদ্বতীকে ক্ষত্রিয়েরা। তাই সন্ধ্যা ওর কাগজের নাম রেখেছে দৃষদ্বতী।"

"কিন্তু ওতে তো যুদ্ধের বা বীরত্বের কিছু থাকে না। ওতে মেয়েদের সম্বন্ধেই তো গল্প প্রবন্ধ থাকে দেখছি।"

"তোমার ছোটপিসির ধারণা আমাদের সমাজে মেয়েদের খবর মানেই যুদ্ধের খবর। মেয়েরা পরাধীন, মেয়েরা নির্যাতিত, তাই মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। তাদের মুক্তির জন্যে যা কিছু করা হয় তাই যুদ্ধ। ও কাগজের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব ওয়ার-বুলেটিন।"

রঙ্গনাথ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে হাসির আভা উঁকি দিতেছিল। স্বাতী বোকা মেয়ে নয়, কিন্তু সে বোকা সাজিবার ভান করিত। সে সব বুঝিতেছিল কিন্তু ভান করিতেছিল যেন কিছুই বোঝে নাই।

"এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কারা ?"

"আমরা, পুরুষরা।"

নীরব হাসিতে স্বাতীর মুখখানি ভরিয়া গেল, ছোট চোখ দু'টি বুজিয়া আসিল।

"কিন্তু শত্রুর প্রতি আপনাদের ব্যবহার তো অদ্ভুত। শুধু খাওয়াচ্ছেন না, ভালো ভালো গয়না দিচ্ছেন, সব রকমের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।"

"আমাদের মধ্যে যারা বিবেকী তারাই দিচ্ছে, অনুতপ্ত হয়ে খেসারত দিচ্ছে। কিম্বা এ-ও হ'তে পারে অনেকে হয়তো ঘুস দিয়ে শত্রুকে বশ করবার চেষ্টা করছে।"

সন্ধ্যা সূর্যসুন্দরের জন্য উলের দস্তানা বুনিতেছিল। কোন মন্তব্য না করিয়া সে নীরবে বুনিয়া যাইতেছিল। একটি হাসির আভা তাহার সুন্দর কালো মুখখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু। সে মাঝে মাঝে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রঙ্গনাথকে দেখিতেছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—যে দৃষ্টিতে মা তাহার দুরন্ত সন্তানকে নিরীক্ষণ করে।

"আচ্ছা পিসেমশাই—"

"একবার তো মানা করে দিয়েছি আমাকে পিসেমশাই বলবে না। পিসেমশাই শুনলেই আমার চোখের সামনে আমার নিজের এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ছবি

ফুটে ওঠে। রোগা কালো বেঁটে কুঁজো, গুলিখোর। সুতরাং আমি কারো পিসেমশাই হতে চাই না।"

"কি বলে ডাকব তাহলে—"

"দাদা বললে ক্ষতি কি—"

"কি যে বলেন।"

"তোমরা পিতৃতুল্য মাস্টারকে দাদা বল, হবু-স্বামীকেও বিয়ের আগে দাদা বল, পিসেমশাইকে দাদা বললে কিছু বেমানান হবে না। শুনেছি সংস্কৃত তাত শব্দ থেকে বাংলা দাদা কথাটা হয়েছে—"

"তা হোক। দাদা বলে ডাকা চলবে না। মা ভয়ানক রেগে যাবে তাহলে।"

"বেশ, তাহলে শুধু 'পি' বোলো—"

রঙ্গনাথ এবার সন্ধ্যার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে নত নেত্রে নীরবে হাসিমুখে বসিয়া দস্তানাই বুনিতে লাগিল।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা পিসেমশাই, মিস বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?"

"না। তবে মেয়েটি ভালো বলেই মনে হয়।"

"আলাপ হয়নি, তবে কি করে বুঝলেন।"

"গায়ে পড়ে আলাপ করার চেষ্টা করে না দেখে। তোমার ছোটপিসির ওর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা।"

"তাই নাকি ছোটপিসি, আমারও খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে—"

একথাটা স্বাতী মিথ্যা বলিল। মিস্ বসুকে মোটেই তাহার ভালো লাগে নাই, বরং তাহার মনে হইতেছিল দাদা এই অজ্ঞাত কুলশীলাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল। তাহার ফিটফাট ধরনধারণ তাহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার বরং একটু ঈর্ষাই হইয়াছিল। তাহার জন্য আলাদা বাথরুম, কাটিহার হইতে তাহার জন্য কমোড, আলাদা একটা মেথরাণী—এসব তাহার মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু সোজাসুজি মনোভাব ব্যক্ত করিবার মেয়ে সে নয়। প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল মিস বসুকে কাহার কেমন লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বলিল, "ভালোই মেয়েটি।"

"ও, তাই বুঝি। খুব কাজের?"

"না, ভালো মানে মডার্ন। আধুনিক - "

"ও।"

রঙ্গনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের গাছগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কিছু জমিদারি আছে, কিছু কিছু বাগানও আছে। কিন্তু তিনি নিজে মনোমত আর একটি বাগান করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সাহিত্যে যে সব দেশী বিদেশী গাছের নাম তিনি পড়িয়াছেন, সেইগুলি একটি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার। নানা পুস্তক হইতে নানারকম বৃক্ষ ও লতার নাম তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও জোগাড় হয় নাই, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালক-

দের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার পত্রালাপ চলিতেছে। নিজে তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছেনও। তাই বাগান দেখিলেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং নিজের কল্পনায় তা দেন।

সন্ধ্যা বুনিতে বুনিতে হঠাৎ স্বাতীকে প্রশ্ন করিল—"তুই হিন্দু-কোডবিলটা পড়েছিস ?"

"ওই খবরের কাগজে একটু আধটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি। আমার ততো ভালো লাগেনি।"

"ভালো লাগেনি কেন ?"

স্বাতী জানে ছোটপিসির পাল্লা বড় শক্ত পাল্লা। কুটকুট করিয়া প্রশ্ন করিবে, আস্তে আস্তে কুরিয়া কুরিয়া তোমার মনের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিবে, তাহার পরই ঝপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিবে যুক্তির জাঁতিকলে। ও ফাঁদে স্বাতী পা দিবে না।

"কেন, তা-ও কি বলতে পারি। ও নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই নি।"

"ঘামানো উচিত। আমাদেরই জন্যে ওটা হচ্ছে, আমরা যদি মাথা না ঘামাই তাহলে কে ঘামাবে।"

স্বাতী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁচিয়া গেল সে।

"কে আসছে বল তো ছোটপিসি—"

সন্ধ্যা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ন্যুব্জদেহ একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া দিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গায়ে একটা আড়-ময়লা আল-খাল্লা গোছের জামা, এক মুখ খোঁচা খোচা সাদা গোঁফ দাড়ি, মনে হয় যেন দশবারো দিন কামানো হয় নাই। পায়ের জুতোটাও ছেঁড়া। কিছুদূর আসিয়াই সে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর বাগানের মালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে শান্তা, দোঠো বাঘানুটিরো দাত্‌মন্ তোড়ি দে তো বেটা। অভি তক্ মু নেই ধোলোছি—"

শান্তা সসম্ভ্রমে দাঁতন আনিতে ছুটিল।

বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া আগাইয়া আসিল সন্ধ্যার দিকে। তাহার পানের দাগ-লাগা অপরিষ্কার দন্তগুলি দেখিয়া সন্ধ্যা ঘৃণায় মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখভাবে তাহা সে প্রকাশ করিল না, বরং হাসিমুখেই চাহিয়া রহিল আগন্তুকের দিকে। ক্ষীণভাবে ইহাও তাহার মনে হইতে লাগিল মুখটা যেন চেনা-চেনা। বৃদ্ধ কিছুদূরে আসিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল। সন্ধ্যার সহসা মনে হইল তাহার ওই ফোলা-ফোলা হাস্য-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহের ঝরণা নামিতেছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ কথা বলিল।

"কে তুই, কত বড় হ'য়ে গেছিস, চিনতে পারি না।"

"আমি সন্ধ্যা—"

"আরে, আরে তুই সন্ধ্যা। সেই এত টুকুন 'সন্ধ্যা-মুনি রাত-জাগুনি' এত বড় হয়েছিস তুই ? বাহবা বাহবা—বাঃ।"

মহানন্দে বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তা ইতিমধ্যে দুইটি "বাঘানুটির" (বাঘ-ভেরেণ্ডা) দাঁতন আনিয়াছিল। বৃদ্ধ সে দুইটি লইয়া বলিল, "আমি মুখটা আগে ধুয়ে ফেলি। তারপর তোদের সঙ্গে কথা বলব। আঁধার থাকতেই কিষণপুর থেকে হেঁটে বেরিয়েছি। সোজা আগে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাবুর খবরটা

নিলাম। শুনলাম ভালো আছেন। তারপর এখানে মুখ ধুতে এলাম! এখানে যখনই আসি তখনই বাঘানুটির দাঁতন দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলি। এ বাঘানুটি আমিই লাগিয়েছিলাম এখানে। ওতে ভালো বেড়াও হয়, দাঁতনও হয়। শান্তা দো বালতি পানি ওঠা দি' তো বেটা—"

একটু দূরে কূপ ছিল। শান্তার সহিত বৃদ্ধ সেই দিকেই গেলেন। বৃদ্ধকে দুই বালতি জল তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই সন্ধ্যা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তা, উনি কে বলতো—"

"কবিরাজ জি।"

তখন সন্ধ্যার মনে পড়িল পেট-পচা কবিরাজকে। তাহার ছেলেবেলায় ইনি প্রায়ই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। খাদ্য-রসিক, খুব খাইতে পারিতেন, কিন্তু হজম হইত না। উদরাময়ে ভুগিতেন। নিজেই বলিতেন, "আমার পেটের ভিতরটা পচে গেছে"—আর হা হা করিয়া হাসিতেন। সেইজন্য বাড়িতে ইঁহার নাম হইয়া গিয়াছিল পেট-পচা কব্‌রেজ। সন্ধ্যার ইহাও মনে পড়িল, মা ইঁহাকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন! কবিরাজ মহাশয় স্বাতীরও জন্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাতীকে তাহার তেমন মনে ছিল না। স্বাতী কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছিল অনেক।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপিসি, এই পেট-পচা কবরেজ, না?"

"হ্যাঁ, বেশ মজার লোক।"

সন্ধ্যা পুনরায় দস্তানা-বোনায় মন দিল। হিন্দুকোড বিলের কথা আর উঠিল না, স্বাতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারকম বিকট শব্দ করিতে করিতে মুখ-প্রক্ষালন করিলেন। তাহার পর কটি-দেশ-আবদ্ধ গামছাটি খুলিয়া মুখ মুছিলেন। তাঁহার কোমরে একটি বটুয়াও বাঁধা ছিল। বটুয়া হাতে চারআনা পয়সা বাহির করিয়া শান্তাকে বলিলেন, "যা তো বেটা, বিছুয়াকা দোকানো সে কুছু দহি-চুড়া লে আ··· দোঠো শাল পাত্তা ভি!" শান্তা চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভুক লেগেছে বেটি। কিছু খেয়ে লি। এই শালা পেটই তো জ্বালিয়ে মারলে হামাকে". তাহার পর সংশোধন করিয়া বলিলেন, হামাকে কেন সকলকেই।"

কবিরাজ মহাশয়ের ভাষা একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনও বেশ শুদ্ধ বাংলা বলেন, কখনও আবার হিন্দির বুকনি মিশিয়া যায়। তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা-স্বাতী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না, না, হাসির কথা নয়, খাঁটি কথা। পোয়েটরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-জীব-জন্তুর বর্ণনা করে বলেন—আহা ভগবানের সৃষ্টি কি আশ্চর্য, 'এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ', কিন্তু আসল জিনিসটির নাম তাঁরা করেন না, ভগবানের সেরা সৃষ্টি কি জান? পেট! পেট পরিমাণে মাত্র এক বিঘৎ কিন্তু ওইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। ওই দুনিয়ার মালিক। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওকে খাজনা দিতে হয়। ও গহ্বর খালি রাখবার উপায় নেই। পেটই আমাদের কান ধরে ছুট্ করাচ্ছে চারদিকে। আমার মতো বুড়োও আমেদাবাদ থেকে পাট্‌নী, পাটনী থেকে মাদারিচক, মাদারিচক থেকে নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে মনিহারি, মনিহারি থেকে দিব্বা ছুটে বেড়াচ্ছে ওরই তাগাদায়। কাজিগাঁয়ে, বিষ্ণুমন্দির কাছে

ওষুধের দাম বাকি পড়ে ছিল ছ'মাস। অনেক তাগাদার পর আজ বেটা মাত্র চার আনা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পেটায় নম হয়ে গেল—"

কবিরাজ মহাশয় দাঁতগুলি বাহির করিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বলিল, "আপনি এখানে খাচ্ছেন কেন, বাড়িতেই চলুন না, সেইখানেই খাবেন।"

"আরে তা তো খাবই। খবর নিয়ে এসেছি, রান্নার দেরি আছে এখনও। বড় বহু-মা নিজে রান্নাঘরে আছেন, তার মানে ভালো ভালো রান্না হচ্ছে। সে সব পরে খাব। কিন্তু এদিকে পেট যে মানছে না, তাই একটু দহি-চুড়া 'ঘুস' দিচ্ছি বেটাকে—"

"জল খাবারও বাড়িতে খেলেই পারতেন—"

"তা পারতাম। তোমাদের বাড়ি তো আমারই বাড়ি। কুমারকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গা শালা ঘুর ঘুর করে মুরুব্বিয়ানা করছে দেখলাম। ওটাকে বড় ভয় করি। ঠিক ভয় নয়, ঘৃণা করি। মুখের উপর অপমান করে দেয়। কুমার একটা কুকুরকে রাজা করে রেখেছে—শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা—সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে না? এ হয়েছে তাই। ওকে দেখলেই আমি সরে পড়ি! নিজের মান নিজের কাছে।"

স্বাতী বলিয়া উঠিল, "না না, সে কি! গঙ্গা-দা কি আপনাকে অপমান করতে সাহস করবে?"

কবিরাজ মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া স্বাতীর মুখের দিকে চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ! তাহার পর সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন— "ইনি কে? চিনছি না -"

"দাদার বড় মেয়ে, স্বাতী।"

"ও, আচ্ছা! বীরুবাবুর মেয়ে! আরে তবে তো আমার নাত্‌নী। আমার বুড়িয়ার সৌতীন।"

কবিরাজ আবার খিক খিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। কবিরাজ গঙ্গার প্রসঙ্গই তুলিলেন আবার।

"তোমার গঙ্গা-দা একটি গাধ্‌হা। কথায় কথায় চাঁট ছোড়ে। একদিনের কথা শুন। প্রায় একবছর আগেকার কথা। ডাক্তারবাবু তখন এখানে ছিলেন না। তিনি বীরবাবুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কুমার ছিল না! বেলা তখন দেড়টা কি দুটো হবে, আমি এসে পেঁছে গেলাম কাঁটাক্রোশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে। খুব খিদে লেগেছিল। বাড়ির বাইরে কাউকে দেখলাম না। কুমারের কুকুরগুলো বসে ছিল বারান্দায়, আমাকে দেখে ভুক্‌তে লাগল। বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কোথা। সে বললে, দিল্লী গেছেন, বড়দার কাছে। 'কুমার কোথা'? মাঠে গেছে'। তখন তাকেই বললাম, 'বড় ভুক্ লেগেছে ভাই। কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর।' এর উত্তরে বললে কি জান? 'এটা কি হোটেল? যখন তখন খাবার পাওয়া যাবে?' চন্ডালটার কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, 'এটা হোটেল নয় তা জানি, হোটেলেও যখন তখন খাবার পাওয়া যায় না তা-ও জানি। কিন্তু এটা যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, আমার বাড়ি। তুমি ভিতরে গিয়ে খবর দাও যে কবিরাজজি এসেছেন।' গাধ্‌হাটা বললে, 'বউমা এই একটু আগে ঘুমিয়েছে, তাকে আমি জাগাতে পারব না। আপনি বসুন।' সঙ্গে সঙ্গে জুতোটি খেলেন বাছাধন। কপাটের আড়াল

থেকে কুমারের বউয়ের গলা শোনা গেল। আমাদের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। গঙ্গাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কবিরাজ মশাইকে বসতে বল। আমি এক্ষুণি খাবার দিচ্ছি ওঁকে।' গঙ্গা গজগজ করতে করতে চলে গেল ভিতরে। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, 'আসুন'। গিয়ে দেখি বউমা কার্পেটের আসন পেতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন চক্‌চকে কাঁসার বাটিতে ঘন দুধ, ভাল চুড়া, মর্তমান কলা, খেজুরের গুড়, আর নারকেলের সন্দেশ। তখনই বুঝলাম—কুমারের বউ মানবী নয়, দেবী। ওর শাশুড়িও দেবী ছিলেন। সে গল্পও শোনাব তোমাদের। খাওয়া শেষ করে পান চিবুতে চিবুতে বাইরে এসে গঙ্গাকে বললাম, 'কিরে, দেখলি ? তা তোর দোষ নেই বেটা। তুই ছোট বংশের ছেলে, তুই এসবের মর্ম কি করে বুঝতে পারবি। মাথাতে ঢুকবে না তোর। তবে একটা কথা শুনে রাখ, এটা হোটেল নয়, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।' তারপর থেকে কিন্তু এই গঙ্গাটাকে দেখলেই আমি সরে পড়ি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে একবার সন্ধ্যার দিকে, আর একবার স্বাতীর দিকে চাহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কুমারের কিন্তু ও খুব হিতৈষী। আর সেইজন্যেই আমার কাছে ওর সাতখুন মাপ।"

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "ঠাকুমার কি গল্প বলবেন বলছিলেন।"

"তোমার ঠাকুমা লছ্‌মী ছিলেন। ওঁর জন্যেই তোমার ঠাকুরদার এত সুনাম, এত খাতির, উন্নতি। ওঁর চেয়ে ধনী লোক অনেক আছেন এদেশে, কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশী খাতির আর কারও নেই। সব তোমার ঠাকুমার জন্যে। উনি ছিলেন আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

কবিরাজ মহাশয় হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কি গল্প বলছিলেন যে—"

"তোমার ঠাকুমার সম্বন্ধে গল্প কি একটা ? অনেক গল্প। তবে এখন যেটা মনে পড়ছে, শোন। অনেকদিন আগের কথা। সেদিনও ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দূরে কোনও কলে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যেতেন। তখন বৈশাখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। লু বইছে। এই গাঁয়েরই গোপীরাম মাড়োয়ারির স্ত্রীর 'পরসোত' (সূতিকা) হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করছিলাম, ডাক্তারবাবুই রোগীটি জোগাড় করে দিয়েছিলেন আমাকে। সেদিন সেই রোগীর খবর নেবার জন্যে কাজিগাঁ থেকে হেঁটে আসছি আমি। অনেক-দিন খবর পাইনি, ওষুধের দামও বাকি ছিল কিছু, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায় দুপুর রোদ মাথায় করে এলাম। আমার তো সর্বদাই—অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—অবস্থা। এসে শুনলাম, রোগীটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, মানে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে—"

কথাটা বলিয়া কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত দিয়া আবার খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "বেটা একটি ছিদেম দিলে না আমাকে। তখন কি আর করি। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের বাড়ির দিকেই আসতে লাগলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে কিছু খাইনি। তোমাদের বাড়ির সামনে যেখানে হাট বসে সেখানে

এসে উঠেছি, এমন সময় কম্পাউন্ডারবাবুর সঙ্গে দেখা। তার মুখে শুনলাম, ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বেজেছে ? তিনি বললেন, দেড়টা। বলে তিনি চলে গেলেন। আমি হাটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখান থেকে তোমাদের বাড়িটা দেখা যায়। দেখলাম বাড়ির দুয়ার জানালা সব বন্ধ। বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক, রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক. তার উপরে পাছিয়া হাওয়া। আমি ভাবলাম এরকম সময়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরলাম। ঠিক করলাম ওই বিছুয়ার দোকানেই ধারে কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব একটু, তারপর রোদ পড়লে বিকেলে বাড়ি ফিরে যাব। কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, কবিরাজজি, কবিরাজজি। পিছু ফিরে দেখি তোমাদের চাকর ঘিনুয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে বললে, আপ চলিয়ে, মাঈজি আপকো বোলাতী হেঁ। মাঈজি ? কোন মাঈজি ? সে বললে, আমাদের মাঈজি। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ডাকছেন ? তিনি আমাকে দেখলেনই বা কি করে। অবাক হলাম একটু। তারপর তার পিছু পিছু এলাম তোমাদের বাড়িতে। তোমার ঠাকুমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, আপনি হাটের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে, আবার চলে যাচ্ছেন কেন। যা রোদ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার ? সত্য কথাই বললাম, না খাওয়া হয়নি। তোমার ঠাকুমা বললেন, তাহলে স্নান করে এখানেই চাট্টি খেয়ে নিন। ভাত তরকারি সব আছে। আমার খাওয়া হয়নি এখনও। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। বুঝলে ? আমি রাজপুত, আমার প্রাণ পাষাণ, কিন্তু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অনেকদিন আগে ভুপেন বোসের লেখা হিন্দু ফ্যামিলি সম্বধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সে লেখা কণ্ঠস্থ আছে আমার। তার একজায়গায় আছে—"With the Hindu life is bound up by its traditional duty of hospitality. It is the duty of a house-holder to offer a meal to any stranger who may come before midday and ask for one, the mistress of the house does not sit down to her meal until every member is fed, and, as sometimes her food is left; she does not take her meal until well after midday, lest a hungry stranger should come and claim one···"। এই আদর্শ তোমার ঠাকুমার মধ্যে দেখিয়াছিলাম সেদিন। এর চেয়েও বড় আদর্শ। কারণ আমাকে দূর থেকে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, রাস্তা থেকে ডেকে এনে খাইয়েছিলেন—"

কবিরাজ মহাশয় নীরবে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মনে হইল যেন প্রণাম করিতেছেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মায়ের নাম কি ছিল বল তো।"

"রাজলক্ষ্মী—"

"বাঃ বাঃ বাঃ—সার্থক নাম। সত্যিই তিনি ডাক্তারবাবুকে রাজা করে দিয়ে গেছেন। সত্যিই এ অঞ্চলের রাজা উনি—আনক্রাউনড্ কিং—"

রঙ্গনাথ বাগান পরিক্রমা শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পিছন দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এই অদ্ভুত আগন্তুকটিকে লক্ষ্য

করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার পিছন দিকে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন এবং ঘুরিয়া বসিলেন।

"কে আপনি—"

স্বাতী বলিল, "আমার ছোট পিসেমশায়—"

কবিরাজ মহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যাক্, দর্শন হয়ে গেল। সন্ধ্যার বিয়ের সময় আমি ছিলাম না, দেশে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি হ'লে চ'লে আসতাম। কিন্তু রাজপুতানা থেকে আসা যায় না। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আসতে পারলাম না। বসুন—"

শান্তা কবিরাজ মহাশয়ের জন্য দহি-চূড়া-গুড় এবং দুইটি শাল পাতা লইয়া হাজির হইল। কবিরাজ অবিলম্বে উঠিয়া একটু দূরে কূপের নিকট চলিয়া গেলেন এবং কূপের নিকটই উবু হইয়া বসিয়া মাটিতে পাতা দুটি পাতিয়া ফেলিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার একটু সময় লাগিল মুখ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি।

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যাকে বলিলেন, "এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।"

সন্ধ্যা বলিল, "কবরেজ মশাই গরীব, কিন্তু অসভ্য নন। বেশ শিক্ষিত এবং সভ্য।"

"আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই টেবিলটার উপর পাতা দুটো পেতে চেয়ারে বসে খেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না—"

"উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফসল কাটা হয়ে যাবার পর মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানো হতো। আয়োজন যৎসামান্য। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলাপাতা কেটে আনত, আর কয়েকটা মাটির বড় বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে নিত। তাতে ঢালা হতো দই, তার উপর চিঁড়ে আর গুড়। মহানন্দে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। মুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি—"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসুন।"

স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। ছোট গিন্নী তো—"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আরেকজন। চিত্রা—"

"সে-ও এসেছে?"

"আসে নি। আসবে—"

"আসুক, দেখি তাকে পসন্দ হয় কিনা। একে খুব পসন্দ হয়েছে। আপাতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মুচকি হাসিয়া স্বাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্য। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শান্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার দেশ বুঝি রাজপুতনায়।"

"হ্যাঁ, আমাদের ঠাকুরদা অন্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামে ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও, তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হ'লে পয়সা চাই, সে পয়সা আমার কোথা—"

"দেশে আত্মীয়-স্বজন আছে ?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইঁট-গুলোও নিয়ে যাচ্ছে—"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিরাজ সুরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন ?"

"বক্তৃতা করতে –"

"কিসের বক্তৃতা ?"

"রাজপুতদের এক সভা হয়েছিল। আজকাল সবাই তো নিজের ঢোল পিটাতে ব্যস্ত, রাজপুতরাও ব্যস্ত হয়েছিল। অনেক রাজপুত জমা হয়েছিল সেখানে, আমারও ডাক পড়েছিল।"

"কি বললে সবাই ?"

"কি আর বলবে, নিজেদের ঢাক পেটালে খালি। আমরা হ্যান আমরা ত্যান্ এই সব আর কি। টডের রাজস্থান আওড়ালে কেউ কেউ—"

"আপনি কি বললেন—"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি যা বললাম, তাতে চটে গেল সবাই।"

"কেন, কি বলেছিলেন—"

বলেছিলাম, "আমরা নিজেদের যতই বড়াই করি না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে রাজপুতরা অতি নির্বোধ জাতি। উদাহরণও দিয়েছিলাম অনেক। রামচন্দ্রই ধরুন। তাকে কি কেউ বুদ্ধিমান বলবে ! সৎমার উসকানিতে বাবা বললে বনে যাও, অমনি সে বনে চলে গেল। তা-ও গেলি গেলি বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন। বউ নিয়ে কেউ কখনও বনে যায় ? বনে গিয়েও সে যা করলে তা কোনও বুদ্ধিমান লোক করত না। বউ বললে আমাকে সোনার হরিণ ধরে এনে দাও। অমনি ছুটল হরিণের পিছু পিছু। সোনার জীবন্ত হরিণ হওয়া যে সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব—তা সে ভেবে দেখলে না একবার। ছুটল হরিণ ধরতে। তার আগে লক্ষ্মণের ব্যবহারটাও বিবেচনা কর। শূর্পনখা ব্যভিচারিণী তা মানলুম, তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেই

ল্যাটা চুকে যেত, তার নাক কান কাটতে গেলি কেন, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কাজ ? এই সবের ফলেই সীতাহরণ আর লঙ্কাকাণ্ড। এ সব বুদ্ধির পরিচয় নয়। তারপর মহাভারতের গল্পটা ভাবুন। যুধিষ্ঠিরকে কি বুদ্ধিমান লোক বলবেন আপনি ? ও তো একটা জরদ্গব। ধর্মপুত্র মানে কি বোকা ? ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ভীষ্মের চরিত্রে একটু তবু নুন ঝাল আছে, কিন্তু কেমন যেন এক-বগ্গা গোছের। তোর বাপ দুশ্চরিত্র বলে তুই আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করবি কেন। এর কোন মানে হয়। তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কাণ্ডটা দেখুন। তোদের মধ্যে আপোষে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া হয়েছে মানলুম, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ও হামেসাই হয়ে থাকে। তাই বলে ঘরের বউকে সভার মাঝখানে টেনে এনে উলঙ্গ করবি ? আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করবি ? এ যে ছোট লোকেরাও করে না। কর্ণ দুর্যোধন ওরা কি মানুষ ? লম্পট সব। আর ওই অর্জুন লোকটি যেখানে গেছে একটি করে বিয়ে করেছে। ভীমসেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকেও ছাড়ে নি। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা তো পিশাচ, ছোট শিশুকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল অশ্বত্থামা। তারপর ইতিহাসের এলাকায় আসুন। ওই যে পদ্মিনীর গল্প, ও শুনে আপনারা বাহবা বাহবা করেন। আমি তো ওর মধ্যে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীকে দেখতে চাইল তখন তার স্বামী ভীম সিং উত্তর দিলেন-- আমাদের স্ত্রীলোকেরা অসূর্যম্পশ্যা, কারো সামনে বার হয় না। খাশা কথা। কিন্তু আলাউদ্দিন কত বুদ্ধিমান দেখুন, সে বলে পাঠালে আমার সামনে বের হবার দরকার নেই আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমি সন্তুষ্ট হব। ভীম সিং অমনি রাজি হয়ে গেল। বুঝুন। সামনে দেখা আর আয়নায় দেখা তফাতটা কি, দেখে তো নিলে। ফল যা হয়েছিল তাতো জানেনই আপনারা। বোকা, বোকা, সব বোকা। ইতিহাসে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে—সামনে গরুর পাল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, ভাবছে গরু তাদের দেবতা বলে সকলেরই দেবতা ! আজকালকার যুগে আসুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত মানে দারোয়ান, কিম্বা কনেষ্টেবল। ছোৎকা চেহারা, ইয়া গোঁফ, মগজে এক ছটাক বুদ্ধি নেই। মুনিব হুকুম দিলেই মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হচ্ছে, আর ওরা মারপিট করে জেল খেটে মরছে। রাজপুতের ইতিহাস মানে নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস। ওরা মুসলমানদের সঙ্গে পারে ?"

কবিরাজ মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, রাজপুতদের ইতিহাস আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস।"

"ঠিক বলেছ। গৌ মানে এখানে গরু। ওদের গর্জনে হুংকারে আমি তো গরুদের হাম্বারব ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না।"

"রাণা প্রতাপকে শ্রদ্ধা হয় না আপনার ?"

"শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু ওকে বুদ্ধিমান বলতে পারি না। আকবরের সঙ্গে ওর ভাব করা উচিৎ ছিল। আরে, আগে বাঁচতে হবে তো। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানসিং ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু—"

কিন্তু এ আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। কুমারকে দূরে দেখা গেল, তাঁহার কাঁধে বন্দুক ! তাহার পিছনে বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে আসিতেছিল স্টেশনমাস্টারের

ছেলে সুকুমার এবং চাকর ল্যাংড়া। ল্যাংড়ার দুই হাতে অনেকগুলি মরা হাঁস বদ্ধ-পদ অবস্থায় ঝুলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"তুমি শিকার করলে? বাঃ অনেক পেয়েছ দেখছি।"

"দুটো ফায়ার করেছিলাম। জলে পড়ে গেল কয়েকটা, তোলাই গেল না।"

"আজ রাত্রে তাহলে থেকে যাই, কি বল।"

কুমার সুকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই গোটা চারেক নিয়ে যা। চারটেতে কুলুবে তো?"

"দুটোতে যথেষ্ট হবে। মা ওসব খায় না, বাবাও মন্ত্র নিয়েছেন—খাবেন কি না জানি না। আর তো বাড়িতে কেউ নেই। দুটোই নিচ্ছি আমি - "

"বেশ।"

সুকুমার গোটা দুই বড় বড় বেলে হাঁস বাইকের হাতলের দুইধারে বাঁধিয়া লইল।

"আমি চলি তাহলে।"

"আচ্ছা।"

সুকুমার টপ করিয়া নিজের নূতন বাইক্‌টাতে চড়িয়া বসিল। এই শিকার-উপলক্ষে নিজের বাইক্‌টাতে যে বারবার চড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী। এখানে বাইক চড়িবার সুযোগই নাই, বাজারে বা পোস্টাফিসে কতবার আর যাওয়া যায়। আজ সে অনেক সুযোগ পাইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই বাইক্‌টা ঠেলিয়া তাহাকে কুমারের পিছু পিছু চলিতে হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বাইক্‌-টাকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তো। বালুয়াচকে যখন হাঁস পাওয়া গেল না তখন বাইকে চড়িয়া সে-ই গঙ্গার ধারে গিয়া খবর আনিল যে কাজিগ্রামের বাঁকটায় অনেক হাঁস আছে, সেখানে বসিবার বেশ ভালো একটা আড়ালও আছে। বাইক করিয়া এ খবর না আনিলে কুমারবাবু বালুয়াচক হইতেই ফিরিয়া আসিতেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমিই রাঁধবে নাকি।"

"হ্যাঁ।"

"বাঃ, তাহলে তো গ্র্যান্ড হবে। কিন্তু একটু অনুরোধ আছে কুমারবাবু।"

"কি?"

"খুব বেশী লঙ্কা দিও না। আমি অর্শের রুগী তো। আর বেশী লঙ্কা খাওয়াটা তোমাদের পক্ষেও ভালো না।"

"বেশ, তাই হবে।"

কুমার তখন ল্যাংড়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই হাঁসগুলো ছাড়িয়ে কুটে এখানে ঠিক করে রাখ। এখন ওগুলোকে ওই কেরোসিন কাঠের সিন্ধুকটার ভিতর ঢুকিয়ে রেখে দে। তারপর বাড়ি থেকে বাসনপত্তর, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন আর তোলা উনুনটা নিয়ে আয়। সব ঠিক হ'য়ে গেলে তারপর উনুনের আঁচটা দিয়ে দিস্‌।"

ল্যাংড়া এসব কাজ করিয়া অভ্যস্ত, সে কাজে লাগিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "মাংস কি এখানে রাঁধবে নাকি?"

"বাড়িতে যে কাকাবাবু রয়েছেন। বৌদি এসব হাঙ্গাম বাড়িতে করতেই দেবেন না। এমনি হাঁসটাঁস মারাতে ওঁর মনে মনে আপত্তি যথেষ্ট। এখানেই বেশ হবে।"

"বেশী ঝালটি কিন্তু দিওনা বাপু—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "ডাক্‌রোস্টই তো ভালো সবচেয়ে।"

"সে আর একদিন খাওয়াবো আপনাকে। আজ কারি হোক।"

"কি কি হাঁস পেয়েছেন। চখা তো রয়েছে দেখছি। ওগুলো কি—"

"বেশীর ভাগই টিল। আর ওই বড়টা Spoonbill। এদেশে বলে পসুনি ঠোরা।"

সন্ধ্যা নাকটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঁশটে গন্ধ হবে না তো?"

"না। ঠেসে পেঁয়াজ রসুন দেব।"

সন্ধ্যা দূরে চাহিয়া বলিল, "মেজদি আসছে। এবার বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত হও।"

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ঊষা আসিতেছে। তাহার গায়ের লাল র‍্যাপারটা প্রতিফলিত সূর্য কিরণে আগুনের মতো দেখাইতেছিল। দূরে হইতে তাহাকে মূর্তিমতী রোষবহ্নির মতোই দেখাইতেছিল বটে কিন্তু নিকটে আসিতে দেখা গেল সে হাসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া সে আর একটু হাসিল এবং আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"আরে আরে আমাকে প্রণাম করছিস কি! তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বউ, আমি ছত্রি।"

"বাঃ, আপনি যে কাকাবাবু—"

"এই কাণ্ড দেখ।"

তাহার পর ঊষা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাবে না? ক'টা বেজেছে জান?"

"তা তো জানিনা, ঘড়ি কাছে নেই।"

সন্ধ্যার হাতে সুদৃশ্য একটি রিস্ট-ওয়াচ ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দেড়টা।"

"এতক্ষণ বসে গল্প করছিলি, তোর হুঁস থাকা উচিত ছিল।"

"কবরেজ কাকা এসে পড়লেন যে।"

ঊষা হাসিমুখে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব গল্প জমিয়েছিলেন বুঝি। আহা, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু চল সব, আর দেরি নয়। রান্না হ'য়ে গেছে, বাবা তোমাদের সকলকে নিয়ে খাবেন বলে অপেক্ষা করছেন। ওগুলো কি—"

ঘরের বারান্দার উপর স্তূপীকৃত হাঁসগুলি এইবার সে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছোটদা মেরে এনেছে।"

"ও বাবা, এত বেলায় অত তত্ত্ব এখন করবে কে।"

"আমি এখানেই রান্না করব।"

"তুমি তো শুধু খুন্তি নাড়বে। মালপত্তর হাঁড়িকুড়ি ঘি তেল মশলা সব বয়ে বয়ে আনতে হবে। কে করবে অত কাণ্ড!"

কুমার বলিল, "তুই ভাবছিস কেন, ল্যাংড়া করবে সব।"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকব ছোটকাকা"—স্বাতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

ঊষা ল্যাংড়ার নিকট আগাইয়া গেল এবং তাহাকে আদেশ করিল, "দেখ মেটেগুলো সব আলাদা করে রাখিস। আলাদা চচ্চড়ি হবে।"

কবিরাজ মহাশয় স্মিতমুখে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছিল না, মুগ্ধ অভিভূত হইয়া তিনি কেবল দেখিতেছিলেন ইহাদের, লোকে যেমন ভালো ফুলের বাগান দেখে।

ল্যাংড়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঊষা বলিল, "চল, চল, আর দেরি নয়। বাবা অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। গগনের বউ গীটার বাজিয়ে শোনাবে বাবাকে। কাকাবাবু চলুন, গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। কাকীমা কেমন আছেন। ভালো আছেন তো—"

"খুব প্রবলভাবে ভালো আছেন। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, কিন্তু বুড়ি হয়নি। এখনও শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খায়। যখন কথা বলে মনে হয় কামান গর্জন করছে। তার ভয়েই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—"

"খুব বকেন বুঝি আপনাকে।"

"আমি ছাড়া আর কাকে বকবে। আর তো কেউ নেই।"

কবিরাজ হাসিমুখে ঊষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঊষার সহসা মনে পড়িল কবিরাজ-কাকার দুটি মেয়ে ছিল। দুইটি গিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল সে।

কবিরাজ বলিলেন, "আমি যখন থাকি না তখন ভগবানকে বকে। বকে আর কাঁদে। চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও বকে। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা ভগবানের কান নেই, আর মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম। সবাই মরবে। আগে আর পিছে। বলি কিন্তু বোঝে না।"

হঠাৎ এই শোকাবহ পরিস্থিতির চেহারা বদল হইয়া গেল পোস্টমাস্টারবাবুর আবির্ভাবে। তিনি একটি টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছেন।

"পিওনটা ফেরেনি এখনও। তাই আমিই নিয়ে এলাম।"

কুমার সানন্দে অনুভব করিল রাধানাথবাবুর ঔষধ ধরিয়াছে।

টেলিগ্রাম খুলিয়া কুমার বলিল, "সেজদা কাল আসছে।"

ঊষা সানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

"সেজবৌদিও আসছে তো।"

"হ্যাঁ। লিখেছেন—Reaching with family."

"বাবা শুনে খুব খুশী হবেন। উনি ভাবছেন মেজদার কোন খবর নেই?"

"এখনও পাইনি তো—"

"কি যে কাণ্ড মেজদার—"

কবিরাজ মহাশয় সান্ত্বনা দিলেন।

"দেখ সবাই যদি এরকম হতো তাহলে একরাঙা হয়ে যেত দুনিয়াটা। ভগবান দু'টি মুখ একরকম করেননি। হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচরকম। পৃথুবাবু নতুন সুর বাজিয়েছে একটা। যখন শুনব তখন ভালোই লাগবে মনে হয়—"

রঙ্গনাথ পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে যে সব কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহাই টুকিয়া রাখিতেছিলেন। এরকম খাপছাড়া ডায়েরি লেখা তাঁহার স্বভাব।

স্বাতী সহসা চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট পিসি, তোমার পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা পোকা বসেছে—"

সন্ধ্যা নিজের মনে দস্তানা বুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল দিদি আসিয়াই কবিরাজ-কাকাকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে তো করে নাই। অন্যায় হইল কি? সকলকে প্রণাম করা কি উচিত? কেবল প্রণম্যদের প্রণাম করাই ঠিক। কিন্তু সত্যই কি কেহ প্রণম্য আছে—এই সব কথা ভাবিতেছিল সে। ভাবিতেছিল ইহা লইয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবে। স্বাতীর কথায় সে লাফাইয়া উঠিল না। মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিল, "ফেলে দে না—"

"ও বাবা, ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারব না। প্রকাণ্ড বড়—"

ঊষা বলিল, "গঙ্গা ফড়িং। গঙ্গায় কত জল জিগ্যেস করলেই পা তুলে দেখাবেন গঙ্গায় কত জল—ওই দেখ পা তুলেছে। বাঃ সুন্দর সবুজ ফড়িংটি তো। এত বড় প্রায় দেখা যায় না। যাক আমি ফেলে দিচ্ছি—"

রঙ্গনাথ মৃদু হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঘের কবলে পড়েছিলে—"

"তার মানে?"

"পোকার জগতে গঙ্গা ফড়িং হচ্ছে বাঘ।"

দূরে দেখা গেল শান্তা আসিতেছে।

"ওই শান্তা আবার আসছে। চল, চল, বৌদি রাগ করছেন ঠিক—"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুমার পোস্টমাস্টারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পাখীর মাংস খান তো।"

"খাই—"

"তাহলে আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবেন। হাঁস শিকার করেছি আজ—"

"হ্যাঁ. বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু আগে।"

"রাত্রি দশটা নাগাদ আসবেন।"

"আচ্ছা।"

পোস্টমাস্টার অন্তরের অন্তস্থলে যাহা অনুভব করিলেন তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত একটা আনন্দ হইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বাতী শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। দেখা গেল বাগানের বাহিরেই যে মাঠটা আছে সোমনাথ সেখানে এক দুই তিনকে লইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। এক লাটাই ধরিয়া আছে, চমৎকার একটি লাল ঘুড়ি আকাশে উড়িতেছে।

ঊষা বলিল, "ওদের নিয়ে এমনিই তো আমি নাকানিচোবানি খাচ্ছি, এর উপর তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে তো আমি আর পেরে উঠব না, হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। চান টান হয়ে গেছে তোমার?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, "ভোরেই তো চান করেছি।"

"চল এখন খাবে চল। এই এক ঘুড়ি লাটাই থাক এখন, খাবি চল—"

এক ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "বাঃ, একটু আগেই তো লুচি তরকারি পেট ভরে খেয়েছি। আমার এখন খিদে পায় নি।"

দুই বলিল, "আমারও পায় নি।"

তিন বলিল, "আমালও।"

তিনের বয়স যদিও ছয়, কিন্তু তাহার আধো-আধো কথা এখনও আছে, এখনও সে পরিষ্কারভাবে 'র' উচ্চারণ করিতে পারে না।

ঊষা ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাদের তো কোন সময়েই খিদে পায় না, ঘাড় ধরে খাইয়ে দিতে হয়। চল, যা পার খেয়ে নেবে। বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে তোমাদের জন্য।"

সুতো গুটাইতে গিয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। বাবলা গাছে ঘুড়িটা আটকাইয়া শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল।

"ওই যাঃ—এ কি হ'ল।"

এক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও ঠিক করে দেব আমি। তাছাড়া গঙ্গাকে আরও চারটে ঘুড়ি, দুটো লাটাই, আর অনেক সুতো আনতে দিয়েছি আমি। চল না, খেয়ে দেয়ে আবার ওড়ানো যাবে—"

ছেঁড়া ঘুড়িটা গুটাইয়া সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল আবার।

॥ ১৩ ॥

সূর্যসুন্দরের ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি প্রকাণ্ড হলের মতো। সকলেরই বেশ কুলাইয়া গেল। সূর্যসুন্দরের বিছানার পাশে যে তেপায়াটা ছিল তাহার উপর প্রকাণ্ড একটি কাঁসার গ্লাসে ডালসুদ্ধ এক ঝাঁক রক্তজবা শোভা পাইতেছিল। পুরসুন্দরী গ্লাসটি কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের বাবার গ্লাস, ওই গ্লাসেই তিনি প্রত্যহ নাকি জল পান করিতেন। অত বড় গ্লাস আজ-কাল দেখা যায় না, যেমন বড় তেমনি ভারী। খালি গ্লাসটাই কিরণ সহজে একহাতে তুলিতে পারে নাই। জলভরতি এই গ্লাস ঠাকুরদা প্রত্যহ এক হাতে অবলীলাক্রমে তুলিতেন, এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দর গ্লাসটিতে জল ভরাইয়া তাহাতে কিছু জবাফুল সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জবাফুল তাঁহার বাবার খুব প্রিয় ছিল, প্রত্যহ জবাফুল দিয়া কালীপুজা করিতেন তিনি। শেষ-জীবনে নিজের বাসার আঙিনায় দুইটি জবার গাছও তিনি পুঁতিয়াছিলেন। এই গাছ দুইটির এবং তাঁহার পোষা হরিণটির সেবা করা তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। পোষা হরিণের শিং দুইটিও সূর্যসুন্দর সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটি সামনের দেওয়ালেই টাঙানো ছিল। তাহাদের ঘিরিয়াও জবাফুলের মালা দুলিতেছিল। আজ সহসা তিনি যেন একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাবার স্মৃতিচিহ্নগুলিকে সাজাইয়া একটু যেন বেশী তৃপ্তি পাইতেছিলেন। এই সবের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর শুধু বাবাকেই নয়, পৃথ্বীশকেও যেন স্পর্শ করিতে চাহিতেছিল। তিনি তাঁহার মনের ভাব অবশ্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি জানেন কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলে এ সবের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। আপনার মনেই মশগুল হইয়া বসিয়াছিলেন তিনি। পত্নী রাজলক্ষ্মীর অয়েলপেন্টিংখানাও সামনের দেওয়ালেই বিলম্বিত ছিল। ঊর্মিলা তাহাতেও একটা কুন্দফুলের মালা টাঙাইয়া দিয়াছিল।···একটা কাঁসার গ্লাস, এক জোড়া হরিণের শিং, আর রাজলক্ষ্মীর ছবিটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে জগত মনে মনে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্বপ্নও নহে, বাস্তবও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত

জগত। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন এই যে আজ তিনি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিনী-নাতবৌ লইয়া খাইতে বসিয়াছেন ইহাতে তাঁহার বাবা এবং রাজলক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে উপস্থিত আছেন। পৃথ্বীশও। তিনি ডাক্তার, এই সেদিন পর্যন্ত প্র্যাক্‌টিস করিয়াছেন, মানুষের স্থূল শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার ছিল। কিন্তু স্থূল শরীরের কারবার করিতে করিতেই এমন সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যাহার তাৎপর্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথোলজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সূক্ষ্মপথে রহস্য লোকে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মর্ম বোঝা যায়। পরলোক বলিয়া যে কিছু একটা আছে তাহার আভাস একাধিকবার তিনি ইহজীবনেই পাইয়াছেন। সেদিন বিশেষ করিয়া চৌধুরীজির কথাটা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। বছর দশেক আগে চৌধুরীজির মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন, চৌধুরীজির শেষ চিকিৎসাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রায় বারোঘণ্টা পূর্বে চৌধুরীজি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। শেষে কাহাকেও আর চিনিতেছিলেন না। বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝা যাইতেছিল না। সূর্যসুন্দর সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া খাওয়াইতে হইতেছিল, ঔষধের সবটা পেটেও যাইতেছিল না, কস বাহিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। চৌধুরীজির বড় ছেলে ফাগুবাবু রাত্রি দশটা নাগাদ শুইতে গেলেন। তাঁহারও জ্বর হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরই জোর করিয়া তাঁহাকে শুইতে পাঠাইলেন। যখন ঘটনাটি ঘটিল তখন রাত্রি একটা! সূর্যসুন্দরেরও একটু ঢুল আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন—নিশীথ নীরবতাকে বিদীর্ণ করিয়া যেন কে ডাকিতেছে—ছক্‌কু, ছক্‌কু, চল আমি এসেছি। ডাকটি শুনিবামাত্র চৌধুরীজি তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সূর্যসুন্দর দেখিলেন, তাঁহার আচ্ছন্নভাব নাই—চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল।

"ছক্‌কু ছক্‌কু বলে কে ডাকলে না?"

"হ্যাঁ।"

"শুনেছেন আপনি?"

চৌধুরীকে বেশ উত্তেজিত বোধ হইল।

"শুনেছি। কেউ বোধহয় চাকর-টাকরকে ডাকছে। ছক্‌কু বলে আপনাদের কোন চাকর আছে কি? যাই হোক আপনি উঠেছেন যখন—তখন এই ওষুধটা খেয়ে নিন।"

"না, আমি আর ওষুধ খাব না। বাবুলাল আমাকে ডাকতে এসেছে, আমারই ডাক নাম ছক্‌কু।"

সূর্যসুন্দর একথা জানিতেন না।

"বাবুলাল কে?"

"আমার বাল্যবন্ধু। অনেকদিন আগে মারা গেছে। কথা ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যুকালে ডাকতে আসবে। বাবুলাল ডাকতে এসেছে। আমি চললাম—"

চৌধুরীজি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ঘটনাটা মনে পড়িবার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু মন্মথকে মনে পড়িল। সে-ও

তো অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। সে কি তাঁহার মৃত্যুকালে ডাকিতে আসিবে? কোনও কথা হয় নাই তো।

কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"চম্পাকে আগেই খাইয়ে দিলুম। গগনের জেদ! গগন বলছে তোমরা যখন খাবে তখন চম্পা এই কোণের ঘরে বসে গীটার বাজাবে। তুমি গীটার শুনতে চেয়েছ না কি?"

"হ্যাঁ।"

"বৌদি কিন্তু খুব চটে গেছে। বলছে শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী-দেওর কেউ খায়নি ও আগে খাবে কেন?"

"তাতে কি হয়েছে। শাশুড়ীর ধারা ধরেছে দেখছি বড় বউ। ও পোয়াতি মানুষ, ওকে আগেই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডেকে দাও বলে দিচ্ছি।"

"ডাকতে হবে না, আমি বসিয়ে দিয়েছি। খাবে তো ভারি। আমি ঊর্মিলাকেও বসিয়ে দিয়েছি, ও তো আপনাকে খাওয়াবে।"

কিরণ আবার চলিয়া গেল।

ঠিক পাশের ঘরেই চম্পা গীটার বাজাইতেছিল।

সুরের এমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ হইয়াছিল যে কিছুই যেন বেমানান মনে হইতেছিল না। মলিন জামাকাপড়-পরা খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি কবিরাজ মহাশয় ফিটফাট সদানন্দের পাশে বসিয়া খাইতেছিলেন, গগন একটা ডগমগে রঙের সিল্কের ঢিলা পাজামা পরিয়া খাইতে বসিয়াছিল, রঙ্গনাথ কাঁটা চামচ দিয়া খাইতেছিলেন। কিরণ, ঊষা আর সন্ধ্যা পাশাপাশি বসিয়াছিল এবং নিম্নকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, বীরুবাবু খাইতে খাইতেও ছোট একটা বই বাঁ হাতে ধরিয়া পড়িতেছিলেন— ইজিপ্টের সম্বন্ধে বই, সন্ধ্যা-বেলা নাতিদের গল্প বলিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। চন্দ্রসুন্দর সকলের নিকট হইতে একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া আলাদা একধারে বসিয়া নিরামিষ সাত্ত্বিক ভোজন করিতেছেন, হাবু মামা একটা রঙীন লুঙ্গী পরিয়া একটি কাষ্ঠাসনের উপর উবু হইয়া বসিয়া খাইতেছিলেন, আর পাঁচজনের মতো সুখাসনে বসিয়া তিনি সুখ পান না। তাঁহার খাইবার ধরণটিও একটু অভিনব, খাবারগুলি যেন মুখের মধ্যে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিতে-ছিলেন। সূর্যসুন্দর বিছানার উপর বসিয়াই খাইতেছিলেন। তাঁহার সামনে এবং দুই পাশে ছোট ছোট টেবিল, পিছনে ঠেস দিবার জন্য ব্যাক্‌রেস্ট। ঊর্মিলা গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধিয়া দিয়াছিল, কোলের উপর আর একটি বড় তোয়ালে পাতা ছিল, খাবার পড়িয়া যাহাতে কাপড়-চোপড় বা বিছানা নষ্ট না হয় ঊর্মিলা সে বিষয়ে সতর্ক হইয়াছিল। ঊর্মিলাই চামচে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াও দিতেছিল। এইরূপ নানা-রকম বিসদৃশ দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছিল ঘরটিতে। কিন্তু গীটারের সুরের আবহাওয়ায় সব যেন মানাইয়া গিয়াছিল।

সূর্যসুন্দর প্রতিটি তরকারি তারিফ করিয়া খাইতেছিলেন। তিনি সেকালের লোক, তাঁহার মতে কোনও শিল্প-কর্মের সম্যক প্রশংসা না করিলে শিল্পীর অপমান করা

হয়। খাবার খাইয়া, গান শুনিয়া বা যে কোন শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিয়া প্রশংসা না করাটা তাঁহার মতে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে কৃপণ-স্বভাবের, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারে না, মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে। অনেক সময় হাসেও না, গোমড়া মুখ করিয়া সুখাদ্য খায় অথবা ভালো গানবাজনা শোনে। তিনি এ জাতের লোক নন, তাই রান্নার অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। সুক্তোটা বিশেষ করিয়া তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল। পুরসুন্দরী স্বহস্তে এটি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ব্যঞ্জনটির প্রতি শ্বশুরের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি জানিতেন। প্রশংসা শুনিয়া আর একটু আনিয়া দিলেন। কোনও রান্নার প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা আর একবার আনিয়া না দিলে মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এটাও তাঁহার মতে অভদ্রতা।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিতেছিলেন কবিরাজ মহাশয়। তাঁহাকে প্রতিটি পদ কখনও দুইবার, কখনও কখনও তিনবারও দিতে হইতেছিল। পার্বতী একা তাঁহাকেই পরিবেশন করিতেছিলেন।

পুরসুন্দরী পরিবেশন করিতেছিলেন সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরকে।

কেবল নিরামিষ রান্না লইয়াই ছিলেন তিনি।

"দিগন্ত এই ফ্রাই চারটে নিয়ে যা আমার কাছ থেকে—"

গগন দিগন্তর দিকে চাহিয়া আদেশের সুরে বলিয়া উঠিল।

পার্বতী বলিল, "তুমি খাও না, ফ্রাই তো রয়েছে অনেক—"

গগন এ কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় দিগন্তকে লক্ষ্য করিয়া ডাক দিল—

"নিয়ে যা এগুলো—"

দিগন্ত কৃষ্ণকান্তের পাশে বসিয়া খাইতেছিল, সে উঠিয়া গিয়া গগনের নিকট হইতে প্লেটটা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যা মন্তব্য করিল, "নিজে ডাক্তার হ'য়ে কি করে যে এঁটো তুই অপরকে খাওয়াস।"

গগন একথারও কোন জবাব দিল না, তাহার চোখের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল শুধু। ব্যাপারটার তাৎপর্য কেবল বুঝিলেন পুরসুন্দরী। নিজের খাবারের কিছু অংশ দিগন্তকে দিতে না পারিলে গগনের যেন খাইয়া তৃপ্তিই হয় না। ছেলে-বেলা হইতে ওই স্বভাব। পেয়ারায় এক কামড় দিয়া বাকিটা সে দিগন্তকে বরাবর খাওয়াইয়াছে।

পার্বতী ছাড়িবার মেয়ে নয়।

"ফ্রাই ভালো হয়নি সেকথা মুখ ফুটে বললেই হয়। দিগন্তকে দিয়ে দেবার দরকার কি?"

গগন সংক্ষেপে বলিল, "ফ্রাই ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে।"

"তবে দিয়ে দিলে কেন, আরও এনে দেব?"

"দে যখন ছাড়বি না।"

পার্বতী ফ্রাই আনিতে যাইতেছিল। কিরণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জামাইবাবুদের ভালো করে জিগ্যেস কর—আর কি চাই। তোমার বড় জামাইবাবুটি বেশ খাইয়ে লোক—"

"আচ্ছা—"

পার্বতী প্রচুর ফ্রাই আনিয়া আবার সকলকে দিতে লাগিল।

চন্দ্রসুন্দর একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পুরসুন্দরী পবিত্রভাবে আলাদা রান্নাঘরে তাঁর জন্য নিরামিষ রান্না করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন, নিরামিষ তরি-তরকারিও নানারকম হইয়াছে, সে বিষয়েও খুঁত ধরিবার কিছু নাই, তবু কিন্তু চন্দ্রসুন্দর যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার সামনে বসিয়া ছেলে-মেয়ে-জামাই একসঙ্গে খাইতেছে, ইহা তাঁহার আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই, ইহার মধ্যে তিনি বৈদেশিক উচ্ছৃংখলতার আভাস পাইতেছিলেন। গগনের ঢিলা পাজামা, রংগনাথের কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, চম্পার গীটার বাজানো—কোনটাই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ দাদাই এসব প্রশ্রয় দিয়াছেন। দাদার ছেলে-মেয়ে জামাইদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যা-বৈভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু তাহাদের বিদেশী চাল-চলন মোটেই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনি মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতে-ছিলেন—মজা বুঝিবেন পরে, অতি বাড় ভালো নয়। এ কথাও তাঁহার মনে হইতেছিল সবই অদৃষ্টের খেলা, তা না হইলে তাঁহার অমন ভালো ছেলে, যাহারা দুইবেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল খায় না, তাহাদের এ দুর্দশা কেন। পার্বতী যখন প্রচুর চিংড়ি মাছের ফ্রাই আনিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন সহসা চন্দ্রসুন্দর যেন অনুভব করিলেন তাঁহার গলার ভিতরটা কুটকুট করিতেছে। জিবের পাশটাও। মনে পড়িল বাড়ির পাঁদাড় হইতে কুমার প্রচুর ওল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে এবং সংগে সংগে তিনি ভাবিলেন বৌমা ঠিক সেই ওল এই পাঁচ-মিশেলি ছ্যাঁচড়ার মধ্যে দিয়াছে। সহসা তাঁহার গলাটা খুব বেশি কুটকুট করিতে লাগিল। তিনি এক টুকরো লেবুতে নুন মাখাইয়া চুষিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নিরুপায় ক্ষোভ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ছেলে-মেয়ে জামাইদের জন্য পোলাও কোর্মা কাবাবের আয়োজন করিয়া বড় বউ তাঁহার জন্য কেবল কতকগুলা শাক পাতা আর ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে কিন্তু কিছুই বলিলেন না, কেবল সশব্দে লেবুটা চুষিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা পুরসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইল না। বাম হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কাকাবাবু, খাচ্ছেন না যে। আর একটু ডাল এনে দেব ?"

"বুনো ওল না শুকিয়েই তরকারিতে দিয়েছ মা, গলা কুটকুট করছে—"

"ওল তো রান্না হয়নি আজ।"

"গলা কিন্তু কুটকুট করছে।"

চন্দ্রসুন্দর মুখটা উঁচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া গলা চুলকাইতে লাগিলেন। ইহাতে একটু রসভংগের মতো হইল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "তুই বোধহয় লংকা চিবিয়ে ফেলেছিস। দুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল।"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গরম গরম লুচি ভেজেছি। পায়েস দিয়ে তাই না হয় খান। ওসব খেতে হবে না, এই বাটিতেই হাতটা ধুয়ে ফেলুন—"

তাহাই হইল। চন্দ্রসুন্দর অসহায়ের মতো মুখ করিয়া পায়েস দিয়া গরম লুচি খাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে চম্পা গীটারে 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটা বাজাইতেছিল। গগন নিমীলিত নয়নে কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে মনে মনে গাহিতেছিল 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'···।

সূর্যসুন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই সুস্থ পায়ের পাতাটা নাড়িয়া তাল দিতেছিলেন।

ইহা যে অসুখের বাড়ি তাহা মনেই হইতেছিল না। মনে হইতেছিল এক অভিজাত খাম-খেয়ালী বৃদ্ধকে ঘিরিয়া উৎসব চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত মৃদুকণ্ঠে রঙ্গনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শাক ভাজাকে যদি ফ্রাই বলা যায়, তাহলে কি খুব ভুল হবে ?"

"হওয়া তো উচিত নয়। হঠাৎ এ কথা মনে হলো কেন ?"

"চলতি কায়দা অনুসারে তাহলে পার্বতীকে ফরমাস করি।"

"করুন।"

"পার্বতী আমার জন্যে একটু পালং ফ্রাই নিয়ে এসো তো।"

"সে আবার কি !"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "পালংশাক ভাজা চাইছেন।"

"চিংড়ির ফ্রাই খেয়ে শাক ভাজা খাবেন ?"

"খাব। রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমৎকার হয়েছে ওটা।"

কিরণ নিম্নকণ্ঠে মন্তব্য করিল—"সবই অদ্ভুত।"

ঊষা সহসা উঠিয়া এক-দুই-তিনের কাছে গেল। তাহার মনে হইল তাহারা খাইতেছে না।

"আয় খাইয়ে দি তোদের। পাগল করে দিবি দেখছি আমাকে। খাচ্ছিস না ঘাঁটচিস কেবল। সরে আয়—"

স্বাতী সোমনাথকে শুনাইয়া ঊষার কানে কানে বলিল, "প্রতিটি তরকারী আজ ঝালে পুড়িয়েছে পার্বতী। কি করে যে খাই—"

আসলে প্রতিটি তরকারি তাহার খুব ভালো লাগিতেছিল কিন্তু তাহার শ্বশুর-বাড়িতে একেবারে অঝালা রান্না হয়, ভণ্ডামি করিয়া সোমনাথকে তাই সে জানাইয়া দিল যে ঝালে-পোড়া তরকারি তাহার পক্ষেও সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সোমনাথ বলিল—"আমার তো চমৎকার লাগছে।"

ঊষা স্বাতীর পাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর পাতে তো কিছু পড়ে নেই।"

স্বাতী মুচকি হাসিয়া বলিল, "উঃ, যা করে খেয়েছি, পাছে পার্বতী কিছু মনে করে।"

হঠাৎ প্লেট হাতে করিয়া মিস্ বোস (ওরফে অনু) আসিয়া প্রবেশ করিল।

"বাঃ, আমাকে আলাদা করে তাঁবুতে খেতে দিয়েছেন কেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে খাব—"

স্বাতীর পাশেই সে বসিয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

কুমারের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ হইতেই উঠিবার জন্য উসখুস

করিতেছিল। সে বলিল, "আমি এবার উঠি, তিনটে বেজে গেছে। আপনারা খান। আমি বাগানে গিয়ে হাঁসগুলোর ব্যবস্থা করি গিয়ে—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ উঠে পড় তুমি কুমারবাবু। ও ব্যাপারটা বেশ ঝঞ্ঝাটের, সময় লাগবে।"

কুমার উঠিয়া পড়িল এবং একটু পরে একটা পেট্রোম্যাক্স আলো লইয়া চলিয়া গেল।

সূর্যসুন্দর হঠাৎ বলিলেন, "চম্পাও এই ঘরে এসেই বাজাক না। ওঘরে বেচারি একা একা থাকবে কেন, এইখানেই আসুক।"

পুরসুন্দরীর ইহাতে আপত্তি ছিল, চন্দ্রসুন্দরের তো ছিলই।

পুরসুন্দরী শ্বশুরের কথায় প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেবল বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখানে বসবার জায়গা কোথা।"

সূর্যসুন্দর গগনের দিকে চাহিলেন।

গগন সোৎসাহে দিগন্তকে আদেশ করিল—"ওই কোণের দিকে বড় মোড়াটা পেতে দে না—তা হলেই হবে।"

দিগন্ত এঁটো হাতেই উঠিয়া বড় বেতের মোড়া খালি কোণটায় পাতিয়া দিল। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, দাদু তোমাকে এইখানেই আসতে বলছেন মোড়া পেতে দিয়েছি, এস।"

গীটারটি হাতে লইয়া চম্পা আনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটিতে সুন্দর মানাইয়াছিল তাহাকে।

গগন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন একটা কিছু ধর। দাদু, কি বাজাবে।"

সূর্যসুন্দর উদ্ভাসিত মুখে চম্পার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন রাজলক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে তাঁহার নাত-বৌটিকে দেখিতেছে।

"ফরমাসটা তুমিই কর—"

"না তুমি কর—"

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী—এ গানটা বাজাতে পারে কি?"

চম্পা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পারে।

"তবে ওইটেই হোক, গগনের ওইটেই তো মনের কথা—"

চম্পার মস্তক আর একটু নত হইয়া গেল।

একটু পরেই গীটারে গানটা বাজিতে লাগিল।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নিকট বসিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের কুলবধূ গীটার বাজাইয়া গুরুজনদের সম্মুখে বাইজিদের মতো লালসার গান গাহিতেছে ইহা অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে! মনে মনে তিনি 'ছি ছি ছি' করিতেছিলেন—কিন্তু বাহিরে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না, স্বয়ং সূর্যসুন্দরের হুকুম। তখন তিনি পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বড় বৌ তোমার পায়েসটাও একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে—"

"তাই না কি, অত বুঝতে পারি নি তো—"

হাবু-মামা নিষ্পলক-নেত্রে চন্দ্রসুন্দরের দিকে চাহিয়াছিলেন।

চোখোচোখি হইতেই বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া মুচকি হাসিলেন একটু। তাহার পর চাহিলেন শূন্য পায়েসের বাটিটার দিকে, আবার বার দুই নিশ্বাস টানিয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন।

গীটারে বাজিতে লাগিল—

সখি জাগো—
মেলি রাগ-অলস আঁখি
অনুরাগ-অলস আঁখি
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখি জাগো—।

সূর্যসুন্দর বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে তিনি চাহিতেছিলেন বটে কিন্তু তিনি মনে মনে দেখিতেছিলেন সেই লজ্জিত বধূটিকে, তাহার নামও রাজলক্ষ্মী ছিল, কিন্তু সে এই ছবির রাজলক্ষ্মী নয়। তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল।

॥ ১৪ ॥

আহারান্তে হাবু-মামা কবিরাজী ঔষধ 'চুরণ' খাইবার জন্য চন্দ্রসুন্দরের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরসুন্দরী একটি শ্বেত পাথরের ছোট বাটিতে চন্দ্রসুন্দরের জন্য পান ছেঁচিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রসুন্দর তাহাই চিবাইতেছিলেন। হাবুল-মামার মুখে পান নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

"পান খাও নি ?"

"আগে 'চুরণ'টা খেয়ে নি, তারপর খাব। একটু গুরুভোজন হয়েছে আজ। অনেক-দিন এসব খাওয়া অভ্যেস তো নেই। তুমিও নানা বায়নাক্কা করলে বটে, কিন্তু মন্দ খাওনি।"

"এ সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে খেয়ে তৃপ্তি হয় না মামা। ওই ফ্রাই না কি, এমন বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ছিল, পেঁয়াজের কাঁচা রস দিয়েছে না কি দিয়েছে ভগবানই জানেন।"

হাবু-মামা বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি খড়্গপুরে কত দিন ছিলে—"

"বছর দুই। কেন বল তো—"

"আমি যে কোয়ার্টারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেই কোয়ার্টারেই বরাবর ছিলে ?"

"হ্যাঁ। কোয়ার্টারটি তো ভালোই ছিল।"

"কি করে ছিলে তাই ভাবছি।"

"কেন। কোন কষ্ট ছিল না, দক্ষিণ পূব পশ্চিম তিন-দিকই খোলা—"

"কিন্তু তোমার বাড়ির লাগোয়া থাকতেন এক মৌলভী সাহেব। তাঁর বাড়ির

পেঁয়াজ ভাজার শব্দ পর্যন্ত তোমার ঘরে বসে শোনা যেত। গন্ধ তো পাওয়া যেতই। তাঁর মুর্গি তোমার উঠোনে বারান্দায় রোজ উড়ে আসত এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে দু'বচ্ছর কাটালে কি করে ?"

"পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ছিলুম। কি করব বল। দারিদ্র্যো দোষো গুণরাশি-নাশী !"

হাবু-মামা মুচকি হাসিলেন এবং চুরণটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চকিত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। গেলেন কম্পাউন্ডারবাবুর কাছে।

গগন চুপি চুপি আসিয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপেল স্টাফিং কেমন খেলে দাদু ? ভালো লাগল ?"

"চমৎকার। আগে কখনও খাইনি।"

"তোমাকে এবার একটা পর্তুগীজ তরকারি খাওয়াব।"

"কি।"

"টম্‌ফ্র্যাডু—"

"সে আবার কি। মাংস না মাছ ?"

"লাউ। ছোটকাকার অনেক লাউ হয়েছে দেখছি। কাল করাব চম্পাকে দিয়ে।"

"বেশী খাটিও না ওকে—"

"দিন-রাত তো বসেই আছে। বাজনা কেমন শুনলে—"

"খাসা।"

"গানও মন্দ গায় না। সন্ধের পর গাইতে বোলো, গাইবে।"

ঊর্মিলা আসিয়া পড়াতে এসব গোপন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গগন ছোট-কাকীর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার দেখা হইয়া গেল দিগন্তের সঙ্গে।

"দিগন্ত, ননীকে একটা টেলিগ্রাম করে দে তো। ইংরেজি বাংলা কয়েক রকম পাক-প্রণালী যেন পাঠিয়ে দেয় কিনে। আপেল স্টাফিং খুব ভালো লেগেছে দাদুর। দাদুকে রোজ একটা করে নতুন রান্না করে খাওয়াক না চম্পা। এখনি টেলিগ্রামটা করে দে। আরজেন্ট টেলিগ্রাম করিস। আমার স্যুটকেসে টাকা আছে, তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নে—"

"টাকা আছে আমার কাছে।"

"তাহলে যা। একটা চিঠিও লিখে দিস।"

"আচ্ছা—"

বৃহস্পতি ওরফে বীরুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া ইজিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক তিনি, স্বল্পাহারীও। অনেকরকম রান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। দুই আঙুলে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাখিয়াছিলেন। চাখিতে চাখিতেই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। ভাত যৎসামান্য খাইয়াছেন, ডালই একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ চুমুক দিয়া খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটা

তাঁহার মন্দ লাগে নাই। চম্পার রান্নার হাত আছে। চম্পার গানবাজনাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাঁহার কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা যে ইহাতে আনন্দ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ খুশীভাবটাও তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন নাই, সাধারণত করেন না। এক-দুই-তিনকে কি গল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। ফারাও খুফু পুত্রকে যে যাদুকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সে গল্প তাহাদের ভালো লাগিবে। যাদুকর দেশী হাঁসের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিলেন।...সহসা অন্য একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক-রহস্য আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি। তাহা কি সম্ভব? গভর্নমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি? শুনিবে না, পীর-পাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান দাংগাই বাধিয়া যাইবে হয়তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোনকণ্টাক্‌টার মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের তলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহর পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেকথা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যায়।... বৃহস্পতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় দু'-একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্য যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে দুশ্চিন্তার মেঘ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সংগে আনিয়াছিলাম।

ঊষা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবানিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিদ্রার পূর্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে। পূর্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন ঊষা নিজেই টিপিয়া দেয়। চাকরদের হাতে ছোঁয়াচে চর্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্য-ভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। সন্ধ্যাটারই বরং লজ্জা-সরম নাই, দুপুরে স্বামীকে লইয়া ঘরে খিল দিয়াছে। ঊষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট দুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা সুন্দর কেশ-তৈলের সৌরভে ঘরের বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভৎর্সনা করিতেছিল। ইদানীং কিছুদিন হইতে সে স্বামীর সহিত যে আলাপই করুক না কেন, তাহাতে ভৎর্সনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবারও বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে

গল্প করে বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার—"

"কেষ্ট-দা'ও তো যান নি।"

"কেষ্ট-দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওঁর ভালো লাগে।"

"রঙ্গনাথ গিয়েছিল কি—"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ লেফাপা-দুরস্ত আছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে। ঘুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। তুমিই খালি এড়িয়ে চলছ—"

"গুরুজনদের সামনে গিয়ে কেমন যেন স্বস্তি পাই না। কি গল্প করব ওর সঙ্গে—"

"যে কোন বিষয়ে গল্প করতে পার! বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সম্বন্ধে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বলছিল, কে একজন বুড়ো মুসলান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ সায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন—"

"আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব তাতো মাথাতেই আসছে না।"

"বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষায় যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়ি থেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই সব হারিয়ে গেছে। যে বই নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই কারও—"

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ, সন্ধ্যের পর বসব গিয়ে—"

"আর দেখ, এক-দুই-তিনকে তুমি একটু শাসন করো। বড্ড বেড়েছে ওরা—"

"আচ্ছা।"

"আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল. চা কফি হরলিকস্ কোকো এইসব কিনে আনুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দাদা অবশ্য এসেই ওকে কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তব্য আছে—"

"বেশ—"

সদানন্দের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

ঊষা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃদু হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহার গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঊষা দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-দুই-তিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার খুব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্য একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারান্তে সেই তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে।

আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল, কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

"এ কি এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে নাকি।"

স্বাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বভাব।

"দাদুর জন্যে খুঁজছি। দাদু পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো—"

দুই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা তো আমরাই খেলাম ভাগ করে। দাদুর জন্যে রাখলে না তো—"

"ও পেয়ারা কি দাদুকে দেওয়া যায়। পাকেই নি—"

এক বলিল, "না জামাইবাবু, সুন্দর ছিল পেয়ারাটা—"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উঁচুতে চমৎকার একটা পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে?"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

কিরণ খাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকান্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকান্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘন্টুকে।

"বাবা ঘন্টু, তোমার দাদু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমাট। উষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউও এসেছে। বউদি তো এসেইছেন। সন্ধ্যা-রঙ্গনাথও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যেমন করে পার ছুটি নিয়ে চলে এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে না করে থাকো। দরখাস্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অসুখ করেছে—"

এই একটি কথাই সে নানা সুরে লিখিতে লাগিল।

পার্বতী পুরসুন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন।"

"না এখন তেল মাখাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার চাদরটা তেলে মাখামাখি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা।"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে—"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন—"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটা যদি বাড়ে তখন আমাকেই ভুগতে হবে যে। আমি উনুনে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি।"

পার্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পুরসুন্দরী অর্ধ-স্ফুট-কণ্ঠে বলিলেন, "জ্বালিয়ে খেলে মেয়েটা—"

বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, "দিক না একটু তেল মালিশ করে। ঠিকই তো বলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে"—

পুরসুন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্য দিগন্তর সহিত সন্ধ্যাও পোস্টাফিসে গিয়াছিল। ঊষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই ঊষা দেখিয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা ঊষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আসে না। দিনের বেলা সে পড়াশোনা করে। কিন্তু রঙ্গনাথের দিনের বেলা না ঘুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রঙ্গনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগন্ত কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে—"

"পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাকপ্রণালী চাই দু'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে দি সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে—"

"পাক-প্রণালী ? কি হবে ?"

"দাদা বলছে দাদুকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে খাওয়াবে রোজ। আইডিয়াটা চমৎকার, না ?"

কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগন্ত সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নতুন আইডিয়ার কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল দিগন্তকে। নূতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলে-বেলায় যেতুম।"

"চল।"

পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কাশী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কেউ আছে কিনা কে জানে—"

পোস্টাফিসের পিছনেই কাশী সিংয়ের বাড়ি। কাশী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি তাহার মুঙ্গের জেলায়। এখানেই পুলিশের

চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্যসুন্দর চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্থানীয় জমিদারের কাছারিতে উচ্চ-শ্রেণীর সিপাহীর পদে বহাল করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কাশী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হইতেই কাশী সিংয়ের সহিত সূর্যসুন্দর পরিবারে হৃদ্যতা। কাশী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানা রকম খাবার ঘরে প্রস্তুত করিয়া সূর্যসুন্দরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লইয়া যাইত। চিড়া বা মুড়ির মোয়া, ঠেকুয়া, খাবুনি, ব্যাসনের সন্দেশ, ডাল মাড়া প্রভৃতি একদিন ঊষা ও সন্ধ্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কাশী সিংয়েরও দুটি মেয়ে ছিল, বুধিয়া আর সীতিয়া। ঊষা আর সন্ধ্যার খেলার সংগী ছিল তাহারা। কাশী সিং বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কাশী সিংয়ের স্ত্রী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।

"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবহুল জরাকুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনিতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সংগে আধা-বাঙ্লা আধা-হিন্দিতে কথা বলে।

"আরে সন্ঝা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে পারি নি, আঁখে আর ভাল সুঝে না। সীতিয়াকে রোজ যেতে বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—"

"সীতিয়া আছে না কি এখানে—"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখ দেখি কে আয়ল বা—"

সীতিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মুখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল সন্ধ্যা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা হইয়াছে! সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাবুর অসুখ করেছে, তোরা এসেছিস, সব আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না, কোমরে এত ব্যথা।"

"কি হয়েছে কোমরে?"

"বাত।"

"এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

"দেখিয়েছি। হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওষুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না।"

"তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"গগন কে?"

"দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিস নি?"

এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাখানো দাঁতগুলি আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

"খোকাবাবু ডাক্টর বনু গেলন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন তাকে।"

পাঁচ ছয় বৎসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাণ্ড টিকি, নাক-বোঝাই সর্দি। গায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী দেহটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ঘুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা বটুয়া ঝুলিতেছে।

"শিউযতন, গোড় লাগ। মৌসি—"

"তোর ছেলে?"

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

"বড় দুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে।"

শিউযতন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

"আয় ঘরে বসবি আয়—"

সন্ধ্যা অনুভব করিল, সীতিয়া আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই ঢুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা দুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীন রেজাই ঢাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাথি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাখিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড়ু লইয়া প্রবেশ করিল।

"খা—"

লাড়ুগুলি দিয়া চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া বরশী হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলায় লাড়ু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিয়াছিল সেই পাত্রটি দেখিয়া! প্লেটের মতো, কিন্তু কাচের বা চিনেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রংও রহিয়াছে, চমৎকার দেখিতে। গৃহশিল্প সম্বন্ধেও অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কোথা থেকে কিনেছিস? বেশ চমৎকার।"

"ভিখনার বউ তৈরি করে বিক্রি করে।"

"কোথা থাকে সে?"

"কাজি গাঁয়ে। তুই নিবি? এইটেই নিয়ে যা না।"

"দে—"

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্য উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহসা যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

"আমি কিন্তু ভিখনার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে।"

সন্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল কি করিবে। ভিখনার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থায় তাহার একটি ফোটো তুলিবে সে। বাসনগুলির ফোটো তুলিবে, দৃষদ্বতীতে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখিবে। তাহার পর সে নিজের গলা হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায় পরাইয়া দিল।

"ওকি করলি ?"

"দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একটা ফুল প্যাণ্টও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এসে মাপ নিয়ে যাবে—"

সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হলো মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে—"

"রমজানিয়া মারা গেছে ? বেশ, গোহরকেই পাঠাব তাহলে—। বুধিয়ার খবর কি ?"

"বুধিয়া শ্বশুর বাড়িতে আছে।"

"ভালো আছে বেশ ?"

"খুব ভালো নেই। তার স্বামীটা বড় মারখুণ্ডা। তোর ছেলেমেয়ে কি ?"

"আমার এখনও হয় নি ভাই।"

"কেন ?"

"এমনি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে থাকলে ওসব হতো না।"

"তা বটে। আমার মাত্র দুটো ছেলে, তাতেই পাগল করে দিয়েছে আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিস কি করে। কোন ওষুধ খেয়েছিস ?"

"না।"

সন্ধ্যা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। স্থির করিল এ বিষয়েও পরে সে সীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে।

"লাড়ু খাচ্ছিস না যে—"

"অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব—"

বারান্দায় চাচীর হুংকার শব্দ শোনা গেল।

মিস অনুপমা বসুও নিজের কর্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, ব্লাডপ্রেসার কত, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে সযত্নে প্রত্যহ পাঠাইতেছে। গঙ্গার জলস্রোতের দিকে চাহিয়া তাহার বাবুলের কথা মনে পড়িতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে হইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে কে জানে। ভালোই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়ই খবর দিতেন।

তাহারই ছেলে বাবুল। কিন্তু যেহেতু বাবুলের বাবার সহিত তাহার সামাজিক

আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই তাই প্রকাশ্যভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অনুপমার বাবা শঙ্করপ্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে লেখাপড়া ভালোই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রীর সহিত একটি প্রণয়ীও জুটাইয়া আনিল। সুপর্ণ সিংহ নামটাই অনুপমার চিত্তকে প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষীরাজ এবং পশুরাজের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার। লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরনের পশু-পাখী ফড়িং ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়া ছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অনুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রী আছে। সমাজেরই সেবা করেন। নামটিও চমৎকার। যথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শঙ্করপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যখন পেটে আসিল তখন অনু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হইল, কারণ নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সুপর্ণ উড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে খবর পাওয়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কন্যার পাণি-পীড়ন করিতে উৎসুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন (অর্থাৎ সমাজ-সেবা) সফল হইবে। কারণ সমাজ সেবা করিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ সুপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও বোম্বাই, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্পঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পায় নাই।

শঙ্করপ্রসাদ অনুকে ভর্ৎসনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দূরে করিয়া দিয়া কোনও নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি লেখাপড়া শিখেছ। সব জেনে শুনে যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাঞ্ছনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে একটা জিনিস আছে এখনও। আমি যতদূরে সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপমার মাথায় সিঁদুর পরাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হাসপাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড় হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখানে হইতে মাদ্রাজ যায়। মাদ্রাজের এক মিশনারি সাহেবের সাহায্যে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রসব-করানো বেশ ভালোভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালোই রোজগার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে দুইশত টাকা পর্যন্ত পাঠাইতে পারে। শঙ্করপ্রসাদ সমস্ত টাকা বাবুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন। নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে সুপর্ণ সিংহকে ভালোবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আবার হইল।

সূর্যসুন্দর নিমীলিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবাস্বপ্নটি দেখিতেছিলেন। নির্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য অক্লান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ওকে—

"কে, ওকে—"

তন্দ্রার ঘোরে সূর্যসুন্দর কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাবা কিছু বলছেন ?"

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল।

সূর্যসুন্দরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে নেটের মশারিটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর ঊর্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। তাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শয়ন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন ?"

"না। কুমার কোথা।"

"তিনি বাগানে গেছেন, পাখীর মাংস রান্না করছেন সেখানে।"

"ও।"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন চন্দ্রসুন্দর। ঊর্মিলাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধ্যের পর এইখানে বসে গীতা পড়ব। তুমি মা মেঝেটা গঙ্গাজল দিয়ে একটু নিকিয়ে দিও, কেমন ? মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুনের রান্না এই-খানটায় বসে খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর ঊর্মিলা দিল না।

কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এখুনি ধুয়ে দিচ্ছি মেঝেটা।"

॥ ১৫ ॥

কুমার বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানাসুরে নানা-রকম নৈশ কীট-পতঙ্গ চিৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতর কয়লার উনুনের উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেক্‌চিতে মাংস ফুটিতেছে, মশলাভাজার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারিতে অভ্যস্ত নহে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশা হইতে আত্মরক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দিকে ক্লিট্

ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুচ্‌কি সামনের থাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল। ঘরের একধারে পেট্রো-ম্যাক্স জ্বলিতেছে। কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার 'স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলিভরা বন্দুক। গোটা দুই বড় বড় ব্যাঙ্‌ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। থানার বর্তমান দারোগা সাহেব মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে বন্দুক-আওয়াজ করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাঁখ বাজাইতে পারে, যাহার শাঁখ নাই সে গলা-খাঁকারি দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাড়ির ক্ষ্যান্ত ঝি চাল ডাল তরকারি ফল-মূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীনু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নরুন-পাড় ধুতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীনু পণ্ডিত খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীনু পণ্ডিত আমার উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠশালায় প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চোদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই বিস্তৃত হাতের উপর দুইখানি ইঁট। চোদ্দ-পোয়া শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, দুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত ব্যবধান থাকিবে। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিদিমার কৌশলে আমি দীনুপণ্ডিতের কোপকবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ ছেলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোড়া আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব খুব হইয়াছিল। মন্মথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মক্‌সো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু পণ্ডিত গোড়া হইতে আবার সব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়া বলিলেন—"মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়া-গাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ও তো একটি গবাকান্ত হয়েছে।" দিদিমা বুদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিদ্যার্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীনু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না।

বলিলেন, "এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মানুষ করে তোল।" দীনু পণ্ডিত সাহ্লাদে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘোঁতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জ্বালায়। আম জাম পেয়ারা কুল প্রত্যেকটি গাছ মুড়িয়ে খেত ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওকে একদিন ধরে এনে আমার হাতে সমর্পণ করে দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিট্ করেছিলাম। এখন রেলে টালি ক্লার্ক হয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার নাম ডাক তো খুব। সুয্যির ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই—"

দিদিমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীনু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য খুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না—আমার হাতের লেখা অংক এবং ভাষা জ্ঞানও যাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া দুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমৎকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা হইত মন্মথ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্তৃতাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি যাইতাম। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্য। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্য খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া,তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। দিদিমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। ইহার সূত্রপাত হয় আমার সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে দুইজনেরই বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা যে স্বামী-পরিত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহারা। সম্ভবত এই সব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিম্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের

ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলুভাতে থাকিত। পাঠশালায় যাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি (কদাচিৎ কোনদিন মাছ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ্দ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যহই কিছু ভালোমন্দ খাবার খাইয়া আসিতাম, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোন-দিন দুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লুচি পরোটা থাকিত সেদিন তো হাতে স্বর্গ পাইতাম। মন্মথর বাড়ি হইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ডাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খুব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। সংসারে মামীমার আধিপত্য ক্রমশ বাড়িতেছিল, মা ক্রমশ যেন নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া গল্প করিতে দেখি নাই। সর্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা, রান্না করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাঝে কুটিয়া দিত। রান্না আবার দুই-রকম ছিল। দিদিমার জন্য শুদ্ধাচারে আলোচালের ভাত রান্না করিতে হইত। আলাদা একটা রান্নাঘরই ছিল তাঁহার জন্য। দিদিমা তাঁহার পাত হইতে আমার জন্য প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ডাল রাখিয়া দিতেন। মা সংসারের সব কাজই এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কখনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায় সিঁদুর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্তূপ হইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেন এবং চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন শুনিতে পাইতাম।...এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা যেন আরও লজ্জিত, আরও ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম—আমার একটি ভাই হইয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ ভাই আসিল কোথা হইতে? গোয়ালের পাশে যে ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

উঁকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ছেঁড়াকম্বল ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-নেকড়ায়-ঢাকা একটি ফুটফুটে শিশু। সে-ঘুমাইতেছে। ক্ষ্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল। শুনিলাম সেই ধাত্রী, জাতে ডোম। সে-ই ছেলে প্রসব করাইয়াছে, সে-ই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"হবেই তো। ও যে চাঁদ"—দিদিমা বলিলেন।

"চাঁদ ?"

"তুই সূর্য্যি, তোর ভাই চাঁদ হবে না ? খুব সুন্দর হয়েছে ?"

"খুব। চাঁদের চেয়েও ভালো।"

"পোড়াকপাল আমার, এই সময়ই চোখের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না।"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিরুণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। দুই একবার চিরুণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারিচস না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

পরদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিমার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অদ্ভুত হইল দিদিমাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিমার একটু জ্বরভাব হইল। প্রবীণ ডাক্তার সুরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিমার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। গফুর দরজি তাঁহার জন্য যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটি ছিল টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো। তিনি যখন টোপরের মতো কালো মখমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইহুদী বুঝি বসিয়া আছে। দিদিমা বলিয়া তাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি দুইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায় দিদিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই নূতন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিমি মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে সবুজ-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমৎকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিলে দিদিমাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্ত্রবলে হঠাৎ বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে···"

কুমার তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সত্যই কেমন দেখিতে ছিলেন।

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেউ-ভেউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ছুঁচ্‌কিও তাহার অনুসরণ করিল। কুমার খাতা বন্ধ করিয়া দ্বারের দিকে চাহিল একবার, তাহার পর

উঠিয়া পড়িল। ডেক্‌চির ঢাকনাটা খুলিয়া একবার দেখিল মাংসের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তখনও ছিল। হাতার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তখন একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে, মনে হইল জলটা মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি। দুইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবুকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্য দুইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হোক তাহারা পরস্পর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়াকামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোষাক অদ্ভুত। ব্রিচেস পরা সাহেবী পোষাক, হাতে বন্দুক, মাথায় টর্চ-বাঁধা। চক্ষু-কর্ণ-রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন, দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে।"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কখনও পাচ্ছেন, কখনও হারাচ্ছেন।"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন ?"

"প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম—"

"প্রতিশোধ ? কিসের প্রতিশোধ।"

"আজ সকালে হাসপাতালে দেখলাম একটি মানবশিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি।"

"কোথায়—"

"পাশের বাগানটায় ! ওই বেতের জঙ্গলটার পাশে—"

"অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে—"

"টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে মাথায় এই আলোটা জেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতূহলী জীব, অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা কি। গুটিগুটি রেনজের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে গেল না।"

"কুড়িটা মেরেছেন ?"

"কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, ওগুলো পুঁতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিশ্রী গন্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গন্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়—"

একটা কেরোসিন বাক্সের উপর পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলিতেছিল, সেটা মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাক্সটার উপর উপবেশন করিলেন।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে বসুন না।"

"না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমার স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল দুষ্কৃতদের শাসন করি—"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাড়ছে না।"

"বুনো হাঁস ?"

"হ্যাঁ।"

"কি কি হাঁস ?"

"টিল, পোচার্ড, লালসর, স্পুনবিল, গাঁজও আছে একটা—"

"কতটা মাংস আছে—"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে।"

"ভালো সরষের তেল আছে এখানে ?"

"আছে—"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল চড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ ?"

"হ্যাঁ, ওই যে—"

"পেঁয়াজ রসুন আদা ?"

"তা-ও আছে—"

"তাহলে গোটা তিনেক রসুন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাক খানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবসুদ্ধ ঢেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখীর মাংস সরষের তেলেই জব্দ। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা।"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—"

"জি—"

কোণের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

"কড়াটা পরিষ্কার কর। আর তিনটে রসুন, ছ'টা পেঁয়াজ, আর খানিকটা আদা কোট্।"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমৎকার কামুফ্লেজ করে ছিল তো ল্যাংড়া।"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাং-ল্যাং এবং ছুচ্কি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল। ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখীর মাংস খাওয়াইয়াছে।

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ দুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণে—"

কৃষ্ণকান্ত ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন।"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির শ্বশুর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিলাম।"

"প্রতিশোধ নিয়েছিলাম।"

"কি রকম—"

"মালতী আমার এক দূরসম্পর্কের দাদার মেয়ে। দুমকায় যখন ছিলাম তখন মেয়েটা খুব ন্যাওটো ছিল আমার। বীরেনদা দুমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে

বীরেনদা দুম্ করে মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাবুর ইম্‌বেসিল (imbecile) ছেলেটার সঙ্গে। মুর্খ, থস্‌থসে মোটা, দুটি গাল যেন দু'টি বানরুটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালোই হয়েছে। ভুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরনের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায় নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের কম্‌বিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি, কুৎসিত দর্শন লোকটা। চোখে নীল চশমা। বাঁ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি সর্বদা চলাচল করছে গোঁফদাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, "আপনাকে তো চিনি না। বীরেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে বার করি কি করে।" বললাম, "আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে তোমার কেষ্টকাকা এসেছে।" অনেক কচলাকচলি করে তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম বুড়োর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক খাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাড়িতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাড়িতে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে কালীবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হ'য়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হুঁ"—আবার খানিকক্ষণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা, জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহানুভূতি হবারই কথা। হুঁ"—এই বলে আবার দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—"তোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেনে তোকে নিয়ে যাব।" সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুক্‌নো ইঁদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইঁদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হ'য়ে গেল পুরাতন বন্ধু সুরপৎ সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব সুবিধে হ'য়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে আবার থানায় গেলাম। সুরপৎ সিংকে আমার প্ল্যানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তবে দেখো, মরে যায় না যেন!" বললাম, "না, মরবে না"। রাত বারোটা নাগাদ মুখোশ পরে ওদের শোয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলাম লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাক্কা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে

গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা দু'জনকেই টানতে টানতে নিয়ে সেই শুক্‌নো ই'দারাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম!"

কুমার স্মিত মুখে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি! চীৎকার করলে না তারা?"

"তার স্বরে। তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি ই'দারায় নাবিয়ে মুখোসটা ফেলে দিয়েছি ই'দারার মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ই'দারাটা—"

"ই'দারায় নাবাতে গেলেন কেন?"

"বাইরে শীতে কি রকম কষ্ট হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে—"

"তারপর?"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল দু' একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—"আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোথা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাজে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেনেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যখন কেস হবে তখন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটের ট্রেনে।"

"কি হলো শেষ পর্যন্ত?"

"কেস হলো। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না পড়াতে কেস ধামা চাপা পড়ে গেল।"

"আর মালতী?"

"মালতী আর ফিরে যায় নি। তাকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ পাস করে প্রফেসারি করছে।"

"কালীবাবু কিছু করেন নি?"

"যথেষ্ট করেছিলেন। মকোর্দমা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন নি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি, সুরপৎ আমার স্বপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

"ভাগ্যে আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একটু হ'লে ধরে যেত—"

"এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ খানিকটা তেলে পেঁয়াজ রসুন আদাটা ভাজ।"

পেঁয়াজ রসুন আদা কাটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচুকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া তুমুল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক রুষ্ট কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, "তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়।"

"তাকিয়া ? সে আবার কে ?"

"বোসবাবুর কুকুর। বোসবাবু পুষেছিল ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন ওটাকে আর নিয়ে যান নি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছুতে আমোল দিচ্ছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভেতরে আয়—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনে না। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তখনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া। বিজয়ীর মতো তাহারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ঝগড়াটে হিংসুটে কোথাকার। ব'স এখানে—"

কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া দিল।

"বসে থাক চুপ করে।'

তাহারা বসিবার পর কুমার ডাকিল—"তাকিয়া, তাকিয়া আয়, তাকিয়া—"

কুণ্ঠিত মুখে সসংকোচে পাঁশুটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কুকুর আনত নয়নে, আনত পুচ্ছে দ্বারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসংকোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওর নামটি বেশ লাগসই হয়েছে। কে রেখেছে ?"

"আমি। আমিই ওকে প্রথমে পুষেছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ।"

তাকিয়া সভয়ে ল্যাজ নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি দুইজনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

"চোপ্। চুপ করে বসে থাক তোরা। হিংসুটে কোথাকার।"

কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা।

এমন সময় বাহির হইতে স্বাতীর গলা শোনা গেল।

"ছোটকাকা, ছোটকাকা—আলো দেখাও।"

ল্যাংড়া পেট্রোম্যাকস্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। শিগ্গির চল, চিত্রা এসে গেছে—"

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাচ্ছে, চলুন।"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব কোথা ?"

"আপনাকে খুঁজছেন।"

"আমাকে ! কেন ?"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শখ হয়েছে—"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি।"

"হয়তো জঙ্গলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন।"

কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে ?"

"এখনও হয় নি। তবে দিদিমা তাঁর জন্যে অন্য ঘরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেখেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্যে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—"

"তুই পায়েসও খেয়েছিস না কি ?"

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্। কিন্তু দিলে একটি বাটি। হ্যাঁ, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে শালপাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়—"

"ল্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো ?"

"জি হাঁ"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল।"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, "জানো ছোটকাকা, বাবা বড় disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ঘটা করে স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়েই হুট্ করে এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করার সময় পায়নি, সুব্রত লাস্ট মোমেণ্টে ছুটির খবর পেলে—"

"ও, তাই বুঝি—"

হঠাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, ওদুটো কি, শেয়াল নাকি !"

সত্যই দুইটি শৃগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।

"এ দুটোর ভবলীলাও শেষ করে দেব না কি" – কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ দুটোকে।"

শৃগাল দুটিও সরিয়া পড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি ? কোথা ?" – স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"পাশের বাগানটায় স্তূপ করা আছে।"

"চলুন না দেখি—"

"না এখন নয়। কাল সকালে দেখো।"

সন্ধ্যার মৃদুকণ্ঠের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহারা বাড়ি পেঁীছিয়া দেখিল চন্দ্রসুন্দর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাঠি জ্বলিতেছে। চন্দ্রসুন্দর পরিবেশটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাথ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুগ্ধচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গ্যাঁদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চন্দ্রসুন্দরের দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সফরুদ্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। ঘরের আর একধারে একটু

তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিলবাবুর স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত দুইটি জোড়-করা। ঊষাও এখানে ছিল, কিন্তু চিত্রা আর সুব্রত আসাতে উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। গগন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল। আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল গীতাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাদুর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাদুর গীতা পাঠ সে সম্ভাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুদিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্ত-হীন নির্জন পথ, যে পথে তিনি একক যাত্রী, যে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু ? মৃত্যু কি এভাবে আসে ?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল।

" ও কী ?"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন "কিষুণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্তনের দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার হাতার একধারে বসে নামকীর্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কাঞ্চনমালা, নিখিলবাবুর স্ত্রী, কিরণের কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, "কাকীমা বলছেন, একটু দূরে বসে ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাবার কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়।"

"না, না, ওরা দূরে বসেই বাজাবে। ওই হাসুহানার ঝাড়ের ওপারে ওদের জায়গা করে দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে তবে ওদের খবর দিয়েছিলাম—"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালইতো।"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্যে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

পুরসুন্দরী সূর্যসুন্দরের কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্যে গরম লুচি ভেজে আনি দু'খানা ?"

"না। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না। দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্রে না খাওয়াই ভালো।"

গগন মাথার দিকে দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ভোরের দিকে আমি না হয় হর্লিকস করে দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে দেবে ?"

সূর্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছি ওখানে। স্টোভ কুঁজো চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন্, হরলিক্স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চন্দ্রসুন্দর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি! পুরসুন্দরী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "রাত তো অনেক হলো। আপনার খাবার জায়গা করে দি?"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা।"

"তবু যা পারেন খেয়ে নিন। গরম গরম ফুলকো লুচি আপনি বসলে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে বসবে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইয়ে দিতে চাই।"

কিরণ মন্তব্য করিল—"সে-ই ভালো। একে পাখীর মাংস তায় কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও তো মাৎ করে দেবে চারদিক। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন।"

"আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে উঠছি।"

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার-কোটও পরিয়াছে, হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানায় বসিল এবং দুই হাতে সূর্যসুন্দরের গাল দুটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য!

পুরসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, "জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাদুকে, ছোটদাদুকে—"

"ও।"

অপ্রতিভ মুখে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এবং জুতা খুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুব্রতও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, তাহার পরিধানে শুধু খাকি সুট। সে-ও পুরসুন্দরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রসুন্দর সুব্রতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ তাহা শুনিয়াছিলেন।

বলিলেন, "তুমি দাদু কষ্ট করে জুতো খুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'য়ে গেছে। তাছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস।"

সুব্রত কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র, তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর সূর্যসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, আপনি কেমন আছেন এখন?"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হ'য়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠতে হবে।"

পার্বতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের সুরে পুরসুন্দরীকে বলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ। চিত্রা আয়, সুব্রত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি।

মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক ক'রে দিয়েছি।"

গগনকে আবার দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"ওরে পার্বতী, চিত্রা আর সুব্রতর জিনিস-পত্র ওই হলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তুই গুছিয়ে দে সব -"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল—"

বলিয়াই পার্বতী অন্তর্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় সুব্রতকে স্যালুট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ্"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেছিলাম। ফৌজী আদবকায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ সাহেব কেমন আছ?"

"ভালো। আপনি?"

"আমি নেই। যা দেখছ তা অতীতের কঙ্কাল।"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সুব্রতর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল।

পাবর্তীর উচ্চকণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, সুব্রত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বামুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধহয় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এসেছে আবার—"

"কার কথা বলছেন—"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন ও বাড়িতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোন নি। বীরুবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"সুব্রত, চিত্রা-আ—"

আবার পার্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও।"

চিত্রা সুব্রত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভুসকারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আস্তানা করে নিয়েছি।"

এ অদ্ভুত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভুসকার মানে যে ঘরে গমের ভুসি জমা করা থাকে। প্রকাণ্ড উঁচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানালার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভুসি ঢালা হয়। ভুসি বাহির করিবার সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরেরা ঢোকে। ঘরের ছাদ হইতে মেঝে পর্যন্ত ভুসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাকে ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অদ্ভুত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, "ওখানে আপনি উঠলেন কি করে?"

"মই দিয়ে। কুমারবাবুর লম্বা মই আছে যে একটা।"

"আপনার গায়ে তো ভুসি-টুসি কিছু লাগে নি দেখছি।"

"আপাদ মস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে খুব। সেটা খুলে এসেছি।"

সূর্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্‌কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস।"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক খিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু ?"

"আছে বই কি—"

ঊষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হলো—"

"এখন হয় নি। হয়েছিল অনেকদিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প।"

"বলুন না।"

ছোট-খুকীর মতো আবদার করিয়া ঊষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া কাঞ্চনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন ? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্য খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচ্ছি। আপনি যদি যেতে যান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন।"

"তাই যাই তাহলে। লণ্ঠন দিও একটা।"

"হ্যাঁ লণ্ঠন দেব বই কি।"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দরও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন তাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য। আই অ্যাম এ হিস্‌টোরিয়ান্‌। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তখন বাগান ছিল। ফুল ফল শাক-সব্‌জি কপি-আলু সব রকম হতো। ডাক্তারবাবু বিতরণ করতে কসুর করতেন না, তবু চুরি হতো। কাক-বাদুড়-গরু-ছাগলরা তো করতই, মানুষরাও করত। যখনকার কথা বলছি তখন ডাক্তারবাবুর কলা-চাষ করবার শখ খুব প্রবল। জিতুবাবু বলে, এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থাকতেন এবং চাষ সম্বন্ধে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা পয়সায় নানা রকম তরিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহবা বাহবা করতুম। কলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারিদিকে নানা রকম কলা-গাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের কলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে কলা, বর্মী কলা, সিংগাপুরী কলা, কাবুলী কলা, মাদ্রাজী কলা, মর্তমান কলা, অগ্নীশ্বর কলা—এই ক'টা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম কলা গাছ

আনলেন তার নাম 'শফ্‌রি' কলা। তিনি এক ডজন শফরি কলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে কলা-গাছগুলিকে একবার দেখে আসেন। জিতুবাবু তো দু'ঘণ্টা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা গেল একটি গাছে কলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাড়িতে নূতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা কলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হলো একটা। সবাই এসে চোখ বড় বড় করে দেখে যেতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন কলার রং ধরল সেদিন তো হৈ চৈ পড়ে' গেল বাড়িতে। দুটো দল হ'য়ে গেল। বীরুবাবুর মা বললেন—এখুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, দু' একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তিনি বললেন – গাছে আরও দু' একদিন থাক, মাটির রসটা পুরো টেনে নিক, তারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, তাঁর কথা অমান্য করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে সকাল সাতটার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে ঝুলছে, আরও দু'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন — সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। হুলুস্থুল পড়ে গেল। থানায় পর্যন্ত খবর দেওয়া হলো। দুপুর বেলা আমেদাবাদ থেকে আমি এসে পেঁছিলাম এক বেটো ঘোড়ায় চড়ে। তখন আমার ঘোড়া ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বীরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন জুটে যেত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাবু ভুরু কুঁচকে বসে আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিৎ সিং তম্বি করে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তারপর শুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগ হলো খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্যে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তারবাবু তখনও কল থেকে ফেরেন নি, বীরুবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুব বলে মই আনিয়ে ভুসকারে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে নিরিবিলিতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়। বিশেষত শীতকালে। বরাবরই আমি ওখানে শুতাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভুসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা ঢোকানো রয়েছে। বুঝলাম চুরি করে কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হ'লে নিয়ে যাবে। ওখানে শোয়া আর নিরাপদ বলে মনে হলো না। নেবে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের ল্যাজে পা পড়লে যা হয় অনেকটা তেমনি হলো। উদিৎ সিং তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দুলতে লাগল, যেন আমাকেই ছোবলাবে। নাকের ছ্যাঁদা ফাঁক হয়ে গেল, ছোট ছোট চোখ দুটো থেকে ছুটতে লাগল আগুন। দাঁতে দাঁত পিষে নীচু গলায় তর্জন করে আমাকে বললে, কোইকো কোই বাত্ নেহি বোলিয়ে। ময় শালেকো পাকড়েংগে। তারপর কি করলে জান? সেই কলার কাঁদির পাশেই ভুসোর মধ্যে ডুবে বসে রইল। নাকের ছ্যাঁদা দুটি আর চোখ দুটি বেরিয়ে রইল শুধু। ঠিক সন্ধ্যের পরই ধরা পড়ল চোরটা। ডাক্তারবাবু তাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, খেতে পাচ্ছিল না— তাই বাগানের মালী করে বাহাল করেছিলেন। সেই শালার এই ব্যবহার।

উদিৎ সিং তো তাকে জুতিয়ে রক্তারক্তি করে দিলে, তারপর থানা পুলিস। নির্ঘাত জেল হ'য়ে যেত, ডাক্তারবাবুই আবার বাঁচালেন তাকে। চাকরিও দিলেন আবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেন নি। মাস ছয়েক পরে আর এক জায়গায় চুরি করে ধরা পড়ল সে। তখন জেল হ'য়ে গেল···।

গগন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সে অনুভব করিল কবিরাজ মহাশয় যদি আর এক প্রস্থ গল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে বড়ই দেরি হইয়া যাইবে। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন আমরা সব বাইরে গিয়ে বসি। দাদুর সমস্ত দিন বড্ড strain গেছে, উনি এবার একটু ঘুমুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভালো। চল বাইরেই যাই আমরা। আমি তো পুরোনো গুদাম ঘরের মতো। আমার মনের দরজা জানলা খুলে দিলে কত যে গল্পের আরশোলা, ইঁদুর, টিকটিকে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে? রাত ভোর হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন। গগন পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে নিয়ে আয় এইবার—"

দিগন্ত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া পাশের ঘর হইতে একটি নীল-শেড-দেওয়া সুদৃশ্য বাতি লইয়া প্রবেশ করিল।

"কোথা রাখব এটা?"

"মাথার শিয়রের দিকে এই তেপায়াটার উপর। দাদুর ঘরে রাত্রে এই বাতিটাই জ্বলবে। শেডটা ভালো, স্নিগ্ধ আলো হবে। এই লণ্ঠনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা—"

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আবার কোথা থেকে পেলি?"

"কাটিহার থেকে আনলাম।"

"তাই বুঝি সন্ধ্যে থেকে দু'ভায়ে মিলে ওইটে নিয়ে ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করছিস?"

দিগন্ত দাদার আদেশ অনুসারে আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া লণ্ঠনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা একটা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল।

ঊষার দিকে চাহিয়া গগন প্রশ্ন করিল—"বেশ সুন্দর হয় নি?"

"চমৎকার।"

"দাদুকে এবার ঘুমুতে দাও একটু। তুমি আবার যেন গল্প ফেঁদো না।"

"গল্প তো তোমরাই করছ। আমি তো এতক্ষণে এলাম ছেলে তিনটেকে খাইয়ে। ছেলে তো নয়, এক একটা ডাকাত।"

"ঘুমিয়েছে ওরা?" সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন।

"না! চক্ষে ঘুম নেই কারো। অথচ সমস্ত দিন হৈ হৈ করে বেড়িয়েছে! কতক্ষণ আর চাপড়াব। বুড়ো হাতীদের কি আর চাপড়ে ঘুম-পাড়ানো যায়! ওদের বাপের কাছে দিয়ে চলে এলুম তাই। ওঁরও ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যের সময় বাবার কাছে এসে একটু বসেন, কিন্তু যা হৈ হৈ হচ্ছে বসবেন কখন। আমারও ক্লান্ত লাগছে। মোটা মানুষ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বাবার পায়ের কাছে এই খানটায় একটু গড়িয়ে নি। ওই ছোট বালিশটা আমাকে দে তো ঊর্মিলা—"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কোথাও উঠিয়া যায় নাই, কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার অঙ্গুলিগুলি সূর্যসুন্দরের কেশ-বিরল মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল।

উষা মাথায় বালিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার নাকও ডাকিতে লাগিল। সূর্যসুন্দর তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

গগন তখন চুপি চুপি দাদুর কানের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদু, আলোটা ভালো লাগছে তো?"

"ওয়াণ্ডারফুল।"

"চম্পাকে ডাকব? সে এইখানে তোমার কাছে বসে আস্তে আস্তে গান শোনাক না একটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়—"

"বেশ, সে তো ভালোই হবে। কিন্তু ওর কষ্ট হবে না তো, পোয়াতি মানুষ—"

"বাপের বাড়িতে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই অবস্থায়। ডেকে আনি?"

"আন তাহলে।"

দিগন্ত পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। গগন সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দিগন্ত তোর বৌদিকে নিয়ে আয়। তার আগে ক্যাম্প-চেয়ারটা দাদুর মাথার দিকে পেতে দে। চম্পা ওইটেতে বসে গান শোনাক দাদুকে—"

বাধ্য বালকের মতো দিগন্ত আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া দিল এবং তাহার পর চম্পাকে ডাকিয়া আনিল। চম্পা যেন গ্রীণ-রুমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পরিধানে জরির পাড়-বসানো নীল শাড়ি, খোঁপায় কুন্দফুলের মালা। সে সলজ্জ মৃদু হাসিয়া গগনের দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে দিগন্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গানটা গাইব?"

দিগন্ত বলিল, "দিন শেষে বসন্ত যা—"

গগন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দিগন্তের দিকে চাহিল। সে আশা করিয়াছিল দুপুরের কথা-মতো 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটাই গাওয়া হইবে। কিন্তু দিগন্ত এ কি ফরমাস করিল। কিন্তু সে জানে এ সব ব্যাপারে দিগন্তই বেশী সমঝদার, তাই সে আর প্রতিবাদ করিল না।

চম্পা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

> "দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
> তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে।
> তারি সুর নেব ধরে'
> আমার গানেতে ভরে।
> ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে'।"

গগন দিগন্ত দুই জনেই নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া গেল। সূর্যসুন্দর গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নিজের মাকে দেখিতে পাইলেন। মায়ের কোলে একটি শিশু, তিনিই যেন শিশু হইয়া মায়ের কোলে শুইয়া আছেন, মা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাইয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। মায়ের ছবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বাবা আসিলেন, তাঁহার হাতে এক-গোছা সবুজ দুর্বা। বাবার হরিণটা আসিয়া দুর্বাগুলি খাইতে লাগিল। বাবা চলিয়া গেলে আসিলেন মামা। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার উপর সত্যই অন্যায় করেছিলাম আমি,

আমায় মাপ করো। মামাও চলিয়া গেলেন, তাহার পর আসিল মন্মথ। হাসিয়া বলিল, কিরে তুইও টিকিট কেটেছিস দেখছি। কোন ভয় নেই। বেশ আছি আমরা এখানে। এখানেও গান গাই। শুনবি? তোর সেই হার্মোনিয়ামটা আছে তো। হার্মোনিয়ামটা বাহির করিয়া আনিয়া, তেমনি করিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া সেই পুরাতন গানটা ধরিল—

উরমির পর উরমি উঠিয়া
সবলে এ তনু দেয় ডুবাইয়া
ডুবে গিয়ে পুন কেন উঠি ভেসে
কেন নাহি যাই তলায়ে

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল, "হার্মোনিয়ামের বেলোটা খারাপ হয়ে গেছে, সারিয়ে নিস।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সে-ও চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল নবুদা, তাহার পর রায় মশায়।···সর্বশেষে আসিল 'বউ'—বীরুর মা। মুখে প্রসন্ন হাসি।—মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি, নাতবৌ নিয়ে বেশ আরামে আছ দেখছি।

যে জগত অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, যে জগতের অধিবাসীরা আর ইহলোকে নাই সেই জগত তাহার ঘুমের মধ্যে মূর্ত হইল। প্রায়ই হয়।

···তাহার পর হঠাৎ সব লুপ্ত হইয়া গেল আবার। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন—ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে, চম্পা উঠিয়া গিয়াছে। উর্মিলা শুধু বসিয়া আছে মাথার শিয়রে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কীর্তনের গান—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

"কারা হরি নাম করছে?"

"রামনিবাস বাবাজীর দল কীর্তন করছে, সেই যে সন্ধ্যের সময় এসেছিল।"

"ও।"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন। উর্মিলা আনতমুখে সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর যখন অনুভব করিল সূর্যসুন্দর সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; তখন সে-ও মাথার শিয়রের স্থানটিতে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। তিনি রামনিবাসের বাবা শ্রীনিবাসের কথা ভাবিতেছিলেন। লোকটা মদ খাইত, মাংসও খুব প্রিয় ছিল তাহার। প্রায়ই তাঁহার বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। কখনও শুধু হাতে ফেরে নাই। ঘুঘু হরিয়াল শরাল প্রভৃতি প্রায়ই মারিয়া আনিত। শুধু মারিয়া আনিত নয়, তাঁহার আস্তাবলটায় বসিয়া রাঁধিত। একা হাতেই সে পাখীর পালক ছাড়াইত, কুটিত, মশলা বাটিত। বামুনদিদি তাহাকে বাড়িতে আমল দিতেন না। রান্না করিতে করিতে তাঁহার জন্যে খানিকটা আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে বাকিটাতে খুব ঝাল দিত। তাহার পর সেই ঝাল মাংসের চাট দিয়া মদ খাইত। রোজ মদ খাইত সে। বস্তুত ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সকালে উঠিয়া পাখীর খোঁজে

বাহির হওয়া, পাখী খুঁজিয়া শিকার করা এবং সন্ধ্যায় সেই পাখীর মাংস সহযোগে মদ খাওয়া। যেদিন সে অন্য পাখী পাইত না, সেদিন চড়াই শালিক পর্যন্ত মারিত। ঢিল ছুড়িয়া মারিত। এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাহার, মাংস সে কোন রকমে রোজ জোগাড় করিবেই। মাংস তাহার প্রত্যহ চাই-ই, অথচ বাজারে প্রত্যহ মাংস পাওয়া যাইত না, এখনকার মতো তখন গ্রামে গ্রামে কশাইয়ের দোকান ছিল না, পূজার সময় ছাড়া পাঁঠা কাটা হইত না। আদিম বন্য মানবদের মতো তাই শ্রীনিবাসকে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। মদ খাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল শ্রীনিবাস। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সবই সে মদে নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তে দশ বিঘার যে আমবাগানটি আছে সেইটি বাঁধা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল সে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া রীতিমত দলিল-পত্র করিয়া ধার করিয়াছিল। কিন্তু শোধ করিতে পারে নাই। কাহারও ধার সে শোধ করে নাই। অবশেষে একটা নষ্ট স্ত্রীলোকের আশ্রয় লইয়াছিল। সে নষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসের খুব হিতৈষিণী ছিল। সেই তাহাকে খাইতে পরিতে দিত এবং পাওনাদারদের তম্বি হইতে লুকাইয়া রাখিত। কোন পাওনাদার শ্রীনিবাসের নাগাল পাইত না। সে নাকি শাখাপত্র বহুল বড় বড় গাছে উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকটি একটি বালতির ভিতর এক বোতল মদ, কিছু মাংস এবং খানকয়েক রুটি লইয়া গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সংকেত করিলে শ্রীনিবাস গাছের উপর হইতে একটি দড়ি নামাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটি বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া পুনরায় সংকেত করিলে শ্রীনিবাস বালতি উপরে টানিয়া লইত। স্ত্রীলোকটিও তাহার পর গাছে উঠিয়া যাইত। সূর্যসুন্দর একবার স্বচক্ষে তাহাদের একটি গাছের উপরে দেখিয়াছিলেন। পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের অবশেষে কঠিন পীড়া হইল। সিরোসিস্ অব লিভার এবং তদুপরি নিউমোনিয়া। ছিন্নবসনা রুক্ষকেশা শ্রীনিবাসের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যসুন্দরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্যসুন্দর শ্রীনিবাসের চিকিৎসা করিবার জন্য তাঁহার বাড়ি গেলেন। গিয়া দেখিলেন চিকিৎসা করিবার আর কিছু নাই, শেষ চিকিৎসক যম আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীনিবাস অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, দুই গাল বাহিয়া ধারা নামিল। শ্রীনিবাসের পুত্র রামনিবাস তখন চার বছরের শিশু। সে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীনিবাস তাহার হাতটি টানিয়া সূর্যসুন্দরের হাতে দিয়া নির্নিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে সূর্যসুন্দরে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় সূর্যসুন্দর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন। যে হ্যাণ্ডনোট ও দলিল লিখিয়া শ্রীনিবাস একদা তাঁহার নিকট বাগান বাঁধা রাখিয়া আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল, সেই হ্যাণ্ডনোট ও দলিলটি তিনি বাড়ি হইতে আনাইয়া তাহার সম্মুখেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, মৃত্যুপথযাত্রী হয়তো কিছু সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। রামনিবাস তাঁহার সে টাকা শোধ করে নাই। সেই বাগানটি অন্য লোককে বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় একটি আখড়া স্থাপন করিয়াছে। আখড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আছে। অনেক ভক্ত জুটিয়াছে। রামনিবাস এখন বাবাজী, কেহ কেহ গুরুজিও বলে। ভক্তদের কৃপায় তাহার আর অন্নকষ্ট নাই।

কীর্তন আবার প্রবল হইয়া উঠিল—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

শুনিতে শুনিতে সূর্যসুন্দর আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুমাইয়া আবার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আবার যেন 'বউ' আসিয়াছে। বলিতেছে, "তুমি দিনকতক পরে এসো। সবার সঙ্গে দেখা না করে যেন এসো না। গগনের বউ ভারী সুন্দর হয়েছে না?" মুচকি হাসিয়া বউ চলিয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যেই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সকলের সঙ্গে তো দেখা হয় নাই, সকলে তো এখন পর্যন্ত আসিয়া পেঁছায় নাই। সকলে কি আসিবে? কতদিন পরে আসিবে? ততদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবার মতো শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি? দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। তিনি চোখ খুলিয়া দেখিলেন। ঘরে সেই নীল শেড দেওয়া আলোটা জ্বলিতেছে। তাঁহার বিছানার কাছে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? বউ নাকি?

"কে—"

মৃদু কণ্ঠে উত্তর আসিল, "আমি চম্পা, আপনার জন্য ওভাল্‌টিন এনেছি।"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না, দিতে পারিলেন না। একটা অপূর্ব মাধুর্যরসে তাঁহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া গেল, তিনি কথা বলিতে পারিলেন না।

উদয় অস্ত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

৮ চৈত্র, ১৩৮০
লেকটাউন
কলিকাতা-৫৫

প্রথম পর্বের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার সূর্যসুন্দর বিরাশী বৎসর বয়সে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষাঘাত হইয়াছে। সূর্যসুন্দরের ছোট ছেলে কুমার সকলকে টেলিগ্রামে খবর দেওয়াতে তাঁহার বড় ছেলে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্ত্রী পুরসুন্দরীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছে তাঁহাদের পালিতা কন্যা পার্বতী। বৃহস্পতি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র। বৃহস্পতির দুই পুত্র গগন, দিগন্ত এবং আসন্নপ্রসবা গগনের স্ত্রী চম্পাও আসিয়াছে। চম্পার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আসিয়াছে মিস অনুপমা বসু, একজন মিড্‌ওয়াইফ। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বাতী এবং তাহার স্বামী সোমনাথ, কনিষ্ঠা কন্যা চিত্রা এবং তাহার স্বামী সুব্রতও আসিয়াছে। সোমনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সুব্রত এস. পি.। সূর্যসুন্দরের কন্যারা কিরণ, উষা, সন্ধ্যা এবং জামাইরা কৃষ্ণকান্ত, সদানন্দ এবং রঙ্গনাথও উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একজন ফরেস্ট অফিসার এবং শিকারী। সদানন্দ জমিদার, রঙ্গনাথও ধনী, শৌখিন, বিদ্বান ব্যক্তি। সন্ধ্যা প্রগতিশীলা আধুনিকা। সে নিঃসন্তান।

সূর্যসুন্দরের ছোট ছেলে কুমার বাবার একটি পুরাতন ডায়েরি পাইয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কুমার সময় পাইলেই সেই ডায়েরিটি পড়িতেছে। পাছে কেহ কাড়িয়া লয়, এজন্য ডায়েরির কথা কাহাকেও বলে নাই।

কুমারের স্ত্রী ঊর্মিলা শ্বশুরের শিয়রে সর্বদা বসিয়া আছে।

সূর্যসুন্দরের মেজ ছেলে উশনারও আসিবার কথা আছে। সে হয়তো আসিবে। কিন্তু তাঁহার সেজ ছেলে পৃথ্বীশ আসিবে কিনা অনিশ্চিত। সূর্যসুন্দর পৃথ্বীশের কথাই মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেছেন। সে সাত আট বছর নিরুদ্দেশ। সে আসিবে কি? কখনও কখনও তাঁহার মনে হয়—"আমার বাবা আমার জন্যই শেষ-জীবনে নিজের খেয়াল-খুশির পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশ রূপে যদি আমার কাছে আসিয়া থাকেন—হয়তো তাহাই আসিয়াছেন—তাহা হইলে আবার তাহাকে জোর করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে?"

সূর্যসুন্দর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথিতযশা হৃদয়বান্ চিকিৎসক। অনেকেই তাঁহার কাছে উপকৃত এবং কৃতজ্ঞ। অসুখের খবর পাইয়া গুণমুগ্ধ ভক্ত একদল আসিয়াছে এবং রোজ আসিতেছে। সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী সুরসিক পেট-পচা কবিরাজ, সুবাতালী তহশিলদার, জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা প্রবীণ রমেশবাবু, জমিদার গোবিন্দ মণ্ডল, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহ, স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার নিখিলবাবু প্রত্যহ আসিতেছেন। তাঁহার ছেলেদের বন্ধুবান্ধব এবং সমবয়সী রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল, শিউনাথ, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন প্রভৃতিও কখনও বারান্দায়, কখনও বাহিরের ঘরে বসিয়া আড্ডা জমাইতেছে।

সূর্যসুন্দর একটু সুস্থ হইয়াছেন। একদিন সকলের সহিত আহারও করিলেন। গগনের বউ চম্পা খাওয়ার সময় তাঁহাকে গীটারে রবীন্দ্রসংগীত বাজাইয়া শুনাইল। সূর্যসুন্দরের ছোট ভাই চন্দ্রসুন্দরও আসিয়াছেন। তিনি একটু রক্ষণশীল গোঁড়া-প্রকৃতির লোক। তিনি একদিন সূর্যসুন্দরকে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। একদা-উপকৃত রামনিবাস বাবাজী হাতার একধারে বসিয়া কীর্তন করিতেছেন।

সূর্যসুন্দরকে একটু সুস্থ দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন সকলে। সেইজন্য গগনের বউ চম্পার সাধ উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন সূর্যসুন্দরের বন্ধুরা।

কুমার মাঝে মাঝে সূর্যসুন্দরের বাল্যজীবনের কাহিনী ডায়েরি হইতে পড়িতেছে। আর দূরসম্পর্কের আত্মীয় হাবু মামা (তিনিও আসিয়াছেন) সূর্যসুন্দরের যৌবন সুহৃৎ স্বর্গীয় রায়মহাশয়ের কাহিনী তাঁহার পৌত্র পরীক্ষিৎ রায়কে শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

সূর্যসুন্দরের নিমীলিত নয়নের সম্মুখে কখনও তাহার মা-বাবা, কখনও মৃতা স্ত্রী আসিয়া দেখা দিতেছেন। আর একটা দৃশ্যও তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে—একটা আদি-অন্ত-হীন দিগন্ত-বিস্তৃত পথ। সে পথে তিনি একক যাত্রী। সে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে! তাহাকে চেনা যায় না। মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু।

রাধানাথ গোপ—সূর্যসুন্দরের একজন হিতৈষী ধনী গৃহস্থ—সূর্যসুন্দরের হাতায় প্রকাণ্ড কয়েকটা চালা তুলিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। কারণ আশেপাশের নানা গ্রাম হইতে সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর পাইয়া দলে দলে লোক আসিতেছে! তাহাদের একটা বসিবার আশ্রয় দরকার।

সূর্যসুন্দরের অসুখকে কেন্দ্র করিয়া আত্মীয় অনাত্মীয় বহু লোক সমবেত হইয়াছেন।

॥ ১ ॥

সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর পাইয়া যাঁহারা আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলে রাত্রে নিজের নিজের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ঘুমাইতেছিলেন না। প্রত্যেকেই রাত্রির নির্জনে নিজের নিজের ঘরে এক একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিতান্ত নিজস্ব একটি পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে মানুষের যেন তৃপ্তি হয় না। সূর্যসুন্দরের জন্য যে দুশ্চিন্তা লইয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সূর্যসুন্দরকে দেখিবার পর সে দুশ্চিন্তা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। সকলেরই মন আবার আত্মকেন্দ্রিক হইয়া আপন আপন আকাশে ডানা মেলিতেছে।

হাবুমামা আশ্রয় লইয়াছিলেন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারবাবুর কোয়ার্টারে। কুমার বাড়িতেই তাঁহাকে একটা আলাদা ঘর দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি সেখানে যান নাই। তিনি আসিয়াই হাসপাতালের ছোকরা কম্পাউণ্ডার পরীক্ষিৎ রায়ের সহিত আলাপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে তাহার কোয়ার্টারে সে একাই থাকে তখন সেখানে থাকাই স্থির করিলেন। পরীক্ষিতও আনন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিল। হাবুমামা সূর্যসুন্দরের আপন মামার জ্ঞাতি-সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। বয়সে তিনি সূর্যসুন্দরের অপেক্ষা অনেক ছোট। বাল্যকালে তিনি এবং তাঁহার ভাই সাবু সাহেবগঞ্জের বাড়িতে আসিয়া দাদার আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। সাহেবগঞ্জে শক্তিনারায়ণ নিজের সংসারে অনেক আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অনেকে তাহার বাড়িতে থাকিয়া খাইয়া পরিয়া 'মানুষ' হইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু লেখাপড়ায় কেহই বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। তিনি নিজের সাধ্যমত ইহাদের সকলকেই কোন চাকরিতে বা কোনও কর্মে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় অনেকে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে সক্ষম হইয়াছেন। হাবুমামা যখন উপর্যুপরি কয়েকবার ফোর্থ ক্লাস হইতে প্রোমোশন পাইলেন না তখন শক্তিনারায়ণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। হাবুমামা কোট প্যান্ট ও রেলের টুপি পরিয়া দিন কতক টিকিট কালেকটারি করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরিটি বজায় রাখিতে পারেন নাই। জীবনে অনেক চাকরিই তিনি পাইয়াছিলেন। যদি একটাতেও তিনি স্থায়ীভাবে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারিতেন হয়তো তাঁহার আর্থিক উন্নতি হইত, দৈন্যদুর্দশাও ঘুচিত। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বেপরোয়া খামখেয়ালী ভাব ছিল যে, কোনও বন্ধনেই তিনি বেশীদিন বাঁধা থাকিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ সে বন্ধনের সহিত যদি আত্মীয়-প্রীতি বা সামাজিকতার বিরোধ বাধিত তাহা হইলে তিনি তাহা ছিন্ন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার এক বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী যাইবার জন্য তিনি রেলের চাকরিটি ছাড়িয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহার অনেক চাকরি গিয়াছে। সূর্যসুন্দরের অসুখের সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। ইহার জন্যও হয়তো তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, বর্তমানে যে কাজটি করিতেছেন তাহাও হয়তো থাকিবে না। বর্তমানে এক ব্যবসায়ীর জন্য মফস্বলে মাল খরিদ করিয়া বেড়ানোই তাঁহার কাজ। ধান চাল খরিদ করিবার জন্য তিনি বীরভুমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, যেই শুনিলেন সূর্যসুন্দর অসুস্থ অমনি চলিয়া আসিয়াছেন। চাকরি থাক বা যাক তাঁহার সে বিষয়ে চিন্তা নাই।

সূর্যসুন্দরের সহিত তাঁহার কেবল মামা-ভাগ্নে সম্পর্কই নাই, আর একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। যখন তাঁহার প্রথম চাকরি টিকিট কালেক্টারিটি গেল, তখন শক্তিনারায়ণ তাঁহার উপর খুব চটিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাকে বাড়ি হইতে দূর করিয়াও দিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় সূর্যসুন্দর ডাক্তারি পাশ করিয়া এই নিতান্ত নগণ্য পল্লীগ্রামে আসিয়া প্র্যাক্টিস আরম্ভ করিয়াছেন। তখন তাঁহার আয় যৎসামান্য। প্রিয়গোপালের বাবার দেওয়া একটা সামান্য খড়ের ঘরে কোনক্রমে তিনি বাস করিতেছেন। দিনের বেলা দুধ খাইয়া থাকেন, রাত্রে স্বপাক ভাতে-ভাত খান। এই অবস্থাতেও সূর্যসুন্দর হাবুমামাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কম্পাউন্ডারি শিখাইয়াছিলেন। হাবুমামা বহুদিন সূর্যসুন্দরের কম্পাউন্ডার হইয়াছিলেন। সাধারণ রোগের মোটামুটি চিকিৎসাও শিখিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের ইচ্ছা ছিল হাবুমামাকে দূরের কোনও একটা গ্রামে বসাইয়া দিবেন। তখন ও-অঞ্চলে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলিত হয় নাই। হাবুমামা যদি সূর্যসুন্দরের পরামর্শ শুনিতেন তাহা হইলে তিনিও কোন গ্রামে ভদ্রভাবে বসবাস করিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা উড়ু-উড়ু ভাব ছিল, তিনি সূর্যসুন্দরের নিকট কিছুদিন থাকিয়াই আবার অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই প্রথম যৌবনে সূর্যসুন্দরের যে সান্নিধ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি আজও তাঁহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। তিনি যখন সূর্যসুন্দরের নিকট ছিলেন তখন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ত্রিপুরারি সিংহ সিংহবিক্রমে ও-অঞ্চলে শাসন করিতেছিলেন। নীলকুঠির অ্যালবার্ট সাহেব এবং আর একজন জমিদার তেজনারায়ণ চৌধুরীর সহিত তাঁহার সর্বদা সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। সেই সব সংঘর্ষে তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন তাঁহার একচক্ষু ম্যানেজার চন্দন রায় এবং ঈষৎবধির দেওয়ান গোপীবল্লভ চৌধুরী। সূর্যসুন্দর তখন এখানে আসিয়া প্র্যাক্টিস আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং অনিবার্যভাবে ইঁহাদের সহিত সূর্যসুন্দরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। যোগাযোগের ইতিহাসটি সুন্দর। হাবুমামা তখন সূর্যসুন্দরের কাছে ছিলেন, তিনি ঘটনাটি জানিতেন, তখনকার আরও অনেক ঘটনা জানা ছিল তাঁহার। হাঁসপাতালের নূতন কম্পাউন্ডার পরীক্ষিৎ রায় অতীত যুগের সেই সব ঘটনা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। হইবার কারণও ছিল, কারণ চন্দন রায় তাহারই ঠাকুরদাদা ছিলেন। ঠাকুরদাদার অতীত জীবনকাহিনী হাবুমামার জানা আছে শুনিবামাত্র সে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছিল এবং সেখানেই তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। হাবুমামাও আপত্তি করেন নাই, পরীক্ষিতের কোয়ার্টার নিরিবিলি, ছোকরাটিও ভালো। আসিবামাত্র তাঁহার সহিত ঠাকুরদা সম্পর্ক পাতাইয়া ফেলিয়াছে, যখন-তখন ভক্তিভরে চা করিয়াও খাওয়াইতেছে। বনিয়াদী বংশের ছেলে, হাবুমামার খুব পছন্দ হইয়াছে। রাত্রে আহারাদির পর হাবুমামা আসিয়া দেখিলেন পরীক্ষিৎ তখনও জাগিয়া আছে।

"কি হে এখনও ঘুমোওনি—"

"আপনি না এলে ঘুমোব কি করে? চা করব নাকি?"

"প্রচুর খাওয়া হয়েছে। এর উপর এখন চা খাওয়াটা কি ভালো?"

"তাহলে থাক। আপনি কিন্তু গল্প বলবেন বলেছিলেন আজ।"

"তাহলে চা কর।"

পরীক্ষিৎ তড়াক করিয়া বিছানা হইতে নামিয়া স্টোভ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হাবুমামা বলিলেন, "তোমার ঠাকুরদার গল্প কি একটা যেন চট্‌ করে বলে ফেলব। আমার লেখবার ক্ষমতা থাকলে তোমার ঠাকুরদাকে নিয়ে বই লিখতাম—"

নাক দিয়া বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া হাবুমামা বিছানার উপর উবু হইয়া বসিলেন।

পরীক্ষিৎ বলিল, "ডাক্তার-দাদুকে খুবই ভালবাসতেন ঠাকুরদা, বাবার মুখে শুনেছি। বাবাও ডাক্তার-দাদুকে খুব ভক্তি করতেন। স্বচক্ষে দেখেছি এটা।"

"করবে না? প্রথম আলাপেই যে তাক লেগে গিয়েছিল তোমার ঠাকুরদার। ত্রিপুরারি সিং তখনকার দিনে হাতে মাথা কাটতেন সকলের। ভাগনার কাছে তিনি তোমার ঠাকুরদাকে পাঠিয়েছিলেন একটা মিথ্যে মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্যে। ভাগনা তখন সবে এসেছে, ত্রিপুরারি সিংয়ের জমিদারিতে প্র্যাক্‌টিস করবে ঠিক করেছে। তোমার ঠাকুরদা ভাবতেই পরেননি যে ভাগনা সার্টিফিকেটটা দেবে না। তখনকার দিনে ত্রিপুরারি সিংয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করবার কথা ভাবতেও পারত না কেউ। ভাগনা তখন নিঃসহায় নিঃসম্বল কিন্তু তবু ভাগনা সার্টিফিকেট দিলে না। তোমার ঠাকুরদা বললেন—তাহলে আপনার পক্ষে এখানে প্র্যাক্‌টিস করা অসম্ভব হবে। অপমানিতও হবেন হয়তো। ভাগনা টলল না, বললে তাহলে কালই আমি চলে যাব। আমার দিকে চেয়ে বললে—হাবুমামা, জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল, কালই যাব আমরা। পরের দিন কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হলো একটা। স্বয়ং ত্রিপুরারি সিং এসে হাজির। তিনি বললেন, আপনার সৎসাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আপনাকে আমি যেতে দেব না। মিথ্যে সার্টিফিকেট টাকা ফেললে পাওয়া যায়, আমি পেয়েও গেছি, সিভিল-সার্জনই দিয়েছে একশ' টাকা ফি নিয়ে। কিন্তু সাচ্চা লোক দুর্লভ। আপনি থাকুন এখানে. আপনার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার ঠাকুরদা সেই দিনই নেমন্তন্ন করলে আমাদের। ভুরি-ভোজন হলো তাঁর কাছারিতে। সে-সব দিন আর ফিরবে না, বুঝলে—"

স্টোভ জ্বলিয়া উঠিল। পরীক্ষিৎ চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

হাবুমামা বেশ বড় একটি কাচের গ্লাসে প্রায় পুরা একগ্লাস চা লইয়া চোখ বুজিয়া ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগিলেন। পরীক্ষিতের এ সময় চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু হাবুমামাকে সঙ্গদান করিবার জন্য সে-ও এককাপ চা ছাঁকিয়া লইল। হাবুমামা প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া চা-টি ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করিলেন এবং যতক্ষণ না শেষ হইল চোখ খুলিলেন না। পরীক্ষিৎ স্মিতমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল তিনি চোখ খুলিতেই প্রশ্ন করিল—"এইবার ঠাকুরদার গল্প শোনান একটা—"

"ক'টা বেজেছে—"

"শ্যাওড়া গাছে প্যাঁচাটা ডাকল একটু আগে। বারোটা বেজেছে—"

"প্যাঁচাই বুঝি ঘড়ি তোমার—"

"না। ঘড়ি আছে একটা—"

একটি ছোট কৌটা খুলিয়া সে একটি হাত-ঘড়ি বাহির করিল।

"বারোটা বেজে কুড়ি। প্যাঁচাটা ঠিক বারোটার সময় ডাকে একবার।"

"রাত হয়ে গেছে। একটা ছোট গল্প শোনাই তোমাকে। তোমার ঠাকুরদাকে তুমি দেখেছ?"

"না—"

"তাঁর একটি চোখ ছিল না।"

"হ্যাঁ শুনেছি সে-কথা।"

"প্রিয়গোপালের বাবাকে দেখেছ?"

"না—"

"তিনি কালা ছিলেন। বদ্ধ-কালা। দেওয়ান ছিলেন তিনি। ওই কানা ম্যানেজার আর কালা দেওয়ানের ভয়ে থরথর কাঁপত সবাই। বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত। এরা দুজনে যখন গোপনীয় পরামর্শ করতেন তখন সেটা একটা দেখবার মতো জিনিস হত, যদিও কেউ দেখবার বিশেষ সুযোগ পেত না।"

"কেন—"

"তিন-কোশিয়া মাঠের মাঝখানে বসে পরামর্শ করতেন তাঁরা। তিন-কোশিয়া মাঠ দেখেছ?"

"দেখেছি। লোকে বলে ওখানে নাকি ভূত-প্রেত আছে—"

"এ গুজবটা তোমার ঠাকুরদাই রটিয়েছিলেন সম্ভবতঃ। ভূত-প্রেত আছে কিনা জানি না। কিন্তু ও-মাঠের তিন ক্রোশের মধ্যে জনমানবের বসতি নেই। অন্ততঃ সেকালে ছিল না। দেওয়ানজি আর ম্যানেজার ওই মাঠের মাঝখানে বসে পরামর্শ করতেন।"

"কেন—"

"কারণ খুব চেঁচিয়ে না বললে তো দেওয়ানজি শুনতেই পেতেন না কিছু। গাঁয়ের মাঝখানে ওরকম চেঁচিয়ে পরামর্শ করলে তা কি আর গোপন থাকে! তোমার ঠাকুরদা শেষে ওই বুদ্ধি বার করেছিলেন।"

"বাঃ, বেশ ভালো বুদ্ধি তো—"

"হ্যাঁ, খুব বুদ্ধিমান ছিলেন তোমার ঠাকুরদা—অত দূরদর্শী লোক আমি দেখিনি—আর একটা গল্প মনে পড়ল হঠাৎ—"

হাবুমামা বার দুই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া হাস্যদীপ্ত চক্ষে পরীক্ষিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কি গল্প মনে পড়ল, বলুন—"

হাবুমামা তবু কিছু বলিলেন না, স্মিতমুখে বসিয়া রহিলেন। পরীক্ষিতও চাহিয়া রহিল তাঁহার দিকে। হঠাৎ হাবুমামা বলিলেন, "আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি হাঁড়িগুলো মাথায় পরে' পরে' দেখছেন মাথাটা ঢোকে কিনা।"

"হাঁড়ি মাথায় ঢোকে কিনা দেখছিলেন? কেন?"

"তবে গোড়া থেকে শোন। ভাগনা প্রথম যে বাড়িটা করেছিল সেটা ছিল বাজারের কাছে। বাড়ির পিছনে ছিল একটা সীডলেস বেলগাছ আর তার পিছনে একটা পুকুর। তোমার ঠাকুরদা প্রায়ই সেখানে আসতেন। একদিন তিনি বারান্দায় বসে আছেন এমন

সময় একটা কুমোর এক ঝাঁকা হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছিল সামনের রাস্তা দিয়ে। তিনি ডাকলেন তাকে। তার কাছ থেকে বেশ ফাঁক-মুখো চারটে বড় বড় হাঁড়ি কিনলেন। তখনও বুঝিনি কেন কিনেছেন। গম্ভীর লোক ছিলেন, জিগ্যেস করতে সাহস হলো না। তিনি নিজেও কিছু বললেন না। তিনি যে ঘরে শুতেন, আমি থাকতুম ঠিক তার পাশের ঘরটিতে। দুটি ঘরের মাঝে একটি দরজা ছিল, সেই দরজায় ছিল একটা ফুটো। ভোরে উঠেই আমার প্রথম কাজ ছিল, সেই দরজার ফুটোয় চোখটি দিয়ে দেখা রায় মশায় কি করছেন। রোজই দেখতাম পুজো করছেন। সে দিন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। দেখলাম তিনি হাঁড়িগুলো মাথায় পরে' পরে' দেখছেন।

প্রত্যেকটি হাঁড়িরই মুখ বেশ বড় ছিল, সব হাঁড়ি-গুলোতেই তাঁর মাথা বেশ ঢোকে। তখন তিনি তাঁর চাকর চোখনকে ডেকে বললেন হাঁড়িগুলোতে আলকাতরা মাখিয়ে শুকিয়ে রেখে দিতে। কি ব্যাপার, কিছুই বুঝলাম না। জিগ্যেস করতেও সাহস হলো না। গম্ভীর লোক, তায় এক চোখ কানা। ভয়ংকর মনে হতো তাঁকে। কিছুক্ষণ পরে ভাগনা কল থেকে ফিরে এসে দেখলে চোখন হাঁড়িতে আলকাতরা মাখাচ্ছে। রায় মশায় বারান্দায় বসে আছেন—"

ভাগনা জিগ্যেস করলে—"হাঁড়িতে আলকাতরা লাগাচ্ছেন কেন—"

স্বল্পভাষী রায় মশায় সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"দরকার আছে—"

দরকারটা কি তা বোঝা গেল তিন মাস পরে। রায় মশায়ের নামে সর্বদাই দুটো-তিনটে ওয়ারেণ্ট থাকত। নীলকর কুঠিওলা সাহেবের সঙ্গে হরদম তাঁর মোকর্দমা লেগেই থাকত কিনা, খুন জখম দাঙ্গা প্রায়ই হতো। কিন্তু রায় মশায়কে ধরতে পারত না কেউ সহজে। ঘুষ দিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে, চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক বেরিয়ে যেতেন তিনি। মাস তিনেক পরে—রায় মশায় তখন আমাদের বাড়িতে রয়েছেন—সেদিন শনিবার অমাবস্যা, সন্ধ্যার পর বেশ মেঘ করে এসেছে, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ পুলিস এসে বাড়ি ঘেরাও করলে। রায় মশায় ঘরে বসে পুজো করছেন তখন। এখানকার দারোগা আসেননি, এসেছেন কলকাতা থেকে আর একজন দারোগা। এখানকার দারোগা চন্দরভান্ সিং রায় মশায়ের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে থাকতেন সর্বদা। তাঁর কেশটি পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না কখনও। নীলকর সাহেবরা নাকি একথা জানিয়েছিল তাই কলকাতা থেকে দারোগা এল তাঁকে অ্যারেস্ট করবার জন্যে। ভাগনা আপ্যায়িত করে বসালো সেই দারোগাকে। ভাগনার তো চিরকালই সব্বাইকে আপ্যায়িত করা স্বভাব। ভাগনে ভাবলে বোধহয় আপ্যায়িত করলে দারোগা হয়তো ছেড়ে দেবে রায় মশায়কে। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। লোকটি ডজন দুই ফুলকো লুচি, তদুপযুক্ত আলুর ছেঁচকি, হালুয়া আর চা খেয়ে রুমালে মুখটি মুছে বললে—"তাহলে বেরিয়ে আসতে বলুন রায় মশাইকে—তাঁর পুজো আশা করি হয়ে গেছে এতক্ষণ—"

'তাকে ছেড়ে দিতে পারেন না ?"

"ওরে বাপস্ ! সে অসম্ভব, চাকরি যাবে তাহলে—"

"তা যদি হয় তাহলে আর উপায় কি। হাবুমামা, দেখ রায় মশায়ের পুজো হলো কিনা। হয়ে থাকে তো আসতে বল তাঁকে।"

রায় মশায় নিজের ঘরে বসে প্রাণায়াম করছিলেন, একটু আগেই দেখে এসেছিলাম

আমি। গিয়ে দেখি তিনি নেই, আসন খালি। তাঁর ঘর থেকে ভিতরের দিকের বারান্দায় যাবার একটা দরজা ছিল। সে দরজাটা দেখলুম খোলা। সেই দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে গেলাম। রায় মশায় নেই। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে বললে কিছু জানে না। বেরিয়ে এসে বললাম, রায় মশায় তো ভিতরে নেই।

"সে কি!" আকাশ থেকে পড়লেন দারোগা।

তারপর বললেন, "নিশ্চয় আছেন, লুকিয়ে আছেন, বাড়ি সার্চ করব আমরা—"

ভাগনা বললে, "করতে পারেন—"

তন্নতন্ন করে সার্চ করা হলো বাড়ি। রায় মশায়কে পাওয়া গেল না। বাড়ির পিছনে খানিকটা জঙ্গলের মতো ছিল, তার পরেই একটা পুকুর। সেখানেও গেলেন দারোগা সাহেব পুলিস-টুলিস নিয়ে। কিন্তু রায় মশাইকে ধরতে পারলেন না, তিনি যেন কর্পূরের মতো উবে গেলেন।

"গেলেন কোথায়?" পরীক্ষিৎ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

হাবুমামা বার দুই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

"ওই কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে নেবে গেলেন সেই পুকুরে। আর একটা হাঁড়িও উপুড় করে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেকালে টর্চ ছিল না, পুলিসের লোক লণ্ঠন তুলে দেখলে গোটা দুই কেলে হাঁড়ি ভাসছে পুকুরে, এরকম ভেসেই থাকে, তাদের সন্দেহ হলো না কিছু। একটু পরে তারা চলে গেল। তোমার ঠাকুরদাকে ধরতে পারলে না। তারা চলে যাবার পর তোমার ঠাকুরদা কাদায়-জলে মাখামাখি হয়ে উঠে এলেন পুকুর থেকে। এসেই গরম জলে স্নান করে তখখুনি আবার ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। গেলেন হোসিয়ারপুর কাছারিতে। বললেন ওরা আবার এখুনি আসতে পারে। এল ঠিক। কিন্তু তখন পাখি উড়ে গেছে।"

হাবুমামা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ওরকম দূরদৃষ্টিওলা লোক আমি আর দেখিনি। উপস্থিতবুদ্ধিও অদ্ভুত ছিল। সে গল্প কাল বলব, এখন শুয়ে পড়।"

"আবার কি গল্প?"

"আরে, তোমার ঠাকুরদার কি একটা গল্প। সব সময় মনেও পড়ে না। কাল শুনো। এখন শুয়ে পড়—"

"হ্যাঁ, শুয়ে পড়ছি। শুয়ে শুয়েও বলতে পারেন—"

"ওফ্‌, নাছোড়বান্দা লোক দেখছি তুমি। শুয়ে শুয়ে পারব না। কাল তো দেখলে আমি নাক-মুখ ঢাকা দিয়ে শুই। একেবারে রেজিস্টার্ড পার্সেলটি হয়ে ঘুমের দেশে চলে যাই। ও অবস্থায় কথা বলা যাবে না। কাল শুনো—"

হাবুমামা শুইয়া পড়িয়া আপাদমস্তক ঢাকা দিলেন। পরীক্ষিতও শুইয়া পড়িল।

বীরুবাবুকেও গল্প বলিতে হইয়াছিল। ইজিপ্টের প্রাচীন গল্পে খানিকক্ষণ জমিয়াছিল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ জমিল না। স্বাতীও গল্পের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, "বাবা তুমি প্রোথেরো সায়েবের গল্প বল, বেশ জমবে—"

"পোথেরো কে বড়মামা"—এক জিজ্ঞাসা করিল।

"একজন সাহেব। বেশ মজার সায়েব ছিল সে।"

দিগন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরসুন্দরী বিছানার এক কোণে বসিয়া স্কার্ফ বুনিতেছিলেন। স্বাতী আসিয়াই তাঁহাকে এই ফরমাশটি করিয়াছে, এজন্য সে সঙ্গে করিয়া উলও আনিয়াছে। দিগন্ত প্রবেশ করিয়া একবার হাসিমুখে চোখ মিটমিট করিয়া এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর সোজা বিছানায় উঠিয়া গিয়া পুরসুন্দরীর কোলে মাথা দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

পুরসুন্দরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে করিস বুড়ো বয়সে। বুনছি যে—"

দিগন্ত আর একটু হাসিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বলিল, "গল্প শুনতে এলুম। কিসের গল্প হচ্ছে।"

স্বাতী বললে—"বাবা এবার প্রোথেরো সাহেবের গল্প বলবেন।"

"আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, এখন ভুলে গেছি। অদ্ভুত ছিল লোকটা এইটুকু মনে আছে শুধু।"

"বাবা এইবার আরম্ভ কর—"

বীরুবাবু আরম্ভ করিলেন।

"অদ্ভুত তো ছিলই, বিরাট বিদ্বানও ছিল। অক্সফোর্ডের এম. এ. ছিল। ইতিহাসের বই লিখেছিল একখানা। আর একটা বইও লিখেছিল—যাতে সে লিখেছিল যে এদেশে ইংরেজ রাজত্ব বেশীদিন আর টিকবে না, কারণ ইংরেজরাও 'ডালি' অর্থাৎ ঘুষ নিতে আরম্ভ করেছে। যে ন্যায়পরতার আদর্শ ইংরেজ এদেশে এনেছিল তার মর্যাদা আর তারা রাখতে পারছে না। সুতরাং রাজত্ব আর বেশীদিন থাকবে না।"

"খুব লম্বা ছিল, নয় বাবা ?" স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ, তা সাড়ে ছ' ফুট তো হবেই, বেশীও হতে পারে। বড় বড় লম্বা লোক তার কাঁধের কাছে পড়ত। আমাদের হেডমাস্টার মশাই বেশ লম্বা ছিলেন, কিন্তু তিনি তার কাঁধের কাছে পড়তেন। তার লম্বা গোঁফও ছিল। সাদা সিল্কের মতো গোঁফ, হাওয়ায় ফরফর করে উড়ত—"

দুই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"হাতের লেখাও বড় বড় ছিল। প্রতিটি অক্ষর প্রায় এক ইঞ্চি করে লম্বা। আমাদের ভিজিটর্স্ বই ফুলস্ক্যাপ সাইজের ছিল। প্রোথেরো সাহেব যখন লিখত তাতে, তখন ২০।২৫ পাতা লাগত। প্রতি পাতায় সাত আট লাইনের বেশী আঁটত না। দাগড়া দাগড়া লম্বা লেখা। দাঁতও খুব বড় বড় ছিল, ফাঁক ফাঁক, হলদে রঙ। গাঁউ-গাঁউ করে কথা বলত—"

স্বাতী হঠাৎ মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতেই বীরুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন সোমনাথ প্রবেশ করিতেছে। পুরসুন্দরীও মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "এস, বাবা এস, বস। স্বাতী মোড়াটা ভালো করে পেতে দে। ওই চাদরটা বিছিয়ে দে ওর উপর—"

স্বাতী মোড়াটা কোণ হইতে আনিয়া পাতিয়া দিল।

"তাঁবুতে অসুবিধে হচ্ছে না তো ?—"

"না, তাঁবু খুব ভালো লাগে আমার। টুরে বেরুলে তো তাঁবুতেই থাকতে হয়—"

"এখন উঠে এলে কেন ? রাত তো অনেক হয়েছে, ঘুম হচ্ছে না বুঝি—"

সোমনাথ কিছু না বলিয়া মুচকি হাসিল শুধু। আসলে স্বাতী এখানে ছিল বলিয়া সে-ও এখানে আসিয়াছে। স্বাতীও তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু দিগন্তর কানে কানে সে বলিল—"এখানে ও কেন যে অমন করছে কে জানে। ভয়ংকর ঘুমকাতুরে। একা একা খুব ঘুমুতে পারে—"

"অজানা জায়গা বলে বোধহয় ওরকম হচ্ছে। আমারও হয়।"

"মামা, পোথেরো সায়েবের গল্প বলছ না কেন। থেমে গেলে যে—"

একের তাগাদায় বীরুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন।

"আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন প্রোথেরো সাহেব ছিলেন ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌টার। তিনি প্রথম যখন আমাদের স্কুলে আসেন সে ঘটনাটা এখনও আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমরা তখন খুব নীচু ক্লাসে পড়তাম। হরেনবাবু হেডমাস্টার আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, খেতেন আর আমাদের পড়াতেন। খুব ভালো লোক ছিলেন, আমাদের পড়াতেনও খুব ভালো, কিন্তু বড্ড ভীতু ছিলেন তিনি। সন্ধ্যার সময় শিয়াল ডাকলেও ভয় পেতেন - বলতেন, কপাট জানালা সব বন্ধ করে দাও। একবার একটা ফেউ ডেকেছিল, তিনি ঘরের চারিদিকে ফিনাইল ছেটাতে লাগলেন। তখন কেশ মশাই ছিলেন। তিনি বললেন, ফেউ কি সাপ যে ফিনাইল ছেটাচ্ছেন ? হরেনবাবু বললেন—বইয়ে পড়েছি তীব্র গন্ধে যে-কোনও জানোয়ারই দূরে সরে যায়। এই বলে তিনি ঘরের চারিদিকে ফিনাইল তো ছেটালেনই স্কুলের চাকরটাকে বললেন হাতার চারিদিকেও ছেটাতে। তাঁর সব অদ্ভুত ধারণা ছিল। একদিন রাত্রে দুটো গাধা চীৎকার করছিল। তিনি হৈ-হৈ করে কেশ মশাইকে ডেকে তুললেন। কেশ মশাই তাঁর পাশের ঘরেই শুতেন। 'কি হয়েছে, অত চেঁচাচ্ছেন কেন ?'—জিজ্ঞেস করলেন তিনি। হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম।' তিনি গাধার ডাক নাকি আগে শোনেননি। কেশ মশাই নাকি বলেছিলেন, 'সিংহই বটে, তবে পশুরাজ সিংহ নয়। আপনার আত্মীয় কেউ হবে, আপনি এসেছেন শুনে হয়তো খোঁজ নিতে এসেছেন।' হরেনবাবুর উপাধি ছিল সিংহ। খুবই ভীতু লোক ছিলেন মাস্টার মশাই। তিনি যখন চিঠি পেলেন যে প্রোথেরো সাহেব মাসখানেক পরে তাঁর স্কুলে আসবেন তখন এত ভয় পেয়ে গেলেন যে বাবাকে এসে বললেন—'ডাক্তারবাবু, আমাকে কিছু-দিনের জন্য ছুটি দিন, অনেকদিন বাড়ি যাইনি, ঘুরে আসি, প্রোথেরো সাহেব চলে গেলে, তারপর আসব। সব শুনে-টুনে আমার বড় ভয় করছে। দৈত্যের মতো লোকটা তার উপর পাগল।' বাবা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। বাবা আশ্বাস দিলেন তাঁকে। বললেন, 'দেখুনই না কি হয়। আপনার চাকরি তো নিতে পারবে না। বড়জোর স্কুলের 'এড' বন্ধ করে দেবে। তখন দেখা যাবে।' প্রোথেরো সাহেবের সম্বন্ধে সত্যিই নানারকম ভয়ংকর গুজব রটেছিল। সবচেয়ে ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি এসে কি যে করবেন তা আগে থাকতে জানা যেত না। আন্দাজ করাও যেত না। কোনও স্কুলে গিয়ে তিনি হয়তো সব ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা করলেন, আবার কোনও স্কুলে হয়তো লাস্ট ক্লাসের ছেলেদের পরীক্ষা করলেন কেবল। একটা স্কুলে গিয়ে তিনি ছেলেদের নাকি পরীক্ষা করেননি, মাস্টারদের পরীক্ষা করেছিলেন, রীতিমত পরীক্ষা, ডিক্‌টেশন, অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভুগোল এইসব। আর একটা স্কুলের বিল্‌ডিংটা পরীক্ষা

করলেন। সিঁড়ি আনিয়ে ছাতে উঠলেন, খানিকটা দেওয়ালের প্লাস্টার খুঁড়ে খামে পুরে নিয়ে গেলেন। সেটা পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন নাকি রুড়কিতে। আর একটা স্কুলে গিয়ে পড়লেন ক্লার্ককে নিয়ে। সমস্ত পুরোনো হিসেবপত্র তন্নতন্ন করে দেখলেন। নানারকম করতেন তিনি। একটা স্কুলে গিয়ে বললেন—আজ ফুটবল খেলা হোক। একদিকে থাকবে মাস্টাররা, আর একদিকে ছাত্ররা। এগারো জন মাস্টার খেলোয়াড় পাওয়া গেল না, মাত্র চারজন খেলতে জানতেন, তাও খুব ভালো নয়! প্রোথেরো সাহেবের হুকুমে তাঁদের খেলতে হল, স্কুল থেকে বাকী সাতজন যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। সাহেব তো রেগে টং, হেডমাস্টারকে তাড়া করে গেলেন, বললেন, যে-স্কুলে ফুটবল টিম নেই, মাস্টাররা খেলতে জানে না, সে স্কুলের এড বন্ধ করে দেওয়া উচিত। গ্রাম থেকে শেষে জনকয়েক পুরোনো ছাত্রকে জোগাড় করে আনা হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিল বাবুলাল ভকত। তার খেলা দেখে খুব খুশী হলেন প্রোথেরো সাহেব। তিনি নিজে নাকি রেফারি হয়েছিলেন। এই রকম নানা কাণ্ড করতেন প্রোথেরো সাহেব। এই লোক আমাদের স্কুলে এসে যে কি করবে এই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন সবাই। জনমজুর লাগিয়ে ইস্কুলের হাতা পরিষ্কার করানো হতে লাগল। আমাদের ছুটি হয়ে গেল চার দিন, ইস্কুলটা ভালো করে চুনকাম করানো হলো। রংও দেওয়া হলো কপাটে জানালায়। ডেপুটি ইনস্পেক্টার মহম্মদ রসুল সাহেব এইসব করবার জন্যে হেডমাস্টার মশাইকে চিঠি লিখেছিলেন। রসুল সাহেব ছিলেন বুড়ো মানুষ, জেলার ইনস্পেক্টার ছিলেন তিনি। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই এসে থাকতেন। তিনি লিখলেন প্রোথেরো সাহেব যেদিন আসবেন তার ঠিক আগের দিন সকালে এসে পেঁছিবেন তিনি। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার জন্যে। প্রোথেরো সাহেবের যেদিন আসবার কথা, তার আগের দিন এসে হাজির হলেন তিনি। রসুল সাহেবের ছিল ধপধপে ফরসা রং, একটু বেঁটে, সাদা সিল্কের মতো দাড়ি আর চুল, চোখে নীলচে রঙের চশমা। একটু বেঁটে ছিলেন, সামনের দিকে একটু ঝুকে চলতেন রুপোবাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ির উপর ভর করে। কালো আলপাকার আচকান, ধপধপে সাদা পাজামা আর কালো মখমলের পামশু পরতেন। মাথার টুপিটাও কালো মখমলের। খুব আস্তে আস্তে মুচকি হেসে কথা বলতেন। হিন্দী-বাংলা-ইংরেজী মেশানো এক অদ্ভুত ভাষা ছিল তাঁর। সকালেই এসেছিলেন তিনি। এসেই বললেন— "আজ সাহেব কাটিহার স্কুল দেখবে। কুছ্ ভি ডিফেক্ট্ পাবে না। পহলে সে সব ঠিক কর দিয়া। আজ হিঁয়াভী ঠিক কর দেংগে।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা রসুল সাহেব, আগে তো ডিভিশনাল ইনস্-পেক্টারের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা থাকতেন, এখন সে নিয়ম বদলে গেছে নাকি?"

"এক এক সাহেবের এক এক কানুন। মিস্টার প্রোথেরো লাইকস্ টু রোম অ্যালোন।"

রসুল সাহেব সমস্তদিন আমাদের স্কুলে রইলেন। নিজে হিসাবের কাগজপত্র দেখলেন। আমাদের ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে পড়া ধরলেন, যারা বেশ চটপট জবাব দিতে পারলে না, তাদের বললেন, তোমাদের কাল স্কুলে আসতে হবে না, থোড়াভি ডিফেক্ট মিললে সাহেব হাল্লা মাচাবে। তোমাদের কাল ছুটি। তারপর তিনি অফিসের খাতা-গুলো ভালো করে দেখলেন। স্কুলের বিল্ডিংটাও দেখলেন। এক জায়গায় একটু ফাট

ধরেছিল দেয়ালে, মিস্ত্রী ডাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু সারিয়ে নিলেন। স্কুলের ফুটবল টিমটা ঠিক আছে কিনা খবর নিলেন। মাস্টারদের বললেন তাঁরা যেন ফিটফাট হয়ে স্কুলে আসেন আর যিনি যে বিষয় পড়ান তার বইগুলো যেন ভাল করে পড়ে আসেন। প্রোথেরো সাহেব কখন যে কোথায় ক্যাঁক করে চেপে ধরবেন বলা যায় না। রসুল সাহেব ভোর ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্কুলেই রইলেন। খেতে পর্যন্ত এলেন না। আমরা তাঁর খাবার স্কুলেই পেঁছে দিয়ে এলাম। খাবার দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি নিজে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক ঘরের ঝুল ঝাড়াচ্ছেন। স্কুলের চাকরটা একটা বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাতের, দেওয়ালের ধুলো আর ঝুল ঝাড়ছে, রসুল সাহেব মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাড়িতে চুলে ঝুল লেগেছে। এর পর চুনকাম করানো হলো। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে তিনি স্নান করলেন, তারপর চায়ের টেবিলে বসলেন। তাঁর ইনস্পেক্টারি জীবনের নানারকম গল্প করতে লাগলেন। আমরা আড়াল থেকে সব শুনছিলুম। তিনি একটা অদ্ভুত গল্প বলেছিলেন। আমাদের দেশে তখন নাইট স্কুলের রেওয়াজ হয়নি। রাত্রে যে স্কুল বসতে পারে, তা কল্পনাও করত না কেউ। রসুল সাহেব বললেন তিনিই বোধহয় প্রথম নাইট স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর নিজের গ্রামে। তিনিই তখন সে অঞ্চলে ডেপুটি ইনস্পেক্টার হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা গোপন করতে হয়েছিল, গভর্নমেণ্ট তখন নাইট স্কুল করবার জন্য সাহায্য দিত না। অথচ দিনের বেলা ছাত্র পাওয়া মুশকিল। গ্রামের অধিকাংশই চাষী আর গোয়ালা। তাদের ছেলেরা দিনের বেলায় গরু চরায়, মাঠের কাজ করে। স্কুলে আসবার তাদের অবসর নেই। রসুল সাহেব তখন গ্রামের সবাইকে ডেকে স্থির করলেন যে স্কুল সন্ধের পরই বসবে রোজ। কিন্তু যদি কোনদিন কোন সাহেব-সুবো স্কুল ভিজিট করতে আসে সেদিন দিনের বেলা স্কুল বসাতে হবে। ওপরে তিনি জানাবেন না যে নাইট স্কুল বসানো হচ্ছে। ওপরে কেবল জানানো হবে যে স্কুল হয়েছে একটা, সেটা যে নাইট স্কুল এ খবরটা চেপে যাবেন তিনি তাদের কাছ থেকে। তাঁর পাতলা দাড়ি চুমরে মুচকি হেসে রসুল সাহেব বললেন, ভালো কাজ করতে গেলে কানুনকে কুছ কুছ বদ্‌লে নিতে হয়। তাতে দোষ হয় না। এই সব গল্প হচ্ছে এমন সময় কাটিহার থেকে সন্ধের ট্রেন এলো। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই স্টেশন ছিল, তখন ট্রেন এলে দেখা যেত, গাড়ি আসা-যাওয়ার শব্দও পাওয়া যেত। গাড়ি আসার শব্দে রসুল সাহেব উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, বললেন, ইস্ গাড়ি মে কাটিহার সে কুছ খবর আনা চাহিয়ে। আজ প্রোথেরো সাহেব তো কাটিহার স্কুল জরুর ভিজিট কিয়া হ্যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবর এসে পেঁছল। কাটিহার স্কুলের বৃদ্ধ হেডক্লার্ক নবীনবাবু এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে আমরা আঁতকে উঠলুম। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নাকের খানিকটা এবং বা চোখটাও ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢাকা। তিনি এসেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বলতে লাগলেন, আমাকে মেরেছে, এই বুড়ো বয়সে আমাকে মেরেছে প্রোথেরো সাহেব। আমি আর চাকরি করব না। আমি আর চাকরি করব না। বার বার এই বলে কাঁদতে লাগলেন খুব। রসুল সাহেব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন খুব, একটি কথা বলতে পারলেন না, নির্বাক হয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কেবল।

বাবা নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছিল, কেন মারলে আপনাকে, সব খুলে বলুন না। দরকার হলে নালিশ করব আমরা সাহেবের নামে। নবীনবাবু

একটু থেমে থেমে ব্যাপারটা বললেন। সাহেব তাঁকে হিসাবের লেজারটা আনতে বলেছিলেন। তারপর সেই লেজার থেকে তাঁকে প্রায় পঞ্চাশটা ফিগার ডিকটেট করলেন। তারপর বললেন, যোগ কর। অত বড় যোগ চট্ করে কি করা যায় ? তবু করলাম, কিন্তু ভুল হল। আর একবার করতে বললেন, সেবারও ভুল হল। তৃতীয়বার ঠিক হলো। কিন্তু লেজারে যে যোগফল ছিল তার সঙ্গে মিলল না। সাহেব গাঁউগাঁউ করে জিজ্ঞেস করলেন—এর মানে কি। আমি শুধু বললাম, আই ডোণ্ট নো সার। যেই বলা অমনি খাতাটা ছুঁড়ে মেরে দিলে আমার মুখের উপর। আর একটু হলে অন্ধ হয়ে যেতুম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোক। রসুল সাহেব চোখ বড় বড় করে শুনছিলেন সব! তার চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে গিয়েছিল। হেডক্লার্ক কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন। রসুল সাহেব তখন বাবার দিকে চেয়ে বললেন—'এবার আমারও কলিজাতে ডর ঘুসছে ডাক্তার সাহেব। এ তো আদমি নয়, খুনী শের হ্যায়। কখন কার উপর লাফিয়ে পড়বে কে জানে! কি করা যায় বলুন তো।' বাবা বললেন, 'কিছু ভয় নেই। এখানে যদি মারধোর করে আমরাও ছেড়ে দেব না। আমি রামপীরিতকে খবর পাঠাচ্ছি এখুনি। সে জনকয়েক লাঠিয়াল জোগাড় করে রাখুক।' রসুল সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে বাবার দুটো হাত ধরে বললেন, 'খবরদার অমন কাজ করবেন না ডাক্তারবাবু। তাহলে আপনাদের স্কুল তো উঠে যাবেই আমারও চাকরি যাবে। হয়তো জেলও হয়ে যেতে পারে। খবরদার ও মতলব করবেন না। আসল ইংরেজের বাচ্চা, আসল গহুমনা সাপ, কিং কোব্রা—তার পুছড়ি দাবনা হরগিজ মুনাসিব নহি হ্যায়।'

বীরুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন. তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া ছিলেন। অর্ধবিস্মৃত শৈশব আবার যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার মনে। তিনি ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার ছেলেমেয়েরা তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছে।

"তারপর কি হলো—"

"প্রোথেরো সাহেব এলেন তার পরদিন।"

"এসে কি করলেন—"

"স্কুলে এসে ঘুরে গেলেন একবার, আর কিছুই করলেন না। সমস্ত দিন ডাকবাংলোয় বসে লিখতে লাগলেন। তখন তিনি কি একটা বই লিখছিলেন। হেডমাস্টার মশাইকে বললেন সন্ধের পর তিনি ছেলেদের নিয়ে আকাশের নক্ষত্র দেখবেন, ছেলেরা সে-সময় যেন স্কুলের মাঠে জড়ো হয়। আমাদের তখন নেচার স্টাডি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বলে একটা বই ছিল। তাতে মোটামুটি গাছপালার নাম, সাধারণ পাখিদের নাম এই সব জানতে হতো, আকাশের নক্ষত্রও চিনতে হতো। তাছাড়া ছোট জমির টুকরোতে বা টবে ধান গম যব মটর এইসব বীজ ছিটিয়ে দিয়ে তাদের অঙ্কুর কেমন করে বেরোয়, কখন পাতা বেরোয়, গাছ রোজ কেমন করে বাড়ে এইসবও শেখবার কথা। কিন্তু আমাদের স্কুলে ওই বিষয়টি ভালো করে পড়ানো হতো না। মাত্র পঁচিশ নম্বর থাকত বলে ওর উপর বিশেষ জোরও দিত না কেউ। প্রোথেরো সাহেব ইংরেজী অঙ্ক ছেড়ে যে ওই subject-টার উপর জোর দেবেন, একথা কেউ ভাবেনি। হেডমাস্টার মশাই তো ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন, তিনি বললেন আমি তো কিছু জানি না ও-বিষয়ে।

আজ আমারও অদৃষ্টে মার নাচছে দেখছি। আমি আর সন্ধ্যের সময় যাব না ভাবছি। আমার পেটটাও কামড়াচ্ছে। রসুল সাহেব বললেন—না, না ওসব মতলব করবেন না। তাহলে আরও ক্ষেপে যাবে। আমিও কি কিছু জানি? আম, বাবুল, কাটাহার এই রকম দু'চারটে পেড় চিনি, আর কোয়া, কবুতর, ময়না, মুরগী এইরকম দু'চারটে চিড়িয়া চিনি, বাস্। সান আর মুন্ ছাড়া আকাশের আর কিছুই চিনি না। কিন্তু তা বলে আমি কি ডিউটি থেকে পালিয়ে থাকতে পারি? যদি সাহেব কুছ পুছে আই শ্যাল কন্‌ফেস্। তারপর যা হয় হোক।

প্রোথেরো সাহেব সমস্ত দিন র চা খেয়ে ক্রমাগত বই লিখে যেতে লাগলেন। নিজেই স্পিরিট স্টোভে চা করছিলেন। কারো সাহায্য নিচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে চা খাচ্ছিলেন আর লিখছিলেন। খুব বড় বড় অক্ষরে লিখছিলেন। চার পাঁচ লাইনে একটা কাগজ ভরে যাচ্ছিল। তিনি এক পাতা লিখেই সেটা টেবিল থেকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছিলেন আর তাঁর চাপরাসী সেটা সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে পাশের টেবিলে জমা করে রাখছিল। সেখানে সমস্ত দিনে কাগজের একটা স্তূপ হয়ে গেল। সাহেব সমস্ত দিন চা, বিস্কুট আর ডিম সিদ্ধ খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। বাবা খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা। প্রোথেরো সাহেব জানালেন করতে হবে না। সন্ধের একটু আগে খবর এল সাহেব মদ খাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বোতল বার করেছে।

এই শুনে রসুল সাহেব খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন—একেই তো খফ্‌ত মেজাজের লোক। তার উপর মাতোয়ারা হলে কি যে করবে খোদাই জানে। হেডমাস্টার মশাই বার বার বলতে লাগলেন, আমার খুব পেট কামড়াচ্ছে, আমি যাব না। রসুল সায়েব কিন্তু নাছোড়। তিনি বলতে লাগলেন, যেতে আপনাকে হবেই। আপনাকে না দেখলে আরও খফ্‌ত হোয়ে যাবে সাহেব। আপনি চলুন, আমি থাকব, সাহেবকে বুঝিয়ে বলব সব।

সন্ধের আগে থেকেই স্কুলের সামনের মাঠে চাকর ভুট্টা আমাদের দুটো চাকরকে নিয়ে বেঞ্চি সাজাতে লাগল। টেবিল চেয়ারও নিয়ে গেল। দু'একটা বড় বড় হ্যারিকেন লণ্ঠনও তেল ভরিয়ে রাখা হলো। তখনও পেট্রোম্যাক্স বাজারে আসেনি। একটু অন্ধকার হলেই প্রোথেরো সাহেব হাজির হলেন এসে। প্রকাণ্ড একটা বিলিতী টর্চ তাঁর হাতে। টর্চ দেখে আমরা তো অবাক। তখনও টর্চ বাজারে আসেনি। তিনি এসেই একটা ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, শো মি গ্রেট্ বেয়ার। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আর একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও চুপ। তৃতীয় ছেলেটাও যখন দেখাতে পারল না তখন তিনি হেডমাস্টার মশাইকে বললেন—শো দেম্ দি গ্রেট্ বেয়ার।

হেডমাস্টার মশাই তখন কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বললেন—তিনি আকাশের কোন নক্ষত্রই চেনেন না। রসুল সাহেব তখন এগিয়ে এসে বললেন—আমিও চিনি না। আমরা সবাই আর্ট কোর্সের লোক, আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান খুব কম। যখনই নেচার স্টাডি ছেলেদের কোর্স করা হয়, তখনই আমি একটা নোট দিয়েছিলাম যে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেবার মতো টিচার প্রায় কোন স্কুলেই নেই। যাই হোক, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো একজন বিজ্ঞান অধ্যাপক আমাদের মধ্যে এসেছেন। আপনি দয়া করে আজ আমাদের কিছু শিখিয়ে দিন।

প্রোথেরো সাহেব বললেন, অল্ রাইট্।

তারপর তিনি আকাশে টর্চের আলো ফেলে আমাদের নক্ষত্র দেখাতে লাগলেন। গ্রেট্ বেয়ার, পোল-স্টার, লিট্‌ল্ বেয়ার, ড্রেকো, হারকিউলিস আর্কটুরাস্ এবং আরও অনেক নক্ষত্র চিনিয়ে দিলেন আমাদের। ওদের মধ্যে যে আমাদের সপ্তর্ষি, ধ্রুব, ধ্রুব-মাতৃমণ্ডল, স্বাতী আছে তা অনেক বড় হয়ে পরে জেনেছিলাম। আকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার প্রথম গুরু প্রোথেরো সাহেব। সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত নক্ষত্রের ক্লাস হয়েছিল। প্রোথেরো সাহেব রসুল সাহেবকে বললেন, ছেলেদের খিদে পেয়ে যাচ্ছে, আপনি ওদের জন্য কিছু গরম গরম খাবারের ব্যবস্থা করুন। দাম আমি দেব। স্টেশনের গুজরাটি খাবারওলা বিঠল ভাই আমাদের কচুরি ভেজে খাইয়েছিল। প্রোথেরো সাহেবের পঁচিশ টাকা খরচ হয়েছিল। প্রোথেরো সাহেব নিজেও কচুরি খেয়েছিলেন খুব। এক একবারে চার-পাঁচটা করে মুখে পুরেছিলেন। সে ক'ঘণ্টা যে কি আনন্দে কেটেছিল তা আর কি বলব। আকাশের নক্ষত্রদের ঘিরে যে-সব বিদেশী রূপকথা আছে তা-ও শুনিয়েছিলেন আমাদের। তিনি ইংরেজীতে বলছিলেন এবং হেডমাস্টার মশাই সেগুলো বাংলা করে শোনাচ্ছিলেন আমাদের। তার পরদিন তিনি ভিজিটার্স বুকে স্কুল সম্বন্ধে প্রায় কুড়ি পাতা লিখলেন। ভালই লিখেছেন শুনলাম। তাঁর লেখার ফলে আমাদের স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার জন্যে নতুন শিক্ষক এলেন একজন।"

"খোকা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি। ওঠ, নিজের বিছানায় গিয়ে শুগে যা—"

"আমরাও উঠি এবার। রাত অনেক হয়েছে। বারোটা বাজে—"

"তাই নাকি। তাহলে এবার যাও, শুয়ে পড় তোমরা। আমরাও শুই—"

বীরুবাবুর ঘরের সভা সঙ্গ হইল, যদিও এক-দুই-তিনের ইচ্ছা ছিল গল্প আরও খানিকক্ষণ চলুক।

॥ ৩ ॥

সূর্যসুন্দরকে চম্পা গান শুনাইতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া গগন সে গান শুনিতেছিল। সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলে চম্পা ধীরে ধীরে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। চম্পা সবই ধীরে ধীরে করে। তাহার গমনভঙ্গিমা ধীর, চলে ধীরে ধীরে, কথাও বলে মৃদুকণ্ঠে। যখন গান ধরে তখন তাহার কণ্ঠস্বর খুব উচ্চ গ্রামে উঠিয়া নিজেকে জাহির করিতে চায় না। যখন কাহারও দিকে চায় চোখের পাতাটিও অতি ধীরে ধীরে তোলে। তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব যেন একটি শান্ত সুরে বাঁধা।

গগন বলিল, "দাদুকে কি একটা বাজে গান শোনালে—"

"ঠাকুরপো যে ওই গানটাই গাইতে বলেছিল।"

"তোমার ঠাকুরপোর যেমন বুদ্ধি—"

চম্পা মৃদু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, সে কখনও কোন প্রতিবাদ করে না।

"তোমার কি খুব ক্লান্ত লাগছে?"—গগন প্রশ্ন করিল।

"না। কেন?"

"চল না তাহলে গঙ্গার ধারে বসা যাক একটু। এখুনি চাঁদ উঠবে। গঙ্গার

ওপারের বাবলা-বনের ফাঁক দিয়ে চাঁদ ওঠাটা যে কি সুন্দর তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে ওই চাঁদ ওঠার স্মৃতিটা জড়িয়ে আছে। ছেলেবেলায় বাবলা-বনের ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ওই চাঁদকে কত রূপে দেখেছি। চল আজ দেখা যাক কি মেক্ আপ নিয়ে নাবছেন তিনি—"

"গঙ্গার ধারে কি মাটিতে বসবে ?"

"পাগল। দুটো ক্যাম্প-চেয়ার নিয়ে যাই চল।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই বোঝা গেল চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্যই গগন চম্পাকে নির্জন নদীতীরে লইয়া আসে নাই। সে আসিয়াছিল একটি গোপন পরামর্শ করিবার জন্য। মিস বোসের সম্পর্কে। মিস বোস যে মিস নহেন মিসেস, এ-খবরটি গগন জানিত। চম্পাকে আনিতে সে যখন শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল তখন কোনও সবজান্তার নিকট মিস বোসের গোপন বিবাহ-কাহিনীটি শুনিয়াছিল সে। শত চেষ্টা করিলেও এসব জিনিস সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায় না। সবজান্তা ভদ্রলোকটি মিস বোসের অবিবাহিত স্বামী সুপর্ণ সিংহের বর্তমান ঠিকানাটিও বলিয়াছিল গগনকে। ঠিকানাটি জানিবার পর হইতেই গগনের মনে একটি মতলব জাগিয়াছে। ভাবিয়াছিল পত্রযোগেই ব্যাপারটা হয়তো সুসম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু সুব্রত যখন স্বশরীরে এখানেই হাজির হইয়াছে তখন এই তো সুযোগ। তাছাড়া মিস বোসও এখানে রহিয়াছে। সে নিজেই সুব্রতকে বলিতে পারে। সুপর্ণবাবু যে-অঞ্চলে এখন নূতন করিয়া উড়িবার চেষ্টা করিতেছেন সুব্রত সেই অঞ্চলেই এখন সুপারিনটেণ্ডেট অব পুলিস। সুব্রত চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাঁহাকে পিঞ্জরাবন্ধ করিতে পারে। কিন্তু সুব্রতকে কিছু বলিবার পূর্বে তাহার মনে হইয়াছে সর্বাগ্রে চম্পার সহিত পরামর্শ করা দরকার। কেন মনে হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। হয়তো যে-কোনও অজুহাতে পত্নীর সান্নিধ্য লাভটাই প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ পরামর্শদাত্রী হিসাবে চম্পা যে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নহে তাহা গগনও জানে। অবশ্য চম্পার মাধ্যমেই তাহার মিস বোসের সহিত আলাপ, ইহাও একটি কারণ হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া গগন আশ্চর্য হইয়া গেল। চম্পাচরিত্রের এমন একটা দিক দেখিতে পাইল যাহা সে ইতিপূর্বে দেখে নাই। চম্পা মিস বোসের সমস্ত কাহিনী জানে, অথচ এতদিন চুপ করিয়া ছিল, তাহাকে পর্যন্ত কিছু বলে নাই।

"তুমি সব জানতে ! আমাকে কিছু বলনি তো।"

"পরের কথা তোমাকে বলে কি হবে। তাছাড়া সত্যি কি মিথ্যে তাও তো জানা নেই ঠিক। ও নিয়ে ঘোঁট করে কি লাভ।"

"তাহলে সুব্রতকে বলব না ?"

চম্পা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ওকে আগে জিগ্যেস করি, ও যদি বলে তাহলে বলো। ছোট জামাইবাবু কি করতে পারেন ?"

"পুলিসের লোক দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারে। সুপর্ণ ওরই এলাকায় থাকে, ও যদি ওকে ডাকিয়ে এনে একবার কড়কে দেয় তাহলেই বাবুসায়েবের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তার আগে অনুপমার মতটা নেওয়া উচিত।"

"তা ঠিক। অনুপমা যদি মত দেয় তাহলেই সুব্রতকে জিগ্যেস করব।"

"হ্যাঁ সেই ভালো। অনুপমাকে জিগ্যেস করলে কতখানি সত্যি কতখানি মিথ্যে তাও বোঝা যাবে। আমাদের তো লোকের মুখে শোনা, আর এ-দেশের লোককে তো চেনই। কারো ভালো দেখতে পারে না। অনু বিলেত গেছে, রোজগার করে খুব, কারও তোয়াক্কা করে না—এই জন্যে লোক হিংসেয় ফেটে পড়ছে। হয়তো সবটাই বানানো গল্প। সত্যি মিথ্যে না জেনে কিচ্ছু করতে যেও না।"

গগন মুগ্ধ হইয়া গেল। এ চম্পার পরিচয় সে আগে তো পায় নাই।

হঠাৎ বলিল, "আমায় সত্যি মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও, এই গানটা গাও তো।"

"এখন আবার গান!"

"ক্ষতি কি!"

"কেউ শুনতে পায় যদি।"

"পাগল হয়েছ। কেউ জেগে নেই এখন।"

"খুব আস্তে আস্তে গাইছি তাহলে।"

"বেশ।"

একটু পরেই চম্পার গান নির্জন নদীতীরে একটা স্বপ্নলোক সৃজন করিয়া ফেলিল। নদীর অস্ফুট কল্লোল, অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনিও চম্পার গানের সহিত যোগ দিল।

গগন বলিল—"দেখ, দেখ—"

চম্পা চোখ তুলিয়া দেখিল নদীর ওপারে বাবলা-বনের আড়ালে চাঁদ উঠিয়াছে। মনে হইতেছে একটা বিরাট কালো জাফরির আড়ালে দাঁড়াইয়া চাঁদও যেন চম্পার গান শুনিতেছে।

॥ ৪ ॥

পার্বতী পুরসুন্দরীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। সকলের খাওয়াদাওয়া চুকিয়া যাইবার পর, রান্নাঘরের কাজ সারিয়া গরম তেলের বাটিটি লইয়া সে পুরসুন্দরীর নিকট আসিয়াছিল। পুরসুন্দরী আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শোনে নাই। বীরুবাবু বিছানায় বই পড়িতেছিলেন। তখনও তাঁহার ঘুম আসে নাই। Conquest of Mexico and Peru বইটিতে তন্ময় হইয়াছিলেন। পার্বতী যে নিকটে বসিয়া পুরসুন্দরীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল তাহা তাঁহার মনোযোগ বিচলিত করিতে পারে নাই। একটু পরে পার্বতী কথা বলিল।

"মা, তুমি গগনকে একটু শাসন করে দিও। বউকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। সন্ধেবেলা দাদুর কাছে গান গাইয়েছে। এখন আবার দেখলাম নদীর ধারে নিয়ে গেছে। দু'জনে পাশাপাশি ক্যাম্পচেয়ারে বসে আছে। চম্পা গান গাইছে আবার। পোয়াতি মানুষ, অতটা ভাল নয়।"

পুরসুন্দরী মনে মনে এ-কথায় সায় দিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। তিনি জানেন মানা করিলে কোন ফল হইবে না, তিক্ততার সৃষ্টি হইবে কেবল। পার্বতী কিন্তু নাছোড়।

"গগনকে ডেকে আনি। তুমি মানা করে দাও—"

"ওরা আপনি উঠে যাবে এখনি। দিগন্ত কোথা ?"

"সে নিজের ঘরে বসে কি একটা লিখছে, তাকেই বরং ডেকে বলি তোমার নাম করে গগনকে গিয়ে বলুক—"

হঠাৎ বীরুবাবু কথা কহিয়া উঠিলেন।

"না, না. দিগন্তকে এখন বিরক্ত করিস না, ও নিজের থীসিসটা লিখছে বোধ হয়, তুই এবার শুগে যা, কোথায় শুবি ?"

"ছোট কাকা মিস বোসের ঘরে আমার বিছানা পাতিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ও খ্রীষ্টানীর সঙ্গে আমার শুতে ইচ্ছে করছে না। জায়গা থাকলে এখানেই শুয়ে পড়তাম কিন্তু এখানে জায়গা কই।"

বীরুবাবু সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন।

"ও খ্রীষ্টানী তোকে কে বললে। আমি শুনেছি ভদ্র হিন্দুবংশের মেয়ে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে।"

পার্বতী জেদী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

"অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড় গিয়ে—"

বীরুবাবু আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং মেক্সিকো-পেরু বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

পার্বতী অনুপমার তাঁবুতে গিয়া যাহা দেখিল তাহা সে দেখিবে বলিয়া প্রত্যাশা করে নাই। দেখিল অনুপমা নিজের বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। কাঁদিতেছে নাকি ! পার্বতী নীরবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মিস বোস, ঘুমিয়েছেন নাকি—"

অনুপমা উঠিয়া বসিল। তখন আর পার্বতীর সন্দেহ রহিল না। সত্যই সে কাঁদিতেছিল, চোখে জল। চোখের জলের কি মহিমা আছে জানি না, পার্বতীর বিরুদ্ধ ভাবটা হঠাৎ যেন কুয়াশার মতো মিলাইয়া গেল। সে তাহার পাশে বসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া তাহার মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া সস্নেহে বলিল. "কাঁদছ কেন ভাই—"

ইহাতে অনুপমার কান্না আরও বাড়িয়া গেল। সে ঘাড় হেঁট করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল পার্বতী।

"এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার ?"

অনুপমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সামলাইয়া শান্ত হইয়া বসিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এমন সুখের সংসারে কি কারও কষ্ট হতে পারে। এমন পরিপূর্ণ সুখের সংসার আমি আর দেখিনি !"

"তবে কাঁদছিলেন কেন ?"

"এমন সুখের সংসারের মাঝখানে এসেছি বলেই হঠাৎ নিজের জীবনের দুঃখটাকে এমন স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। কেঁদে তাই হালকা হয়ে নিলাম একটু—"

"কি এমন দুঃখ আপনার—"

অনুপমা ম্লান হাসিয়া পার্বতীর মুখের দিকে চাহিল।

"গভীর দুঃখের কথা কাউকে বলা যায় না। চোখের জলই তার একমাত্র ভাষা, তা তো আপনি দেখেছেন। আর কি বলব—"

পার্বতী কয়েক মুহূর্ত অনুপমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ আবদারের সুরে বলিয়া বসিল—"না শুনে আমি ছাড়বই না—"

হঠাৎ সে অনুপমাকে জড়াইয়া ধরিল।

"এ আমার অতি গোপন কথা, কাউকে বলি না।"

"আমাকে কিন্তু বলতেই হবে।"

পার্বতীর জেদ যেন উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

"এখন থাক। আর একদিন চেষ্টা করব। কিন্তু কি করবেন শুনে? উপন্যাসের মতো শোনাবে। সত্যি বলে মনে হবে না। মনে হবে বানিয়ে বলছি।"

"আমি তাই শুনব—"

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল।

"মিস বোস জেগে আছেন নাকি—"

গগনের গলা। অনুপমা তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আসুন। জেগে আছি—"

গগন ভিতরে ঢুকিল।

"পার্বতী তুই এখানে?"

"আমি যে এখানে শোব। ওই তো আমার বিছানা—"

গগন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চম্পার পরামর্শ অনুসারে সে অনুপমার সঙ্গে তাহার স্বামীর বিয়ের কথাবার্তা বলিতে আসিয়াছিল। পার্বতীর সম্মুখে কথাটা প্রকাশ করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। অথচ ইহাও তাহার মনে হইল, ব্যাপারটা আজ রাত্রেই নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়া ভালো। মেজকাকা কাল সকালেই আসিয়া পেঁছাইবেন। তা ছাড়া সমস্ত দিন হৈ-চৈ তো আছেই। সুব্রতরও ছুটি হয়তো বেশীদিন নাই। দাদুর অবস্থা যখন ভালোর দিকে তখন সে হয়তো কালই চলিয়া যাইতে চাহিবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে অনুপমাকে বলিল, "ঘুম পেয়েছে নাকি? চোখ দুটো ফুলো ফুলো দেখছি।"

পার্বতী তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। কিন্তু একটু আগে সে যে কাঁদিতেছিল তাহা আর বলিল না। অনুপমা বলিল, "না, ঘুম পায়নি। কেন বলুন তো—"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল, গোপনীয় কথা। যদি আপত্তি না থাকে একটু বাইরে চলুন, দুটো চেয়ার পাতা আছে।"

পার্বতী বলিল, "বৌদিও আছে নাকি সেখানে?"

"না। সে শুতে গেল।"

"বৌদিকে নিয়ে তুমি গঙ্গার ধারে বসেছিলে মা শুনে খুব রাগ করছিলেন। কতরকম পাখিপক্ষী রাতের আকাশে উড়ে যায়। পোয়াতি মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ওসব উড়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়—"

"আচ্ছা থাম থাম পাকা বুড়ি কোথাকার।"

"মায়ের কাছে যখন বকুনিটি খাবে তখন বুঝতে পারবে—"

গগন অনুপমার দিকে চাহিয়া বলিল, "যাবেন তো চলুন—"

"চলুন—"

গগনের সহিত অনুপমা বাহির হইয়া গেল। একটু পরে পার্বতীও নিঃশব্দচরণে তাহাদের অনুসরণ করিল।

॥ ৫ ॥

উষাকে কুমার যে ঘরটি দিয়াছিল সেটি বেশ বড় ঘর। ঘরে একটি মাত্র মাঝারি গোছের চৌকি ছিল। সেটিতে সদানন্দের বিছানা করিয়া দিয়া উষা নিজের বিছানা পাতিয়াছিল মেঝের উপর। প্রশস্ত বিছানা না হইলে তাহার চলে না। কারণ তাহার ছেলে তিনটি রাত্রে ঘুমের ঘোরেও হুটোপাটি করে। বার বার তাহাদের সোজা করিয়া শোওয়াইয়া দিতে হয়। তাহাদের বাড়ীতে যে শোওয়ার ঘরটি আছে তাহার মেঝে প্রায় সম্পূর্ণ চৌকি দিয়া ঢাকা। ছোটখাটো একটি মাঠ বলিলেই হয়। তাহার উপর এক-দুই-তিন সারারাত ঘুরপাক খায়, আর উষা তাহাদের বার বার ঠিক করিয়া শোয়াইয়া দেয়। এখানে তাই সে মাটিতে বিছানা করিয়াছে।

গভীর রাত্রি। রামনিবাস বাবাজীর কীর্তনের দল অনেকক্ষণ কীর্তন গাহিয়া এখন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইতেছে। চতুর্দিকে ঝিল্লীধ্বনি। মাঝে মাঝে দুই একটা প্যাঁচা ডাকিতেছে। সদানন্দের দিবানিদ্রাটি বেশ দীর্ঘ হইয়াছিল তাই রাত্রে ঘুম আসিতেছিল না। ঘুম না আসিলে সাধারণতঃ বাড়ীতে তিনি যাহা করেন, এখানেও তাহাই করিতেছিলেন। উষার সঙ্গে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন। আমাদের দেশে দুইজনে সাধারণতঃ পেটাপেটি খেলা হয়। কিন্তু সদানন্দ বিদেশ হইতে আরও নানারকম খেলার প্রণালী সংগ্রহ করিয়া উষাকে সেগুলি শিখাইয়াছিলেন। সুতরাং যদিও দুইজনের খেলা তবু তাহা কখনও একঘেয়ে হয় না। কখনও ব্রিটিশ, কখনও ফরাসী, কখনও সুইডিশ, কখনও বা জার্মান দেশের খেলা খেলিয়া তাহারা পরস্পরের মনোরঞ্জন করে। নীরবেই খেলা চলিতেছিল।

সদানন্দ বলিলেন—"বাবা তো বেশ ভালো আছেন দেখছি। চল না এবার ফিরে যাই।

"কেন, তোমার কোন কাজ আছে সেখানে?"

"কাজ তেমন কোন নেই। কিন্তু এখানেই বা চুপচাপ বসে বসে কি করি বল। কেবল খাওয়া আর ঘুমোনো কি ভালো লাগে। এখানে যে মনের খোরাক কিছু নেই। কলকাতায় দোকানে গিয়ে বসলে তবু পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়—"

"এখানেও তো লোকজনের অভাব নেই। কিন্তু তুমি কারো সঙ্গে মিশতে পার না যে। নিজের ঘরটিতে চুপচাপ বসে আছ কেবল। বড় জামাইবাবু, রঙ্গনাথ, ওরা নিজের নিজের দল করে নিয়েছে। তুমি তো বাবার কাছে গিয়েও একবার বসলে না ভালো করে।"

"আমি গিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু কথা কইতে পারিনি। কবরেজ মশাই আসর সরগরম করেছিলেন। আমি চুপচাপ বসেছিলাম পিছন দিকে।"

"তুমি এক কাজ কর না। তোমার তো মাছ ধরার খুব শখ, আমাদের পুকুরে গিয়ে মাছ ধর না। বড় বড় রুই কাতলা আছে। কুমারকে বল সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওর হুইল-টুইল সব ছিল এককালে, এখনও হয়তো আছে—"

সদানন্দ এই খবর শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

"এ-খবর তো জানতুম না। মাছ ধরার ব্যবস্থা হলে সময়টা ভালোই কাটবে। কালই কুমারবাবুকে বলতে হবে। ভালো মাছ ধরতে পারি তো বাবাকে দু'একটা নতুন ধরনের মাছের তরকারিও খাওয়াব। গগন তো এ বিষয়ে খুব উৎসাহী।"

"খুব। নাও ফেল—"

উষা আড়চোখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল একবার যদি মাছ ধরার নেশায় পাইয়া বসে তাহা হইলে ভদ্রলোক আর নড়িতে চাহিবে না। উষা অনেকদিন পরে আসিয়াছে, বাবাকে ছাড়িয়া তাহার এখন যাইবার ইচ্ছা নাই।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যা নিজের ঘরে একটা পেট্রোম্যাক্স্ লণ্ঠন আনাইয়া লইয়াছিল। বাবার জন্য যে-দস্তানাটা সে বুনিতেছিল সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। টেবিলের অপর পার্শ্বে রঙ্গনাথ একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া একটি পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা বুনিতেছিল বটে, যন্ত্রচালিতবৎ তাহার হাত দুইটি চলিতেছিল। কিন্তু সে ভাবিতেছিল অন্য কথা। দুপুরে সে তাহার বাল্যসখী সীতিয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছিল। মনে হইতেছিল মন কি বিচিত্র। বাল্যকালে ওই সীতিয়াকে ছাড়া তাহার একদণ্ড চলিত না। সীতিয়ার যখন বিবাহ হইয়া গেল তখন সে কান্নাকাটিও করিয়াছিল। কিন্তু এখন ? এখানে আসিয়াও তাহার কথা মনে পড়ে নাই, মনে পড়িল পোস্ট-আফিসের কাছাকাছি গিয়া যখন সে সীতিয়াদের বাড়ীটা দেখিতে পাইল। আর একটা উপমাও তাহার মনে হইল, আমাদের মন নদীর ঘাটের মতো। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় ঘাট বুঝি বরাবর একই রকম আছে। বহমান নদীস্রোত যে সে-ঘাটের রূপ প্রতিমুহূর্তেই বদলাইয়া দিতেছে সে খেয়াল আমাদের থাকে না, হঠাৎ এই সত্যটা আবিষ্কার করিয়া আমরা বিস্মিত হই. কিন্তু ইহাই নিয়ম। এ নিয়ম না থাকিলে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। কিন্তু এসব চিন্তার অন্তরালে আর একটি ছবিও তাহার মনের অবচেতন লোকে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সহসা সেটি প্রকট হইয়া উঠিল। সীতিয়ার ছোট ছেলের ছবি। কি সুন্দর ছেলেটি, কেমন হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল যে তাহার নিজের ছেলে হয় নাই। হইতে পারিত, কিন্তু নিজেই সে হইতে দেয় নাই। স্ত্রীলোক হইলেই যে জননী হইতে হইবে এই অমোঘ নিয়মের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়াছে। রঙ্গনাথকে বলিয়া দিয়াছে—"আমি মা হতে চাই না, তোমার যদি ছেলের শখ থাকে তাহলে আর একটা বিয়ে করতে পার।" রঙ্গনাথ উত্তর দিয়াছিল—"ছেলের শখ অপাতত আমারও নেই। ইয়োরোপটা আর আমেরিকাটা দুজনে মিলে আগে বেড়িয়ে আসা যাক তারপর ওকথা ভাবা যাবে। তখনও যদি তোমার এ-মত প্রবল থাকে তারপর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের কথা চিন্তা করে দেখা যাবে। যা ঝামেলা, ইচ্ছে হয় না।" তখনও হিন্দু কোড বিল পাশ হয় নাই। বিলটি পাশ হইবার পর এ-প্রসঙ্গে আলোচনাও হয় নাই আর।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সন্ধ্যা বলিল—"কি পড়ছ—"

"কেষ্টদা 'রেড্-উড্' (Red wood) সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দিয়েছেন সেইটি পড়ছি।"

"রেড্-উড্—কোথা সেটা ?"

"ইউনাইটেড স্টেটে। কালিফোর্নিয়াতে। সিয়েরা নেভাডা (Sierra Nevada) পাহাড়ের গায়ে। অদ্ভুত জঙ্গল।"

"কি রকম ?"

"সে জঙ্গলের গাছ কত উঁচু জান ? দু'শ' তিনশ' ফুট। গাছের গুঁড়ির ডায়ামেটার কুড়ি পঁচিশ ফুট। গাছের গুঁড়িতে যে ছাল আছে, স্পঞ্জের মতো, আগুনে পোড়ে না। ওখানকার জংলী ইণ্ডিয়ানরা প্রতি বছর বনে আগুন লাগায় নীচের ঝোপজঙ্গলগুলো পুড়িয়ে ফেলবার জন্যে। না পুড়িয়ে ফেললে জঙ্গলে চলাফেরা করে শিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ-গাছগুলো পোড়ে না। ফায়ার রেজিস্টান্ট (Fire resistant)।"

রঙ্গনাথ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল সহসা। সন্ধ্যা কেবল বলিল—"খুব আশ্চর্য তো।"

ইহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া রঙ্গনাথ বলিল—"কি লিখেছে শুনবে ? The gently tapering shafts are almost bare of branches for a hundred feet or more above the ground. The bark is deep purplish red, massively fluted; the foliage is delicate and feathery. A virgin red-wood forest, with the light filtering through the tree-tops and falling in diagonal beams between the great columns, is one of the most beautiful sights in the world. আমরা যখন যাব তখন এ-জায়গাটা দেখে আসতে হবে বুঝলে। কেষ্টদারও যাবার খুব ইচ্ছে। ওখানে জন্তুজানোয়ারও অদ্ভুত রকম পাওয়া যায় কিনা। কৃষ্ণপুচ্ছ হরিণ, কালো ভালুক, মিংক উইজল্ (Mink Weasel), রিং-টেল্ড ক্যাট (Ringtailed Cat)। রিং-টেল্ড ক্যাট নাকি অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। অনেকে পোষে। তাছাড়া র‍্যাট্‌ল সাপ আছে। কেষ্টদার অনেক খোরাক আছে সেখানে। পাখিও নানারকম। আমার কিন্তু জন্তুজানোয়ারের চেয়ে গাছের সৌন্দর্য বেশী ভাল লাগে। ধীর স্থির বেশ একটা সংযত সৌন্দর্য আছে গাছের মধ্যে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু প্রগল্‌ভ নয়। ভারী সুন্দর লাগে। আমি সব দেশের গাছ দেখে বেড়াতে চাই—আর নিজের যে বাগানটি করতে চাই—"

হঠাৎ সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল—"আমি কিন্তু আজ ভারী সুন্দর জিনিস দেখেছি একটি—"

"কি।"

"সীতিয়ার ছেলে—"

"সে আবার কে।"

"সীতিয়া এই গ্রামের মেয়ে। আমার বাল্যসখী। আজ দুপুরে তার বাড়ী গিয়েছিলাম। তার ছেলেটি চমৎকার। ধপধপে ফরসা আর গামুস মোটা—"

"ও, তাই নাকি—"

রঙ্গনাথ সবিস্ময়ে এবং সকৌতুকে সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল সন্ধ্যার দৃষ্টি যদিও দস্তানায় নিবদ্ধ কিন্তু তাহার মুখে একটি মৃদু হাসি ফুটিফুটি করিতেছে।

॥ ৭ ॥

কৃষ্ণকান্তের কুচকুচে কালো রংএর জন্যে যদিও তেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁহার সুলালিত গোঁফ আছে একজোড়া। কৃষ্ণকান্ত প্রতিদিন শুইতে যাইবার আগে এই গোঁফ-জোড়ার পরিচর্যা করেন। বাঁ হাতে একটি হাত-আয়না ধরিয়া ডান হাতের তর্জনী দিয়া হাকিমী একটা তৈল মর্দন করেন গোঁফে। কৃষ্ণকান্তের প্রিয়-বন্ধু দিল্লীর হাকিম বর্কতুল্লা সাহেব বাঘের চর্বি হইতে এই তৈল তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ বাঘের চর্বিতে দুর্গন্ধ হয়, কিন্তু হাকিম সাহেবের প্রস্তুত-নৈপুণ্যে ইহা সুগন্ধি। সাধারণতঃ ইহা পঁচিশ টাকা তোলায় তিনি বিক্রয় করেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে তিনি ইহা বিনা মূল্যে দিয়াছেন এবং বরাবর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। ইহার কারণ কৃষ্ণকান্ত একবার একটি বড় চর্বিদার বাঘ মারিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সেই চর্বি হইতে বর্কতুল্লা সাহেব নাকি প্রচুর গুম্ফ-টনিক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বর্কতুল্লা সাহেবও শিকারী, সুযোগ পাইলেই তিনি কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে শিকার করিতে যান। তৈল প্রসঙ্গে বর্কতুল্লা সাহেব বলিয়াছিলেন—এই তৈল লাগাইলে গুম্ফ তো বীরত্বব্যঞ্জক হইবেই, শরীরে কুবৎ অর্থাৎ শক্তিও বাড়িবে। কৃষ্ণকান্ত শিক্ষিত লোক। কিন্তু কোন্ শিক্ষিত লোকের কুসংস্কার নাই? তিনি শিকারী মানুষ, অনেক রকম তুকতাকে তাঁহার আস্থা আছে। গত এক বৎসর যাবত তিনি এই তৈল ব্যবহার করিতেছেন। কুবৎ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে কি না বলা শক্ত, কারণ কৃষ্ণকান্ত এমনিতেই বেশ শক্তিশালী সাহসী লোক, কিন্তু গোঁফটির বেশ উন্নতি হইয়াছে। এত কালো এবং মসৃণ হইয়াছে যে গোঁফ আছে কি না বোঝাই যায় না। চামড়ার রঙের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অথচ কাফ্রীদের চুলের মতো কোঁকড়ানো।

কিরণ ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে কৃষ্ণকান্তের গুম্ফ পরিচর্যা দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে রোজ রোজ এক ঘণ্টা ধরে গোঁফ নিয়ে সময় কাটাতে লজ্জা করে না তোমার?"

"আমি শাড়িও পরি না, চুড়িও পরি না, লজ্জা করবে কেন—"

"তার মানে?"

"লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ!"

"আহা!"

কিরণ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। এবং হাসিমুখে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

"তেল মেখে গোঁফের যা ছিরি হয়েছে। ঠিক যেন ভেড়ার লোমের মতো।"

"সত্যি? শুনে খুব আনন্দিত হলাম। রাশিচক্রে প্রথম রাশির নাম মেষ। বৈশাখ মাসে সূর্য সেখানে থাকেন। ভেড়া খুব তেজী জানোয়ার। ভেড়ার লোমের মতো যদি হয়ে থাকে তাহলে বর্কতুল্লার কথা ফলেছে বলতে হবে। সে বলেছিল কুবৎ হবে। এটা ভালো টনিক।"

"কুবৎ কি—"

"শক্তি, তেজ—"

"এমনিতেই তোমার যা কুবৎ তাতেই তো রক্ষে নেই। বেশী কুবৎ নিয়ে কি হবে বুড়ো বয়সে—"

"বুড়ো বয়সেই তো এসব দরকার। ভিতরে শক্তি যখন কমতে থাকে তখনই বাইরের শক্তি দরকার। তুমি তোমার চুলের গোড়ায় মেখে দেখতে পার।"

"রক্ষে কর।"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর কিরণ অন্য প্রসঙ্গে উপনীত হইল।

"কালও তুমি বন্দুক নিয়ে বেরুবে নাকি—"

"বিছুয়ার জঙ্গলে অনেক তিতির আছে শুনেছি। সেখানেই যাব—"

"তিতির তো অনেক মেরেছ। সারাজীবন তো ওই নিয়ে আছ। এখানে অসুখের বাড়ীতে এসেছ, এখানে রোজ রোজ জীবহত্যা নাই করলে—"

"জীবহত্যা তো কম হচ্ছে না। কুমার রোজ মাছ-মাংসের যে রকম আয়োজন করছে তাতে তো মনে হয় না যে বাবার অসুখের জন্য জীবহত্যা বন্ধ আছে। বাবা তিতিরের মাংস খুব ভালোবাসেন। যদি মারতে পারি তাঁকে স্ট্যু করে দিও। তিনি খুব খুশী হবেন। তোমাদের মতো জীব-হত্যা-কমপ্লেক্স তাঁর নেই।"

"বাবা তিতিরের মাংস ভালোবাসেন বলেই বিছুয়ার জঙ্গলে ছুটছ নাকি!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"এইবার আমাকে কোণঠাসা করেছ। সত্যি কথা যদি বলতে হয়—আর তোমার কাছে কখনও তো মিথ্যে কথা বলিনি—তাহলে বলতে হয় যে, না, সেজন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। রামপ্রসাদ বিছুয়ার জঙ্গলে যে তিতিরের বর্ণনা দিলে তাতে মনে হল সেগুলো কালো তিতির। কিন্তু কালো তিতির তো মণিপুরের জঙ্গলে শিকার করেছি। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের কাছাকাছিও পেয়েছিলাম একবার। কিন্তু এখানেও কালো তিতির পাওয়া যায় শুনে আশ্চর্য লাগল। তাই দেখতে যাচ্ছি। স্রেফ কৌতূহল। যদি মারতে পারি স্ট্যু খাওয়া যাবে। সাইজে অনেকটা মুরগীর মতো, খেতে মুরগীর চেয়েও ভালো।"

"তুমি ঘনটুকে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছ?"

"চিঠি লিখলেই কি সে আসবে? মিলিটারিতে ছুটি পাওয়া শক্ত।"

"তবু তুমি লিখেই দেখ না।"

"খবর তো পেয়েছে সে। ছুটি পেলে আসবে নিশ্চয়।"

"না, তবু তুমি আর একটা চিঠি লেখ কাল।"

কিরণের কণ্ঠে আবদারের সুর ধ্বনিত হইল।

কৃষ্ণকান্ত গোঁফে তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"কাল ভোরেই তো বেরিয়ে যাব রামপ্রসাদের সঙ্গে। ফিরে এসে আর লেখবার সময় থাকবে না। পরশু লিখব—"

"গরুর গাড়িতে যাবে?"

"না। মাত্র চার ক্রোশ তো, হেঁটেই চলে যাব।"

"কাল মেজদা আসছেন, তুমি চলে যাবে?"

"মেজদার ভয়েই তো আরও পালাচ্ছি। তাঁকে একটা বাঘের চামড়া দেবার কথা

ছিল এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। দেখা হলেই চেপে ধরবেন। যতক্ষণ এড়িয়ে থাকা যায়—"

"মেজদার সঙ্গে দেখা হবার পর তিনটে বাঘ তো মেরেছ, চামড়াগুলো কি করলে—"

"সব দান করে দিয়েছি, কাঁচাই দিয়েছি। কিন্তু মেজদাকে তো কাঁচা দেওয়া যাবে না, ট্যান করিয়ে দিতে হবে। খরচের ব্যাপার। কিন্তু দেব, যখন বলেছি দেবই, একটা বড় বাঘের খবর পেয়েওছি। এবার ফিরে গিয়ে থলিতে পুরব সেটাকে।"

একটা লম্বা হাই তুলিয়া কিরণ বলিল - "আলো নিবিয়ে দাও, ঘুম পাচ্ছে—"

কিরণ শুইয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া উঠিল একটা বিকট শব্দ শুনিয়া। 'বুবো বুবো—' এই ধরনের শব্দটা।

"ওটা কিসের ডাক বল তো ?"

"প্যাঁচার মনে হচ্ছে। কাল প্যাঁচা।"

"ও বাবা, মহা অলুক্ষণে পাখি। তাড়াও ওটাকে।"

কৃষ্ণকান্ত বন্দুকটি লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই দুম দুম করিয়া শব্দ শোনা গেল। কিরণ হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। কেন বা কাহাকে তাহা বোঝা গেল না ঠিক। একটু পরেই কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"প্রকাণ্ড প্যাঁচা। মরল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। ওই দূরে যে বাগানটা আছে সেইখানেই ওদের আড্ডা বোধ হয়। গঙ্গার ধারে উঁচু পাথরটায় বসেছিল। প্যাঁচা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম।"

"কি।"

"গগন আর মিস বোস গঙ্গার ধারে বসে কথা কইছে। মনে হল মিস বোস বোরুদ্যমানা। গগন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বন্দুকের আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠে পড়ল।"

কিরণ অবাক হইয়া গেল। তাহার পর বলিল, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে যে কি আছে ওরাই জানে !"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "সব সময় খারাপ দিকটাই ভাব কেন। গগন ভালো ছেলে। ওর সম্বন্ধে আমার কোন ভাবনা নেই। মিস বোসের কথা বলতে পারি না। স্ত্রিয়াশ্চ-রিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

"তোমরা যে কি তা আর জানতে বাকী নেই—"

কৃষ্ণকান্ত এ-কথার কোন জবাব দিলেন না, নির্বিকারচিত্তে আরও কয়েক মিনিট গোঁফে চর্বি ঘষিলেন। তাহার পর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

৮ ॥

স্বাতী ও সোমনাথের শুইবার জন্য যে-ঘর কুমার ঠিক করিয়াছিল তাহা পুরসুন্দরীদের ঘরের কাছেই। প্রায় সামনা সামনি। মাঝে কেবল একটা ছোট বারান্দা। পুরসুন্দরীর ঘরের খোলা দরজা দিয়া স্বাতীর ঘরের দরজা দেখা যায়। পুরসুন্দরীর

ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। পুরসুন্দরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বীরুবাবু ঘুমান নাই, মাথার শিয়রে আলো জ্বালিয়া তিনি তখনও Conquest of Mexico and Peru পড়িতেছেন। এই নিতান্ত নিরীহ ব্যাপারটি যে স্বাতী-সোমনাথের ঘরে এক নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সোমনাথ ঘরে আসিয়াই কপাটে খিল দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু স্বাতী দিতে দেয় নাই।

"এখন কপাট বন্ধ কোরো না।"

"কেন ?"

"আমার বড্ড গরম লাগছে।"

আসল কথাটি স্বাতী সহজে প্রকাশ করে না।

"গরম ? বাইরে রীতিমত ঠান্ডা!"

"ঠান্ডা হলে দাদা বৌদিকে নিয়ে বাইরে বসে আছে কি করে।"

"তোমার দাদা একটি পাগল। অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়ি চল, ঘুম পাচ্ছে—"

"ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমোও না, কপাটটা খোলা থাক।"

"কপাট খোলা থাকবে! তুমি শোবে না ?"

"আমি এখন শুই কি করে। বাবার ঘরের কপাট খোলা রয়েছে দেখছ না ? বাবার ঘরের কপাট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি কপাট বন্ধ করতে পারব না। তোমরা বেহায়া হতে পার কিন্তু আমাদের তো লজ্জাসরম আছে—"

কথাগুলি বলিয়া স্বাতী স্বামীর দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। সে-হাসির আভা তাহার চোখে-মুখে যে-শোভার সৃষ্টি করিল তাহা অবর্ণনীয়। স্বাতীর কথাগুলির সহিত এই হাসিটুকু না থাকিলে তদ্দণ্ডেই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হইয়া যাইত। স্বাতীর হাসি-ভরা মুখের দিকে চাহিয়া সোমনাথ গলিয়া গেল—

"বেহায়া নয় লোভী। সুতরাং চক্ষুলজ্জা নেই, কপাট বন্ধ করে দিচ্ছি—"

উঠিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল।

"ছি, ছি, কি করছ, বাবা কি মনে করবেন।"

খট্ করিয়া ছিটকিনি যথাস্থানে বসিয়া গেল।

হঠাৎ স্বাতী লীলাভরে মাথা দোলাইয়া আরও সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া যাহা বলিল তাহা অপ্রত্যাশিত।

"সেই কথাটি মনে আছে তো।"

"কি কথা।"

"আমাকে নতুন প্যাটার্ণের চুড়ি গড়িয়ে দেবে বলেছিলে। ফিরে গিয়েই দিতে হবে কিন্তু।"

সোমনাথ স্বাতীকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

॥ ৯ ॥

চিত্রা-সুব্রতর শুইবার স্থান হইয়াছিল একটি তাঁবুতে। তাঁবুটি ভালো। সঙ্গে বাথরুমের ব্যবস্থাও আছে। সুব্রত মিলিটারি পোশাকে আসিয়াছিল, এখন শুইবার পোশাক লুঙ্গি পরিতেছিল। চিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিয়া সে বলিল, "খাওয়াদাওয়ার যে রকম বহর দেখছি তাতে মনে হচ্ছে সাতদিনেই ভুঁড়ি হয়ে যাবে।"

সুব্রত সাতদিনের ছুটি লইয়াছিল। চিত্রা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "তুমি যা খেয়েছ তা আমি দেখেছি। কিছুই তো খাও নি।"

"এসব মসলা-দেওয়া 'রিচ্' খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস তো নেই। জানো তো, স্ট্যু, রোস্ট, টোস্ট, স্যালাড্ এই সব খেলেই ভালো থাকি।"

"বল তো এখানেও সে-সব ব্যবস্থা হতে পারে। ছোট কাকার কানে একবার তুলে দিলেই হল।"

"না, দরকার নেই।"

সুব্রতর অভ্যাসটা অবশ্য দেড় বছরের, চাকরি হওয়ার পর হইতে সে সাহেবীখানা শুরু করিয়াছে। তাহার পূর্বে সে কলিকাতার মেস-হস্টেলের মসলা-দেওয়া রান্নায় এবং তৎপূর্বে বীরভুমের খেঁড়ো-পোস্ত বড়িচচ্চড়ি কলাইয়ের ডালে অভ্যস্ত ছিল। অফিসার হইবার পর হইতেই তাহার বাঙালী খাওয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে। সুব্রতর বাড়ী বীরভুমের এক পল্লীগ্রাম। পিতা পৌরোহিত্য করেন, কিছু জমিজমাও আছে। সে লেখাপড়ায় ভালো ছেলে ছিল, প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া চাকরিটি পাইয়াছে। তাহার স্বভাবও বেশ ভালো, কিন্তু সে যে একজন বড় অফিসার একথা সে ভুলিতে পারে না। ভাষায় প্রকাশ না করিলেও ভাবে-ভঙ্গীতে সেটা প্রকাশ করিয়া ফেলে। বিছানায় উপবেশন করিয়া সে একবার আড়মুড়ি ভাঙিল। তাহার পর বলিল, "তোমার ছোট দাদু আমাকে একটু মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন।"

"কি মুশকিল—"

"তাঁর এক নন্‌ম্যাট্রিক ছেলের জন্য একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে বলছেন। কি কাণ্ড!"—বলিয়া সে বিলাতী কায়দায় 'স্রাগ' করিল।

"এতে আর মুশকিল কি। সে যদি চাকরির যোগ্য হয় আর তুমি যদি করে দিতে পার, দাও করে।"

"তাকে কনেস্টবল করে নেওয়া যেত, কিন্তু তার 'হাইট' বড্ড কম শুনছি। পুলিশে বেঁটে লোকের চাকরি হওয়া শক্ত।"

"তবে সেই কথা বলে দাও ছোট দাদুকে।"

"তোমার ছোট দাদুর মুখের উপর রূঢ় সত্যটা বলি কি করে।"

"আচ্ছা, আমি বলে দেব তুমি যদি না পার।"

"না, না, এখন কিছু বোলো না। চেষ্টা করব ওকে যদি সি. আই. ডি.-তে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

"না। আমাদের বংশের ছেলেরা স্পাই হবে না।"

চিত্রার চোখে-মুখে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার

নিবিয়া গেল সেটা। সে হাসিয়া বলিল, "আমার সব চেয়ে কি ভালো লাগছে জান? আমি আমার আঁকবার সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসেছি। দাদুর একটি পোট্রেট আঁকব।"

"দাদু কি সিটিং দিতে পারবেন?"

"বালিশে ঠেস দিয়ে যদি বসতে পারেন ভালোই, তা না হলে শোয়া-অবস্থাতেই আঁকব।"

বাহিরে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া সুব্রত দাঁড়াইয়া উঠিল।

"এত রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ কেন। আমার রিভলভারটা বার করে দাও তো স্যুটকেস থেকে। বেরিয়ে দেখি। এরকম নদীর ধারে ডাকাতি প্রায়ই হয়।"

চিত্রা চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল স্বামীর মুখের দিকে।

"ডাকাতি! আমাদের বাড়ীতে কখনও ডাকাতি হয় নি। হবেও না।"

"তবু একবার বেরিয়ে দেখা উচিত।"

"তুমি একা যেও না, আমিও যাব।"

"আমি এখুনি আসছি, তুমি আবার বেরুবে কেন?"

চিত্রা কোন উত্তর দিল না, রিভলভারটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

"পাগল না কি তুমি!"

সুব্রত টর্চটা লইয়া তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া তাহারা গগনকে দেখিতে পাইল। গগন বলিল, "বড় পিসেমশাই বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন। একটা প্যাঁচা ডাকছিল, সেইটে তাড়ালেন বোধহয়। তুমি এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা। চল তোমার ঘরেই যাই।"

তিনজনে গিয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল।

॥ ১০ ॥

রাধানাথ গোপ চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। বাল্যকালে মাইনর স্কুলে তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ, বেশ ধনী লোক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জাতে বিহারী গোয়ালা। সে-যুগে বাঙালীরা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশে সর্ববিভাগেই নেতৃত্ব করিতেন। বহু বাঙালী শিক্ষকের বহু অবাঙালী ছাত্র ছিল এবং তাহারা পরস্পর যে-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত তাহা প্রেমের বন্ধন। বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাদের অন্তরের আদান-প্রদান চলিত। তখন শিক্ষক সত্যই ছাত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, ছাত্ররা গুরুকে সত্যই ভক্তি করিত। রাজনীতির বিষ তখন এমন-ভাবে ছড়ায় নাই। বাঙালী-বিহারী 'ফিলিং' তখন ছিল না। সে যুগের এই মাধুর্যের স্মৃতি সে-যুগের অনেক লোকের মনে এখনও জাগরূক আছে। রাধানাথ গোপেরও আছে। তিনি তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক চন্দ্রসুন্দরকে ভুলিতে পারেন নাই। ভুলিতে পারেন নাই যে চন্দ্রসুন্দর শুধু যে তাঁহাদের ভালো পড়াইতেন তাহা নয়, তাঁহাদের দাঁত, কান, নাক, চোখের কোণ, আঙুলের নখ পরিষ্কার আছে কি না দেখিতেন, চুল সামান্য এলোমেলো থাকিলেও স্বহস্তে তাহা ঠিক করিয়া দিতেন। জামাকাপড় পরিষ্কার আছে কি না, জামার বোতামগুলি বিশেষতঃ গলার ও বুকের বোতাম ঠিক আছে কি

না তাহার তদারক করিতেন। ভালো ছেলেদের বেশী 'টাস্‌ক্‌' (task) দিয়া বাড়িতে সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন। এজন্য তাঁহাকে প্রত্যহ অনেক রাত পর্যন্ত জাগিতে হইত। দুরূহ ইংরেজি উচ্চারণগুলি যাহাতে ঠিকমতো তাদের মুখ দিয়া বাহির হয় এজন্য কি চেষ্টাই না করিতেন। ইংরেজি 'z' উচ্চারণটা লইয়া বেশী গোল হইত। কিংবা যেখানে 's'-এর উচ্চারণ 'z'-এর মতো—যেমন is বা was-এর ক্ষেত্রে—সেখানেও গোলমাল হইত। সাধারণতঃ ছেলেরা 'জ'-এর উচ্চারণ করিয়া 'ইজ্‌' বা 'ওয়াজ্‌' বলিত। ইহা সংশোধন করিবার নিমিত্ত চন্দ্রসুন্দর অনেক পরিশ্রম করিতেন। এসব কথা রাধানাথ গোপ ভোলেন নাই। এইসব কারণে চন্দ্রসুন্দরের প্রতি তাঁহার ভক্তি আজও অচল আছে। আর একটা কারণও ছিল। চন্দ্রসুন্দরের গোঁড়ামির জন্যও তিনি তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। তিনি যে অনাচারের স্রোতে ভাসিয়া যান নাই, পাহাড়ের মতো দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাতে রাধানাথ গোপের ভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে। যে-পরিবারে সকলেই মাছ-মাংস পেঁয়াজের ভক্ত সেই পরিবারের চন্দ্রসুন্দরের মতো লোকের আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর মনে হয় তাঁহার কাছে। অথচ ওই রাধাকান্ত গোপ সূর্যসুন্দরকে কম ভক্তি করেন না। সূর্যসুন্দরের কোনরকম গোঁড়ামি নাই, কোনওরকম অযৌক্তিক গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করেন না—ইহাও রাধানাথকে সমান মুগ্ধ করিয়াছে। সূর্যসুন্দরের বিরাট ব্যক্তিত্ব, সহৃদয়তা, বিশেষ করিয়া টাকা-কড়ি বিষয়-আশয় সম্বন্ধে তাঁহার বৈরাগ্যই রাধানাথের ভক্তি বেশী করিয়া উদ্রিক্ত করিয়াছে। তাঁহার মতো নিস্পৃহ সাধুলোক রাধানাথ আর দেখে নাই। এ-অঞ্চলের তিন-তিনটি বড় জমিদার সূর্যসুন্দরকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। ইচ্ছা করিলে এ-অঞ্চলে নামমাত্র খাজনা দিয়া দুই তিন হাজার বিঘা জমি সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব হইত না। কিন্তু সেদিকে তাঁহার কিছু মাত্র লোভ ছিল না। এ-বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলিতেন, এত জমি লইয়া আমি কি করিব! তাঁহার দুই-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু জমিদারদের ম্যানেজার বা নায়েব ছিলেন। তাঁহারা একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে কিছু জমি করিয়া দিয়াছিলেন। গছাইয়া দিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া আর একটা জিনিসও রাধানাথকে বরাবর বিস্মিত করিয়াছে। পূর্বে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে দুই বেলা পাতা পড়িত কত। আত্মীয়-অনাত্মীয় বাঙালী-বিহারী-মুসলমান-খৃষ্টান পাঞ্জাবী-মারোয়াড়ি সকলের কাছেই তাঁহার গৃহ বরাবর অবারিত দ্বার। গঙ্গাস্নানের যোগ লাগিলে তাঁহার বাড়ীতে মেলা বসিয়া যাইত। নিকটবর্তী শহর ও গ্রাম হইতে কত লোক আসিত তাহার ঠিক নাই। আর সকলেই অসংকোচে আসিত। এ যেন তাহাদের বাড়ী। আগে রোজই তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যায় গানবাজনার আড্ডা বসিত, কত কাপ চা যে বিতরিত হইত তাহার ঠিক নাই। সূর্যসুন্দরের একটা প্রধান গুণ ছিল তিনি অতি সহজে সকলের অন্তরঙ্গ হইয়া যাইতে পারেন। তিনি শুধু যে যে চিকিৎসক ছিলেন তাহা নয় বহু পরিবারের হিতৈষী বন্ধুও ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহার ছেলেটির রেলে চাকরি হইয়াছে। তাঁহাদের যে জামাই এখন ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে ভালো কলেজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য সূর্যসুন্দর কত চেষ্টাই না করিয়া ছিলেন। নিজে খরচ করিয়া পাটনা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের অনেক গুণ। তাঁহার বিবিধ গুণ এত বিচিত্র ও অধিক যে তিনি মাছ মাংস খান কি না এ-প্রশ্ন অবান্তর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূর্যসুন্দরের পরিবারে চন্দ্রসুন্দর ব্যতিক্রম বলিয়াই তাঁহাকে বেশী ভালো লাগে রাধানাথ গোপের।

সব কাজ শেষ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রসুন্দরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে, কপাটের ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছে। তিনি বন্ধদ্বারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর গলা খাঁকারি দিয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "মাস্টার মশাই জেগে আছেন কি—"

"কে—"

"আমি রাধানাথ। ভিতরে আসতে পারি ?"

"এস।"

কপাট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রাধানাথ দেখিলেন, চন্দ্রসুন্দর পত্র লিখিতেছেন।

"ও, তুমি ! এত রাত্রে কি মনে করে—"

সেই ছাত্রজীবনে রাধানাথ শিক্ষক চন্দ্রসুন্দরের সম্মুখে যেমন ভাবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেন তেমনি ভাবে দাঁড়াইলেন।

"সমস্ত দিন নানাকাজে ব্যস্ত ছিলাম। ভালো করে আপনার খবর নিতে পারি নি। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো, বাড়ীতে ভিড় হয়েছে, আরও হবে। যদি কোন অসুবিধা হয় আমাকে বলবেন। এত রাত্রে লেখাপড়া করছিলেন নাকি ?"

"চিঠি লিখছিলাম আমার ছেলেকে। সে বেকার বসে আছে। তাকে এখানে আসতে লিখলাম। দাদার জামাইরা সব পদস্থ, যদি কেউ কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারে।"

"হ্যাঁ, লিখে দিন। আমাদের জামাইও এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। তার দ্বারা যদি কিছু হয় সে নিশ্চয় করে দেবে। সে লেখাপড়া শিখেছে কতদূর—"

"ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি।"

রাধানাথ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"আপনার ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি ? এ তো বড় আশ্চর্য !"

"আমার দুর্ভাগ্য। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্।"

চন্দ্রসুন্দর দুই হাত দিয়া নিজের ডান পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে টিপিতে টিপিতে রাধানাথের দিকে হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন।

"চেষ্টার কোনও ত্রুটি করি নি বাবা। কিন্তু আমরা চেষ্টাই করতে পারি, ফলাফল ভগবানের হাতে। গীতায় স্বয়ং ভগবান এই কথা বলে গেছেন। বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?"

রাধানাথ গোপ বিছানার একধারে সসংকোচে উপবেশন করিলেন।

"দেখ, তোমরা পাঁচজনে চেষ্টা করে যদি কিছু করে দিতে পার। আমাদের নাতজামাই এস. পি.। তাকেও বলেছি। সে বললে 'হাইট্' ভালো হলে কনেস্টবল হতে পারত। তার থেকে উন্নতি হওয়াও সম্ভব। কিন্তু আমার ছেলে বেঁটে। সবই অদৃষ্ট, বুঝলে !"

চন্দ্রসুন্দর হাসিমুখে গোছের মাংসল অংশটা টিপিতে লাগিলেন।

"পা কামড়াচ্ছে নাকি মাস্টার মশাই—"

"হ্যাঁ, বেতো শরীর তো ! বাত আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। বাবারও ছিল শুনেছি। শোবার সময় পা টেপানোটা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। দাদারও অভ্যাস

ছিল আগে, সন্তোষ দাদার পা টিপত। ওখানে আমার একটা ছোঁড়া চাকর আছে সেই টিপে দেয়। কিন্তু এখানে ভিড়ের বাড়ীতে কারো হাতের অবসর নেই, কাকে বলি—"

"আমি দিচ্ছি। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি যখন স্কুলে পড়তুম, কতবার আপনার পা টিপে দিয়েছি মনে নেই? আমি আপনার সেই রাধানাথই আছি।"

"তুমি আর সে রাধানাথ নেই বাবা। তুমি এখন বড় হয়েছ। যখন ছোট ছিলে তখন তুমি আমার রাধানাথ ছিলে।" চন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল।

"আমি এখনও আপনার সেই রাধানাথই আছি মাস্টার মশাই। শুয়ে পড়ুন, পা-টা বাড়িয়ে দিন।"

চন্দ্রসুন্দর একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে পাটা বাড়াইয়া দিলেন। রাধানাথ তাঁহার পা টিপিতে লাগিলেন।

॥ ১১ ॥

কুমার নিজের ঘরে বসিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরি পড়িতেছিল।

"আমার ভাই চন্দ্রের বয়স যখন মাস ছয়েক তখন দিদিমা মামাকে একদিন বলিলেন, 'বাবা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছিলাম ভালয় ভালয় ছ'মাস কেটে গেলে চন্দরকে নিয়ে ওর মা বাবার কাছে পুজো দিয়ে আসবে। ওখানেই বাবার ভোগের প্রসাদ মুখে দিয়েই ওর অন্নপ্রাশনও হবে।' এই প্রস্তাবে মামা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তারকেশ্বরে যাওয়া মানেই খরচ। সঙ্গে একজন লোকও চাই। মামা বলিলেন, 'বাবা তারকেশ্বরকে স্মরণ করে এইখানকার শিবমন্দিরেই পুজো দিয়ে দাও। শিব তো সর্বত্রই এক।' দিদিমা চটিয়া গেলেন। বলিলেন, 'তোর মতো অত তত্ত্বজ্ঞান আমার হয় নি। আমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে মানত করেছি, সেইখানেই যেতে হবে ওদের। তোর টাকার অভাব থাকে, আমিই খরচ দিয়ে দেব। আমার কাছে টাকা আছে। আমিই ওদের খরচ দেব। কার্তিকেরও একটা মানত আছে, সে-ই নিয়ে যাবে ওদের। সুয্যিও যাবে। তুই তারাপদকে ডেকে একটা ভালো দিন দেখতে বল।' দিদিমা খুব রাশভারী লোক ছিলেন, মামা তাঁহাকে ভয় করিতেন। তিনি আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। কার্তিক ছিলেন মামার নুনের গোলার একজন গোমস্তা এবং তারাপদ ছিলেন বাড়ীর পুরোহিত। আমরা দুজনকেই মামা বলিতাম। আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। মামীমাও ইহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, মামীমার অসন্তুষ্ট ভাবটা তাঁহার চোখে মুখে নীরবে পরিস্ফুট হইয়া রহিল। আমার সহিত বা মায়ের সহিত যখন কথা কহিতেন তখন কথাবার্তায় একটা ঝাঁজও লক্ষ্য করিতাম। ইহার কারণ তখন বুঝিতে পারি নাই, বড় হইয়া অনেক পরে বুঝিয়াছি। যাহারা আশ্রিত তাহারা আশ্রয়দাতার বাড়ীতে অন্ন বস্ত্র এবং থাকিবার স্থান একটা পায় কিন্তু সম্মান কখনও পায় না। যে-কন্যার স্বামী নিজে উপার্জন করিয়া নিজের সংসার স্থাপন করিতে অসমর্থ পিতৃগৃহেও সে-কন্যার সম্মানের আসন থাকে না। বাল্যেই কন্যা পিতৃগৃহে আদৃত, যৌবনে তাহার সম্মানের স্থান পতিগৃহে। মা-বাবা বাঁচিয়া থাকিলেও পতিগৃহবঞ্চিতা কন্যাকে লইয়া পুত্র এবং পুত্রবধূদের সহিত তাহাদের

মনোমালিন্য ঘটে। ইহাই নিয়ম। আমাদের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মামীমা আমাদের সুনজরে দেখিতেন না। আমরা যে তাঁহার সংসারে গলগ্রহ একথা তিনি আমাদের ভাবে-ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিতেন। কেবল দিদিমার ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। মামা কিন্তু আমার মাকে এবং আমাকে খুব ভালোবাসিতেন, কিন্তু তিনি মামীমাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। মামীমা যে আমাদের উপর বিরূপ একথা যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল, ইহা বিশ্বাস হয় না কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করিতেন না বলিয়া সন্দেহ হয় যে, তিনিও মামীমাকে ভয় করিতেন, মামীমারও একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। তা ছাড়া পারিবারিক অশান্তি কেহ চায় না, তাহা এড়াইবার জন্য অনেকে অন্যায়ও সহ্য করিয়া যান। মামা বোধহয় তাহাই করিতেন। তিনি দোটানায় পড়িয়াছিলেন। একদিকে মা-বোন আর একদিকে স্ত্রী। কাহাকেও চটাইবার সাহস তাঁহার ছিল না। তাই তিনি আমাদের সম্বন্ধে যতটা সম্ভব নীরব থাকাই নিরাপদ মনে করিতেন। আমাদের সম্বন্ধে দিদিমা যাহা স্থির করিয়া দিতেন তাহাই হইত। সুতরাং আমাদের তারকেশ্বর যাওয়ার ব্যবস্থা অনড় রহিল। একটা শুভদিন দেখিয়া কার্তিক মামার সহিত আমরা তারকেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে কার্তিক মামা দুই দিনের জন্য একটা ছোট বাসাও ভাড়া করিলেন। সেকালেও দৈনিক ভাড়া দিয়া ঘর পাওয়া যাইত। আমরা যে-ঘরটি লইয়াছিলাম তাহার দৈনিক ভাড়া ছিল চার আনা। আমরা যখন গিয়া পৌঁছিলাম তখন অপরাহ্ন। কার্তিক মামা পাণ্ডার সহিত দেখা করিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ পূজা হইবে না, এখানে রাত্রিবাস করিতে হইবে। সকালে তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমরা সেই ভাড়া করা ঘরে রাত্রি কাটাইলাম। আমার ঘুম আসিতেছিল না। কার্তিক মামা ফড়িং-সন্ন্যাসীর এক অদ্ভুত গল্প বলিতে লাগিলেন। এক সন্ন্যাসী দিনের বেলায় রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইত, নদীতে স্নান করিত, দেবালয়ে পূজা দিত, কিন্তু সন্ধ্যা হইবামাত্র সে ফড়িংয়ে রূপান্তরিত হইয়া ঝিঁঝির দলে যোগ দিয়া তাহাদের ঐকতানে গলা মিলাইয়া গান গাহিত। এই গল্প শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সকালে মা মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। চন্দ্র মন্দিরের চত্বরে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিল। চন্দ্র ছেলেবেলায় অতিশয় সুদর্শন ছিল। মন্দিরের অনেকেই তাহার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একটি দাড়ি-ওলা দীর্ঘাকৃতি সন্ন্যাসীর মতো লোক চন্দ্রকে টপ করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কারণ তখন ছেলেধরার ভয় খুব ছিল। আমার চীৎকারে লোক জড় হইয়া গেল, কার্তিক মামা ছুটিয়া আসিলেন। লোকটি কিন্তু ভয় পাইল না, চন্দ্রকে কোলে করিয়া নির্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কার্তিক মামা হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "ওকে দিন, ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাব।"

লোকটি প্রশ্ন করিল, "এটি কার ছেলে?"—তাহার পর আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ওই ছেলেটির ভাই কি?"

"হ্যাঁ, কেন?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"কার্তিকবাবু আমায় চিনতে পারছেন না, বোধহয় দাড়ি রেখেছি বলে। আমি কিন্তু আপনাকে আর সুধীকে চিনেছি—"

"আরে, জামাইবাবু না কি !"

কার্তিক মামা স-সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "প্রণাম কর, প্রণাম কর, তোর বাবা, চিনতে পারিস নি ?"

প্রণাম করিলাম। সত্যিই আমি বাবাকে চিনিতে পারি নাই। কার্তিক মামা বলিলেন, "বাবা তারকেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। হরিপালে আমার শ্বশুরবাড়ী। ভাবছিলুম বাবা যদি কোন বিশ্বাসী লোকের দেখা পাইয়ে দেন তাহলে তার সঙ্গে এদের সাহেবগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়ে আমি হরিপালে চলে যাব। তাদের প্রসাদটা দিয়ে আসব। আপনি স্বয়ং যখন এসে গেছেন তখন আপনার ভার আপনিই নিন। আমি চট্ করে আমার ছেলেমেয়েদের দেখে আসি। অনেকদিন দেখি নি। দিন দুই পরেই আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করছি। উঃ, হঠাৎ আপনার দেখা পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলব।"

কার্তিক মামা ইহার পর যাহা করিলেন তাহা অপ্রত্যাশিত। তিনি বগল বাজাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রের এই লঘু দিকটা আগে কখনও দেখি নাই। বেশ মজা লাগিল। আমি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলাম।

বাবার সঙ্গেই আমরা সাহেবগঞ্জে আসিলাম। দিদিমা আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। চাঁদ হাতে পাওয়ার আনন্দটা কিন্তু প্রকাশ পাইল অশ্রুরূপে। তিনি ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন। বাবার দুই হাত ধরিয়া তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি বাবা আর যেও না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি। সূর্য-চন্দ্রকে দেখতে পাই না। বারাহী সমস্ত দিন সংসার নিয়ে থাকে। বউমাও আসন্ন-প্রসবা। কিছুদিন পরে ও নিজের সামগ্রীটি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সূর্য-চন্দ্রকে তখব দেখবে কে। তুমি এখানে থাক বাবা, তুমি ভার না নিলে তোমার ছেলের ভার কে নেবে বল।" বাবা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু বিয়ের আগে আমার সঙ্গে একথা তো হয় নি। আমি এসব ব্যাপারে অসমর্থ বলে বিয়েই করতে চাই নি। কিন্তু আপনি যখন বললেন সব দায়িত্ব আপনারাই নেবেন তখন আমি রাজী হলাম। এখন আবার অন্য কথা বলছেন কেন ?"

আমি কাছেই ছিলাম। দেখিলাম বাবার চক্ষু দুইটি হাসিতেছে। দিদিমা উত্তর দিলেন, "আমি যদি অন্ধ হয়ে না যেতাম তাহলে তোমাকে এ-অনুরোধ করতাম না। বারাহীর ভার তো আমরা নিয়েইছি, সে ভার আমরা বইবও, কিন্তু কেউ দেখাশোনা না করলে অমন সোনার চাঁদ ছেলে দুটি নষ্ট হয়ে যাবে।"

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমি সারাজীবন পথে-ঘাটে তীর্থে ধর্মশালায় কাটিয়েছি, গানবাজনার আখড়ায় ঘুরেছি, ছোট ছেলে মানুষ করবার শিক্ষা তো আমার নেই।"

দিদিমা বলিলেন, "সে-শিক্ষা কোন বাপ-মায়েরই নেই। কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে থাকলে বাবা-মাকে দেখলেই ছেলেরা যে-শিক্ষা পায় তাই তো বাবা আসল শিক্ষা। তোমার ছেলেরা যদি সব সময় দেখতে পায় তোমাকে, তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শেখে তাহলে তোমাকে আদর্শ করেই বড় হবে তারা। তোমার মতো সাধু লোকের সংস্পর্শে থাকাই তো পরম ভাগ্যের কথা। এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে।

তুমি ওদের জন্মদাতা। এ-পুণ্য থেকে ওদের বঞ্চিত কোরো না। তুমি ওদের ছেড়ে যেও না বাবা।"

"কিন্তু আমার তো বাঁধা-ধরা কোন রোজগার নেই। শ্বশুরবাড়ীর অন্ন খেয়ে আমি থাকতে পারব না।"

দিদিমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তোমার চলে কি করে ?"

"আমার কিছু শিষ্য আছে। অনেককে গানবাজনা শিখিয়েছি। তাদের নিমন্ত্রণে তাদের কাছে মাঝে মাঝে যাই। তা না হলে কোনও তীর্থে চলে যাই। মন্দিরে বা ধর্মশালায় থাকি আর মায়ের নাম কীর্তন করি। এখানেও থাকতে পারি যদি আমার আলাদা থাকার একটা ব্যবস্থা হয়। আমি স্বপাক খাই, কিংবা মায়ের প্রসাদ খাই। এখানে কোনও মন্দির আছে ?"

"কালী-মন্দির আছে একটা।"

"ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেবারে যখন এসেছিলাম মন্দিরে পুজো দিতে যেতুম। সে তো বেশ ভালো বড় মন্দির। রোজ বলি হয়।"

"মন্দিরের মালিক অযোধ্যানাথ আমার ছেলেকে খুব খাতির করে। ও তাদের বাড়ীর ডাক্তার। তোমার মতো লোককে পেলে বর্তে যাবে ওরা। গানবাজনারও শখ আছে, প্রায়ই কীর্তন হয়।"

"কিন্তু মন্দিরে দিনরাত পড়ে থাকলে ছেলেদের দেখা শোনা করব কি করে। এখনে যদি থাকতেই হয় এ-বাড়ির কাছাকাছি কোনও একটা আস্তানা করতে হবে।"

বাবার কথাবার্তায় দিদিমা আশার সুর শুনিলেন। বলিলেন, "সব হয়ে যাবে বাবা। তুমি মতিস্থির কর, কিচ্ছু আটকাবে না।"

"দেখি ভেবে।"

বাবা উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন। আমিও আস্তে আস্তে উঠিয়া তাঁহার পিছু পিছু গেলাম। বাবা সম্ভবতঃ বাগচী মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন, কারণ সেতারী বাগচী মহাশয়ই সাহেবগঞ্জে তাঁহার একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। আমাদের বাড়ী হইতে বাগচী মহাশয়ের বাড়ী যাইতে হইলে একটি সরু গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। বাবা সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গলিটি তখন নির্জন ছিল। আমি হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলাম। ছুটিয়া গিয়া বাবার হাঁটু দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-সজল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "বাবা তুমি যেও না। এখানেই থাক।" আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিয়াছিল। বাবা আমাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আমার মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকাইয়া আবার আমাকে নামাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন—"আচ্ছা।" আর কিছু বলিলেন না। আমি তাঁহার পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। একটু পরে ঘাড় ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও।" বাবার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলিতেন না। মিথ্যা স্তোকও দিতেন না। যতদূর মনে পড়ে আমার মতো ছোট ছেলেকে ভুলাইবার জন্যও তিনি কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু যে-কথাটি বলিতেন তাহা মূল্যবান।

বাবা শেষ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গেলেন। তাঁহার মনোমত একটা ব্যবস্থাও হইয়া গেল। আমার সহপাঠী মন্মথর বাবা বরদাবাবু সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুভংকরীর সহিত দিদিমায়ের খুব হৃদ্যতা ছিল। দিদিমা পরদিনই পালকি করিয়া তাঁহার কাছে গেলেন। মামা রোগীর বাড়ী যাইবার জন্য পালকি করিয়াছিলেন। তখন রিক্‌শা বা মোটরের তেমন প্রচলন হয় নাই। মামা শহরের মধ্যে পালকি করিয়াই রোগীর বাড়ী যাতায়াত করিতেন। সেই পালকি বাড়ীর মেয়েরাও সময় সময় ব্যবহার করিত। দিদিমার সহিত মন্মথর মায়ের কি কথাবার্তা হইয়াছিল জানি না, কিন্তু তাহার পরদিন বরদাবাবু আমাদের সকলকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ ছিল বোধহয় ইতুপূজা। তখনকার দিনে যে-কোনও পূজা উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইতে গৃহলক্ষ্মীরা ভালোবাসিতেন। তাই কোন না কোন ছুতায় বাড়ীতে বাড়ীতে নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া যাইত। উপলক্ষটা হইত নিতান্ত উপলক্ষ মাত্র। সেদিন আহারাদির পর বরদাবাবু বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কেদারবাবু, একটা প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, রাগ করবেন না তো।"

বাবা সাধারণত স্বপাকই আহার করিতেন, কিন্তু সেদিন দিদিমার অনুরোধে তিনি বরদাবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন।

বরদাবাবুর কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "সে কি, রাগ করব কেন! কি প্রস্তাব বলুন।"

"এখানকার মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্যাক্‌স কালেক্‌টারের একটি চাকরি খালি আছে। আপনি যদি সেটি নেন আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হব। মাইনে মাসিক আঠারো টাকা। কাজ বিশেষ কিছু নেই। যা সামান্য আছে তা আপনার নতুন শাগরেদ বিষ্ণুই করে দেবে। বিষ্ণুও আমাদের ট্যাক্‌স কালেক্‌টার। ছোকরা খুব ভালো। শক্তিবাবুর মায়ের খুব ইচ্ছে যে আপনি এখানে থাকেন। শক্তিবাবুর বাড়ীর কাছেই আমার একটা ছোট বাড়ী আছে, সেটাতে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন। ওটা ভাড়া দেব বলে কিনেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও ভাড়াটে জোটে নি। আপনার মতো লোক যদি ওটাতে বাস করেন তাহলে ওটার একটা সদ্গতি হয়। আমরাও খুব আনন্দিত হই। ওটা এমনিই পড়ে আছে। ভূতের বাড়ী হয়ে যাবে শেষকালে।"

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি রকম ভাড়া দিতে হবে।"

"আপনি যা দেবেন তাই নেব। যদি কিছু না দেন তাতেও আপত্তি নেই। শক্তিবাবু আমাদের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছেন।"

বাবা বলিলেন. "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

বাবা আসিবার দুই একদিন পরেই বিষ্ণুচাঁদের সহিত বাবার আলাপ হইয়াছিল বাগচী মহাশয়ের বাড়ীতে। সেখানেই সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ সংগীতের মজলিস বসিত। সেতারে বাবার পিলু আলাপ শুনিয়া বিষ্ণুচাঁদ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বাবাকে ধরিয়া পড়িল, পিলুটা তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। অনেক ওস্তাদ নিজের বিদ্যা সহজে অপরকে দান করিতে চান না। তাঁহারা সংসারী ওস্তাদ। যে-বিদ্যার বৈশিষ্ট্যে অর্থ উপার্জন করিয়া তাঁহাদের সংসার চালাইতে হয়, সেটি তাঁহারা সকলকে শিখাইতে চান না। বাবা ছিলেন সংসারবিবাগী উদাসীন লোক। তিনি যাহা সংগ্রহ করিতেন

তাহা বিনা দ্বিধায় সকলকে বিতরণ করিয়া দিতেন। বিষ্ণুচাঁদকে তিনি বলিলেন, "এটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম লখনউ শহরের মীরদুল্লা সাহেবের কাছে। মাস তিনেক লেগেছিল শিখতে। আজই তুমি আরম্ভ করে দিতে পার। আমি এখানে মাস তিনেক থাকব কিনা সন্দেহ। আমি না থাকলেও বাগচীমশাই আছেন, তিনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন।"

ইহার পর বাবার চাকরির সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল তখন সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দিত হইল বিষ্ণুপ্রসাদ চৌবে। বিষ্ণুপ্রসাদ চমৎকার বাংলা বলিত। সে বাবাকে বলিল, "আপনি গুরুজি সেতার নিয়ে 'মস্‌ত্‌' হয়ে থাকুন দিনরাত, আপনার সব কাজ আমি করে দেব। সব কাজ তো আমিই করি। আপনাকে এখানে রাখার জন্যে বর্দাবাবু এ পোস্টটা খাড়া করলেন। আমাকে দিয়ে ঝুটমুট একটা দর্খাস্ত লিখিয়ে নিলেন যে আমি একা এত কাজ পাচ্ছি না"—বিহারীরা বরদাবাবুকে বর্দাবাবু বলিত।

বাবা সাহেবগঞ্জ হইতে আর গেলেন না। বরদাবাবু তাঁহার যে ছোট বাসাটির কথা বলিয়াছিলেন সেই বাসাটিই তিনি লইলেন মাসিক এক টাকা ভাড়া দিয়া। বাসাটি ছোট, কিন্তু একার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুইখানি ঘর। একটি বেশ বড় আর একটি ছোট। উঠানটি বেশ চওড়া। উঠানের একধারে রান্নাঘর ও তাহার পাশে ভাঁড়ার ঘর ছিল। সেগুলি অবশ্য পাকা নয়। মাটির দেওয়াল, খোলার চাল। বাবা সেগুলি নিজে কখনও ব্যবহার করেন নাই। কিছুদিন পরে বাবার পোষা হরিণটি সেই ঘরে থাকিত। বাবা তাহার নামও রাখিয়াছিলেন 'হরিণ'। হরিণ বলিলেই সে লাফাইতে লাফাইতে কাছে ছুটিয়া আসিত। বিষ্ণুপ্রসাদই দেহাত হইতে হরিণশিশুটিকে লইয়া আসিয়াছিল। বাবার সেটি খুব পছন্দ হওয়াতে বিষ্ণুপ্রসাদ বাবাকেই সেটি দান করিয়া কৃতার্থ হয়। বিষ্ণুপ্রসাদের মতো ভক্ত আমি কম দেখিয়াছি। বাবার সামান্যতম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সে সদাসর্বদা ব্যগ্র থাকিত। সে প্রত্যহ খুব সকালে আসিয়া বাবার ঘর দুইটি এবং সম্মুখের বারান্দাটি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিত। তাহার পর কূয়া হইতে জল তুলিয়া বালতি কলসী ভরিয়া ফেলিত। বাবা আদেশ করিলে বাবার রান্নাটাও করিয়া দিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাবা স্বপাক আহারই পছন্দ করিতেন। সকালে ভাতে-ভাত, ঘি এবং একবাটি দুধ ছাড়া তিনি আর কিছু খাইতেন না। রাত্রে খাইতেন কালী-মন্দিরের প্রসাদ। তাহাতে প্রায় প্রত্যহই মাংস থাকিত। মন্দিরের মালিক অযোধ্যানাথ বাবার পূজা দেখিয়া এমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই মন্দিরের কার্যকলাপ বাবারই নিয়ন্ত্রণে হইতে লাগিল। মন্দিরের মাহিনা করা পুরোহিত কালীকিংকরবাবু বাবার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িলেন এবং বাবার কাছে তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মোট কথা, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাবা সাহেবগঞ্জের সমাজে একটি শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিলেন। তাঁহার দুই দল ভক্ত জুটিয়া গেল। একদল গানের আর একদল কালী-সাধনার। বাবা যদি ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থ লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্থকষ্ট থাকিত না। কিন্তু তিনি সে-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। মিউনিসিপ্যালিটির বেতনও তিনি সব খরচ করিতেন না। প্রতি মাসেই কিছু বাঁচিয়া যাইত। বাবা তাহা সঞ্চয় করিতেন না। তাহা দিয়া ভিখারী-ভোজন করাইতেন। তখনকার দিনে মাসিক আঠারো টাকা বেতন নিতান্ত কম ছিল না।

আমি আর চন্দ্র বাবার বাসায় আসিয়া প্রায় সমস্ত দিনই থাকিতাম। চন্দ্রকে বাবা সেতারের গৎ শুনাইয়া ঘুম পাড়াইতেন। বাবার বিছানার একপাশে মা তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেন। সে হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করিত। কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেই বাবা সেতারের গৎ বাজাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া দিতেন। আমি পূর্বে লেখাপড়া করিতাম মামার নুনের গোলায় বসিয়া। নুনের ব্যাপারীদের বসিবার জন্য একটি আলাদা ঘর ছিল, বেশ প্রশস্ত ঘর। সেই ঘরের একধারে বসিয়া আমি পড়াশোনা করিতাম। কার্তিক মামা মাঝে মাঝে আসিয়া তদারক করিয়া যাইতেন আমি ঠিকমতো পড়িতেছি কি না। মামাই তাঁহাকে এ-ভার দিয়াছিলেন। তিনি যখন মামাকে রিপোর্ট করিতেন যে আমি পড়িতেছি না তখন মামা আমাকে খুব বকিতেন। মামার একটা বিশেষ গালাগালি ছিল 'হ্যাঁচ্‌কারা'। ইহার কি অর্থ তাহা আমি আজও জানি না। মামা বিশেষ মারধোর করিতেন না, ওই শব্দটি স-জোরে উচ্চারণ করিয়া বড় জোর কান মলিয়া দিতেন। বাবা আসিবার পর হইতে আমি বাবার ঘরে গিয়া পড়িতে লাগিলাম। বাবার ঘর তখন নির্জন থাকিত। বাবা খুব ভোরে উঠিয়া গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গার ঘাট হইতেই তিনি চলিয়া যাইতেন কালী-মন্দিরে, সেখান হইতে পূজা সারিয়া ফিরিতে তাঁহার আটটা ন'টা বাজিয়া যাইত। আমি দিদিমার কাছে শুইতাম। দিদিমা খুব ভোরে আমাকে উঠাইয়া দিতেন। বলিতেন, 'ওঠ, ওঠ, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে নিয়ে বাবার কাছে যা। কাছে কাছে থাকলে তবে তো মায়া বসবে। একবার মায়া বসে গেলে আর কোথাও যাবে না।' প্রায় রোজই দিদিমা এই কথাটি বলিতেন। কিন্তু খুব সকালে উঠিলেও খুব সকালে আমি বাবার কাছে যাইতে পারিতাম না। ইহার কারণ মামীমা উঠিতেন একটু বেলায়। যে বাসী রুটি ও গুড় আমার সকালবেলার জলখাবার ছিল তাহা থাকিত ভাঁড়ার ঘরে। ভাঁড়ার ঘরের তালার চাবি থাকিত মামীমার কাছে। সদর দরজাতেও রাত্রে ভিতর হইতে তালা বন্ধ থাকিত, সে-চাবিও থাকিত মামীমার আঁচলে। দিদিমা অন্ধ ছিলেন, আমার যাইবার বাধা যে কোথায় তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন না। আমিও তাঁহাকে বুঝিতে দিতাম না। আমি তাঁহাকে এ-কথা বলিলে তিনি হয়তো মামীমার নিকট হইতে চাবিটা লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিতেন, কিংবা মামীকে ভোরে উঠিতে বাধ্য করিতেন। ইহার মধ্যে যে-কোনটি করিলে যে শেষ পর্যন্ত আমিই বিপন্ন হইব এ-কথা সেই ছেলেবেলাতেই আমি বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম যে মামীমাই গৃহের কর্ত্রী, অন্ধ দিদিমা আইনতঃ তাঁহার উপরওলা হইলেও কার্যতঃ তাঁহার অধীন। সুতরাং সেই ছেলেবেলা হইতে আমি মামীমাকে খুশী রাখিবার চেষ্টা করিতাম। দিদিমা আমাকে ভোরে উঠাইয়া দিলে আমি ছাতে চলিয়া যাইতাম। ছাতে বসিয়া সূর্যোদয় দেখিতাম। সূর্যোদয়ের নিত্য-নূতন মহিমায় আমার সমস্ত চিত্ত আপ্লুত হইয়া যাইত। প্রত্যহই অনুভব করিতাম যে সূর্য এত বৃহৎ, এত উজ্জ্বল, এমন মহিমান্বিত, দিদিমা সেই সূর্যের নামে আমার নাম রাখিলেন কেন। আমি তো সর্বদিক দিয়াই সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট। আমি কি ও-নামের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিব? মামীমা প্রত্যহ সাড়ে ছ'টার সময় উঠিতেন। উঠিয়া প্রথমেই তিনি মামার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মামা সকালে উঠিয়া মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া পাটের কাপড় পরিয়া ফুল তুলিয়া পূজার ঘরে ঢুকিতেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিতেন। বাড়ীর উঠানে কলকে ফুলের গাছ ছিল একটা,

অধিকাংশ দিনই কলকে ফুল দিয়া পূজা হইত। মাঝে মাঝে মামার এক রোগী আগের দিন সন্ধ্যায় কলাপাতায় জড়াইয়া কিছু কিছু ফুল দিয়া যাইতেন, তাহার পরদিন মামাকে আর ফুল তুলিতে হইত না। মামা পূজার ঘরে ঢুকিলেই আমি ছাত হইতে নামিয়া আসিতাম এবং মামীমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতাম। মুখ ফুটিয়া মামীমার কাছে খাবার চাহিবার সাহস আমার কখনও হয় নাই। মামীমা আমাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন আমার কি চাই। আমাকে দেখিয়াই তিনি রান্নাঘরে ঢুকিয়া একটি কাঁশিতে খান দুই রুটি এবং একটু গুড় বাহির করিয়া দিতেন। শীতকালে গুড়ের সহিত কিছু বাসী তরকারিও থাকিত। সেই বাসী রুটি ও গুড় যে কি উপাদেয় মনে হইত তাহা ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। খাইয়াই আমি বাবার কাছে চলিয়া যাইতাম। গিয়া দেখিতাম বিষ্ণুপ্রসাদ বাবার ঘর-দুয়ার ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিতেছে। কলসীতে এবং বালতীতে খাবার জল ভরা হইয়া গিয়াছে। আমি যে-মাদুরে বসিয়া পড়িতাম সেটিও নিপুণভাবে ঘরের মেঝেতে বিষ্ণুপ্রসাদ পাতিয়া রাখিয়াছে। আমাকে দেখিয়া প্রত্যহ সে ইংরাজীতে বলিত, 'গুড্ মর্ণিং সার, দি স্টাডি ইজ রেডি।' তখন আমি ইংরাজী জানিতাম না, বিষ্ণুপ্রসাদের ভাষাটা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহার হাসি এবং ভাবভঙ্গি হইতে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে আমার কষ্ট হইত না। বিষ্ণুপ্রসাদ কোন ইংরাজী স্কুলে কতদূর পর্যন্ত পড়িয়াছিল তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছিলাম কাশীর নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাহার বাড়ী ছিল। বিমাতার অত্যাচারে সে নাকি গৃহত্যাগ করে এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকাল হইতেই তাহার সংগীতে অনুরাগ। সাহেবগঞ্জ থানার কনেস্টবলদের একটি গানের আখড়া ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহারা খচমচ খচমচ করিয়া খঞ্জনি ও ঢোল সহযোগে গান করিত। বিষ্ণুপ্রসাদ এই আখড়ার একজন নেতা ছিল। তাহার নিজের সেতারও ছিল একটি। খুব ভোরে উঠিয়া সে এই সেতারে রেওয়াজ করিত। বাবা সাহেবগঞ্জে আসিবার পূর্বে সে মনের মতো গুরু পায় নাই। বাবার নাগাল পাইয়া সে যেন বর্তিয়া গেল। প্রকৃত শিষ্যের মতোই সে বাবার সেবা করিত। বিষ্ণুপ্রসাদ না থাকিলে, বাবা শেষ পর্যন্ত সাহেবগঞ্জে থাকিতেন কিনা সন্দেহ। বিষ্ণুপ্রসাদের আন্তরিক সেবাই বাবাকে সাহেবগঞ্জে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মাকে কখনও বাবার বাসায় আসিতে দেখি নাই। তিনি মামার অন্তঃপুরে গৃহকর্মের মধ্যে নীরবে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। বাড়ীতে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ কেহ কখনও শোনে নাই। তাঁহাকে প্রসাধন করিতেও আমি কখনও দেখি নাই। এই সময়ের দুইটি চিত্র আমার মনে আজও স্পষ্টভাবে আঁকা আছে। আমি রাত্রে দিদিমার কাছে শুইতাম। একদিন গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সবিস্ময়ে দেখিলাম মা দিদিমার কোলের উপর মুখ রাখিয়া নীরবে শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মনে হইল, মা কাঁদিতেছেন। আমার বয়স তখন বেশী নয়, কিন্তু তবু আমি যেন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই পরম শোকাবহ দৃশ্যের আমিই একমাত্র দর্শক ছিলাম। আমি অবশ্য একটি কথাও বলি নাই। সহসা আমার চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল। মায়ের কান্নার কারণ কি তাহাও বুঝিতে পারি নাই। ঠিক ইহার দুই দিন পূর্বে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাবার বাসায় পরম রূপবতী একটি বাইজী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি যে সাধারণ বাইজী নন তাহা তাঁহার চেহারা ধরণ-ধারণ এবং বেশবাশ হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল। তিনি স্টেশন হইতে পালকি ভাড়া করিয়া বাবার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দুইজন ভৃত্য এবং একজন তবলা-বাদকও আসিয়াছিল। তিনি যখন পালকি চড়িয়া সদলবলে বাবার বাসায় আসিয়া পড়িলেন তখন পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি পালকি হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন এবং একধারে একটু দূরে বসিয়া রহিলেন। বিষ্ণুপ্রসাদই তাঁহাকে আসন পাতিয়া দিল। বাইজী পরিষ্কার বাংলায় বাবাকে বলিলেন, "বাবা, আপনি এখানে আছেন তা জানতাম না। কলকাতায় গিয়েছিলাম সেখানে খবর পেলাম আপনি এখানে আছেন। আপনি কি আর লখনউ যাবেন না ?"

"আপাতত যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানেই এখন থাকতে হবে আমাকে।"

বাইজী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। "আমিই তাহলে আসব মাঝে মাঝে। আপনার কাছে দু'একটা গৎ নিয়ে যাব।"

"দু'একটা গৎ-এর জন্য অতদূর থেকে আসবার দরকার কি ? লখনউ শহরে বড় বড় ওস্তাদের অভাব নেই।"

"ওস্তাদের অভাব নেই, কিন্তু গুরুর অভাব আছে। কেউ ভালো করে শেখাতে চায় না, সবাই যেন দোকানদারি করে। আপনার মতো গুরু আমি কখনও পাই নি। আপনি অনুমতি দিন আপনার কাছেই আসব আমি।"

"এসো।"

বাইজী কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলেন এবং সেই সময়টুকুর মধ্যেই বাবার নিকট একটি গৎ আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি বাবার পায়ের কাছে এক থলি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন। বাবা থলিটি স্পর্শ পর্যন্ত করেন নাই। বিষ্ণুপ্রসাদ খুলিয়া দেখিয়াছিল থলিতে একশত টাকা রহিয়াছে। বাবাকে সে যখন প্রশ্ন করিল, "গুরুজি, এ-টাকা কোথায় রাখব ?" বাবা বলিলেন, "তোমার কাছেই রেখে দাও, আমার সংসার তো তুমিই চালাচ্ছ।"

মায়ের কথা বলিতে বলিতে অন্য প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি। মায়ের দ্বিতীয় আর একটি চিত্রও আমার মনে আঁকা আছে। আগেই বলিয়াছি মাকে কখনও প্রসাধন করিতে দেখি নাই। সম্ভবতঃ কোন দিন তিনি ভাল করিয়া চুলও বাঁধিতেন না। দিদিমা এজন্য প্রায়ই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। দিদিমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, মা ভালো শাড়ি পরিয়া ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাবার বাসায় রোজ অন্ততঃ একবারও গিয়া বাবার গৃহস্থলী গুছাইয়া দিয়া আসেন। মা কিছুতেই তাহাতে রাজী হইতেন না। বাবার বাসায় মাকে কখনও যাইতে দেখি নাই। একদিন দেখিলাম মামীমা মায়ের চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন। দেখিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। মায়ের যে অত চুল ছিল তাহা জানিতাম না। সমস্ত পিঠ ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। চুলের সঙ্গে কবিরা কালো মেঘের উপমা দেন। সেদিন সত্যই আমার মনে হইয়াছিল মায়ের পিঠে যেন বর্ষার কালো মেঘের খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে। আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মামীমা ঘাড় ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিতেই আমি একছুটে বাহিরে চলিয়া গেলাম। মা সেদিন কেন চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন তাহা আজও আমি

জানি না। কিন্তু সেই চুলের ছবি আজও আমার মনে আঁকা আছে। অমন ঘনকৃষ্ণ রাশি রাশি চুল আমি আর কাহারও মাথায় দেখি নাই।

ইহার মাস দুই পরেই মা মারা যান। ম্যালেরিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাই সকলের অনুমান। ম্যালেরিয়া তখন অনেকেরই হইত। মা-ও প্রায় কম্প-জ্বরে ভুগিতেন। কিন্তু মামা তাহাকে কখনও ঔষধ খাওয়াইতে পারেন নাই। তিনি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকবার ঔষধ আনিয়া দিয়াছেন কিন্তু মা খান নাই। নিজের জন্য কোন কিছু করিতেন না। অপরে তাঁহার জন্য কিছু করুক ইহাও তিনি চাহিতেন না। মৃত্যুকালে কেহ তাঁহার কাছে ছিল না। তিনি একতলায় একটা কোণের ঘরে একা শুইতেন। কখন শুইতেন, কখন উঠিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত না। ভোরে উঠিয়াই তিনি গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিতেন। সেদিন যখন অনেক বেলা পর্যন্ত তাঁহাকে রান্নাঘরে দেখা গেল না তখনই তাঁহার খোঁজ পড়িল। দেখা গেল সেদিন আর তিনি ঘর হইতে বাহির হন নাই। কপাট ভাঙিয়া তাঁহার মৃতদেহ বাহির করিতে হইল। যখন তাঁহার ঘরের কপাট ভাঙা হইতেছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম না। বাবার বাসায় বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিলাম।

মায়ের শ্মশান-যাত্রার ছবিটা এখনও আমার মনে আছে। পাড়ার ছয়-সাতজন লোক, মামা ও আমি শবানুগমন করিয়াছিলাম। বাবা আমাদের সঙ্গে যান নাই। মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া বাড়ীতে পর্যন্ত আসেন নাই। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, প্রতিবেশীদের ভিড়ে উঠান ছাইয়া গিয়াছিল। মামীমা বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। সদাহাস্যমুখী নেতারও দুই চোখে ধারা বহিয়া যাইতেছিল। দিদিমা কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আরও এমন অনেক লোক, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক, হাহাকার করিতেছিল যাঁহাদের আমি চিনিতে পারিলাম না। হয়তো মায়ের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার খুব কান্না পাইতেছিল, বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমি বিবর্ণমুখে একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে হইতেছিল আমি যেন একজন আগন্তুক, আমি যেন কাহারও কেহ নই, যেন একটা অভিনয় দেখিতেছি। এমন কি ইহাও আমার মনে হইতেছিল, আমি যেন মাটিতে দাঁড়াইয়া নাই, শূন্যে দাঁড়াইয়া আছি। এরকম নিঃসঙ্গ নিস্পৃহ নিরাসক্ত অবস্থা আমার জীবনে আর কখনও আসে নাই।

মামীমা মায়ের পায়ে আলতা ও মাথায় সিঁদুর পরাইয়া প্রণাম করিলেন। আরও অনেকে করিল। আমিও করিলাম। মামাও করিলেন। মামা খুব কাঁদিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—'আমার সংসার এইবার ভেঙে গেল। সংসারের মেরুদণ্ড চলে গেল।' কার্তিক মামা কোথা হইতে একটা জবাফুলের মালা আনিয়া মাকে পরাইয়া দিলেন। যে কলকে ফুলের গাছটিকে মা রোজ যত্ন করিত সে-ও তাহার সব ফুলগুলি উজাড় করিয়া দিল। কার্তিক মামা সেগুলি দিয়াও একটি মালা গাঁথিয়া দিলেন। তাহার পর বাবার খোঁজ পড়িল। মামা বলিলেন, জামাইবাবু কোথা, তাঁকে দেখচি না। বাবাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একজন তাঁহাকে মন্দিরে খোঁজ করিতে

গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল তিনি সেখানে নাই, বাড়ীতেও নাই। এই সংবাদে সকলে আরও বিব্রত হইয়া পড়িল। মামা বলিলেন, তিনিও বোধ হয় চলে গেলেন। কিন্তু তিনি চলিয়া যান নাই। আমরা শ্মশানে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেখানে বসিয়া সেতার বাজাইতেছেন। তাঁহার আত্মসমাহিত গম্ভীর মুখভাব, সেতারের অদ্ভুত আলাপ সেই শ্মশানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই।

মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসজীবনের রূপ নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু সে পরিবর্তনের ক্ষেত্র বোধহয় ছিল আমার অবচেতনলোকে। আমি নিজে কিছু বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু অন্যান্য সকলে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিত। আমার বন্ধু মন্মথ বলিত, "তোর মুখটা সর্বদাই যেন থমথম করছে। অমন গোমড়া মুখ করে আর কত দিন থাকবি? মা কি আর কারো মরে নি! ওই দেখ না, বাবুলের মা সেদিন মারা গেছেন, দেখ্ না ও কেমন ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে। আলবার্ট কেটে ফুলেল তেল মেখে সিগারেট ফুঁকছে। তোকে অত করতে বলছি না, তুই একটু হাস দেখি!' মামীমা আমাকে খুব বকিতেন। বলিতেন, আমার খাওয়া নাকি কমিয়া গিয়াছে। দিদিমা মুখে কিছু বলিতেন না। যখন তখন আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন, আর ক্রমাগত কাঁদিতেন। নীরব কান্না। সে কান্নার বিরাম ছিল না। রাত্রে আমি তাঁহার কাছে শুইতাম। চন্দ্র শুইত মামীমার কাছে। সকালবেলা পূজা সারিয়া আসিয়া বাবা চন্দ্রকে নিজের কাছে লইয়া যাইতেন। নেত্য গিয়া তাহাকে দিয়া আসিত। বিষ্ণুই সমস্ত দিন তাহার দেখাশোনা করিত। আমিও বাবার বাসাতে বসিয়া পড়াশোনা করিতাম এবং তাহার পর স্কুলে চলিয়া যাইতাম। আমার জীবনধারা নিয়মানুবর্তিতার বাঁধা খাতে পূর্ববৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মায়ের মৃত্যুতে কোন পরিবর্তন হইল না।

একটা পরিবর্তন কিন্তু আমার জীবনে ক্রমশঃ মুখ্য স্থান অধিকার করিতেছিল, বাবা নয়। বাবা যে-সব গুণে গুণী ছিলেন তাহার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার বয়স আমার তখনও হয় নাই। তিনি কখনও কাহারও মনে নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি নিজেকে লইয়াই থাকিতেন। কে তাঁহার সম্বন্ধে কি ভাবিতেছে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাঁহার ছিল না। তিনি অহোরাত্র তাঁহার সেতার, সংগীত ও শ্যামাপূজায় মগ্ন থাকিতেন। আমি প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়াশোনা করিতাম তাহা যেন তিনি দেখিতেই পাইতেন না। দেখিয়াও দেখিতেন না। আমার অপেক্ষা তিনি ঢের বেশী মনোযোগ দিতেন হরিণটার প্রতি। নিজের হাতে তাহার জন্য কচি দুর্বা তুলিয়া আনিতেন। তাহাকে যত্ন করিয়া দুধ খাওয়াইতেন। চন্দ্রের প্রতিও বাবা তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তাহাকে কোলে তুলিয়া কখনও আদর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। সন্ধ্যার পর সে যখন খুব কাঁদিত তখন কেবল তাহাকে সেতার বাজাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিতেন। সে ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন দিদিমার কাছে। যতদূর মনে পড়ে আমাদের জন্য কোন ঝক্কি কখনও পোহান নাই। যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকুই কেবল করিতেন। সুতরাং আমার

বালকমনে বাবার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ওই বয়সেই আমি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, মায়ের অকালমৃত্যুর কারণ বাবাই। বাবার ঔদাসীন্যের জন্যই আমার অভিমানিনী মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মামার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কারণ দেখিতাম তিনিই সমস্ত সংসারটাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রচুর উপার্জন করিতেন, খরচও প্রচুর ছিল। অনেক গরীব আত্মীয় এবং গ্রামবাসীকে তিনি পালন করিতেন। অনেক দরিদ্র রোগীকে বিনা পয়সায় ঔষধ এবং পথ্য দিতেন। তাঁহার পশার খুব বাড়িয়াছিল। অনেক সময় তিনি দূরে দূরে রোগী দেখিতে চলিয়া যাইতেন। বাড়ী ফিরিতেন দুই তিন দিন পরে। বাড়ীতেও প্রত্যহ বহু রোগী জুটিত। মামার ঔষধের দোকান ছিল একটি। তাঁহার কম্পাউণ্ডার ছিলেন নিকুঞ্জবাবু। পূর্ব-বঙ্গের লোক। তাঁহার ছিল একমুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি, বড় বড় লাল চোখ এবং হলদে রঙের বড় বড় দাঁত। ভীষণদর্শন লোক ছিলেন তিনি। আমাকে 'ছ্যামড়া' বলিতেন। পাড়ার কলহপরায়ণা একটি দাইকে বলিতেন 'খাটাস্'। তাঁহার মুখের অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু এই দুইটি কথা মনে আটকাইয়া আছে। যতদূর মনে পড়ে তাঁহার বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা। মামা তাঁহাকে দুইবেলা খাইতে দিতেন। থাকিবার জন্য একটি ঘরও দিয়াছিলেন। রোগীদের নিকট হইতে তিনি কিছু উপরিও রোজগার করিতেন। প্রতি রোগী তাঁহাকে একটি করিয়া পয়সা দিত। মামাই এ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইহাতে তাঁহার নাকি মাসে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার হইত। প্রতিবৎসর পূজার সময় দশ দিনের ছুটি লইয়া দেশে যাইতেন। সে-সময় হাবু মামা বা আর কেহ তাঁহার জায়গায় কাজ করিত। দেশে যাইবার সময় মামা নিকুঞ্জবাবুকে মাহিনা ছাড়া কুড়ি টাকা আশীর্বাদী স্বরূপ দিতেন। আজকালকার ভাষায় ইহাকে 'বোনাস্' বলা যাইতে পারে। দেশে যাইবার জন্য নিকুঞ্জবাবু যখন স্টেশনে যাইতেন তখন তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া সকলেরই মনে কৌতুক জাগিত। কোঁচানো কালো-পাড় ধুতি, চকোলেট রঙের সাটিনের একটি আজানুলম্বিত কোট, ব্রাউন রঙের জুতা এবং কালো রঙের মোজা। কোটের উপর গলায় একটি কোঁচানো শান্তিপুরী চাদরও ঝুলাইতেন। পাড়ায় শশী হালদারের একটি মনিহারীর দোকান ছিল, সে বলিত প্রতিবার বাড়ী যাইবার আগের দিন নিকুঞ্জবাবু একটি ভালো চিরুনি, চুল বাঁধিবার ফিতা এবং তৎকাল-প্রচলিত ম্যাকেসর তেলও নাকি লুকাইয়া খরিদ করিতেন।

বাল্যকালে মামার ব্যক্তিত্বই আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া থাকিত। মনে মনে আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে মামার জীবনের ছাঁচেই গড়িতে ভালোবাসিতাম। মামার কাছে যেমন দলে দলে রোগী আসিয়া ভালো হইয়া যাইত, কল্পনা করিতাম আমার কাছেও তেমনি রোগীরা আসিয়া ভালো হইয়া যাইতেছে। মামার ডিস্পেন্সারি হইতে ছোটবড় কয়েকটি বোতল লইয়া আমি গুদামঘরের এককোণে নিজের একটি ডিস্পেন্সারিও করিয়াছিলাম। মামার সেই গুদামঘরটিতে ভাঙাচোরা নানারকম জিনিস থাকিত। একটি ভাঙা বালতি, একটি ভাঙা লণ্ঠন, দুটি পা-ভাঙা চেয়ার এবং কয়েকটি ছেঁড়া বালিশকে রোগী কল্পনা করিয়া আমি আমার ডাক্তারি করিতাম। গুদামঘরটা প্রকাণ্ড ছিল। সকলের অগোচরে আমি সেখানে প্রবেশ

করিতাম। ভাঙা বালতি কোনদিন হইত ম্যালেরিয়া রোগী, কোনওদিন বা কল্পনা করিতাম তাহার উদরী হইয়াছে। ওই চার পাঁচটি ভাঙা জিনিসই হেরফের করিয়া নানা রোগীতে রূপান্তরিত হইত। মামা রোগীদের সহিত যে-ভাবে যে-ভাষায় আলাপ করিতেন, আমিও তাহাদের সহিত তাহাই করিতাম। তাহার পর তাহাদের বোতলে-রাখা লাল নীল জল একে একে খাওয়াইয়া দিতাম। অর্থাৎ তাহাদের উপর ঢালিয়া দিতাম। আমার এই গোপন ডাক্তারির কথা কেহ জানিত না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্মথকেও একথা বলি নাই। এই বিশেষ বিষয়ে আমার কেমন যেন একটা লজ্জা ছিল। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, জানিতে পারিলে সকলেই আমাকে উপহাস করিবে। বলিবে, কুব্জের চিত হইয়া শুইবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি ডাক্তারি ডাক্তারি খেলাই খেলিতাম, সত্য সত্যই যে ডাক্তার হইব একথা কোনদিন ভাবি নাই। কোথায় কোন্ স্কুলে ডাক্তারি পড়া হয়, কি করিয়া যে স্কুলে ভরতি হওয়া যায়, মামা কি করিয়া ডাক্তারি শিখিলেন এসব কথা কখনও ভাবি নাই। পড়াশোনাতে আমি মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। সাহিত্য ইতিহাস ভুগোল প্রভৃতি যতটা মুখস্থসাধ্য ততটাই আমি আয়ত্ত করিতে পারিতাম। কিন্তু যেখানেই বুদ্ধির ব্যাপার সেইখানেই আমার মুশকিল ছিল। পাটীগণিত, শুভংকরী, জ্যামিতি, পরিমিতি আমার মাথায় তেমন ঢুকিত না। আমাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিবার লোকও তেমন কেহ ছিল না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আমি ওসব কিছু জানি না। বিষ্ণুপ্রসাদও সম্ভবতঃ অঙ্কে তেমন পারদর্শী ছিল না, কারণ অঙ্কের প্রসঙ্গ উঠিলেই সে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইবার চেষ্টা করিত। তাহার পর একদিন সে সরলভাবে বলিয়াই ফেলিল—ওসব ভাই 'ইয়াদ্' (মুখস্থ) করে ফেল। ওসব আমিও কিছু বুঝি না। সুতরাং অঙ্কও আমি যথাসাধ্য মুখস্থ করিয়া ফেলিতাম। মুখস্থের বাহিরে কিছু পড়িলে আর পারিতাম না। স্কুলের গণিত শিক্ষক বিপিন বসু আমাকে 'গবেট' আখ্যা দিয়েছিলেন এবং আমার ওই নামটাই স্কুলে চালু হইয়া গিয়াছিল।

আমার স্কুল-জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া আমার আরও দুইটি মুখ মনে পড়িতেছে, সুধীরের ও কমলার। মামার বড় ছেলের আর বড় মেয়ের। সংসারে যখন নূতন শিশুদের আগমন হয় তখন প্রায়ই তাহারা লুকাইয়া আসে, প্রায়ই গভীর রাত্রে তাহাদের জন্ম হয়। ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নয়, কিন্তু আমার মনে ওইরকম একটা ধারণাই জন্মাইয়া গিয়াছে। সুধীরের জন্ম তাহার মামার বাড়ীতে হইয়াছিল। সে যখন সাহেবগঞ্জে আসে তখন তাহার বয়স ছয় মাস। সাহেবগঞ্জেও সে রাত্রি দুইটার ট্রেনে আসিয়াছিল, আমি তখন জাগিয়া ছিলাম না। সকালে উঠিয়া তাহাকে প্রথম দেখিলাম। অমন রূপ কোনও শিশুর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ঠিক যেন দেবশিশু। চন্দ্রও দেখিতে খুব সুন্দর ছিল, কিন্তু সুধীরের মুখে এমন একটা দিব্যভাব ছিল যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় না। আজ বৃদ্ধবয়সে আমার জীবনের কাহিনী লিখিতে বসিয়া সুধীরের মুখটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। বছর দুই আগে সে মারা গিয়াছে। মনে হইতেছে, মৃত্যুর অন্ধকার পটভূমিকায় সে যেন জ্যোতির্ময় দেবতার মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যীশুখৃষ্ট বা চৈতন্য সত্যই দেখিতে কেমন ছিলেন জানি না, বড় বড় শিল্পীদের আঁকা তাঁহাদের ছবি-মাত্র দেখিয়াছি। সুধীরের কথা মনে হইলে ওই সব

ছবির কথা মনে পড়ে। সুধীরের জন্য বাল্যকালে আমাকে কিছু অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেজন্য সুধীর তো দায়ী নয়। দায়ী সেইসব সাংসারিক পরিস্থিতি যাহা চিরন্তন এবং যাহা প্রায় অনপনেয়। সুধীরকে লইয়া মামীমা যখন আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন তখন দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পৌত্র সুধীরকে তিনি দেখিতে পান নাই। দেখিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু সুধীর আসিবার পর হইতে তিনি যেন আমাকে ও চন্দ্রকে আরও বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে হইয়াছিল মামীমার যখন নিজের ছেলে হইয়াছে তখন তাহার নিকট হইতে যতটুকু স্নেহ আমরা পাইতাম তাহাও আর পাইব না। আমাদের সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য তিনি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পূর্বাপেক্ষা আমাদের যে তিনি বেশি ভালোবাসিতে লাগিলেন তাহা নয় জন্মাবধি তাঁহার নিকট যে ভালোবাসা পাইয়াছি তাহার অপেক্ষা বেশি ভালোবাসা পাওয়া যে সম্ভব তাহা কল্পনা করাও শক্ত। কিন্তু সুধীর আসাতে সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যেন বাড়িয়া গেল। দিদিমা যেন শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তো তাঁহার সহিত এক খাটেই শুইতাম, এইবার চন্দ্রের বিছানাও তাঁহার আর এক পাশে হইল। রাত্রে আমাদের দেখাশোনা করিবার জন্য মামার দূরসম্পর্কীয়া বিধবা ভাইঝি 'নেত্য'কেও তিনি তাঁহার ঘরের মেঝেতে শুইতে বলিলেন। মামাকে বলিয়া আমার এবং চন্দ্রের জন্য নূতন কোট ও দোলাই করাইয়া দিলেন। আমাকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ এক গ্লাস দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। দুগ্ধ পান করিবার সময় ঢকঢক শব্দ না হইলে তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন আমি বুঝি দুগ্ধ পান করিতেছি না। চোখে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু আহারের পর প্রত্যহ পেটে হাত বুলাইয়া দেখিতেন পেট উঁচু হইয়াছে কিনা। ইহাতে ফল কিন্তু ভালো হয় নাই। পূর্ব হইতেই মামীমা আমাদের উপর একটু অপ্রসন্ন ছিলেন, এইবার আরও চটিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে একটা কালো ছাপ নামিয়া আসিল। দিদিমার প্রতাপে যদিও আমাদের আহার বা পোশাকের কোন অসুবিধা রহিল না কিন্তু মামীমার মনোকষ্টের কারণ হইয়াছি বলিয়া আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে দিদিমা যখন চীৎকার করিয়া নেত্যকে ডাকাডাকি করিতেন—'ওলো হারামজাদি নেত্য, কোথা গেলি তুই, জানলা কপাটের ফুটোগুলোতে তুলো গুঁজে দিয়ে যা না। তোর হাত খালি না থাকে তো বউমাকে পাঠিয়ে দে, ছেলে দুটোর ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!' দিদিমা ঠাণ্ডাকে বড় ভয় করিতেন। শীতকালে নিজে তিনি আপাদমস্তক গরম জামা-কাপড়ে আবৃত থাকিতেন, তাঁহার মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং পায়ে মোজা থাকিত, তবু তাঁহার ভয় হইত জানলা-কপাটের ফুটা দিয়ে ঠাণ্ডা প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কোন অনর্থ ঘটাইবে। তাই তিনি নেত্যকে দিয়া প্রত্যহ জানলা-কপাটের ফুটো তুলা দিয়া বন্ধ করাইতেন এবং আশ্চর্যের বিষয়, দৈবাৎ কোনো ফুটো বন্ধ না হইলে সেটা বুঝিতে পারিতেন। নেত্যকে কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যায় পরদিনের জন্য মসলা বাটিয়া রাখিতে হইত। তাই ঠিক সন্ধ্যার সময় তাহার হাত খালি থাকিত না। দিদিমার চেঁচামেচির চোটে মামীমাকেই আসিয়া প্রায় প্রতিদিনই তুলা বা ন্যাকড়া গুঁজিয়া দিতে হইত। কখনও বা নেত্য মসলা বাটিতে বাটিতে উঠিয়া আসিত এবং দিদিমার গালাগালি শুনিতে

শুনিতে তুলা গুঁজিত। দিদিমা যত গালাগালি দিতেন সে তত হাসিত। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে। বালবিধবা ছিল বলিয়া তাহার মাথায় চুল বেটাছেলেদের মতো ছাঁটা ছিল, একেবারে কদমফুল ছাঁট। আমাদের রাঙা নাপিতানী দুই মাস অন্তর তাহার মাথার চুল ছাঁটিয়া দিত। তাহার যৌবনোদ্গম না হইলে তাহাকে কিশোর বালক বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না। ফরসা গোল মুখ, গাল দুটি টেবো টেবো, ছোট চোখ, হাসিবার সময় চোখ দুটি একেবারে ঢাকিয়া যাইত। তাহাকে কখনও গম্ভীর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সর্বদাই সে হাসিত, অনেক সময় তাহাকে বাসন মাজিতে মাজিতে একা একা বসিয়া হাসিতেও দেখিয়াছি। কাছে-পিঠে কেহ নাই, নেত্য আপন মনে হাসিয়া চলিয়াছে। এ-সংসারটাই যেন তাহার নিকট একটা হাস্যজনক ব্যাপার ছিল। দিদিমার গালাগালি সে যেন বেশি করিয়া উপভোগ করিত, সে বুঝিতে পারিত গালাগালিটা মৌখিক, উহার আড়ালে অফুরন্ত স্নেহ আছে। মামীমা কিন্তু আমার এবং চন্দ্রের উপর ক্রমশঃ চটিতেছিলেন। আমি সুধীরকে কোলে করিলে তিনি যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। ছোঁ মারিয়া আমার কোল হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইতেন। আমার বড়ই কষ্ট হইত। আমি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতাম না। তাঁহাকে কখনও আমি বুঝাইতে পারি নাই যে আমি সত্যই সুধীরকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনও অনিষ্ট কখনও হইতে পারে না। কিন্তু মনের কথা অনুক্ত হইলেও শিশু তাহা বুঝিতে পারে। আমার মনের কথা সুধীর বুঝিত। সে আমাকে দেখিতে পাইলেই আমার কোলে আসিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিত। তাহার পর যখন সে বড় হইল, যখন স্কুলে ভরতি হইল তখন সে সর্বদাই আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরিত। স্কুলে আমিই তাহার রক্ষক ছিলাম।

এই ভাবে নানারূপ সুখদুঃখের ভিতর দিয়া সাহেবগঞ্জে আমার শৈশব অতিবাহিত হইতে লাগিল। এ-জীবনে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। মাঝেমাঝে মন্মথ ও খোঁড়া অশ্বিনী আমাদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিত। পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের পাঠশালার দীনু পণ্ডিত আমাদের জীবনে সমস্যার মতো ছিলেন। কখন যে কাহার উপর তাঁহার কোপদৃষ্টি পড়িবে তাহা কেহ বলিতে পারিত না এবং সেইজন্যই সকলকে সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। মন্মথ এবং অশ্বিনী পণ্ডিতের উপর শোধ তুলিবার চেষ্টা করিত, সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত, কি করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিবে। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। প্রতি বৎসর দীনু পণ্ডিতের শ্বশুরবাড়ী হইতে জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব আসিত এক হাঁড়ি সন্দেশ, এক জোড়া কাপড় এবং একটি চাদর। দীনু পণ্ডিত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তবু তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এই লৌকিকতাটুকু বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হইতে একজন লোক উপহারগুলি বহন করিয়া লইয়া আসিত। সেবার একটা মজা হইল। যেদিন শ্বশুরবাড়ী হইতে তাঁহার সওগাত আসিল সেদিন দীনু পণ্ডিত সাহেবগঞ্জে ছিলেন না। কেহই ছিল না বাড়ীতে। তাঁহার পাঠশালাটি যাহাতে গভর্নমেণ্টের সাহায্য লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি দুমকায় গিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকটি যথাসময়ে পাঠশালায় আসিয়া দেখিল পণ্ডিত পাঠশালায় নাই। আমি বলিলাম তিনি দুমকা গিয়াছেন, ফিরিতে হয়তো দুই একদিন বিলম্ব হইবে। সে-সময় পণ্ডিত মহাশয়ের পরিবারবর্গও

দেশে গিয়াছিল। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি অপেক্ষা করি, জামাইবাবু আসিলে তাঁহাকে জিনিসগুলি দিয়া যাইব। সে-সময় পাহাড়তলিতে একটা হাট বসিত। খোঁড়া অশ্বিনী তাঁহাকে হাট দেখাইতে লইয়া গেল এবং হাটে তাহাকে অনেক-ক্ষণ আটকাইয়া রাখিল। বাকী কাজটি সমাধা করিল মন্মথ। সন্দেশের হাঁড়িটি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে বাহিরের ঘরটিতে ছিল। মন্মথ সন্দেশগুলি বাহির করিয়া হাঁড়ির ভিতর কিছু কচু পুরিয়া হাঁড়ির মুখ পূর্বে যেরূপ ভাবে বাঁধা ছিল সেইরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহার পরদিন আসিলেন। শ্বশুরবাড়ীর লোককে বকশিশ দিয়া বিদায় করিলেন। তখনও তিনি হাঁড়ি খুলিয়া দেখেন নাই ভিতরে কি আছে। যখন দেখিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল।

পরদিন যখন পাঠশালায় আসিলেন তখন রাগে তাঁহার মুখটা থমথম করিতেছে। মন্মথ আমার কানে কানে বলিল, 'কচু খেয়ে শালার মুখ বোধহয় ফুলেছে।' দীনু পণ্ডিত পাঠশালায় আসিয়াই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বলিলেন, "আমার বাড়ীতে গিয়ে সন্দেশের হাঁড়ি থেকে সন্দেশ চুরি করে কে তার ভিতর কচু পুরে দিয়েছে। সত্যি কথা যদি বল আমি কিছু বলব না। আর স্বীকার যদি না কর আমি প্রত্যেককে 'নিল ডাউন' করিয়ে রাখব সমস্ত দিন। তাতেও যদি দোষী ধরা না পড়ে গো-বেড়েন করব প্রত্যেককে।"

আমরা সকলেই নীরব হইয়া রহিলাম। মন্মথ আমাদের প্রত্যেককে সন্দেশের ভাগ দিয়াছিল, আমরা সকলেই জানিতাম কি ভাবে সন্দেশের হাঁড়িতে কচু প্রবেশ করিয়াছে। দীনু পণ্ডিত আমাদের প্রত্যেককে কান ধরিয়া নিল ডাউন করাইয়া দিলেন। তাহার পর ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইতিহাস পড়াইতে পড়াইতে মাঝে মাঝে একজনকে পুরাতন পড়াও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যে না পারিল তাহার কর্ণ-যুগল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। খোঁড়া অশ্বিনী খুব মার খাইল। এই ভাবে যখন আমাদের নির্যাতন চলিতেছে তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভগবান কৃপা করিলেন। সিপাহী ঠাকরুনকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। তিনি কিছুক্ষণ আগে হইতেই রাস্তার ওপারে দাঁড়াইয়া দীনু পণ্ডিতের কীর্তিকলাপ দেখিতেছিলেন। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইতেই তিনি রাস্তা পার হইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন। সিপাহী ঠাকরুনকে দেখিয়া দীনু পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল।

"ড্যাম! এসব কি হচ্ছে দীনু! ছেলেগুলোকে মেরে ফেলবে নাকি! এটা তোমার পাঠশালা না, কসাইখানা? সিট্ ডাউন!"

উচ্চকণ্ঠে তাঁহার মিলিটারি আদেশ শুনিয়া আমরা সকলে বসিয়া পড়িলাম। দীনু পণ্ডিত আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "অতি পাজী ছেলে এরা। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে সন্দেশ এসেছিল এরা সেগুলো চুরি করে খেয়ে হাঁড়ির ভিতর কচু পুরে রেখেছেন মা ঠাকরুন।"

"কে এ কাজ করেছে ধরতে পেরেছ?"

"ধরতে পারি নি ঠিক, তবে এরাই করেছে।"

"সেটা জানলে কি করে তুমি! তুমি কি গণৎকার?"

ধমক খাইয়া দীনু পণ্ডিত থতমত খাইয়া গেলেন। সিপাহী ঠাকরুন বলিলেন, "আমি আজই তোমার নামে রিপোর্ট করছি। তুমি গুরু নও, দানব।"

এই বলিয়া সিপাহী ঠাকরুন গটগট করিয়া চলিয়া গেলেন। দীনু পণ্ডিত তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "যাও তোমরা বাড়ী যাও।"

পরদিন হইতে পাঠশালা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। দীনু পণ্ডিত সন্দেশের কথা যেন ভুলিয়াই গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মামা নুনের ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হইলেন। দিদিমার ধারণা হইল তিনি মা মঙ্গলচণ্ডীকে মানত করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। মা দয়া করিয়াছেন। তিনি মামাকে বলিলেন, "তুই এবার নিজে গিয়ে মায়ের পুজোটা যাতে ভালো করে হয় তার ব্যবস্থা কর। এ ক'বছর তো টাকা পাঠিয়ে পুজো হচ্ছে। প্রতি বছর ওরকম বেগার-ঠেলা পুজো করা ঠিক নয়। আমি এখানে বসে বসেই রোজ মাকে বলি, মা অপরাধ নিও না, ছেলে ব্যস্ত আছে বলে নিজে যেতে পারে না। এবার নিশ্চয় যাবে। তুমি যাও এবার বৌমাকে নিয়ে। আমি তো চোখে দেখতে পাই না পেলে আমিই যেতাম। আমি নেত্যকে নিয়ে থাকছি তুমি ঘুরে এস। জমিজায়গারও তদারক করে এস। এ-বছর তো ঠাকুরপো একটি পয়সা পাঠায় নি, লিখেছে ফসল ভালো হয় নি বলে পাঠাতে পারে নি। নিজে একবার গিয়ে দেখা দরকার।"

মামা যাওয়াই স্থির করিলেন। সে-সময় আমারও পুজোর ছুটি। আমিও দিদিমাকে ধরিয়া বসিলাম মামার সহিত আমিও যাইব। দিদিমা প্রথমে রাজী হন নাই। অনেক কাঁদাকাটি করিয়া ধরাতে শেষটা হইলেন। তাহাও বোধহয় হইতেন না কিন্তু মামীমা বিশেষ অনুরোধ করাতে রাজী হইলেন। মামীমার একটু স্বার্থ ছিল। সুধীর আমার খুব ন্যাওটো হইয়া পড়িয়াছিল। সে অপরের কোলে কাঁদিত কিন্তু আমার কোলে কাঁদিত না। তাহার আর একটি প্রিয়জন ছিল নেত্য। নেত্য কিন্তু দিদিমার কাছে থাকিবে, সুতরাং মামী আমাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

অনেকদিন পরে শঙ্করায় ফিরিলাম। আমার বয়স তখন বোধহয় বারো বছরের কাছাকাছি। শঙ্করায় দেখিলাম অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সই-মায়ের—সন্তোষের মায়ের—পরিবর্তনটা বিশেষ করিয়া চোখে পড়িল। দেখিলাম তাঁহার চুলে পাক ধরিয়াছে, সামনের দিকে চুলই নাই খানিকটা জায়গায়। আগে সোজা হাঁটিতেন, এখন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। মুখের হাসিটাও একটু বদলাইয়াছে, কারণ নিচের কয়েকটা দাঁতই নাই। সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম সন্তোষের। দেখিলাম সে ওই বয়সেই একটি 'ফুল'-বাবুতে পরিণত হইয়াছে। ফুল পেড়ে কোঁচানো ধুতি পরে। ডবল-ব্রেস্টেড শার্ট। গেঞ্জিগুলিও বেশ শৌখিন। ঝিনুকের বোতাম দেওয়া এবং বোতামের ঘরের আশে পাশে রেশমের সুতা দিয়া ফুল-লতা-পাতা আঁকা। আমি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ও-রকম গেঞ্জি আমি আগে কখনও দেখি নাই। সন্তোষের পাঞ্জাবি-গুলিও দেখিলাম, আদ্দির এবং চমৎকার গিলা করা। সন্তোষের দুই জোড়া গোঁফ-ওলা পামশু দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। সই-মা বলিলেন, উনি গতবার পুজোর সময় এই সব কিনে এনেছিলেন। এবার আরও আনবেন। তোর পায়ে হয় তো নিয়ে যা এক জোড়া। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, মনে হইতেছিল আমার কানের ডগা দিয়ে যেন আগুন বাহির হইতেছে। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। একটা কথাও বলি নাই। সই-মা কিন্তু আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তিনি। অনেকক্ষণ চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আজ বারোহী নেই তাই আর কিছুই নেই। তোকে যে দুটো জামা জুতো দেবো সে অধিকারও আমার আর নেই। সবই ফুরিয়ে গেছে।" তাহার পর চোখের জল মুছিয়া আদর করিয়া আমার গায়ে-মুখে-মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি তোর সই-মা যে। তোর যেদিন জন্ম হয়, আঁতুড় ঘরে আমি ছিলাম সেদিন। তোর মা বেঁচে থাকলে একদিন তোকে বলত সব। তখন বুঝতে পারতিস আমি তোর পর নই। আপন জন, অতি আপন। নিয়ে যা ওগুলো। গায়ে দিয়ে দেখ। রাজু, দাদার পাঞ্জাবিগুলো নিয়ে আয় তো।"

তিন-চার বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে তিন-চারটি পাঞ্জাবি লইয়া হাজির হইল। মেয়েটির গায়ের রং ধপধপে ফরসা। চুলগুলি লাল। চুলের বেড়া-বিনুনি করা।

"প্রণাম কর আগে—"

রাজু প্রণাম করিয়া জামাগুলি ফেলিয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষের মা বলিলেন, "একে তুই দেখিস নি। এ আমার ছোট মেয়ে।"

সন্তোষের ছোট একটি টাট্টু ঘোড়াও আছে দেখিলাম। হরি বাগদীর ছেলে নিতাই সেটির দলাই-মলাই করে। সন্তোষ আমাকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া দেখাইতে লাগিল। বলিল, "নিতাইটা দলাই-মলাইয়ের কাজ এখনও শেখে নি ভালো করে। নগেন চৌধুরীর বুড়ো সহিসটাকে রাখতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু সে আসতে চায় না।"

নিতাই বলিল, "আমিই শিখে নেব দাঠাকুর, তুমি কিছু ভেবো নি।"

নিতাইয়ের বয়স দশ-এগারো বৎসর, কিন্তু দেখিলাম তাহার এবিষয়ে উৎসাহ প্রবল। সে আমাদের সম্মুখেই দলাই-মলাই শুরু করিয়া দিল।

সন্তোষের লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। সে গোলক পণ্ডিতের পাঠশালাতেই ঢুকিয়াছিল। কিন্তু গোলক পণ্ডিত শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিলাম বলিয়াছিলেন, "গরুর কখনও লেখাপড়া হয় না। তুই গোয়াল ঘরে গিয়ে জাবনা খা, পাঠশালায় আসতে হবে না।"

ইহাতে সন্তোষ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় নাই। সে নাকি সত্যিই একদিন গোয়াল ঘরে ঢুকিয়া বাছুরের দড়িটা গলায় দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—"মা, দেখ দেখ আমি কেমন গরু হয়েছি।" সন্তোষের মা হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ বুঝিয়াছিলেন ছেলের আর লেখাপড়া হইবে না। আর তাহাকে পাঠশালায় পাঠান নাই।

ঠানদি তখনও বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। তিনি ঘরের বাইরে বড় একটা যাইতেন না। তাঁহার কথা কেহ উল্লেখও করে নাই। আমিও তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেক দিন পরে আমি তাঁহার ভয়াবহ মৃত্যুকাহিনী শুনি।

মামা খুব ধুমধাম করিয়া পূজা করিলেন। গ্রামের সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামের জমিদার চৌধুরী মহাশয় নিজে দাঁড়াইয়া খাওয়া-দাওয়া কাঙালী-ভোজন প্রভৃতির তদারক করিয়াছিলেন। খেতুমামাও নিজের প্রতিপত্তি জাহির করিতে কসুর করেন নাই। তিনি এমন একটা ভাব দেখাইতেছিলেন যেন তিনিই বাড়ীর সর্বময় কর্তা। সেই সময় তিনি মামাকে যে-গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহা আমি আজও ভুলি নাই। চণ্ডী-মণ্ডপের রোয়াকে বসিয়া গল্প হইতেছিল, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। খেতুমামার কণ্ঠস্বর একটু উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকিত। কাহিনীটি বীরত্বব্যঞ্জক হইলে তাহা উচ্চতর হইত।

খেতুমামা বলিতেছিলেন, "সেই ডাব চুরির কথা তোমার মনে আছে শক্তি?"

"কোন্ ডাব চুরি?"

"আরে সেই যে চৌধুরীদের বাগানে বিশে শালা ডাব চুরি করবার জন্যে গাছে উঠেছিল আমি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। মনে নেই এক লাঠিতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম তার? সেই নিয়ে মামলা হল, আমার জেল হয়ে গেল।"

মামা বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে।"

"সেই বিশে আবার আমার খপ্পরে পড়েছিল। এখন শালা জেলে ঘানি টানছে। নফরা আজকাল তিনপাহাড়ের স্টেশন মাস্টার জান তো?"

"শুনেছি।"

নফরা খেতুমামার বড় ছেলে।

"আমি এই কিছুদিন আগে নফরার কাছে গিয়েছিলাম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ নফরা এসে বললে, বাবা, ইঁদুরটা এবার কলে পড়েছে, দেখবে না কি। নফরা একটু আধটু কবিতা লেখে জানো তো, উপমা দিয়ে কথা বলে। আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। জিগ্যেস করলাম কোথায় কলে পড়ল। তখন সে হেঁয়ালিটি ভেঙে

বললে—বিশে বামালসুদ্ধ ধরা পড়েছে। গাঁজা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল, পুলিশ ধরে তিনপাহাড়ে নাবিয়েছে। আমি যদি পুলিশকে অনুরোধ করি, পুলিশ হয়তো ছেড়ে দিতে পারে। পুলিশ আমার চেনা। বললাম, খবরদার। উঠে পড়লুম বিছানা থেকে। ভাবলুম শালার চাঁদবদনটি দেখে আসি একবার। পা বাড়ালুম স্টেশনের দিকে। গিয়ে দেখি বসে আছেন বাছাধন মুখখানি চালতার মতো করে। ইচ্ছে হল একটা লাথি ঝেড়ে দি শালার মুখের উপর। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হল না। কেবল গালাগালি দিলাম। বললাম, কিরে শালা এইবার তো টের পেলি যে ভগবান আছেন! ব্যাটা ইঁদুর, চিরকাল গোলার ধান চুরি করে খেয়েছিস্। ফাঁদের কথাটা ভুলে গিয়েছিলি, না? আমার কথা শুনে গুম হয়ে বসে রইল।"

কুমারের চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। সমস্ত দিন প্রচুর খাটুনি গিয়াছে। কাল সেজ-দা আসিবে, ভোরে উঠিয়াই চাকরদের লইয়া স্টেশনে যাইতে হইবে। আর রাত জাগা ঠিক নয়। আলো নিবাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

॥ ১২ ॥

উশনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে অনেকে গিয়াছিল। কুমার তো ছিলই, বীরুবাবুও ছিলেন। একটু পরে সন্ধ্যা, রঙ্গনাথ, গগন, সুব্রত, সোমনাথ, স্বাতী, চিত্রাও আসিয়া হাজির হইল। কৃষ্ণকান্ত আসেন নাই, কারণ খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি তিতিরের সন্ধানে বিছুয়া জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন।

ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নালটার দিকেই চাহিয়া ছিলেন সকলে। একটু দূরে চার-পাঁচটি চাকর অপেক্ষা করিতেছিল। কুমারের কুকুর দুইটিও সকলের সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারাও যেন বুঝিতে পারিয়াছিল বাড়ীর কোনও পরিজন আসিতেছেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাহাদেরও স্টেশনে যাওয়া উচিত। কিন্তু স্টেশনে গিয়া যতটা শোভনতা রক্ষা করা কর্তব্য ততটা তাহাদের ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল না। ছুঁচিক ল্যাংল্যাংয়ের পিঠের উপর পা দুইটি তুলিয়া দিয়া তাহার কান কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, আর ল্যাংল্যাং চেষ্টা করিতেছিল তাহাকে ফেলিয়া দিয়া তাহার পা কামড়াইয়া ধরিতে। তাহারা খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ গরর গরর শব্দও করিতেছিল, কিন্তু মৃদুভাবে। কারণ তাহারা ঝগড়া করিতেছিল না, খেলা করিতেছিল। এমন সময় প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে 'তাকিয়া'কে দেখা গেল। 'তাকিয়া' ছুঁচিক এবং ল্যাংল্যাংয়ের শত্রু। সুতরাং ছুঁচিক ল্যাংল্যাং আর কালবিলম্ব করিল না। ল্যাজ ও কান খাড়া করিয়া বীরবিক্রমে তাড়া করিয়া গেল। 'তাকিয়া' বেশ হৃষ্টপুষ্ট কুকুর। সম্মুখ-সমরে আগুয়ান হইলে সে হয়তো ইহাদের ঘায়েল করিতে পারিত। কিন্তু সে মহাভীতু। ল্যাজটি পিছনের পা দুইটির মধ্যে ঢুকাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। নিমেষের মধ্যে প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া পাশের আমবাগানের ভিতর দিয়া কোথায় সে যে গা ঢাকা দিল তাহা ঠিক বোঝা গেল না। বিজয়ী ছুঁচিক ল্যাংল্যাং ফিরিয়া আসিয়া কুমারকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। উভয়েই হাঁপাইতেছে, উভয়েরই জিব বাহির

হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে, ল্যাংল্যাংয়ের মুখেও বেশ একটা বাহাদুরির ভাব। তাহারা হয়তো ভাবিতেছিল সকলেই তাহাদের তারিফ করিতেছে, আসলে কিন্তু কেহই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্যও করে নাই। কুকুর কুকুর দেখিলেই তাড়া করিয়া যায়, ঝগড়া করাই উহাদের স্বভাব। ইহাতে লক্ষ্য করিবার কি আছে? কিন্তু ছুঁচকি ল্যাংল্যাংয়ের মুখভাব দেখিয়া মনে হইল, তাহাদের আত্মপ্রসাদের যেন সীমা নাই।

…একটু পরেই গঙ্গা আসিয়া পড়িল। আসিয়াই রাগতকণ্ঠে কুমারকে বলিল, "মধুকে তুমি দূর করে দাও, ওর দ্বারা আর কাজ চলবে না।"

"কেন, কি করেছে—"

"ওকে কাল থেকে পইপই করে বলেছি যে সাড়ে আটটায় গাড়ি। ও যেন ঠিক সময় বয়েল দুটোকে খেতে দিয়ে স্টেশনে আটটার সময় গাড়ি নিয়ে আসে। তোমরা তো চলে এলে, আমি গোয়ালে গিয়ে দেখি বয়েল দুটোকে খেতে দিয়েছে বটে কিন্তু মধুর পাত্তা নেই। দৌড়লুম তার বাড়ী। সেখানেও দেখি নেই। তার মেয়েটা বললে জগন্নাথের দোকানে গেছে। গেলুম সেখানে। জগন্নাথ বললে ও বয়েল দুটোর জন্যে দড়ি কিনতে এসেছিল, নিয়ে গেছে দড়ি। এসব কি আগে করতে পারে নি?"

কুমার প্রশ্ন করিল, "গাড়ি এসেছে তো?"

"এসেছে—"

"তুই তাহলে বাড়ী চলে যা। আমি যোগীয়ার মাকে পাঁচ সের আটা দিয়ে যেতে বলেছি। সেটা তুই নিয়ে বৌদিকে দিয়ে আয়। সেজ-দা কলের ময়দা খাবে না।"

"তুমিও দেখছি মধুর মতো"—গঙ্গা ধমকাইয়া উঠিল—"আমাকে আগে বললেই হতো আমি কালই ময়দা এনে রেখে দিতাম। সব কাজ কি শেষ মুহূর্তে করলে চলে!"

গঙ্গা আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

মধু গরুর গাড়ির বয়েল দুইটিকে খুলিয়া দিয়া স্টেশনের বাহিরে গাড়িটি নামাইয়া রাখিয়াছিল। বয়েল দুটিকে একটা গাছে বাঁধিয়া সে কুণ্ঠিতমুখে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া কুমার আগাইয়া গেল।

"বয়েলের নাথ্‌থা ছিঁড়ে গিয়েছিল নাকি?"

যে-দড়িটা বয়েলের নাকের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া দুই পাশে লাগামের মতো বাহির হইয়া আসে তাহাকে এদেশে নাথ্‌থা বলে।

মধু বলিল, "না, ছেঁড়ে নি। পুরানো হয়ে গিয়েছিল। আজ সেজবাবু আসছেন, তাছাড়া কাল থেকে বাড়ীতে ভোজ, তাই নতুন নাথ্‌থা বদলে দিলাম। জগন্নাথ কাল রঙীন নাথ্‌থা দিতে পারে নি আজ দিয়েছে।"

কুমার একটু আগাইয়া গিয়া দেখিল মধু বেশ শৌখিন নাথ্‌থাই কিনিয়াছে। লাল এবং সবুজ দড়ির বিনুনি। সাদা নধরকান্তি গরু দুটির মুখে বেশ মানাইয়াছে। কুমার লক্ষ্য করিল মধু গরু দুটির শিঙে তেল মাখাইয়া দিয়াছে। গরু দুইটির মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে তাহারাও এই প্রসাধনে বেশ পুলকিত হইয়াছে যেন। কুমারও খুশী হইল। গঙ্গা যে এইমাত্র মধুর নামে নালিশ করিয়া গেল সে-কথা সে আর মধুকে বলিল না।

"ট্রেন আসছে—ট্রেন আসছে—"

বীরুবাবু মনে মনে অনেকক্ষণ হইতেই শশব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল প্ল্যাটফর্মে ছুটোছুটি করিয়া বেড়ান, কিন্তু তাহা অশোভন হইবে বিবেচনা করিয়া কেবল চীৎকারটাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ট্রেন আসিয়া স্টেশনে প্রবেশ করিল। উশনা সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলেন। সঙ্গে ছিল স্ত্রী জগন্ময়ী, দুই পুত্র জীবু ও শিবু এবং দুই কন্যা লীলা ও ইলা। তাছাড়া ছিল সুদৃশ্য খাঁচার ভিতর একটি চমৎকার চন্দনা। নাম কৃষ্ণদাস। উশনা যখন ট্রেন হইতে নামিলেন তখন প্রথমটা কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কারণ দশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল না। কেবল বাবরি চুল ছিল। চশমাও ছিল না। এখন তাঁহার একমুখ কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি। চোখে পুরু লেন্সের মোটা চশমা। চিনিয়া লইতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না। বীরুবাবুই প্রথমে চিনিতে পারিলেন এবং দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আগাইয়া গেলেন।

"কিরে উশনা এসেছিস? দাড়ি রেখেছিস দেখছি। ছি, ছি, কি কাণ্ড? চশমা কবে নিলি? কিছু লিখিস নি তো! চেহারাই বদলে গেছে! রংটাও ময়লা হয়ে গেছে—"

উশনা দাদাকে প্রণাম করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কেমন আছেন?"

বীরুবাবু, কেন জানি জানি না, উত্তর দিলেন ইংরেজীতে—"Much improved. এ-টালটা সামলে গেলেন বোধহয়।"

শুনিবামাত্র উশনা হাত জোড় করিয়া চক্ষু বুজিয়া মা-কালীর উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানে একটি জাগ্রত কালী আছেন। বিশাল তাঁহার মন্দির। দূর-দূরান্তর হইতে লোকে সেখানে পুজো দিতে আসে। বাবার অসুখের খবর পাওয়ামাত্র তিনি সেখানে জোড়া পাঁঠা এবং সওয়া পাঁচ টাকার শিন্নি মানত করিয়াছিলেন। জগন্ময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবা ভালো আছেন। আজই বিঠলরামকে পঁচিশটা টাকা টি. এম. ও. করে দাও। কালই যেন মায়ের পুজো দিয়ে দেয়।"

ইহার পর প্রণামের পালা চলিল। চাকরেরা জিনিসপত্র নামাইতেছিল। অনেক জিনিস। তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেসই গোটা দশেক। তাছাড়া পুঁটুলিও হরেক রকমের। নানা পরিধির ঝুড়িও অনেকগুলি! উশনা একটু যোগাড়ে লোক। সংগ্রহ করার বাতিক আছে। বাবার জন্য পুরাতন চালই আনিয়াছেন পাঁচ-ছয় রকম। কোনটা দশ বছরের পুরোনো, কোনটা-বা পাঁচ বছরের, কোনটা কাটারি-ভোগ, কোনটা বাসমতী, কোনটা জিরাসাল। সব রকম ডাল পাঁচ সের করিয়া আনিয়াছেন। বাবা শুক্তো ভালোবাসেন বলিয়া নানারকম বড়িও আনিয়াছেন তিনি। একটা ঝুড়িতে বড় বড় অনেক বাতাসা। আর একটা ঝুড়িতে প্যাকেটে-বাঁধা মসলা নানা রকম। মিষ্টিও তিন হাঁড়ি। টিফিন কেরিয়ারে লুচি ঠাসা। অ্যালুমিনিয়ামের প্রকাণ্ড হাঁড়িতে এক হাঁড়ি মাংস। ইহা ছাড়া এক টিন ঘি, এক টিন তেল।

বীরুবাবু বলিলেন, "করেছিস কি? এত রকম জিনিস বয়ে এনেছিস কেন?"

উশনা প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছে আমার ক্লায়েন্টরা। বয়েছে কুলিরা। আমাকে কিনতেও হয় নি। বইতেও হয় নি।"

মাংসের হাঁড়িটা দেখাইয়া বলিলেন, "ওইটে আনতেই একটু বেগ পেতে হয়েছে। চার জায়গায় চেঞ্জ তো। প্রত্যেক জায়গায় গরম করিয়ে নিয়েছি। আমরা সবাই তো মাংসাশী, মাংসটা পেলে খুশী হবে সবাই। তাছাড়া ওটা মা কালীর প্রসাদ—"

বীরুবাবু বলিলেন, "কিন্তু কাকাবাবু এসেছেন—"

"বাঃ ভালোই হয়েছে! অনেক দিন দেখি নি কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর জন্যেও কিছু মেওয়া আছে। আছে না গো?"

জগন্ময়ী আধ-ঘোমটা দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন আছে। তাহার পর চুপিচুপি কুমারকে বলিলেন, "সন্দেশের হাঁড়িগুলো মাংসের হাঁড়িটার সঙ্গে ঠেকাঠেকি কোরো না। তাহলে কাকাবাবুও খেতে পারবেন।"

কুমার মধুকে ডাকিয়া বলিল, "তিন খেপ লাগবে। সন্দেশের হাঁড়ি বোধিয়া আর মাংসের হাঁড়িটা ল্যাংড়া নিয়ে যাক। বাকি জিনিস তুই গাড়িতে নিয়ে যা। গাড়িতে একবারে যদি না কুলায়, দুবারে যাবে।"

সকলেই পদব্রজে বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। স্টেশনের কাছেই বাড়ী।

রঙ্গনাথ সন্ধ্যাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেজকাকা কি কাজ করেন?"

"উনি একজন বড় কনট্রাক্টার।"

"চেহারাটা কিন্তু রাজার মতো।"

"তার মানে?"

"তাসের রাজার ছবি দেখ নি?"

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "ওঁর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝতে পারবে ওঁর মেজাজও রাজার মতন। আমার বিয়েতে উনি আসতে পারেন নি, কিন্তু সব চেয়ে দামী হারটা উনিই পাঠিয়েছিলেন।"

রঙ্গনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। জবড়জং হারটা তাহার পছন্দ হয় নাই। সেকথা তখনও বলেন নাই, এখনও বলিলেন না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া কিন্তু উশনা যাহা করিলেন তাহা আধুনিক দৃষ্টিতে হাস্যকর। তিনি গেটে ঢুকিয়াই "বাবা গো" বলিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বালকের মতো ছুটিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহার চোখ হইতে চশমা পড়িয়া গেল, মুখের ঘন গোঁফ-দাড়ি অশ্রুপ্লাবিত হইল। তিনি সূর্যসুন্দরের পক্ষাঘাতগ্রস্ত পা-টার উপর মাথা রাখিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সূর্যসুন্দর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে উশনার এই ছেলেমানুষী দেখিতেছিলেন। মনে মনে কৌতুক বোধও করিতেছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল একটু উপহাস করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করেন, কিন্তু তাহা করিলেন না, সহসা তাঁহার চোখ হইতেও টপটপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তাঁহার চোখের উপর বালক উশনার চেহারাটা ভাসিয়া উঠিল। তাহার ছেলেবেলার একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল স্নান করিবার আগে সে কিছুতেই তেল মাখিতে চাহিত না। তাহার মাকে এবং চাকরদের এড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। বলিত তেল মাখাইতে গেলে তাহার না কি কাইকুতু

লাগে। সেই বালক এবং এই চাপদাড়ি-ওলা লোকটা যে একই ব্যক্তি তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত। সূর্যসুন্দর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উশনা প্রশ্ন করিলেন, "এখন কেমন আছ বাবা।"

"আমি খুব ভালো আছি। তুই অমন করে কান্নাকাটি করিস না। হাতমুখ ধুয়ে আগে চা জলখাবার খেয়ে নে।"

বীরুবাবু তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া ভিতরের দিকে লইয়া গেলেন। তাহার পর জগন্ময়ী শিবু জীবু লীলা ইলা একে একে আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিল। শিবু জীবু পায়জামা পরিয়া আছে দেখিয়া সূর্যসুন্দর বিস্মিত হইলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সূর্যসুন্দরের ঘর হইতে বাহির হইয়া বীরু উশনাকে বলিলেন, "চল কাকাবাবুর কাছে চল, কাকাবাবু কাল থেকে অনেকবার তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। সন্ধ্যাহ্নিকের ঝামেলা না থাকলে স্টেশনেও হয়তো যেতেন।"

চন্দ্রসুন্দর সকালে ও সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ করিয়া পূজাপাঠ করেন। উশনা আর বীরু গিয়া দেখিলেন তখনও তাঁহার পূজা শেষ হয় নাই, উদাত্তকণ্ঠে শিব-স্তোত্র-আবৃত্তি করিতেছেন। পদ্মাসনে ঋজু হইয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু দুইটি মুদিত, হাত দুইটি জোড়-করা। সম্মুখে কোশাকুশি এবং নানারকম ফুল। নিকটেই রাধানাথ গোপও হাত জোড় করিয়া বসিয়া ছিলেন। উশনাকে দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বসিতে বলিলেন। রাধানাথই খুব ভোরে পূজার ফুল যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন। উশনা প্রথমে বসিলেন না। দূর হইতেই মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর সেখানেই বসিয়া পড়িলেন মাটিতে। কয়েক মিনিট বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন আবার।

স্নানান্তে উশনা জলখাবার খাইতে বসিলেন। পুরসুন্দরী নানারকম মিষ্টান্ন, ফল, ছানা, সর প্রভৃতি সাজাইয়া দিয়া একটি পাখা হাতে করিয়া সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

"একি কাণ্ড করেছ বউদি। এতো খাওয়া যায়! ভোগের মতো সব সাজিয়ে দিয়েছ, আমি কি ঠাকুর নাকি!"

"ঠাকুরপো তো বটে। খাও, বেশী কিছু দিই নি। কাল থেকে জগোর উপরই ভার দেব, সেই তোমার খাওয়া-দাওয়ার তদারক করবে। তুমি কি খাও তা তো আমার জানা নেই।"

"আমি সকালে এক গ্লাস গরম দুধ আর একটি সন্দেশ খাই। বাস্। বিকেলে কাজ থেকে ফিরেও তাই।"

"বেশ এখানেও তাই হবে।"

তাহার পর পুরসুন্দরী বলিলেন, "কত জিনিসপত্র এনেছ তুমি। হাঁড়ি আনাতে হবে কয়েকটা। এখানে ভাঁড়ারের সব হাঁড়ি ভরতি।"

"আমি সব গুছিয়ে দেব। কয়েকটা হাঁড়ি আর একটা খড়ি আনিয়ে রাখ। খড়ি দিয়ে হাঁড়ির উপর নাম লিখে দেব। ওখানেও আমি এইভাবে ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়েছি।"

"গঙ্গাকে হাঁড়ি আর সরা আনতে বলেছি। খড়িও আনতে বলব।"

উশনা আহারে মন দিলেন। যদিও তিনি প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পাতে তাঁহার কিছুই পড়িয়া নাই। আহারের পর চীৎকার করিয়া তিনি মেয়েকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

"ওরে লীলা আমাকে পান দে। তোর বড়মার জন্যেও আনিস।"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "এখন আর পান খাই না ভাই। দাঁতগুলো সব গেছে।"

"ভাল মঘই পান এনেছি। এক খিলি খেয়ে দেখ না।"

লীলা চমৎকার একটি পানের বাটা বাহির করিয়া পান সাজিতে বসিল। বাটাটি শুধু যে বড় তাহা নয়, কারুকার্যময়। মোরাদাবাদের।

॥ ১৩ ॥

চিত্রার তাঁবুতে চিত্রা, স্বাতী, লীলা এবং ইলা জটলা করিতেছিল। স্বাতী ও চিত্রা সহোদরা। ইহারা পরস্পরকে খানিকটা চেনে, কিন্তু বিবাহের পর ইহাদের ঘিরিয়া একটা রহস্যের অন্তরাল সৃষ্ট হইয়াছে, কুয়াশার মতো কি একটা যেন পরস্পরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে যেন আর স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় না। বাল্যকালে এবং কৈশোরে তাহারা ঝগড়া করিত, খুনসুটি করিত, তাহাদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। এখন হইয়াছে। তাহাদের উভয়েরই জীবনে স্বামীর এবং শ্বশুরবাড়ীর যে প্রভাব পড়িয়াছে তাঁহার সবটা পরস্পরের নিকট খুলিয়া বলা চলে না। স্বাতীর স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চিত্রার স্বামী পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। দুইজনেই পদস্থ অফিসার। স্বাতী এবং চিত্রা সুবিধা পাইলেই এখন গল্পচ্ছলে নিজের নিজের স্বামীর গুণবনা এবং মহিমা আস্ফালন করিতে চেষ্টা করে। অবশ্য শোভনতা রক্ষা করিয়া। পরস্পরের গহনা কাপড় প্রভৃতির খবর সংগ্রহ এবং বিতরণ করিবার আগ্রহও ইহাদের কম নয়। দেখা হইলে এইসব সম্পর্কেই আলাপ করে উভয়ে। তবু খানিকটা অস্পষ্টতা থাকিয়া যায়।

আজ স্বাতী লীলা ও ইলাকে চিত্রার কাছে আনিয়াছে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য। নূতন করিয়াই আলাপ করিতে হইবে। কারণ স্বাতী-চিত্রা ইহাদের শেষবার দেখিয়াছিল গগনের উপনয়নের সময়। তখন খুব ছোট ছিল ইহারা। একজন আট বছরের আর একজন ছয় বছরের। দশ বৎসরে ইহাদের প্রচুর পরিবর্তন হইয়াছে। অষ্টাদশী লীলা এবং ষোড়শী ইলা উভয়েই এখন নূতন মানুষ। ইহারা আসাতে চিত্রা একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। কারণ সে ঠিক করিয়াছিল সূর্যসুন্দরের একটা ছবি আঁকিবে। তাহারই তোড়জোড় করিতেছিল, ইহারা আসাতে মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। স্বাতী ইচ্ছা করিয়াই এই সময়ে ইহাদের লইয়া আসিয়াছিল, সম্ভবতঃ চিত্রাকে বিরক্ত করিবার জন্যই। স্বাতী একটু দুষ্টপ্রকৃতির, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'মিস্চিভাস্'। স্বাতী আসিয়াই বলিল, "এদের দুজনেরই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, জানিস?"

লীলা-ইলা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। চিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ ক্লাসে পড় তোমরা?"

লীলা বলিল, "আমরা বাড়ীতে পড়ি। ক্লাস এইটের বই পড়ছি এখন।"

বলিয়াই সে—একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে জানে তাহাদের যে বয়স তাহাতে তাহাদের আরও অনেক উঁচু ক্লাসে পড়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহার কারণও নির্দেশ করিল সে।

"বাবা স্কুলে পড়ানো পছন্দ করেন না। তাই আমাদের স্কুলে পড়া হয় নি। বাড়ীতেই পড়ি আমরা।"

ইহা কিন্তু তাহাদের নীচু ক্লাসে পড়ার সত্য কারণ নয়। আসল কারণ উশনা মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়া বিষয়ে তাদৃশ-উৎসাহী নন। হইলে মেয়েদের বোর্ডিংয়ে রাখিয়া পড়াইতে পারিতেন। সে সংগতি তাঁহার আছে। কিন্তু তিনি জানেন লেখাপড়া শিখাইলেও মেয়েদের একগাদা টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে হইবে। লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়া তাহাদের বা বরপক্ষের শাড়ি-গয়না-ফার্নিচার-লোলুপতা কিছুমাত্র কমিবে না। স্কুল-কলেজে পড়িয়া প্রকৃত জ্ঞান বা বিদ্যালাভের সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা আছে বিপথে যাইবার। সুতরাং তিনি ও-বিষয়ে তেমন গা করেন নাই। তবে একটা কাজ তিনি করিয়াছেন—মেয়ে দুটির সংগীত সাধনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। শুকুলদেবজী নামে একজন বৃদ্ধ ওস্তাদকে তিনি বাড়ীতে স্থান দিয়া ঘরের লোক করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার যাবতীয় খরচ উশনাই বহন করেন। শুকুল দেব লীলা ও ইলাকে সেতার শিখাইয়াছেন। তাহাদের সেতার-বাজনা শুনিবার মতো।

চিত্রা মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কোথায় বিয়ের ঠিক হয়েছে ?"

লীলা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। ইলা একটু বেশী সপ্রতিভ। সে বলিল, "দিদির ঠিক হয়েছে বম্বেতে আর আমার নাগপুরে।"

"কি করে পাত্ররা—"

"যিনি বম্বের তিনি আই. এ. এস. আর যিনি নাগপুরের তিনি ইন্‌জিনিয়ার।"

"বাঃ, বেশ।"

স্বাতী বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে একটু হিংসা হইল তাহার। চিত্রা বলিল, "কাকাবাবু খুব ভালো পাত্র যোগাড় করেছেন তো !"

ইলা আরও বিশদ করিয়া বলিল ব্যাপারটা।

"যিনি আই. এ. এস. তিনি বাবার এক বন্ধুর ছেলে। বাবার সেই বন্ধুটি হঠাৎ মারা যান। তাঁর ছেলেকে বাবাই বরাবর পড়িয়েছেন। খুব ভালো ছেলে। আমাদের পালটি ঘর। সে নিজেই বাবাকে বলেছে যে দিদিকে বিয়ে করবে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া ইলা চুপ করিল। স্বাতীর ইচ্ছা করিতেছিল ইলার ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির কথাও খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করে। কত পণ লাগিবে, কি কি গহনা দিতে হইবে, ফার্নিচার কি কি চাহিয়াছে, ছেলেটি দেখিতে কেমন—এইসব। কিন্তু সে সুযোগ আর হইল না। ইলার দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল।

"ওখানে বাঁশ পুঁতে আলনার মতো করছে কেন ? কাপড় শুকুতে দেবে ?"

"না, ওখানে মাছ টাঙিয়ে রাখা হবে। বৌদির কাল সাধ যে। অনেক জায়গা থেকে মাছ আসবে তো। সেইগুলো টাঙিয়ে রাখা হবে।"

"কত মাছ আসবে ?"

"শুনেছি অনেক। নিখিল দাদু বলছিলেন পঁচিশ মণ মাছের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।"

"অনেক লোক খাবে বুঝি।"

"সে তো খাবেই।"

জীবু আসিয়া খবর দিল সন্ধ্যা লীলা-ইলাকে ডাকিতেছে।

স্বাতী বলিল, "চল, আমিও যাই। পিসীমা নিশ্চয়ই একটু নতুন কিছু মতলব আঁটছে। চিত্রা যাবি?"

"না। আমি এখন দাদুর ছবি আঁকব।"

স্বাতী মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া চিত্রার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া এক ছুটে চলিয়া গেল। এ-হাসির ঠিক অর্থ যে কি তাহা চিত্রা বুঝিল না, তবু তাহারও মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল। সে ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া সূর্যসুন্দরের কাছে হাজির হইল।

সূর্যসুন্দর বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন।

"দাদু তোমার ছবি আঁকব।"

ঊর্মিলা একধারে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চিত্রা বলিল, "কাকীমা, এইগুলো ধর তো। আমি আমার ইজেলটা নিয়ে আসি। পশ্চিমদিকের জানালাটাও খুলে দাও।"

ঊর্মিলার হাতে রংয়ের বাক্স, তুলি, পেলেট, পেনসিল প্রভৃতি দিয়া চিত্রা আবার চলিয়া গেল। একটু পরেই সে একটা স্ট্যাণ্ডে ফিট করা ক্যানভাস এবং ছোট একটা ফোল্‌ডিং টুল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সূর্যসুন্দর বালিশে ঠেস দিয়া আরামেই বসিয়া ছিলেন। তিনি সম্মুখের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ছিলেন, বটে, কিন্তু তিনি দেওয়ালটা দেখিতেছিলেন না। অতীতকে দেখিতেছিলেন। যে-অতীত আর ফিরিবে না, অথচ যে-অতীতেরই নবরূপ বর্তমান সেই অতীতই তাঁহার চোখে মূর্ত হইয়া উঠিতেছিল। উশনাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য, যে উশনাকে তিনি শেষবার, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলেন সেই উশনাই তাঁহার মনে জীবন্ত হইয়াছিল। আজ যে ব্যক্তি আসিয়াছে সে যেন অপরিচিত। উশনার মুখে চাপদাড়ি ও চোখে পুরু লেন্সের চশমা তিনি কল্পনাই করেন নাই। তাঁহার পায়ের উপর মুখ রাখিয়া উশনার ওই কান্নাটাও তাঁহার তত ভালো লাগে নাই। মনে হইয়াছিল বড় বেশী মেয়েলী। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁহার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল (থিয়েটার দেখিতে দেখিতেও তো চোখে জল আসিয়া পড়ে), কিন্তু ব্যাপারটা তাঁহার তত শোভন মনে হয় নাই। অথচ কি করিলে যে ঠিক শোভন হইত তাহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয়তো বলিতে পারিতেন না। তিনি তাহা ভাবিতেও ছিলেন না। থিয়েটারের কথা মনে হওয়াতে তাঁহার মনে পড়িতেছিল মন্মথকে। সে অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। সে খুব ভালো থিয়েটার করিত। তাহার ছিল ছন্নছাড়া জীবন। তাহার পারিবারিক অশান্তি, তাহার অভিনয়-নিপুণতা, তাহার অপূর্ব সংগীত সমস্তটাই যেন তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছিল। চিত্রা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি আঁকার আয়োজন করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে তিনি দেখিতেছিলেন না। স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া তিনি

অনেকদূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পড়িতেছিল কোন একটা নাটকে (নাটকের নামটা ঠিক মনে নাই) মন্মথ এক দরবেশের ভূমিকায় 'সচ্চা সল্‌লো লেও দিলদার' গানটা গাহিয়াছিল। কী অপূর্ব সে গান! মন্মথ প্রায়ই আসিয়া তাঁহার কাছে থাকিত। বামুনদিদি এজন্য তাহাকে কত বকিতেন কিন্তু সে গ্রাহ্য করিত না। তাঁহার বামুনদিদিকেও মনে পড়িল। বামুনদিদি তাঁহার বাড়ির রাঁধুনী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় বাড়ী ছিল তাহার। জমিদারী সেরেস্তার এক গোমস্তা অনুকূলবাবু তাহাকে দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। অনকূলবাবুর বাড়ীতে সে কিন্তু টিকিতে পারে নাই। কোথাও টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ যদিও সে বাড়ীর রাঁধুনী মাত্র ছিল, কিন্তু সে চাহিত সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে, সেই যেন বাড়ীর মালিক। এ অসঙ্গত আবদার কাহারও পক্ষে সহ্য করা কঠিন। হুকুরু চৌধুরীদের বাড়ীর এক বধূর সহিত তাহার জানাশোনা ছিল। বউটি তাহাদের গ্রামের। অনুকূলবাবুর স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ করিয়া সে অনুকূলবাবুর গৃহ ত্যাগ করে। সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল হুকুরু চৌধুরীর বাড়ীতে। সূর্যসুন্দরের প্র্যাকটিস তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গৃহস্থালী বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তখনও তিনি স্থাপন করিতে পারেন নাই। ডাক্তারি পাশ করিবার পূর্বেই মামা অবশ্য তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই সে বধূটি মারা যায়। তাহাকে নিজের সংসারে তিনি আনিতে পারেন নাই। সেই বালিকা-বধূর মুখটা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। জীবনের নিগূঢ় নিবিড় সম্পর্ক তাহার সহিত হয় নাই। সে যেন আগন্তুকের মতো আসিয়া আগন্তুকের মতো চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনেক পরে আসিয়াছিল রাজলক্ষ্মী। বামুনদিদি আসিবারও অনেক পরে। বামুনদিদির কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। খুনেখুনে বুড়ী ছিল সে। সোজা হইয়া হাঁটিতে পারিত না, লাঠি ধরিয়া কুঁজা হইয়া হাঁটিত। একটি দাঁত ছিল না, কিন্তু সর্বদাই মনে হইত কি যেন চিবাইতেছে। মাথায় সামান্য যা পাকা চুল ছিল তাহা ঝুঁটি করিয়া পিছনে বাঁধিয়া রাখিত। একটা বড় বড়ির আকারের ছিল সেটা। অত্যন্ত বদরাগী এবং দুর্মুখ ছিল বামুনদিদি। যখন রাগিয়া যাইত তখন উচ্চনীচ জ্ঞান থাকিত না। সূর্যসুন্দরও তাহার নিকট গালাগালি খাইয়াছেন। মন্মথের মতো ঐরাবতও তাহার গালাগালির চোটে কতবার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে। আর একটি লোকও তাহাকে ভয় খাইত। সে অখিল। সূর্যসুন্দরের আর এক বন্ধু। সাহেবগঞ্জে রেলে কাজ করিত। দারুণ মাতাল ছিল। সূর্যসুন্দর অনেক সময় তাহাকে নর্দমা হইতে তুলিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। মাতাল হোক, কিন্তু বড় প্রাণখোলা লোক ছিল সে। অন্তর-দ্বারা সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। সাহেবগঞ্জে রেলের 'স্টোর-কিপার' ছিল সে। খুব চুরি করিত। আয়না, দেরাজ, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, খাট কিছুই বাদ দিত না। কিন্তু একাই সব ভোগ করিত না, বন্ধুবান্ধবদের অকৃপণ হস্তে দানও করিত। তাহার দেওয়া একটা গোলটেবিল এখনও সূর্যসুন্দরের কাছে আছে। এই অখিলকে দেখিলেই বামুন-দিদি ক্ষেপিয়া যাইত। অখিলের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাই সে অখিলের নাম দিয়াছিল 'পোড়া মুহা'—অর্থাৎ মুখপোড়া। অখিল আর বামুনদিদির প্রথম সংঘর্ষের কথাটা আবার সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। বামুনদিদি আসিবার পূর্বে সূর্যসুন্দরের

বাসায় মৈথিলী ঠাকুর রাখারই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকিত না। প্রায়ই আসিত এবং চলিয়া যাইত। এই জন্যই দেওয়ানজি (হুকরু চৌধুরী) বামুনদিদিকে সূর্যসুন্দরের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "একেই রাখুন। খুব কাজের লোক। লোকও খারাপ নয়, তবে একটু ঝগড়াটে। কিন্তু আপনার বাড়ীতে তো এখন পরিবার নেই, কার সঙ্গে আর ঝগড়া করবে।"

অখিল ইহার পর যখন আসিল তখন বামুনদিদি রান্নাঘরের একচ্ছত্র মালিক। অখিল ব্যাপারটা জানিত না। প্রতিবারই আসিয়া সে যেমন রান্নাঘরে সোজা গিয়া ঠাকুরকে বলিয়া আসিত, 'ঠাকুর চাল বেশী নাও। আমি এসে গেছি'—সেবারও তাই করিতে গিয়া কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। বামুনদিদি চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে র‍্যা তুই! হেঁসেলে জুতো পরে ঢুকেছিস, বেরো, বেরো—"

"আমি অখিল, ডাক্তারবাবুর বন্ধু।"

তাহা শুনিয়া বামুনদিদি আরও ক্ষেপিয়া গেল।

"দূর হ, দূর হ, বেরো এখান থেকে—"

একটা জ্বলন্ত চেলা-কাঠ লইয়া বামুনদিদি অখিলকে তাড়া করিয়াছিল। অখিল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা না করিলে বামুনদিদি সত্যই হয়তো তাহার মুখে জ্বলন্ত কাঠটা গুঁজিয়া দিত। সূর্যসুন্দর তখন বাড়ীতে ছিলেন না, 'কলে' বাহিরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া যখন অখিলের সঙ্গে দেখা হইল তখন অখিল বলিল, "সূয্যি, এবার দেখছি রান্নাঘরে কুকের বদলে কুকী রয়েছে। মনুষ্যরূপী 'ড্যাসহুণ্ড' একটি। আর একটু হলে মেরে ফেলেছিল আমাকে। তোমাকেও এইভাবে অ্যাটাক করে না কি!" অখিলের হাস্যস্নিগ্ধ মুখটা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িতে লাগিল। বামুনদিদি অখিলকে রোজই যৎপরো-নাস্তি ভর্ৎসনা করিত। গালাগালির ভাষাটাও ছিল কদর্য। বলিত, "সুয্যি ডাক্তারের বাড়ীতে চাল খুব সস্তা, না? তাই দলে দলে তোরা গিলতে আসিস, না?" প্রতিটি 'না'-এর সহিত দুইটি হাত প্রসারিত করিয়া সম্মুখের বাতাসকেই খোঁচা মরিত। সে কাহাকেও বাদ দিত না। অখিল, মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী সকলেরই উদ্দেশ্যে সে একই ভাষা প্রয়োগ করিত। তাহারা চটিত না, হাসিত। অশ্বিনী একবার তাহাকে একটা মলক্কা বেতের মোটা লাঠি আনিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ঠাকরুন, এইটে নাও। শুধু গালাগালি দিয়ে আর হাত নেড়ে আমাদের তাড়াতে পারবে না।" অশ্বিনীর একটি কথা মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। সে বলিয়াছিল—"বামুনদিদিকে কখনও তাড়িও না। ও তোমার হিতৈষী। তোমার মা বেঁচে থাকলে ঠিক এই কথাই ভাবতেন, হয়তো মুখ ফুটে বলতে পারতেন না। আমরা গুড্-ফর-নাথিং-এর দল এখানে দিনের পর দিন তোমার অন্ন ধ্বংস করছি আর থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছি, এটা তোমার কোন গার্জেন সহ্য করত না। বামুনদিদি সত্যিই তোমার গার্জেন। ওকে যত্ন কোরো।" বামুনদিদিকে যত্ন করিবার প্রয়োজনই হইত না। সেই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। দিন-রাত গজর গজর করিত, আর সকাল হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত খাটিত। বাড়ীতে প্রত্যহ দশ-বারোজন বাহিরেরলোক তো খাইতই, তাহার উপর হঠাৎ-আসা অতিথিদের সংখ্যাও কম ছিল না। কাটিহার হইতে, পূর্ণিয়া হইতে, বারসোই হইতে, ভালুকা হইতে, হরিশচন্দ্রপুর হইতে, কিষণগঞ্জ হইতে হঠাৎ চেনা-শোনা লোকের দল আসিয়া পড়িত। গঙ্গাস্নানের কোন একটা যোগ থাকিলে তো কথাই

ছিল না, দশ-বারোজন তো বটেই, কখনও কখনও পঞ্চাশ-ষাট জনও আসিয়া সূর্য-সুন্দরের বাসায় একবেলা থাকিয়া গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করিয়া যাইত। সমস্ত হাঙ্গামা পোহাইত ওই বামুনদিদি আর মধুয়া চাকরটা।

সেকালে অবশ্য হাঙ্গামাটা এত জটিল ছিল না। প্রথমতঃ চায়ের হাঙ্গামা ছিল না। সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে চা প্রথম আমদানি করে মন্মথ, বীরুর জন্মদিনে। দ্বিতীয়তঃ, জলখাবারের ব্যাপারটাও সহজ ছিল। ছোলাভিজা আর গুড়, দুইটা জিনিসই সূর্যসুন্দরের চাষের জমি হইতে আসিত, কখনও কখনও উদিৎ সিং বাহিরে হালুয়া করিত। খাওয়া-দাওয়াও সরল ছিল তখন। ডাল ভাত, দুই একটা নিরামিষ ভাজা-ভুজি আর মাছ। মাছ প্রচুর ছিল। জমিদার বাড়ী হইতে, স্টেশন হইতে, জেলে-রোগীদের নিকট হইতে সূর্যসুন্দর প্রত্যহ এত মাছ ভেট পাইতেন যে তাঁহাকে মাছ কিনিতে হইত না। অনেক সময় তিনি বিতরণ করিয়া দিতে চাহিতেন। কিন্তু বামুনদিদি তাহা করিতে দিত না। বেলা বারোটা পর্যন্ত মাছ বাছিত, মাছ কুটিত। মধুয়াকে ছুঁইতে দিত না। তাহার পর সেগুলি বারান্দায় উনুন জ্বালিয়া ভাজিত। খাওয়া-দাওয়ার পর যে-মাছ বাঁচিত তাহার অম্বল করিত সে। মাছের দিকে অদ্ভুত একটা টান ছিল তাহার। অথচ নিজে সে মাছ খাইত না। বালবিধবা ছিল। অখিল মাঝে মাঝে ক্ষেপাইত তাহাকে। বলিত, "বামুনদিদি, আমি তোমাকে একটা গাউন আর মেমসাহেবের টুপি কিনে দিচ্ছি। তাই পরে তুমি কাঁটা-চামচে দিয়ে চৌকির উপর বসে মাছ খাও, কিছু দোষ হবে না তাতে। সাহেবী-পোশাকপরা বিধবা মেমসায়েবরা গপাগপ মাছ খায়। আর আমাদের দেশের শাস্ত্রকাররা বিধান দিয়েছেন বৃহৎকাষ্ঠের উপর বসে খেলে দোষ নেই। তাই কর তুমি।" বামুনদিদি তাহাকে ঝাঁটা লইয়া তাড়া করিত। বামুনদিদিকে ক্ষেপাইয়া ক্ষেপাইয়া বামুনদিদির সহিত অখিলের শেষে ভাব হইয়া গিয়াছিল। বামুন-দিদি তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে ছাড়িত না। কিন্তু শেষের দিকে সে একটু যেন প্রসন্ন হইয়াছিল। অখিল ঘুষ দিয়া প্রসন্ন করিয়াছিল তাহাকে। একদিন সে বামুনদিদির জন্য একটা খাট আনিয়া ফেলিল। সেগুন কাঠের পালিশ-করা ছোট একটি চমৎকার খাট। একজনের শুইবার মতো। বলা বাহুল্য, রেলের স্টোর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছিল সেটা। সেকালে ওপরওলা সাহেব খুশী থাকিলে পুকুর চুরি করাও চলিত। রেলের কত মাল যে বাহিরে পাচার হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অখিল বলিল, "তোমার জন্যে খাটটা নিয়ে এলাম। আর মাটিতে শুয়ো না। বুড়ো-বয়সে ঠাণ্ডা লেগে তোমার কিছু হলে আমাদেরই মুশকিল। আমরা একেবারে অনাথ হয়ে যাব।" বামুনদিদি যদিও জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলিয়া খাটটার দিকে চাহিয়াছিল (তাহার চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টি অবশ্য কেহ দেখে নাই)—কিন্তু মনে মনে খুশী হইয়াছিল সে। খাটটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—"কুথা পেলি তুই এ-খাট!" অখিল অবশ্য মিথ্যা কথা বলিল, "তোমার জন্যে কিনে নিয়ে এলাম, আর কোথা পাব।" ইহার কিছুদিন পরে সূর্যসুন্দর একদিন কল হইতে ফিরিয়া একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলেন। অখিল রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া আছে এবং বামুনদিদি গাল দিতে দিতে তাহার পিঠে তেল মাখাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল কিছুদিন পরে যখন অখিলের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ আসে তখন বামুনদিদি পুত্রহারা জননীর ন্যায় গগনভেদী কান্না কাঁদিয়াছিল। বামুনদিদির বাহিরটা কর্কশ হইলেও ভিতরটা

কোমল ছিল। ইহার অনেক প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন। তাই তাহার নিবারুণে রূঢ়তা সত্ত্বেও তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন নাই। সূর্যসুন্দরের কাছেই বামুনদিদি তাহার জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সূর্যসুন্দরই তাহার মুখে গঙ্গাজল দিয়াছিলেন। কানে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন। বামুনদিদি তাঁহাকে পুত্রের মতোই ভালোবাসিত, তাই পুত্রের মতোই তাহার শেষকৃত্য তিনি করিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়া আনেন তখন বামুনদিদি ছিল। রাজুকে সে নিজের পুত্রবধূর মতো যত্ন করিত। বকিত, গালাগালি দিত, কিন্তু যত্ন করিত খুব। সূর্যসুন্দরের মনে হইতে লাগিল, বামুনদিদির দেহটা কবে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতির জগতে সে বাঁচিয়া আছে এখনও। স্মৃতির জগতেও সকলে বাঁচিয়া থাকে না। বাড়ির নিপুণা গৃহিণী যেমন অকেজো পুরাতন জিনিসগুলিকে মাঝে মাঝে বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেন মনের মধ্যেও তেমনি এক নিপুণা অদৃশ্য গৃহিণী থাকেন যাঁহার কাজ জীবনের অপ্রয়োজনীয় ঘটনার স্মৃতিগুলিকে মুছিয়া ফেলা, স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে বাজে জিনিসগুলি দূর করিয়া দেওয়া। সব ঘটনার স্মৃতি মনে থাকে না, থাকা সম্ভব নয়। একদিন যাহা কত প্রয়োজনীয় ছিল, পরে তাহার স্মৃতিটুকুও বাঁচিয়া থাকে না। এ-বিস্মৃতির রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। বীরুর মায়ের সব কথা সূর্যসুন্দরের মনে নাই, কিন্তু বামুনদিদির প্রায় সব কথাই তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছেন।...হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল বামুনদিদি জব্দ হইয়া থাকিত শিশু বীরুর কাছে। বীরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কিরণ এবং উষার জন্ম দেখিয়া গিয়াছে বামুনদিদি। পৃথ্বীশের যখন জন্ম হয় তখন বামুনদিদিই বীরুর ভার লইয়াছিল। বীরু রাত্রে তাহার কাছে শুইত। কি বিরক্তই না করিত তাহাকে। রাত্রে বার বার বিছানা ভিজাইয়া ফেলিত। ভোরে উঠিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে হইত। তাহাকে জামা-কাপড় পরানো তো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। মধুয়া জোর করিয়া পরাইতে পারিত। কিন্তু বামুনদিদির জেদ ছিল, সে বীরুর গায়ে আর কাহাকেও হাত দিতে দিবে না, এমন কি বীরুর মা-কেও নয়। বলিত, "বো তো নিজেই একটা ছেল্যামানুষ, ও আবার কি জানে।" 'বো' মানে বউ। রাজলক্ষ্মীকে সকলে বউ বলিয়াই ডাকিত। সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরও। বামুনদিদিই বীরুর সব ঝঞ্ঝাট পোহাইত। বীরুর একটা অদ্ভুত খেলা ছিল বামুনদিদির সঙ্গে। বামুনদিদি যখন রাঁধিত তখন বীরু পিছন দিক হইতে তাহার বড়ির মতো খোঁপায় টান দিয়া ছুটিয়া পলাইত। কখনও পিঠে লাঠি বসাইয়া দিত। ছেলেবেলায় বীরুর হাতে সর্বদা ছোট লাঠি থাকিত একটা। লাঠি খাইয়া বামুনদিদি চীৎকার করিয়া শুইয়া পড়িত এবং ভান করিত যেন মারা গিয়াছে। বীরু তখন তাহার মুখের উপর উপুড় হইয়া বলিত—"বামুনদি, তুই মলে' গেলি? ওঠ ওঠ। মলে' গেলি? মলিস না, ওঠ, ওঠ, আবার খেলি।" বামুনদিদি উঠিতে চাহিত না। বীরু তাহার মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করিত তখন। তারস্বরে ক্রন্দন করিত। বামুনদিদি কিছুক্ষণ মড়ার ভান করিয়া আচমকা হঠাৎ উঠিয়া বীরুকে ধরিয়া ফেলিত এবং চুমু খাইত। বীরু ছেলেবেলায় খুব মোটা ছিল, ছুটিতে পারিত না। এখন সেই বীরু কি হইয়া গিয়াছে। রোগা লম্বা জুলফির চুলে পাক ধরিয়াছে। বামুনদিদি এখন যেখানেই থাকুন—এ-বীরুকে দেখিলে চিনিতে পারিবেন কি? বীরুকে লইয়া বামুনদিদির একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল, চামরুর

বউ। পৃথবীশ যখন রাজলক্ষ্মীর পেটে আসে তখন তাহার দুধ শুকাইয়া গিয়াছিল। বীরু কিছুতেই গরুর দুধ খাইতে চাহিত না। তাহার পেটে গরুর দুধ তেমন সহ্যও হইত না। সূর্যসুন্দর কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তৎকালে প্রচলিত শিশুদের খাদ্য মেলিনস্ ফুড আনাইয়া দেখিলেন তাহাও বীরুর সহ্য হইতেছে না। তখন এ-সমস্যার সমাধান করিল চামরুর বউ। চামরু মুসলমান। সূর্যসুন্দরের জমি চাষ করিত। চামরুর বউও মজুরনী ছিল। সেও সূর্যসুন্দরের জমিতেই খাটিত। এই সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন চামেলী। বীরুর বয়স যখন ছয় মাস তখন চামেলীর জন্ম হয়। চামরুর বউ একদিন চামরুর মারফত সূর্যসুন্দরকে জানাইল যে বাবুর বা মাইজির যদি আপত্তি না থাকে তাহা হইলে সে খোকাবাবুকে নিজের দুধ খাওয়াইতে পারে। তাহার এত দুধ যে চামেলী খাইয়া শেষ করিতে পারে না! তাহার একটা 'থন'-এর (স্তনের) দুধই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। দ্বিতীয় 'থন্'টা সে খোকাবাবুকে অনায়াসেই খাওয়াইতে পারে। বৌ (রাজলক্ষ্মী) প্রথমটা রাজী হয় নাই। কিন্তু বীরুর পেটে যখন গরুর দুধ বা মেলিন্স্ ফুড কিছুতেই সহ্য হইল না তখন শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী হইতে হইয়াছিল। সুতরাং বামুনদিদি বীরুকে সম্পূর্ণ জয় করিবার অনেক আগেই চামরুর বউ তাহার হৃদয় জয় করিয়াছিল। চামরুর বউ বীরুকে অনেক সময় মাঠে লইয়া যাইত। বীরুর শৈশবের অনেকখানিই খোলামাঠে কাটিয়াছে। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামল মাঠের মাঝখানে একটা বুড়ো বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের তলায় বীরুকে বসাইয়া দিত চামরুর বউ। তাহার সঙ্গিনী ছিল চামেলী। আর তাহাদের পাহারা দিত ভাগিয়া, রাখাল চাকরটা। বীরু যখন আরও একটু বড় হইল তখনও ছোট লাঠিটা লইয়া সে মাঠে মাঠেই ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালোবাসিত। ভাগিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বনে-জঙ্গলেও ঘুরিত। টুনটুনি, নীলকণ্ঠ, বক, ফিঙে, শালিক প্রভৃতি পাখিরা তাহাকে নূতন জগতের সন্ধান দিত যেন। ফড়িং ধরিবার চেষ্টায় সে এক ঝোপ হইতে আর এক ঝোপে ছুটোছুটি করিত। ভাগিয়া তাহাকে একবার একটা পাখির বাসাও দেখাইয়াছিল। তিনটি ছোট ছোট নীলচে রংয়ের ডিম ছিল তাহাতে। ডিমগুলির গায়ে বাদামীরঙের ফুটফুট দাগ। এই নিত্যনূতনের সন্ধানে ছেলেবেলা হইতেই মাঠে-মাঠে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ানো একটা নেশা হইয়া গিয়াছিল তাহার। চাকররা তাহার নাম দিয়াছিল জংলিবাবু। ভাগিয়া তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইত। সূর্যসুন্দরের কোনও রোগী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিলে ভাগিয়া সেই ঘোড়ায় বীরুকে চড়াইয়া দিত এবং ঘোড়াটার লাগাম ধরিয়া হাট পর্যন্ত লইয়া যাইত। বামুনদিদি কিন্তু এ-সবের ঘোর বিরোধী ছিল। বামুনদিদির ইচ্ছা বীরুর খেলাধুলা চলাফেরা উঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। এজন্য বীরুকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিবারও চেষ্টা করিত সে। তাহার জন্য মাটির গুলি বানাইয়া রাখিত। উঠানের কোণে খেলাঘর করিয়া দিত। বীরু সে-সব লইয়াও মাতিয়া থাকিতে কসুর করিত না। কিন্তু যেই উঠানের এক কোণে চামরুর বউ দেখা দিত, যেই হাসিমুখে বলিত, সেলাম, জংলিবাবু—অমনি বীরু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিত এবং তাহার কোলে চড়িয়া মাঠে চলিয়া যাইত। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও বামুনদিদি আর তাহাকে ফিরাইতে পারিত না। চামরুর বউয়ের কোলে চড়িয়া সে গল্প শুনিত একটা গিধ্ (শকুনি) তাহাদের জমির উঁচু শিমুল গাছটার মাথায় 'খোতা' (বাসা)

বাঁধিতেছে, মাঠে কয়েকটা জংলি খারুহা (খরগোশ) আসিয়াছে, চুলুহা (আর একজন চাষের চাকর, খুব ষণ্ডা ছিল) ফাঁদ পাতিয়া তাহাদের ধরিবে বলিয়াছে। যদি ধরিতে পারে খাঁচা বানাইয়া খরুহা পুষিতে হইবে। সর্বন মিস্ত্রী ভাল খাঁচা বানাইতে পারে। বীরুর কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িত। বামুনদিদির তৈরী কাদার গুলি বা মুড়ির মোয়ার কথা তাহার আর মনে থাকিত না। এইসব লইয়া কিন্তু ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হইত মাঝে মাঝে। বামুনদিদি রাজলক্ষ্মীকে বলিত, চামরুর বউকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিও না। ও কোলে করিয়া বীরুকে মাঠে লইয়া যাইবে কেন। ভদ্রলোকের ছেলে, বিশেষত ওইটুকু ছেলে, মাঠে গিয়া কি করিবে ? চামরুর বউয়ের অন্য কোন মতলব আছে নিশ্চয়। ওই সব ছোটলোকের মেয়েরা অনেক সময় ডাইনি হয়। যদি বীরুকে 'গুণ' করিয়া ফেলে তাহা হইলে সর্বনাশ হইয়া যাইবে। রাজলক্ষ্মীরও এসব শুনিয়া একটু একটু ভয় যে না করিত তাহা নয়, সূর্যসুন্দরকে দুই-একদিন সে একথা বলিয়াছিল, কিন্তু দুই-একদিন মাত্র। সম্ভবতঃ চামরুর বউয়ের সরল স্নিগ্ধ হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া তাহার ভয় কাটিয়া গিয়াছিল। সম্ভবত তাহার মনে হইয়াছিল, নিজের দুধ দিয়া বীরুকে ও মানুষ করিয়াছে, বীরুর উপর উহারও তো কিছু অধিকার আছে, ও কি বীরুর কোন অনিষ্ট করিতে পারে ! রাজলক্ষ্মী চামরুর বউকে বাধা দিতে পারে নাই। সে রোজ আসিতও না। কিন্তু যখনই আসিত বীরুকে লইয়া চলিয়া যাইত। বামুনদিদির ইহাতে রাগারাগির অন্ত ছিল না। নিজেই সে দুই-একদিন মানা করিয়াছিল, কিন্তু চামরুর বউ তাহার কথা শুনিল না। রাজলক্ষ্মীও যখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিল না তখন বামুনদিদির বড় রাগ হইল। তাহার মনে হইল রাজলক্ষ্মী তাহাকে অপমান করিয়াছে। রাগ হইলে বামুনদিদি নিজের ছোট পুঁটুলিটি লইয়া হকুরু চৌধুরীর বাড়ীতে চলিয়া যাইত। সেখানে গিয়া প্রায়োপবেশন শুরু করিয়া দিত। অবশেষে সূর্যসুন্দর নিজে গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া, মান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া আসিতেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। বামুনদিদি এভাবে চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দরকে বেশ একটু অসুবিধায় পড়িতে হইত। বাড়িতে অতগুলি রান্না করিবার লোকও চট্ করিয়া পাওয়া যাইত না। কুঠি হইতে নিখিলবাবুর ঠাকুর দুনিয়ালাল অনেক সময় আসিয়া সামলাইয়া দিত। বিষ্ণুবাবু থাকিলে তিনিই ভার লইতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ভাল রাঁধিতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি সব সময় থাকিতেন না। বিষ্ণুবাবুর মুখটা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তিনি এতদিন যেন মনের কোন গোপন কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, হঠাৎ বাহির হইয়া আসিলেন !...বিষ্ণুবাবু ইনসপেকটিং পণ্ডিতছিলেন। তাঁহাকে টুরেটুরে ঘুরিতে হইত। এক-একটা টুর সারিয়া সূর্যসুন্দরের কাছে আসিয়া কয়েকদিন থাকিতেন, তাহার পর আবার টুরে চলিয়া যাইতেন। বিষ্ণুবাবুর একমাথা কোঁকড়ানো চুল এবং একমুখ কালো কুচকুচে দাড়ি ছিল। চোখে সোনার চশমা ছিল একটি। বেঁটেখাটো মানুষ ছিলেন তিনি। সকলের সহিতই খুব সসম্ভ্রমে কথা বলিতেন। বর্ধমান জেলার কোনও গ্রামে বাড়ী ছিল। ছুটির পর যখন দেশ হইতে ফিরিতেন, সূর্যসুন্দরের জন্য ওলা, পাটালি গুড়, কদমা প্রভৃতি আনিতেন। বিহার প্রদেশে এ তিনটি জিনিসই দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাই বিষ্ণুবাবু দেশ হইতে ফিরিলে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। ওলা, পাটালি গুড়, কদমা ভাগ ভাগ করিয়া চেনাশোনা অনেকের বাড়ীতে পাঠানো হইত। স্টেশন মাস্টার

শ্যামবাবুর বাড়ী, জমিদারের ম্যানেজার নিখিলবাবুর বাড়ী, দারোগা চন্দ্রভানু বাবুর বাড়ী, রমেশের বাড়ী। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল রমেশের বাড়ী কদমা একটু বেশী করিয়া দিতে হইত। কারণ রমেশ বিষ্ণুবাবুকে একদিন বলিয়াছিল, "আপনি আমার জন্য কদমা একটু বেশী করে আনবেন। আপনার বৌমাটি কদমা দিয়ে মুড়ি খেতে খুব ভালোবাসে।" বিষ্ণুবাবু এক ঝুড়ি কদমা আনিতেন। কিছু ভাঙিয়া যাইত, ভাঙা টুকরাগুলি রমেশ লইয়া যাইত। বলিত, "আমাকেই দিন ওগুলো। ভাঙা হোক না, ক্ষতি কি, ভেঙেই তো খেতে হবে।" বিষ্ণুবাবুকে ঘিরিয়া অনেকগুলি স্মৃতি পর-পর সূর্যসুন্দরের মনে জীবন্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল বিষ্ণুবাবু গাঁজা খাইতেন। কিন্তু খুব লুকাইয়া। সন্ধ্যার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া যাইতেন এবং ভজু নাপিতের বাড়ী গিয়া হাজির হইতেন। ভজুও গাঁজা খাইত। ভোজুর সহিত দাবাও খেলিতেন তিনি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, বিষ্ণুবাবু, গানের আসর ফেলে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকারে কোথায় বেরিয়েছিলেন? বিষ্ণুবাবু উত্তর দিতেন, এই একটু 'ইভ্‌নিং ওয়াক' করে এলাম। এই ইভ্‌নিং ওয়াকের অর্থ কি, তাহা অবশ্য পরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা লইয়া আর কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিত না। সূর্যসুন্দরই সকলকে মানা করিয়া দিয়াছিলেন। বিষ্ণুবাবু সকালেও কখনও কখনও দাবা খেলিতেন। ভোজু নাপিত সপ্তাহে দুই দিন আসিয়া সকলকে কামাইয়া দিয়া যাইত। বিষ্ণুবাবু থাকিলে সে দুই দিনও ভোজুর সহিত দাবা খেলিতেন। বিষ্ণুবাবুর ছোট একটি মাদুর ছিল। সেটি লইয়া নিম গাছটার তলায় পাতিতেন। নিম গাছের তলায় একটা ছোট চৌতারা ছিল। দশরথ মিস্ত্রী চৌতারাটি যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। দশরথ সূর্যসুন্দরের রোগী ছিল। কোন ফি, এমন কি ঔষধের দামও দিত না। মাঝে মাঝে বিনা মজুরিতে কাজ করিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিত সে। চৌতারাটি বানাইবার সময় সে বলিয়াছিল, নিমগাছের হাওয়া খুব ভালো, চৌতারাটি বানাইয়া দিয়েছি, ইহার উপর বসিয়া সকাল-সন্ধ্যা গায়ে নিমের হাওয়া লাগাইলে শরীর ভালো থাকিবে। কিন্তু কেহই এ-উপদেশ পালন করে নাই। চৌতারাটির উপর কুকুরগুলার আড্ডা হইয়াছিল। আর বিষ্ণুবাবু যখন থাকিতেন তখন ভজু নাপিতের সহিত দাবা খেলিতেন ওখানে। বিষ্ণুবাবুর আর একটি ছবিও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তাঁহার 'টুরে' বাহির হইবার ছবিটা। টুরে বাহির হইবার দিন খুব ভোরে উঠিতেন, উঠিয়া কুয়া হইতে নিজেই জল তুলিয়া স্নান করিয়া ফেলিতেন। উপবীতটা সাবান দিয়া খুব ভালো করিয়া পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর পশ্চিম দিকের কোণের ঘরটায় বসিয়া পূজা করিতেন অনেকক্ষণ। অন্যদিন তাঁহাকে পূজা করিতে দেখা যাইত না। পূজা শেষ করিয়া ছুটিতেন নিমু ময়রার দোকানে। তাহার দোকানে বসিয়াই গরম লুচি তরকারি এবং জিলাপি আহার করিয়া আবার দ্রুতপদে বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। আসিয়া আগেই কুচকুচে কালো মোজা এবং জুতাটা পরিয়া ফেলিতেন। জুতা পরিতে তাঁহার অনেকক্ষণ সময় লাগিত, অনেকক্ষণ ধরিয়া ফিতা বাঁধিতেন। বিষ্ণুবাবু 'শু'-জুতা টুরে বাহির হইবার সময় কেবল পরিতেন। অন্যদিন পরিতেন কেবল চটি জুতা। জুতা-মোজা পরা হইয়া গেলে পরিতেন কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি একটি। সেটি তাঁহার ট্রাঙ্কে থাকিত, সেটিও তিনি কেবল টুরে বাহির হইবার সময় পরিতেন। টুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতেন সেটি। তুলিয়া রাখিয়া লুঙ্গি

পরিতেন। একটি গেরুয়া রঙের লুঙ্গি ছিল তাঁহার। কাপড় পরা হইলে গেঞ্জি পরিতেন এবং তাহার উপর পরিতেন একটি আজানুলম্বিত তসরের কোট। এটিও পোশাকী। টুর হইতে ফিরিয়া এটিও তুলিয়া রাখিতেন। কোট পরা হইয়া গেলে বাক্স হইতে আর একটি পোশাকী জিনিসও বাহির করিতেন তিনি। একটি পাট করা মুর্শিদাবাদী চাদর। সেটি কাঁধের উপর ফেলিয়া মসলার কৌটা হইতে কিছু মশলা মুখে দিয়া তিনি স্টেশনের দিকে ছুটিতেন। টুরে বাহির হইয়া তিনি লোয়ার প্রাইমারী এবং আপার প্রাইমারী স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। স্টেশনের দিকে ধাববান বিষ্ণুবাবুকে সূর্যসুন্দর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, শর্টকাট্ হইবে বলিয়া মাঠামাটি ছুটিতেছেন। ট্রেন আসিয়া গিয়াছে।···সূর্যসুন্দরের মুখে একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"দাদু হাসছেন যে! ছবি ভালো হচ্ছে না বুঝি। এখন তো কিছুই হয়নি, পরে দেখবেন। আপনি নড়বেন না, যেমন বসে আছেন, তেমনি বসে থাকুন।"

সুদূর অতীত হইতে সূর্যসুন্দর সহসা বর্তমানে উপনীত হইলেন। ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া চাহিয়া রহিলেন চিত্রার দিকে। কে এ মেয়েটি! পরমুহূর্তেই মনে পড়িল সব। বীরুর ছোট মেয়ে, তাঁহার ছবি আঁকিতেছে। সেকালের মেয়েরা এসব কল্পনা করিতে পারিত কি? রাজলক্ষ্মী অবসর বিনোদন করিত অন্য প্রকারে। দুপুরে রোদে বসিয়া বড়ি দিত, আচার প্রস্তুত করিত নানারকম, মোরব্বা করার শখও ছিল। উল বোনা তখনও তেমন প্রচলিত হয় নাই। এ-অঞ্চলে নিখিলবাবুর স্ত্রী আধুনিকা ছিলেন, তিনি ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের নকলে চুল বাঁধিতেন, শাড়ি পরিতেন। অনেক রকম শৌখিন রান্নাও জানা ছিল তাঁহার। তিনিই এ-গ্রামে সর্বপ্রথম বাড়ীতে চপ-কাটলেট করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন সকলকে। তিনিও উল বুনিতেন না। জুতা পরিতেন না। মাথায় ঘোমটা দিতেন। তখন মেয়েদের চিত্রবিদ্যার দৌড় আলপনায় সীমাবদ্ধ ছিল। খুব ভালো আলপনা দিত তাহারা। সন্তোষের মায়ের হাতের আলপনা ও-অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। পূজার ঘট বা বিবাহের মঙ্গলকলসেও চমৎকার ছবি আঁকিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ পোর্ট্রেট আঁকা তাহারা কল্পনা করিতে পারিতেন কি? হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট-পরা, মাথার চুল বব্ করিয়া ছাঁটা, চোখে-মুখে একটা নতুন ধরনের সংস্কৃতির দীপ্তি, উজ্জ্বল কিন্তু শাণিত নয়—সূর্যসুন্দর অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চিত্রার দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার মনে হইল সন্ধ্যার সহিত তাহার যেন কোথায় মিল আছে, অথচ অমিলও প্রচুর। হঠাৎ একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করিলেন, চিত্রার চিবুকের ডোল ঠিক তাহার দিদিমার চিবুকের মতো। বেশ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সন্ধ্যার চিবুকও অনেকটা এই রকম।

সূর্যসুন্দরের চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা ক্যামেরা হাতে করিয়া স্বাতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে চিত্রার মতো ছবি আঁকিতে পারে না বটে, কিন্তু ক্যামেরার একটা ফটো তো তুলিতে পারে। চিত্রার কাছে সে হারিয়া যাইবে কেন। নিজের ক্যামেরাটা সে আনে নাই, কিন্তু সন্ধ্যার ক্যামেরা ছিল, সেইটাই সে লইয়া আসিয়াছে।

"দাদু, আমার দিকে একবার চাও তো লক্ষ্মীটি—"

ক্লিক্!

"বাস হয়ে গেছে—"

ইহার পর স্বাতী বক্রদৃষ্টিতে চিত্রার ছবির দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া রহিল ক্ষণকাল। তার পর সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "দাদু, চিত্রা তোমাকে ছবিতে একদম ছোকরা বানিয়ে দিচ্ছে।"

চিত্রা কোন উত্তর দিল না, তাহার চোখে মুখেও কোন হাসি ফুটিল না, সে যেমন তন্ময় হইয়া আঁকিতেছিল, তেমনি আঁকিতেই লাগিল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "একটি ছোকরার ছবিই তো ওর মনে আঁকা আছে। সেইটিই ওর হাত দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—আমি তো উপলক্ষ্য মাত্র।'

এইবার চিত্রার মুখে হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল তাহার বুকের ভিতর একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল যেন। বলিল, "পোট্রেটের সঙ্গে ফটোগ্রাফের আসল তফাতই তো ওইখানে। ক্যামেরা যন্ত্র, যা তার সামনে পড়বে তারই ছবি সে হুবহু তুলে নেবে, কিন্তু পোট্রেট আঁকে শিল্পী। সে যা দেখবে তারই হুবহু নকল করবে না, সে যার ছবি আঁকছে তাব আসল ব্যক্তিত্বটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। দাদু বাইরে বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু আসলে তো উনি তরুণ—"

"তরুণ নয়, বীর"—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এই কথা বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় প্রবেশ করিলেন। বাহিরের বারান্দার চৌকিতে কবিরাজ মহাশয় কখন আসিয়া বসিয়াছিলেন কেহ টের পায় নাই।

"এই মেমসাহেবকে দেখে ভয়ে আমি ঢুকতে পারি নি। বাইরে চুপ করে বসেছিলাম। তারপর ওঁর মুখে বাংলা কথা শুনে ভয় ভাঙলো, ভাবলাম আমাদের আপন লোকই হবে কেউ—"

স্বাতী হাসিয়া বলিল, "ও যে চিত্রা আমার বোন—"

"আরে তাই নাকি, চিনতে পারি নি। গুড্ মর্নিং ম্যাডাম্, ইওর আম্বল সার্ভেণ্ট—"বলিয়া ঝুঁকিয়া কর্নিশ করিলেন। চিত্রা আগাইয়া গিয়া প্রণাম করিল তাঁহাকে।

"আরে, আরে, এরা করে কি! আমি ছত্রি তোরা ব্রাহ্মণ—"

সূর্যসুন্দর হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন। কোন মন্তব্য করিলেন না। কবিরাজ মহাশয়ও জাতির প্রসঙ্গ আর তুলিলেন না। যে-কথাগুলি বলিতে বলিতে ঢুকিয়াছিলেন তাহাতেই ফিরিয়া গেলেন।

"তোমার দাদুকে তুমি তরুণ করে এঁকে ঠিক করেছ দিদি। দেখি কেমন হচ্ছে ছবিটা।"

কবিরাজ মহাশয় পিরানের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। তাহার পর ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"ঠিক হচ্ছে। চোখ-মুখের ভাবে তারুণ্য ফুটেছে বটে খানিকটা, তবে উনি সত্যি যে রকম তরুণ সেটা এখনও হয়নি। তোমরা আজকাল তরুণ কথাটাকে কেমন খেলো করে ফেলেছ। তরুণ বললেই যেন হাব-ভাব-মাখা, ন্যাকান্যাকা, ছিমছাম, রোগা-রোগা গোছের অপদার্থ একটা ছোঁড়ার ছবি মনে ভেসে ওঠে। তার মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আর আসল কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিতে হাসিতে দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন। স্বাতী এতক্ষণ মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, এইবার হাসিয়া লুটাইয়া

পড়িল। চিত্রার মুখেও হাসি ফুটিল, কিন্তু সে বেসামাল হইল না! কবিরাজ মহাশয়ের দিকে হাসিমাখা একটা দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, "আপনার মতে তাহলে তরুণ মানে কাটখোট্টা—"

"ঠিক কাটখোট্টা নয়, মজবুত, শক্ত-সমর্থ। শুধু দেহে নয়, মনেও। তোমার কর্তাটির মনের খবর তুমিই বলতে পার, কিন্তু বাইরে যতটুকু দেখলাম ভালোই লাগল। তারুণ্য মানে প্রবল পৌরুষের সুস্থ প্রকাশ। তোমার দাদুর একটা গল্প শুনবে? তখন ওর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে কেটেছে, তখন ঘোড়া চড়েই রুগীর বাড়ীতে যেতেন, সন্ধ্যাবেলা ফিরে গান-বাজনা সেরে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন, শুয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল শিবলাল ওঝার মেয়ের বিয়ে, দিন-তিনেক আগে হলুদমাখা সুপুরি পাঠিয়ে লোচন নাপিতের মারফৎ নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। আগে ওই রকম রেওয়াজ ছিল, ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের বদলে হলুদমাখা সুপারি পাঠানো হতো। মনে পড়বামাত্র উঠে পড়লেন বিছানা থেকে, শনিচরা সহিসকে ডেকে বললেন, ঘোড়া কস্। আমি সেদিন তোমাদের বাড়ীতে ছিলাম তোমার ঠাকুরমায়ের হাতের রান্না চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় সব রকম উদরস্থ করে কোণের ঘরটাতে শুয়ে ছিলাম কম্বল ঢাকা দিয়ে। তখন শীতকাল, মাঘ মাস। ঘোড়াটা চিঁহি করে ডেকে উঠল, ঘোড়াটার পিঠে জিন দিলেই সে চিঁহি করে ডেকে জানিয়ে দিত—I am ready. শব্দ শুনে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি ডাক্তারবাবু বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'রুগী দেখতে বেরুচ্ছেন নাকি এত রাত্রে?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'না আমি যাচ্ছি শিবলাল ওঝার বাড়ীতে। আজ তার মেয়ের বিয়ে। নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম। শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'এত রাত্রে দশ মাইল দূরে যাবেন নিমন্ত্রণ রাখতে! পাগল নাকি আপনি!' ডাক্তারবাবু বললেন, 'শিবলাল গরীব লোক। ভাববে আমি গরীব বলে এলেন না। বীরু আর পৃথ্বীশের পৈতের সময় এসে কত খেটেছিল? মনে নেই? সমানে লুচি ভেজেছিল বেচারা। আমাকে যেতেই হবে।' তবু আর একবার মানা করলাম, কিন্তু শুনলেন না তোমার দাদু। পরে শুনেছিলাম শিবলালের মেয়েকে উনি দশটি টাকা দিয়ে এসেছেন। সেকালের দশ টাকা এখনকার প্রায় একশ' টাকার সমান। শুধু তাই নয়, সেখানে পংক্তি-ভোজনে বসে পেট ভরে খেয়েছেনও। অথচ বাড়ীতে ভর-পেট খেয়েছিলেন তার একটু আগে। উনি মনে মনে এখনও তোমাদেরই বয়সী। শরীরটা একটু অপটু হয়ে গেছে—তা তো হবেই—বিরাশী বছর বয়স তো হলো—বাসাংসি জীর্ণানি—"

সূর্যসুন্দর হাসিমুখে সব শুনিতেছিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বাড়িয়ে বলছেন, কবিরাজ মশায়। আমাদের কথা বলে এখন লাভ কি, আমাদের তো যাবার সময় হয়ে এসেছে। এখন যা-কিছু প্রত্যাশা ওদের কাছে। ওদেরই স্তুতি করুন—"

"চণ্ডী তো রোজই পড়ি। চণ্ডী পড়া মানেই এঁদের স্তুতি করা। যা দেবী সর্বভূতেষু বলে কবি যা লিখেছেন তা এঁদেরই গুণগান। ঠিকই বলেছেন, আমাদের কাজ এখন এদের কাছে দু'হাত পেতে ভিক্ষা করা—মিলে মাইয়া এক মুঠোটি আনুধা লুলুহাকো—" বলিয়াই কবিরাজ মশাই মুখে হাত চাপিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার সামনের দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল, যে দুই-একটি ছিল তাহা পানের ছোপ

লাগিয়া প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। হাসিলে সেগুলি বাহির হইয়া পড়িত এবং বিশ্রী দেখাইত। তাই কবিরাজ মশাই মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতেন।

স্বাতী হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "এক মুঠোটি পেলে সন্তুষ্ট হবেন? সর্বস্ব দিয়েও তো আপনাদের মন পাওয়া শক্ত।"

বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। চিত্রাও ইজেল গুটাইতে লাগিল।

"ছবি আঁকা শেষ হয়ে গেল এর মধ্যে?"—কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন।

"না, এখনও হয়নি, পরে ফিনিশ করব।"

কিরণ চিন্তিত মুখে প্রবেশ করিল।

"চিত্রা, গঙ্গা এসেছে এখানে?"

"না।"

"তাকে দেখেছিস কোথাও?"

"না, কেন?"

"উনি সেই কোন্ ভোরে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছেন, এখনও ফিরলেন না। কিছু খেয়ে যান নি। দেখি, কুমারকে বলি গিয়ে, কুমারকেও তো দেখছি না।"

সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দিকে গেছে, বলে গেছে কিছু?"

"গেছে বিছুয়ার জঙ্গলে।"

"সে তো এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। কখন বেরিয়েছে?"

"খুব ভোরে। বোধহয় চারটের সময়।"

"তাহলে তো এত শিগ্‌গির ফিরতে পারবে না। হেঁটে গেছে?"

"বোধহয়। রামপ্রসাদের সঙ্গে গেছে।"

"আমাকে বললেই হতো, কুটির হাতীটা কসিয়ে দিতুম। নিখিলবাবুকে একবার বললেই হয়ে যেত। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ওখানে তিতির ভালো পাওয়া যায়।"

"সেই লোভেই তো গেছে। আপনাকে তিতিরের স্ট্যু খাওয়াবে, কিন্তু কিছু খেয়ে যায় নি যে। ওখানে কিছু খাবার পাঠানো যায় না?"

"তোর নিখিল কাকাকে বল গিয়ে। ঘোড়ায় চড়ে কেউ বিছুয়ার জঙ্গলে চলে যাক—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "নিখিলবাবু এখন ভোজের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত, খুবই ব্যস্ত। চার-পাঁচটা ঠাকুরকে নিয়ে পড়েছেন দেখলাম। উনি কি এখন এসব ব্যাপারে কান দেবেন?"

"দিতেই হবে"—বলিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "কিরণ নিখিলবাবুর খুব প্রিয়। দেখবেন ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "ভোজের আয়োজন খুব জোর হচ্ছে, না?"

"হবে না? আপনার নাতবৌয়ের সাধ। সেই লোভেই তো আমি থেকে গেলাম। আমেদাবাদে একটা রোগী ছিল মরুক গে ব্যাটা—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্যসুন্দরের হঠাৎ 'বউ'কে মনে পড়িল। রাজলক্ষ্মী এখন কোথা?

নিখিলবাবু সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলেন। হাতে কয়েকটি খাতা লইয়া ভোজের বিরাট আয়োজন করিতেছিলেন তিনি। খাতাগুলিতে ভোজের বিষয়ে নানাবিধ নোট করা ছিল। নিরামিষ এবং আমিষ উভয়বিধ খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে করিতে হইবে, অথচ একপ্রকার খাদ্যের সহিত আর একপ্রকার খাদ্যের ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত চলিবে না। নিখিলবাবু মাছ-মাংসের ব্যবস্থা একেবারে অন্য বাড়ীতে করিয়াছেন। মুষণ কশাই কয়েকটি খাসী লইয়া দেখাইতে আসিয়াছিল।

নিখিলবাবু বলিলেন, "আমার আড়াই মণ মাংস চাই।"

"এগারোটা জানবর হ্যয় হুজুর। হো যায়গা। দু-চার সের ইধর-উধর হো সক্‌তা হ্যয়।"

"দু-চার সের বেশী হলে ক্ষতি নেই কম যেন না হয়। তুমি না হয় আর একটা খাসি বেশী কাটো। এগুলো আমার কাছারিতে নিয়ে যাও। কাল ভোর তিনটের সময় এগুলো বানিয়ে দেবে। দশটার মধ্যে 'রেডি' চাই। দুনিয়ালাল, তুমি দেখ খাসিগুলো ভালো কিনা। আর মাছ-মাংস রাঁধবার বাসন তোমার মাইজীর কাছ থেকে চেয়ে নাও। হাতা, বড় বড় কড়াই, বড় বড় ডেকচি সব ওখানে জমা করা আছে। দশটা ডেক্‌চিতে মাংস রান্না হবে। এক একটা ডেক্‌চিতে দশ সেরের বেশী দিও না। সেই রকম ডেকচিই আনিয়েছি আমি ত্রিশটা। কড়াই চল্লিশটা আছে। মাছের কালিয়া হবে ওগুলোতে। তুমি তোমার মাইজির কাছে চিঠ্‌টা দিয়ে বাসনপত্র নেবে—"

"আচ্ছা—"

"আর যে বাসনগুলি নেবে সেগুলি কাজ হয়ে গেলে ধুয়ে মাজিয়ে আবার মাইজির কাছে ফেরত দিয়ে দেবে 'চিঠ্‌টা' মিলিয়ে। বুঝলে?"

"হাঁ—"

"এই ট্রেনে সাহেবগঞ্জ থেকে কিছু ঠাকুর আসবে। কলকাতা থেকেও আসবে বারোজন। তোমার যে ক'জন ঠাকুর দরকার নিয়ে নিও। কিন্তু আমিষ ডিপার্টমেণ্টের তুমি হবে 'হেড্‌'। রান্না যদি খারাপ হয়, তোমাকেই দায়ী করব আমি।"

"আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না হুজুর।"

দুনিয়ালাল নিখিলবাবুর পুরাতন ঠাকুর। নির্ভরযোগ্য। নিখিলবাবু দেখিলেন দুনিয়ালাল হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতেছে। দুনিয়ালাল মিথিলার লোক। বাংলা বলিতে পারে, বাংলা বোঝেও। সূর্যসুন্দরের বাড়ির সহিত তাহার অনেকদিনের সম্পর্ক। চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র সে। লম্বা সুঁটকো চেহারা। কপালে হলুদ রঙের চন্দনের ছাপ। তাহাকে হাত কচলাইতে দেখিয়া নিখিলবাবু ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাহার দিকে এক নজর চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কতটা গাঁজা চাই তোমার?"

"গোটা-দুই টাকা দিন হুজুর তাহলেই হয়ে যাবে।"

"দু' টাকার গাঁজা খাবে তুমি!"

"বাইরের যারা আসবে তাদেরও তো দু'একটা টান দিতে হবে হুজুর—"

"সবাই তোমার মতো গাঁজাখোর হবে তা তুমি জানলে কি করে?"

"সবাই হুজুর, সবাই। যারাই এসব ভোজ কাজে রান্না করে তারা সবাই একটু-আধটু 'ইস্‌টিম্‌' করে নেয়। না করলে এত খাটুনি বরখাস্ত করতে পারে না।"

নিখিলবাবু দেখিতে পাইলেন দুইটি গরুর গাড়ি বোঝাই লাউ-কুমড়ো আসিতেছে। তিনি দুনিয়ালালের হাতে দুইটি টাকা দিয়া সেইদিকে আগাইয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার সহিত তাঁহার দেখা হইল।

"গঙ্গা এদিকে শোন। কোথায় যাচ্ছ—?"

"বাইরের যারা এসেছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি—"

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, তিনি যে খড়ের ঘরগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন সেগুলি আগন্তুকের ভিড়ে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের অধিকাংশই দূরের গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, অধিকাংশই দরিদ্র চাষী মজুরের দল। ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এই সংবাদটুকু জানিবার জন্যই আসিয়াছিল তাহারা। এখানে আসিয়া যে খাইতে পাইবে এ-প্রত্যাশা ছিল না তাহাদের। কিন্তু সূর্যসুন্দর বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে যেন কিছু জলখাবার দেওয়া হয়। কুমার চিঁড়া ও গুড়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। গঙ্গার উপর ভার পড়িয়াছিল সে-সব বিতরণ করিবার।

নিখিলবাবু বলিলেন, "তুমি হাবুমামাকে ডেকে দিয়ে যাও—।"

নির্দিষ্ট কাজে বাধা পড়িলে গঙ্গা মনে মনে চটিয়া যায়, কিন্তু নিখিলবাবুর আদেশ অমান্য করা শক্ত।

হাবুমামা ভোরে উঠিয়াই পরীক্ষিৎকে সঙ্গে লইয়া পীর-পাহাড় ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং পীরপাহাড়ের কাছে সূর্যসুন্দরের যে বাগান ও জমি আছে সেগুলি কিভাবে জমিদারের চেষ্টায় (সূর্যসুন্দরের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও) আজ এমন চমৎকার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারই বিশদ বর্ণনা দিতেছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া একগ্লাস চা শেষ করিয়া তিনি ঠিক করিয়াছিলেন গঙ্গার তীরে যাইবেন। গঙ্গাতীরের সহিত তাঁহার কত স্মৃতিই জড়িত আছে। জাহাজঘাট বার বার একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া গিয়াছে, এক এক দল রেলোয়ে কর্মচারী আসিয়াছেন এবং চলিয়া গিয়াছেন। সে-যুগে সন্ধ্যাবেলা সকলেরই আড্ডা ছিল সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে—গান-বাজনা হইত, থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। বিশেষ করিয়া টালি ক্লার্ক মোহিনীকে তাহার মনে পড়িল। ভীতু লোক ছিল, কোনও কথা বলিবার আগে হইতেই ঠোঁট দুইটা নড়িতে আরম্ভ করিত, কিন্তু বাঁশি বাজাইত চমৎকার। মনে পড়িল খোনা ডাক্তারকে, তিনি ওই পুরাতন জাহাজঘাটের একটা পরিত্যক্ত ভাঙা রেলোয়ে কোয়ার্টারে থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রীও খোনা ছিল। তাহাকে আড়ালে সকলে খুনী বলিত।

"নিখিলবাবু আপনাকে ডাকছেন—"

হাবুমামা অবাক হইয়া গেলেন।

"আমাকে?"

"হ্যাঁ, আপনাকে।"

বলিয়াই গঙ্গা চলিয়া গেল। বাড়ীর পিছন দিকের রাস্তা দিয়া গেল, যাহাতে নিখিলবাবুর চোখে পড়িতে না হয়, পড়িলেই আবার একটা ফরমাস করিয়া বসিবেন,

লোকটির স্বভাবই ওই রকম। নিখিলবাবুর আদেশ অমান্য করা শক্ত। হাবুমামাকে উঠিতে হইল। নিখিলবাবুর সমীপবর্তী হইতেই নিখিলবাবু বলিলেন, "হাবুমামা, আপনাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। এই খাতা নিন, পেনসিল নিন, আর এই দশ টাকার সিকিও রাখুন। এই যে লাউ-কুমড়োগুলো এসেছে, আরও আসবে, তা কোথা থেকে আসছে, ক'টা আসছে, যে গাড়োয়ান এনেছে তার নাম কি, সব এই খাতায় টুকে রাখুন। আর প্রত্যেক গাড়োয়ানকে একটা করে সিকি দিয়ে দেবেন আর তাকে কখন ছুটি দিলেন সে-সময়টা টুকে রাখবেন। বাইরের ঘর থেকে টাইমপিসটা নিয়ে আসুন—।"

হাবুমামা বলিলেন, "ওরে বাবা, আপনি তো তাহলে আমাকে বন্দী করে ফেলবেন দেখছি। ভাবছিলুম একটু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াব—"

"বসে বসেই গায়ে ফুঁ দিন। ভিতরে উঠোনে কাঠের ঘরের পাশে যে লম্বা ঘরটি আছে তাতেই রাখান এগুলো। পরীক্ষিৎ কোথা ?"

"হাসপাতালে আছে বোধহয়।"

"তার উপর মাছের ভারটা দেব ভাবছি।"

নিখিলবাবু হাসপাতালের দিকে চলিয়া গেলেন। হাবুমামাও বার দুই জোরে জোরে নিশ্বাস টানিয়া লাউ-কুমড়ার গাড়িগুলোর দিকে অগ্রসর হইলেন।

সুবাতালী তহশিলদারের বাথান হইতে যথাসময়ে দুধ আসিয়া গিয়াছে। ঘড়িতে এলার্ম দিয়া নিখিলবাবু রামটহলকে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে কয়েকটি মাজা পিতলের হাঁড়ি লইয়া গরুর গাড়ি করিয়া রওনা হইয়া গিয়াছিল। ভোর পাঁচটায় দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুবাতালী তহশিলদারের দুই মণ দুধ পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পাঠাইয়াছেন তিন মণ। রামটহল বলিল তিনি এক মণ দইও পাঠাইবেন —গোয়ালাদের বলিয়া দিয়াছেন। রামটহল লোকটি জাতে গোয়ালা। কিন্তু সে বহুদিন হইতে জমিদারের কাছারিতে সিপাহীরূপে নিযুক্ত আছে, ত্রিপুরারি সিংহের আমল হইতে। ত্রিপুরারির তিন পুত্র—ধনুকধারী, রামধারী এবং তিলকধারীকে মানুষ করিয়াছে সে। রামটহলের বয়স অনেক, কিন্তু দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। মুখে সর্বদা একটা মৃদু মুচকি হাসি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে তৈলপক্ক বাঁশের লাঠি, পায়ে মহিষ-চর্মের জুতা, চলিলেই মস্মস্ আওয়াজ করে। যে-জুতায় আওয়াজ হয় না, সে-জুতা রামটহলের পছন্দ নয়। ধনুকধারী একবার তাহার জন্য একজোড়া জুতা কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু রামটহল সেটা পরে নাই। যে-জুতায় মস্মস্ আওয়াজ হয় না সে-জুতা পুরুষ মানুষে পরে নাকি! বাবুদের আজকাল মেয়েলী মনোবৃত্তি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া রামটহলের দুঃখ হয়। বড়া মালিক (ত্রিপুরারি সিংহ) মহিষের চামড়ার জুতা পরিতেন। তাঁহার বিশাল গোঁফে তেল মাখিতেন, মুখে মাখিতেন মহিষের দুধের সর, পালোয়ানদের সহিত কুস্তি করিতেন, ওস্তাদদের আসরে বিরাট তানপুরা লইয়া বড় বড় রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে পারিতেন। আর আজকালকার বাবুরা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়াছে, মুখে স্নো-পাউডার মাখে, নরম নরম জুতা-জামা পরে, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস খেলে আর গান-বাজনা শোনে গ্রামোফোনে বা রেডিওতে। রামটহলের নাকটি ঈষৎ বাঁকা। ত্রিপুরারি সিংহের আমলে পার্শ্ববর্তী জমিদারের সহিত বা বদমাস প্রজাদের সহিত

প্রায়ই খণ্ডযুদ্ধ হইত। তখন রামটহল একজন লাঠিয়াল যোদ্ধা ছিল। এইরূপ একটি যুদ্ধে রামটহলের নাকটি জখম হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

নিখিলবাবু বলিলেন, "রামটহল এই দুধের ভার তোমাকে নিতে হবে। এখনই একবার ফুটিয়ে রেখে নাও ঢাকা দিয়ে। বিকেলে আর একবার ফুটিও, তারপর রাত্রে আর একবার! কাল ভোরে এই দুধের পায়েস হবে।"

"সব ঠিক হো যায়গা হুজুর—"

"দুধ জ্বাল দেবে কে? লোক ঠিক করেছ?"

"বারোঠো গোয়ালা কড়াই লেকে আভি আওয়ে গা—"

"তোমার উপর এ ভার দিয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত তো?"

রামটহল কোন উত্তর দিল না। মৃদু-হাস্য-স্নিগ্ধ মুখটি তুলিয়া নিখিলবাবুর দিকে একবার চাহিল মাত্র। সত্যই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সে। নিখিলবাবুর দক্ষিণ হস্ত। বীরুবাবুর চাকর মুকুন্দ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "চমকলালবাবু এসেছেন। ওঝাজি কুলিও পাঠিয়েছেন অনেক। তাদের কি কাজে লাগাবেন জিগ্যেস করছে—"

"চল যাচ্ছি।"

মুকুন্দ আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল। খুচরা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতেই বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিখিলবাবুও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিলেন, রামটহল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শুনিয়ে—"

"কি?"

"কলকাত্তাসে মালিক লোগ কুছ ভেট ভেঁজে হ্যায় কি?"

"না, এখনও তো আসে নি কিছু। হয়তো আসবে।"

নিখিলবাবু চলিয়া গেলেন। ত্রিপুরারি সিংহের ছেলেরা যে এই উৎসবে কোন ভেট পাঠায় নাই ইহাতে যেন রামটহলেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। ত্রিপুরারি সিংহের তিন ছেলে এবং তিন মেয়ের জন্ম যে ডাক্তারবাবুর হাতেই একথা আর যেই ভুলুক রামটহল ভুলিবে না।

নিখিলবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন চমকলালবাবু একটি সুদৃশ্য 'টপ্‌পর' (শকটের উপরের ছাউনি) দেওয়া মহিষের গাড়িতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আরও অনেকগুলি লোকও আসিয়াছে। তাঁহার সন্ধ্যার সময় আসিবার কথা ছিল, কিন্তু আগেই আসিয়া পড়িয়াছেন।

"আমি এসে গেছি ম্যানেজারবাবু। মসলা কোথায় আছে বার করুন। আমি শিল লোঢ়ি (শিল-নোড়া) এনেছি কয়েকটা। এখানে ক'টা আছে?"

"কাল গোটা দশেক এসেছিল বোধহয়। দেখছি। এই রামনিবাস—"

রামনিবাস বাবাজী স্নান করিয়া রোদে পিঠ দিয়া আরামে বসিয়াছিল। নিখিলবাবুর ডাকে তাহাকে উঠিতে হইল।

"তুমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে খবর নাও তো, কাল ক'টা শিল-নোড়া এসেছে আমার কাছারি থেকে। যে ক'টা আছে বাইরে নিয়ে এসে চমকলালবাবুর জিম্মা করে দাও। আর ভোজের জন্য যা যা মসলা কেনা হয়েছে সেগুলোও বের করে দিতে বল। বড়-বৌমার ভাঁড়ারে আছে এসব—"

রামনিবাস বাবাজী অন্দর মহলের দিকে চলিয়া গেল। সে আসিয়াছিল কীর্তন করিবে বলিয়া, কিন্তু নিখিলবাবু তাহাকে এ কি কাজে লাগাইয়া দিলেন!

"আপনি ক'জন লোক এনেছেন চমকলালবাবু?"

"বারোজন।"

"ছ'জনকে পূব দিকের বারান্দায় বসিয়ে দিন আর ছ'জনকে পশ্চিম দিকের বারান্দায়। নিরামিষ আর আমিষ রান্না আলাদা আলাদা হবে। আমিষ রান্নার মসলা দুনিয়ালালকে পাঠিয়ে দিতে হবে আলাদা করে। নিরামিষ রান্না এ-বাড়ীতে হবে। সে-ব্যবস্থা আমি করেছি। আপনি মসলাগুলো বাটিয়ে ফেলুন—"

"জরুর।"

"ওরে বোধিয়া পূব দিকের বারান্দায় আর পশ্চিম দিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে দে। আরাম কুরসি। আপনার খইনি-টইনি সব ঠিক আছে তো?"

"সোব ঠিক আছে। ও নিয়ে আপনি কিছু ভাবিৎ হোবেন না।" চমকলাল সিং যদিও খাঁটি বিহারী, কিন্তু তিনি বাঙালীদের সহিত বাংলাতেই কথা বলেন। মাঝে মাঝে দু'একটা হিন্দী শব্দ মিশিয়া যায়। কখনও কখনও কোথাও বা অকারণে 'ওকার' বা 'হসন্ত'-ও দিয়া ফেলেন।

ওঝাজি কুড়ি জন কুলি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের সর্দার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কাম বাতা দিজিয়ে হুজুর।"

"কুঠিতে চারটে বড় বড় তিরপল আর দুটো বড় বড় শামিয়ানা আছে। সেগুলো নিয়ে এস। ওই মাঠটায় খাটাতে হবে। বাঁশ দড়ি কিছু এখানে আছে. কিছু বাজার থেকে আনতে হবে। ওগুলো খাটানো হয়ে গেলে বড় বড় শতরঞ্জি পাততে হবে শামিয়ানার নীচে। তার উপর চাদর আর তাকিয়া দিতে হবে। সে-সব পরে হবে এখন। চাদর তাকিয়া নবাবগঞ্জ থেকে আসবে। তোমরা আগে শামিয়ানা আর তিরপলগুলো টাঙিয়ে ফেল।"

রামনিবাস বাবাজী কয়েকটি চাকরের সহায়তায় শিল নোড়া মসলার ঝুড়ি প্রভৃতি ভিতর হইতে বাহিরে আনিতেছিল। মসলার ঝুড়িটা বেচারা নিজেই মাথায় করিয়াছিল। তাহার মুখ মেঘাচ্ছন্ন। সে একজন কীর্তন গায়ক গুরুজী, তাহাকে দিয়া নিখিলবাবু মসলার ঝুড়ি বহন করাইতেছেন! কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। প্রথমতঃ এটা ডাক্তারবাবুর বাড়ীর কাজ, দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং নিখিলবাবু আদেশ করিয়াছেন। সে ঠিক করিয়াছিল মসলার ঝুড়িটা নামাইয়া দিয়াই চলিয়া যাইবে এবং কীর্তন আরম্ভ করিয়া দিবে। একবার কীর্তন শুরু করিয়া দিলে নিখিল-বাবু সম্ভবতঃ আর তাহাকে উঠাইবেন না।

ঠিক এই সময় কিরণ ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। "কাকাবাবু, আমি একটা মুশকিলে পড়েছি। একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

"তুই আবার কি মুশকিলে পড়লি?"

কিরণের মুখের দিকে নিখিলবাবু হাসিমুখে চাহিলেন। দেখিলেন তাহার চোখ মুখ সত্যই চিন্তাচ্ছন্ন।

"উনি রাত চারটের সময় বিছুয়ার জঙ্গলে তিতির শিকার করতে গেছেন! বিচ্ছু

খেয়ে যান নি। অথচ এখনও পর্যন্ত তো ফেরবার নাম নেই। ওঁকে এখান থেকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন—"

কিরণের কণ্ঠে আবদারের সুর ফুটিয়া উঠিল। নিখিলবাবু যেন সেই বেণী-দোলানো কিশোরী কিরণকে দেখিতে পাইলেন। বরাবরই জেদী এবং আবদেরে। মনে পড়িল উহারই জেদে কুঠির বকুল গাছটায় দোলনা টাঙাইয়া দিতে হইয়াছিল। টাঙাইবার বহুরকম অসুবিধা ছিল, কিন্তু নাছোড়বান্দা কিরণের জেদে সে-সব অসুবিধা সত্ত্বেও দোলনা টাঙাইয়া দিয়াছিলেন তিনি। সেই দোলনায় দোদুল্যমান হাস্যমুখী কিরণের ছবিটাও ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল তাঁহার মনে। আর একটা ছবিও ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার নিজের মেয়ে সুরভির। কিরণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সে। বহুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। অত ভিড়ের মধ্যেও নিখিলবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

"ঘোড়ায় কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

কিরণ ভিতরে চলিয়া গেল। নিখিলবাবু মহাসমস্যায় পড়িলেন বিশ্বাসযোগ্য ঘোড়সোয়ার এখন কোথায় পাইবেন তিনি! ওঝাজির কুলিদের সর্দার এতোয়ারি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে তিনি ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তিরপল আর সামিয়ানা আনতে ক'জন গেল?"

"দশজন।"

"তুমিও যাও। আমাদের জিতু সহিসকে লাল ঘোড়াটা নিয়ে আসতে বল এক্ষুণি। ঘোড়াটা যেন কসে' নিয়ে আসে। তোমার বাকি লোকগুলোকে বল জল তুলুক। ওই যে সব ড্রামগুলো আছে, ওগুলো সব ভরিয়ে নাও। ভিতরে কয়েকটা বড় জালা আর কলসী আছে সেগুলোও ভরে ফেল। ওঝাজি ড্রাম পাঠাবেন বলেছিলেন তাঁর কি হলো?"

এতোয়ারী বলিল সেগুলোও আসিয়া পড়িবে। ওঝাজি সেগুলি মাজাইয়া এখনই পাঠাইয়া দিবেন।

"তুমি যাও। জিতুকে ঘোড়াটা নিয়ে এখুনি আসতে বল।"

এতোয়ারী চলিয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কিরণের সমস্যার সমাধান হইয়া গেল অন্য উপায়ে। সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সরফুদ্দিন তাহার পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির হইল। প্রতিবৎসর নূতন ঘোড়া কেনা তাহার শখ। এই বৎসর শোনপুরের মেলা হইতে ছাই-ছাই রঙের এই পাহাড়ী ঘোড়াটা কিনিয়া আনিয়াছে এবং সেটার পিঠে চড়িয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়ার পিঠ হইতে একলম্ফে নামিয়া সে ঘোড়াটাকে বাগানের বেড়াটায় বাঁধিয়া হাসিমুখে নিখিলবাবুর দিকে আগাইয়া আসিল।

"আদাব কাকাবাবু। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাবা বিকেলে আসবেন। আমাকে এখন কি করতে হবে বলুন।"

সরফুদ্দিন শৌখিন লোক। কানে আতরসিক্ত তুলা, মুখে জরদা-সুরভিত পান। সর্বাঙ্গ হইতে ভুরভুর করিয়া গন্ধ ছাড়িতেছে।

"তুমি এসে গেছ ভালোই হয়েছে। তুমি বিকেলে মহাদেব বারুইকে দিয়ে পান সাজাবে। কাল অন্তত দু'হাজার খিলি পান চাই। কিন্তু এখন তোমাকে আর একটা

কাজ দিচ্ছি। আমাদের বড় জামাই খুব ভোরে বিছুয়ার জঙ্গলে গেছে তিতির শিকার করতে। এখনও পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। কিছু খেয়ে যায় নি। তুমি একবার তার খবরটা নাও, কিরণ খুব ভাবছে।"

"এখুনি যাচ্ছি—"

সরফুদ্দিন তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

"একটু দাঁড়াও। কিরণ কিছু খাবার দিচ্ছে, সেটাও নিয়ে যাও।"

"ও, আচ্ছা।"

সরফুদ্দিন ফিরিয়া আসিল। কিরণ তাহারও সমবয়সী। ছেলেবেলায় প্রায় তাহার জন্য শিউতালাও হইতে পদ্মফুল আনিয়া দিত। এবার কিরণের সহিত তাহার কথাই হয় নাই। হঠাৎ মনে হইল, শুধু এবার কেন অনেকদিনই তাহার কিরণের সহিত কথা হয় নাই। উৎসুকনেত্রে সে সূর্যসুন্দরের মাধবী-লতায়-ছাওয়া গেটটার দিকে চাহিয়া রহিল। গোছা গোছা মাধবী ফুল ফুটিয়াছে। তাহার মনে হইল তাহার বাগানে এমন সুন্দর মাধবী ফুল তো হয় না। কুমার কি সার দেয় সেটা জানিয়া লইতে হইবে। তাহার একথা মনে হইল বটে, কিন্তু কুমারের নিকট এ-খবরটি তাহার জানিয়া লওয়া হইবে না, একটু পরেই সে ভুলিয়া যাইবে। অনেক জিনিসই সে অনেকের নিকট জানিয়া লইবে ভাবিয়াছে, কিন্তু একটাও জানিয়া লওয়া হয় নাই। একটু পরেই কিরণ বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। মাথায় ঘোমটা নাই।

"সরফু এসেছিস নাকি। কতক্ষণ এসেছিস? ওই ঘোড়া তোর, বাঃ চমৎকার।"

অবগুণ্ঠনমুক্ত কিরণকে দেখিয়া সরফু অবাক হইয়া গেল। তাহার মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল সে।

"ছেলেবেলায় তুই পাকা বুড়ি ছিলি, এবার দেখছি সত্যি সত্যি বুড়ি হয়ে গেছিস। মাথার চুলও পেকে গেছে।"

মাথার পাকা চুলের কেহ উল্লেখ করিলে কিরণ চটিয়া যায়। বলিল, "আহা তুমি যেন খোকা আছ। তোমারও তো জুলফির চুলে পাক ধরেছে। গোঁফ দাড়ি কামানো বলে বোঝা যাচ্ছে না, গোঁফ দাড়িও পেকেছে নিশ্চয়—"

।"

সরফুদ্দিনের হাসি আরও উচ্চগ্রামে উঠিল।

কিরণ নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "কাকাবাবু খাবার নিয়ে এসেছি, কাকে দিয়ে পাঠাব?"

"সরফুদ্দিন নিয়ে যাবে।"

"ও সরফু। তুই যাবি? আমারও ইচ্ছে হচ্ছে তোর পিছনে বসে চলে যাই, ছেলেবেলায় যেমন যেতাম—"

"আয় না।"

"ধ্যাৎ, এখন আর কি পারি। লোকে বলবে কি। এই নে, প্যাকেটের ভিতর লুচি আর ডিমের ওমলেট আছে। সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াবি। নানা ছুতোনাতায় না-খাওয়ার চেষ্টা করবে। কোনও ওজর শুনবি নে।"

"আচ্ছা—"

"তুইও একটু খেয়ে যা। সেজদা এমন চমৎকার সব খাবার এনেছে। মহীশূরি পাক, পেস্তার বরফি, নিয়ে আসি দাঁড়া—"

না-না করিবার পূর্বেই কিরণ বালিকার মতো চঞ্চল চরণে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া সরফুদ্দিন হাসিয়া বলিল, "দেখুন দিকি কাণ্ড। মুখের পানটা ফেলে দিতে হবে এখন—"

"দিতেই হবে। কিরণ ভয়ানক জিদ্দী—"

নিখিলবাবুর আবার সুরভিকে মনে পড়িল। সেও জিদ্দী ছিল খুব।

॥ ১৫ ॥

বাল্যবন্ধু সীতিয়াকে দেখিয়া আসিবার পর হইতেই সন্ধ্যার মাথায় মতলবটি গজাইয়াছে—এখানে গ্রামের মেয়েদের লইয়া একটি সভা করিতে হইবে এবং সেই সভায় স্থির করিতে হইবে কি করিয়া এই গ্রামে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করা যায়। এই জন্যই সে স্বাতী চিত্রা লীলা ইলাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। ঠিক হইয়াছে লীলা সেতারে বাজাইবে, ইলা গান গাহিবে। স্বাতী বক্তৃতা করিবে। স্বাতী প্রথমে রাজী হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার ধমক খাইয়া অবশেষে রাজী হইতে হইয়াছে। তবে সে বলিয়া দিয়াছে দু'এক মিনিটের বেশী বলিতে পারিবে না। এ-বিষয়ে সে কতটুকু বোঝে তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিবে মাত্র, বক্তৃতা করিতে পারিবে না। চিত্রা কি করিবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। তাহার সহিত এ-বিষয়ে ভালো করিয়া আলাপই হয় নাই। বাবার ছবি লইয়া সে ব্যস্ত ছিল। বাবার নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরও ছবিটা লইয়া তন্ময় হইয়াছিল সে খানিকক্ষণ। সন্ধ্যা তাহার কাছে আরও দুইবার লোক পাঠাইবার পর অবশেষে সে আসিয়া হাজির হইল।

"কেন ডাকছ পিসি ?"

"বাবার ছবি শেষ হলো ?"

"এত তাড়াতাড়ি কি হয়। কিছুতেই ঠিক মনোমত হচ্ছে না। তুমি দেখবে ? এসো না। কোথায় যেন একটু তফাৎ হয়ে যাচ্ছে ঠিক ধরতে পাচ্ছি না।"

সন্ধ্যাও বিবাহের পর কিছুদিন ছবি আঁকিয়াছিল, সুতরাং তাহার মতের মূল্য আছে।

"আমি একটু পরে গিয়ে দেখব এখন। এখন যে জন্য ডেকেছি শোন। এখানে আমরা যখন সবাই এসে গেছি তখন গ্রামের অন্য সব মেয়েদের ডেকে একটা সভার আয়োজন করব ভেবেছি। আমার ইচ্ছে এই উপলক্ষে এখানে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করা হোক। আজ বিকেলেই আমাদের আমবাগানে সভা হবে। স্বাতী বক্তৃতা করবে, লীলা সেতার বাজাবে, ইলা গান করবে। তুই কি করবি ?"

চিত্রা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"আমি ? আমি আবার কি করব ! বসে বসে দেখব আর শুনব সব।"

চিত্রা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"তুই তো আগে বেহালা বাজাতিস।"

"এখনও বাজাই। কিন্তু অসুখের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। বেহালা তো আনা হয় নি। দাদুর ছবি আঁকব বলে ছবি আঁকবার সরঞ্জামটা এনেছি খালি—"

"বেহালা এখানে পাওয়া যাবে। বিজলীর বাড়ীতে বেহালা আছে। সেটা এখনই আনিয়ে নিচ্ছি। তোকে বেহালাই বাজাতে হবে। ঠিকঠাক করে রাখ। পাংচুয়ালি চারটের সময় সভা আরম্ভ করব। সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছি বড়দি আর ছোটদিকে নিয়ে। ওরা কেউ কিছু করতে রাজী হচ্ছে না। তুই একবার বলে দেখ না।"

"চম্পাও সভায় যাবে নাকি?"

"ওকে বড়বৌদি যেতে দেবেন না। পোয়াতি মানুষ, ওকে নিয়ে টানাটানি করাও ঠিক হবে না। ও গেলে তো সভা জমে যেত, যা সুন্দর গীটার বাজায়।"

অপ্রত্যাশিতভাবে ঊষা আসিয়া হাজির হইল।

"আচ্ছা, ছোট, অসুখের বাড়ীতে তুই এ কি হুজুগ তুলেছিস বল তো। কাল বাড়ীতে কত লোক খাবে, কাকাবাবু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, আর তুই বাড়ীর তিনটে চাকরকে বাগান পরিষ্কার করতে পাঠিয়ে দিলি। বোধিয়া বাড়ীর সব শতরঞ্জি কম্বলগুলো নিয়ে চলে গেল। নিখিলকাকা ভয়ানক রাগারাগি করছেন।"

সন্ধ্যা আনতনয়নে সব শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর শান্তকণ্ঠে বলিল, "করুন। তুমি শুধু রেগ না।"

ঊষা সন্ধ্যার আনতনয়ন দেখিয়া এবং শান্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে জানে অত্যন্ত রাগিয়া গেলে সন্ধ্যার চক্ষু আনত হয়, কণ্ঠস্বর শান্ত হইয়া আসে। আরও বেশী রাগিলে একদম চুপ করিয়া যায় এবং উপবাস করিতে থাকে। সে বড় সাংঘাতিক পরিস্থিতি। একবার আরম্ভ হইলে তিন চার দিনের আগে কমে না। কোথাও শক্ত গেরো পড়িয়া গেলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। ঊষা আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "আমি রাগ করব কেন। আমি রাগি নি।"

"না রাগলে সভায় যেতে চাইছ না কেন।"

"আচ্ছা তুই পাগল না ক্ষ্যাপা। তিন-তিনটে ডাকাত ছেলে নিয়ে আমি হিমশিম খাচ্ছি। আমি সভায় যাই কি করে বল তো! এসব কথা মুখে আনিস কি করে তোরা? আর একটু হলে কি যে সর্বনাশ হয়ে যেত, দুই ভাই ওই বড় পেয়ারা গাছটার মগডালে উঠেছিল, জানিস? আর ওদের হুঁচিক লাগাচ্ছে ওই বুড়োধাড়ী, স্বাতী—"

"এক, দুই, তিন তো সভায় আবৃত্তি করবে। তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দাও আমি ওদের আটকে রাখছি।"

"ওদের দলে টেনেছ? ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি।"

ঊষা দুই হাত জোড় করিয়া সন্ধ্যাকে নমস্কার করিল। সন্ধ্যার গাম্ভীর্য কিন্তু তাহাতে এতটুকু বিচলিত হইল না।

"এতে আবার দলে টানাটানি কি! ওরা ভালো আবৃত্তি করতে পারে, ওদের আবৃত্তি করবার ইচ্ছেও খুব, আমাদের ঘরোয়া সভা হচ্ছে তাতে ওদের আবৃত্তি করতে দিলে দোষটা কি!"

ঊষা বিগলিত হইয়া গেল। কথার সুর বদলাইয়া গেল তাহার।

"সত্যিই ওরা ভালো আবৃত্তি করে। তিনটা আধো-আধো কথায় এমন সুন্দর বলে

যে কান জুড়িয়ে যায়। বেশ, তাহলে ওদের তোর কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই শিখিয়ে দিলে আরও ভালো করে পারবে—"

"সে যা করবার আমি করব। তুমি কি করবে বল। তুমি তো আগে গান গাইতে চমৎকার। সে গলা কি আছে এখনও? তোমার সেই 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটা সেই কবে শুনেছিলাম, এখনও যেন কানে বাজছে। মনে আছে গানটা—"

"মনে আছে। কিন্তু সভায় আমি গাইতে পারব না। ওঁর সামনে বড় লজ্জা করবে আমার—"

"জামাইবাবু তো সভায় থাকবেন না। কোনও পুরুষ-মানুষই থাকবে না। মেয়েরা আর ছোট ছেলেরা থাকবে।"

"তাই নাকি! গাঁয়ের মেয়েরা সব আসবে?"

"সীতিয়া বলেছে ডেকে আনবে অনেককে। প্রিয়গোপালের বাড়ীর মেয়েরা আসবে। আমাদের চাকরদের বাড়ীর মেয়েরাও আসবে। বর্ষাতিয়ার মায়ের খুব উৎসাহ। আর একজনকে খবর পাঠিয়েছি সে যদি আসে তাহলে তাকেই আমরা সভানেত্রী করব।"

"কে বল তো।"

"দাদার দুধ-মা। চামরুর বউ। সে বুড়ী এখনও বেঁচে আছে শুনলাম।"

"ওমা, তাই নাকি!"

উষার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া গেল। খুব খুশীও হইল সে মনে মনে।

"তার বয়স তো বাবার বয়সের কাছাকাছি। সে হেঁটে আসতে পারবে?"

"ছোটদা নিয়ে আসবে তাকে গাড়ি করে—"

"ছোটদা ওঁকে নিয়ে গেছে আমাদের পুকুরে, উনি সেখানে মাছ ধরবেন। ছিপটিপ নিয়ে চা খেয়ে সকালেই বেরিয়েছে ওরা—"

"জামাইবাবুকে পুকুরে বসিয়ে দিয়ে ছোটদা যাবে টোপরা। সেখানকার জলকর থেকে মাছ আনবার জন্য নিখিলকাকা পাঠিয়েছেন ওকে। গরুর গাড়ি চড়ে গেছে। টোপরাতেই চামরুর বউও থাকে আজকাল তার মেয়ের বাড়ীতে। চামরুর ছেলেটা মরে গেছে তো। বেচারী মেয়ের কাছেই থাকে এখন।"

"এত তত্ত্ব তুই জানলি কোত্থেকে।"

"ছোটদার কাছ থেকে। ছোটদাই নিয়ে আসবে চামরুর বউকে।"

"ওঁকে একলা পুকুর ঘাটে বসিয়ে রেখেছে নাকি ছোটদা তাহলেই হয়েছে। উনি যা ভীতু মানুষ, একা ওই তেপান্তর মাঠে বসে থাকতে পারবেন কি! শহরের লোক তো!"

উষার মনে ও মুখে নূতন আশঙ্কা ছায়াপাত করিল।

"জীবু শিবুকে ওঁর কাছে রেখে গেছে ছোটদা। একটা চাকরও কাছে থাকবে।"

"যাক্, বাঁচা গেল। আমি এক দুই তিনকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে।"

"তোমাকেও কিন্তু সেই গানটা গাইতে হবে।"

"তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। এ-বয়সে গানের গলা কি ওঠে কখনও।"

"যতটা ওঠে তাতেই হবে। এ তো ঘরোয়া ব্যাপার আমাদের। সবাই মিলে একটু আনন্দ করা।"

"দূৎ।"

একটু হাসিয়া উষা চলিয়া গেল। তাহার হাসি হইতে সন্ধ্যার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে উষা গান গাহিবে। মুখে যতই আপত্তি করুক, মনে মনে সে খুশীই হইয়াছে। উষার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া সন্ধ্যা মুখ টিপিয়া হাসিল একটু। তাহার পর সে উঠিয়া পড়িল। কিরণকে আর একবার বলিতে হইবে। বৌদিদিরা ব্যাপারটা এখনও জানেই না। অর্থাৎ তিনটি দুরারোহ পর্বত লঙ্ঘন করিতে হইবে এখনও। আর বসিয়া থাকা চলে না। বাবাকেও বলিতে হইবে।

সন্ধ্যা উঠিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল ঠিকঠাক করিয়া লইল। তাহার পর পরিপাটি করিয়া নিজের-হাতে-বোনা উলের বেঁটে র‍্যাপারটি (স্কার্ফ) নিপুণভাবে গায়ে জড়াইয়া ভেলভেটের চটিটি পায়ে দিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল চটিতে ধুলা লাগিয়াছে। সামান্য ধুলা নিজেই অনায়াসে ঝাড়িয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা করিল না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল—"ভুটুয়া—"

"—জি।"

একটি ক্ষুদ্র বালক দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিল। ন্যাড়া মাথায় প্রকাণ্ড টিকি, পরিধানে ছেঁড়া হাফ প্যাণ্ট এবং তাহার উপর বেমানান লাল রঙের হাঁটু পর্যন্ত একটা কামিজ। কামিজটি সন্ধ্যাই কিনিয়া দিয়াছে। বোধিয়ার ভাগনে। কুমার ইহাকে সন্ধ্যার ফাইফরমাশ খাটিবার কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। অন্য সময়ে সে মাঠে গরু চরায়, অর্থাৎ গরু চরাইবার নামে খেলা করিয়া বেড়ায়। ফাইফরমাস খাটা তাহার অভ্যাস নাই।

"ভুটুয়া আমার জুতো ঝাড়িস নি আজ? ঝেড়ে দে—" সন্ধ্যা একটা ময়লা রুমাল তাহার দিকে ছুড়িয়া দিল। ভুটুয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, চোখ ছোট করিয়া, মুখ সূচালো করিয়া এমনভাবে সেটা ঝাড়িতে লাগিল যেন তাহাকে কোনও দুরূহ কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চটি ঝাড়া হইয়া গেলে চটিটি পায়ে দিয়া সন্ধ্যা আয়নায় আর একবার নিজের মুখটি দেখিল। কানের পাশে দুই একটি চুল স্থানচ্যুত হইয়াছিল, সেটি ঠিক করিয়া দিল। তাহার পর লজেন্সের কৌটা হইতে লজেন্স্ বাহির করিয়া একটি নিজের মুখে পুরিল আর একটি ভুটুয়াকে দিল। বাহির হইতে যাইবে এমন সময় রঙ্গনাথ দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন।

"একটা কথা ছিল—"

"কি"—মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল।

"ছোটবাবু বেরুবার আগে একটা নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সে-সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।"

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "এমন থিয়েটারি ঢং-এ কথা বলছ যে হঠাৎ! কি বক্তব্য?"

"ছোটবাবু বলে গেছেন আমি গিয়ে তোমাদের সভার জন্যে শতরঞ্জি কম্বল চেয়ার টেবিল চৌকি যেন বাগানে গিয়ে সাজিয়ে দিই। জিনিসগুলো ওখানে চলে গেছে, আমি গিয়ে সাজাব কি?"

"সাজাও না, ভালোই তো।"

"তুমি গিয়ে আবার সব ওলটপালট করে ফেলবে না তো। পরে আর চাকর পাওয়া যাবে না, নিখিলবাবু বলেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে চাকরগুলোকে ফেরত পাঠাতে হবে। অর্থাৎ বার বার ওলটপালট করবার সুযোগ আমরা পাব না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমিও চল না আমার সঙ্গে, যেমন বলবে তেমনি করা যাবে। যার কর্ম তারে সাজে—"

সন্ধ্যা হাসিয়া ফেলিল।

"চল যাচ্ছি। বড়দি আর বৌদিদের বলা হয় নি এখনও। ওদের নিয়ে যেতে হবে সভায়। চল না, তুমিও বলবে একটু। তুমি জামাই, তোমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

"সেই জন্যেই তো আমার চুপ করে থাকা উচিত।"

"বেশ, চুপ করেই থেকো তাহলে—"

রাগের ভান করিয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল। রঙ্গনাথও অনুসরণ করিলেন।

উঠানের এক প্রান্তে বড় ইঁদারাটার কাছে যে পাকা চৌতারাটা আছে তাহার উপর চন্দ্রসুন্দর এক দুই তিনকে তেল মাখাইতেছিলেন। বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে থাকিলে তাহাদের তেল মাখানো এবং তাহাদের সহিত একসঙ্গে স্নান করা চন্দ্রসুন্দরের চিরকালের অভ্যাস এবং বিলাস। ইহাতে তিনি বড় আনন্দ পান। তাঁহার মাস্টারি জীবনের প্রারম্ভে যখন তিনি সূর্যসুন্দরের কাছে থাকিয়া এখানকার মাইনর স্কুলটি স্থাপন করিয়া ছিলেন তখনও তিনি স্নানের আগে দাদার ছেলে-মেয়েদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইতেন। বীরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কিরণ, সন্ধ্যা, কুমার সকলেই তাঁহার হাতে তেল মাখিয়া তাঁহার সহিত স্নান করিয়াছে। প্রত্যেকের মাথাতেই 'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলিয়া তিনি জল ঢালিয়াছেন। শিশুদের মাথায় জল ঢালিলে তাহারা ছটফট করিতে থাকে, হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া অসহায়ের মতো চীৎকার করিয়া ওঠে, এ-দৃশ্যটা চন্দ্রসুন্দর বড়ই উপভোগ করেন। শিশুদের সঙ্গই উপভোগ্য তাঁহার নিকট। আজ ঊষার ছেলে তিনটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। দুই-এর পিঠে তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিতেছিলেন—'দুই বাবু বসি বসি তেল মাখে ঘষি ঘষি'। তেল মাখাইতে মাখাইতে মুখে মুখে বড় বড় ছড়াও তিনি বানাইয়া ফেলেন। ছড়াগুলির কাঠামোটা অবশ্য করাই থাকে, নামটা কেবল বদলাইতে হয়। সন্ধ্যা কাকাবাবুর দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। তাহার মনে পড়িল কাকাবাবু তাহাকেও এই ছড়া বলিয়া স্নান করাইতেন —'সন্ধ্যামণি বসি বসি তেল মাখে ঘষি ঘষি'। আরও দুই একটা ছড়াও তাহার মনে পড়িল—'সন্ধ্যামণির চুলে জট, তাই করছে ছটফট', 'কুমারবাবু লক্ষ্মীমুনি, সন্ধ্যারানী ছিঁচকাঁদুনি'। বড় ভালো লাগিল সন্ধ্যার। সে আগাইয়া গিয়া বলিল, "এইবার কাকাবাবু ঠিক নিজের কাজ পেয়ে গেছেন। আর একটা কাজও করতে হবে আপনাকে। এক দুই তিনকে রেসিটেশন দেখিয়ে দিতে হবে একটু। আপনি আমাদের রেসিটেশন বরাবর ঠিক করে দিয়েছেন, এইবার ওদের দিন।"

চন্দ্রসুন্দর সভার খবর জানিতেন না। একটু বিস্মিত হইলেন।

"হঠাৎ এখন রেসিটেশন ?"

"আমাদের মেয়েদের একটা সভা হচ্ছে বাগানে। সেখানে ওরা আবৃত্তি করবে। কবিতা ওদের মুখস্থ আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছাতা বলে ধিক ধিক মাথা মহাশয়'। আপনি একটু ঠিক করে দিন।"

চন্দ্রসুন্দর উৎসাহিত হইলেন।

"বাঃ, সভার কথা আমাকে কিছু বলিস নি তো।"

"এ শুধু মেয়েদের সভা যে। কোনও পুরুষ থাকবে না সে-সভায়।"

একটু দমিয়া গেলেন চন্দ্রসুন্দর। যে-জিনিসটা তিনি পছন্দ করেন না— (বিদেশী ছাঁচে ফেলা স্ত্রীস্বাধীনতা ও অতিআধুনিকতা)—ইহার মধ্যে যেন তাহারই আভাস পাইলেন তিনি। কিন্তু খুব একটা তীব্র প্রতিবাদ করিলেন না। কেবল হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা দিন দিন যে কি হচ্ছ মা, কোন্ পথে যে পা বাড়াচ্ছ তা তোমরাই জান!" চন্দ্রসুন্দরের মনে পড়িল বউ (সন্ধ্যার মা) যখন নববধূ তখন সে একদিন মামার বাড়ীর ছাতের আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া একটা বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল বলিয়া বাড়ীতে কি কাণ্ডই না হইয়াছিল। আর আজ ইহারা মাঠে সভা করিতেছে! কালের প্রভাব দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু তিনি ইহাও বুঝিয়াছেন প্রতিবাদ করিয়াও লাভ নাই, কালই বেশী বলীয়ান। ভালো হোক, মন্দ হোক পরিবর্তনই নিয়ম, তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে।

কাকাবাবুর কথার সুর শুনিয়া সন্ধ্যা সরিয়া পড়িল।

কিরণ বারান্দায় বসিয়া ফলের রস করিতেছিল। তাহার মুখের মেঘাচ্ছন্নভাবটা তখনও কাটে নাই। নিজেকে নিতান্তই দুর্ভাগিনী মনে হইতেছিল তাহার। স্বামী চিরকাল নিজের খেয়ালেই মত্ত, তাহার দুর্বার শিকার প্রবৃত্তিকে সে এতদিন এত চেষ্টা করিয়াও দমন করিতে পারিল না। আর একমাত্র ছেলেটি তো মিলিটারিতে। কখনও ছুটি পায় না। কতদিন যে বাড়ী আসে নাই। সে আশা করিয়াছিল এই অসুখের উপলক্ষ করিয়া হয়তো আসিবে। কিন্তু কই।

"বড়দি আজ বিকেলে আমাদের সভার কথা মনে আছে তো?"

কিরণ ঘাড় হেঁট করিয়া ফলের রস ছাঁকিতেছিল।

বলিল, "আমার ওসব কিছু ভালো লাগছে না এখন।"

"এতে ভালো না লাগবার কি আছে?"

"উনি সেই কোন্ ভোরে শিকারে বেরিয়েছেন। না ফেরা পর্যন্ত কিছু ভালো লাগছে না আমার।"

"জামাইবাবু সময় হলেই ফিরে আসবেন। ক'টার সময় বেরিয়েছেন?"

"ভোর চারটের সময়। আর বিছুয়ার জঙ্গল কি এখানে! শুনলাম চার ক্রোশ দূরে।"

"তাহলে এর মধ্যে ফিরবেন কি করে! হেঁটে গেছেন তো।"

"হ্যাঁ।"

"যেতে আসতেই তো চার পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। তারপর শিকার করতেও অন্তত দু'তিন ঘণ্টা। তারপর বিশ্রাম করবেন একটু নিশ্চয়। দুটো-তিনটের আগে ফিরতেই পারেন না। এখন তো এগারোটাও বাজেনি।"

সন্ধ্যা নিজের হাতঘড়িটা আর একবার দেখিল।

"অসুখের বাড়ীতে গেরস্তকে এরকম উদ্ব্যস্ত করলে কি রকম লাগে বল দিকি।"

"সবাই মুখ গোমড়া করে বসে থেকেই বা কি লাভ হবে। বাবা তো অনেকটা

ভালো আছেন। সেইজন্যই তো এই সভা করছি, সবাই মিলে একটু আনন্দ করা যাক—"

"তোমার সভায় হবে কি ?"

"হবে আবার কি ! সবাই বসে একটু আনন্দ করা যাবে। গ্রামের অনেক মেয়েরাও আসবে। স্বাতী বক্তৃতা করবে, চিত্রা বেহালা বাজাবে। লীলা সেতার বাজাবে, ইলা গান করবে। এক দুই তিন আবৃত্তি করবে। ছোটদিও গান করবে বলেছে। তোমাকেও একটা কিছু করতে হবে। চামরুর বউ যদি না আসে তাহলে তোমাকে 'প্রিজাইড' করতে হবে।"

কিরণ যদিও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিল কিন্তু মনে মনে সে ইহাই যেন প্রত্যাশা করিতেছিল। কোন সভায় 'প্রিজাইড' করা যে একটা গৌরবের বিষয় তাহা সে জানে। দেরাদুনে একটা সভায় একবার মিলিটারি সাহেব সভাপতিত্ব করেন। কৃষ্ণকান্তের সহকারি গিয়ান সিংয়ের মেয়ে নির্মলা তাঁহার গলায় গেঁদা ফুলের প্রকাণ্ড মালা পরাইয়া দিয়াছিল। বহুদিন আগেকার এই চিত্রটি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। বড়দিদি বলিয়া খাতির করিয়া তাহাকে এ-সম্মানটা দিয়াছে, এজন্য সন্ধ্যার উপর মনে মনে প্রসন্ন হইল সে।

"চামরুর বউ কি আসতে পারবে ? কুমার বলছিল খুব বুড়ো হয়ে গেছে। চোখেও না কি ভালো দেখতে পায় না। যাই হোক সে যদি আসে তাকেই প্রিজাইড করতে বলিস।"

"তাতো বলবই। কিন্তু সে শুধু চেয়ারেই বসে থাকবে। প্রিজাইড তোমাকেই করতে হবে।"

"বাবাকে বলেছিস ?"

"বলতে যাচ্ছি। বউদিদিদেরও এখনও বলা হয় নি। ভাবছি, ছোটবউদি যাবে কি করে ? বাবার কাছে তাহলে থাকবে কে। গঙ্গাকে পাওয়া যাবে কি ? নিখিলকাকা তো সবাইকে বাইরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।"

কিরণ বলল, "বাবাকে একা ফেলে সবাইয়ের যাওয়া চলবে না।"

কিরণ সন্ধ্যা দুইজনেই সূর্যসুন্দরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। গিয়া দেখিল চম্পা একটি সুদৃশ্য চিরুনি দিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে। কিরণের হাতে ফলের রস দেখিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "এখুনি চম্পা আমাকে ওভালটিন খাইয়েছে—"

"এটুকুও খেয়ে নাও। যা শুকনো লেবুগুলো, আধ কাপের মতও হয় নি। ফিডিং কাপটা দাও তো ওদিক থেকে—"

"না, ফিডিং কাপের দরকার নেই। ওটা দেখলেই মনে হয় আমি রুগী। এমনি খেতে পারব, দাও।"

সূর্যসুন্দর বাঁ হাত দিয়া কাপটি ধরিয়া এক চুমুকে সবটা শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"সন্ধ্যা কি হুজুগটি তুলেছে শুনেছ তো।"

"শুনেছি। নিখিলবাবু এসেছিলেন এখুনি। চাকরেরা বাগানে চলে গেছে বলে রাগারাগি করছিলেন।"

সন্ধ্যার আত্মসম্মান ইহাতে আহত হইল। বলিল, "এতে রাগারাগি কেন। আমি না হয় কয়েকটা মজুর আনিয়ে নিচ্ছি।"

"মজুর একটাও পাবি না। নিখিলবাবু সবাইকে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছোট গ্রাম তো ক'টাই বা মজুর আছে এখানে।"

এই কথায় সন্ধ্যার মনে যেন একটা নূতন আলোকপাত হইল। এখানে ইচ্ছা করিলে একজনই তাহা হইলে সমস্ত মজুরদের দখল করিতে পারে পয়সার জোরে। ইহা তো অন্যায়।

"গ্রামের সব মজুরদের নিয়ে নিয়েছেন কাকাবাবু? এখানে কত করে মজুরি আজকাল?"

"তা ঠিক জানি না। তবে আমার এখানে মজুরির লোভে কেউ আসে নি, নিজেরাই এসেছে। জমিদাররা কিছু পাঠিয়েছেন, ওঝাজি বোধহয় কিছু পাঠিয়েছেন, বাকী সব নিজেরা এসেছে।"

এসব খবর সন্ধ্যারও অবিদিত নয়। কিন্তু সে অনেকদিন শহরে আছে, গ্রামের সঙ্গে অন্তরের সংপর্ক অনেকদিন ছিন্ন হইয়াছে তাই সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে এখানকার মজুররা অর্থকেই সব সময় পরমার্থ মনে করে না। সূর্যসুন্দরের কথা শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল, আনন্দিতও হইল। ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের পায়ে তেল মালিশ করিতেছিল। বাড়ীতে যদিও অনেক লোকজন আসিয়াছে কিন্তু সূর্যসুন্দরের বিছানায় সে-ই দিবারাত্রি থাকে। রাত্রে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে শুইয়া খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লয়। তখন গঙ্গা অথবা কুমার জাগিয়া বসিয়া থাকে। পুরসুন্দরী এবং জগন্ময়ী প্রবেশ করিলেন। জগন্ময়ীর হাতে একটি থালায় কিছু মিষ্টান্ন।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "বাবা, সেজবউ অনেক রকম মিষ্টান্ন এনেছে। একটু একটু চেখে দেখবেন নাকি?"

"এখন থাক। খাবার সময় দিও। মাছ এসেছে আজ?"

"নিখিলকাকা সকালেই দুটো বড় বড় রুই মাছ পাঠিয়ে দিয়েছেন। গোবিন মহলদার একটা বড় চিতল মাছও দিয়ে গেছে।"

"বাঃ! আমাদের বাগানে সন্ধ্যা কি একটা সভা করছে। তোমরা যাবে না?"

সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, "যাবেন বই কি! সব্বাইকে যেতে হবে।"

পুরসুন্দরী সভার কথা শোনেন নাই।

"কিসের সভা?"

সন্ধ্যা এবং কিরণ দুইজনে মিলিয়া ব্যাপারটা বিবৃত করিল। কিরণ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সমস্ত শুনিয়া পুরসুন্দরী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এতও তোর মাথায় আসে!"

তাহার পর বলিলেন, "আমরা সবাই যাব কি করে? বাবার কাছে কে থাকবে তাহলে। ঊর্মিলা সভায় যাক, ও তো বাবার বিছানা ছেড়ে ওঠে না একবারও। ওই যাক, আমি কাছে থাকব।"

জগন্ময়ী মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কোনও মন্তব্য করিলেন না। দিদি (পুরসুন্দরী) যাহা বলিবেন তাহাই তিনি নির্বিচারে পালন করিবেন। তাঁহার নিজস্ব কোন মতামত নাই। পুরসুন্দরী, জগন্ময়ী, কিরণ এবং সন্ধ্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া ছিলেন। সন্ধ্যাকে সঙ্গে লইয়া বাগানে যাইবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুরসুন্দরী তাহার

দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"সন্ধ্যা বাগানে সভা করছে। তোমাদের একেবারে বাদ দিয়েছে। সভায় খালি মেয়েরা থাকবে।"

"আমাদের একেবারে বাদ দেয় নি। শতরঞ্জি কম্বল চেয়ার টেবিল পাতবার জন্যে আমাদের ডাক পড়েছে। এটাও আমাদের প্রতি কম অনুগ্রহ নয়।"

সন্ধ্যা সকলের পিছনে ছিল। রঙ্গনাথের দিকে সে সহাস্য কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

॥ ১৬ ॥

চন্দ্রসুন্দর স্নান শেষ করিয়া জীবু শিবুকে লইয়া পড়িয়াছিলেন।

"তোরা পায়জামা পরে ঘুরছিস কেন! কাপড় পর।"

শিবু লজ্জিত হইল। সে নিজেই অনুভব করিতেছিল যে ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু হইতেছে! কিন্তু কি করিবে, কাপড় পরা তাহাদের অভ্যাসই নাই। যেখানে তাহারা থাকে সেখানে কাপড় পরার রেওয়াজই নাই। সকলে পায়জামাই পরে সব সময়ে।

জীবু বলিল, "ওখানে আমরা কাপড় পরিই না।"

চন্দ্রসুন্দর অবাক হইলেন।

"সে কি রে! বাঙালীর ছেলে কাপড় পরিস না!"

শিবু সজল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমরা কাপড় পরতেও পারি না ভালো করে। অভ্যাস নেই তো—"

"তা বললে চলবে না তো দাদু। বাঙালীর ছেলে, কাপর-পরা শিখতে হবে বইকি। পায়জামা পরেই বিয়ে করতে যাবি নাকি। আয় আমি তোদের কাপড়-পরা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোদের বাবা-কাকাদেরও শিখিয়েছিলাম। কাপড়-পরা সোজা কাজ নয়। ওর একটা হিসেব আছে। আলনা থেকে ওই কাপড়টা পাড়—"

জীবু একটা কাপড় পাড়িয়া পরিতে লাগিল।

"না না, ও ঠিক হচ্ছে না। দেখিয়ে দি আয়। কাছার যেটা উপরের খুঁট সেটা জাস্ট মাটি ছুঁয়ে থাকবে। বেশী বড় হয়ে গেলে কাছা ঢিলে হয়ে যাবে, বেশী ছোট হলে আঁট হবে। দুটো ব্যাপারই অস্বস্তিকর। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে—"

তাহার পর কোঁচাটা কি করিয়া করিতে হয় দেখাইয়া দিলেন।

"কাপড়ের বহর যদি বেশী হয় কোঁচা ধুলোয় লুটোবে। সেটাকে এইভাবে সামলাতে হয়।"

নিজের হাতে কোঁচাটা তুলিয়া গুঁজিয়া দিলেন।

"কোঁচা দিয়ে মালকোঁচাও করা যায়। কোঁচা খুলে কোমরে বেল্টের মতোও বাঁধা যায়। কাপড়ের কসি বেশ গুঁজে নাও। তা না হলে কাপড় ফস্ করে খুলে যাবে।"

কসিটাও নিজের হাতে ঠিক করিয়া দিলেন।

"গায়ত্রী মনে আছে?"

দুইজনেই বলিল, "আছে—"

দুইজনেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করিয়া তাহা আবৃত্তিও করিল।

"বাঃ—"

চন্দ্রসুন্দর মনে মনে কিন্তু একটু হতাশ হইলেন। গায়ত্রী তাহাদের মনে না থাকিলে তিনি ঘটা করিয়া তাহা তাহাদের মুখস্থ করাইতেন।

॥ ১৭ ॥

মাছ আনিবার জন্য কুমার হীরু হালদারের বিরাট জলকর মোতি বিলে গিয়াছিল। হীরুর ঠাকুরদা মোতি মহলদার যখন এই বিলটির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়াছিলেন তখন ইহার নাম ছিল টিকরি বিল। মোতির মৃত্যুর পর মোতির পুত্র ঘিসু ইহার নাম বদলাইয়া পিতার নামে নামকরণ করিয়াছিল। সূর্যসুন্দর ঘিসু হালদারের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সুতরাং তাহার বাড়ীর সব কাজে মোতি বিল হইতে মৎস্য সরবরাহ হইত। নিখিলবাবু তিন দিন পূর্বে হীরু মহলদারের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। নির্দেশ দিয়াছিলেন কুমার গেলে তবে যেন মাছ ধরানো শুরু করা হয়। জীবন্ত টাটকা মাছ চাই।

বিলের ধারে একটি খড়ের ঘর। সেখানে আরাম করিয়া বসিবার এবং শুইবার ব্যবস্থা আছে। হীরু শৌখিন লোক। কোন ত্রুটি রাখে নাই। খাট, টেবিল, চেয়ার, আরাম-চেয়ার, ফুলদানি, আয়না, সব এখানে আছে। হীরু কুমারের সহপাঠী বলিয়া এখানে কুমারের খাতির আরও বেশী। অর্থাৎ হীরু এমন ভাব দেখায় যেন এই জলকর এবং তাহার আশেপাশের বাগান জমি প্রভৃতির আসল মালিক কুমারই। সে যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

…জাল ফেলা হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে টানা হইতেছে। হীরু নাই, একটা জরুরী দরকারে সে পূর্ণিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাইবার পূর্বে কুমারের জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে সে। চায়ের সব ব্যবস্থা আছে। চা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য আলাদা একটা চাকরও আছে। একটি দুগ্ধবতী গাভীও রাখিয়া গিয়াছে সে যাহাতে টাটকা দুধ দিয়া কুমার চা খাইতে পারে।

কুমার আটটার পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার একবার চা খাওয়া হইয়া গিয়াছে। একজন জেলে বলিল মাছ উঠিতে এখনও বেশ বিলম্ব আছে। আরও ঘণ্টা দুই লাগিবে অন্ততঃ। কুমার ইহা অনুমান করিয়াছিল। তাই সূর্যসুন্দরের ডায়েরি-খানা সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। সে জলকরটার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। জল-করের চারিদিকে লম্বা লম্বা বাঁশ পোতা। প্রত্যেকটি বাঁশের উপর একটি করিয়া পাখি বসিয়া আছে। চিল কাক তো আছেই, নীলকণ্ঠ ফিঙেও আছে। সহসা কুমার দেখিতে পাইল একটি 'খোক্‌না'ও উড়িতেছে। খোক্‌না, চিলজাতীয় একরকম শিকারী পাখি। বাংলা নাম কোড়ল। অত্যন্ত চতুর এবং ক্ষিপ্র। ছোঁ মারিয়া বড় বড় মাছকে নখে ঝুলাইয়া লইয়া নিমেষে সরিয়া পড়ে। অনেক সময় পক্ষী শিকারীদের ইহারা অনুসরণ করে। বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া যদি কোন পাখি দূরে বা জলে পড়িয়া যায় তাহা হইলে শিকারী সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই খোক্‌না সেখানে পৌঁছিয়া যায়।

কুমার প্রায়ই শিকারে বাহির হয়, এই ডাকাত পাখিটার পরিচয় তাহার ভালো করিয়াই জানা আছে। কুমার উৎসুক নয়নে খোক্‌নাটাকে দেখিতেছিল। বেশ বলিষ্ঠ পাখি, বলিষ্ঠ নয়, বলিষ্ঠ ঠোঁট। যদি একটা মাচ ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লয় দেখিবার মতো দৃশ্য হইবে একটা। গোটা দুই খোক্‌না ছিল। একটা বাঁশের উপর বসিয়াছিল, আর একটা আকাশে 'চক্কোর' দিতেছিল। কুমার অনেকক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল। যদিও দুই-একটা মাছ লাফাইয়া উঠিতেছিল কিন্তু সেগুলির প্রতি খোক্‌নাদের তাদৃশ মনোযোগ দেখা গেল না। তখন সে চাকরটাকে আর এক কাপ চা করিতে বলিয়া ডায়েরীতে মন দিল।

"শঙ্করা হইতে ফিরিয়াই আমাকে পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হইল। জেলা হইতে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টার আসিয়া এ পরীক্ষা লইতেন। দিদিমার ভয় ছিল আমি পাশ করিতে পারিব কি না। তাঁহার পরিচিত যতগুলি ঠাকুরদেবতা ছিলেন সকলেরই নিকট তিনি সওয়া পাঁচ আনার পূজা মানত করিলেন। পরীক্ষা দিতে যাইবার পূর্বে মামা, মামীমা, দিদিমাকে তো প্রমাণ করিলামই, নিত্য দিদিকেও করিলাম। সে তো হাসিয়াই আকুল। দিদিমা আমার মাথায় দেবতার নির্মাল্য দিয়া সজল কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, 'কিচ্ছু ভয় নেই, মা মঙ্গলচণ্ডী সব ঠিক করে দেবেন। যাবার আগে তোমার বাবাকে প্রণাম করে যেও।'

আমি যখন বাবার বাসায় গেলাম তখন তিনি তাঁহার হরিণ-শিশুটিকে কোলে করিয়া কচি ঘাস খাওয়াইতেছিলেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই প্রশ্ন করিলেন, 'আজ এত প্রণামের ঘটা যে! ব্যাপার কি—'

'আমার আজ পরীক্ষা—'

বাবা হরিণ-শিশুটিকে কোল হইতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাহা করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর—আমাকে বুকে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। তাহার পর ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া যে সংস্কৃত মন্ত্রটা বলিলেন, তাহা এখন আমার মনে নাই। তাহার পর আর একবার চুম্বন করিয়া আমাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, 'পাশ করবে।' বাবার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি নিরাসক্ত এবং আবেগবর্জিত বলিয়া সকলের ধারণা ছিল, তাঁহার কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। এই আবেগ প্রকাশ করিয়া তিনি যেন একটু লজ্জিত হইয়াছেন মনে হইল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। এ-পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল বাবা আমাদের সম্বন্ধে উদাসীন, দিদিমার অনুরোধেই এখানে আছেন। যতটুকু করিতেছেন কর্তব্যের খাতিরেই, তাহার সহিত হৃদয়ের কোনও যোগ নাই। সেদিন কিন্তু পাথরের তলায় ঝরণা আবিষ্কার করিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম, যে-আনন্দে সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার নাই। সম্ভবতঃ এই আনন্দের জোরেই পরীক্ষায় পাশ করিয়া গেলাম। সাধারণতঃ আমি ভীতু প্রকৃতির ছিলাম, কিন্তু সেদিন যেন নির্ভয় হইয়া গেলাম। অনুভব করিলাম আমি নিঃসহায় নই, বাবা আমার সহায় আছেন।

আমার পরীক্ষা পাশের কৃতিত্বটা কিন্তু ষোল আনাই লইলেন দীনু পণ্ডিত। তিনি যে আমার মতো গাধাকে পিটাইয়া প্রায় ঘোড়া করিয়া আনিয়াছেন এই কথাই

দিদিমাকে আসিয়া সাড়ম্বরে বলিতে লাগিলেন। দিদিমা তাঁহাকে এক জোড়া কাপড়, একটি তসরের চাদর, কিছু সিধা এবং পাঁচটি টাকা দিয়াছিলেন। আমি যেদিন পাঠশালা হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আসি সেদিন ওই জিনিসগুলি পণ্ডিত মশায়ের বাড়ীতে আমি পেঁাছাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছিলাম। খুব খুশী হইয়াছিলেন দীনু পণ্ডিত এবং আমাকে যে উপদেশটি দিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। বলিয়াছিলেন—'সর্বদা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করবে। হটাম্ করে কিছু করে বসো না।' পণ্ডিতমহাশয় বীরভূম জেলার লোক ছিলেন। কথাবার্তায় তাহা প্রকাশ পাইত।

পরীক্ষা পাশের খবর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু এবার তিনি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন না। কেবল বলিলেন, 'বেশ। আমি জানতাম তুমি পাশ করবে।' সেতারে সুর বাঁধিতেছিলেন, তাহাই বাঁধিতে লাগিলেন। বাবা আমার সহিত যখনই কথা বলিতেন, 'তুমি' বলিতেন। তাঁহার মুখে 'তুই' শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যদিও বাহিরে তাঁহার এই রকম কেতাদুরস্ত পর পর ভাব ছিল কিন্তু একথা ক্রমশঃ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম যে অলক্ষ্যে একটা সদাজাগ্রত দৃষ্টি তিনি আমার উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে যদিও তিনি কিছু বলিতেন না কিন্তু আমি অনুভব করিতাম তাঁহার এই দৃষ্টি যেন সর্বদাই আমাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে। তিনি যে ক্রমশঃ আমার এবং চন্দরের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন ইহার প্রমাণও পাওয়া যাইতে লাগিল। একদিন তিনি দিদিমার হাতে গোটা দশেক টাকা দিয়া বলিয়া আসিলেন, 'সূর্যের আর চন্দরের জামা-কাপড় এই টাকা দিয়েই কিনে দেবেন।' তাহার পর যখন আমি মাইনর স্কুলে ভরতি হইলাম তখন ভরতি হওয়ার সব খরচ তিনিই বহন করিলেন। স্কুলের বেতনও তিনিই প্রতিমাসে দিতেন। এ-সবের জন্য দিদিমার হাতেই তিনি মাসে মাসে টাকা দিয়া আসিতেন। ইহাতে মামার খুশী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দিদিমার মুখে শুনিয়াছি তিনি ইহাতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। দিদিমাকে বলিয়াছিলেন, 'দিদির ছেলেদের ভার আমি নিয়েছি। সে-ভার আমি বইব। জামাইবাবু যদি এ-টাকাটা জমিয়ে রাখেন তাহলে ওদের জন্য এক টুকরো জমি কিনে দিতে পারি। বাড়ীও একটা হয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে।'

দিদিমা উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'তুমিই তাকে বুঝিয়ে বোলো বাবা। আমি এ-কথা তাকে বলব কি করে। কি মনে করতে কি মনে করবে কে জানে। খামখেয়ালী লোক তো, হঠাৎ আবার একদিন উধাও হয়ে যাবে। তুমিই বোলো।' মামাও বলিতে পারেন নাই। বাবা রাশভারী গম্ভীর লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।

…আমি মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়া গেলাম। মন্মথ এবং খোঁড়া অশ্বিনীও ভরতি হইল। তাহারাও পাশ করিয়াছিল। অশ্বিনী খুব ভালোভাবে পাশ করিয়াছিল। মাইনর স্কুলেও ভালো ছেলে বলিয়া সুনাম হইয়াছিল তাহার। ইংরেজীটা খুব ভালো শিখিয়াছিল। ইহারই জোরে পরবর্তী জীবনে খুব উন্নতি করে সে। রেলের খুব বড় অফিসার হইয়াছিল।

পাঠশালায় দীনু পণ্ডিতই সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু মাইনর স্কুলে ছিলেন তিনজন শিক্ষক। হেড মাস্টার, সেকেণ্ড মাস্টার এবং পণ্ডিতমশাই। হেড মাস্টার

নীলমাধববাবু সেকালের জুনিয়র-সিনিয়র ছিলেন। অত্যন্ত মাতালও ছিলেন। সেকালে বিদ্বান লোকদের পক্ষে মদ খাওয়াটা খুব বেশী নিন্দনীয় ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার সহিত সভ্যতার এবং সভ্যতার সহিত মদ খাওয়ার যেন একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিল। নীলমাধববাবুকে বিদ্বান বলিয়াই সকলে খাতির করিতেন, মাতাল বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতেন না। কালো লম্বা লোক ছিলেন তিনি। স্কুলে সাহেবী পোশাক পরিয়া আসিতেন। সাদা জিনের প্যাণ্ট এবং কালো গলাবন্ধ কোট। কোটের গলার কাছে একটা সাদা শক্ত কলারও দেখা যাইত। স্বল্পভাষী লোক ছিলেন তিনি। কোথাও আড্ডা দিতে যাইতেন না। স্কুল হইতে সোজা বাড়ী যাইতেন, বাড়ী হইতে সোজা স্কুলে যাইতেন। অন্য কোথাও কেহ তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। স্কুলের কেরানী যতীনবাবু তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিতেন। সকলেই করিত। ঠিক দশটার সময় তাঁহাকে স্কুলের গেটে প্রবেশ করিতে দেখা যাইত, কখনও কোনও দিন কোনও কারণে এক মিনিটও 'লেট' হন নাই। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলে স্কুলের কলরব নিমেষে থামিয়া যাইত। ছেলেরা যন্ত্রচালিতবৎ নিজ নিজ স্থানে গিয়া বসিত। অথচ কোনও ছেলেকে তিনি কখনও মারিতেন না, বকিতেন না বা জরিমানাও করিতেন না। পড়াইতেন অতি চমৎকার। প্রত্যেক ছেলের পড়া ধরিতেন, প্রত্যেক ছেলের 'হোম-টাস্ক' সযত্নে সংশোধন করিয়া দিতেন। কেহ পড়া না পারিলে নীরবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিতেন, 'স্কুলে বসেই পড়াটা শিখে তবে বাড়ী যাবে।' গলার স্বর একটু ভাঙা ছিল। সর্বদা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিতেন। মনে হইত সর্বদাই তিনি যেন কোনও দুরূহ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন। সমস্যাটা যে কি তাহা বুঝিবার বয়স তখনও হয় নাই। পরে জানিয়াছি তাঁহার জীবনটাই সমস্যা-সংকুল ছিল। বড়লোকের ছেলে ছিলেন তিনি। তিনি পিতামাতার অমতে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। এজন্য তিনি গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতাও ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাকে। সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘটনাটি পরে ঘটিয়াছিল। যে-বিধবাটিকে বিবাহ করিয়া তিনি এত নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন সে-ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর একজনের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। মনে হয় এই নিদারুণ দুঃখের ছাপই তাঁহার মুখে বিষাদের ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। তাঁহার মাতাল বলিয়া বদনাম ছিল, কিন্তু মত্ত অবস্থায় কেহ তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। শুনিয়াছি সন্ধ্যার পর তিনি মদ খাইতেন। মনিয়ার মা নামে একটি চাকরানী তাঁহার দেখাশোনা করিত। সে তাঁহার রাঁধুনীও ছিল। জাতিতে সে ছিল কাহার, কিন্তু যৌবনে এক পশ্চিম-দেশীয় ব্রাহ্মণ কনস্টেবলের রক্ষিতা ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'বাভনী' বলিয়া ডাকিত। তাহার মেয়ে মনিয়া বাল্যকালেই মারা গিয়াছিল। এ-খবরটা যাহারা জানিত তাহারা তাহাকে 'মনিয়ার মা'ও বলিত। কিন্তু 'বাভনী' নামটাই বেশী প্রচলিত ছিল। এই 'বাভনী' নীলমাধববাবুর যে যত্ন করিত তাহার তুলনা হয় না। সাহেবগঞ্জে বাভনীই তাঁহার একমাত্র আপন লোক।

আমাদের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন গিরীনবাবু। খিটখিটে রোগা লোক। একঘর ছেলেমেয়ে ছিল তাঁহার। এক ডজন পুরিয়া গিয়াছিল। তাঁহার চেহারায়, পোশাকে, চালচলনে কোনও আভিজাত্যের চিহ্ন ছিল না। উস্ক-খুস্ক চুল, কপালের মাঝখানে একটি শিরা, মুখ সর্বদাই কুঞ্চিত, ভুরুতে চুল নাই, দাঁত পানের ছোপ-ধরা। খ্যাঁক

থ্যাঁক করিয়া কথা বলিতেন। জামা পরিতেন না। গ্রীষ্মকালে একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া স্কুলে আসিতেন, শীতকালে একটা লুই। পায়ে চটি। কিন্তু এই স্বল্প পোশাকও তিনি পরিষ্কার রাখিতে পারিতেন না। নূতন অবস্থায় চটি জুতাটির যে কি রং ছিল তাহা নির্ণয় করা যাইত না। কাপড়ও সর্বদা আড়ময়লা, তাহাতে মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা সেলাই দেখিতে পাইতাম। চাদরেও কখনও তালি, কখনও সেলাই।

এই গিরীন মাস্টারকে আমরা যমের মতো ভয় করিতাম। কারণ বেতের ব্যবহারটা তিনি একটু বেশী মাত্রায় করিতেন। যখন ঠেঙাইতে আরম্ভ করিতেন তখন তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। শুধু যে প্রহার করিতেন তাহা নয়, প্রহার করিতে করিতে খুব চীৎকারও করিতেন। চীৎকার মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া যাইত। তখন হেড মাস্টার মহাশয় স্কুলের চাকর সহজলালকে পাঠাইয়া তাঁহাকে আপিসে ডাকিয়া লইতেন। আপিসে তাঁহাকে কি বলিতেন জানি না, কিন্তু সেদিনের মতো মার থামিয়া যাইত। গিরীন মাস্টারের ভাষাও বড় অভদ্র ছিল। তাঁহার মৃদুতম গালাগালি ছিল, বেটাচ্ছেলে। বেশী রাগিয়া গেলে শালা, হারামজাদাও বলিতেন। তাঁহার একটি গুণ অবশ্যই ছিল, যে-বিষয়গুলি তিনি পড়াইতেন সেগুলি যেমন করিয়া হোক—মারের চোটে বা বকুনির চোটে—ছেলেদের মনে গাঁথিয়া দিতেন। যতক্ষণ না সেগুলি কণ্ঠস্থ হইত ততক্ষণ তিনি হাল ছাড়িতেন না। বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করিতেন। কণ্ঠস্থ করানো তাঁহার একটা বাতিক ছিল। অঙ্ক পর্যন্ত কণ্ঠস্থ করিতে হইত। এজন্য ছেলেদের বাপ-মায়েরা গিরীন মাস্টারকে খুব পছন্দ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন মারুক ধরুক যাই করুক ছেলেদের নিকট কাজ তো আদায় করিয়া লয়। তিনি যে-সব বিষয় পড়াইতেন সে সব বিষয়ে সত্যই কোনও ছেলে ফেল করিত না।

পণ্ডিত মহাশয়ের নাম ছিল বিরজা পণ্ডিত। তাঁহার আবক্ষ দাড়ি, চক্ষু দুইটি সর্বদাই জবাফুলের মতো লাল। গঞ্জিকা-ভক্ত ছিলেন তিনি, গাঁজা খাইয়াই স্কুলে আসিতেন। তাঁহার গা হইতে গাঁজার গন্ধ ছাড়িত। টিফিনের সময়ও গাঁজা খাইবার জন্যই বাড়ী চলিয়া যাইতেন। টিফিনের পর যখন ফিরিতেন তখন তাঁহার চক্ষু দুইটি আরও লাল দেখাইত, দূর হইতেই গাঁজার গন্ধ পাওয়া যাইত। বলিষ্ঠ লোক ছিলেন বিরজা পণ্ডিত। দুই বেলায় দুই সের করিয়া মহিষের দুগ্ধ পান করিতেন নাকি। এসব খবর অবশ্য মন্মথর মুখে শোনা। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে গাঁজা বা দুধ খাইতে দেখি নাই। তবে এটা ঠিক তিনি কাছে আসিলেই গাঁজার গন্ধ পাওয়া যাইত। গিরীন মাস্টারের মতো প্রত্যহ ছেলে ঠেঙাইতেন না। ক্লাসে আসিয়া সম্মুখের দেওয়ালের দিকে চাহিয়া বলিতেন, 'পড়'। কোনও ছেলের মুখের দিকে তিনি তাকাইতেন না। সম্মুখের দেওয়ালের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি খানিকক্ষণ নিবদ্ধ থাকিত। আমরা পড়িতে আরম্ভ করিলে তাঁহার দৃষ্টি ক্রমশঃ দেওয়াল হইতে আমাদের মুখের উপর নামিয়া আসিত। শুধু নামিয়া আসিত না, প্রত্যেক ছেলের মুখের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত। নীরবে তিনি লক্ষ্য করিতেন প্রত্যেকটি ছেলে পড়িতেছে কি না। কেহ পড়িতেছে না লক্ষ্য করিলে মার্জারের মতো নিঃশব্দচরণে ছেলেটির পিছনে গিয়া দাঁড়াইতেন, তাহার পর আচমকা হয় তাহার চুলের মুঠি না হয় কান দুইটি ধরিয়া

একেবারে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ফেলিতেন। শূন্যেই কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিতেন, তাহার পর আবার ধপাস্‌ করিয়া নামাইয়া দিতেন। নামাইয়া নিজের চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন কিছুক্ষণ। তাহার পর ঈষৎ দুলিতে দুলিতে চাপা তর্জন করিতেন একটা—'শানে আছড়ে মেরে ফেলব।' বিরজা পণ্ডিতকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় করিত। গিরীন মাস্টারের বেত এবং হুংকারের মধ্যে কিছু লুকোছাপা ছিল না। কিন্তু বিরজা পণ্ডিতের আবক্ষ দাড়ি, নির্ণিমেষ রক্তচক্ষু, নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়ানো, তাহার পর আচমকা চুলের মুঠি ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ফেলা বড়ই ভীতিকর ছিল আমার কাছে।

দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় আমাদের রক্ষক ছিলেন সিপাহী ঠাকরুন। শুনিয়াছিলাম মাইনর স্কুলেও তিনি মাঝে মাঝে আসিতেন এবং ছেলেদের নির্যাতন দেখিলে আগাইয়া তাহাদের রক্ষা করিতেন। মন্মথ বলিয়াছিল সিপাহী ঠাকরুন একদিন নাকি বিরজা পণ্ডিতকে কুলিপাড়ার গলিতে দাড়ি ধরিয়া চড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। আমরা যখন মাইনর স্কুলে ভরতি হইলাম তখন সিপাহী ঠাকরুন ছিলেন না। কিছুদিন পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। হঠাৎ মারা যান তিনি। থানার কনেস্টবলরা মিলিটারী কায়দায় শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু পাঠশালা স্কুলের অসহায় শিশুরাই যে একজন বলিষ্ঠ ত্রাণকর্ত্রী হারাইয়াছিল তাহা নয়, অনেক দীন দরিদ্র লোকও অভিভাবকহীন হইয়া গিয়াছিল। সিপাহী ঠাকরুন অনেক গরীব লোককে খাইতে দিতেন। অনেকের জামা-কাপড় কিনিয়া দিতেন। অনেক গরীব ছেলের স্কুলের বেতনও দিতেন শুনিয়াছি।

আজকাল বি. এ., এম. এ., পি-এইচ্. ডি. ঘরে ঘরে। সেকালেও ছিল, কিন্তু এত ছিল না। সেকালে এনট্রান্স পাশ লোককেই সকলে যথেষ্ট কৃতবিদ্য মনে করিতেন। নীলমাধববাবু এফ. এ. পাশ ছিলেন। পল্লীগ্রামে বি. এ., এম. এ. সচরাচর দেখা যাইত না। তাঁহারা শহরেই বড় চাকরি করিতেন। উচ্চ ডিগ্রিধারীদের এমন ভিড় তখন ছিল না। কিন্তু একটা জিনিস তখন ছিল যাহা এখন নাই। তখন ছেলেরা লেখাপড়াটা ভালো করিয়া শিখিত। এখন শেখে না। এখন ডিগ্রিটাও সস্তা এবং সহজলভ্য। তখন মারের চোটে প্রাণের দায়ে পরীক্ষার ভয়ে আমরা পাঠ্যপুস্তকগুলি ভালো করিয়া পড়িতাম। এখন ছেলেরা বই পড়ে না, নোট পড়ে। তাহাতেও না কুলাইলে পৈরবীর শরণাপন্ন হয়, কখনও কখনও পরীক্ষককে ঘুষ দিবার চেষ্টাও করে। আমার তো নয়ই আমাদের অভিভাবকেরা একথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তখন একজন এনট্রান্স পাশ ছেলের ইংরেজীতে, অঙ্কে, সংস্কৃতে যতটা দখল থাকিত এখন ততটা নাই। এখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক উচ্চ ডিগ্রিধারী ছেলেও এক লাইন ইংরেজী শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না। বাংলাও পারে না। আমার ভাই চন্দর একজন কৃতবিদ্য লোক, ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত খুব ভালো জানে, কিন্তু সেকালের এফ এ পরীক্ষা পাশ করিতে পারে নাই। অঙ্কে ফেল করিত, কখনও বা ফিজিক্সে। তখন এফ. এ. কোর্সে বিজ্ঞানও পড়ানো হইত। আমার বিদ্যা মাইনর পর্যন্ত। কিন্তু ওই মাইনর পড়িয়াই আমি যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা এখনকার ম্যাট্রিকুলেশন, এমন কি আই. এ. পাশ ছেলেরাও শেখে না। আমাদের পড়িতে হইত লোহারামের ব্যাকরণ,

সম্ভাবশতক, সীতার বনবাস, পদ্যপাঠ, শুভঙ্করী, পাটীগণিত, ইউক্লিডের জ্যামিতি, পরিমিতি, ইংরেজী 'মল' ক্লাস বুক, লেনিজ গ্রামার— এ-সব ছাড়াও ছিল পুরাবৃত্তসার, পদার্থবিদ্যা, শরীর পালন। পড়াশোনাই তখন ছাত্রজীবনের প্রধান কর্ম ছিল। আজকাল পড়াশোনা ছাড়া স্কুল-কলেজেই আরও নানারকম জিনিসের চর্চা হয়। স্পোর্টস, ডিবেটিং ক্লাব, এমন কি নাচ-গানের সুযোগও অনেক স্কুল-কলেজে দেওয়া হয়। মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়ার প্রথা অনেক স্কুলে প্রচলিত আছে। বয়েজ স্কাউটস্, এন. সি. সি. প্রভৃতি তখন ছিল না। তখন আমাদের একমাত্র কাজ ছিল বই মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করা। পিতামাতারাও তাহাই চাহিতেন, তাই তাঁহারা বাড়ীতেও কড়া নজর রাখিতেন ছেলেরা পড়িতেছে কি না। ইহার কারণও ছিল, তখন পরীক্ষা পাশ করিলেই চাকরি হইত এবং চাকরি হইলেই ভবিষ্যতের সুরাহা হইয়া যাইত। এখন আর তাহা হয় না। তাই ছাত্রেরা আজকাল পড়াশোনায় তেমন উৎসাহী নয়, তাহাদের পিতামাতাদের উৎসাহও মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহারা এখন ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ান, উপার্জনের পথ খোলা নাই বলিয়া। উপার্জন-ক্ষমতা অর্জন করাটাই চিরকাল সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, লেখাপড়াটা গৌণ। জ্ঞানের সাধনায় ব্রাহ্মণেরাই আগ্রহশীল, দারিদ্র্যবরণ করিয়াও তাঁহারা মা সরস্বতীর ভজনা করেন। ব্রাহ্মণ চিরকালই বিরল, এমন কি ব্রাহ্মণের বংশেও প্রকৃত ব্রাহ্মণের ক্বচিৎ জন্ম হয়। আবার কখনও অব্রাহ্মণ বংশেও তাঁহাদের আবির্ভাব ঘটে।

যদিও সেকালে পড়াশোনার অর্থকরী বলিয়া সুনাম ছিল এবং ছেলেদের অভিভাবকেরা ছেলেরা যাহাতে পরীক্ষা পাশ করে সে-বিষয়ে সচেতন থাকিতেন, তবু সেকালে পড়াশোনায় অমনোযোগী ছেলের সংখ্যা কম ছিল না। আমাদের দলের মধ্যে মন্মথ পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। তাহার ঝোঁক ছিল গান-বাজনায় এবং অভিনয়ে। এখানকার মতো তখন সিনেমার প্রচলন হয় নাই। কিন্তু যাত্রা-থিয়েটার ছিল। সাহেবগঞ্জে শখের থিয়েটারের দল ছিল একটা। রেলের বাবুরাই তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ অভিনেতাই রেলের কর্মচারী। একজনের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম রাসবিহারীবাবু। নিজে ভালো অভিনয় করিতেন, অভিনয় শিক্ষাও দিতেন। রিহার্সালের সময় রেলের কালো কোট-প্যান্টের উপরই ওড়না জড়াইয়া স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ও দেখাইয়া দিতে পারিতেন। ভালো ছবি আঁকার হাত ছিল। থিয়েটারের সমস্ত 'সিন্' নিজের হাতে আঁকিতেন। খুব দ্রুতবেগে দুই হাতে আঁকিতে পারিতেন। বড় বড় সাদা ক্যাম্বিসের পরদা দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যে কখনও রাজপ্রাসাদে, কখনও ঘন অরণ্যে, কখনও বা সৈন্য শিবিরে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আমরা অবাক হইয়া দেখিতাম। গঙ্গার ধারে খেলারাম মারোয়াড়ীর একটা বাগান-বাড়ী ছিল। সেইখানে রাসবিহারীবাবু 'সিন্' আঁকিতেন। আমরা—স্কুলের ছেলেরা—ছুটি পাইলেই সেখানে গিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতাম। মন্মথই আমাকে লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য খুব লুকাইয়া যাইতে হইত। দিদিমা বা মামা জানিতে পারিলে খুব বকাবকি করিবেন, এ ভয় ছিল।

মন্মথর বাবা বরদাবাবুর কিন্তু এ বিষয়ে খুব কড়াক্কড়ি ছিল না। তিনি একটু উদারপন্থী লোক ছিলেন। মন্মথর দাদা (তাঁহাকে আমরা আনুদা বলিতাম) ক্রমাগত এন্ট্রান্স ফেল করিতেছিলেন। বরদাবাবু ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিজের আপিসে

ঢুকাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। বলিয়াছিলেন, এনট্রান্সটা পাশ করুক। তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই আনন্দ-দা থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। বরদাবাবু ইহাতে আপত্তি করেন নাই। মন্মথও স্কুলে পড়িতে পড়িতেই ছোটখাটো ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিত। সে একবার লবের ভূমিকায় নামিয়াছিল মনে পড়িতেছে। বরদাবাবু ইহাতেও আপত্তি করেন নাই। বরদাবাবু নিজেও নামিতেন মাঝে মাঝে। বরদাবাবুর বাড়ীতেই সেকালে একটু আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। মন্মথর দুই দিদি ছিল। তাহারা কুঁচি দিয়া কাপড় পরিত এবং গান গাহিত। খোঁপায় বেল ফুলের মালা দিয়া ছাতে ঘুরিয়া বেড়াইত, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও প্রকাশ্যে পড়িতে সংকোচ হইত না তাহাদের। অনেকেরই সমালোচনার লক্ষ্যস্থল ছিল তাহারা। অনেকেই ব্যঙ্গ করিত কিন্তু সবই করিতে হইত গোপনে। প্রকাশ্যে বরদাবাবুর বা তাঁহার পুত্রকন্যাদের সমালোচনা করিবার সাহস ছিল না কাহারও। কারণ বরদাবাবুর হাতে অনেক চাকরি, অনেক নিমজ্জমান সংসার-তরণীর কর্ণধার তাঁহার অনুগ্রহেই ঝড়ঝাপটা সামলাইবার শক্তি অর্জন করিতেন। সুতরাং তাঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি যে মন্মথর সঙ্গে মিশি এটা মামা খুব পছন্দ করিতেন না। কিন্তু আমাকে মানা করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। কারণ মামার অনেক আত্মীয়স্বজনের চাকরি বরদাবাবুই করিয়া দিয়াছিলেন। মামার বাড়ীতে সর্বদাই বেকার একদল পোষ্য থাকিত। তাহারা দুই বেলা খাইত এবং নুনের গদিতে শয়ন করিত। আহার-নিদ্রা এবং পরচর্চা করা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না তাহাদের। বরদাবাবুর সহায়তায় মামা তাহাদের চাকরি জুটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বরদাবাবু যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এমন কাজ মামা কখনও করিতেন না।

স্কুল হইতে ফিরিয়া আমি প্রতিদিনই স্নানাহার করিয়া বেড়াইতে যাইতাম। আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল হয় পাহাড়তলি কিংবা খেলারামের বাগান-বাড়ী। সাহেবগঞ্জে রেল-লাইনের ওপারে পাহাড়তলি নামে একটি মনোরম স্থান ছিল। স্কুলের ছেলেরা অনেকেই সেখানে বেড়াইতে যাইত সিগারেট খাইবার জন্য। তখন প্রকাশ্যে রাস্তায়-ঘাটে ভদ্রলোকের ছেলেরা সিগারেট ফুঁকিতে সাহস করিত না। ডাক্তার সুরথবাবুর চোখে পড়িলে সর্বনাশ হইয়া যাইত। তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়া সিগারেট ফেলিয়া দিতে বাধ্য করিতেন তিনি। তাহার পর বাড়ীতে রিপোর্ট করিতেন। তিনি ছিলেন শহরের সব ছেলেদের গার্জেন। সন্ধ্যার পর তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোন ছেলে দেরি করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিতেন, এত দেরির কারণ কি। সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে ধমক খাইতে হইত। পাহাড়তলিতে গিয়ে পাহাড়ে উঠিতাম আমরা। খুব দ্রুতবেগে উঠিতে পারিতাম। পাহাড়ের মাথায় একটি বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ ছিল। তাহারই তলায় বসিয়া মন্মথ সিগারেট ধরাইত। আমিও দু'এক টান দিতাম। কিন্তু ওই দু'এক টান মাত্রই। মন্মথর অনুরোধেই টানিতে হইত। কিন্তু আমার তেমন ভালো লাগিত না। টান দিলেই কাসি হইত খুব। একদিন বমিও হইয়া গিয়াছিল। আর একটা কারণেও আমি সিগারেট খাইতে চাহিতাম না। ভয় হইত যদি ওই নেশার দাস হইয়া পড়ি পয়সা পাইব কোথায়? আমার হাতে মামা একটি পয়সাও দিতেন না। স্কুলের মাহিনাটি

পর্যন্ত কার্তিক মামা নিজে গিয়ে স্কুলে জমা দিয়া আসিতেন। জলখাবার বাড়ীতে খাইতাম। স্কুলের বইও কার্তিক মামাই কিনিয়া দিতেন, কিংবা কোথাও হইতে পুরাতন বই যোগাড় করিয়া আনিতেন। এ-বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা ছিল। সেকালে আমরা অনেক ছেলেই খাতা কিনিতাম না। চেনাশোনা রেলের কর্মচারীরা অনেক সময় রুল-টানা খাতা আমাদের দিতেন। তাহাতে না কুলাইলে কার্তিক মামাই হলুদ রঙের শ্রীরামপুরী কাগজ কিনিয়া বাড়ীতে আমাদের জন্য খাতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। আমার হাতে পয়সা আসিবার কোনও সুযোগই ছিল না। বাবার কাছে পয়সা চাহিবার কথা ভাবিতেও ভয় হইত। দিদিমাও নগদ পয়সা দিতে চাহিতেন না, তাঁহার ভয় হইত আমি পয়সা লইয়া বাজারের তেলে-ভাজা ফুলুরি কিনিয়া খাইব এবং তাহা খাইলেই নির্ঘাত পেটের অসুখ করিবে। মাঝে মাঝে নিত্য আমাকে লুকাইয়া দুই একটা পয়সা দিত। বলিত, 'একাই সব খাস নি, আমার জন্যেও দু' একটা নিয়ে আসিস। লুকিয়ে আনিস কিন্তু—।' তাহার হাসিমাখা মুখটি আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। হাতে পয়সা ছিল না বলিয়াই আমি ছেলেবেলায় সিগারেট খাওয়া শিখিতে পারি নাই। কিন্তু লুকাইয়া রাসবিহারীবাবুর সিন্-আঁকা দেখা বা আড়ি পাতিয়া থিয়েটারের রিহার্সাল শোনার জন্য পয়সার দরকার ছিল না। সুযোগ পাইলেই এই দুটি কাজ করিতাম। বস্তুতঃ, আমার নীরস ছাত্র-জীবনে ওই শখের থিয়েটারই আমার কল্পনার খোরাক যোগাইত। উহাই আমার কাছে নানা রসের উৎস ছিল। ছেলেবেলায় শঙ্করা গ্রামে সন্তোষের মা রূপকথা বলিয়া আমাকে অপরূপ লোকে লইয়া যাইতেন, কাহিনীর ময়ূরপংখীতে চড়াইয়া, কত অজানা দেশে অচেনা ঘাটে, কত নামহীন সমুদ্রে নদীতে অরণ্যে প্রান্তরে, আকাশের কত নক্ষত্রলোকে ভ্রমণ করাইতেন। সাহেবগঞ্জে সন্তোষের মা ছিলেন না। তাঁহার স্থান লইয়াছিল শখের থিয়েটার এবং রাসবিহারীবাবু।

রাসবিহারীবাবুই সাহেবগঞ্জের শখের থিয়েটারের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। সিন্ আঁকিতেন, ভালো অভিনয় করিতেন, সকলকে অভিনয় শিখাইতেন এবং যেদিন থিয়েটার হইবে তাহার সাত দিন আগে হইতেই ডি. টি. এস. আপিসের পিছনের মাঠে নিজে দাঁড়াইয়া মঞ্চ প্রস্তুত করাইতেন। রাসবিহারীবাবুর চেহারায় ও চরিত্রে এমনি একটি বৈশিষ্ট্য এবং ব্যঞ্জনা ছিল যাহা অসাধারণ। বড় ভারি মাথায় বাবরি চুল, গোঁফদাড়ি কামানো। ঈষৎ বেঁটে, বলিষ্ঠ এবং নাতিস্থূল চেহারা। টানা-টানা চোখের দৃষ্টি ভাষাময়। মনে হইত সর্বদাই যেন একটা মজার কথা মনে মনে উপভোগ করিতেছেন। থিয়েটারে প্রায়ই খুব ছোটোখাটো ভূমিকায় নামিতেন—যেমন চাকর অথবা পারিষদের ভূমিকায়—কিন্তু অভিনয় নিখুঁত হইত। অর্ধেন্দু মুস্তফী এবং অমৃতলাল তাঁহার আদর্শ ছিলেন। শুধু যে তিনি থিয়েটার ব্যাপারেই দক্ষ ছিলেন তাহা নয়, অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারেও অপরিহার্য ছিলেন তিনি। মড়া পোড়াইতে তাঁহার মতো ওস্তাদ সাহেবগঞ্জে আর কেহ ছিল না। সৎকার সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন তিনি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সব জাতের শবকেই শ্মশানে লইয়া যাইতেন। বলিতেন মড়ার কোন জাত নাই। ভোজ-কাজের ব্যাপারে অধিকাংশ বাড়ীতেই রান্না পরিবেশনের ভার তাঁহার উপর দিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতেন। পরিবেশন করিতে করিতে চোখমুখের এমন ভাবভঙ্গী করিতেন যে সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত।

মূক অভিনয়ে তাঁহার জোড়া কেহ ছিল না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সুযোগ পাইলে সবলের সঙ্গেই কৌতুক করিতেন। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ভাব ছিল, প্রায়ই তাহাদের লইয়া ফষ্টিনষ্টি করিতেন। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। স্কুলের সবে ছুটি হইয়াছে, স্কুলের গেট দিয়া পিলপিল করিয়া ছেলের দল বাহির হইতেছে। দেখা গেল, রাসবিহারীবাবু গেটের ঠিক সামনে ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হঠাৎ বলিলেন, 'বাঃ চমৎকার কেটেছে ঘুড়িটা।' বলিয়াই চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে বাড়ীর দিকে ছুটিতেছিলাম, কিন্তু ঘুড়ি কাটিয়াছে শুনিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আকাশ হইতে কাটা ঘুড়ি পাওয়া, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতোই লোভনীয় ছিল আমাদের কাছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ঘাড় ব্যথা করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু ঘুড়ি দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম রাসবিহারীবাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন, তখন বুঝিতে পারিলাম আমাদের তিনি ঠকাইয়াছেন। তাঁহার এক ছেলের নাম ননী। একদিন বেলা দশটার সময় ননীকে ডাকিতে গিয়াছি। তাহার কাছে আমার একটা খাতা ছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। ননী ননী বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছি, রাসবিহারীবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—'কি বোকা রে তুই, এই ঘোর গ্রীষ্মে এত বেলা পর্যন্ত ননী কি আর আছে? গলে গেছে।' বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই ধরনের ছোটখাটো রসিকতা তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত।

রাসবিহারীবাবু রেলে সামান্য কাজ করিতেন—সম্ভবতঃ গার্ড ছিলেন—কিন্তু সাহেবগঞ্জের বাঙালী-অবাঙালী সকলের হৃদয়ে তিনি যে-স্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন তাহা অসামান্য। বিহারীরা তাঁহাকে রসোবাবু এবং মারোয়াড়ীরা তাঁহাকে রাসুসোবাবু বলিত। তাঁহার ছোট-খাটো পরিহাস-প্রিয়তার জন্য এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য সবলেই শ্রদ্ধা করিত তাঁহাকে। তিনি সুযোগ পাইলেই সকলের উপকার করিতেন, কিন্তু কখনও প্রত্যুপকারের আশা করিতেন না। কেহ প্রত্যুপকার করিতে গেলে তাহা এড়াইয়া যাইতেন বা প্রত্যাখ্যান করিতেন। অদ্ভুত স্বভাব ছিল তাঁহার। অনেককে ঋণী করিয়াছেন, কিন্তু নিজে বরাবর অঋণী ছিলেন। তিনি বহুলোকের মড়া কাঁধে করিয়া বহন করিয়াছেন কিন্তু এমনই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল তাঁহার মড়া কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই। শ্মশানের ঠিক পাশেই যে গঙ্গাঘাট ছিল তাহাতেই তিনি প্রত্যহ হাঁটিয়া গিয়া স্নান করিয়া আসিতেন। একদিন স্নান করিতে গিয়া সেখানেই হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। এরকম মৃত্যু বিরল। গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া সূর্য-স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। তাঁহাকে বহন করিবার জন্য কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না।

এই রাসবিহারীবাবুই আমার থিয়েটারের নেশা ধরাইয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে, ডাক্তারি পাশ করিবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত এ-নেশা আমার ছিল। নিজের বাড়ীতেই একটা থিয়েটারের আখড়া করিয়াছিলাম।

আমার স্কুল জীবনের আর একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। মন্মথ হঠাৎ একদিন একটা যাত্রাদলের সহিত উধাও হইয়া গেল। তখন যাত্রার খুব প্রচলন ছিল। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলই তখন প্রিয় ছিল সকলের। আর বহুল প্রচলন ছিল বিদ্যাসুন্দরের পালা, কথকতা প্রভৃতির। থিয়েটার অপেক্ষা এই সবই লোকে বেশী পছন্দ করিত। মন্মথ তো একেবারে মাতিয়া উঠিত। তাহার বাড়ীতে তেমন কড়াক্কড়ি ছিল না, কোনও যাত্রার দল আসিলে সে তাহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইত, তাহাদের সঙ্গেই সর্বদা থাকিত এবং তাহাদের ফাই-ফরমাশ খাটিত। তখন অনেক যাত্রা—বিশেষ করিয়া বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার—খুব ভোরে, সাড়ে তিনটা বা বড়জোর চারটের সময় আরম্ভ হইত এবং দশটা নাগাদ শেষ হইয়া যাইত। কাহারও কাজকর্মের বা রাত্রির ঘুমের ব্যাঘাত হইত না ইহাতে। এইজন্য আমার প্রায় যাত্রা শোনা হইত না। আমি দিদিমার কাছে শুইতাম, দিদিমা অত ভোরে আমাকে উঠাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার ভয় হইত ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইবে। মামা নিজে যাত্রা শুনিতেন, কিন্তু বাড়ীর ছোট ছেলেদের বা মেয়েদের যাত্রা শোনা পছন্দ করিতেন না। চিকের বন্দোবস্ত থাকিলে মামীমা কখনও কখনও যাইতেন। মন্মথ কিন্তু রোজ গোড়া হইতে যাত্রা শুনিত। কারণ যাত্রার দলের সঙ্গেই রোজ রাত্রে শুইত সে। বরদাবাবু বা তাঁহার স্ত্রী ইহাতে আপত্তির কিছুই দেখিতেন না। একদিন শুনিলাম যাত্রার দলের একটি ছেলে অসুস্থ হইয়া পড়াতে মন্মথই তাহার বদলে গান গাহিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সেকালের যাত্রায় একদল বালক গায়ক থাকিত, তাহারা শ্রোতাদের মধ্যে চলিয়া গিয়া জুড়ির গান গাহিত। জুড়িরা ছিল মূল গায়েন (গায়ক), তাহারা আসরের চারিদিকে দাঁড়াইয়া গান গাহিত। বালকেরা শ্রোতাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতিধ্বনি করিত। ইহাতে যে জমাট আবহাওয়া সৃষ্টি হইত তাহা আজকালকার থিয়েটার বা সিনেমায় হয় না। সেকালের যাত্রায় সব রকম রসের প্রচুর পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকিত। বক্তৃতা, ওস্তাদী গান, কমিক, পোশাকের জাঁকজমক, অভিনয়-কৃতিত্ব, তরবারি-ক্রীড়া, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির প্রভাব একটা পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায় দর্শক ও শ্রোতাদের মনে যে আনন্দ-লোক সৃষ্টি করিত তাহা আজকালকার থিয়েটার বা সিনেমায় দেখি নাই। যাত্রার আসরের মধ্যেও একটা উদার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। সংকীর্ণ চেয়ারে বসিতে হইত না। মাটিতেই ফরাশ বা শতরঞ্জির উপরই বসিত অনেক লোক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসরের কাছে বসিত। তাহার পর বসিত বয়স্কেরা। বৃদ্ধেরা একটু আলাদা জায়গায় নিজেদের বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক সময় গড়গড়া থাকিত। যাহারা মাটিতে বসিতে চাহিত না, তাহারা নিজেদের খরচে যাত্রার একধারে মাচা বানাইয়া তাহাতে বসিত। এরকম মাচার নাম ছিল ঘাড়ি-ঘর। সেটা অনেকটা আজকালকার রিজার্ভড্ বক্সের মতো। যাত্রার দল শুধু যে পুরুষদের দ্বারাই পরিচালিত হইত তাহা নয়, মেয়েদের দ্বারাও হইত। বউ কুণ্ডু, বউ মাস্টার মেয়েদের যাত্রা ছিল। এই ধরনের মেয়ে যাত্রা সাধারণতঃ মৃত অধিকারীদের পত্নীরা পরিচালনা করিতেন। এই রকম একটা মেয়ে যাত্রার (বউ মাস্টার, কি বউ কুণ্ডু তাহা ঠিক মনে নাই) অধিকারিণীর মাতৃস্নেহ

মন্মথকে দেখিয়া উথলিয়া উঠিল। ঠিক মন্মথর মতোই তাঁহার একটি পুত্র ছিল নাকি, পুত্রটি অকালে মাকে ছাড়িয়া চিরতরে চলিয়া যায়। মন্মথর মতো সে-ও নাকি সুকণ্ঠ ছিল, অনেক ভালো ওস্তাদ রাখিয়া তাহাকে তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান তাহাকে কাড়িয়া লইলেন। মন্মথের মধ্যে তাঁহার মৃতপুত্রের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন এবং দুই বাহু দিয়া তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। কয়েকদিন পরে দেখা গেল মন্মথকে তিনি একটি সোনার আংটি গড়াইয়া দিয়াছেন। সর্বদাই মন্মথকে কাছে কাছে চোখে চোখে রাখিতেন। একদিন মন্মথর মাকেও গিয়া বলিলেন. 'আপনার মন্মথর মধ্যে আমি আমার হীরুকে ফিরে পেয়েছি। আমি যে ক'দিন এখানে থাকি মন্মথ আমার কাছেই থাকুক, আপনি আপত্তি করবেন না,' মন্মথর মা আপত্তি করেন নাই। মন্মথর মা শুভংকরী দেবী সহৃদয়া মহিলা ছিলেন। পুত্রের উচ্ছ্বলিত প্রশংসা শুনিয়া তিনি বিগলিতও হইয়াছিলেন। উক্ত অধিকারিণী অবিমিশ্র শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিয়াছিলেন সকলের। তিনি মাথায় একটি অলংকৃত শিরস্ত্রাণ এবং গায়ে একটি সুরঞ্জিত জরির কাজ-করা আলখাল্লা পরিয়া আসরে দাঁড়াইয়া জুড়ির গান করিতেন। গানের গলা অপূর্ব ছিল। তাহার গানের সহিত বেহলা বাজাইতেন বৃদ্ধ বিধু ঘোষাল। তাঁহার গলা আর বেহালার স্বর একেবারে নাকি মিশিয়া যাইত। মনে হইত বেহালাই গান গাহিতেছে। সেতারী বাগচি মহাশয় তাঁহাকে কোকিলকণ্ঠী আখ্যা দিয়াছিলেন। এহেন প্রতিভাময়ী নারীর অনুরোধ বরদাবাবু বা শুভংকরী উপেক্ষা করিতে পারেন না। মন্মথ অধিকাংশ সময়ই তাঁহার কাছে থাকিত। স্কুলে অবশ্য আসিত সে। কিন্তু যাত্রার দলের অধিকারিণীর স্নেহভাজন হইয়াছিল বলিয়া স্কুলে আসিয়া পড়াশোনা অপেক্ষা মাতব্বরিই বেশী করিত। এমন কি গিরীন মাস্টার পর্যন্ত তাহাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই যাত্রার দলের সহিত মন্মথ একদিন চলিয়া গেল। হইচই পড়িয়া গেল শহরে। মন্মথর মা কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। বরদাবাবু কিন্তু বিশেষ বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, 'ও দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে। ভগবান ওকে যে গুণ দিয়েছেন তার সমঝদার এখানে নেই। এখানে গান গাইলে আমরা বকি, আর ওরা এইজন্যই ওকে বাহবা দেয়। এই 'বাহবা'র মোহটা কেটে গেলেই ও আপনি ফিরে আসবে। এ মোহ কাটতে অনেক সময় দেরি হয় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটে যায়।' বরদাবাবুর এই দার্শনিক উক্তি কিন্তু মন্মথর মাকে শান্ত করিতে পারিল না। তাঁহারই জেদে বরদাবাবু শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দিলেন। সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দল বায়না লইয়া ধানবাদে গিয়াছে। একটি কনস্টেবল লইয়া আনন্দা সেখানে ছুটিলেন এবং দিন সাতেক পরে মন্মথকে পাকড়াও করিয়া আনিলেন। মন্মথ নাকি কিছুতেই আসিতে চাহিতেছিল না, অধিকারিণীও কান্নাকাটি কম করেন নাই; তিনি একথাও নাকি বলিয়াছিলেন যে মন্মথর যেরূপ প্রতিভা ও কণ্ঠস্বর তাহাতে সে একজন ভারতবিখ্যাত গায়ক হইতে পারে, তাহার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন এবং সংগীতবিদ্যায় তাহাকে পারদর্শী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একথাও তিনি বলিয়াছিলেন যে মন্মথ একটু বড় হইলে তাহার হাতেই যাত্রার দলের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া তিনি কাশীবাসিনী হইবেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মন্মথকে আনন্দা লইয়া আসিলেন। সঙ্গে পুলিশ ছিল বলিয়া তাহা সহজসাধ্য হইল।

মন্মথ ফিরিয়া আসিলে তাহাকে লইয়া ছাত্রমহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিমালয়-লঙ্ঘনকারী বিরাট বীর অথবা তুষারাচ্ছন্ন মেরু আবিষ্কর্তা দুঃসাহসী নাবিক যে সম্মান পাইয়া থাকেন মন্মথকে আমরা সেই সম্মানই দিলাম। আমরা মাস্টারদের শাসনে জর্জরিত হইরা একঘেয়ে পাঠ্যপুস্তকের শ্বাসরোধকর বন্দীশালায় দিনের পর দিন আবদ্ধ ছিলাম, ইহার বাহিরে যে বৃহত্তর একটা জগৎ আছে, এই বন্দীশালার প্রাচীর টপকাইয়া সে জগতের রূপরস উপভোগ করাও যে সম্ভব মন্মথই তাহা আমাদের প্রথমে দেখাইয়া দিল। তাই তাহাকে আমরা বিদ্রোহী বীরের সম্মান দিলাম।

মন্মথ কিন্তু আর স্কুলে ফিরিয়া আসিল না। সে তাহার মাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল, 'আমার পড়াশোনা ভালো লাগে না। আমি গান-বাজনা নিয়ে থাকব। তোমরা যদি আমাকে স্কুলে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি কর আবার আমি পালিয়ে যাব।' বরদাবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। সকুরিগলির গণেশ ওস্তাদ প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে গান শিখাইতে লাগিল। রাসবিহারীবাবুর থিয়েটারের দলেও সে এবার খোলাখুলিভাবে মিশিয়া গেল। বরদাবাবু ইহাতেও আপত্তি করিলেন না। বরদাবাবুর ইহাই বিশেষত্ব ছিল। নিজের ছেলে-মেয়েদের একটা বিশেষ গণ্ডীতে তিনি জোর করিয়া আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেন না। নিজের নিজের রুচি অনুসারে তাহাদের স্বাধীনভাবে চলিতে দিতেন। সে যুগে এরকম মনোভাব দুর্লভ এবং বিস্ময়কর ছিল। বরদাবাবু নিজেও একজন আর্টিস্ট ছিলেন। ছবি আঁকার এবং ফটোতোলার শখ ছিল তাঁহার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িতে ছেলে-মেয়েদের বাধা দিতেন না। তাঁহাদের পরিবারে আধুনিকতার একটা বেপরোয়া হাওয়া বহিত। তাঁহাদের বাড়ীর সকলে পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ শৌখিন এবং ছিমছাম থাকাই পছন্দ করিতেন। তাহাদের বাড়ীর আসবাবপত্রেও আধুনিকতার ছাপ দেখা যাইত। মনে পড়িতেছে, তাঁহাদের বাড়ীতেই আমি প্রথম 'হোয়াট নট্' নামক আসবাবটি দেখিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীতে 'পরদা' ছিল, অপরিচিত লোকের সামনে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা বাহির হইত না। স্বল্পপরিচিত জ্ঞাতি কুটুম্বদের সামনেও তাহাদের দীর্ঘ ঘোমটা না দিয়া উঁকিঝুঁকি দিলেও মামা রাগারাগি করিতেন। কিন্তু মন্মথদের বাড়ীর দ্বার সকলের কাছেই অবারিত ছিল। পাড়ার ছেলেদের সেখানে আড্ডা বসিত, তাস-খেলা চলিত, গান-বাজনার আসর তো ছিলই। মন্মথর মা এসব বোধহয় তত পছন্দ করিতেন না। মনে আছে দিদিমাকে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার বাড়ীতে হিন্দুয়ানি বেশ বজায় আছে। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে নেই। আমাদের বাড়ীতে সব কিরিশ্চানী (খ্রীষ্টানী) কাণ্ড। আমার ভালো লাগে না ভাই। কিন্তু কি করব বল, ছেলে-মেয়েরা ওই চায়, উনিও ওই পছন্দ করেন। আমিও তাই ওই স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছি। ওদের সুখেই আমার সুখ।' অত্যন্ত স্নেহময়ী ছিলেন শুভঙ্করী। কাহাকেও কোন রূঢ়কথা বলিতেন না। রুখিয়া দাঁড়াইয়া কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা জোর করিয়া তাঁহার নিকট পয়সা আদায় করিত এবং সে পয়সা যথেচ্ছ ব্যয় করিত। ইহার ফল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালো হয় নাই। মন্মথর দুটি বোন ছিল, সোনা এবং রুপা। সোনা আমাদের অপেক্ষা বছর দুইয়ের ছোট ছিল। রুপা ছিল আরও ছোট। এই সোনা পাড়ার ছেলেদের মাতাইয়া তুলিয়াছিল সেই অল্প বয়সেই। সেই বয়সেই তাহার চোখে মুখে

যে প্রাণোচ্ছলতা দেখিয়াছি তাহা যুবতী-সুলভ, অত কম বয়সের মেয়ের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। সত্যই তাহার হাসিতে মাণিক এবং অশ্রুতে মুক্তা ঝরিত। ঝরণার সঙ্গে তাহার যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। চমৎকার গান গাহিত, চমৎকার ভঙ্গীতে কথা বলিত, চলনেও যেন একটা ছন্দ ছিল। মনে হইত যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। পোষাক-পরিচ্ছদেও নিত্য নূতন বৈচিত্র্য প্রকাশ করিত সে। নিত্য নূতন ধরনের খোঁপা বাঁধিত। যেদিক দিয়া যাইত সেদিক সৌরভে আকুল হইয়া উঠিত। রোজই নূতন ধরনের সৌরভ। তাহার আর একটা বৈশিষ্ট্য মনে পড়িতেছে। চলিবার সময় সামনের দিকে বরাবর চাহিয়া থাকিত না, ঘাড় ফিরাইয়া বার বার পিছনের দিকে চাহিত। আমি যখন মাইনর পাশ করি, তাহার কিছুদিন পরেই সোনা কুলে কালি দিয়া গৃহত্যাগ করে। কাহার সহিত করিয়াছিল জানি না। শুনিয়াছিলাম পরে সে নাকি কলিকাতার এক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীও হইয়াছিল। নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা আশ্চর্য কথাও মনে পড়িতেছে। যে মন্মথ নিজে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া যাত্রার দলে ভিড়িয়াছিল, সেই মন্মথই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এই ব্যাপারে। আমাকে প্রায়ই বলিত, 'ওকে যদি ধরতে পারি তাহলে গুলি করে মেরে ফেলব।' ধরিবার উদ্দেশ্যে দুই একবার কলিকাতা গিয়াওছিল কিন্তু সোনার নাগাল আর পায় নাই। কি নামে কোন্ রঙ্গমঞ্চে সে অবতীর্ণ হইতেছিল তাহা তাহার পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ছিল। শেষে শোনা গেল সে নাকি বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। সোনা চিরকালের মতো হারাইয়া গেল।

আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মামার একটি মেয়ে হইয়াছিল। দিদিমা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন কমলা। কমলা দেখিতে সুধীরের মতো সুন্দর হয় নাই। রং ফরসা ছিল কিন্তু গড়ন তেমন নিখুঁত ছিল না। মামীমার ভাই নকুল তাহার নাম দিয়াছিল থেবড়ি। এই নকুল বয়সে আমার অপেক্ষা কিছু ছোটই ছিল। তাই যদিও সে সম্পর্কে গুরুজন আমি তাহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিতাম। মামীমার পিতা পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। নকুলের মা-ও যখন মারা গেলেন তখন নকুল বাধ্য হইয়া তাহার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মামার সংসারে আর একটি পরিজন বাড়িল। নকুল ছিল চন্দরের সমবয়সী। নকুল, চন্দর এবং সুধীর দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেল। এই নকুল আমার এবং চন্দরের জীবনে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছে। তাহার প্রধান দোষ ছিল সে চুরি করিয়া খাইত। আচার চুরি করা তাহার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে ছিল। রোজই চুরি করিত। মামার রোগীরা প্রায়ই নানারকম খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, আম জাম পেয়ারা কলা, আচার, আমসত্ত্ব প্রায়ই আসিত। সন্দেশও আসিত মাঝে মাঝে। নকুল লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, ফাঁক পাইলেই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া কিছু-না-কিছু হাতাইয়া আনিত। মামীমা বুঝিতে পারিতেন ভাঁড়ার ঘর হইতে জিনিস সরিয়া যাইতেছে, ইহা লইয়া প্রায়ই তিনি বকাবকি করিতেন। প্রথমে তাঁহার সন্দেহ হইত নেত্যকে। কিন্তু পরে নকুলই তাঁহাকে একদিন গোপনে খবর দিল যে চন্দর এবং আমিই নাকি চুরি করিয়া খাই। মামীমা তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন, (যেহেতু নকুল তাঁহার ভাই) এবং খবরটি তুলিয়া দিলেন মামার কানে। মামা একদিন যাচ্ছেতাই করিয়া বকিলেন আমাকে। সেদিন আমি যে

কি অপমানিত বোধ করিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমার যেন মাথা কাটা গিয়াছিল। আমার আরও বেশী লাগিয়াছিল কারণ মামার নুনের গোলার কয়েকজন ব্যাপারী সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহারা মামার খোশামোদ করিত। একজন বলিল, 'আপনি বৃথাই রাগ করছেন ডাক্তারবাবু, কালটি যে কলি।' আর এক জন ফোড়ন দিল, 'এদিকে তো ছেলেটি দেখতে ভালোমানুষের মতো, ওর ভিতর এমন জিলিপির প্যাঁচ আছে বাইরে থেকে তা তো বোঝা যায় না।' আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই। প্রতিবাদ করিলে ব্যাপারটা আরও জানাজানি হইয়া যাইবে, বাবার কানে যদি ওঠে তিনি কি মনে করিবেন. এই সব ভয়ে আমি অবনতমস্তকে এই অন্যায় বকুনি নীরবে হজম করিয়া গেলাম। কিন্তু ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল না। দোষটা পরের ঘাড়ে চাপাইবার সুযোগ পাইয়া নকুলের সাহস এবং স্পর্ধা বাড়িয়া গেল। নকুলের অপরাধে মামীমা একদিন চন্দরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভাঁড়ারঘর হইতে একবাটি সর নাকি অন্তর্ধান করিয়াছিল। চন্দর তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল। দিদিমা তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চন্দর কাঁদছে কেন অমন করে। কোথাও পড়ে টড়ে গেল নাকি।' নেত্য বলিল, 'ভাঁড়ারঘর থেকে সর চুরি করে খেয়েছে বলে মা মেরেছেন।' এই কথায় যেন বারুদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। দিদিমা বাঘিনীর মতো হুংকার করিয়া উঠিলেন।

'চন্দর চুরি করে খেয়েছে? কে দেখেছে ওকে খেতে। ও তো সেরকম ছেলে নয়। ও চুরি করেছে?'

সুধীর কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, 'মেজদা খায়নি ঠাকুমা। মামা খেয়ে মেজদার নামে লাগিয়েছে।'

আর যায় কোথা! দিদিমা তখনই মামীমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'তুই চন্দরকে মেরেছিস কেন! ও কত বড় বংশের ছেলে জানিস? ও কখনও চুরি করে খেতে পারে। চুরি করেছে তোর ভাই। হা-ঘরে লক্ষ্মীছাড়া বংশের ছেলে কিনা তাই ছুং ছুং করে বেড়াচ্ছে চারদিকে। শক্তিকে আজই বলছি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিক ওকে। দুধ কলা দিয়ে ওসব কালসাপ পোষবার দরকার নেই।'

দিদিমা কিন্তু কথাটা মামার কানে তোলেন নাই। তাঁহার হয়তো মনে হইয়াছিল নকুল অনাথ এবং নিরাশ্রয়, তাহাকে দূর করিয়া দিলে সে যাইবে কোথায়। মামীমা দিদিমার এই বকুনি নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন বটে—দিদিমার মুখের উপর কেহ কথা বলিতে সাহস করিত না, এমন কি মামাও না—কিন্তু ইহার পরিণাম আমাদের পক্ষে শুভ হইল না। আমাদের প্রাপ্য দুধ ক্রমশঃ বেশী জোলো হইতে লাগিল, যে ডাল আমরা খাইতাম তাহাতে ফ্যানের অংশ এত বেশী থাকিতে লাগিল যে তাহা অনেক সময় ডাল বলিয়া চেনাই যাইত না। যে বাসী রুটি আমাদের জলখাবার ছিল তাহাতে আগে একটু-আধটু ঘি মাখানো থাকিত এখন ক্রমশঃ তাহা স্নেহহীন হইয়া রুক্ষমূর্তি ধারণ করিল। নকুল সুধীর কমলা এক পঙ্‌ক্তিতে আমাদের সঙ্গে খাইতে বসিত বটে, কিন্তু মাছের পেটিটা বা তরকারির ভালো অংশটুকু উহাদের পাতেই পড়িত। আমাকে এবং চন্দরকে মাছের কাঁটাকুটি অথবা তরকারির দুই একটা আলু পটল এবং ঝোল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। একদিন দেখিলাম মামীমা নকুলকে এবং সুধীরকে আলাদা ডাকিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। আমি সবই বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু চন্দর পারিত না।

একটু বড় হইয়া কিন্তু সে-ও বুঝিল এবং আমার মতো সে-ও সহ্য করিতে লাগিল। যে সব ছেলে-মেয়েরা পরের বাড়ীতে মানুষ হয় তাহাদের চরিত্রে এই সহনশীলতা স্বতঃই যেন স্বাভাবিক গুণরূপে বিকশিত হয়। সসংকোচে বিনা প্রতিবাদে অন্যায় অবিচার সহ্য করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া পড়ে। প্রতিবাদ করিয়া কোন লাভ নাই ইহাও তাহারা যেন উপলব্ধি করে। বনের পাখীরা বন্দী হইয়া ক্রমশঃ পিঞ্জরজীবনেই নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লয়। পরাশ্রিত বালক-বালিকারাও অবাঞ্ছিত পরিবেশকেই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লয়। ছেলেবেলায় পিতামাতার স্নেহনীড়ই শিশুদের একমাত্র আপন স্থান। অন্য যে-কোন আশ্রয়, তাহা যত নিকট আত্মীয়ের গৃহেই হোক না কেন, তাহাদের কাছে পর-বাস। পরে আমার নিজের সংসারেও আমাকে অনেক আত্মীয় বালক-বালিকাকে আশ্রয় দিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমিও তাহাদের এই গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পারি নাই। কারণ সংসার আমার একার নহে, সংসারে একাধিক লোক শাসন করে এবং সে শাসন অনেক সময় হিতকারী হইলেও পরাশ্রিতদের চক্ষে অত্যাচার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরকে আপন করা সত্যই বড় কঠিন। তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেও অনেক সময় তাহার মনে হয় যে লোক-দেখানো লৌকিকতা করা হইতেছে। পরকে আপন করিতে পারে অকৃত্রিম ভালোবাসা, কিন্তু সে ভালোবাসা দুর্লভ। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে প্রত্যেকেই নিজের কোলের দিকে ঝোল টানিতে ব্যস্ত সেখানে স্বার্থপরতার নানা মূর্তিই প্রকট, বাড়ীর কর্তা এবং কর্ত্রী যদি পরার্থপরও হন তবু তাঁহারা নীচতার গ্লানি হইতে আশ্রিত অসহায় বালক-বালিকাদের রক্ষা করিতে পারেন না, মামার সংসারে মামা এবং দিদিমা আমাদের সহায় ছিলেন, দিদিমা স্নেহ-বশে এবং মামা কর্তব্যবোধে, কিন্তু তবু মামীমার ব্যবহার আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রায় প্রত্যহ আঘাত করিত। ক্রমশঃ সে অনুভূতির সূক্ষ্মতা আর রহিল না, আঘাতের পর আঘাত খাইয়া তাহা লুপ্ত হইয়া গেল। বাড়ীতে নকুলের প্রতিপত্তিই বাড়ীতে লাগিল। ভাগনার অপেক্ষা শালার প্রতিপত্তি বেশী হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। নকুল খুব খারাপ লোকও ছিল না। সে চন্দরকে খুব ভালোবাসিত এবং আমাকে, কেন জানি না, সমীহ করিত। একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। একদিন সে পাঠশালা হইতে আসিয়া বলিল, 'চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি। সেখানে মজার ব্যাপার আছে একটা।' আমি বৈকালে সাধারণতঃ কোথাও যাইতাম না। 'হোম টাস্‌ক্‌' থাকিত, বৈকালে বসিয়া সেইগুলিই করিতাম। মামীমা সন্ধ্যাবেলাই সব ছেলেদের খাওয়াইয়া দিতেন। খাইবার পরই ঘুমে আমার চোখ জড়াইয়া আসিত। তাই বৈকালেই আমি হোম টাস্‌ক্‌' সারিয়া রাখিতাম। সেদিন শনিবার ছিল, পরদিন ছুটি, নকুলের সহিত গঙ্গার ধারে যাইবার কোন বাধা ছিল না। গঙ্গার ধারে গিয়া দেখিলাম নকুলের প্রিয়তম বন্ধু ট্যারা নগেনও বসিয়া আছে। এই নগেনই উত্তরকালে নকুলের ব্যবসায়ের অংশীদার হইয়াছিল। নকুল আমাদের বলিল, 'তোরা ব'স আমি আসছি।' কাছেই একটা পোড়ো নীলকুঠি ছিল, আমাদের বসাইয়া নকুল সেই দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই সে চটের একটি থলি লইয়া ফিরিল। থলির ভিতর বড় বড় পাকা পেয়ারা ছিল। ইতিপূর্বে অত বড় পেয়ারা আমি দেখি নাই। নকুল আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া পেয়ারা দিয়া নিজে একটি লইল। আমি সবিস্ময়ে ফলটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলাম। নকুল বলিল, 'আরে দেখছ কি, কামড় দাও, পেয়ারা কাশীর পেয়ারা। তাড়াতাড়ি শেষ

করে ফেল, কেউ দেখতে পেলে মুশকিল হবে।' আমি আরও অবাক হইয়া গেলাম। কাশীর পেয়ারা এখানকার নীলকুঠিতে আসিল কি করিয়া। সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে নকুল ধমকাইয়া উঠিল, 'আরে আগে খেয়ে ফেল না। পরে সেসব শুনো।' পরে শুনিয়াছিলাম। নগেনের বাবা ছিল রেলে ট্রানশিপমেণ্টের মালবাবু। নগেন প্রায়ই স্টেশনে যাইত। গতকল্য সে দেখিয়া আসিয়াছিল এই পেয়ারাগুলি চালান যাইতেছে। অনেকগুলি ঝুড়ি প্ল্যাটফর্মে বসানো রহিয়াছে। নকুল এ খবর পাইবামাত্র স্টেশনে চলিয়া যায়। একটা ঝুড়ি ভাঙা ছিল, নকুল এ সুযোগ উপেক্ষা করে নাই। ইহার জন্য নকুলকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কারণ 'চুরি' জিনিসটা তখন খুব ঘৃণ্য ছিল না। রেলের বাবুরা, পুলিস কর্মচারীরা প্রায় প্রকাশ্যেই চুরি করিত। পরের বাগান হইতে আম কাঁঠাল কলা মুলো চুরি করাটাই রেওয়াজ ছিল। যে সব ছেলে ইহা করিতে পারিত, তাহাদের পিতা মাতারা সেটা ছেলেদের বাহাদুরি বলিয়া গণ্য করিতেন, চোর বলিয়া তাহাদের শাসন করিতেন না। তাই সেদিন গঙ্গার ঘাটে নকুলকে আমি চোর বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি নাই। বরং তাহার চোরাই মাল সে যে আমাদের ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে ইহাতে সেদিন আমার বালক-হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেদিন বুঝিয়াছিলাম এবং তাহার পর হইতে সারাজীবন এ ধারণা আমার অটুট ছিল যে নকুল নিজে যাহাই হোক সে আমাকে ভালোবাসে। নকুল পড়াশোনায় মোটেই ভালো ছিল না, কিন্তু মাস্টার পণ্ডিতরা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। নকুল নানাভাবে তাঁহাদের সেবা করিত। গিরীন মাস্টারের বাড়ীর বাজার করিয়া দিত সে। খুব ভালো বাজার করিতে পারিত। মামীমাও তাহাকে বাজারে পাঠাইতেন। এইজন্য সকাল বেলাটা তাহার পড়াশোনায় না কাটিয়া বাজারে বাজারেই কাটিত। আর সন্ধ্যার পর তাহার ঘুম পাইত। বৈকালেও সে বাড়ীতে থাকিত না। শুনিয়াছিলাম বৈকালে সে বিরজা পণ্ডিতের কাছে পড়িতে যায়। কিন্তু রাজেন আসিয়া একদিন যে খবরটি ফাঁস করিল তাহা ভয়ানক। সে নাকি স্বচক্ষে একদিন নকুলকে গাঁজা সাজিতে দেখিয়াছে। বিরজা পণ্ডিত যে গাঁজা খান একথা সুবিদিত ছিল, তাঁহার ছাত্র নকুল প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে গাঁজা সাজিয়া দিতে পারে কিন্তু খবরটি শুনিয়া সকলে, বিশেষতঃ মামীমা, বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন কথাটা যেন মামার কানে না ওঠে। রাজেনকেও তিনি অনুনয় করিলেন। রাজেন বলিল, 'আমি নিজে থেকে যেচে কিছু বলব না, কিন্তু মামা যদি আমাকে জিগ্যেস করেন তাহলে আমাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। মিথ্যে কথা কি বলা যায়!

এই রাজেন ছেলেটিরও বৈশিষ্ট্য ছিল। সে-ও ছিল ডি. টি. এস. আপিসের বড়বাবু জগন্ময় রায়ের ভাগ্নে। আমাদের দলে তিনটি 'ভাগ্নে' তখন সাহেবগঞ্জে একত্রিত হইয়াছিল। আমি, চন্দ্রসুন্দর এবং রাজেন। রাজেনের ছিপছিপে পাতলা চেহারা, ধপধপে ফরসা রং। চোখ দুটি টানা-টানা এবং রক্তাভ। সে-ও কম দুষ্ট ছিল না। নেত্য ভীতু বলিয়া প্রায়ই সে তাহাকে ভয় দেখাইত। নেত্য যেখানে বসিয়া বাসন মাজিত সেখান হইতে একটি আমড়া গাছ দেখা যাইত। রাজেন সর্বাঙ্গে সাদা চাদর জড়াইয়া অন্ধকারে সেই আমড়া গাছে উঠিয়া নেত্যকে ভূতের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। আর একবার একটা ভীষণ মুখোশ পরিয়া হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে আসিয়া হাজির। আমরা খাইতে বসিয়াছিলাম, সকলে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,

মামীমা পর্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। হঠাৎ রাজেন মুখোশটা খুলিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, 'ছিঃ, তোমরা এত ভীতু! এটা যে মুখোশ তা বুঝতে পারলে না!' তাহার কণ্ঠস্বর শান্ত ছিল বটে, কিন্তু চোখ দুইটি কৌতুকে হাসিতেছিল। ইহা তখন তাহার নিকট তুচ্ছ খেলামাত্র ছিল, কিন্তু আজ ভাবিয়া দেখিতেছি এই খেলাই সে পরে সারা-জীবন খেলিয়াছে। বার বার সে নিজের এবং অপরের মুখোশ খুলিয়া বলিয়াছে,— আরে দূর্, মুখোশ দেখে ভুলছো কেন। এটা যে মুখোশ, মুখোশের আড়ালে যে আছে তাকেই দেখ। রাজেন পরে যে আধ্যাত্মিক-জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বাল্যকালের এই মুখোশের খেলা, ভূতের ভয় দেখানো প্রভৃতি যেন তাহারই সূচনা। বাল্যকালে তাহার আর একটা বৈশিষ্ট্যও সকলকে আতঙ্কিত করিত। অত্যন্ত নির্ভীক ছিল সে। উঁচু ছাতের আলিসার উপর নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, বড় বড় গাছের মগ-ডালে উঠিতে তাহার বিন্দুমাত্র ভয় করিত না। এখন আমার মনে হয় এসবের মূলে ছিল তাহার ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস। বাবাকেও খুব ভক্তি করিত সে। বাবা যখন মন্দিরে কালীপূজা করিতেন তখন প্রায়ই সে তন্ময় হইয়া বসিয়া পূজা দেখিত। তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত না এই বালকই গঙ্গার ঘাটে মাঝিদের নৌকা খুলিয়া দেয়, বা গাছে চড়িয়া নেত্যকে ভূতের ভয় দেখায়।

মাইনর স্কুলে পড়িবার সময়ই আমাদের উপনয়ন হইয়াছিল, আমার, চন্দরের এবং নকুলের। রাজেনেরও প্রায় সেই সময়ে হইয়াছিল। উপনয়নের পর আমি মাত্র এক বৎসর নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়াছিলাম। তা-ও মামার ভয়ে। কিন্তু চন্দরের এ বিষয়ে অস্বাভাবিক একনিষ্ঠতা দেখিয়া দিদিমা ভয় পাইয়া গেলেন। চন্দর ওই অল্প বয়সেই পদ্মাসনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম করিত। শোনা গেল রাজেনও নাকি তাহাই করে। এ বিষয়ে রাজেনই নাকি চন্দরের আদর্শ। উভয়েই মোটা টিকি রাখিয়াছিল, উভয়েরই মাছ-মাংসের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিতেছিল। আমাদের ভাগে মাছ-মাংস যে খুব বেশী পড়িত তাহা নয়, কিন্তু দু'এক খানা যাও বা পড়িত, তাহাও চন্দর খাইত না, পাতে ফেলিয়া রাখিত। বলিত, তাহার ভালো লাগে না। এই সব শুনিয়া দিদিমা ঘাবড়াইয়া গেলেন। নেত্য এক দিন দিদিমাকে বলিল, 'রাজেনের যে রকম হাবভাব দেখছি ও শেষকালে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। রোজ নাকি ও আর চন্দর গঙ্গার ধারে বসে হরিনাম সংকীর্তন করে। আমার ভয় হচ্ছে রাজেনের সঙ্গে মিশে চন্দরও না শেষকালে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।' দিদিমা আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল চন্দর নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে। একথা বলিতে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। দিদিমা তখন নকুলের শরণাপন্ন হইলেন। নকুলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মতো লোককেও কার্যোদ্ধারের জন্য বানরের খোশামোদ করিতে হইয়াছিল। নকুলও রোজ সন্ধ্যাহ্নিক করিত, তাহারও রাজেনের সহিত ভাব ছিল। চন্দরের সহিত তো ছিলই। তাই দিদিমা বোধহয় ভাবিলেন নকুল চেষ্টা করিলে চন্দরকে রাজেনের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারিবে। নকুল অবশ্য সাড়ম্বরে সন্ধ্যাহ্নিক করিত আধ্যাত্মিক প্রেরণাবশে ততটা নহে যতটা মামাকে খুশী করিবার জন্য। রাজেনের উপর তাহার প্রেমও যে গভীর ছিল তাহা নহে কিন্তু দিদিমা এত সব জানিতেন না। তিনি একদিন নকুলকে বলিলেন, 'তুই আর চন্দর রাজেনের সঙ্গে অত মিশিস কেন। বেড়াবার জন্যে গঙ্গার ধারেই বা

যাওয়ার দরকার কি তোদের। বাড়ীর পিছনেই তো অতবড় মাঠ রয়েছে, সেখানে বেড়ালেই হয়, রাজেনের সঙ্গে অত ঘোরা কেন ? যা শুনেছি তাতে মনে হয় ও ছেলেটা শেষকালে বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা গরীবের ছেলে—তোমাদের ওসব হুজুকে মাতলে তো চলবে না। শক্তি তোমাদের আশ্রয় দিয়েছে, তার আশ্রয়ে থেকে তোমরা আখেরের কাজটি গুছিয়ে নাও। লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার কর, তবেই না তোমার মায়ের দুঃখ ঘুচবে। সন্ন্যাসী হবার কি এই বয়েস ?' চতুর নকুল বলিল, 'রাজেন আমাদের গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে চানাচুর কিনে খাওয়ায়। সেই লোভেই যাই আমরা। বেশ, আর যাব না।' নকুল যাহা প্রত্যাশা করিতেছিল দিদিমা সেই উত্তরই দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'বেশ আমি তোদের রোজ দুটো করে পয়সা দেব, এইখানেই চানাচুর কিনে খাস। চানাচুর খাওয়ার জন্যে গঙ্গার ধারে যাওয়ার দরকার কি, রাজেনের সঙ্গেই বা মেশবার দরকার কি। আমি তোমাদের চানাচুর খাওয়ার পয়সা দেব।' নকুল দিদিমার নিকট হইতে রোজ দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া যাইত। ইহাতেও কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। দিদিমাকে পাড়ার আর একটা ছেলে আসিয়া খবর দিল যে চন্দর রাজেনের সহিত গঙ্গার ঘাটে যাইতেছে না বটে, কিন্তু পাহাড়তলিতে যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, সেখানে যে গুহাটা আছে, তাহার মধ্যে দুইজনে ঢুকিয়া কি যেন করে। দিদিমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। পাহাড়তলির সে গুহা যে সাংঘাতিক গুহা। নানারকম বদনাম ছিল গুহাটার। কেহ বলিত উহার মধ্যে একটা বাঘ থাকে, কেহ কেহ একটা সাপও নাকি দেখিয়াছে সেখানে। একটা অঘোরপন্থী উলঙ্গ সাধু যে ওখানে কিছুদিন ছিল একথা তো সুবিদিত। সে ভয়ংকর লোক ছিল। শ্মশান হইতে আধপোড়া মড়া চুরি করিয়া আনিয়া আহার করিত। তাহাকে অনেকে মড়ার মাথার ঘিলুও খাইতে দেখিয়াছে। এই ভয়ংকর গুহায় রাজেন চন্দরের সহিত গিয়া কি করে ? চন্দরকে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। নকুল বলিল, 'ওরা গুহার ভিতরে বসে যোগ করে। নাক টিপে দম বন্ধ করে বসে থাকে। আমি যাই না ওদের সঙ্গে।' দিদিমা শেষে 'বিষস্য বিষমৌষধম্' এই নীতি অনুসরণ করিয়া রাজেনকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজেন আসিলে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'শুনলুম, তুই আর চন্দর পাহাড়তলির গুহায় যাস ! কি করিস সেখানে গিয়ে ?' রাজেন বলিল, 'এমনি বেড়াতে যাই, বেশ নির্জন জায়গাটা। ওখানে বসে থাকতে ভালো লাগে।' দিদিমা বুঝিলেন, রাজেন আসল কথাটা কিছুতেই বলিবে না। তখন তিনি হঠাৎ রাজেনের দুই হাত ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'তোর হাতেই চন্দরকে সঁপে দিলাম আমি। ওর ভালো-মন্দের ভার তুই নে। আর যাই করিস, ওকে সন্ন্যাসী করিস না। আর তুইও দাদু সন্ন্যাসী হ'স না। সন্ন্যাসীদের বড় কষ্ট। জটা পরে, নেংটি পরে, ছাই মেখে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয় ওদের। ভিক্ষে করে খেতে হয়। গাঁজাও খেতে হয় শুনেছি। তোরা দুধের ছেলে তোরা কি এসব পারবি ? পারবি না। এ দুর্মতি তোর কেন যে হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি না। আজ আমায় কথা দিয়ে যা আর ও পথে পা বাড়াবি না। ও পথ তোদের পথ নয়। কথা দে আমাকে।'

রাজেন শুধু মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল, কিছু বলিল না। এক ছুটে পালাইয়া গেল। সে মাঝে মাঝে আসিয়া দিদিমাকে ভয় দেখাইত, 'তোমার কথা রাখতে

পাচ্ছি না দিদিমা। গিরীন মাস্টার বড্ড মারধোর শুরু করেছে। দেখছি সন্ন্যাসীই হয়ে যেতে হবে শেষকালে।'

আজ জীবনের সায়াহ্নে এই সব কথা স্মরণ করিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিতেছি। রাজেন বা চন্দর কেহই সন্ন্যাসী হয় নাই। রাজেন বার দুই এনট্রান্স ফেল করিয়া জীবিকার্জনের জন্য নানারকম কাজ করিয়াছে, যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছে, বহু পুত্রকন্যার জন্মদান করিয়া বিধিমত সংসার পাতিয়াছে তবে একথাও সত্য আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন তাহার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সংসার-আশ্রমে থাকিয়াও তপস্যা করিয়াছে সে। তাহার শান্ত সৌম্য মুখের দিকে চাহিলেই তাহা বোঝা যায়, অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, তাহার প্রদীপ্ত চোখের প্রশান্ত দৃষ্টিই তাহার সাক্ষী। এই আধ্যাত্মিকতা শেষে তাহার জীবনের আধিভৌতিক সমস্যারও সমাধান করিয়াছে। তাহার সাধনায় ও নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি ভক্ত জুটিয়াছে তাহার। রাজেন এখন গুরুগিরি করে। ভক্তদের দাক্ষিণ্যে তাহার সংসার বেশ সচ্ছল। শেষ বয়সে কিছুদিন আগে তাহার বাল্যকালের সন্ন্যাস রোগ আর একবার মাথা চাড়া দিয়াছিল। সংসারের গোলমালে অতিষ্ঠ হইয়া সে কোন একটা তীর্থস্থানে পলাইয়া গিয়াছিল নির্জনে তপস্যা করিবে বলিয়া। কিন্তু ইহাতেও সে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারে নাই। তাহার স্ত্রী পিছু পিছু গিয়া হাজির হইয়াছিল। বলিয়াছিল, 'তুমি নির্জনে এসে তপস্যা করলে তোমার ছেলে-মেয়েদের দেখবে কে। সংসার চলবে কি করে। দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি, একটা ছেলেও মানুষ হয়নি। তোমার জন্যেই ভক্তরা আসে, প্রণামী দেয়, সংসার চলে। তুমি সরে থাকলে আর তারা আসবে না। সংসার চলবে তাহলে কি করে?'—এই অতিশয় ন্যায়সংগত কথা শুনিয়া রাজেন প্রথমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছিল। রাজেন লোক ভালো। তাহার মুখেই গল্পটা শুনিয়াছি। এই কিছুদিন পূর্বে সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। এখনও সে আমাকে বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান দেয়। চন্দরের ইতিহাস একটু অন্যরকম। চন্দর লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছেলে ছিল। মাইনর স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। এনট্রান্স পরীক্ষাটাও পাশ করিয়াছিল, কিন্তু ফল তেমন ভালো হয় নাই। ধর্মচর্চাই তাহার উন্নতির অন্তরায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আধ্যাত্মিক পথে সে সত্যই কতটা অগ্রসর হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বাহিরের আড়ম্বরটা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিল, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। টিকি রাখিয়া মাছ মাংস পেঁয়াজ ত্যাগ করিয়াছিল, দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া রোজ পূজা করিত। কোথাও কোন সন্ন্যাসী বা গুরু আসিয়াছে খবর পাইলে সেখানেই গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ধর্ম-বিষয়ক কোন বক্তৃতা বাদ দিত না। অন্তরে সে কতটা ধার্মিক হইয়াছিল জানি না, কিন্তু বাহিরে সে যে ধর্ম-ধ্বজী হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চন্দর যখন মাইনর পাশ করে, আমি তখন ডাক্তারি পাশ করিয়াছি। মাইনর পাশ করিয়া সেকালে ক্যাম্বেল স্কুলে ভরতি হওয়া যাইত। আমার ক্যাম্বেল স্কুলে ভরতি হওয়ার কাহিনী আমি পরে লিখিব। এখন চন্দরের কথাটাই শেষ করিয়া রাখি। মাইনর পাশ করিয়া চন্দর যখন বৃত্তি পাইল আমি তখন খুবই উৎসাহিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম তুমি যতদূর পর্যন্ত পড়িতে পার পড়, আমি সব খরচ দিব। চন্দর মাইনর পাশ

করিয়া কলিকাতায় গিয়া ভরতি হইল। বোর্ডিংয়ে থাকিতে লাগিল। আমি তাহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতে লাগিলাম। শুধু টাকা নয়, তাহাকে প্রতি মাসে খাঁটি ঘি এবং মাথায় মাখিবার জন্য কবিরাজী তেলও পাঠাইতে হইত। দিদিমার আদেশেই এসব করিতাম। দিদিমার বদ্ধ ধারণা হইয়া গিয়াছিল চন্দরের মস্তিষ্কটা তেমন সবল নয়। তাহার উপর মাছ খায় না, শক্ত শক্ত বই পড়িতে হয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণায়াম করে, বোর্ডিংয়ের নিরামিষ খাওয়াও তেমন পুষ্টিকর নয়, দিদিমার নির্দেশে তাই আমি তাহার দুধ ও মাখনের জন্য অতিরিক্ত টাকাও পাঠাইতাম। সুবিধা পাইলে ঘি-ও পাঠাইতাম। এক কবিরাজ দিদিমাকে চ্যবনপ্রাশ সরবরাহ করিতেন। তাঁহার একটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখনও মনে আছে। তাহার পেটের ঠিক মাঝখানে একটা বড় আবের মতো ছিল। এখন মনে হয় খুব সম্ভবতঃ সেটি ভেণ্ট্রাল হার্নিয়া। তিনি শুধুগায়ে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁহার পেটের আবটা লইয়া মাতিয়া উঠিত। তিনিও হাসিমুখে প্রশ্রয় দিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের নামটা মনে নাই। 'কব্‌রেজ মশাই' নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। মাথায় চকচকে টাক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মুখখানি সর্বদাই হাসি-হাসি। মনে হইত একটা চাপা ব্যঙ্গও যেন সে হাসিতে উঁকি দিতেছে। তিনি দিদিমাকে বলিলেন, ছেলে-মানুষের মস্তিষ্ক তো সাধারণত দুর্বল হয় না, যদি হইয়াই থাকে একটা কবিরাজী তেল মালিশ করুক। দিদিমার আদেশে এক শিশি করিয়া এই তেলও আমি চন্দরকে পাঠাইতে লাগিলাম। কিন্তু লোকমুখে খবর পাইতাম চন্দর লেখাপড়ার পরিবর্তে সনাতন হিন্দু-ধর্ম-সংরক্ষণেই বেশী মন দিয়াছে। কলিকাতায় তখন ব্রাহ্মধর্মে খুব আড়ম্বর। সৎবংশের অনেক ভালো ছেলেরা তখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজে আলোড়ন আনিয়াছে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভব হইয়াছে একদল গোঁড়া সনাতনী-দলের। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ নেতাগণ তখন সনাতনী ধর্মের স্বপক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। চন্দর ইঁহাদেরই দলে ভিড়িয়া গেল। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষাটা কোন রকমে পাশ করিল, কিন্তু এফ. এ. (তখন আই. এ. র বদলে এফ. এ. ছিল) পরীক্ষাটা আর পাশ করিতে পারিল না। উপর্যুপরি ফেল করিতে লাগিল। আজকালকার আই এ. বা আই. এসসি. পরীক্ষার মতো এফ. এ. পরীক্ষা সহজ ছিল না। তখনকার এফ. এ ছাত্রদের বিজ্ঞানও পড়িতে হইত। চন্দর এই বিজ্ঞানেই ফেল করিতে লাগিল বার বার। অংকটা তাহার মাথায় কিছুতেই ঢুকিত না। প্রতিবারই দেখা যাইত যে ম্যাথামেটিক্‌স্‌-এ ফেল করিয়াছে। দিদিমা ইংরেজী জানিতেন না, ম্যাথামেটিক্‌স্‌কে তিনি বলিতেন 'লাঠালাঠি'। নকুল তাঁহাকে বুঝাইয়াও দিয়াছিল যে সত্যই নাকি ওই পরীক্ষায় পরীক্ষকদের সহিত লাঠালাঠি করিতে হয়। লাঠিখেলায় তাহাদের পরাস্ত না করিতে পারিলে পরীক্ষায় পাশনম্বর পাওয়া যায় না। চন্দর বার বার ফেল করাতে দিদিয়া খুব দমিয়া গিয়াছিলেন, বোধহয় মনে মনে একটু অপ্রস্তুতও হইয়াছিলেন। চন্দর যে হীরের টুকরো ছেলে একথা সুযোগ পাইলেই তিনি সকলকে শুনাইতেন। সেই চন্দর বার বার ফেল করিতেছে ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান আহত হইতেছিল। নকুলের কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন এবং আশ্বস্ত হইলেন। নিজেকে প্রবোধ দিবার সুযোগ পাইলেন। চন্দর ছেলেমানুষ, ভীতু, তাহার গায়ে কি অত জোর আছে; ও কি ষণ্ডা সাহেবদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিতে পারে। আমাকে

একদিন ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই ওকে আরও পাঁচটা করে টাকা পাঠা, ভালো ভালো খাবার কিনে খাক। গায়ে জোর না হলে লাঠালাঠিতে পারবে কেন সায়েবদের সঙ্গে।' দিদিমার এ ভুল আমি ভাঙাইয়া দিই নাই। মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া তিনি যদি সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন পান না, আমি সেটা ভাঙাইয়া দিব কেন। আমাকেও তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা তুই যে ডাক্তারি পাশ করলি তোকেও কি লাঠালাঠি করতে হয়েছিল?' বলিয়াছিলাম, 'না, ডাক্তারি পড়তে গেলে লাঠালাঠি করতে হয় না।' দিদিমা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাই আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তিনি কি এই অবিশ্বাস্য কথাটা সত্যই বিশ্বাস করিতেন? না, নিজের মনকে চোখ ঠারিয়া সত্যের মুখে মুখোশ পরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? এ রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে জানি স্নেহের বশবর্তী হইয়া মানুষ সব করিতে পারে। শাদাকে কালো বা কালোকে শাদা বলিতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না।

বাবা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজের সেতার, কালীপুজা এবং হরিণের সেবা লইয়াই থাকিতেন, মামার সংসারের সহিত নিজেকে কখনও জড়ান নাই, তবু তিনি সব খবর রাখিতেন। মাহিনা পাইবার পর মাসে তিনি একবার মামার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন দিদিমাকে টাকা দিবার জন্যে। আধঘণ্টার বেশী দিদিমার কাছে থাকিতেন না, কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মামার সংসারের স্বরূপ তাঁহার মনে আঁকা হইয়া যাইত। তিনি আসিলেই মামী গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু সে প্রণাম যে বাহ্যিক তাহা বাবার অগোচর ছিল না। মামীমাকে তিনি চিনিয়াছিলেন, অর্থাৎ মামীমা যে আমাদের হিতৈষী নন, আমাদের সম্বন্ধে তিনি যে ঈর্ষাপরায়ণ একথা বাবার অবিদিত ছিল না। কিন্তু ইহা লইয়া কাহাকেও তিনি একটি কথাও কখনও বলেন নাই। স্বভাবতঃই তিনি স্বল্পভাষী গম্ভীর লোক ছিলেন। আমার সহিতও তাঁহার ক্কচিৎ কথা হইত। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, 'চন্দরের জন্য আর তুমি অনর্থক টাকা খরচ কোরো না। কলকাতায় বেশী দিন থাকলে ও হুজুকে মেতে আরও নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে একটা চাকরি-বাকরি যোগাড় করে দাও বরং। তোমার দিদিমা বৃথা আশা করে আছেন ও ডেপুটি হবে। ওর আর কিছু হবে না। তুমি ওকে তোমার কাছেই ডেকে নাও। দিদিমার অনুরোধে কিন্তু তাহাকে আর এক বৎসর পড়াইতে হইল। কিন্তু তবু সে এফ. এ. পাশ করিতে পারিল না। খবর পাইলাম সে কোন এক গুরুর কাছে মন্ত্র লইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পর সে যখন আমার নিকট আসিল তখন তাহাকে লইয়া আমি মহা সমস্যায় পড়িলাম। তাহার ধর্মের আতিশয্য, তাহার আহ্নিক-প্রাণায়াম, তাহার নিরামিষ, পিঁয়াজ রসুনের গন্ধে অসহিষ্ণুতা, তাহার শুচিবাই আমাকে বড়ই বিব্রত করিতে লাগিল। সকলেরই মনে হইতে লাগিল সে যেন একটা বহুমূল্য কাচের পুতুল—সামান্য টোকা লাগিলেই ভাঙিয়া যাইবে।

আমার ডাক্তারি পড়িবার কাহিনীটাও অদ্ভুত। অনেকে ইহাকে আকস্মিক যোগাযোগ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ইহার মধ্যে ভগবানের হাত ছিল। পৃথিবীতে কোন কিছুই আকস্মিক নয়, যাহা ঘটে তাহা ভগবানের বিধানেই ঘটে।

আমি চন্দরের মতো ভালো ছেলে ছিলাম না। তবে কখনও ফেল করি নাই। স্কুলের শিক্ষকেরা আমার সম্বন্ধে কখনই উচ্চাশা করিতেন না। স্কুলে 'গবেট' 'গবা-কান্ত' এই সবই আমার নাম ছিল। আমি যে মাইনর পাশ করিতে পারিব ইহাও কেহ আশা করেন নাই। মাইনর পাশ করিবার পর আমি যে বিদেশে এনট্রান্স পড়িতে যাইব এ কল্পনাও আমি করিতে পারিতাম না। মামা ঠিক করিয়াছিলেন মাইনরের শেষ পরীক্ষা দিয়া আমি তাঁহার নুনের গোলায় খাতা লিখিব। সেইজন্য মামা, কার্তিক মামা প্রায়ই আমাকে বলিতেন, হাতের লেখাটা ভালো কর। আর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ভালো করিয়া শিখিয়া লও। পারো তো শুভংকরীটাও আয়ত্ত করিয়া ফেল। ব্যবসার কাজ করিতে গেলে ওইগুলাই বেশী দরকার। আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। কি আর বলিব। দরিদ্রকে নীরব হইয়াই থাকিতে হয়। বাবা যে আমাকে বিদেশে বোর্ডিংয়ে রাখিয়া পড়াইবেন সে রকম অবস্থা তাঁহার ছিল না। নিজের খরচ বাদে তাঁহার উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত সম্ভবতঃ তাহা তিনি আমাদের খরচের জন্য দিদিমার হাতে দিতেন। দিদিমা বোধহয় সেটা দিতেন মামীমার হাতে। মামীমা বলিতেন বাবা যাহা দেন তাহাতে আমাদের কুলায় না। একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় বান্ধবী হিরি গয়লানীকে যাহা বলিতেছিলেন তাহা আড়াল হইতে আমি শুনিয়াছিলাম। বলিতেছিলেন, 'ঠাকুরজামাই তাঁর ছেলেদের জন্য দু'পাঁচ টাকা দেন বটে কিন্তু দু'দুটো ছেলের খরচ কি ওতে কুলোয়? তুমিই বল না। ও শুধু লোক-দেখানো দেওয়া। আমরাও মান্যি করে উনি যা দেন তাই নি। কিন্তু ওতে সংসারের সুসোর হয় না কিছু, ওঁর মান রক্ষেটা হয়।' গয়লানী নাপিতানী লোকেরাই মামীমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তাহাদের সহিতই তিনি প্রাণের কথা কহিতেন। মামীমার আর একটি ছেলে এবং আর একটি মেয়ে হইয়াছিল। খোকন আর নন্তি। খোকনের ভালো নাম সুনীল, নন্তির ভালো নাম কুসুম। ইহারাও আমাদের খুব প্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু মামীমা ক্রমশঃ যেন আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। ইহার একটা কারণ বোধহয় সুধীর ক্লাস-প্রমোশন পাইতেছিল না। মামীমার ধারণা হইয়াছিল আমরা বাড়ীতে আছি বলিয়া সুধীরের লেখাপড়ায় অসুবিধা হইতেছে। আমরা না থাকিলে সুধীরের জন্য তিনি আলাদা প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা থাকিতে সুধীরের জন্য আলাদা টিউটার নিযুক্ত করা দৃষ্টিকটু। নকুলের নানারকম দৌরাত্ম্যও তাঁহার অশান্তির কারণ হইয়াছিল। নকুলের দুষ্কৃতি তিনি প্রথম প্রথম গোপন করিতে চাহিতেন, কিন্তু শেষে আর গোপন করা সম্ভব ছিল না। নকুল বাড়ীর বাহিরেও নানারকম দুষ্টামি করিত। মামার অনেক ব্যাপারীরা ভাত রাঁধিয়া খাইতেন। নকুল দূর হইতে ঢিল ফেলিয়া তাঁহাদের ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি ভাঙিয়া ছুটিয়া পলাইত। ইহাতে বিশেষ একটা আনন্দ পাইত সে। একদিন ধরা পড়িয়া মামার হাতে খুব মার খাইল। বাড়ীতে একটা অশান্তির ঝড় বহিয়া গেল। মামীমা সমস্ত দিন কান্নাকাটি করিলেন। কিন্তু ইহার শেষ ফল ভুগিতে হইল আমাকে এবং চন্দরকে। মামীমা আমাদের উপর আরও চটিয়া গেলেন। তাঁহার কথার ঝাঁজে এবং অগ্নিদৃষ্টির ঝলকে আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

এই সব অশান্তির মধ্যেই আমাকে মাইনর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আশা করিতে পারি নাই যে পাশ করিয়া যাইব। কিন্তু ভগবানের দয়ায় পাশ করিয়া গেলাম।

আমাদের মধ্যে খোঁড়া অশ্বিনীর ফল সর্বাপেক্ষা ভালো হইয়াছিল। জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিল সে। অশ্বিনীর বাবা নৃসিংহবাবু রেলে বড় চাকুরি করিতেন, অনেক বাঙালী ছেলের চাকুরি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিল। অশ্বিনীর পাশের খবর বাহির হইবার পর সমস্ত শহরেই একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তাহাদের বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হইল। অশ্বিনী আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু আমি লজ্জায় আর যাই নাই। শুনিলাম অশ্বিনী কলিকাতায় পড়িতে যাইবে, হেয়ার স্কুলে ভরতি হইবে, নৃসিংহবাবু তাহার জন্য নাকি সাহেব মাস্টার রাখিয়া দিবেন। অশ্বিনী ভালো ছেলে, তাহার বাবা বড়লোক, মনে হইল যাহা ঘটিতেছে তাহা ঘটাই স্বাভাবিক এবং উচিত। তবু আমার কেমন যেন হিংসা হইতে লাগিল। অশ্বিনীর সৌভাগ্যে একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম! মামার নুনের গোলায় বসিয়া হিসাবের খাতা লিখিতে হইবে আমার এই সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যেন আসন্ন মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার মতো আমার মনের দিগন্তকে অন্ধকার করিয়া রাখিল। বার বার মনে হইতে লাগিল ইহা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে। আমরা যে গরীব, নিতান্ত গরীব। আমরা যে গরীব এই কথাটাই একটা বেদনার মতো সমস্ত সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। অশ্বিনীর বাড়ীতে আমাদের বাড়ীর সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আমি আমাদের বাড়ীর পিছনকার সরু গলিটা দিয়া অন্ধকারে বাবার বাসার দিকে চলিয়াছিলাম। বাবা এবং বিষ্ণুপ্রসাদ এই সময়ে সেতার বাজাইতেন! আমার মতলব ছিল বাবার ঘরের পাশের ঘরে বিষ্ণুপ্রসাদের যে বিছানাটা আছে তাহাতেই গিয়া লুকাইয়া থাকিব। এই সময় বাবা বিষ্ণুপ্রসাদকে সেতার শিখাইতেন। আমি আস্তে আস্তে গিয়া উঠানে উপস্থিত হইলাম। পাশের ঘরে বাজনা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। বাবা বাজাইতেছিলেন, বিষ্ণুপ্রসাদ সঙ্গত করিতে-ছিল। আমি আস্তে আস্তে ঢুকিয়া বিষ্ণুপ্রসাদের বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে হইল আমি যেন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, যে রাজ্যে হিংসা, মলিনতা, দারিদ্র্য কিছুই নাই, আছে কেবল সুর আর ছন্দ যাহা ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলকেই আনন্দিত করে। সুরের পরিবেশে আমার মনের গ্লানি ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। বিষ্ণুপ্রসাদের ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি গান-বাজনা থামিয়া গিয়াছে।

"ও সুরজবাবু, চলো চলো। ওস্তাদজি তোমাকে ডাকছেন।"

পাশের ঘরে বাবা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে এসে শুয়েছ যে।"

আমি কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

"কি হয়েছে বল না।"

"আমার আজ অশ্বিনীদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু আমি সেখানে যাই নি, তাই এখানে এসে শুয়েছি। ও বাড়ীতে শুলে দিদিমা জোর করে পাঠিয়ে দিতেন।"

"অশ্বিনী তো তোমার বন্ধু, গেলে না কেন।"

আমি আনতনয়নে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমার বড় লজ্জা করছিল। অশ্বিনী ভালো করে পাশ করেছে, কলকাতায় পড়তে যাবে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যাব।"

"তুমিও তো পাশ করেছ। তোমার লজ্জা পাবার কি আছে? এবার তুমি কি করবে ঠিক হয়েছে কি?"

"মামা বলছেন গোলার খাতা লিখতে—"

আমার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল, চোখেও বোধহয় জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

"গোলার খাতা লিখবে কেন। তুমিও পড়বে।"

"মামা বলছেন আমাকে আর পড়াবেন না।"

"আমি পড়াব। বিষ্ণু, পারব না?"

"খুব পারব। আপনার পাসবুকে পাঁচশ পঁচিশ টাকা জমিয়ে রেখেছি আমি।"

বিষ্ণুপ্রসাদের এই উক্তি শুনিয়া বাবাও একটু অবাক্ হইয়া গেলেন। আমার বিস্ময় তো সীমা ছাড়াইয়া গেল। সেকালে পাঁচশ পঁচিশ টাকা যে অনেক টাকা! বাবার কাছে এত টাকা সঞ্চিত আছে ইহা যে কল্পনাতীত। বাবা বলিলেন, "এত টাকা তুমি কোথায় পেলে বিষ্ণু?"

"আপনার শাগরেদ-শিষ্যরা মাঝে মাঝে যে টাকা আপনাকে প্রণামী পাঠায় সে টাকা তো সবই জমে। আমি আপনাকে সে কথা জানাইও না, তার থেকে একটি পয়সা খরচও করি না, চুপচাপ পোস্টাফিসে জমিয়ে রাখি—"

"তার থেকে কিছু খরচ কর না? আমার সংসার চলে কি করে তাহলে—"

বিষ্ণুপ্রসাদ এই প্রশ্নটির জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত তাহার পর বলিল, "আপনি মাইনে পেয়ে সব টাকাই তো আমার কাছে দিয়ে দেন। তার থেকে যে টাকা আপনি নানীকে (দিদিমাকে) দিয়ে আসেন, তাই খরচ হয়। বাকিটাও আমি পোস্টাফিসে জমিয়ে রাখি—"

"কি মুশকিল, আমার সংসার চলে কি করে? বাজারে ধার জমাচ্ছ নাকি।"

"না। বাজারে এক ছিদাম ধার নেই। আপনি যদি অভয় দেন সব কথা খুলে বলি। আমার কিছু ক্ষেতি গিরস্তি আছে। আমার জমিতে ভালো বাসমতী ধান হয়। সেই ধান থেকেই আমাদের চাল হয়। বছরে একশ মণ। আমি সেই চাল আপনার জন্যে নিয়ে আসি। আপনি তো মাত্র একবেলা খান। বছরে তিন চার মণ চাল হলেই যথেষ্ট। আমি গুরুদছছিনা (দক্ষিণা) হিসাবে পাঁচ মণ চাল আপনার জন্যে আলাদা করে রাখি। আপনি যদি রাগ করেন এই ভয়ে কিছু বলিনি। অযোধ্যাবাবুর মন্দির থেকে আপনার সেবার জন্যে মহাপ্রসাদ আর 'কারণ' আসে। ওর জন্যে এক পয়সা খরচ হয় না। আর সবজি তো এই বাড়ীর আংনাতেই (উঠোনে) যা হয় তাই যথেষ্ট। আমার বাড়ী থেকে ঘি-ও আমি আপনার জন্যে নিয়ে আসি—"

বাবা মাথা হেঁট করিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি তোমার পোষ্য হয়ে থাকতে চাই না বিষ্ণুপ্রসাদ। তোমার চালের আর ঘিয়ের দাম তুমি ওই জমানো টাকা থেকে কেটে নাও।"

"আপনি যা হুকুম করবেন তাই হবে। কিন্তু আপনি যে আমাকে এত মেহনত করে সেতার শেখাচ্ছেন, তার একটা—"

"আমি বিদ্যা বিক্রয় করি না।"

"না, আমি দাম দিচ্ছি না। আমি জানি ওর দাম দেওয়া যায় না। সে তাগতও আমার নেই। আমি কিছু দছছিনা দিতে চাই শুধু—"

"তোমার শিক্ষা শেষ হলে দক্ষিণা দিও। এখনও তো তুমি কিছুই শেখনি। এর মধ্যেই দক্ষিণার কথা ভাবছ কেন। আচ্ছা কে কে তোমাকে টাকা পাঠিয়েছে তাদের নাম কি মনে আছে তোমার? মনি-অর্ডার তুমিই সই করে নিতে।"

"জি হাঁ। ফর দিয়ে সই করতাম। পিওন আমাকে চেনে। চুপ্‌সে সই করে চুপ্‌সে পোস্টাফিসে দিয়ে আসতাম, নামগুলো আমি টুকে রেখেছি—"

বিষ্ণুপ্রসাদ পাশের ঘরে গিয়ে ছোট একটি হিসাবের খাতার মতো খেরো-বাঁধানো খাতা লইয়া আসিল। তাহা খুলিয়া অনেকগুলি নাম পড়িল। কয়েকটা নাম আমার এখনও মনে আছে। হীরা বাঈ, শিউলাল, শ্যাম দুবে, নুরুদ্দিন, কুসুমকুমারী, শাহী খাতুন…

বাবা বিস্মিত হইলেন।

"নুরুদ্দিন? কাশ্মীরের নুরুদ্দিন? তাকে তো আমি গান শেখাই নি। সে আমার দোস্ত—"

"তিনি এখানে মাঝে মাঝে শাল বিক্রি করতে আসেন। কিছু দিন আগে এসেছিলেন একদিনের জন্য। সেদিন আপনি মুঙ্গেরে গিয়েছিলেন সংগীত-বৈঠকে। আমি তাঁর কাছ থেকে শাল কিনেছি একটা। কথায় কথায় আপনার কথা উঠে পড়ল। তিনি আপনার কথা শুনে বললেন—কিদারবাবু! উয়হ্ তো ফকীর হ্যায়, শাহান্‌সা ভি হ্যায়। তারপর আপনি নাকি পাহাড়ে ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। বলে গেছেন আবার এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন একদিন। মাস দুই আগে পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—"

বাবা ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া সবিস্ময়ে বিষ্ণুপ্রসাদের কথা শুনিতেছিলেন।

"তুমি তো এসব কথা কিছুই বলনি এতদিন।"

"ভয় ছিল, যদি আপনি ফিরিয়ে দেন। তাই চুপ্‌সে ফর দিয়ে সই করে চুপ্‌সে পাসবুকে জমা করে দিতাম।"

বাবার চোখের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি বলিলেন, "অন্যায় করেছ তুমি। ওরা আমার ঠিকানাই বা জানলে কি করে!"

"আপনার কাছে তো অনেকে আসে। অনেকদিন আগে সেই যে এক আওরাৎ এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে, তার কাছে অনেকে হয়তো শুনেছে। বেশী মনি-অর্ডার লক্ষ্ণৌ, বনারস, দিল্লী থেকে এসেছে।"

বাবা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি কারও দান বা অনুগ্রহ কখনও নেব না ভেবেছিলাম। মা আমার সে অহংকার চূর্ণ করে দিলেন। কোনও অহংকারই শেষ পর্যন্ত টেকে না। মা টিকতে দেন না।"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি শুয়ে পড় গিয়ে। কাল সকালে গিয়ে অশ্বিনীর কাছে খোঁজ নাও, সে কোন্ স্কুলে ভরতি হবে। তোমাকেও সেই স্কুলে ভরতি করে দেব—"

আমি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সত্যই মনে হইতেছিল ইহা স্বপ্ন না সত্য।

…আমি যখন বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম তখনও দিদিমা জাগিয়া ছিলেন। অশ্বিনীর বাড়ী হইতে চন্দর, নকুল, সুধীর ফিরিয়া আসিয়াছিল। দিদিমা তাহাদের

মুখে খবর পাইয়াছিলেন আমি সেখানে যাই নাই। দিদিমার আশংকা হইয়াছিল আমি হয়তো মন্মথর সংগে সংগীত সমাজে গিয়া জুটিয়াছি। সংগীতসমাজে গান-বাজনা, থিয়েটার রিহার্সাল এবং তাস খেলা হইত। শহরের বখা ছেলেদের আড্ডা বলিয়া সংগীতসমাজের বদনাম ছিল। নকুলই মিথ্যা করিয়া দিদিমার কাছে লাগাইয়াছিল যে আমি সংগীতসমাজে গিয়াছি। দিদিমাকে অনর্থক ভাবাইয়া নকুল ভারী আনন্দ পাইত। আর একদিন চন্দরের বাড়ী ফিরিতে দেরি হইতেছিল, তাহাকে গিরীন মাস্টার স্কুলে বসাইয়া অংক কষাইতেছিলেন, নকুল বাড়ী আসিয়া রটাইয়া দিল চন্দর কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছে। একটু পরেই চন্দর বাড়ী ফিরিল তখন নকুল বলিল একটা কুলির মুখে সে কুয়ায় পড়ার কথাটা শুনিয়াছিল।

দিদিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোথা ছিলি এতক্ষণ? অশ্বিনীদের বাড়ী যাস নি?" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "সংগীতসমাজে গিয়েছিলি নাকি? তোর মামা শুনলে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করবে—"

"আমি বাবার বাসায় ছিলাম। বিষ্ণুপ্রসাদের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"নকুলটা আচ্ছা পাজি তো। তুই ওখানে শুয়ে ঘুমুতেই বা গেলি কেন। শরীর ভালো আছে তো। সরে আয় এদিকে—"

দিদিমা আমার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন।

"গা-টা একটু ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে—"

দিদিমা যখনই আমার বা চন্দরের গায়ে হাত দিতেন, তখনই তাঁহার মনে হইত গা-টা ছ্যাঁকছ্যাঁক করিতেছে। কপাল হইতে দিদিমার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "না, আমার কিছ্ছু হয় নি"—তাহার পর সহসা তাঁহার গলা জড়াইয়া আবদারের সুরে বলিলাম, "দিদিমা আমিও অশ্বিনীর মতো কোলকাতায় পড়তে যাব। নুনের গোলায় খাতা আমি লিখব না।"

নুনের গোলায় খাতা লিখিবার কথাটা দিদিমাও শুনিয়াছিলেন। তাঁহার ভালো লাগে নাই। কিন্তু ইহাও তিনি জানিতেন মামা আমাকে টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইবেন না। হয়তো তাহা তখন তাঁহার সামর্থ্যেই কুলাইত না। তিনি রোজগার ভালোই করিতেন, কিন্তু তাঁহার খরচও অনেক ছিল। মামা আত্মীয়-প্রতিপালক ছিলেন, বাহিরের অনেক দরিদ্র অনাত্মীয়কেও খাইতে দিতেন। তাই তাঁহার সঞ্চয় বেশী হইত না। নুনের গোলাতেও অনেক টাকা আটকাইয়া থাকিত। দিদিমা একথা জানিতেন।

"শক্তি কি তোর কোলকাতার খরচ চালাতে পারবে? ওর তো কিছুই বাঁচে না।"

"বাবা আমার খরচ দেবেন বলেছেন।"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বলেছে নাকি! কিন্তু ওই বা টাকা পাবে কোথায়।"

আমি তখন সব কথা খুলিয়া বলিলাম।

কাসির শব্দ শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল একটি বৃদ্ধ কিছুদূরে উবু হইয়া বসিয়া আছে। গায়ের রং ঘোর কালো, মাথার চুল ধপধপে শাদা। দেখিলেই মনে হয় লোকটি এককালে খুব শক্তিমান ছিল। কুমারেশ শনিচরাকে চিনিতে

পারিল। কয়েকদিন আগে সে বাবার অসুখের খবর লইতে আসিয়াছিল। শনিচরা বহুকাল আগে সূর্যসুন্দরের ঘোড়ার সাহিস ছিল। সে জাতিতে সাঁওতাল এবং এই অঞ্চলেই কোথাও চাষবাস করে। মোতি মহলদারের বিলে জাল পড়িলেই আসিয়া হাজির হয় সে। খাজনা আদায় করিতে আসে। এই অঞ্চলটাই পূর্বে নাকি সাঁওতালদের রাজত্ব ছিল। সাঁওতালদের রাজার নাম ছিল তিলকা মাঝি এবং রানীর নাম ছিল টিকরি মেঝেন। নবাবী আমলে সাঁওতালদের সহিত নবাবী ফৌজের নাকি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে টিকরি মেঝেন নাকি ভল্ল হস্তে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে অনেক শত্রু নিধন করিয়া অবশেষে নিজেও নিহত হয়। তাহারই স্মৃতি রক্ষার জন্য সাঁওতালরা এই বিরাট পুষ্করিণী নিজেরাই খনন করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল টিকরি তালাও। ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। টিকরি তালাও নাম পরিবর্তিত হইয়া টিকরি বিল নামে পরিচিত হইল। তাহার পর মোতি মহলদার যখন ইহার ইজারা লইলেন তখন নামটা একেবারে বদলাইয়া গেল। টিকরি মেঝেনের নামটাও আর রহিল না। ইহা লইয়া সাঁওতালেরা গোলমাল করিয়াছিল, মকদ্দমাও হইয়াছিল। কিন্তু সাঁওতালরা মকদ্দমায় জিতিতে পারে নাই। আন্দোলন চালাইতে লাগিল। মোতি মহলদার তখন একটা আপস করিলেন। তিনি বলিলেন সাঁওতালরা যদি আন্দোলন বন্ধ করে তাহা হইলে তিনি মাছ ধরা হইলেই প্রতিবার সাঁওতাল সর্দারকে কিছু মাছ উপহার দিবেন। প্রথম জালে যত মাছ উঠিবে সবটাই সাঁওতাল সর্দারের প্রাপ্য হইবে। সাঁওতালরা ইহাতে রাজী হইল। প্রতিবার তাহারা প্রায় একমণ দেড় মণ মাছ পাইত এবং তাহা লইয়া বন-ভোজন করিত। ইহার নাম তাহারা দিয়াছিল টিকরি পরব। মোতি বিলের এই মাছ পাওয়াটাকে তাহারা 'খাজনা' বলিয়া গণ্য করিত। সর্দার শনিচরা এই খাজনা লইতে আসিয়াছিল।

শনিচরা আবার জিজ্ঞাসা করিল ডাক্তারবাবু কেমন আছেন। ভালো আছেন শুনিয়া খুব খুশী হইল এবং কুমারকে বলিল, "তাহলে তুই আমাদের টিকরি পরবে আয় না কেনে।"

কুমার উত্তর দিল, "কাল যে আমাদের বাড়ীতেও ভোজ। আমাদের বড়বৌমার সাধ দিচ্ছি আমরা। তুমিই বরং এস আমাদের বাড়ীতে। বাবা খুব খুশী হবেন তাহলে।"

শনিচরা স্মিতমুখে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কালই ডাক্তারবাবুর বড় নাতবৌয়ের সাধ? আর সে যাইতে পারিবে না? তা কি কখনও হয়! অথচ—। হঠাৎ সমস্যাটার সমাধান করিয়া ফেলিল সে।

"আমাদের টিকরি পরব কাল তুদের বাড়ীতেই করব আমরা। সবাইকে নিয়ে যাব। তুদের বাড়ীর সামনের মাঠে আমাদের পরব হবে। মেয়েরা নাচবে, আমরা মাদল বাজাব, শোনু গনু বাঁশি বাজাবে—"

কুমার এতটা প্রত্যাশা করে নাই।

"সে তো চমৎকার হবে। কিন্তু তোদের পরব আমাদের বাড়ীতে করলে কেউ কিছু বলবে না তো—"

"আমি সরদার। আমি যেখানে পরবের জায়গা ঠিক করব সেইখানেই পরব হবে। কেউ আপত্তি করবে না। ডাক্তারবাবুকে সবাই ভালোবাসে যে। উ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, জানিস?"

কুমার জানিত না।

"তোর তখন জনম হয়নি।"

ইহার পর শনিচরা যে গল্পটি বলিল তাহা অদ্ভুত। সূর্যসুন্দর একবার নাকি ঘোড়ায় চড়িয়া রোগী দেখিতে যাইতেছিলেন, মাঠের মধ্যে ভিড় দেখিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন। একটু আগেই একটা বুনো শুয়োর শনিচরার পেট চিরিয়া দিয়াছিল। পেটের সমস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শনিচরার জ্ঞান ছিল। কেহ আশা করে নাই যে সে বাঁচিবে। ডাক্তারবাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার নাড়ি দেখিলেন। বলিলেন, বাঁচতেও পারে। গ্রাম হইতে ডুলি যোগাড় করিয়া তিনি শনিচরাকে হাসপাতালে লইয়া গেলেন। নাড়ি-ভুঁড়ি পেটে ঢুকাইয়া পেট সেলাই করিয়া দিলেন। শনিচরা বাঁচিয়া গেল। তাহার পেটে দাগটা এখনও আছে। শনিচরা সেটা কুমারকে দেখাইল। প্রকাণ্ড দাগ—সমস্ত পেটটা জুড়িয়া। এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

শনিচরা হাসিয়া বলিল, "আমি ডাক্তারবাবুকে এক পয়সা ফিস দিইনি। প্রাণের দাম কি টাকায় শোধ হয়? আমি তুদের বাড়ী এক বছর সাঁইস হ'য়ে ছিলাম। কোন মাইনে নিইনি। ডাক্তারবাবু যেখানে যেখানে ঘোড়ায় করে যেত আমিও সঙ্গে থাকতাম। ইচন্দরের সব জায়গা ঘুরেছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। তুদের তখন জনম হয়নি।"

কুমার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়ার সঙ্গে যেতে? ছুটতে ছুটতে?"

"হুঁ গো! ছুটতে ছুটতে। সব সময় ছুটতন না। ঘোড়া আস্তে আস্তেও চলত। অনেক সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে হতো। একবার একটা বাঘের মুখে পড়ে গিয়েছিলম।"

"বাঘের মুখে!"

"হুঁ গো! রেতের বেলা। ডাক্তারবাবু যাচ্ছিল হাঁসুয়ায়। মাঝে ছিল টালের জঙ্গলটা। এখন সেটা আর নাই, সব সাফ করে দিয়েছে। তখন বড় জঙ্গল ছিল। আমরা যাচ্ছিলম বিছু মোড়লের বাড়ী। তার বিটির পেটে ছেলা আটকে গিয়েছিল। সাত দিন কুঁথাকুঁথি করেও যখন বেরল না, তখন ডাক পড়ল ডাক্তারবাবুর। ডাক্তারবাবু ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল, আমি পেছনে ছিলাম ওষুধের বাক্স মাথায় নিয়ে। টাল জঙ্গলে ঢুকে কিছুদূরে গিয়ে ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল। কিছুতেই আর আগাতে চায় না। তখন ডাক্তারবাবু বললে, শনিচরা তু দেখতো, সামনে কি আছে। ঘোড়াটা আগাতে চাইছে না কেন। জঙ্গলের সরু রাস্তা। চারদিকে বড় বড় গাছগাছালি। সঙ্গে আমার শালাই (দিয়াশালাই) ছিল। আমি ওষুধের বাক্সটা নামায়ে শুকনা খড় আর ডালপালা দিয়ে একটা মশালের মতো বানালাম। তারপর সেটাতে আগুন ধরিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর দিয়ে দেখি একটা বকনা গরু মরে পড়ে আছে, তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর ঘাড়টা মটকানো। বুঝলাম বাঘে মেরেছে। কাছেই নিশ্চয় বাঘটা লুকিয়ে আছে কোথাও। মানুষের সাড়া পেয়ে ঝোপে-ঝাপে গা ঢাকা দিয়েছে। ভয়ে আমার পায়ে কাঁপুনি লেগেছে তখন। ডাক্তারকে সব বললম এসে। ডাক্তার বললে—আমাকে বিছু মোড়লের বাড়ী যেতেই হবে। ঘোড়াটা কিছুতেই এগোল না। তখন ডাক্তার নেমেই পড়ল ঘোড়া থেকে। বললে, ঘোড়া যখন

যাবে না, তখন এখানেই থাক। তুই ওষুধের বাক্সটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে। আমার তখন কাঁপুনি লেগেছে। বললম, বাঘের মুখে আমি যেতে লারব। ডাক্তার আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলে। তারপর বললে, তুই আচ্ছা ভীতু তো। আমাকে কিন্তু যেতেই হবে। তুই তাহলে ঘোড়াটা নিয়ে ফিরে যা, কিম্বা জঙ্গলের বাইরে গিয়ে থাক কোথাও। আমি একাই যাই। বিছু মোড়লের ঘোড়াতেই আমি ফিরব। ওষুধের বাক্স থেকে কয়েকটা ওষুধ আর যন্ত্রপাতি বের করে নিয়ে মশালটা হাতে করে একাই এগিয়ে গেল বাঘের মুখে। সেই রাতে গিয়ে বিছু মোড়লের বিটির পেট থেকে টেনে বার করলে ছেলাকে। সে ছেলা কে জান—ওই জগো পালোয়ান গো—লাঠি খেলায় ওস্তাদ।”

শনিচরা সহসা চুপ করিয়া গেল। ভাবাবেগের আতিশয্যে সম্ভবতঃ সে আর কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার উদ্ভাসিত চোখ-মুখ যাহা প্রকাশ করিল তাহা সে কথা দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, “হুঁ, ডাক্তার একটা বীর লোক বটে।” এটুকু বলিয়া তাহার যেন তৃপ্তি হইল না। মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আবার বলিল, “বীর লোক, মানী লোক, দাতা লোক। অনেক লোকের প্রাণ বাঁচাইছে। অনেক লোককে ভাত খাওয়াইছে।”

শনিচরা হয়তো আরও কিছু বলিত কিন্তু তাহার দৃষ্টি সহসা জলকরের দিকে আকৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল সে। কুমার দেখিল, বড় বড় মাছ জল হইতে লাফাইয়া অনেক দূর পর্যন্ত উঠিতেছে। বড় বড় রুই, শোল, চিতল। মনে হইল আকাশ হইতে মাছ-বর্ষণ হইতেছে বুঝি। অদ্ভুত দৃশ্য। শনিচরা বলিল, “আমার ভাগের মাছগুলো তুই নিয়ে যা। আমরা তুর বাড়ীতে গিয়েই ভোজ খাব।”

ঠিক এই সময়ে আর একটা কাণ্ড ঘটিল। একটা খোকনা ছোঁ মারিয়া শূন্য হইতেই একটা ছোট মাছ লইয়া পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ‘খোক্‌না’টাও তাড়া করিল তাহাকে। ইহা দেখিয়া শনিচরাও লাফাইয়া উঠিল। হা রে রে রে রে হা রে রে রে বে চীৎকার করিতে করিতে বিলের ধার দিয়া ছুটিল সে। পলিতকেশ শনিচরার এই বালকসুলভ আচরণে কুমারও উত্তেজিত হইয়া বন্দুকটা তুলিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল—আমরা তো এখান হইতে মণ মণ মাছ লইয়া যাইব, ও বেচারার মুখের গ্রাসটুকু কাড়িবার দরকার কি। তাছাড়া, কাড়িতে পারিব কি? দেখিতে দেখিতে ‘খোক্‌না’টা দূরে মিলাইয়া গেল। শনিচরার বন্যপ্রকৃতি কিন্তু এত সহজে নিরস্ত হইল না, সে ঊর্ধ্বমুখে চীৎকার করিতে করিতে ‘খোক্‌না’টার পিছু পিছু মাঠ ভাঙিয়া ছুটিতে লাগিল। যে লোক একটু আগে তাহার প্রাপ্য সমস্ত মাছ কুমারকে দান করিয়া গিয়াছে সামান্য একটা ছোট মাছের জন্য তাহার এ কি কাণ্ড। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া মাঠামাঠি ছুটিতেছে! আশ্চর্য মানুষের স্বভাব।…সহসা কুমারের মনে পড়িল ছোটদি আমবাগানে সভা করিতেছে, চামরুর বউকে লইয়া যাইতে হইবে।

পুকুরের ধারে সদানন্দ একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কুমার তাঁহার জন্য পুকুরধারে যে ব্যবস্থাটা করিয়াছিল তাহা প্রায় রাজকীয়। পুকুরের ভিতর পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের মতো একটি বাঁশের মাচা পূর্ব হইতেই ছিল। কুমার তাহার উপর পাতিয়া দিয়াছিল বেশ ভালো একটি বিছানা এবং বিছানার উপর দামী একটি সুজনী। ঠেস দিবার জন্য ছিল তিনটি তাকিয়া পিছনে এবং দুইটি দুই পাশে। মাথার উপর ছায়া করিবার জন্য একটি খড়ের ছাউনিও করিয়াছিল। যদিও সদানন্দ সিগারেটই খান এবং যে ব্রাণ্ডের খান তাহা প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছেন, এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ধূমপানের জন্য কুমার যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল তাহা সদানন্দের অতি মনোরম লাগিল। একটি গড়গড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল সে। গড়গড়াটা স্বর্গীয় মামাবাবুর। গুদামঘরের এক কোণে এতদিন অবহেলিত হইয়া পড়িয়া ছিল। কুমার সেটিকে বাহির করিয়া মাজাইয়াছে। ভালো জরির কাজ করা একটি নল এবং উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাকও সে কাল শহর হইতে আনাইয়াছে। একটা ছোঁড়া চাকর সদানন্দের ফরমাশমতো তামাক সাজিয়া দিতেছে। সদানন্দ বড় খুশী। ছোঁড়া চাকরটা বঁড়শিতে কেঁচোও গাঁথিয়া দিতেছিল। প্রকাণ্ড একটা ছিপ ফেলিয়া সদানন্দ ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার মনোযোগ বার বার ক্ষুণ্ণ করিতেছিল কয়েকটি পাখী। পুকুরপাড়ের ঝোপে টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করিয়া একটা ছটফটে ছোট পাখী লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছিল। শিমুলগাছের মাথায় একটা নীলকণ্ঠ ধীরে ধীরে পুচ্ছ আন্দোলন করিয়া শব্দ করিতেছিল—ড্য, ড্য ড্য। সুমিষ্ট সূক্ষ্মকণ্ঠে টি-টি-টিই, টি-টি-টিই করিতে করিতে একদল তালচোঁচ উড়িতেছিল মাথার উপর। কুলগাছের ডালে ডালে কয়েকটা বুলবুল বার বার বলিতেছিল—কৃষ্ট প্রিয়। সদানন্দ ফাতনার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিতেছিলেন না। বার বার তাঁহাকে চোখ তুলিয়া চাহিতে হইতেছিল। চাহিলেই চোখে পড়িতেছিল নির্মল নীল আকাশের খানিকটা। আরও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। জীবু শিবু আসিয়াছিল তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য। কিন্তু তাহাদের তিনি কাছে থাকিতে দেন নাই। একাই তাঁহার খুব ভালো লাগিতেছিল। তাঁহার নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়িতেছিল। বৈঁচির নিকট এক গ্রামে তাঁহার মামার বাড়ী। সেখানেও একটা তালপুকুর ছিল, মাছ ধরিবার ব্যবস্থা ছিল। সদানন্দ খুব ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়ীতে যাইতেন সেখানে মাছ ধরিতেন। তাঁহার সঙ্গী ছিল গোবিন্দ। হঠাৎ আর একটা কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। গোবিন্দর সঙ্গে আসিত তাহার ছোট বোন প্রমীলা। সাত আট বছরের ফুটফুটে মেয়ে। মাথার চুল বেড়া-বিনুনি করা। ঘন কালো চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যাশাভরা হাসির ছটা। সদানন্দ যখন মাছ ধরিতেন প্রমীলা তখন মাঝে মাঝে তাঁহাকে খাবার দিয়া যাইত। কখনও বেগনী, মোরব্বা, কখনও বা দুটো কুল বা পেয়ারা। বলিত, মা পাঠিয়ে দিয়েছে। পরে কিন্তু সদানন্দ জানিয়াছিলেন প্রমীলা সেগুলি নিজেই আনিত, লুকাইয়া চুরি করিয়া আনিত। কারণ ছিল। প্রমীলার সহিত সদানন্দের বিবাহের কথাবার্তা উঠিয়াছিল। কিন্তু ওই কথাবার্তা পর্যন্তই, সদানন্দের বাবা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।...হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর

শুনিয়া সদানন্দ চোখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন পুকুরের ওপারে উশনা এবং আর একটি লম্বা লোক দাঁড়াইয়া আছেন। লোকটিকে সদানন্দ চিনিতে পারিলেন না। চিনিবার কথাও নয়। লছমন পাঠক এই গ্রামেরই লোক, জমিদারী সেরেস্তায় আমিনের কাজ করেন। উশনার সহপাঠী ছিলেন। উশনা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পৈত্রিক সম্পত্তি পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে—আমি তো বরাবর বিদেশেই থাকি, বাবার জমি কোথায় কি আছে, কিছু জানি না, এবার যখন এসে পড়েছি তখন ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক। চক্ষুলজ্জাবশতঃই বোধহয় কুমারকে তিনি কথাটা বলিতে পারেন নাই। তাছাড়া বাড়ীতে ভোজকাজের হাঙ্গামায় কুমারের অবসরও নাই। তাই তিনি খুঁজিয়া লছমন পাঠককে বাহির করিয়াছেন। সে আমিন, সে সব জানে।

"ও এইখানেই কুমার পুকুরটা করিয়েছে বুঝি—"

"হাঁ—"

দুইজনে মিলিয়া পুকুরটা পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গড়গড়াটার জন্য সদানন্দের অস্বস্তি হইতে লাগিল। ফাতনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকাটাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন তিনি। তাঁহাকে দেখিয়া উশনা এবং লছমন পাঠক নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহারা বেশীক্ষণ রহিলেনও না। যাইবার সময় উশনা শুধু একবার ভ্রূ নাচাইয়া স্মিতমুখে বলিয়া গেলেন, "কি ভাই মাছ ধরা হচ্ছে, বেশ বেশ।"

উত্তরে সদানন্দ একটু মুচকি হাসিলেন শুধু। তাঁহারা যখন দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলেন তখন গড়গড়ায় একটি সুদীর্ঘ টান দিলেন তিনি। নাক মুখ দিয়া প্রচুর সুগন্ধি ধূম ছাড়িয়া দিয়া আবার ফাতনার দিকে চাহিলেন। ফাতনাটা নড়িতেছে! যথারীতি হ্যাঁচকা টান মারিয়া তুলিয়া ফেলিলেন ছিপটা। মাছ উঠিল না। সদানন্দ দেখিলেন টোপটি খাইয়া মাছ সরিয়া পড়িয়াছে।

"ওরে—"

ছোঁড়া চাকরটা পাশের ঝোপে ফড়িং ধরিতেছিল। ডাক শুনিয়া আসিয়া হাজির হইল।

"বঁড়শিতে আর একটা কেঁচো লাগিয়ে দে। ভালো করে লাগাস। এবার খেয়ে পালিয়ে গেছে—"

অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গা আসিয়া হাজির। তাহার হাতে অ্যালুমিনিয়মের একটা ঢাকা কৌটা, কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক ঝোলানো। পিছনে আর একজন চাকর—তাহার হাতে এক কুঁজা জল।

"জামাইবাবু, খাবার আর চা এনেছি।"

"এ সময়ে খাবার আর চা!"

"উষাদি চিঠিও দিয়েছেন—"

গঙ্গা ফতুয়ার পকেট হইতে চিঠিটি বাহির করিয়া দিল। উষা লিখিয়াছে—"খেতে অনেক বেলা হবে। তোমার জন্যে তাই চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলাম। খেয়ে নিয়ে গঙ্গার হাতে বাসনগুলো পাঠিয়ে দিও। বড় জামাইবাবু এখনও শিকার থেকে ফেরেন নি। দিদি তাঁর জন্যেও খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। মাছ ধরেছ নাকি একটাও? ধরে থাকলে গঙ্গার হাতে পাঠিয়ে দিও, খাবার সময় ভেজে দেব। টাটকা মাছ গরম গরম

ভাজা তো তুমি ভালোবাস। ওখানে বেশ মজা লাগছে নিশ্চয়। আমিও যেতুম, কিন্তু সন্ধ্যা আমাদের বাগানে এক সভার ফরকট্ তুলেছে। এক দুই তিন সেখানে আবৃত্তি করবে। তুমি সে সভায় এলে খুব ভালো হতো। কিন্তু সন্ধ্যা কোনও বয়স্ক পুরুষকে সে সভায় থাকতে দেবে না। জানই তো ওর মাথায় হরদমই নানারকম উদ্ভট বুদ্ধি গজায়। বৌদি নানারকম রান্নার আয়োজন করেছেন। চিঁড়ে আর মটরশুঁটি দিয়ে পোলাও হচ্ছে। রান্না বৌদি নিজেই করছেন। তুমি আর ঘণ্টাখানেক পরে চলে এস। তোমাকে তো আবার তেল দিয়ে দলাইমলাই করতে হবে। তাই বেশী দেরি কোরো না। বাবা বেশ ভালো আছেন। আজ যেন তাঁর ফুর্তি বেড়েছে। মাথায় জবাকুসুম মেখেছেন। তুমি খাবারটা খেয়ে নিয়ো। বেশী দিইনি, খান ছয়েক লুচি, আলুছেঁচকি আর অমলেট। খেয়ে নিও। আর দেখো, জলের খুব ধার ঘেঁষে বোসো না। পুকুরটায় অনেক জল।—উষা" ছোট একটা কাগজের আষ্টেপৃষ্ঠে ছোট ছোট অক্ষরে চিঠিখানা লিখিয়াছে। একজায়গায় একটু ফাঁক ছিল সেটাও 'পুনশ্চ' দিয়া ভরাইয়াছে। পুনশ্চ—গঙ্গাকে বলে দিও থার্মোফ্লাস্কটা যেন সাবধানে আনে। ভেঙে গেলে এখানে আর পাওয়া যাবে না।

গঙ্গার দিকে চোখ তুলিতেই সে বলিল, "আপনি এবার খেয়ে নিন জামাইবাবু। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—।"

সদানন্দ বলিলেন, "চা-টাই খাবো। খাবারটা ওই ছোঁড়াটাকে দিয়ে দাও।"

"উষাদি বলেছেন খেতে দেরি হবে।"

"খিদে পায়নি। সকালে প্রচুর খেয়েছি যে।"

ছোঁড়া চাকরটার কিন্তু বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। কোন্ সকালে বেচারা চারটি মুড়ি খাইয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে।

"লে রে তোরই মজা হলো—"

গঙ্গা হাসিয়া খাবারের কৌটাটা তাহাকে দিয়া দিল। কৌটাটা লইয়া তৎক্ষণাৎ একটা ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল সে। কাহারও সামনে সে খাইতে পারে না।

গঙ্গা তাহাকে নির্দেশ দিল।

"খাবারটা খেয়ে কৌটোটা মেজে অ্যানিস।"

"আচ্ছো।"

তাহার সব কথাই ওকারান্ত।

গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সদানন্দ নূতন টোপ লাগাইয়া আবার ছিপটি ফেলিয়া ফাতনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। নীলকণ্ঠ এবং বুলবুলি পাখী উড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঝোপের ভিতর সেই ছোট পাখীটি টিক্‌টিক্ করিয়া বেড়াইতেছিল তখনও। সদানন্দ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন আর একজনও তাঁহার মনের ভিতর ঘুরঘুর করিতেছে—সেই প্রমীলা। মাথায় বেড়া-বিনুনি-করা, চোখে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি।

বাগানের মহিলা-সভায় জনসমাগম মন্দ হয় নাই। সবাই আসিয়াছিল, এমন কি চামরুর বউও। সন্ধ্যা তাহাকে একটি ফরসা শাড়ি পরাইয়া, তাহার মাথায় তেল দিয়া, চিরুনি দিয়া চুলের পরিপাটি করিয়া, তাহার সর্বাঙ্গে একটি লাল রঙের র‍্যাপার দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল, যাহাতে সভানেত্রী হিসাবে তাহাকে বেমানান না দেখায়। সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে সন্ধ্যা একটি গাঁদা ফুলের মালাও তাহাকে পরাইয়া দিয়াছিল। চামরুর বউ প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এত লোক কেন, এত হইচই কিসের, ডাক্তারবাবু ভালো আছেন তো! সে প্রথমে আসিয়াই সূর্যসুন্দরের ঘরে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। মুখে কিছু বলে নাই। কিন্তু তাহার ঈষৎ-বিস্ফারিত ভয়-চকিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যে অনির্বচনীয় ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছিল তাহার বক্তব্য কি। সে যেন বলিতেছিল—"তুমি এমনভাবে শুইয়া আছ? তোমার সোনার সংসার যে চারিদিকে উথলিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে এত লোক, এত আনন্দ, তুমিই যে সকলের উৎস, তুমি শুইয়া অছে! তুমি বনস্পতি মহীরুহ, তোমার শাখায় কত পাখী বাসা বাঁধিয়াছে, কত ফুল ফুটিয়াছে. কত ফল ধরিয়াছে, আমার প্রবল প্রতাপ মালিক কত লোককে তুমি আশ্রয় দিয়াছ, কত প্রবল ঝড়কে তুমি তুচ্ছ করিয়াছ, আজ তুমি রোগশয্যায় শায়িত, উত্থানশক্তিরহিত!" এই সব কথাই তাহার মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে নাই। ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়াছিল শুধু। ঊর্মিলা তাহাকে চিনিতে পারে নাই। বিশেষ লক্ষ্যও করে নাই। কারণ কত লোকই তো ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা পরিচয় করিয়া দিবার পর তবে বুঝিতে পারিল। তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বড় ভালো লাগিল তাহাকে। চামরুর বউয়ের রং কালো, মুখে একটি দাঁত নাই, চুল রুক্ষ, কাপড় ময়লা কিন্তু তাহার চোখ মুখ হইতে যে স্নেহ বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহা অনবদ্য। চামরুর বউ সূর্যসুন্দরের ঘরে দাঁড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার মাইজী! তাহার পর সেটিকেও প্রণাম করিল। তাহার পর খোঁজ করিল—জংলীবাবু কোথা। বীরুবাবু সকাল হইতে অসহায়ের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। আসন্ন ভোজের ব্যাপারে সবাই মাতিয়া উঠিয়াছিল, নিখিলবাবু চরকির মতো চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। সহসা তিনি বীরুকে দেখিয়া বলিলেন, "বড়বাবু, তুমি একটা কাজ কর। ওদিকের ওই লম্বা ঘরটায় অনেক শালপাতা, কলাপাতা, মাটির খুরি, গেলাস এসে জমেছে। তুমি গোটা দুই কুলি নিয়ে ওগুলো ধুইয়ে আলাদা আলাদা করে রাখাও দিকি। ওই ঘরটার পেছন দিকে দুটো বড় বড় টবে জল ভরিয়ে রেখেছি। তুমি ওইখানেই চলে যাও একটা মোড়া নিয়ে। চামরুর বউ যখন বীরুর খোঁজ করিল তখন তিনি সেই লম্বা ঘরের ভিতর বসিয়া পাতা ধোওয়াইতেছিলেন। বীরুবাবু একটু নিস্পৃহ স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। ভিড় গোলমাল হৈ-হল্লা তেমন পছন্দ করেন না। পুঁথির জগতে নিজেকে লইয়া থাকিতে ভালোবাসেন তিনি। বর্তমানের সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র ঔৎসুক্য বা কৌতুহল নাই। তিনি বাস করেন অতীতে। তাঁহার মতে অতীতে বাস করার একটা প্রধান সুবিধা এই যে সে-জীবনের ঝড়ঝাপটা ঝামেলা হইতে দূরে থাকিয়াও সে-জীবনের সমস্ত রূপ-রস-আনন্দ দুঃখ কষ্ট

সব উপভোগ করা যায়, অনেকটা যেন থিয়েটার দেখার মতো। ইজিপটের ফারাওরা বাস করিতেন ভবিষ্যতে। তাহারা মনে করিতেন অনন্তকালের অসীমতার মধ্যে এ জীবনের সীমা কতটুকুই বা ভবিষ্যৎ জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো কাটাইতে হইবে সেই অদৃশ্য মহাব্যাপ্তির মধ্যে যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি। তাই তাঁহারা সারাজীবন ধরিয়া নিজেদের কবরখানা নির্মাণ করাইতেন এবং মনে করিতেন ওইটাই জীবনের প্রধান কাজ। ইতিহাসের ছাত্র বীরুবাবু বর্তমানের প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া অতীতের এইসব নাট্যলীলা উপভোগ করিতে ভালো-বাসেন। বর্তমানের মানব-মানবী, বর্তমানের সভ্যতা, বর্তমানের জীবন তাঁহার মনকে তেমন নাড়া দেয় না। তিনি মনে করেন যতটুকু দেখিতেছি তাহা সম্পূর্ণ চিত্র নয়, বিজ্ঞাপনের আড়ালে, ভণ্ডামির মুখোশের তলায়, বিভিন্ন পরিবেশের ক্ষণিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে সত্য রূপটা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, একমাত্র মৃত্যুই তাহাকে অনাবৃত করিয়া খাঁটি সত্যরূপে প্রকাশ করিতে পারে। মহাকালের নির্মম নিকষে যাচাই না হইলে কোনও যুগের বা মনুষ্যের সত্য মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। যাহা অনাবশ্যক যাহা মূল্যহীন, যাহা মিথ্যা মহাকাল তাহাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল খাঁটি সোনাটুকু, কেবল আসল রত্নগুলি সে ইতিহাসের অক্ষয় ভাণ্ডারে সংগ্রহ করিয়া রাখে। বীরুবাবুর এরূপ মনোবৃত্তির আর একটা কারণও সম্ভবতঃ ছিল। বীরুবাবু কল্পনাবিলাসী। ইতিহাসের একটা যুগ বা চরিত্র লইয়া কল্পনার জাল বয়ন করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বর্তমান প্রত্যক্ষদর্শী, তাহার প্রত্যক্ষদর্শনও পরস্পরবিরোধী ঘটনার সংঘাতে আলোড়িত। সুতরাং রসটা ঠিক যেন জমে না, এরকম ধাক্কাধাক্কিতে জমা-সম্ভবও নয়। তাই বীরুবাবু অতীতেই বাস করেন। তাঁহার প্রতিবেশী হেমবাবু অপেক্ষা হাম্মুরাবি তাঁহার নিকট বেশী সত্য। হাম্মুরাবির স্থির-চিত্র তাঁহাকে অনেক রকম কল্পনার খোরাক যোগায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে বীরুবাবু বর্তমানকেও একে-বারে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বর্তমানে যে সত্যই তাঁহাকে বাস করিতে হয়। কিন্তু সে বর্তমানে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বাস করেন, তাঁহার মন পড়িয়া থাকে অতীতে যেখানে বর্তমানের রূপ অতীতের রসায়নে শাশ্বত মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

চামরুর বউ যখন খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তিনি অপটুভাবে গোটাচারেক ফাঁকিবাজ কুলিকে কাজে প্রবৃত্ত করাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন।

"তুই বেটা এখানে —?"

বীরুবাবু যেন অকূলে কূল পাইলেন।

"এদের ধমকে একটু ঠিক করে দে তো। এরা বড় ফাঁকি দিচ্ছে কাজে—"

চামরুর বউ কুলিদের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মতো গর্জন করিয়া উঠিল। 'ছেকাছিনি' ভাষায় বলিল, "কাজ না করিস তো দূর হ'য়ে যা। তোদের মতো নিমকহারাম কুত্তাদের এখানে থাকবার দরকার নেই। ম্যানেজার সাহেবকে তোদের কথা গিয়ে বলব ? জুতো খাবার জন্য পিঠ সুড়সুড় করছে, না ? ওই রকম করে গেলাস ধোবার ঢং ? ওই রকম করে পাতা ধোয় ?"

চামরুর বউ নিজেই পাতা ধুইতে বসিয়া গেল। বুড়ী চামরুর বউয়ের এই মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল কুলিগুলো। কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হইল তাহাদের।

"ওরাই করুক, তুই আর জল ঘাঁটিস নি। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"লাগুক না। তোদের সেবা করতে করতে তোদের রেখে যেতে পারলেই তো বাঁচি এখন। ঠাণ্ডার কি পরোয়া করি—"

চামরুর বউ ফোকলা দাঁতে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আঁচলে হাত মুছিতে লাগিল। তাহার পর বীরুর পাশে বসিয়া তাঁহার জুলফির কাছের কাঁচা-পাকা চুল গুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে সক্ষোভে বলিল, "তোর চুলও পেকে গেল? দাঁত ঠিক আছে তো।"

"আছে—"

"তোদের জন্যে কিছু চূড়া আর মুড়ির লাড়ু এনেছি। খাস। ক্ষীর দিয়ে খাস, খুব ভালো লাগবে।"

হন্তদন্ত হইয়া সন্ধ্যা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"দাদা তুমি আর ওকে আটকে রেখ না। আমাদের সভার সময় যে হ'য়ে এল। একে এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে, অনেক কাজ—"

"আমি তো আটকে রাখিনি। ও নিজেই এসেছে—"

"চল চল আর দেরি কোরো না।"

চামরুর বউকে লইয়া সন্ধ্যা চলিয়া গেল।

সভায় ফরসা কাপড়-জামা পরা র‍্যাপার-গায়ে চামরুর বউকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাইতেছিল। সে একটি কথা বলে নাই। সে কেবল ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া হাসি-মুখে ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার ইহাও মনে হইতেছিল, ইহা সত্য না স্বপ্ন। তাহার গলায় ফুলের মালা দিয়া 'সনঝামণি' তাহাকে চেয়ারে বসাইয়াছে। কি কাণ্ড! সভার কাজ কিরণই করিতেছিল। সন্ধ্যা একটা কাগজে পরিষ্কার করিয়া 'প্রোগ্রাম' লিখিয়া আনিয়াছিল। কিরণ তদনুসারে সভার কাজ চালাইতেছিল গম্ভীর মুখে। প্রথমেই ছিল চিত্রার বেহালা। সে দেশ রাগিণী এমন চমৎকার বাজাইল যে মুগ্ধ হইয়া গেল সকলে। সমস্ত সভা রুদ্ধশ্বাসে সে বাজনা শুনিল। তাহার পর স্বাতীর বক্তৃতা। স্বাতী গম্ভীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি বক্তৃতা জানি না। এর আগে কখনও দিইনি। ছোটপিসির জেদেই আজ আমাকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে ছোট-পিসির অনেক বড় বড় উঁচু ধারণা আছে, আমার সে সব কিছু নেই। আমি সোজা-সুজি বুঝি খেয়ে পরে পাঁচজনকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই জীবন সার্থক, তা সে স্বাধীনভাবেই হোক বা পরাধীনভাবেই হোক। কিন্তু আমাদের সমাজের যা নিয়ম তাতে সব ঝক্কি মেয়েদের ঘাড়ে এসেই পড়ে। এ অবস্থায় আমার মতে সব দিক রক্ষে করে যতটা ফাঁকি দিতে পারা যায় দেওয়া উচিত। ফাঁকি দিতে না জানলে খাটতে খাটতে প্রাণান্ত হ'য়ে মারা পড়তে হবে। আর আমার কিছু বলবার নেই।"·· এই বলিয়াই স্বাতী ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল এবং মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল। উষা স-কোপ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "কি পাজী মেয়ে দেখেছ!" ইহার পর সন্ধ্যার বান্ধবী সীতিয়ার হেলে হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করিল একটি—'সিয়ারন পাঁড়ে'। এক শেয়ালের গল্প। শেয়াল রোজ মকাই ক্ষেতে

ঢুকিয়া মকাই চুরি করিয়া খাইত। কিন্তু একদিন সে ফাঁদে ধরা পড়িয়া গেল। গল্পটি ছন্দে লিখিত। আবৃত্তি শুনিয়া খুব হৈ হৈ করিয়া হাসিয়া উঠিল সবাই। সীতিয়ার চোখের দৃষ্টি পুত্রগর্বে ঝলমল করিতে লাগিল। ইহার পর লীলার সেতার। সে সেতারে ঝংকার দিবামাত্র চতুর্দিক গমগম করিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল লীলা অসাধারণ প্রতিভাময়ী। তাহার বোন সংগত করিল সেতারের সংগে। তাহারও বাজনা শুনিয়া সকলে অবাক। তাহার পর সে গান ধরিল। ওস্তাদী গান, ইমনের আলাপ। লীলা তাহার সহিত সেতার বাজাইতে লাগিল। দুই বোন অনেকক্ষণ জমাইয়া রাখিল সভাকে। উশনার মেয়েদের গ্রামের লোকেরা ভালো করিয়া চিনিত না। তাহাদের লইয়া সভায় গুনগুন করিয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বাদপ্রতিবাদও শুরু হইল। সন্ধ্যা চামরুর বউয়ের কানে কানে বলিল, "গোলমাল হচ্ছে। তুমি সবাইকে চুপ করে থাকতে বল।" চামরুর বউ সংগে সংগে ছেকাছিনি ভাষায় বলিয়া উঠিল, "তোরা সে নি চুপ রাহিনি গে। কচ্ কচ্ করে হিঁ কাহে—"। গোলমাল থামিয়া গেল। তখন কিরণ উঠিয়া বলিল, "এবার সন্ধ্যা—প্রবন্ধ পড়বে।" সন্ধ্যা সকলকে অবাক করিয়া দিল। সে প্রবন্ধ পড়িল হিন্দীতে। আরম্ভ করিল, 'মেরে বাহিনিও' বলিয়া। প্রবন্ধে সে যাহা বলিল তাহা সকলে ঠিকমত হৃদয়ংগম করিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাহা যে সারগর্ভ ইহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। সে সংক্ষেপে নারী-জাগরণের ইতিহাসটাই বিবৃত করিয়া ফেলিল এবং সর্বশেষে বলিল—"নারীরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহাদের মংগল কেহ করিতে পারিবে না। নিজেদের কল্যাণ নিজেদেরই অর্জন করিতে হয়, ভিক্ষা করিয়া তাহা পাওয়া যায় না। পুরুষরা নারীদের স্বাভাবিক সংগী, প্রভু নয়, একথাও নারীদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।" তাহার পর সে গ্রামে একটি নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিল। তাহাতে তিনটি বিভাগ থাকিবে। প্রথম নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা, নাইট স্কুল। দ্বিতীয় নারীদের উপার্জনের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প। তৃতীয় দুঃস্থ নারীদের সাহায্যের ব্যবস্থা: জীবনবীমা এবং কো-অপারেটিভের উপযোগিতা। রুশদেশে প্রবর্তিত কমুনের কথা উল্লেখ করিল। সন্ধ্যার চিন্তাশীলতায় সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পর উষা গাহিল রবীন্দ্রনাথের সেই অতি পুরাতন গানটা—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগত-জনের শ্রবণ জুড়াক—'। উষা যদিও মাঝে মাঝে বেসুরো হইয়া যাইতেছিল তবু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে তাহার সব দোষ ঢাকিয়া গেল। তাহার গলার স্বর পাখীর স্বরের মতো স্বাভাবিক। খুব ভালো লাগিল সকলের। ইহার পর হইল এক দুই তিন-এর আবৃত্তি। এক আবৃত্তি করিল 'পঞ্চ নদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে'। দুই— 'আমি যখন বাবার মতো হবো' আর তিন—'ঝরণা, ঝরণা, সুন্দরী ঝরণা'। প্রত্যেকের আবৃত্তিই চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু তিনের আধ-আধ কণ্ঠের 'ঝন্না, ঝন্না, ছুনদলী ঝন্না, তললিত চন্দিকা চন্দন বন্না' সকলের হৃদয় বেশী হরণ করিল। উষা তো পুত্রগর্বে একেবারে ডগমগ। ইহার পর গান গাহিল তুরীটোলার তিলিয়া। কালোকালো হাসিমুখী মেয়েটি নবোদ্ভিন্নযৌবনা। হলুদ রঙের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছে। মাথার সিঁথায় এক ধ্যাবড়া মেটে সিঁদুর। কপালে উলকি, নাকে নাকছাবি। মাথায় খোঁপায় ফুল। সে কানে হাত দিয়া এক পল্লী সংগীত করিল— হে গে ননদী, ফুটলো রাহারকি ফুলোয়া। অড়হরের ফুল দেখিয়া বধুর বিরহ

জাগিয়াছে, সে ননদিকে মনের ব্যথা জানাইতেছে। তিলিয়ার গান শুনিয়া অনেকেই মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তিলিয়ার সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুষা আছে। তুরী-সমাজে সে নাকি একটা রাধিকা। গানে সে একেবারে প্রাণ ঢালিয়া দিল। তাহার গান শেষ হইলে সন্ধ্যা কিরণের কানে কানে বলিল—"বড়দি, তুমি এবার কিছু বল। আচ্ছা, ছোটবউ কোথা গেল বল তো।" সকলের অনুরোধে উর্মিলা সভায় আসিয়াছিল। বসিয়াছিল একেবারে শেষপ্রান্তে। খোঁজ করিয়া জানা গেল বর্ষাতিয়ার মায়ের সঙ্গে সে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছে। সুর্যসুন্দরের নিকট হইতে উঠিয়া আসা অবধি সে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তারপর তাহার হঠাৎ মনে পড়িল পাঁচটার সময় বাবাকে 'ভিটামিন' খাওয়াইতে হইবে, সে কথাটা দিদিকে বলিয়া আসা হয় নাই। তাই সে বর্ষাতিয়ার মাকে সঙ্গে লইয়া মাঠামাঠি হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা একটু দুঃখিত হইল ইহাতে। বলিল, "মনে করেছিলাম ছোটবউকে দিয়ে ক্যারিকেচার করাব একটা। এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম সুন্দর ক্যারিকেচার করে! চলে গেল কেন হঠাৎ ? বাবার কাছে তো পিসিমারা আছেন।" কিরণেরও আর ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মন পড়িয়াছিল অন্যদিকে, কৃষ্ণকান্তের কোন খবর আসিল কি না। সন্ধ্যার কথায় সে বলিয়া উঠিল, "সবাই তোমার মতো হৈ হৈ ভালোবাসে না। সভা তো হ'য়ে গেল, এইবার চল, বাড়ী যাই।"

"তুমি কিছু বলবে না ?"

"আমি ! আমি আবার কি বলব।"

"যাহোক কিছু বল।"

হঠাৎ চামরুর বউও ধমকের সুরে বলিয়া উঠিল—"হাঁ, কুছ্ বোল্নি। আংনাবে তো কেত্তা বাত বোলেছ।"

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে চটিয়াছিল, চুটাইয়া বক্তৃতা দিল। বলিল, "আমি বক্তৃতা করতে পারি না। হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই বাংলায় বলছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। আমি যা বুঝেছি তাই বলব। সন্ধ্যা তোমাদের এতক্ষণ স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলছিল। সে যা বলেছে তা খুবই ভালো। কিন্তু আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্ম এখনও ঠিক বুঝিনি। স্ত্রী-স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, নিজের খুশি মতো পাগলামি করা নয়। সমাজের সংসারের যাতে মঙ্গল হয় সেইটে করবার অধিকারই স্ত্রী-স্বাধীনতা। কিন্তু সমাজে বা সংসারের কিসে ঠিক মঙ্গল হয় তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। নানা মুনির নানা মত। আর তাই নিয়ে পৃথিবীতে নানারকম দলাদলিও হয়েছে। যুদ্ধও হচ্ছে অনেক জায়গায়। এর ফলে শান্তি লোপ পাচ্ছে সমাজ থেকে। আমি নিজে শান্তির পক্ষপাতী। আমি মনে করি সংসারে যদি শান্তি না থাকে তাহলে সবই অনর্থক। আমাদের সাবেক সমাজে ঘরের শান্তি, ঘরের সৌন্দর্য রক্ষার ভার ছিল স্ত্রীলোকদের উপর। যদিও মনুর বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকেরা বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে পুত্রের—কিন্তু অধীন থেকেও তারাই ছিল ঘরের মালিক ঘরের কর্ত্রী। তারা সংসারকে যেমনভাবে চালাত, সংসার তেমনিভাবে চলত। পিতা, স্বামী বা পুত্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, উপার্জন করে তাদের হাতে টাকা এনে দিতেন বলে কখনও তাদের অসম্মান করতেন না। বাড়ীর মেয়েরাই সংসারের আসল কর্ত্রী ছিলেন। সমাজের মঙ্গল করবার জন্যে

সংসারের বাইরে থেকে একদল মেয়ে চিরকাল যুদ্ধ করতে চান, হয়তো আত্মোৎসর্গ করেন, তা তাঁরা করুন, তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু ঘরের ভিতরে থেকে ঘরের মঙ্গল, ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা যারা ভাববে, সংসারে তাদের সংখ্যাই বেশী। আমার মনে হয় তারাও কম নমস্য নয়। তাদের প্রতিমুহূর্তের আত্মোৎসর্গের কাহিনী খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় না বলেই যে তা কম মহৎ একথা আমি মনে করি না। ছোট ছোট গৃহস্থালীর সমষ্টিই সমাজ, এই সব গৃহস্থালীর যারা কর্ত্রী, তারাই সমাজেরও কর্ত্রী। তারা প্রত্যেকে যদি নিজেদের গৃহস্থালীর কর্তব্য ঠিক করে করে তাহলেই সমাজের কল্যাণ করা হয়। পিতা মাতা পুত্র এদের অধীনে থাকাটা অনেক আধুনিক মহিলা আত্মসম্মানহানিকর মনে করেন। আমি তাঁদের দলে নই। আমার মনে হয় তাঁরা ঠিকমতো পিতা মাতা বা পতি পুত্রকে ভালোবাসেন না। বাসলে একথা তাঁদের মনেই হতো না। ভালোবাসা নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়, তুচ্ছ আত্মসম্মানের পতাকা আস্ফালন করার কথা মনেই হয় না তার। আমি যা বললাম তা আমার নিজের মনের কথা। অপরের মনের সংগে তার মিল হয়তো না-ও হতে পারে। কিন্তু আমি নিজের মনের কথাই বলতে পারি, পরের ধার-করা কথা বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কামনা করি তোমরা সবাই বাবা মা স্বামী ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে সুখী হও! সুখী হবার জন্যে বিদ্যা বুদ্ধি ধন দৌলত কিছুরই দরকার নেই। সবাইকে ভালোবাসতে পারলেই সুখী হওয়া যায়, ভগবানে বিশ্বাস থাকলেই কষ্টকে কষ্ট বলে আর মনে হয় না। আমাদের আজকের সভানেত্রী চামরুর বউ সুখী। জীবনে ওর অনেক দুঃখ কষ্ট এসেছে, কিন্তু সেসব ও গ্রাহ্য করেনি। সকলের সেবা করেছে, সকলকে ভালোবেসেছে। তাই ওর মুখে শিশুর সারল্য, তাই ওর হাসি ফুলের হাসির মতো নির্মল"—কিরণ হয়তো আরও কিছু বলিত, কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটাতে হৈ হৈ করিয়া সভা ভাঙিয়া গেল। হঠাৎ সভার একপ্রান্তে এক বিরাট হাতী আসিয়া উপস্থিত, হাতীর পিঠে কৃষ্ণকান্ত, তাঁহার হাতে বন্দুক।

হাতী হইতে কৃষ্ণকান্ত নামিয়া পড়িলেন। প্রথমেই সন্ধ্যার সহিত মুখোমুখি হইতেই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি ব্যাপার! আমার মৃত্যুসংবাদ রটে গেছে না কি! এখানে কি শোকসভা হ'চ্ছে?"

কিরণের মুখ কৃষ্ণকান্তকে দেখিবামাত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে সে বলিল, "কি আক্কেল তোমার—"

"আমার আক্কেল অভিজ্ঞতা সব তো তোমার বাক্সে বন্ধ। তুমি কিছু দিলে তবে তো আমার কাছে থাকবে, সব তো তোমার কাছে—"

উষা ছোট খুকীর মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"আসল কথাটা বলুন এবার। তিতির পেয়েছেন?"

"প্রচুর। কিন্তু 'কালো' নয় 'গ্রে'। গোটা তেইশ মেরেছিলাম। তিনটে রামপ্রসাদকে দিয়ে দিয়েছি—"

"কোথায় সেগুলো—"

"সেগুলো তো সরফুদ্দিনের সংগে পাঠিয়ে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগে। সে ঘোড়ায় করে এসেছে, দিয়ে যায়নি?"

"গেছে বোধহয়। আমরা তো কেউ বাড়ী ছিলাম না। এখানে সভা করছিলাম।"

"সভা? কিসের সভা?"

"সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা কর। ওই নাটের গুরু।"

সন্ধ্যা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমরা এখানে একটা নারীকল্যাণ সমিতি স্থাপন করলাম।"

"বাঃ। আমি তোমাদের কিছু লাঠি দেব।"

"লাঠি!"

ঊষা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"এতগুলি উন্মত্তা নারী একত্র হলে মারপিট তো অনিবার্য। তোমাদের সহকর্মিণী কারা? এরা না কি? এরা তো তোমাদের ঠেঙিয়ে লাস করে দেবে।"

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমাদের অস্ত্র লাঠি নয়—"

"তোমাদের ওই হাসি আর বাঁকা চাউনি আমাদের মতো হাঁদাদের ঘায়েল করতে পারে, কিন্তু মেয়েদের পারবে না। একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের সুন্দর মুখ দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে আর বাধা না থাকলে দৌড়ে গিয়ে আগেই মুখটা খামচে ক্ষতবিক্ষত করতে চেষ্টা করে—"

"চল, চল, ঢের ভাঁড়ামি হয়েছে"—কিরণ ধমকাইয়া উঠিল—"খুব খিদে পেয়েছে তো?"

কৃষ্ণকান্ত মুচকি হাসিয়া চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে। তাহার পর বলিল, "পেয়েছে বললেই তুমি খুশি হও। কিন্তু পায়নি। তুমি সরফুর হাতে যা খাবার পাঠিয়েছিলে তা তিনটি লোকের খোরাক। সরফুর কড়া পাহারায় তার সবটা খেতে হয়েছে। তাছাড়া একটা কুলের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। অনেক কুল খেয়েছি। অসময়ে এরকম কুল দেখিনি কখনও আগে। ইয়া বড় বড়। তোমাদের জন্যেও এনেছি কিছু। তাছাড়া গৌরবাবুও প্রচুর খাইয়েছেন—"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল—"হাতী কোথায় পেলেন?"

"হাতী গৌরবাবুর।"

"তুমি সেখানে গেলে কি করে?" রীতিমত জেরা শুরু করিল কিরণ। সন্ধ্যা এমন একটা মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যেন তাহার বিস্ময় থৈ পাইতেছে না।

"সে অনেক কথা। চল যেতে যেতে বলছি। সভা শেষ হয়ে গেছে তো? না, আরও হবে?"

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—"আর একটু হতো কিন্তু আপনিই তো হুড়মুড়িয়ে এক হাতী নিয়ে এসে ভেঙে দিলেন সভাটা—"

চামরুর বউ সবিস্ময়ে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতেছিল। সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া আধ-ঘোমটা টানিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিরনকে দুলহো ছে?"

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহার অনুমান ঠিক। তাহার পর চামরুর বউয়ের দিকে কৃষ্ণকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, "জামাইবাবু ইনি আজ আমাদের সভানেত্রী হয়েছিলেন।"

কৃষ্ণকান্ত নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কে?"

"দাদার দুধ-মা। দাদা ছেলেবেলায় এর দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে। এরা তখন আমাদের চাষের কাজ করত।"

"বাঃ, এঁকে দেখে খুব আনন্দ হলো--"

হঠাৎ হাতীর মাহুতটা হাতীর উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "দাদী তু কি ঘর যাইভি ?"

সকলে মাহুতের দিকে চাহিতেই চামরুর বউ হাসিয়া বলিল, "ওকে তোরা চিনতে পারলি না ? ও রমজানিয়ার বড় বেটা মিরচানিয়া। আমি ওর সঙ্গে চলে যাই। কাল আবার আসব ভোজ খেতে।"

মিরচানিয়া হাতীকে বসাইয়া তাহার দাদীকে তুলিয়া লইল। যতক্ষণ দেখা গেল চামরুর বউ ইহাদের দিকেই হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। সভা ভাঙিয়া যাওয়াতে গ্রামের মেয়েরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারাও ক্রমশঃ নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

"চল এবার আমরাও বাড়ী যাই—"

যাইতে যাইতে কিরণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বাড়ী না গিয়ে এখানে এসে পড়লে যে —"

"এইটেই তো বাড়ী যাওয়ার রাস্তা। ভিড় দেখে থেমে গেলুম।"

"গৌরবাবুর ওখানে গিয়েছিলে কেন।"

"গরুর গাড়ির চেষ্টায়—"

"হঠাৎ গরুর গাড়ির কি দরকার পড়ল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল নিশ্চয়। তা তো হবেই। চার ক্রোশ পথ কি সোজা! এখান থেকেই তোমার গরুর গাড়িতে যাওয়া উচিত ছিল।"

কৃষ্ণকান্ত ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

"তারপর ?"

"তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ? তাহলে শোন। গরুর গাড়ি নিজের জন্য চাইতে যাইনি। চাইতে গিয়েছিলাম একটা কুমীরের জন্য।"

"কুমীরের জন্য ? তার মানে ?"

সকলেই বিস্মিত হইল।

"তিতির মেরে ফিরছি। একটা প্রকাণ্ড বিলের ধার দিয়ে রাস্তা! হঠাৎ দেখতে পেলুম বিলের জলে একটা কুমীরের নাক দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে রাইফেল ছিল, বুলেটও ছিল। লোভ সামলাতে পারলাম না, দিলাম একটা ফায়ার করে। টুপ করে নাকটি ডুবে গেল। ঠিক লেগেছে কি না বুঝতে পারলাম না। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম দূরে জেলেদের একটা ডিঙি রয়েছে। ডিঙি ঠেলবার লগিও রয়েছে একটা। ডিঙির উপর কিন্তু লোক নেই। কেউ কোথাও নেই। রামপ্রসাদ আর আমি গিয়ে চড়লাম সেই ডিঙিতে, লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সেটাকে নিয়ে এলাম যেখানে কুমীরের নাক দেখা গিয়েছিল। গিয়ে দেখি সেখানকার জল রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। বুঝলাম লেগেছে গুলিটা। তারপর লগিটা এদিক ওদিক চালিয়ে কুমীরটাকেও পেলাম, দেখলাম জলের ভিতরই সেইখানে মরে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেবে পড়লাম আমি জলে, রামপ্রসাদও নাবল। ও ছোকরার বেশ সাহস আছে দেখলাম—"

"জলে লাফিয়ে পড়লে কুমীরের মুখে! সে কি গো! কি কাণ্ড যে করে বেড়াও তুমি। কুমীরের মুখে লাফিয়ে পড়লে কি বলে!"

"দুর্গা বলে! তারপরে দু'জনে মিলে টানতে টানতে তুললাম সেটাকে ডাঙায়। It was stone dead! বিরাট কুমীর।"

স্বাতী হঠাৎ বলিল, "কই আপনার কাপড় তো একটুও ভেজেনি। কাদাও লাগেনি—"

"এ কাপড়টা গৌরবাবু দিয়েছেন। আমার কাপড় গাড়িতে কুমীরের সঙ্গে আসছে।"

"তারপর—" রুদ্ধশ্বাসে কিরণ প্রশ্ন করিল।

"কুমীরটা ডাঙায় তুলেই আমার মনে হলো এতো বড় কুমীর তো এখানে ফেলে যাওয়া চলবে না, নিয়ে যেতে হবে। গরুর গাড়ি চাই। রামপ্রসাদ বললে গৌরবাবুর কাছারি ছাড়া এখন আর কোথাও গরুর গাড়ি পাওয়া যাবে না। দূরে দেখলাম একটা রাখাল ছোঁড়া যাচ্ছে। তাকে ডাকলাম—তোকে আট আনা পয়সা দেব তুই এই কুমীরটাকে পাহারা দে। আমরা গাড়ি নিয়ে আসছি। কাছারিতে গিয়ে গৌরবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। তিনি শ্বশুরমশায়ের নাম শুনে মহাখাতির করে বসালেন আমাকে। বললেন, তুমি ডাক্তারবাবুর জামাই মানেই আমার জামাই। ডাক্তারবাবুর নাতবৌয়ের সাধে আমি ঠিক সময়ে গিয়ে হাজির হব। মহাব্যস্ত হয়ে উঠলেন তারপর। প্রথমেই খাওয়ার ব্যবস্থা। সংক্ষেপে গরম গরম লুচি আর আলুর দম। পেটে খুব বেশী জায়গা ছিল না। তবু খেলাম কিছু। মানে খেতে হলো! তারপর উনি বললেন, আমি হাতী কষিয়ে দিচ্ছি, তুমি হাতীতে যাও। আর কুমীর গাড়িতে যাক। তার সঙ্গে একটা সিপাহীও যাক। গরুর গাড়ি, বাঁশ, দড়ি, তিন চারজন জোয়ান লোক সব দিয়ে দিলেন। আমার খাওয়াদাওয়া করতে একটু দেরি হয়ে গেল। কুমীর বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে। কি বিরাট কুমীর দেখবে চল—"

"কি হবে বিরাট কুমীর নিয়ে। সত্যি তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি।"

কিরণ তর্জন করিয়া উঠিল। যদিও তাহার বুক স্বামীগর্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

"বিরাট কুমীর নিয়ে কি হবে বলছ? আমার বিশ্বাস অন্তত গোটা দুই ব্লাউস কেস হবে।"

"কি করব বুড়ো বয়সে ওসব নিয়ে।"

"বুড়ো বয়সকে অমন উপেক্ষার চক্ষে দেখো না। সার্ভেন্টিস তাঁর বিখ্যাত বই 'ডন্ কুইকসেট' বুড়ো বয়সে লিখেছিলেন। ইতিহাস ওলটালে দেখতে পাবে আরও অনেক বুড়ো লোক অনেক গোঁয়ারতুমি করেছেন। এমন কি যুদ্ধও করেছেন, আকবর জাহাঙ্গীর শাজাহান, না ছোট গিন্নী? তুমি তো ইতিহাসে ছাত্রী।"

সন্ধ্যা কিল তুলিয়া বলিল, "ফের আমাকে ছোটগিন্নী বলবেন তো ভালো হবে না।"

"কোদালকে কোদাল বলাই তো ভালো।"

ঊষা হঠাৎ অনুযোগের সুরে আবদার-মাখা কণ্ঠে বলিল, "জামাইবাবু আমাদের দিকে আর ফিরেও চান না। দিদির দিকে তো নয়ই, আমার দিকেও না!"

"আহা, বুঝতে পারছ না। তোমরা হ'চ্ছ আমার রিজার্ভ ফরেস্ট। সন্ধ্যারানী বিলকুল রঙ্গনাথের। ওখানে একআধবার পোচিং করতে লোভ হয় মাঝে মাঝে।"

হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটার মোড় ঘুরিয়া গেল এক মিলিটারি-পোশাকপরা যুবকের আবির্ভাবে।

"কে আসছে বল তো"—ঊষা মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

"এ কি! ও যে ঘন্টু! ঘন্টু এসেছে!"

উচ্ছ্বসিতা কিরণ আত্মহারা হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেল। ঘন্টু আসিয়া প্রণাম করিল সকলকে।

"কি লম্বা হয়েছিস রে তুই। একেবারে তালগাছ হচ্ছিস যে।"

কৃষ্ণকান্ত একবার পুত্রের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন। ঘন্টু বলিল, "বাবা তোমার কুমীরটা এসে পেঁাছে গেছে। এতবড় কুমীর আমি দেখিনি। বিরাট!"

কৃষ্ণকান্ত কিছু না বলিয়া কিরণের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ নিজের ছেলের মুখ থেকেই শোন, কি কাণ্ডটা করিয়া আসিয়াছি।

ঊষা বলিল. "তুই এসেছিস, এবার দিদির মুখে একটু হাসি ফুটবে। ছেলে ছেলে করে অস্থির একেবারে। শুনেছিলাম ছুটি পাবি না, হঠাৎ পেয়ে গেলি কি করে।"

"পেতাম না। বাবা কর্নেল জেফারসনকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ছুটির। মিলিটারিতে ছুটি পাওয়া শক্ত।"

কিরণ কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি যে চিঠি লিখেছ একথা তো আমাকে বলনি।"

এবারও কৃষ্ণকান্ত কিছু বলিলেন না, কেবল মুচকি হাসিলেন।

সন্ধ্যা একধারে দাঁড়াইয়া তাহার বান্ধবী সীতিয়ার সহিত কথা বলিতেছিল। সীতিয়া যেই শুনিল ওই মিলিটারি সাহেব কিরণের ছেলে সে অবাক হইয়া গালে হাত দিল। সন্ধ্যা বলে কি! ওই জোয়ান লম্বা সাহেব ওই অতটুকু কিরনদির ছেলে! তাহার পর হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া বলিল—"আপসোস যে তোর একটাও ছেলে হলো না। আমার শ্বশুরবাড়ীতে 'ধরমবাবার থান' আছে। সেখানে মানত করলে ছেলে হয়। মানত করবি?"

"চুপ কর"—হঠাৎ ধমকাইয়া উঠিল সন্ধ্যা।

তাহার পর ও-প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য কৃষ্ণকান্তের কাছাকাছি আসিয়া বলিল, "আপনার বুঝি মিলিটারি সাহেবদের সঙ্গে আলাপ আছে জামাইবাবু—"

"কে বললে—"

"ওই যে ঘন্টু বলছে কর্ণেল জেফারসনকে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন বলে ওর ছুটি হয়েছে—"

"কর্ণেল জেফারসন যখন মেজর ছিল তখন আমরা একসঙ্গে শিকার করেছি এককালে। মিলিটারিতে ঢোকবার ইচ্ছে আছে নাকি তোমার।"

"আমার একটা ঘোড়া কেনবার খুব শখ। শুনেছি মিলিটারি লোকেরা ঘোড়া ভালো চেনে।"

"তা চেনে। কিন্তু যে ঘোড়াটি তোমার আছে সেটিও তো বেশ ভালো—"

"আমার আবার ঘোড়া কোথা!"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, ঘন্টু চিত্রা স্বাতী লীলা নীলা—অর্থাৎ

ছেলেমেয়েরা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গিয়াছে। তখন তিনি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "কেন, রঙ্গনাথ—"

সন্ধ্যা তাঁহার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল। কিরণ ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল. "কি যে অসভ্যতা করিস—"

উষা খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

॥ ২১ ॥

সূর্যসুন্দরের ঘরে খুব আড্ডা জমিয়াছিল। তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল লীলা নীলা চিত্রা। একটু আগে উষাও ছিল, সে তাঁহাকে সালংকারে এবং সবিস্তারে বাগানের মিটিংয়ের বর্ণনা শুনাইয়া ছেলেদের খাওয়াইতে গিয়াছে। সে বাগানে যে গানটা গাইয়াছিল সেটাও সূর্যসুন্দরকে শুনাইয়া দিয়াছে। লীলা নীলা চিত্রা সেই উদ্দেশ্যে আসিয়া বসিয়াছিল। মীটিংয়ে তাহারা যে গানবাজনা করিয়াছে তাহা দাদুকে শুনাইবে। কিন্তু বাধা পড়িয়া গেল, আশপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে নানাবয়সের ও নানাজাতের স্ত্রী পুরুষ সূর্যসুন্দরের খবর লইতে আসিয়াছিল। ভোজের বাড়ীতে কেহই শুধুহাতে আসে নাই। চাল ডাল তরিতরকারি দুধ মাছ যে যাহা পারিয়াছে আনিয়াছে। সূর্যসুন্দরের ঘরের প্রকাণ্ড মেঝেতে প্রকাণ্ড একটা শতরঞ্চি পাতাই ছিল। সকলে তাহার উপর আসিয়া বসিল। সকলেরই দৃষ্টি ভক্তি-নম্র এবং ভয়-বিহ্বল। কেহই একটিও কথা বলিতেছিল না। অনেকে হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল।

সূর্যসুন্দরই কথা বলিলেন—"তোমরা এসেছ এতে আমি খুব খুশী হয়েচি। তোমরা সবাই এখানে খেয়ে যেও। এ তোমাদেরই বাড়ী। এ তিনটি আমার নাতনী। পৌত্রী। এরা আমাকে গানবাজনা শোনাবে বলে বসেছে। তোমরাও শোন।—"

পেট-পচা কবিরাজও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

"বাঃ এখানেও বেশ সভা বসে গেছে দেখছি। চন্দরবাবুর ওখানেও সভা বসেছে। ধর্ম আলোচনা চলছে। এখানে কি হচ্ছে?"

"গানবাজনা হবে। নাতনীরা গাইবে বাজাবে—"

"বাঃ বাঃ বাঃ। একে গানবাজনা, তায় নাতনীরা করছে। সোনায় সোহাগা। এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। আমিও বসলুম একধারে।"

"হ্যাঁ বসুন না—"

প্রথমেই চিত্রা বেহালাতে রবীন্দ্রনাথের একটা গান বাজাইল—"না, না গো না, ক'রো না ভাবনা"। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাহবা দিয়া উঠিলেন কবিরাজ মশাই।

বলিলেন, "ইনি যদি এস. পি. সাহেবের আপিসে বসে বেহালা বাজান তাহলে চোর বদমায়েশরা আপনি এসে ধরা দেবে, তাদের নামে আর ওয়ারেণ্ট ইস্যু করতে হবে না!"

সংগীতচর্চায় কিন্তু বাধা পড়িয়া গেল।

নিখিলবাবু একটি টেলিগ্রাম লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"গগনের শ্বশুর শাশুড়ী আসছেন। স্টেশনে গোটা চারেক পালকি পাঠিয়েছি।

বীরুকে নিয়ে আমি স্টেশনে যাচ্ছি। গগনকে যেতে বললাম কিন্তু ও যেতে চাইছে না। দিগন্তকে নিয়ে যাচ্ছি অগত্যা—"

"ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা কোথা হবে—"

"আমাদের চোয়ারিতে। অত বড় বাংলো রয়েছে। শোবার ঘর বাথরুম সব ঠিক আছে। জলটল তুলিয়ে রেখেছি, বিছানাটিছানাও রেডি। চোয়ারি বাড়ীতে মাছ মাংসও রান্না করছে দুনিয়ালাল।"

"চারটে পালকি পাঠাচ্ছেন কেন? আরও কেউ আসবে নাকি?"

"হ্যাঁ ধনুকধারীবাবু আর সোমেন্দ্রবালাও আসছে যে। তাদের টেলিগ্রাম পেয়েছি—"

"ও, সোমেন আসছে? বাঃ। সে কি করে খবর পেলে—?"

"কলকাতাতেই ছিল বোধহয়—"

"ওর শ্বশুরবাড়ী তো রংপুর-"

"সেখান থেকে অনেকদিন আগেই চলে এসেছে। ওর স্বামী সীতানাথও চলে এসেছে!"

"মনু আর টুনু কোথা আজকাল বলুন তো—"

"মনু তীর্থ করতে বেরিয়েছে। টুনু আছে বোম্বেতে তার স্বামীর কাছে। ট্রেনের সময় হলো, আমি স্টেশনে চললুম—"

নিখিলবাবু চলিয়া যাইবার পরই ঘণ্টুকে লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল। ঘণ্টুর চেহারাটি চমৎকার। রাজপুত্র যেন।

"বাবা, ঘণ্টুর সঙ্গে আলাপ করলে? ছেলে কি কাণ্ড করেছে জান? দশখানা শাড়ি এনেছে। আর আপনার জন্যে এনেছে ভালো একটা পাঞ্জাবির কাপড়। খুব ভালো ভায়েলা। আজকাল পাওয়া শক্ত। ও মিলিটারি স্টোর থেকে এনেছে-"

"কেন এত খরচ করতে গেলে দাদু—"

"আমাদের বংশের ধারাই যে ওই। এক টাকা আয় হ'তে না হ'তেই দু'টাকা খরচ করবার ফন্দী মাথায় এসে যায়। টাকা ধার করে এনেছে, জান?"

"কি যে তুমি কর মা!"—ঘণ্টু বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

কবিরাজ মশাই মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন—"চালুনি বলে ছুঁচ তোর চোখে কেন ছ্যাঁদা—!"

সূর্যসুন্দর প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"বড়বৌমা কোথা? চম্পা কোথা? গগনের শ্বশুর শাশুড়ী এই ট্রেনে আসছেন। নিখিলবাবু তাঁদের আনতে স্টেশনে গেলেন।"

"তাই না কি। বাঃ কি মজা!"

কবিরাজ মশাই নীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমাদের গানের আসরটা কিন্তু মাটি করে দিলে পাঁচজনে মিলে। চিত্রা দিদির বেহালা যা শুনলাম—সেরেফ হেভেন্‌লি! না ভুল বললাম—হেভেনের কোন অভিজ্ঞতা নেই আমার—বলতে পারি লাভ্‌লি, সুপার্ব।"

"ঘণ্টুও চমৎকার ইংরেজী গান গাইতে পারে কবিরাজ কাকা। শুনুন না, মনে হবে ঠিক সায়েব গাইছে—"

"গাও না ঘণ্টু দা।"—চিত্রা অনুরোধ করিল।

"দূৎ, মায়ের কথা শুনিস কেন—"

ঘণ্টু উঠিয়া চলিয়া গেল।

যাহারা দূরের গ্রাম হইতে সূর্যসুন্দরকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা উসখুস করিতেছে দেখিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন—"কিরণ এদের খাবার ব্যবস্থা করে দে –"

"এস—"

কিরণ তাহাদের লইয়া পশ্চিমদিকের বারান্দায় চলিয়া গেল। কবিরাজ মশাই লীলা নীলার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমাদের বাজনা শোনাও এবার—"

"এত গোলমালে ভালো হবে না।"

তাহারাও উঠিয়া পড়িল। প্রবেশ করিল স্বাতী মুচকি হাসিতে হাসিতে।

"কাকিমা আপনাকে মা ডাকছেন। আপনি চা খেয়ে আসুন। আমি দাদুর কাছে বসছি—"

উর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার দিকে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, সে যে একধারে বসিয়া আছে ইহা কেহ যেন লক্ষ্যই করে নাই। স্বাতীর কথায় একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া উর্মিলা উঠিয়া পড়িল এবং স্বাতীর কানে কানে বলিল—"সাড়ে সাতটার সময় বাবাকে ওই মিকশ্চারটা খাওয়াতে হবে। আর দশ মিনিট বাকি আছে। খাওয়াবার সময় গলায় তোয়ালেটা ভাল করে দিয়ে দিও। কেমন ?"

উর্মিলা চলিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীর দিকে চাহিয়া ভুরু নাচাইয়া বলিলেন—"দিদি তুমি না কি আজ খুব ভালো বক্তৃতা দিয়েছ শুনলাম।"

"আমি !"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ তুমি। রিপোর্টাররা যা বলছে তা শুনে তো অবাক হয়ে গেছি !"

"কে রিপোর্টার ? কি বলছে ?"

"দোসাদটোলার লেংড়িকে বললুম এক ছিলিম তামাক সেজে দে তো বেটী, সে হেসে বললে স্বাতী দিদি আজ কি বলেছে জান ? প্রত্যেকের উচিত কাজে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু আপনার কাজে আমি ফাঁকি দেব না। এখনই সেজে এনে দিচ্ছি। বলে হেসে চলে গেল। একটু পরে এনেও দিলে এক ছিলিম তামাক—"

স্বাতীও খুব হাসতে লাগল।

"আমি কি করি বলুন। আমি কি বক্তৃতা করতে পারি ? কিন্তু ছোটপিসি একেবারে না-ছোড়, করতেই হবে। তাই কি করি—উঠে যা মনে এল বলে দিলুম—"

"দিদি তুমি যা বলেছ তা মস্ত একটা দার্শনিক তত্ত্ব। বড় বড় সাধকরা বলেছেন যে সংসারের তুচ্ছ কাজে যতটা সম্ভব ফাঁকি দেবে। শারীরিক মেহনত কমাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বড় বড় আবিষ্কার করেছেন। এখন কুয়া থেকে জল তুলতে হয় না, কল ঘোরালেই জল পড়ে। বড় বড় সাধুরা সব চোখ বুজে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকেন, কেউ কুটোটি নাড়েন না। মানুষ যত সভ্য হয় ততই সে দৈহিক মেহনত করা কমিয়ে দেয়। ওইটেই হচ্ছে সভ্যতার লক্ষণ। তুমি মস্ত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছ দিদি—"

"আমাকে অত বোকা ভাববেন না যে ঠাট্টা বুঝতে পারি না !"

স্বাতী মৃদু হাসিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে গিয়া উপবেশন করিল।

"তাহলে আমার তো সেই গল্পের বাঁদরের মতো দশা হলো দেখছি। পারস্যদেশের এক রাজকুমারী পশুপক্ষীর কথা বুঝতে পারতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একটা বুড়ো বাঁদর তাঁর জানলার নীচে উর্ধ্বমুখ হয়ে বসে আছে। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাঁদরটা বললে—দেবি, আপনি বেহেস্তের হুরীর চেয়েও সুন্দরী, আশা করি আপনার মনটাও মাখনের মতো নরম, আপনি কি দয়া করে আমাকে একটা কলা দেবেন? শুনেছি আপনার জন্যে লবঙ্গ দ্বীপ থেকে কলা আসে। রাজকুমারী বলিলেন—তুই মিথ্যুক খোশামুদে বাঁদর, তোকে কিছু দেব না, তুই দূর হয়ে যা। বাঁদর চলে গেল। তারপরদিনই রাজকুমারী দেখলেন বাঁদরটা আবার এসেছে। চোখাচোখি হতেই সে হেসে বললে— দেবি, কাল আমি সত্যিই আপনার রূপের কথা বাড়িয়ে বলেছিলাম। আপনি বেহেস্তের হুরী নন, আপনি সাধারণ মানবীও নন। আমার এক দিদিমা ছিলেন তাঁর সঙ্গে আপনার প্রচুর সাদৃশ্য আছে। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সেই ভালোবাসার দোহাই দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে দয়া করে একটা লবঙ্গ দ্বীপের কলা দিন। দ্বিতীয়বার বাঁদরটা সত্যিকথাই বলেছিল কিন্তু তবু রাজকুমারী তাকে দূর করে দিলেন, একটা কলাও দিলেন না।"

কবিরাজ মুখে হাত দিয়া খিকখিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। সূর্যসুন্দর কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিলেন না। তিনি বোধহয় কবিরাজ মহাশয়ের গল্পটাও শোনেন নাই। তিনি অন্য জগতে ছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি সম্মুখে যেন সিংজীর সেই টাট্টু ঘোড়াটা দেখিতে পাইতেছেন। ঘোড়াটার সামনের দুটো পা বাঁধা। ঘোড়াটা লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে। যেন ঘোড়া নয় বড় একটা ফড়িং। নদীর ঘাটে সিংজী বসিয়া ঘটি মাজিতেছেন। তাঁহার কানে হলদে পৈতে জড়ানো। পরনে হলুদ রঙের কাপড়। শুধু গা। খুব কম লোকই সিংজীকে তাঁহার বাড়ীতে দেখিতে পায়। এক তাঁহার বৃদ্ধ চাকর বৈজু ছাড়া। সিংজী বাড়ী ফেরেন রাত্রিতে। আসিয়াই নিজের দড়ির খাটিয়াতেই শুইয়া পড়েন। খাটিয়া বারান্দায় বিছানোই থাকে। বৈজু টাট্টু ঘোড়াটির সামনের পা দুইটি ছাঁদিয়া ছাড়িয়া দেয়, সে ফড়িংয়ের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া চরিয়া বেড়ায়। সিংজী আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়েন। মশারি খাটান না। আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শোন। রাত্রে তিনি খান না। ভোরে টাট্টুর পিঠে চড়িয়া বাহির হন পাঁচটার সময়। কাজি-গ্রামের নিকট গিয়া গঙ্গার ঘাটে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করেন। ঘাটের কাছেই বুলাকি সাহের দোকানে দহি-চূড়া এবং একটি লাড্ডু খান। তাহার পর এক ঘটি জল। টাটকা গঙ্গাজল। তাহার পর বুলাকি সাহের খাতায় সেদিনকার খাবারের দামটা উসুল করিয়া দেন। বুলাকি সাহ বহুকাল পূর্বে তাঁহার নিকট যে টাকা লইয়াছিল এইভাবে তাহা ধীরে ধীরে শোধ হয়। তাহার পর সিংজী টাট্টুর পিঠে চড়িয়া আবার বাহির হন। সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। সিংজী কুসীদজীবী। প্রায় দশ ক্রোশ জুড়িয়া নানা গ্রামে তাঁহার খাতক আছে। তিনি সমস্ত দিন তাগাদা করিয়া বেড়ান। যেখানে যতটুকু সুদ আদায় করিতে পারিতেন সেটুকু বটুয়াতে পুরিয়া লইয়া আসেন। বটুয়াতে তিনটি খোপ আছে। একটিতে থাকে একটি ছোট জাঁতি, কয়েকটি সুপারি এবং খইনিপাতা। দ্বিতীয়টিতে থাকে টাকা পয়সা। তৃতীয়টিতে নোট। টাকা

পয়সা বা নোট বেশীক্ষণ তাঁহার বটুয়ায় থাকিতে পায় না। হয় সেগুলি অন্য কোনও ঋণ-প্রার্থীকে দিয়া দেন না হয় পোস্টাপিসে জমা করেন। তাঁহার দৈনিক পরিক্রমার মধ্যে দুইটি পোস্টাপিস পড়ে। তিনি বা তাঁহার ঘোড়া ক্লান্ত হইলে তাঁহাকে সাধারণতঃ মাঠের মাঝে বা নদীর ধারে কোন গাছতলায় বিশ্রাম করিতে দেখা যায়। তখন তিনি বসিয়া স্বহস্তে সুপারি কুঁচাইয়া চিত্তবিনোদন করেন। কখনও ক্বচিৎ তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থাতেও দেখা যায়। যে শতরঞ্চিটি তিনি ঘোড়ার পিঠে চার পাট করিয়া দিয়া 'জিন' করেন সেইটিই গাছতলায় পাতিয়া উপবেশন এবং শয়নও চলে। কাহারও বাড়ীতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করা বা কাহারও সহিত অকারণে ঘনিষ্ঠতা করা সিংজী পছন্দ করেন না। ঘনিষ্ঠতা করিবার মতো আপনজনও তাঁহার কেহ নাই। সংসারে তিনি একা। স্ত্রী-পুত্র বহুপূর্বে মারা গিয়াছে। প্রথম জীবনে দুই একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দুই একজন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই সিংজী ঠকিয়াছেন, উপলব্ধি করিয়াছেন সকলেই তাঁহার টাকা হাতাইবার জন্যই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসে। দুই একবার ঠকিয়া আর ও ফাঁদে তিনি পা দেন নাই। পরে নিঃসঙ্গ থাকাটাই তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। যদিও তিনি সুদখোর মহাজন ছিলেন তবু তাঁহার মনে একটা বৈরাগ্যের ভাব ছিল। যখন নদীতীরে একাকী তিনি দূরদিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন তখন তাঁহাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন দার্শনিক বলিয়া মনে হইত। তিনি কি যে ভাবিতেন তাহা কেহ জানে না। তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ ঔৎসুক্যও ছিল না। কেহ তাঁহার নাম করিত না পাছে হাঁড়ি ফাটিয়া যায় বা আহারে অন্য কোন বিঘ্ন হয়। লোক তাঁহার মুখ দেখিলেও অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ন হইয়া পড়িত। সিংজীও কাহারও মুখ দেখিতে চাহিতেন না। ইহার একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছিল। ডাক্তার সুরযুবাবু। এই লোকটিকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সূর্যসুন্দরও শ্রদ্ধা করিতেন সিংজীকে। তাঁহার এই নিস্পৃহতা সূর্যসুন্দরের ভালো লাগিত। কাহারও সাতে-পাঁচে থাকিতেন না সিংজী। নিজেকে লইয়াই থাকিতেন। সিংজীর সহিত সূর্যসুন্দরের প্রথম পরিচয় হয় একটি দুরারোগ্য দাদের মাধ্যমে। দাদটি সিংজীর কোমরে ছিল। উপর্যুপরি তিনদিন একবার করিয়া একটি ঔষধ লাগাইয়া সূর্যসুন্দর দাদটি সারাইয়া দিয়াছিলেন। খুব জ্বালা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সারিয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য সূর্যসুন্দর কোন প্রকার ফি লন নাই। ঔষধের দাম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই হইতে সূর্যসুন্দরের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। সূর্যসুন্দরকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু কখনও তাঁহার সহিত গলাগলি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তাঁহাদের দেখা হইত মাঠে, ঘাটে বা গাছতলায়, ক্বচিৎ কখনও। অনেক সময় তাঁহার সহিত দেখা হইবার পূর্বেই তাঁহার টাট্টু ঘোড়াটাকে তিনি দেখিতে পাইতেন। ঘোড়াটা দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন সিংজী আশেপাশে কোথাও আছেন। সেই ঘোড়াটিকে সূর্যসুন্দর এখন দেখিতে পাইলেন। তিনি যেন নদীর উপর নৌকায় রহিয়াছেন, ঘোড়াটা নদীর ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে। একটু পরে সিংজীকে দেখিতে পাইলেন। কানে পৈতা জড়াইয়া ঘটি মাজিতেছেন। বহুকাল পূর্বে তাঁহার সহিত যে সব কথা হইয়াছিল তাহাও যেন তিনি শুনিতে পাইলেন।

"ডাক্তারবাবু যে। নমস্কার। কোথায় যাওয়া হচ্ছে—"

"ত্রিপুরাবাবুর বাড়ী থেকে ফিরছি। তাঁর একটি মেয়ে হলো।"

"অ। তাহলে তো অনেক টাকা কামিয়ে ফিরলেন—"

"তা পেয়েছি কিছু। কিন্তু আমার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে ত্রিপুরাবাবু স্কুলের জন্য পাঁচশ' টাকা দিয়েছেন—"

"কোন্ স্কুলের জন্য—এ অঞ্চলে তো কোন স্কুল নেই।"

"আমাদের গ্রামে একটা মাইনর স্কুল হচ্ছে। তারই জন্যে একটা বাড়ী তৈরি করতে হবে। তাই ভিক্ষে করছি সকলের কাছে—"

"স্কুল? স্কুল করে কি করবেন? ইংরেজি লেখা পড়া শিখলে তো সবাই বাবু হয়ে যাবে! সব ফুটানি করে বেড়াবে।"

"ইংরেজী পড়ে ভাল লোকও অনেক হয়েছে। জাত হিসেবে ইংরেজরা খুব বড়। আমরা সত্যি যদি তাদের মতো হতে পারি তাহলে আমাদের উন্নতিই হবে।"

"হাঁ?—"

সিংজীর সপ্রশ্ন ভ্রূকুঞ্চিত-দৃষ্টিটা সূর্যসুন্দর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য ব্যাপার! যে ঘরে যে পরিবেশে তিনি বসিয়া আছেন তাহা যেন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইয়া গেল। যে অতীত কবে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে সেই অতীত সহসা সম্মুখে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল কেন? তবে কি অতীত কোথাও বাঁচিয়া আছে? আজ কাল মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁহার এরকম হয়। অতীতের একটা তুচ্ছ ছবি হঠাৎ মনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়। আরও দুইটি কথা তাঁহার মনে পড়িল। ওই স্কুলের জন্য সিংজীও তাঁহাকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু একটি শর্তে। তাঁহার নাম যেন প্রকাশিত না হয়। সূর্যসুন্দর সিংজীর নিকট চান নাই, তিনি নিজেই রাত্রে আসিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দুই হাত ধরিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন তাঁহার নামটা যেন কেহ জানিতে না পারে। তাঁহার হাতের স্পর্শ তিনি যেন আবার অনুভব করিলেন। দ্বিতীয় যে কথাটা মনে পড়িল সেটা এই যে সেদিন তিনি ত্রিপুরাবাবুর যে কন্যাটিকে ফরসেপস্-এর সাহায্যে মাতৃজঠর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া ছিলেন, যাহার বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না, সেই সোমেন্দ্রবালা এই ট্রেনে আসিতেছে তাঁহাকে দেখিতে। কতদিন আগে সোমার জন্ম হইয়াছিল? সালটা কিছুতেই তিনি মনে করিতে পারিলেন না। সিংজীই বা কবে মারা যান? তাহাও মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছিল সুখপুরিয়ার মাঠে। আবার সমস্ত যেন অবলুপ্ত হইয়া গেল। দিগন্তবিস্তৃত প্রকাণ্ড মাঠ যেন চতুর্দিকে। মাঠের বুক চিরিয়া একটি সরু পায়ে চলার পথ দূরে আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। সেই পথে তিনি যেন একা চলিয়াছেন। যেন অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছেন। সারা জীবন। পথের অপর প্রান্তে—আকাশের গায়ে যেখানে পথটা গিয়া মিশিয়াছে—সেখানে আর একটা মূর্তি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। সেটা যেন তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কে ও?

বাহিরের পদশব্দে এবং কথাবার্তায় সূর্যসুন্দরের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। নিখিলবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে কয়েকজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গগনের শ্বাশুড়ী, ধনুকধারী, সোমেন্দ্রবালা এবং সকলের শেষে জগাই। সন্তোষের ছেলে জগাই। তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না, এমন কি সূর্যসুন্দরও নয়। জগাইয়ের

অদ্ভুত চেহারা। মাথায় বাবরির মতো লম্বা লম্বা চুল, একমুখ গোঁফ দাড়ি। চোখ দুইটি বিড়ালের চোখের মতো কটা এবং গোল। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়াছিল। সে একধারে একটু দূরে ছিল বলিয়া সূর্যসুন্দর হয়তো তাহাকে দেখিতেও পাইলেন না। সকলে একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল। গগনের শ্বশুর সাহেবী পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে একটু বেমানান দেখাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার মুখে যে ভদ্রতা এবং সসম্ভ্রম শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়াছিল তাহা অনুপম। গগনের শাশুড়ীর মুখে গালে, বিশেষ করিয়া গলার কাছে পাউডারের বাহুল্য একটু দৃষ্টিকটু হইয়াছিল। তাঁহার মুখের হাসিটাও মনে হইতেছিল মেকী, যেন বাহির হইতে কে মুখের উপর লাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তিনি যখন ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তখন সমস্ত ছবিটাই যেন বদলাইয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত দেখাইতেছিল সোমেন্দ্রবালাকে। শ্যামবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, হরিণের মতো বড় বড় কালো কালো চোখ। মুখখানি অতি সুকুমার। ঠোঁট দুটি খুব পাতলা। মুখের ভাব বালকের মতো। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার বয়স ত্রিশ পার হইয়া গিয়াছে। মনে হয় পনের ষোলো বছরের এক বালক মেয়েমানুষের পোশাক পরিয়া রহিয়াছে। মাথায় ঘোমটা নাই। মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো এবং ভ্রমরকৃষ্ণ। খুব বেশী চুলও নাই। সিঁথায় সিঁদুর হইতেই চেনা যায় সে পুরুষ নয় নারী।

"কাকাবাবু, আমায় চিনতে পারছেন? আমি সোমা—"

প্রণাম করিয়া হঠাৎ সে আঁচলের ভিতর হইতে এক জোড়া মোজা বাহির করিল।

"আপনার জন্যে মোজা বুনে নিয়ে এসেছি। পরিয়ে দিই?"

সূর্যসুন্দরের পায়ে মোজা ছিল। তাহার উপরই সোমা আবার মোজা পরাইয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—"ঠিক হয়েছে। আন্দাজী করেছি তো, আমার ভয় ছিল পায়ে হবে কি না—"

গগনের শ্বশুর সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"বাইরে তো মেলা বসে গেছে। দেখে আমাদের ভয়ই হয়েছিল। আপনাকে সুস্থ দেখে ভারী নিশ্চিন্ত হলাম।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"আমি ভালো আছি। তোমাদের সবাইকে দেখে আমার অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে এই ভিড়ে তোমাদেরই কষ্ট হচ্ছে খুব।"

"কিছু না, কিছু না, কোন কষ্ট নেই। আপনাকে এত লোক ভালোবাসে এত লোক শ্রদ্ধা করে, এ দেখে আমাদের নয়ন সার্থক হয়ে গেল।"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না। তাহার চোখের কোণে জল ছলছল করিতে লাগিল কেবল। নিখিলবাবুর অনেক কাজ। তিনি বলিলেন—"আপনাদের ব্যবস্থা চোয়ারিতে করেছি। সমস্ত দিন ট্রেনে কেটেছে, চলুন এবার একটু বিশ্রাম করবেন। তারপর আবার না হয় আসবেন, একটা পালকি আপনাদের জন্যে হাজির থাকবে—"

ধনুকধারী বলিলেন—"কাকাবাবুর কাছে ভিড় করে থাকাও ঠিক নয়। চলুন আমরা যাই, পরে আসা যাবে—"

বাবা মার সাড়া পাইয়া চম্পাও বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"গগনের মা কোথা?" গগনের শাশুড়ী প্রশ্ন করিলেন।

"মা ভিতরে আছেন। আসুন—"

চম্পা মা বাবাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সোমাও উঠিয়া পড়িল—"কাকাবাবু, আমিও কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এখুনি আসছি। একে চিনতে পারছি না তো—"

স্বাতীর দিকে চাহিয়া সোমা মুচকি হাসিল।

"ও বীরুর বড় মেয়ে—"

"বাঃ, কি সুন্দর। আমি আসছি এখুনি। সকলের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। অনেক নতুন লোক এসেছে বাড়ীতে—"

ধনুকধারীর সঙ্গে সোমা চলিয়া গেল। নিখিলবাবুও গেলেন।

"এরা কে দাদু ?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"জমিদার ত্রিপুরা সিংয়ের ছেলে মেয়ে। তুমি ভিতরে যাও, গগনের শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম কর গিয়ে।"

"হ্যাঁ যাও—" কবিরাজ মশায়ও সায় দিলেন।

স্বাতী উঠিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া আসিল আবার।

"দাদু তোমাকে মিকশ্চারটা খাওয়ানো হয়নি। গেলেই ছোটকাকী জিগ্যেস করবে—"

"ওষুধ খেতে আর ইচ্ছে করে না—"

"ওসব ছোটকাকীকে বোলো। আমি যদি ওষুধ না খাইয়ে যাই আমাকে বলবে ফাঁকিবাজ।"

"দাও তাহলে—"

নিপুণভাবে সূর্যসুন্দরের গলায় তোয়ালে জড়াইয়া স্বাতী তাঁহাকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর সে যাহা করিল তাহা অদ্ভুত। যে গ্লাসে করিয়া সে ঔষধ খাওয়াইল তাহাতে যে ঔষধটুকু লাগিয়া ছিল তাহা সে নিজের মুখে ঢালিয়া দিল। ফোঁটা দুই ঔষধ তাহার মুখে পড়িল। তাহার পর সবিস্ময়ে বলিল—"দাদু, এমন সুন্দর ওষুধ তুমি খেতে চাইছ না! এতো চমৎকার খেতে! এইবার সত্যি দুষ্টুমি আরম্ভ করেছ তুমি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

"দুষ্টুমি না করলে কি অমন সুন্দর মুখের বকুনি পাওয়া যায়!"

স্বাতী ঘাড় বাঁকাইয়া তির্যকদৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—"আপনাকে কলা এনে দিচ্ছি!" বলিয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় একটি দার্শনিক মন্তব্য করিলেন।

"পৃথিবীতে ফুল অনবরত ফুটে যাচ্ছে আর ঝরে যাচ্ছে। আমরা সবাই ফোটা ফুল আর ঝরা ফুলের মেলায় বসে আছি। আমরা যদিও ঝরা-ফুলেরই দলে তবু বেশ মজা লাগছে—",

কবিরাজ মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইল না, জগাই কুণ্ঠিতভাবে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ সসংকোচে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, বুঝিতে পারিয়াছিল যে সূর্যসুন্দর বুঝিতে পারেন নাই যে সে আসিয়াছে। সে পুনরায় প্রণাম করিয়া আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার সূর্যসুন্দর চিনিতে পারিলেন।

"কে জগু? তুই কখন এলি—"

সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তাহার দিকে।

"আমি এই এঁদের সঙ্গে এলাম—"

"আজকাল কোথা আছিস তুই—"

"ব্যাণ্ডেলে—"

"কি করিস সেখানে—"

জগাই কবিরাজ মহাশয়ের দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে যে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে কুলির কাজ করে তাহা আর ব্যক্ত করিতে পারিল না। কবিরাজ মহাশয়ও তাহার বাবাকে চিনিতেন, তাহাকেও চিনিতেন। তিনিও নীরব থাকাই সমীচিন মনে করিলেন।

জগাই বলিল, "এমনি একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছি।"

"আমার অসুখের খবর কি করে পেলি ?"

"মধু মোড়লের সঙ্গে পরশু ট্রেনে দেখা হয়েছিল, সেই বললে।"

"ভালো আছিস তো ?"

এই কথায় জগাই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল এবং চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"ভিড়ে আপনার কষ্ট হচ্ছে। এখন একটু খালি হয়েছে। চোখ বুজে একটু শুয়ে থাকুন। আমিও আর বসব না, উঠি। ওই যে ছোটমাও এসে গেলেন।"

কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন। ঊর্মিলা আসিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে বসিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল রামটহল। তাহার পিছনে আর একটি ভৃত্য। তাহার এক হাতে প্রকাণ্ড একটি রূপার পরাত এবং আর এক হাতে একটি হাঁড়ি। রামটহলের হাতে ছোট একটি থলি। থলিটি লাল রেশমের এবং কারুকার্যময়। সঙ্গে সঙ্গে গগনও আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কি রামটহল, এসব কি—"

"মালিক কুছু ভেট ভেজ দিহিন হঁয়।"

রামটহলের মুখ গর্বে আনন্দে উদ্ভাসিত। সে একটি পত্রও গগনকে দিল। ধনুকধারী সিং লিখিয়াছে।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, বৌমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার পাঠাইলাম। আমি একটি শাড়ি ও কুড়িটি মোহর আনিয়াছিলাম। সোমাও একটি শাড়ি এবং দশ সের সন্দেশ আনিয়াছে। গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। প্রণাম লইবেন। ইতি, প্রণত ধনুকধারী

গগন দেখিল দুইটিই বেশ মহার্ঘ শাড়ি।

সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন—"কি ওসব ?"

"ধনুকধারীবাবু আর সোমা চম্পার জন্য শাড়ি, সন্দেশ আর মোহর পাঠিয়েছেন—"

"ভিতরে নিয়ে যাও। বড়বৌমাকে দাও গিয়ে—"

সূর্যসুন্দর ক্লান্ত বোধ করিতেছিলেন। চোখ বুজিয়া রহিলেন। কিন্তু ঘুম আসিল

না। চোখের সম্মুখে রাজলক্ষ্মীর ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ঠিক যেন জীবন্ত মূর্তি। পরনে টকটকে লালপাড় শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করিতেছে। মনে হইল সে যেন কি বলিবে। কিন্তু কিছুই বলিল না, বলি-বলি করিয়া থামিয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তাহার পায়ে কে যেন হাত বুলাইতেছে। চোখ খুলিয়া দেখিলেন, জগু। জগু যখন এখানে স্কুলে পড়িত তখন সে তাঁহার পা টিপিত। রবিবার দ্বিপ্রহরে জগুকে দিয়া পা না টিপাইলে তাঁহার ঘুম আসিত না। সেই জগু এতদিন পরে আবার আসিয়াছে। সন্তোষের ছেলে! দেখিতে দেখিতে সব কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

॥ ২১ ॥

চম্পার সাধের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। কত লোক যে খাইয়াছিল তাহা কেহ গণনা করে নাই। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত অবিরাম লোক খাইয়াছে। নিখিলবাবুর কর্মতৎপরতা দেখিয়া যুবকের দল অবাক হইয়া গেল। বৃদ্ধবয়সেও যে তিনি এত খাটিতে পারিবেন, এমন নিখুঁত নিপুণ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। রমেশবাবু আশংকা করিয়াছিলেন যে সব ছেলে-ছোকরাদের উপর পরিবেশনের ভার থাকিবে তাহারাই শেষ পর্যন্ত কাজ পণ্ড করিয়া দিবে। কারণ রমেশবাবুর ধারণা আজকালকার প্রত্যেকটি ছোকরাই বাক্যবাগীশ এবং ফাঁকিবাজ। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ঠিক উল্টা। তাহারা এমন সুশৃংখলার সহিত এমন আন্তরিকভাবে কাজ করিল যে রমেশবাবুকে ধারণা বদল করিতে হইল। কিন্তু এই ছোকরার দলও হার মানিয়াছে বৃদ্ধ নিখিলবাবুর কাছে। তিনি চরকির মতো সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং সুদক্ষ সেনাপতির মতো সমস্ত ব্যাপারটার রাশ এমন দৃঢ়হস্তে টানিয়া রাখিলেন যে কোথাও ছন্দপতন হইল না। সুবাতালী তহশিলদার, গোবিন্দ মণ্ডল, চমকলাল সিং, ওঝাজি প্রভৃতি মাতব্বরগণও নিখিলবাবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রমেশবাবু বলিলেন— আমার মনে হচ্ছে কোন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব এসে কাজ করে গেল। ওই বখা ছোঁড়াগুলো যে অমনভাবে কাজ করল এতে আমি রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেছি। পচা ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে গেল, তাজ্জব ব্যাপার!"

"এর আর তাজ্জব কি আছে! মোহাব্বত্ সে সব কুছ্ হোতা হ্যায়। ডাক্তারবাবুকে সবাই ভালোবাসে, তাই জান দিয়ে সবাই খেটেছে। খাটনাই চাহিয়ে!"—সুবাতালী বলিলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম।"

গোবিন্দ মণ্ডল মাথায় হাত বুলাইয়া যখনই 'সীয়ারাম' উচ্চারণ করেন তখনই বোঝা যায় তিনি হয় কাহারও বাক্য সমর্থন করিতেছেন অথবা কাহারও বাক্যের প্রতিবাদ করিতেছেন। এক্ষেত্রে মনে হইল তিনি সুবাতালির উক্তির সমর্থন করিলেন। চমকলাল সিং একটি বিষয়ের জন্য মনে মনে উৎসুক ছিলেন। তিনি ওঝাজির সহায়তায় যে হারটি কলিকাতা হইতে আনাইয়া চম্পাকে উপহার দিয়াছেন তাহা চম্পার মনোমত

হইয়াছে কি না তাহা তিনি নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারেন নাই। গোবিন্দ মণ্ডলের উপর টেক্কা দিবার জন্যই তিনি হারটি কলিকাতা হইতে আনাইয়াছেন। গোবিন্দ মণ্ডল মুখে যতই 'সীয়ারাম' 'সীয়ারাম' করুন চমকলালের বিশ্বাস আসলে তিনি একটি গ্রাম্য ঘুঘু। কুমারকে যে তিনি প্রথম দিন আসিয়াই দুইশত টাকা দিয়াছেন ইহা তিনি গোপন করিতে চাহিলেও চমকলাল সিং জানিতে পারিয়াছেন। জানিতে পারিয়া মনে মনে হাসিয়াছেন—"গাঁওয়ার লোক কিনা! তাই নগদটাকা দিতে গিয়াছে। ডাক্তারবাবুর যেন টাকার অভাব!" ওঝাজি তাঁহাকে যে হারটি আনাইয়া দিয়াছেন সেটির দাম পড়িয়াছে পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা সাড়ে ছ আনা। হারের নাম 'পুষ্পহার'। হার দেখিয়া তাঁহার তো চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছে, এখন 'বহুমায়ী'র পছন্দ হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিয়াছেন এই ভিড়ে তাহা জানিবার উপায় নাই। ঠিক করিলেন পরে কোনও এক সময়ে আসিয়া জানিয়া লইবেন। সুবাতালী তহশিলদার খুব দামী রেশমী শাড়ি, রেশমী ওড়না এবং নগদ একশ এক টাকা দিয়াছেন। ভোজের দুধ দুই এবং ঘিও বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়াছেন তিনি। ধনী দরিদ্র সকলেই কিছু-না কিছু উপহার আনিয়াছে। এতো উপহার আসিয়া জুটিয়াছে যে ঘরে রাখিবার স্থান নাই।

সুবাতালী তহশিলদার মজলিসে বসিয়া সূর্যসুন্দর সম্বন্ধে যে গল্পটি করিলেন তাহা অদ্ভুত। সূর্যসুন্দর প্রথমে আসিয়া নাকি প্রিয়গোপালের বাবা হুকরু চৌধুরীর গোয়ালঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন তাঁহার কোন প্র্যাক্‌টিসই হয় হয় নাই। তখন ভেরোঁ দুবে, নিগম পাঠক আর কানু কছুয়ার খুব প্র্যাক্‌টিস। তিনজনই কবিরাজ। ডাক্তারবাবুকে তখন কেউ চিনিতই না। কোট প্যান্ট পরিয়া উনি গঙ্গার ধারে সকাল সন্ধ্যা আপনমনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এইভাবে রোজই বেড়ান, একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন গঙ্গার ধারে একটা লোক পড়িয়া আছে। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল কোন মাতাল বুঝি। কাছেই একটা নৌকা ছিল, তাহার মাঝি বলিল মাতাল নয়, মড়া। সূর্যসুন্দর কাছে গিয়া দেখিলেন। প্রথমে তাঁহারও মড়া বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন লোকটা তখনও মরে নাই। তাহার নিকটে বমি এবং পায়খানার চিহ্ন দেখিয়া তিনি আন্দাজ করিলেন লোকটার সম্ভবতঃ কলেরা হইয়াছিল, চিকিৎসা করিলে হয়তো বাঁচিতে পারে। তিনি গ্রামে ঢুকিয়া চেষ্টা করিলেন যদি একটা খাটিয়া এবং লোকজন জোগাড় করিয়া লোকটাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কেহই রাজী হইল না। তখন তিনি যাহা করিলেন তাহা একমাত্র তিনিই করিতে পারিতেন। লোকটাকে কাঁধে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া আসিলেন। তাহার চিকিৎসা করিয়া সেবা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিলেন। তাহার পর হইতেই একটা রব উঠিয়া গেল ডাক্তারবাবু মড়া বাঁচাইয়াছেন। তখন হইতেই তাঁহার প্র্যাক্‌টিস শুরু হইয়া গেল। কিছুদিন পরে ভেরোঁ দুবে, নিগম পাঠক এবং কানু কছুয়াও তাঁহাকে রোগী দিতে লাগিল। উহারা নিজেরাও শেষ পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর রোগী হইয়া পড়িয়াছিল। গল্পটি শেষ করিয়া সুবাতালী তহশিলদার বলিলেন, ডাক্তারবাবুর ভিতর একটা 'জাদু' আছে, যাহার সহিত তাঁহার একবার আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই। একেবারে আত্মীয়তা হইয়া গিয়াছে! তাহার পর চক্ষুর ইশারায় গোবিন্দ মণ্ডলকে দেখাইয়া

তিনি বলিলেন—মড়রজি তো ইহার সাবুত্ (সাক্ষী) দিতে পারেন। গোবিন্দ মণ্ডল চক্ষু বুজিয়া ছিলেন, তিনি হঠাৎ সীয়ারাম সীয়ারাম করিয়া উঠিলেন, সুবাতালীর কথায় তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিল মাত্র, কিন্তু তিনি চোখ খুলিলেন না। প্রথম যৌবনে গোবিন্দ মণ্ডল ত্রিপুরারী সিংহের বিরুদ্ধপক্ষ নীলকর জমিদার টেলার সাহেবের পক্ষে ছিলেন। সূর্যসুন্দরকে অন্যান্য জমিদাররা সকলেই মনে করিত ত্রিপুরা সিংহের বন্ধু। ত্রিপুরা সিংহ প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন। অন্যান্য জমিদাররা তাঁহার ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। ত্রিপুরা সিংহের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া সূর্যসুন্দর প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। কারণ ত্রিপুরা সিংহের বন্ধু বলিয়া অনেকেই তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। গোবিন্দ মণ্ডলও এই দলে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র যখন টাইফয়েডে পড়িল এবং কানু কছুয়া, ভৈরোঁ দুবে দুইজনেই যখন জবাব দিয়া গেল তখন অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল সুরযুবাবুকে ডাকিয়া দেখাইতে। গোবিন্দ মণ্ডল প্রথম প্রথম সাহস করেন নাই। অবশেষে তাঁহার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল, তিনি গিয়া টেলার সাহেবের পরামর্শ চাহিলেন। সাহেবের হাটুতে বাত ছিল। তিনি বলিলেন ডাক্তার মুখার্জির মতো ভালো ডাক্তার এ অঞ্চলে নাই, আমিও তাঁহাকে দিয়া বাতের চিকিৎসা করাইব ভাবিতেছি। এতো লোক যখন তাঁহার সুখ্যাতি করে তখন লোক নিশ্চয় খারাপ নয়। যে ত্রিপুরা সিংহ কাহারও বশীভূত নন তিনিও যখন ডাক্তারবাবুকে অত খাতির করেন তখন বুঝিতে হইবে লোকটি সত্যই ভালো। গোবিন্দ মণ্ডল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া অবশেষে সূর্যসুন্দরকে একদিন 'কল' দিলেন। 'কল' দিয়াই বুঝিলেন সূর্যসুন্দর কি জাতের মানুষ। তিনি আসিয়াই কি বলিয়াছিলেন তাহা এখনও গোবিন্দ মণ্ডলের মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, বাঁচাইবার বা মারিবার মালিক ভগবান, তিনি নহেন। তিনি চেষ্টা মাত্র করিতে পারেন। তিনি আরও একটা কাজ করিয়াছিলেন, যাহা অদ্ভুত। কানু কছুয়া এবং ভৈরোঁ দুবেকেও ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে যদিও ইঁহারা কবিরাজী মতে চিকিৎসা করেন কিন্তু ইঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, কারণ ইহারা প্রবীণ চিকিৎসক। ইঁহাদের উপদেশ সর্বদাই শিরোধার্য। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়াই তিনি তাঁহার ছেলের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একষট্টি দিনের পর জ্বর ছাড়ে। আর একটা আশ্চর্য কথা, যতদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন এক পয়সা 'ফি' লন নাই। ফি দিতে গেলেই বলিতেন আগে ছেলে ভালো হোক, তাহার পর ওসব কথা হইবে। ছেলেকে যেদিন পথ্য দিলেন সেদিন প্রচুর সিধা, কাপড়-চাদর এবং দুইশত টাকার একটি থলি তিনি উপহার দিতে গেলে ডাক্তারবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও আশ্চর্যজনক। বলিয়াছিলেন, সিধা এবং কাপড়-চোপড় আমি লইলাম কিন্তু টাকাটা লইব না। উহার বদলে আরও বেশী মূল্যবান জিনিস আমি চাই। বিস্মিত গোবিন্দ মণ্ডল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সে জিনিস, ডাক্তারবাবু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, আপনার দোস্তি। পৃথিবীতে প্রেমই সর্বাপেক্ষা দামী জিনিস, তাহাই আমাকে দিন। ত্রিপুরারি সিংহের কথাও সেই সময় আলোচিত হইয়াছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে যে গল্পটি বলিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস্য। অন্য কেহ বলিলে তিনি বিশ্বাসই করিতেন না, কিন্তু সুরযুবাবুর কথা অবিশ্বাস করা যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন যখন তিনি এখানে আসেন তখন মাত্র বারো আনা পয়সা তাঁহার সম্বল ছিল। তাঁহার মামা

সাহেবগঞ্জে ডাক্তারী করিতেন। তিনি ত্রিপুরাবাবুর দেওয়ান হুকরু চৌধুরীকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার ভাগিনেয়র থাকিবার একটা ব্যবস্থা তিনি যেন করিয়া দেন। সেই সময় হুকরু চৌধুরী তাঁহার গোয়ালের ঠিক পাশেই গরুর চাকরদের শুইবার জন্য মাটির একটি ঘর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই ঘরটিই তিনি ডাক্তারবাবুকে থাকিতে দিলেন। প্রথম প্রথম কোন রোগীই জুটিত না। ওই বারো আনা পয়সায় ডাক্তারবাবু এক মাস চালাইয়াছিলেন। তখন টাকায় বত্রিশ সের দুধ পাওয়া যাইত। ডাক্তারবাবু প্রত্যহ দুই পয়সার দুধ কিনিতেন। তাহাতেই তাহার দুইবেলার খাওয়া হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে দেওয়ানজির বাড়ী হইতেও তাঁহার জন্য খাবার আসিত। এক মাস পরে ডাক্তারবাবু একেবারে নিঃস্ব হইয়া গেলেন। সুবাতালী তহশিলদার কলেরা রোগীর যে কাহিনীটি বলিলেন তাহা পরের ব্যাপার। স্বয়ং ডাক্তারবাবুর মুখ হইতে গোবিন্দ মণ্ডল আসল 'কিস্‌সা' (গল্প) আগেই শুনিয়াছেন। সুবাতালী আসল কথাটি জানেন না, একটা ভুল খবর শুনাইয়া দিলেন। প্রতিবাদ করা গোবিন্দ মণ্ডলের স্বভাব নয়। কিন্তু তিনি মনে মনে আসল 'কিসসা'টি রোমন্থন করিয়া নিমীলিতনয়নে ডাক্তারবাবু বর্ণিত চিত্রটি মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। নিঃস্ব ডাক্তারবাবু ক্ষুধার্ত অবস্থায় ত্রিপুরা সিংহের কাছারির সামনে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। কাছারির সামনে প্রচুর ভিড়। ত্রিপুরা সিংহের ম্যানেজার রায় মহাশয় আসিয়াছেন। টেলার সাহেবের সহিত একটা সংঘর্ষ আসন্ন। চারিদিকে সাজ সাজ পড়িয়া গিয়াছে। গোবিন্দ মণ্ডলের মনে পড়িল তিনি তখন বেরিয়া অঞ্চলের টেলার সাহেবের জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। কেহই ত্রিপুরা সিংহের বিরুদ্ধে লড়িতে রাজী নয়, পূর্বেই রায় মহাশয় সকলকেই নিজের দলভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন, কাছারির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে কোথাও বড় বড় পালোয়ানেরা কুস্তি করিতেছে, কোথাও তরবারি-খেলা হইতেছে, কোথাও লাঠি-খেলা। সপারিষদ রায় মহাশয় বসিয়া এইসব দেখিতেছেন। তাঁহার পাশেই টাকার থলি লইয়া গোমস্তা বসিয়া আছে, বিজয়ী বীরদের বকশিস দিবে। রায় মহাশয়ের এক চোখ কানা ছিল। একবার বিদ্রোহী সাঁওতাল প্রজাদের দমন করিতে গিয়াছিলেন, সাঁওতালের তীর লাগিয়া একটি চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, আর একটু বেশি বিঁধিলে প্রাণও যাইত। রায় মহাশয়ের চক্ষু একটি ছিল বটে কিন্তু ওই একটি চক্ষু দিয়াই তিনি যাহা দেখিতেন দুইটি চক্ষু দিয়াও অনেক লোক তাহা দেখিতে পাইত না। একটি অপরিচিত বাঙালী যুবক যে তাঁহার কাছারির সামনে পায়চারি করিতেছে ইহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। একজন লোক পাঠাইয়া তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন পরিচয় পাইলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ এবং পাশ-করা ডাক্তার (পাশ-করা ডাক্তার তখন ও অঞ্চলে ছিল না) তখন সমাদর করিয়া তাঁহাকে কাছে বসাইলেন এবং রাত্রে খাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। সেদিন ডাক্তারবাবুর আশঙ্কা হইয়াছিল হয়তো অনাহারে কাটিবে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভুরিভোজন হইল। শুধু তাহাই নয়, রায় মহাশয়ের সহিত সেদিন তাঁহার যে পরিচয় হইল তাহা ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হইয়া পরে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। রায় মহাশয় এবং তাঁহার পরিবারবর্গ পরে ডাক্তারবাবুর পরিবারের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুর সম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্য রায় মহাশয় প্রথম দিন পান নাই।

পাইয়াছিলেন প্রায় মাসখানেক পরে যখন টেলার সাহেবের সহিত দাঙ্গা হইয়া গেল। টেলার সাহেবের একজন লোক খুন হইয়া গিয়াছিল এবং পুলিশ ত্রিপুরা সিংহের সদর নায়েব ত্রিলোকনাথ পাণ্ডেকে আসামী হুলিয়া বাহির করিয়াছিল। রায় মহাশয় ত্রিলোকনাথবাবুকে বাঁচাইবার জন্য ডাক্তারবাবুকে একটি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন যে লিখিয়া দিন যে গত দুই মাস হইতে ত্রিলোকনাথ আমার চিকিৎসায় আছেন। ইহার জন্য ডাক্তারবাবুকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত 'ফি' কবুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু রাজী হন নাই। যদিও তিনি তখন নিঃস্ব, যদিও তিনি জানিতেন যে রায় মহাশয়ের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকের অনুরোধ উপেক্ষা করা বিপজ্জনক তবু তিনি রাজী হন নাই। রায় মহাশয় এ প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁহার মোক্ষম অস্ত্রটিও শেষ পর্যন্ত ছাড়িলেন। বলিলেন —ত্রিপুরা সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি আপনি এখানে থাকিতে পারিবেন? ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, আমি এখানে থাকিব না। যত শীঘ্র সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব। সত্যই তিনি একদিন চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া স্বয়ং ত্রিপুরা সিং আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাও অপ্রত্যাশিত। বলিলেন, মিথ্যা সার্টিফিকেট দুর্লভ নহে। মাত্র একশত টাকা খরচ করিয়া তিনি সিভিল সার্জনের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া আসিয়াছেন। সাঁচ্চা লোকই দুর্লভ। আপনার মতো সাঁচ্চা লোককে যখন আমরা পাইয়াছি তখন ছাড়িব না। আপনাকে এখানে থাকিতেই হইবে। আমি ম্যানেজারবাবুকে বলিয়া দিতেছি, আপনার থাকিবার সব সুব্যবস্থা তিনি করিয়া দিবেন। সেই হইতে ডাক্তারবাবু এখানে থাকিয়া গেলেন। গোবিন্দ মণ্ডল আর একবার সীয়ারাম সীয়ারাম বলিয়া হাই তুলিলেন। তাঁহারও এই মজলিসে ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কারণ তাঁহার ধারণা ডাক্তারবাবুর স্বরূপ তিনিই সকলের চেয়ে ভালো করিয়া চেনেন. তাঁহার বিষয়ে 'বহুত্ কিস্‌সা'ও তাঁহার জানা আছে, কিন্তু এই বাক্যবাগীশ ফপরদালালদের সহিত পাল্লা দিয়া গল্প বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ডাক্তারবাবুকে ইহারা কেহ চেনে কি? সব উপর-উপর দেখিয়াছে। চিনিত বটে কানা রায় মহাশয়। টেলার সাহেব চলিয়া যাইবার পর ডাক্তারবাবুর সুপারিশে গোবিন্দ মণ্ডল রায় মহাশয়ের সুনজরে পড়িয়াছিলেন। রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, আপনি যদি চান আপনাকেই মনিহারি কুঠির নায়েব করিয়া দিব। কিন্তু গোবিন্দ মণ্ডল রাজী হন নাই, কোথাও চাকরি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। অতবড় একটা দুর্দান্ত লোক তাঁহাকে যে নেকনজরে দেখিতেছেন ইহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে আর একবার মাথায় হাত বুলাইলেন।

চমকলাল সুবাতালীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি ডাক্তারবাবুর জাদুর কথা যাহা বলিলেন তাহা খুবই ঠিক। কিন্তু ওই জাদুর মন্ত্রটি কি তাহা জানেন? তিনি সকলের মুখের দিকে একটা স্পর্ধিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন যেন আসল সত্যটি তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না, জানিতে পারেন না. যদি কেহ জানেন তাহা হইলে তিনি তাহা এই মজলিসে ব্যক্ত করুন। কেহই কিছু ব্যক্ত করিল না, সকলেই তাঁহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চমকলাল বলিলেন, ডাক্তারবাবুর আসল জাদু কেবল তাঁহার উদারতাই নয় সে উদারতার জন্য বিপদকে

তুচ্ছ করিবার আগ্রহ এবং জিদ। আজ বহ্কাল আগেকার একটা কথা মনে পড়িতেছে। তখন আমি ব্তর্ (ছোট বালক), ডাক্তারবাব্র প্র্যাক্টিস তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রপ্রে আমার এক নানী ছিল। নানী খবর পাঠাইল যে তাহাদের এক 'পড়োশী' (প্রতিবেশী) ঠাণ্ডা লাগিয়া বড়ই বেহালত্ (অসুস্থ) হইয়া পড়িয়াছে। কান্ কছ্য়া বলিয়া গিয়াছে ব্কে কফ বসিয়া নিমোনিয়ায় দাঁড়াইয়াছে। সুরয্বাব্ ডাক্তার আসিয়া যদি হাল ধরেন তবেই নৌকা পারে লাগিতে পারে। কিন্তু বেচারী বড়ই গরীব, সুরয্বাব্র ফিস্ দিবার সামর্থ্য নাই। সেদিন আমাদের জলকর হইতে মাছ আসিয়াছিল। বাবা একটা বড় দশ-সেরী রহ্ (র্ই) ডাক্তারবাব্কে ভেট পাঠাইলেন সঙ্গে আমি গেলাম। তখন বর্ষাকাল, বড় মাছ পাওয়া যায় না, ডাক্তারবাব্ মাছটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সুযোগ ব্ঝিয়া আমি নানীর পড়োশীর কথা পাড়িলাম। ইহাও বলিলাম যে সে বড় গরীব, ফিস্ দিতে পারিবে না। ডাক্তারবাব্ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, বেশ আমি গিয়া দেখিয়া আসিব। তুমি একটা নৌকা লইয়া এস। আমি ইহা প্রত্যাশা করি নাই। বাবাকে গিয়া বলিলাম, তিনি একটা নৌকা ঠিক করিয়া দিলেন। আমিই ডাক্তারবাব্র সহিত গেলাম। নৌকা যখন গ্রামের সীমানা পার হইয়া গেল তখন আমার মনে হইল এ কোথায় চলিয়াছি, চারিদিকেই জলে জলময়, গ্রামের কাছেই সমন্দর (সম্দ্র) আসিয়া গেল না কি। অমন বান আমি আর কখনও দেখি নাই। মাঝিটা ভয় পাইয়া গেল। আমরা তখন মেদিনীপ্রের কাছাকাছি গিয়াছি। সে বলিল কোথাও কিছ্ ঠাহর হইতেছে না, আমি যাইতে পারিব না। ডাক্তারবাব্ বলিলেন, বেশ তুমি না যাইতে চাও তো ভগ্গ্ মাঝিকে ডাকিয়া আন, তাহার বাড়ী কাছেই। মাঝি একটা নৌকা বাঁধিয়া ভগ্গ্কে ডাকিতে গেল। আমরা ভগ্গ্র জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। ডাক্তারবাব্ এ সুযোগের অজ্হাতে অনায়াসেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু আসিলেন না। ভগ্গ্র আগমন প্রতীক্ষায় সেই নৌকার উপর বসিয়া রহিলেন। আমারও ভয় করিতে লাগিল, আমিও ডাক্তারবাব্কে বলিলাম, চল্ন বাড়ী ফিরিয়া যাই। তখন ডাক্তারবাব্ আমাকে একটি কথা বলিয়াছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। বলিয়াছিলেন, রোগীটি গরীব, আমাকে ফিস্ দিতে পারিবে না একথা না জানিলে ফিরিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু ওকথা শ্নিয়া আর ফিরিতে পারি না, আমাকে যাইতেই হইবে। ভগ্গ্ও আসিয়া দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চাহিয়া ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, ডাক্তারবাব্, কাল থেকে আমার পেটে খ্ব 'দরদ', আমি এ মেহনতের কাজ গছতে পারব না। ডাক্তারবাব্ ব্ঝিলেন ভগ্গ্ 'মক্ড়া' (ভান) করিতেছে। বলিলেন, তুমি 'ঝ্ট বাত' (মিথ্যা কথা) বলিতেছ কেন। তোমার যে কিছ্ হয় নাই তাহা তো তোমার ম্খ দেখিয়াই ব্ঝিতে পারিতেছি। আমি এখন না গেলে একজন লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে। তুমি থাকিতে আমি সেখানে পৌঁছিতে পারিব না, ইহা বড়ই আপসোসের কথা। মাস দ্ই আগে তোমার বেটী জ্বরে বেহোঁশ (অজ্ঞান) হইয়া গিয়াছিল তখন অন্ধকার রাত্রে তুমি আমার নিকট ছ্টিয়া গিয়াছিলে। আমি যদি তখন না আসিতাম তোমার কি রকম মনে হইত? ডাক্তারবাব্র কথা শ্নিয়া ভগ্গ্ একটু নরম হইল। কিন্তু তব্ মিথ্যাটাকে ছাড়িল না। বলিল, তাহা হইলে আমাকে একটা দরদের দাবাই দিন। সত্যই দরদ এখনও একটু একটু আছে। ডাক্তারবাব্ ঔষধ দিলেন। ভগ্গ্

নৌকায় উঠিয়া বৈঠায় বসিল। ভগ্‌গুর মতো অভিজ্ঞ মাঝিকে সঙ্গী পাইয়া আমাদের মাঝিটাও যাইতে রাজী হইয়া গেল। অমন প্রবল বন্যা আমি আমার জীবনে কখনও দেখি নাই। যতদূর দেখা যায়, কেবল জল আর জল, মাঝে মাঝে কেবল বড় বড় গাছের মাথা, কোথাও কোথাও বা নিমজ্জিত গ্রামের ঘরগুলি। আমাদের চেনা পথ-ঘাট যেন একাকার হইয়া অচেনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভগ্‌গুর মুখ প্রশান্ত, ডাক্তারবাবুও নির্বিকার। বান কেন হয় তিনি আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়াই ভগ্‌গু বলিল হাওয়ার গতি, পাখীর ওড়া এবং মেঘের 'লছ্‌ছন্‌' দেখিয়া তাহার মনে হইতেছে যে কিছুক্ষণ পরেই আবার দুর্যোগ নামিবে। সুতরাং রাত্রের মতো হাঁসবর গ্রামে আশ্রয় লওয়াই উচিত, সেখানের ভেজু তেওয়ারির বাড়ীটা ডোবে নাই। ডাক্তারবাবু রাজী হইলেন না। বলিলেন, শক্ত রোগী দেখিতে যাইতেছি। অত ভবিষ্যৎ ভাবিলে চলিবে না। বিপদ উপস্থিত হইলে তখন যাহা হয় করা যাইবে। ডাক্তারবাবুর জিদ দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। নৌকা চলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু ভগ্‌গুকে গান গাহিতে বলিলেন, এমন কি কোন্‌ গানটি গাহিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। ভগ্‌গু গাহিতে লাগিল, "পম্পাতীরমে শোভত হ্যায় সীয়ারাম লছমনজী"। ভগ্‌গুর সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর জ্ঞান দেখিয়া আমি তাজ্জব বনিয়া গেলাম। আমিও ভগ্‌গুকে অনেকদিন হইতে চিনিতাম কিন্তু সে যে এমন ভালো গান গাহিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। গান গাহিয়া এবং গল্প করিয়া অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল। তাহার পর হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে। ভগ্‌গু অভিজ্ঞ মাঝি, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। একটু পরেই তুমল দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল। ঝড় ও বৃষ্টি। ভগ্‌গু বলিল আর নৌকা চালানো যাইবে না। সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিল। কাছেই বেশ একটি বড় জিওল গাছ ছিল। ভগ্‌গু তাহারই গুঁড়িতে বেশ শক্ত করিয়া নৌকাটা বাঁধিল। আমরা সকলে নৌকার ছইয়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। ডাক্তারবাবু অনেক মজার মজার গল্প বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঝড়ের বেগে নৌকাটা দুলিতেছিল, তাহাতে ঘুম শীঘ্রই আসিয়া গেল। ভগ্‌গু সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, জাগিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত রাত ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি চলিল। ভগ্‌গু নৌকার পিছন দিকে ও দুই পাশে বাঁশের লগি পুঁতিয়া কখন যে নৌকাটাকে আবার বাঁধিয়াছিল তাহা আমি জানি না। আমি তখন বুত্‌রু ছিলাম, এমন অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম যে সমস্ত রাত আর জাগি নাই। সকালে ডাক্তারবাবু আমাকে জাগাইলেন। বলিলেন, দেখ দেখ একটা মজার জিনিস দেখ। এমন জিনিস আর দেখিতে পাইবে না। দেখিয়া সত্যই তাজ্জব বনিয়া গেলাম। গাছের উপর তিনটি বড় বড় সাপ এবং অনেক ব্যাঙ একত্রে রহিয়াছে। কেহ কাহাকেও কিছু বলিতেছে না। দেখিলাম একটা সাপের মুখের কাছেই একটি ব্যাঙ নির্ভয়ে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু বলিলেন একই বিপদে পড়িয়া ইহারা খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা হরিশ্চন্দ্রপুরে পৌঁছিলাম। সমস্ত দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর ঘাটে দেখিলাম কয়েকজন লোক লণ্ঠন এবং ছাতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলাম ত্রিপুরারি সিং অসুস্থ। তাঁহার জন্য চাঁচল হইতে ডাক্তার আনিবার জন্য লোক গিয়াছিল। আমাদের নৌকা দেখিয়া উহারা মনে করিয়াছিল যে চাঁচলের ডাক্তারই বুঝি

আসিলেন। আমাদের ডাক্তারবাবুকে লইয়া আমি নানীর বাড়ী চলিয়া গেলাম। ডাক্তারবাবু গিয়াই রোগী দেখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা 'সুই' (ইনজেকশন) দিলেন। তাহার পর খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থাও করিলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটি কাঠের বাক্স থাকিত, আপনাদের মনে আছে বোধহয়, সেইটিই ছিল তাঁহার ডিসপেনসারি। সেখান হইতে নিজে হাতে তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এক দাগ 'দাবাই' নিজে হাতে তিনি রোগীটিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন এখন 'বাচ' (ওয়াচ) করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি আবার একটা 'সুই' দিবেন। এই ব্যবস্থা করিয়া তিনি হাত মুখ ধুইয়া 'নাস্তা' (জলখাবার) খাইতে যাইতেছিলেন এমন সময় ত্রিপুরা সিংয়ের বাড়ী হইতে মুকুনবাবু (মুকুন্দবাবু) আসিয়া হাজির। ত্রিপুরা সিংহের শালা মুকুনবাবুর কথা ডাক্তারবাবু খুব মানিতেন। মুকুনবাবু বলিলেন চাঁচল হইতে ডাক্তার আসে নাই, ত্রিপুরা সিংয়ের চিকিৎসার ভারও আপনাকে লইতে হইবে। ত্রিপুরাবাবু আপনার কথাই বরাবর বলিতেছিলেন, কিন্তু আপনি এই বানের সময় অতদূর হইতে আসিতে পারিবেন কি না সে সন্দেহ সকলেরই হইতেছিল। আমাদের নৌকাটাও তত মজবুত নয়, তাই আমরা চাঁচলেই লোক পাঠাইয়াছিলাম। চাঁচল কাছেই কিন্তু সেখান হইতে ডাক্তারবাবু আসিতে পারিলেন না. ভগবান আপনাকেই শেষ পর্যন্ত পাঠাইয়া দিলেন। আপনিই চলুন, চিকিৎসার ভারটা নিন। ডাক্তারবাবু মুকুনবাবুর কথা ঠেলিতে পারিলেন না, 'নাস্তা' না করিয়াই চলিয়া গেলেন। ত্রিপুরা সিংয়ের পেটে ব্যথা হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর এক খোরাক ঔষধেই তাহা অনেকটা কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবু হরিশ্চন্দ্রপুরে সাত দিন ছিলেন এবং দুটি রোগীকেই পথ্য দিয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাবু তাঁহাকে নগদ তিনশত টাকা, প্রচুর সিধা, এক হাঁড়ি ঘি, এক হাঁড়ি দই ও কাপড় চাদর দিয়াছিলেন। নানীর 'পড়োশী' শিবু ধুনুকর টাকা দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে একটি সুন্দর 'রেজাই' (লেপ) উপহার দিয়াছিল। ডাক্তারবাবু এটি লইতে চান নাই, কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন যে না লইলে শিবু দুঃখিত হইবে তখন লইলেন। এত সব কথা আমি বুঝি নাই, কারণ তখন আমি 'বুতরু' ছিলাম, পরে বড় হইয়া বুঝিয়াছি।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, চমকলাল, তোমার চুলে পাক ধরিয়াছে বটে কিন্তু তুমি এখনও বুতরুই (শিশু) আছ। তাহা না হইলে মামুর (মামার) কাছে মৌসির (মাসীর) কিসসা শুনাইতে না। যাহা হউক যাহা বলিলে তাহা শুনিতে ভালোই লাগিল।

গোবিন্দ মন্ডল আর একবার সীয়ারাম সীয়ারাম বলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া নিমীলিত চক্ষু দুইটিকে আর একটু কুঞ্চিত করিলেন।

বাহিরের একটা আটচালায় মজলিস বসিয়াছিল। চমকলালের চোখ মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল সে সুবাতালীর কথার জবাবে আরও কিছু বলিবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, বাধা পড়িয়া গেল। ঘন্টু এবং তাহার পিছনে কয়েকটি চাকর প্রবেশ করিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই হাতে খাবারের থালা। গগনের শ্বশুর শাশুড়ী যে মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন তাহাই তাহারা আনিয়াছে। ঘন্টুর বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুবাতালী তহশিলদারের সহিত তাহার পূর্বেই আলাপ হইয়াছিল। তিনি সকলের সহিত ইহার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"কিরণকে বেটা ছে—"

যে কিরণকে তাহারা সকলেই কোলে-পিঠে করিয়াছে, যে কিরণ এই সেদিন পর্যন্ত বেণী দুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার ছেলে এত বড় হইয়া গিয়াছে ইহা দেখিয়া বৃদ্ধের দল সকলে অবাক হইয়া গেল।

রমেশবাবু ঘন্টুর মুখের দিকে এমন ভাবে চাহিয়া ছিলেন যেন তিনি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাহার পর সহসা তিনি ঘাড় নীচু করিয়া চমকলালের কানে কানে বলিলেন, "কিরণের ছেলে মিলিটারিতে বড় অফিসার। ওর ভয়ে দেরাদুনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।" কথাটা অবশ্য সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু আড্ডায় বা মজলিসে এরূপ মিথ্যা বেশ ফলপ্রদ। চমকলালের চক্ষু দুইটি ছানাবড়ার মতো হইয়া গেল। মিলিটারিকে তাঁহার বড় ভয়। একবার তাঁহার জমিদারিতে পিউনিটিভ পুলিশ বসিয়াছিল। মিলিটারির যথেচ্ছাচার যে কি জিনিস এবং সরকারের দরবারে মিলিটারির খাতির যে কত তাহার একটা সত্য-মিথ্যা-পূর্ণ ধারণা তাঁহার আছে। ঘন্টু সেই মিলিটারির বড় অফিসার ইহা শুনিয়া বুকটা গর্বে এমন ফুলিয়া উঠিল যেন ঘন্টু তাঁহারই ছেলে। ঘন্টুর সঙ্গে একটু আলাপ করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। একজন মিলিটারি অফিসারকে গেঞ্জি গায়ে এমন ঘরোয়াভাবে এত সন্নিকটে মিষ্টান্ন-পরিবেশকরূপে পাওয়া যাইবে তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা মনেই মিলাইয়া গেল। বাহিরে সাঁওতালী মাদলের শব্দ শোনা গেল—ধিতাং তাং ধিতাং তাং। একটু পরেই সাঁওতালের সরদার শনিচরিয়া আসিয়া আধা-হিন্দী আধা-বাংলা ভাষায় বলিল যে কাল ভোজের হাঙ্গামায় তাহারা বহুমায়ীকে 'নাচ' দেখাইতে পারে নাই, আজ দেখাইবে।

ঘন্টু এই খবর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

॥ ২২ ॥

হাটের উপর সাঁওতাল নাচ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। বড় গামহার গাছটার নীচে প্রশস্ত জায়গাটা ছিল সেখানেই কয়েকটা চেয়ার ইজিচেয়ার এবং শতরঞ্জির উপর বাড়ীর মেয়েরা এবং আত্মীয়স্বজনেরা সমবেত হইয়াছিলেন। চম্পা মাঝখানে বসিয়াছিল। অদ্ভুত সুন্দর দেখাইতেছিল তাহাকে। সে যে আসন্নপ্রসবা তাহা মনেই হইতেছিল না। তাহার দুই পাশে বসিয়া ছিলেন গগনের শ্বশুর শাশুড়ী। তাঁহারা দুইজনেই মুখে হাসি ফুটাইয়া রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহারা একটু সাহেবী মেজাজের মানুষ, এই গ্রাম্য উৎসব তাঁহাদের খুব খারাপ লাগিতেছিল না বটে, কিন্তু উৎসবটা ককটেল পার্টি বা ওই জাতীয় কিছু একটা হইলে তাঁহাদের বেশী ভালো লাগিত। ইংরেজীতে যাহাদের 'স্নব' বলে তাঁহারা ঠিক ততটা অদ্ভুত না হইলেও তাঁহাদের চাল-চলন কথাবার্তা অনেকটা সেইরকম। কোন্ স্যুটের কত দাম পড়িয়াছে, কোন্ দরজীর কত মজুরি, কম মজুরি লইয়াও কোন্ গলির দরজী সাহেব-বাড়ীর দরজীর মতো কাজ করে এই ধরনের আলাপেই তাঁহারা বেশী খুশী হন। সাঁওতাল নাচ দেখিয়া তাহারা অবশ্য খুশিই হইতেছিলেন। কিন্তু তবু

তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করিবার জন্য নিম্নকণ্ঠে দিগন্তের কানে কানে বর্মার লোকনৃত্যের সহিত সাঁওতাল নাচের তুলনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন আগে তিনি রেঙ্গুনে গিয়া পোয়ে নৃত্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং পোয়ে নৃত্য দেখিবার জন্য তাঁহাকে কি পরিমাণ কষ্ট এবং ব্যয় করিতে হইয়াছিল সেইটাও ফলাও করিয়া বলিতেছিলেন। দিগন্ত স্মিতমুখে সব শুনিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এখন নাচটা ভালো করে দেখা যাক পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।" গগনের শ্বশুর জানিতেন না বিভিন্ন দেশীয় নৃত্য সম্বন্ধে দিগন্ত একটি ভালো প্রবন্ধ লিখিয়া এলাহাবাদ কলেজের এক সাহিত্যসভায় খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। গগনের শ্বশুর চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার মনে হইল নিজের বিদ্যা বা 'কালচার' 'ফ্লারিশ' করাটা সত্যই এখন অশোভন। তিনি ভবিষ্যত কোন সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। এক ঊষা ছাড়া বাকি মেয়েরাও সব চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ঊষা যদিও চোখ রাঙাইয়া এক দুই তিনকে চুপ করিয়া থাকিতে উপদেশ দিতেছিল কিন্তু নিজে চুপ করিয়া ছিল না। সে নৃত্যপরা সাঁওতাল মেয়েদের সম্বন্ধে স্বাতীর কানে কানে ফিসফিস করিয়া যাহা বলিতেছিল তাহা প্রায় সকলেই শুনিতে পাইতেছিল।

"ওই বাঁদিকের মেয়েটার ফিগার কি চমৎকার দেখেছিস? কেন যে আমাদের ওরকম ফিগার হয় না, গাদা গাদা চর্বি চাপ চাপ হয়ে আমাদের সর্বাঙ্গে বসেছে খালি! ওমা, মাঝখানের ওই মেয়েটার মুখ ঠিক আমাদের ঘোষবাবুর মেয়ে শিউলির মতো নয়? শিউলির রংটা খালি ফরসা, চোখ মুখ নাক হুবহু এক—আশ্চর্য মিল তো।"

হঠাৎ দিগন্তর চোখের দিকে চাহিয়া ঊষা থামিয়া গেল। দিগন্ত মুখে যদিও কিছু বলিতেছিল না কিন্তু তাহার চোখে যাহা ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহা ভয়ংকর। কপাল হইতে চুলগুলাও সে যে ভঙ্গিতে সরাইতেছিল তাহা দেখিয়া ঊষা বুঝিতে পারিল তাহার ভিতর ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছে। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ভালো মানুষের মতো বসিয়া রহিল। স্বাতীও মুচকি হাসিয়া নাচ দেখিতে লাগিল, যেন সে এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না।

উশনার স্ত্রী জগন্ময়ী একধারে আধঘোমটা দিয়া নিজের মেয়ে দুটিকে লইয়া বসিয়াছিলেন। মেয়ে দুটি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নাচ দেখিতেছিল। চোখ বড় বড় করিয়া নাচ গিলিতেছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসব ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। জগন্ময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি বৈষ্ণববাড়ীর মেয়ে। তাঁহার বাপের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। সেখানে রাসের সময় পাড়ার ছেলে-মেয়েরা নাচিত। সেই কথাই তাঁহার মনে পড়িতেছিল। তাঁহার বাপের বাড়ীর পরিবেশ শ্বশুরবাড়ীতে নাই। বাপের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই সংসারের সব-কিছু হইত। মাংস বাড়ীতে ঢুকিত না। তাহার ভাই গজু লুকাইয়া অন্য বাড়ীতে মাংস খাইয়া আসিত। মাছ অবশ্য আসিত, কিন্তু কচিৎ। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে মাছ-মাংসেরই হুল্লোড়। জগন্ময়ীর প্রথম প্রথম খারাপ লাগিত, কিন্তু পরে সবই সহিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার নিজেরই মাছ-মাংস না থাকিলে খাওয়াটা অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। মানুষের, বিশেষতঃ মেয়েমানুষের, স্বভাবটা অনেকটা জলের মতো, যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এবং ধারণ করিয়া সুখ পায়।

সন্ধ্যাও একাগ্রচিত্তে একধারে বসিয়া নাচ দেখিতেছিল। 'ফোক ডান্স' সম্বন্ধে সে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছে, দিগন্তের রচনাটাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাহার। সে ভাবিতেছিল যে নারী-সমিতি সে এখানে স্থাপন করিয়াছে তাহার সহিত ওই সাঁওতাল মেয়েগুলিকেও যুক্ত করা যায় কি না। সে যখন খুব ছোট শনিচরা তখন তাহাদের বাড়ীতে সহিস ছিল, সে কি কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে?

পুরসুন্দরী আসেন নাই। তিনি রান্নাঘরে ছিলেন। বহুলোকের বহুরকম খাদ্য প্রস্তুত হইতেছে—তাঁহার কি নাচের আসরে আসিলে চলে? সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরের খাবার তিনি নিজের হাতে প্রস্তুত করেন। চন্দ্রসুন্দরের নিরামিষ খাবার আলাদা করিয়া শুদ্ধাচারে করিতে হয়। নাচ দেখিবার অবসর তাঁহার নাই।

বীরুবাবু পীরপাহাড়ে গিয়াছিলেন। সেখানকার খড়ির দেওয়ালগুলি হইতে অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেগুলির বয়স কত হইতে পারে। খানিকটা খড়ি কুড়াইয়া দুই আঙ্গুল দিয়া চাপ দিতেই তাহা ভাঙিয়া গেল, মনে হইল যেন বেশী ময়ান দেওয়া নিমকির মতো সেগুলি বড় বেশী ভঙ্গুর। মানুষের মন বড় বিচিত্র, স্মৃতির লীলাও আশ্চর্যজনক। এই ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ অন্য একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। বহুকাল আগে একবার তিনি গুজরাটে গিয়াছিলেন তাঁহার এক প্রফেসর বন্ধুর নিমন্ত্রণে। সেখানে তাঁহার দাঁতে ব্যথা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুপত্নীকে বলিয়াছিলেন যে রাত্রে যদিও আমি হাতে-গড়া রুটিই খাই কিন্তু দাঁতে ব্যথা হইয়াছে, রাত্রে আমি দুধে ভিজাইয়া পাঁউরুটিই খাইব। বন্ধুপত্নী বলিলেন, আমি আপনাকে এমন রুটি বানাইয়া দিব যাহা মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া যাইবে। সত্যই তিনি সেইরকম রুটি বানাইয়া দিলেন। অথচ তিনি মোটেই ঘি দেন নাই। ইহার রহস্যটি বীরুবাবু জানিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। বন্ধুপত্নী বলিয়াছিলেন, ঘিয়ের নয় রেড়ির তেলের ময়ান দিয়াছিলাম। সকালে রেড়ির তেলের ময়ান দিয়া ময়দার তালটি একবেলা রাখিয়া দিতে হয়। আট দশ ঘণ্টা রেড়ির তেলে ভিজিলে রুটি খুব নরম হয়, অথচ রেড়ির তেলের কোনও গন্ধ পাওয়া যায় না। এ রুটি খাইলে কোষ্ঠও বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। হঠাৎ বীরুবাবুর মনে হইল বাবাকে এরকম রুটি খাওয়াইলে কেমন হয়। তাঁহার তো পেটের মল ভালো পরিষ্কার হইতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্নতত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। পুরসুন্দরীকে কথাটা বলিতে হইবে। বেশ দ্রুতপদেই ফিরিতেছিলেন। পথে কুমারের সহিত দেখা হইল, সে মাঠে যাইতেছিল। মাঠে খানিকক্ষণ না থাকিলে কুমারের মনে হয় যেন সমস্ত দিনটা বৃথাই গেল। বাবা বেশ ভালো আছেন এবং বাড়ীর সকলে সাঁওতাল নাচ লইয়া মাতিয়াছে তাই এই সুযোগে সে মাঠে চলিয়াছে। বাগানের খানিকটা জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে। সে যদি না যায় চাকরগুলো ফাঁকি দিবে। সাওতাল নাচ দেখিতে তাহার ভালোই লাগে, কিন্তু শনিচরার দলের নাচ সে অনেকবার দেখিয়াছে।

বীরুবাবুকে সে বলিল, "দাদা, বাড়ীতে শনিচরার দল সাওতাল নাচ দেখাচ্ছে। তুমি তো অনেকদিন দেখনি, তোমার হয়তো ভালো লাগবে।"

বীরুবাবুর গতিবেগ বাড়িয়া গেল। কিরণও নাচ দেখিতেছিল, সে কিন্তু হাটে বসে নাই। বারান্দার উপর বসিয়াছিল, পাশে ছিল ঘণ্টু। ঘণ্টুর সহিত গল্প করাই উদ্দেশ্য। অকারণে বকিয়া চলিয়াছিল সে। ঘণ্টুর রং খারাপ হইয়া গিয়াছে (ঘণ্টু

কোনও কালে ফরসা ছিল না), ঘণ্টুর গলার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে (অন্য কাহারও চোখে পড়ে নাই), ঘণ্টু সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কখন কি করে, কখন খায়, কি কি খায় এইসব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া ঘণ্টুকে সে অনর্গল প্রশ্ন করিতেছিল। ঘণ্টু প্রকাণ্ড শান্ত 'গ্রট ডেন' কুকুরের মতো চুপ করিয়া বসিয়াছিল এবং মায়ের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে কেবল মৃদু হাসিয়া বলিতেছিল, "তুমি কি যে বল মা !"

হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে ঊর্মিলা বাহির হইয়া আসিল ! কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "নাচ দেখতে যাচ্ছিস না কি ; বাবার কাছে কে আছে—"

"ভাসুর ঠাকুর এখনি এলেন। তিনি বাবার সঙ্গে কি কথা কইবেন, আমাকে বাইরে যেতে বললেন।"

ঊর্মিলা ধীরে ধীরে হাটের দিকে অগ্রসর হইল। উশনার আদেশে সে বাহিরে আসিয়াছিল বটে কিন্তু বাবার বিছানা ছাড়িতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। নবজাত শিশুকে ঘরে রাখিয়া নবপ্রসূতির বাহিরে কোথাও গেলে যেমন অস্বস্তি হয় ঊর্মিলারও সেইরূপ হইতে লাগিল। তবু সে পিছনে একধারে গিয়া বসিল। নাচ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল।

উশনা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া আপাং, কণ্টিকারি, ঘলঘলে প্রভৃতি কয়েকটি বন্য গাছ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশী গাছগাছড়ার ভেষজ গুণের অনেক তথ্য তিনি জানেন তাই পাইলেই সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সূর্যসুন্দরের বিছানায় উপবেশন করিয়া উশনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছেন—"

"বেশ ভালো আছি। তোমাদের দেখে আমার সব অসুখ সেরে গেছে। সাঁওতালরা হাটে নাচছে তুমি যাওনি ?"

"না, আমি আর গেলাম না। ও নাচ অনেক দেখেছি। ভাবলাম তার চেয়ে আপনার কাছে একটু বসি।"

উশনা একটু ভালো করিয়া বসিলেন। তাহার পর একটু উসখুস করিয়া আসল কথাটি বলিলেন।

"আচ্ছা বাবা, আপনি কি কোন উইল করেছেন ?"

"করেছি।"

"সেটা দেখতে পারি কি ?"

"কুমারের কাছে আছে, তার কাছ থেকে নিয়ে দেখো। আমি চন্দরকে দুশ' বিঘে জমি দিয়েছি। একশ' বিঘে কুমারকে দিয়েছি, ওই তো জমিজমা নিয়ে বাড়ী আগলে এখানে থাকবে। বাকি জমি তোদের তিন ভাইকে সমান ভাগে করে দিয়েছি। এই বাড়ীটাতে তোমাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। তোমার বোনেদেরও। বাগানটাতেও তোমাদের চার ভাইয়ের সমান অধিকার। ওর আয় তোমরা এক এক বছরে একজন করে পাবে। বাগানের আয় থেকে চার বছর অন্তর অন্তর বাড়ীটাও মেরামত হবে। অর্থাৎ পঞ্চম বছরে তোমরা কেউ কিছু পাবে না। সে বছর বাগানের আয় বাড়ী মেরামতে খরচ হবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর আবার বলিলেন, "উইল একটা করতে হয় তাই করেছি। আমার করবার ইচ্ছে ছিল না, নিখিলবাবু জোর করে করিয়েছেন। যা হবার তাই হয়। জমিদারদের সম্পর্কে থেকে অনেক জিনিসই তো

দেখলাম। জাল উইল আসল বলে চলে গেল, আসল উইল নাকচ হ'য়ে গেল হাই-কোর্টের বিচারে। তবে তোমাদের একটা কথা আমি বলতে চাই—বিষয়ের জন্যে মনুষ্যত্ব কখনও নষ্ট কোরো না। মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে যে বিষয় পাওয়া যায় তাও থাকে না। শেষ পর্যন্ত দুদিকই নষ্ট হ'য়ে যায়—"

ঊর্মিলা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে উপবেশন করিল।

"তুমি চলে এলে যে—"

"ও নাচ তো আগে আমি দেখেছি—"

সূর্যসুন্দরকে ছাড়িয়া সে যে অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল তাহা আর প্রকাশ করিল না। উশনা সূর্যসুন্দরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি যা করেছেন তা ঠিকই করেছেন, তবে আমার দুটো একটা কথা বলবার আছে তা পরে বলব। এখন উঠি—"

উশনা চলিয়া গেলেন। গেলেন হাটের দিকে, সেখানে নাচ হইতেছিল। সেখানে সকলের পিছনে গিয়া তিনি বসিলেন, বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। যে কথাটা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল কি করিয়া তাহা প্রকাশ করিবেন তাহাই তাঁহার অন্তরকে তোলপাড় করিতে লাগিল।

॥ ২৩ ॥

কুমার মাঠে গিয়া দেখিল জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে। কয়েকটা বক লাঙলের পিছনে পিছনে চলিয়াছে। উদ্দেশ্য, কর্ষিত মাটি হইতে পোকা বাহির হইলে সেগুলি ধরিয়া উদরস্থ করিবে। কুমার সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটি সঙ্গে আনিয়াছিল, মাঠের মধ্যে তাহার ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া, সে তাহাই খুলিয়া বসিল। এতক্ষণ সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, এইবার পারিল। সে মাঠে আসিয়াছিল নির্জনে বাবার ডায়েরিটা পড়িবে বলিয়াই, জমির কাজ দেখাটা উপলক্ষ মাত্র। বাড়ীতে অসম্ভব ভিড়, সেখানে ডায়েরি পড়িবার কোন সুযোগ নাই। ডায়েরিটা শেষ করিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কুমারের মাঠের ঘরটি সুন্দর। সব ব্যবস্থাই আছে। সে ক্যাম্পচেয়ারটি পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

"যদিও আমার বাবা আমার কলিকাতায় পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিলেন তবু কিন্তু গোল মিটিল না। বাবার ইচ্ছা ছিল অশ্বিনীর মতো আমিও গিয়া হেয়ার স্কুলে পড়ি। কিন্তু অশ্বিনী কলিকাতায় গিয়া আমাকে জানাইল যে হেয়ার স্কুলে এবার আর ছেলে লওয়া হইবে না। সব সীট ভরতি হইয়া গিয়াছে। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। মনে মনে যে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথিয়াছিলাম তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চিঠিখানা হাতে লইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমার কলিকাতায় গিয়া পড়িবার আশা ত্যাগ করিলেন। আমি যে কি করিব, কে যে আমাকে সৎপরামর্শ দিবে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। হেয়ার স্কুলে হয়তো সীট নাই, কিন্তু অন্য স্কুলে থাকিতে পারে! কিন্তু কে সন্ধান করিবে। ভাবিলাম

অশ্বিনীকেই আর একটা চিঠি লিখি। কিন্তু অশ্বিনীর ঠিকানা যোগাড় করিতে পারিলাম না। অশ্বিনী আমাকে যে পত্র দিয়াছিল তাহাতে কোন ঠিকানা ছিল না। অশ্বিনীর বাবা মাও অশ্বিনীকে ভরতি করিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অশ্বিনীর ঠিকানা আমি যোগাড় করিতে পারিলাম না। মনে হইল শেষ পর্যন্ত মামার নুনের গোলাতে বসিয়াই আমাকে খাতা লিখিতে হইবে। আমার হতাশায় কার্তিকমামা আমাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—'গোলায় খাতা লেখাটাও খুব খারাপ কাজ নয়। ওতেও যদি লেগে থাকতে পারিস, উন্নতি হবে। নুনের গোলার কাজ মোটেই ফেল্না নয়। ভালো করে যদি কাজ শিখিস আর তোর মামার সুনজরে পড়ে যাস তাহলে তোকে উনি ব্যবসার অংশীদারও করে নিতে পারেন। তা যদি হয় তাহলে তো দু'দিনেই ফেঁপে উঠবি। কি হবে বেশি ইংরিজি মিংরিজি পড়ে। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস। তুই খাতা লিখতেই লেগে যা।' এ সান্ত্বনায় আমার কিন্তু দুঃখ ঘুচিল না, আমি রোজই দিদিমার কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে দিদিমারও খুব ইচ্ছা ছিল না। তিনি বার বার বলিতেছিলেন—'ভালোই হয়েছে স্কুলে সীট পাওয়া যায়নি। পনের বছর তো মোটে বয়স। এই বয়সে কলকাতার মতো শহরে গিয়ে কি করবি। সে কি সোজা শহর! কত রাস্তা, কত গলি, কত লোক। যত বদমাইশ গুণ্ডা ছেলে-ধরার দল ঘুরে বেড়ায় সেখানে। আমার বাপের বাড়ীর আন্নাকালীর ছেলে কলকাতায় গিয়ে আর ফিরল না। সীট পাওয়া যায়নি, ভালোই হয়েছে। এখানেই যা হয় কর।' এসব তিনি বলিতেছিলেন বটে কিন্তু আমার কান্নাও তাঁহাকে বড়ই বিচলিত করিতে-ছিল। তিনি মা মঙ্গলচণ্ডীকে বার বার ডাকিয়া বলিতেছিলেন, 'মা, একটা উপায় করে দাও। ওর কান্না আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

পঞ্চুমামা একদিন দিদিমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। পঞ্চুমামা মামার খুড়তুতো ভাই। তিনি কলিকাতায় ব্যাংকে কাজ করিতেন। তখন নাম ছিল বেঙ্গল ব্যাংক, পরে তাহাই ইম্‌পিরিয়াল ব্যাংক হয়। এখন স্টেট ব্যাংক। পঞ্চুমামা সেই ব্যাংকে বড় কর্মচারী ছিলেন। তিনি বছরে একবার ছুটি লইয়া আত্মীয়স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া বেড়াইতেন। ছুটিতে তিনি দিদিমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ আলাপের পরই আমার প্রসঙ্গ উঠিল। দিদিমা বলিলেন, 'কলকাতার স্কুলে সীট পায়নি বলে ও তো কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্ছে।' পঞ্চুমামা একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'ওকে ডাক্তারি পড়ান না। ক্যাম্পবেল স্কুলে বোধহয় এখনও সীট পাওয়া যেতে পারে। ক্যাম্পবেলের একজন কেরানীর সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। আমি বোধহয় ভরতি করিয়ে দিতে পারব। আমি আজ শঙ্করায় যাচ্ছি। কলকাতায় ফিরব দিন দশেক পরে। কলকাতায় আমার বাসা আছে। বাসার ঠিকানা রেখে যাচ্ছি দশ দিন পর ওকে পাঠিয়ে দেবেন, তখন আমি সব ব্যবস্থা করব।' দিদিমা বলিলেন, 'ও কি তোমার বাসা খুঁজে বার করতে পারবে? ছেলেমানুষ তো।' পঞ্চুমামা একথা আমোলের মধ্যেই আনিলেন না। বলিলেন, 'খুব পারবে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বলবে আমাকে নেবুতলায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে বাড়ীর নম্বর দেখালেই কেউ না কেউ দেখিয়ে দেবে বাড়ীটা। সে কিছুই শক্ত নয়। নেবুতলায় গেলে ও নিজেই খুঁজে নিতে পারবে।' আমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'পারবি

না ?' আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'পারব।' আমি তখন মনে মনে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলাম। কোন কিছুই অসম্ভব মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল—সবই পারিব। শংকরা গ্রামে আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিনও এই পঞ্চুমামা মামার বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ আমার নবজন্মের ক্ষণেও তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চুমামা একদিন মাত্রই ছিলেন। তাঁহার কলিকাতার বাসার ঠিকানা দিদিমাকে দিয়া পরদিনই চলিয়া গেলেন তিনি। তিনি যতক্ষণ ছিলেন মামা বা মামী কেহ টঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। পঞ্চুমামার স্পষ্টভাষণকে সকলেই ভয় করিত। পঞ্চুমামা চলিয়া গেলে মামা বলিলেন—'তোমরা যে ওকে কলকাতা পাঠাব বলে নাচাচ্ছ কিন্তু অত টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ? জামাইবাবু কি অত খরচ চালাতে পারবেন ? খাওয়ার খরচ আছে, ভরতির খরচ আছে, স্কুলের মাইনে আছে, ওখানে মাসে মাসে বাসাখরচ আছে, এত খরচ টানবে কে ? আমি পারব না। জামাইবাবু পারবেন কি ? আমি মাসে বড়জোর দু' টাকা করে দিতে পারি। বাকি টাকা কোথা থেকে আসবে ?'

দিদিমা বলিলেন—'সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। ওর পৈতের সময় ও পনেরো টাকা ব্রতভিক্ষা পেয়েছিল, সে টাকা আমার কাছে আছে। সে টাকা আমি দেব। তাছাড়া ওর বাবা বলেছে ওকে মাসে মাসে পড়ার খরচ দেবে। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। ওর বাবা রোজগার করছে সেই দেবে—'

মামা বলিলেন—'জামাইবাবুর রোজগার আর কত ? মাসে মাত্র আঠারো টাকা। ওঁর বাসাখরচ তো আছে, নিজের হাতখরচ তো আছে, সে সব খরচ করে কত টাকা উনি পাঠাতে পারবেন ?'

'সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি ওকে আশীর্বাদ কর ওর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। ছেলে ক'দিন থেকে খায়নি ভালো করে, কেঁদে কেঁদে শরীর আধখানা হ'য়ে গেল।'

মামা আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মামীমা দালানে ছিলেন তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, 'কত সাধ যায় রে চিতে মলের আগে চুটকি দিতে !'

দিদিমা পালকি আনাইয়া বরদাবাবুর বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি শুনিয়া খুব খুশী হইলেন। বার বার বলিতে লাগিলেন, 'ডাক্তারির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। সুযিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন। টাকার জন্যে আটকাবে না। আমি কেদারবাবুর মাইনে আরও দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। মাসে দশ টাকা করে দিলেই কলকাতার বাসা-খরচ কুলিয়ে যাবে। তার ওপর শক্তিবাবু যদি আরও দু' টাকা করে দেন খুব ভালোভাবে চলে যাবে।' আমার বাবা যে তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে টাকা পাইতেন এবং বিষ্ণুপ্রসাদ যে তাহা পোস্টাফিসে জমাইয়া রাখিত এ সংবাদ বাহিরের কেহ জানিত না। বাবা এবং বিষ্ণুপ্রসাদ ছাড়া আমি কেবল এ খবরটি জানিতাম। কিন্তু আমি ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কেমন যেন ভয় হইল। খরচের সমস্যা মিটিয়া গেলেও আরও নানারকম সমস্যা ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিল। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মামার জনকয়েক খোশামুদে পর্ষদ ছিল। তাহারা নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে আমার ডাক্তারি পড়া না হয়। একজন নাকি চুপিচুপি মামাকে বলিয়াছিলেন—'খবরদার ওকে ডাক্তারি পড়াতে দেবেন না। ও যদি ডাক্তার হ'য়ে

এখানে এসে বসে তাহলে আপনার সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। আপনার 'রাইভাল' হ'য়ে দাঁড়াবে। জানি না মামা এ সংবাদে বিচলিত হইয়াছিলেন কি না, কিন্তু তিনি দিদিমাকে আসিয়া যাহা বলিলেন তাহা নূতন বিঘ্ন সৃষ্টি করিল। বলিলেন—'তোমরা ওকে ডাক্তারি পড়তে পাঠাচ্ছ, কিন্তু ও যেরকম ভীতু ও পারবে কি! শুনেছি গিয়েই পচা মড়া কাটতে হবে। কার্তিক বলছিল অ্যানাটমি হলে নাকি ভুতেরও দৌরাত্ম্য আছে। ওদের গ্রামের একটা ছেলে ক্যাম্পবেলে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল সে নাকি ভুত দেখে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। আমি কার্তিককে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি তার মুখেই সব শুনো।' কার্তিকমামা আসিয়া ভয়ানক বর্ণনা দিলেন। বলিলেন অ্যানাটমি হলে যে মড়ারা রাত্রে হুটোপাটি করে একথা কে না জানে। মড়াদের হা হা হাসি এবং খট্ খট্ নাচ রাত্রে তো রোজই শোনা যায়, অনেক সময় দিনের বেলাতেও যায়। একবার একটা মড়া নাকি লাফাইয়া উঠিয়া একটা ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। এসব কাহিনী শুনিয়া দিদিমা রীতিমত ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার উৎসাহ মন্দীভুত হইল। আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—'যা শুনেছি তা তো ভয়ানক। ওখানে তোমাকে আমি পাঠাতে পারব না।' এসব শুনিয়া আমারও যে একটু ভয় না করিতেছিল তাহা নয়, ছেলেবেলায় ভুতের ভয় আমারও ছিল, কিন্তু তবু আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম এ সুযোগ যদি আমি ত্যাগ করি তাহা হইলে আমার জীবনে দুরপনেয় অন্ধকার নামিয়া আসিবে। মামার মুনের গোলায় নড়বড়ে চৌকিতে বসিয়া সারাজীবন ওই অসভ্য ব্যাপারীদের সাহচর্যে খেরোর খাতায় হিসাব লিখিতে হইবে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। কি করিব? দিদিমার মতের বিরুদ্ধে তো কিছু করা যায় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, সত্যসত্যই যদি বাঁকিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে সে বাধা তো অতিক্রম করা যাইবে না। ঠিক করিলাম ব্যাপারটা বাবাকে বলিব। এতদিন মামাকেই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় মনে করিয়াছিলাম কিন্তু হঠাৎ যেন অনুভব করিলাম, আমার অসহায় জীবনে ঠিক যে স্থানটিতে তাঁহাকে পাইব প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সে স্থানে তিনি নাই। সে স্থানে আমার বাবা রহিয়াছেন, হউন তিনি উদাসীন, হউন তিনি সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি আমার বাবা। তাঁহার কাছেই যাওয়া স্থির তো করিলাম, কিন্তু বাবার কাছে যাওয়াই যে শক্ত। তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এত কথা বলিবার সাহসই যে আমার ছিল না। অবশেষে বিষ্ণুপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলাম! বিষ্ণুপ্রসাদ বাবার সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, 'চল তোমাকে গুরুজি ডাকছেন।' আমি যাইতেই বাবা বলিলেন, 'ভয় করা মহাপাপ। কোন ভয় নেই। ভয় মাত্রেই অলীক। তুমি কিছু ভয় পেও না। পঞ্চুবাবু তোমাকে যেদিন কলকাতা যেতে বলে গেছেন ঠিক সেই দিনই তুমি কলকাতা রওনা হবে। আমি তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। আজই তাঁর ঠিকানায় একটা চিঠি লিখে দাও। তোমার দিদিমার সঙ্গে আজই আমি দেখা করে সব বুঝিয়ে বলে দেব। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি যাবার জন্যে তৈরী হও।' সেই দিনই তিনি দিদিমার সহিত দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আপনারা ভুতের ভয় দেখাচ্ছেন কেন ছেলেটাকে! যা শুনেছেন তা সব গুজব। যদি সত্যি হতো তাহলে কি কোন ছেলে ডাক্তারি পড়তে যেত? কেউ যেত না। যারা আপনাকে ওসব কথা বলেছে জানবেন হয় তারা মিথ্যাবাদী, না হয়

বোকা। ক্যাম্পবেল গভর্নমেন্ট স্কুল, সেখানে যদি ওরকম ভূতের উপদ্রব হতো তাহলে হইচই পড়ে যেত, কাগজে সে খবর বেরুত, গভর্নমেন্ট স্বয়ং তার প্রতিবিধান করত। কিন্তু সে সব তো কিছুই হয়নি। আপনারা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন কেন। ওর জামা কাপড় সব গুছিয়ে দিন, পশুবাবু যেদিন ওকে কলকাতা যেতে বলেছেন সেদিন ও চলে যাক। তারপর ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে। আপনি ভয় পাবেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'···সমস্ত বাধা কুয়াশার মতো মিলাইয়া গেল।

যেদিন আমি কলিকাতা যাই সেদিনের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বাবার দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাইয়া সমস্ত বাড়ীটাই যেন থমথমে হইয়া গিয়াছিল। একটা নীরব বিরুদ্ধতা যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল সারা বাড়ীটাতে। কাহারও মুখে কোনও কথা ছিল না। এমন কি দিদিমা পর্যন্ত নীরব হইয়া গিয়াছিলেন। নেত্য কেবল আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, 'কলকাতায় আমার দেওরের শ্বশুরবাড়ী শুনেছি চেতলায়। তোর যদি কোন বিপদ হয় তাদের খবর দিস। আমার নাম শুনলে তারা সাহায্য করবে। কেমন?' প্রতিশ্রুতি দিলাম বিপদে পড়িলে উক্ত দেবরের শ্বশুর-বাড়ীতে সাহায্য প্রার্থনা করিব। চেতলা কলিকাতার কোন্ অংশে অবস্থিত তাহা আমার জানা ছিল না। সম্ভবতঃ নেত্যরও ছিল না। তাহার দেবরের বা শ্বশুরের নাম কি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই। কলিকাতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই তখন ছিল না। ভাবিয়াছিলাম চেতলায় গিয়া নেত্যর দেবরের শ্বশুরবাড়ী কোন্‌টা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই দেখাইয়া দিবে।

তখন শীতকাল। আমার ট্রেন রাত্রি বারোটার পর। সন্ধ্যার সময় মামা দিদিমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দিদিমার হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিলেন—'তোমরা যখন গোঁয়ার্তুমি করে ওকে পাঠাবেই তখন আমার আর কি বলবার আছে। এই দশটা টাকা ওকে দিয়ে দিও। মাসে মাসে ওকে দু'টাকা করে আমি দেব। লোকে যেন না বলতে পারে আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

দিদিমা বলিলেন, 'তুই জামাইবাবুকেই দিয়ে আয় না টাকাটা। কত খুশী হবে।'

'সে আমি পারব না। খামখেয়ালী মানুষ, কি ভাবতে কি ভেবে বসবেন। প্রতি মাসেও আমি টাকা তোমারই হাতে দেব, তুমি জামাইবাবুকে দিয়ে দিও।'

মামা চলিয়া যাইবার একটু পরেই বাবা আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি কুলি এবং কুলির মাথায় একটি ট্রাঙ্ক। দিদিমাকে বলিলেন, 'বিষ্ণু সুযিকে এই ট্রাঙ্কটা কিনে দিলে। এতে সুযির জামা কাপড় যা আছে তা গুছিয়ে দিন। আজ রাত্রেই তো ওকে কলকাতা রওনা হ'তে হবে। রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে ওর ট্রেন। আমি গিয়ে ওকে তুলে দিয়ে আসব।'

দিদিমা টাকা দশটা বাবাকে দিয়া বলিলেন, 'শস্তি এই টাকাটা সুযিকে দিয়েছে। আর মাসে মাসে দু'টাকা করে দেবে বলেছে।'

বাবা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'ভালো।'

দিদিমা বলিলেন—'আমার কাছেও ওর পৈতের টাকা আছে। পৈতের সময় ভিক্ষে পেয়েছিল। সেটাও ওর সঙ্গে দিয়ে দাও।'

বাবা বলিলেন—'না, অত টাকা ওর সঙ্গে দেব না। ছেলেমানুষ একা যাচ্ছে।

টিকিটটা কেটে দেব। আর সঙ্গে গোটা পাঁচেক টাকা দেব। তারপর বিষ্ণু পঞ্চুবাবুর নামে যেমন দরকার হবে মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দেবে টাকা।'

রাত্রি বারোটার সময় সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। বাবা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া গুনগুন করিয়া কি একটা সুর ভাঁজিতেছিলেন। বিঁড়ি খাইবার জন্য বিষ্ণুপ্রসাদ একটু আড়ালে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে কেরোসিন আলো জ্বলিত। একটা আলোর নীচে আমি আমার নূতন-কেনা ট্রাংকটার উপর বসিয়া শীতে কাঁপিতেছিলাম। হুহু করিয়া উত্তরে হাওয়া বহিতেছিল। আমার শীতবস্ত্র তেমন কিছু ছিল না। গায়ে সামান্য একটা গেঞ্জি এবং তাহার উপর একটা সুতার কোট ছিল। মামীমার একটা ছেঁড়া র‍্যাপার আমি গায়ে দিতাম। সেইটাই গায়ে দিয়া আসিয়াছিলাম। তবু শীত করিতেছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ একজোড়া নূতন জুতা কিনিয়া দিয়াছিল, কিন্তু মোজা কিনিয়া দেয় নাই। আগে জুতা অভ্যাস ছিল না, নূতন জুতা পরিয়া খুব অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। নবজীবনের পথে প্রথম যাত্রা আমার পক্ষে মোটেই সুখকর হয় নাই। শীত করিতেছিল খুব, রুদ্যমানা দিদিমার মুখটা বার বার মনে পড়িতেছিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটাও রহস্যময় অন্ধকারে আবৃত হইয়া আমাকে যেন ভয় দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল কালো কি একটা যেন দূরে ঘাপটি মারিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কার্তিকমামা যে সব ভুতুড়ে গল্প বলিয়াছিলেন সেগুলোও মাঝে মাঝে মনে পড়িতেছিল। বাবা যদিও বলিয়াছিলেন ওসব মিথ্যা বানানো গল্প তবু সেগুলি কায়াহীন ছায়ার মতো মনের প্রত্যন্তপ্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম বাবা বেঞ্চ হইতে কখন উঠিয়া গিয়াছেন। আমার আরও ভয় করিতে লাগিল। স্টেশনে বেশী প্যাসেঞ্জার ছিল না। আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাবাকে দেখিতে পাইলাম না। বিষ্ণুপ্রসাদকেও না। অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। এ কথাও মনে হইল বাবা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন না তো! তখনও বাবার সম্বন্ধে আমার আস্থা অনড় হয় নাই। তখনও মনে হইত বৈরাগ্যের জোয়ার আসিলে তিনি অনায়াসে আমাদের ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। মাকে ফেলিয়া তিনি তো চলিয়াই গিয়াছিলেন। খেয়ালের বশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আবার খেয়ালের টানে চলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। এইসব ভাবিতেছিলাম এমন সময় দেখি বাবা ও বিষ্ণুপ্রসাদ ফিরিয়া আসিতেছেন। বাবার হাতে একটি বড় ঠোঙা।

কাছে আসিয়া বলিলেন, 'সেই তো সন্ধের সময় খেয়েছ। আর তো কিছু খাও নি। পশুপতির দোকান থেকে কিছু গরম লুচি ভাজিয়ে আনলুম. তরকারি আর মিষ্টিও আছে। খানিকটা এখনি খেয়ে নাও, আর খানিকটা সঙ্গে নিয়ে যাও। সকালের দিকে হয়তো খিদে পাবে, তখন খেও। বিষ্ণু জলের কুঁজোটা কোথা।'

বিষ্ণু বলিল—'পশুপতির চাকর সেটা ধুয়ে জল ভরে আনছে।'

আমার গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করিতে লাগিল, তাহার পর আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম।

'কাঁদছ কেন, দিদিমায়ের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি—'

বাবা সস্নেহে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'আসবার সময় সবাইকে প্রণাম করে এসেছিলে তো ?'

'হ্যাঁ—'

'পুরানো জায়গা ছেড়ে যাবার সময় একটু মন কেমন করে, তারপর সব ঠিক হ'য়ে যায়। কেঁদ না—'

এই কথায় আর একটা কথা মনে পড়িল। প্রণাম করিবার সময় মামা বলিয়াছিলেন—'ভগবান তোমার বাসনা পূর্ণ করুন'। মামীমা কিন্তু কিছুই বলেন নাই। তাঁহার মুখে যেন একটা ছায়া নামিয়াছিল। যখন প্রণাম করিলাম তখন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর একটা কথাও মনে হইল—তাঁহাদের আশ্রয়ে জন্মাবধি আছি, আজ সে আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছি, কিন্তু কই তাহারা কেহ তো আমাকে আগাইয়া দিতে আসেন নাই। মামাকে অনেক রাত্রে রোগীর বাড়ী যাইতে দেখিয়াছি, তিনি ইচ্ছা করিলে কি স্টেশনে আসিতে পারিতেন না ? যদিও আমার এ বাসনা স্পর্ধাসূচক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু তবু একথা আজ না লিখিয়া পারিতেছি না যে মামা সেদিন স্টেশনে আসেন নাই বলিয়া সত্যই মনে মনে দুঃখিত হইয়াছিলাম।

···একটু পরেই ট্রেন আসিয়া গেল। আমি একটি থার্ড ক্লাস গাড়িতে চড়িয়া বসিলাম। চড়িবার আগে বাবাকে এবং বিষ্ণুপ্রসাদকেও প্রণাম করিলাম। বিষ্ণুপ্রসাদ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না। বাবা বলিলেন, 'তুমি পেঁছেই একখানা চিঠি দিও। তারপর ভর্তি হয়ে আর একখানা দিও। মনে কোন ভয় রেখো না, মায়ের ইচ্ছায় সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

ট্রেন ছাড়িবার একটু আগে যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মর্মান্তিক। কার্তিকমামা হন্তদন্ত হইয়া আমার গাড়ির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি তোমার মামীমার র‍্যাপারটা নিয়ে এসেছ ? দাও, খুলে দাও, উনি ভয়ানক রাগারাগি করছেন !' র‍্যাপারটা খুলিয়া দিলাম, কার্তিকমামা চলিয়া গেলেন। বাবা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—'তুমি যেদিন পাশ করে আসবে সেদিন তোমাকে শাল কিনে দেব। আজ এইটে নিয়ে যাও।' বাবার গায়ে একটা লুই ছিল, সেইটে তিনি আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিবার পরমুহূর্তেই আমার মনে ঠিক কি ভাব জাগিয়াছিল তাহা এখন মনে নাই। তবে আমার চোখে জলের ধারা বহিতেছিল এবং তাহা দেখিয়াই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ভদ্রলোকের সৌম্যমূর্তি, কথাবার্তাও খুব স্নেহপূর্ণ। জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কাঁদিতেছি কেন, কোথায় যাইব। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা আত্মীয়তার সুর বাজিয়া উঠিল যে আমি আমার সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিতে দ্বিধা করিলাম না। তিনি বলিলেন, 'তা কাঁদছ কেন। এইটুকু বয়সে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছ, এ তো মহাসৌভাগ্যের কথা। তোমার কোন ভয় নেই, হাওড়ায় আমি তোমাকে গাড়ি ভাড়া করে দেব। সে সোজা তোমাকে নেবুতলা নিয়ে যাবে। কোন ভয় নেই। হাওড়া স্টেশনেই আমার কাজ, কাজ সেরে আবার পরের ট্রেনে আমাকে ফিরে আসতে হবে। তা না হলে সঙ্গে করে আমি তোমায় পেঁছে দিতাম কিন্তু তার উপায় নেই। হাওড়াতেই সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।' অপরিচিত লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া খুব আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষা বেশী আপন মনে

হইতে লাগিল। তাঁহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিলাম। তিনিও আর একটু সরিয়া আমার শুইবার স্থান করিয়া দিলেন। তাঁহার কোলের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙিল তখন ট্রেন হাওড়ায় পেঁছিয়া গিয়াছে। সেই ভদ্রলোকই আমাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন।

'ওঠ, ওঠ, ওঠ। এসে গেছি আমরা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—। এই কুলি, এই কুলি—'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এত লোক! একটা মেলায় যে এত লোক হয় না? এত বিরাট প্ল্যাটফর্ম! অবাক হইয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম।

ভদ্রলোক একটা কুলি ডাকিয়া আমার জিনিসপত্র তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ সব জিনিস নেওয়া হয়েছে তো।' দেখিলাম সব জিনিসই তিনি গুছাইয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার জিনিস কই?'

'আমার কোন জিনিস নেই। কিছু আনিনি। পরের ট্রেনেই তো ফিরে যাচ্ছি—'

ভদ্রলোক আমাকে স্টেশনের বাহিরে লইয়া গিয়া একটা গাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন। গাড়িওয়ালা বলিল সে নেবুতলায় গিয়া ঠিকানা খুঁজিয়া আমাকে পেঁছাইয়া দিবে।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভদ্রলোক হঠাৎ থামাইয়া দিলেন। তাহার পর দূরের দিকে তাকাইয়া ডাকিতে লাগিলেন—'নগেন, নগেন শোন। কলকাতা যাচ্ছ নাকি?'

কালো কোট প্যাণ্ট পরা একটি টিকিট কালেকটার আসিল।

'হ্যাঁ। ডিউটি হ'য়ে গেছে। বাড়ি যাচ্ছি—'

'তাহলে এই গাড়িতে যাও। এই ছেলেটিকে নেবুতলায় পেঁছে দিও। তোমার তো ওই কাছেই বাড়ী—। ট্রামে না গিয়ে গাড়িতেই যাও—'

'বেশ।'

ভদ্রলোক গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন।

পঞ্চুমামা বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, 'এখনই চল তোমাকে ক্যাম্বেলে নিয়ে যাচ্ছি। আগে ভরতিটা হ'য়ে যাক তারপর অন্য কথা। এখন প্রায় নটা বেজেছে। আমার আবার সাড়ে দশটায় আপিস আছে। আমি একেবারে আপিসের জন্যেই তৈরী হ'য়ে যাই। ওখান থেকেই আপিসে চলে যাব। চল।'

ক্যাম্বেলে গিয়া তিনি আপিস ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। যে কেরানীটির সহিত তাঁহার আলাপ ছিল সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'আসতে বড় দেরি করে ফেলেছেন। সীট তো আর খালি নেই। পনেরো দিন আগেই সব ভরতি হ'য়ে গেছে। এখন ক্লাস হ'চ্ছে—'

পঞ্চুমামা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—'আপনি যে তারিখে আনতে বলেছিলেন সেই তারিখেই তো এনেছি—'

'এবার ভয়ানক rush, দেখতে দেখতে সব ভরে গেল। কি করব বলুন। আমি ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি সব ভরে যাবে।'

আমি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হইল। মনে হইল ভরাডুবি হইয়া আমি যেন সর্বস্বান্ত হইয়া গেলাম। পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল।

পঞ্চুমামা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'শুনলে তো সীট নেই? আসতে দেরি করে ফেলেছ। এবার আগেই সব সীট ভরে গেছে। যাই হোক তুমি বাসায় ফিরে যাও। আমি আপিস থেকে ফিরে আসি, তখন ভেবেচিন্তে দেখা যাবে এ অবস্থায় কি কর্তব্য। তুমি বাসায় ফিরে যাও।'

পঞ্চুমামা আপিস চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু বাসায় ফিরিলাম না। ক্যাম্বেল স্কুলের পাকা সিঁড়ির একধারে বসিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি বেশ বুঝিতেছিলাম এইবার আমাকে গিয়া মামার নুনের গোলায় খাতা লিখিতে হইবে। সকলে ঠাট্টা করিবে, বলিবে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গেলে যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে। কেবলি মনে হইতেছিল—এ কি হইল, আমার এ কি হইল! ভগবান আমার এ সর্বনাশ কেন করিলেন। কতক্ষণ এভাবে বসিয়া ছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখিলাম একজন সাহেব খটখট করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিলাম। আমি তখন জানিতাম না যে তিনিই ক্যাম্বেল স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট মেকেন্‌জি সাহেব। সাহেব আমাকে ইংরেজীতেই প্রশ্ন করিলেন—Boy, what do you want? আমি ইংরেজী জানিতাম না, বাংলাতেই তাঁহাকে আমার সর্বনাশের কথা বলিলাম। মনে হইতেছিল তিনি বোধ হয় আমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—Come with me. আমাকে লইয়া তিনি আপিস ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং হেডক্লার্ককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—Admit this boy. তাঁহার কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হইল। যে হেডক্লার্ক একটু আগে বলিয়াছিল সীট নাই সেই এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ইয়েস সার। এবং অবিলম্বে আমাকে ভরতি করিয়া লইল। মুহূর্তের মধ্যে সব পরিবর্তিত হইয়া গেল। একটু আগে আমি হতাশার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে মেকেন্‌জি সাহেব আমাকে টানিয়া তুলিলেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন। আরব্য উপন্যাসে আলাদিনের মায়া-প্রদীপের গল্প শুনিয়াছি। মায়া-প্রদীপের সহায়তায় আলাদিন অসম্ভবকে সম্ভব করিত কিন্তু আমার কাছে তো কোন মায়া-প্রদীপ ছিল না, আমি হতাশ-অন্তঃকরণে ভগ্নস্বরে কেবল ভগবানকে ডাকিতেছিলাম। মনে হয় সেদিন ভগবানই আমার ডাক শুনিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। আমি মেকেন্‌জি সাহেবকে মুখে আর কিছুই বলিতে পারি নাই। কেবল জোড়হস্তে নীরবে তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছিলাম। তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, Be a good boy and become a good doctor.

ভরতি হইয়া যাইবার পর আমি নেবুতলায় পঞ্চুমামার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পূর্বে একটা দোকানে কিছু খাইয়া লইয়াছিলাম। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছিল। পঞ্চুমামার বাসায় গিয়া দেখিলাম, তিনি আপিস হইতে ফিরিয়াছেন। মেকেন্‌জি সাহেবের কৃপায় আমি ভরতি হইয়া গিয়াছি শুনিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইলেন।

বলিলেন, 'তবে তো কেল্লা ফতে করেছ। এইবার চল তোমার একটা বাসার ঠিক করে দি। নিয়োগী পুকুর লেনে আমার জানা একটা ক্যাম্বেলের মেস আছে সেইখানেই থাকবে। চল তোমাকে রেখে আসি। আগে কিছু জল খেয়ে নাও।' আমি বলিলাম, 'আমার জল খাওয়া হ'য়ে গেছে। আমি এক্ষণি যেতে পারি।' আমি বাজারে জলখাবার খাইয়াছি শুনিয়া পণ্টুমামা একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'পয়সাগুলো অমন নয়ছয় করে নষ্ট করো না। সামনে এখন অনেক খরচ—'

নিয়োগী পুকুর লেনে গিয়া প্রথমেই পালিতবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। পালিতবাবু একটা ঘর লইয়া আলাদা থাকিতেন। তাঁহার সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র তাঁহার উপর আমার কেমন যেন একটা শ্রদ্ধা হইল। গম্ভীর লোক, মুখে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্মিত হাসি। খুব কম কথা বলেন এবং কথা বলিবার পূর্বে বাম হাতের তর্জনীটি ওষ্ঠের উপর ধীরে ধীরে স্থাপন করেন। মুখে সামান্য গোঁফ দাড়ি উঠিয়াছে। চোখে সর্বদাই একটা শান্ত নীরব হাস্য দেদীপ্যমান। তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইল আমাকেও তাঁহার ভালো লাগিয়াছে। বলিলেন, 'এইটুকু ছেলে, ডাক্তারি পড়বে? বাঃ। আমার দ্বারা যতটা সাহায্য হয় আমি নিশ্চয় করব। এই মেসে আরও একজন ক্যাম্বেলের ছাত্র আছে। তারই ঘরে ও থাকবে।' পালিতবাবুর পুরা নাম তারকনাথ পালিত। তিনি কোনও বিদ্যালয়ে পড়িতেন না, এক সওদাগরী আপিসে চাকরি করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঘরে দেখিলাম সারি সারি আলমারি এবং তাহাতে নানারকম মোটা মোটা বই। তিনি দশটা পাঁচটা আপিস করিতেন এবং বাকি সময়টা পড়িতেন। নানারকম বিষয়ে পড়িতেন। উত্তরকালে তিনি একজন বড় হোমিওপ্যাথ হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তখন তিনি চাকুরি করিতেন। নিয়োগী পুকুর লেনের সমস্ত বাড়ীটা তিনিই ভাড়া করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একটা বড় ঘর লইয়া থাকিতেন এবং বাকি ঘরগুলিতে ছাত্রদের থাকিতে দিতেন। আমাকে বলিলেন, 'তুমি বিপিন দত্তের ঘরে থাকবে। সে-ও এবার ক্যাম্বেলে ভরতি হয়েছে। তোমার সীট রেণ্ট লাগবে মাসে দু' টাকা বারো আনা। সেটা মাসের প্রথমে দিতে হবে। আর এখানে অন্য ছেলেরা মেস করে থাকে। নিজেরাই বাজার করে এনে দেয়, ঠাকুরে রাঁধে। মাসে টাকা ছয়েক করে পড়ে। আমি মেসে খাই না, আমি স্বপাক খাই। ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নি, আর দুধ খাই। এখানে মেসের ঠাকুর রাঁধে ভালো। মাঝে মাঝে তার রান্না চেখে দেখেছি। বেশ রাঁধে।' তাঁহার চক্ষু দুইটি আবার নীরব হাসিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম—আমাকে স্কুলের বেতন তিন টাকা, সীট রেণ্ট দু' টাকা বারো আনা, এবং খাওয়ার খরচ ছয় টাকা, অর্থাৎ মাসে মাসে এগারো টাকা বারো আনা দিতে হইতে। বাবা আমাকে দশ টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন এবং মামা দুই টাকা। সুতরাং সব খরচ দিয়া আমার হাতে মাত্র চার আনা পয়সা থাকিবে। উহাতেই সারামাস কোনরকমে চালাইয়া লইব স্থির করিলাম। বাবাকে লিখিলে হয়তো তিনি আরও দু' এক টাকা বেশী পাঠাইতে পারিতেন, কিন্তু স্থির করিলাম লিখিব না। কেমন একটা জেদ চাপিয়া গেল। ওই চার আনাতেই সমস্ত মাস চালাইয়া লইব। সত্যই ওই চার আনাতেই আমার সমস্ত মাসের জলখাবার কুলাইয়া যাইত। লুচি সন্দেশ খাই নাই। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, চার পয়সার ছোলা কিনিতাম।

তাহাই দুই মুঠা করিয়া ভিজাইয়া দিতাম,তাহাতেই আমার আট দশ দিনের জলখাবার হইয়া যাইত।

কিন্তু ভরতি হইয়াই আর একটা যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল তাহা আরও ভয়ানক। তখন ক্যাম্বেলে নিয়ম ছিল যে প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের ডাকিয়া Anatomy এবং Physiology-তে মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হইত। প্রতি ছাত্রকে সবসুদ্ধ চার বা পাঁচ বার ডাকিত। এ পরীক্ষায় ফেল করিলে আর নিস্তার ছিল না—স্কুল হইতে নাম কাটিয়া দূর করিয়া দিত। আমি যেদিন প্রথমে ক্লাসে গেলাম সেই দিনই Anatomyর শিক্ষক ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ আমাকে ডাকিয়া একটি হাড় দিয়া সেটি বর্ণনা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—'সার আমি আজ নতুন ভরতি হয়েছি। এখনও বই বা হাড় কিনতে পারিনি।' চন্দ্রমাধব ঘোষ খুব কড়া রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আমাকে zero (শূন্য) দিয়া বলিলেন—'ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। যাও।' ম্লান মুখে মেসে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারী বই এবং হাড়ের অনেক দাম। সে সব কিনিবার পয়সা কোথায় পাইব? চিন্তার সমুদ্র চারিদিকে উত্তাল হইয়া উঠিল। মেসে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার ঘরে আর একটি সীটে থাকিত বিপিন দত্ত। সে-ও ক্যাম্বেলে পড়িত, আমার সহপাঠী ছিল। সে বলিল—'মুখপোড়া কাঁদছিস কেন? আমার তো বই আর হাড় আছে তাই দুজনে মিলে পড়া যাবে। তোর ওসব কেনবার দরকারই নেই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কেঁদে মরছিস কেন? নে খা।' বিপিন দত্ত একঠোঙা তেলে-ভাজা কিনিয়া আনিয়াছিল তাহাই আমার দিকে আগাইয়া দিল। সেই মুহূর্তেই বিপিন দত্ত আমার পরম আত্মীয় হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে যে বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইলাম সে বন্ধন সারাজীবন অটুট ছিল। বিপিনের বই এবং হাড় লইয়া পড়াশোনা আরম্ভ করিলাম। দুইজনে প্রথমে একসঙ্গে পড়িতাম। তাহার পর বিপিন ঘুমাইলে তাহার বই হইতে মুখস্থ করিতাম। কয়েকদিন সময় পাইলে হয়তো পরের পরীক্ষাটা পাশ করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু সে সময় পাইলাম না, তাহার পরের দিনই আবার আমার ডাক পড়িল। ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ আবার আমাকে zero দিলেন। চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। আমাকে আর দুইবার কি বড়জোর তিনবার ডাকিবে। এই পরীক্ষাগুলিতে ফুল মার্কস্ না পাইলে পাশ করিতে পারিব না এবং পাশ না করিতে পারিলে আমার নাম কাটিয়া আমাকে দূর করিয়া দিবে। সকলেই বলিতে লাগিল আর আশা নাই। চন্দ্রমাধব ঘোষের নিকট হইতে ফুল মার্কস্ পাওয়ার আশা নিতান্তই দুরাশা। বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। তীরের নিকট আসিয়া কি তরী ডুবিয়া যাইবে? হাতে পয়সা ছিল না, যাহা আনিয়াছিলাম তাহা 'ফি' এবং মেসে অ্যাডভান্স দিতেই খরচ হইয়া গিয়াছে। ফিরিয়া যাইবার পয়সাও নাই। পঞ্চুমামার নিকট ধার করিয়া রেলভাড়াটা হয়তো যোগাড় হইতে পারে, কিন্তু বাড়ীতে গিয়া মুখ দেখাইব কেমন করিয়া! কুব্জের পক্ষে চিৎ হইয়া শুইবার আকাঙ্ক্ষাটা যে অতীব হাস্যকর তাহা তো এইবার নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যাইবে। কি করিব, কে আমাকে এই অন্ধকারে পথের নির্দেশ দিবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সেদিন আর কিছু খাইলাম না, রাত্রে ঘুমও হইল না। বিনিদ্র নয়নে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে অবশেষে একটা কথা মনে হইল—ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ী গিয়া তাঁহাকে

সব কথা যদি খুলিয়া বলি তাহা হইলে তিনি কি দয়া করিবেন না ; তাঁহাকে বলিব যে আমাকে অপরের বই ও হাড় লইয়া পড়িতে হয়। অন্ততঃ পনের দিন আমাকে সময় দিন, তাহার পর আমাকে বেশীবার পরীক্ষা করুন তাহা হইলে আমার পাশ নম্বরটা হইয়া যাইবে। একটু সময় পাইলে আমি নিশ্চয় পড়া তৈয়ারি করিয়া ফেলিব। মেসের ছেলেরা কিন্তু আমাকে বারণ করিল। বলিল, গেলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। চন্দ্রমাধব ঘোষ ভয়ানক রাগী লোক, সকলে তাঁহাকে হিরণ্যকশিপু বলে। বাড়ীতে তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতে চান না। তাছাড়া বাড়ীতে তাঁহার ভীষণ একটা বুলডগ আছে। তুমি গেলে তোমাকে সে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিবে। চন্দ্রমাধব ঘোষের দৈত্যের মতো চেহারাটা মনে পড়িল। প্রকাণ্ড মুখ, প্রকাণ্ড মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। সত্যই বড় ভয় করিতে লাগিল। একমাত্র বিপিন দত্তই আমাকে সাহস দিয়া বলিল—'চল, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। দুর্গা বলে সামনে গিয়ে হাজির তো হ, তারপর যা হয় হবে। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি।'

বিপিন দত্ত আমাকে সঙ্গে করিয়া চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ীতে লইয়া গেল। গিয়া দেখি যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা ঠিক, ভীষণদর্শন একটা বুলডগ তাঁহার ঘরের ঠিক সামনেই বাঁধা রহিয়াছে। আমাদের দেখিয়াই সেটা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। কুকুরটা ডাকিতেই একটা চাপরাসী ছুটিয়া আসিল। চাপরাসীকে বলিলাম, অত্যন্ত জরুরী দরকারে ডাক্তার ঘোষের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। বিপিন দত্ত বলিল, যদি দেখা করাইয়া দাও তোমাকে বকশিস দিব। ডাক্তার ঘোষ দয়া করিয়া দেখা করিতে সম্মত হইলেন। আমি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই ? আমি তখন তাঁহাকে আমার সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলাম। বলিলাম, আমি অত্যন্ত গরীব, বই বা হাড় কিনিবার পয়সা নাই। যাহার বই আর হাড় লইয়া পড়িব সে ঘুমাইয়া পড়িলে তবে রাত জাগিয়া আমাকে পড়িতে হইবে। আমাকে পনের দিন পরে ডাকিলে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। তাহার পর আমাকে দয়া করিয়া বেশীদিন ডাকিবেন, তাহা হইলে আমার পাশ নম্বরটা উঠিয়া যাইবে। বলিতে বলিতে আমার চোখে বোধহয় জল আসিয়া গিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর দয়া হইল। বলিলেন, অল রাইট। আমি যেন আকাশে উড়িতে উড়িতে মেসে ফিরিলাম। সেদিন হইতে অ্যানাটমি ধ্যানজ্ঞান হইল। স্কুল হইতে ফিরিয়া ভিজা ছোলার জলখাবার খাইয়া অ্যানাটমি লইয়া বসিতাম। বিপিন সে সময় বেড়াইতে যাইত। বিপিন সন্ধ্যার পর ফিরিত। তাহার পর বিপিন যখন ঘুমাইয়া পড়িত তখন রাত জাগিয়া তাহার বই হইতে পাঠ্য বিষয়টি একটি খাতায় নকল করিয়া লইতাম। আট দিনের মধ্যে যতটুকু অ্যানাটমি পড়ানো হইয়াছিল ততটুকু আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। আট দিন পরে আমি নিজেই একদিন ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষকে গিয়া বলিলাম, সার আমার পড়া এবার তৈয়ারী হইয়াছে, আপনি আমার পরীক্ষা লইতে পারেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া আমাকে ফুল মার্কস্ দিলেন। সেই দিন হইতে আমি তাঁহার সুনজরে পড়িলাম। ক্লাসে কোন ছেলে পড়া না পারিলে তিনি আমাকে ডাকিতেন। আমি ঠিক উত্তর বলিয়া দিতাম। তাহার পর আরও চারবার তাঁহার কাছে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। প্রতিবারই ফুল মার্কস্ পাইয়াছি। মেটিরিয়ামেডিকাতেও ভালো নম্বর পাইতাম। ফার্স্ট

ইয়ারের পরীক্ষাটা অনায়াসে পাশ করিয়া গেলাম। ইহার পর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। পঞ্চুমামাকে সঙ্গে লইয়া মামা নিজে একদিন আমার মেসে আসিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন, তোমার বিবাহের সব ঠিক করিয়াছি, তুমি ছুটির জন্য দরখাস্ত কর। আকাশ হইতে পড়িলাম। আমার বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। অবশ্য সেকালে এই বয়সে অনেকেরই বিবাহ হইত। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার মতো চাল চুলাবিহীন পাত্রকে কে কন্যাদান করিতে চাহিতেছে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়টা কিন্তু মনের ভিতরই চাপিয়া রাখিতে হইল। সেকালে গুরুজনদের কোনও আচরণের প্রতিবাদ করা, বা সে বিষয়ে প্রশ্ন করার রেওয়াজ ছিল না। গুরুজনেরা যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইত। মামা বলিলেন, বিবাহের কথাটা লিখিয়া দিও তাহা হইলে ছুটি পাওয়া সহজ হইবে। তাহাই দিলাম। এ বিবাহে বাবার মত আছে কিনা সে কথাটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস হইল না। ট্রেনে যাইতে যাইতে মামা এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিলেন। বলিলেন, তোমার দিদিমার জেদেই এ বিবাহ হইতেছে। তাঁহার সই বরদাবাবুর স্ত্রী সম্বন্ধটি আনিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ তোমার দিদিমার পক্ষে—আমাদের পক্ষেও—উপেক্ষা করা শক্ত। সুতরাং তিনি জেদ ধরিয়াছেন ওইখানেই বিবাহ দিতে হইবে। তোমার বাবারও মত আছে, তিনি বলিয়াছেন বিবাহ সকাল সকাল দেওয়াই ভালো। তাছাড়া আর একটা কথা। তোমার মামীমার শরীর ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িতেছে। সংসারের ভার তিনি একা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সংসারে তাঁহার একজন সাহায্যকারিণী দরকার। তাহার পর একটু থামিয়া মামা বলিলেন, শুনিলাম মেয়েটি দেখিতেও ভালো। কার্তিক আর তারাপদ দেখিয়া আসিয়াছে। গৌরবর্ণ নয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। এই সব শুনিয়া তখন আমার কি মনে হইয়াছিল তাহা এতকাল পরে আর স্মরণে নাই। শুধু এতটুকু বলিতে পারি, ভালোই লাগিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভালো লাগিয়াছিল এইজন্য যে মামার সংসারে আমি এখন আর উপেক্ষিত নগণ্য পোষ্য মাত্র রহিলাম না, আমার বউ আসিয়া মামীমার সহকারিণী হইবে, মামা নিজে আমাকে লইতে আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে ডাক্তার হইয়া হয়তো মামাকে অর্থসাহায্য করিতে পারিব—এইসব চিন্তাই মনকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ পদোন্নতি হইলে সাধারণতঃ যে রকম মনোভাব হয় আমার তাহাই হইয়াছিল। বিবাহ-প্রসঙ্গে সাধারণতঃ যে রোম্যান্টিক ভাব মনে জাগা স্বাভাবিক তাহা প্রথমে আমার জাগে নাই। আমি যে নিতান্ত তুচ্ছ প্রাণীমাত্র নই, আমিও যে অবশেষে সংসারের কাজে লাগিলাম এই ধরনের একটা সূক্ষ্ম গর্বে আমার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু অবাক হইতে হইল। যাঁহার ছেলের বিবাহ তিনিই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রসাদ বলিল বাবা কাশীতে একটা সংগীত-সভায় গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন ঠিক নাই। বিষ্ণুপ্রসাদ চুপিচুপি আরও একটি সংবাদ দিল। বাবার নাকি এ বিবাহে মত ছিল না। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন ডাক্তারি পাশ করিবার পূর্বে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু মামাবাবু বলিলেন যে তিনি পাত্রীর বাবাকে পাকা কথা দিয়া ফেলিয়াছেন। কথার নড়চড় করিলে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে। তাছাড়া বুড়ি মাঈও (আমার দিদিমা) খুব জেদ করিতে লাগিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত বাবার আপত্তি টিকিল না। বিষ্ণুপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে

আর একটি সংবাদও আমাকে দিল। মামা পাত্রী-পক্ষের নিকট হইতে পণস্বরূপ কিছু টাকাও নাকি অগ্রিম লইয়াছেন। দিদিমা দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহার চোখে অবিরাম অশ্রু ঝরিতেছে। আমার মায়ের কথাই তাহার সর্বদা মনে পড়িতেছে। বার বার বলিতেছেন, আহা, এমন সুখের দিনে সে হতভাগী যদি থাকিত। সারাজীবন সে দুঃখের ঝড়ঝাপটাই সহ্য করিয়া গেল। এইবার সুখের দিন আসিতেছে, কিন্তু সে কোথায়। মা বাঁচিয়া থাকিলে আজ কি করিতেন তাহারই একটা আনুমানিক চিত্র তিনি আঁকিতে লাগিলেন। দিদিমায়ের দৃঢ় ধারণা বাবা মাকে যে রঙীন শাড়ীখানা কিনিয়া দিয়াছিলেন সেইখানা পরিয়াই মা বধূবরণ করিতেন। মামীমা তখন আসন্নপ্রসবা। শরীর ভালো নাই। দেখিলাম তিনিও খুব খুশী হইয়াছেন। আমি প্রণাম করিতেই যে ভাবে আমাকে আশীর্বাদ করিলেন আন্তরিকতার সুরই ফুটিয়া উঠিল। ..."

কুমার এই পর্যন্ত পড়িয়াছিল এমন সময় বাধা পড়িল। গঙ্গা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত।

"তুই এখানে! শীগ্‌গির বাড়ী চল। মেজদা এসে গেছেন—"

"মেজদা! কোন্ ট্রেনে এলো?"

"তা তো জানি না। কখন এসেছেন তা-ও জানি না। হঠাৎ দেখি সামনের চৌতারাটার উপর বসে বেহালা বাজাচ্ছেন। বাড়ীতে খুব হইচই পড়ে গেছে। তুই চল।"

"বাবা কি করছেন।"

"কিছু করছেন না। চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করছে খালি। খুব খুশী হয়েছেন। এখন মেজদা তাঁর ঘরের ভিতর গিয়ে বাজনা শোনাচ্ছেন তাঁকে। সবাই ঘিরে বসেছে। তুইও চল।"

কুমার খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ সংবাদের জন্য সত্যই সে প্রস্তুত ছিল না। মেজদা কি ভাবে ফিরিয়াছেন, সন্ন্যাসীর বেশে কি?

"মেজদার চেহারা কেমন দেখলি?"

"খুব সুন্দর। মনে হ'চ্ছে বয়স একটুও বাড়েনি।"

"গেরুয়া পরে আছে?"

"না কিচ্ছু না। শাদা কাপড়, শাদা পাঞ্জাবি। তা-ও আড়ময়লা! চল চল আর দেরি করিস নি।"

"চাকরগুলোকে তাহলে ছুটি দিয়ে দে। মেজদার অনারে ওদেরও আজ ছুটি হোক। এই রোদে আজ আর লাঙ্গল দিতে হবে না। বাড়ী চলুক!"

গঙ্গা চীৎকার করিয়া আদেশটি জারি করিল। সদলবলে কুমার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ সে গঙ্গাকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁরে, পায়রার বাচ্চা যোগাড় করতে পারবি!"

"পায়রার বাচ্চা কি হবে এখন।"

"হঠাৎ মনে পড়ল মেজদা পায়রার মাংস খেতে খুব ভালোবাসত।"

"চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না কেন।"

কুমার আসিয়া অবাক হইয়া গেল। বাবার ঘরে লোকে লোকারণ্য, শুধু বাড়ীর লোকজন নয়, বাহিরের লোকও অনেক আসিয়াছে। পৃথ্বীশ ঘরের মেঝেতে বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে তন্ময় হইয়া বেহালা বাজাইয়া চলিয়াছেন। কি সুর বাজিতেছে তাহা কুমার ধরিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল মর্মস্পর্শী একটা কান্না যেন সুরে সুরে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল, কুমারও নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, তাহার চোখের কোণ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার ঠোঁটও কাঁপিয়া উঠিতেছিল মাঝে মাঝে। তিনি মনে মনে তাঁহার বাবাকেই দেখিতে ছিলেন। বহুকাল পূর্বে শোনা সেতারের আলাপই যেন আবার তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিতেছিল। বেহালা আর সেতার অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার কাছে। তিনি কেবল একটা অবিচ্ছিন্ন রূপময় রোদন শুনিতেছিলেন, যে রোদনের ভাষা কথা নয় সুর। কুমার লক্ষ্য করিল পৃথ্বীশের পোশাকপরিচ্ছদে সন্ন্যাসীর কোন লক্ষণ নাই, সাধারণ বাঙালীর পোশাক পরিয়াই সে আসিয়াছে। মুখে গোঁফ দাড়িও নাই। পরিষ্কার কামানো। মাথার চুলও সুবিন্যস্ত, জটা নাই। আর মুখখানি কি সুন্দর, যেন প্রফুল্ল কমলের মতো। মেজদা তাহা হইলে এতদিন কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, এই সব প্রশ্নই বার বার তাহার মনে জাগিতে লাগিল।

···খানিকক্ষণ পরে বাজনা যখন থামিয়া গেল তখনও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন যেন সুরে সুরে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া ছিল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কবিরাজ মহাশয় একধারে একটা মোড়ার উপর বসিয়া ছিলেন। তিনিই প্রথমে কথা বলিলেন।

"মেজবাবু, আপনি তো আমাদের সবাইকে বেকুব বানিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

"বেকুব ? কেন !"

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া পৃথ্বীশ প্রশ্ন করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"বেকুব ছাড়া আর কি। যাকে ভ্যাগাবণ্ড নিষ্কর্মা ভেবেছিলুম এখন আবিষ্কার করলুম সেই সবচেয়ে কাজের লোক। যাকে ভিখারী মনে হয়েছিল, দেখছি সে মহারাজ! লজ্জিত করে দিয়েছ তুমি আমাদের।"

পৃথ্বীশ নতমস্তকে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—"আমি ভ্যাগাবণ্ড এবং ভিখারীই। ওর চেয়ে বেশী আর কিছু নই। আপনারা ঠিকই ধরেছেন।"

কবিরাজ হটিবার পাত্র নহেন। অকৃত্রিম আনন্দে তিনি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বাঃ, বাঃ, বাঃ, শুনে খুব খুশী হলাম। তোমার মতো মহারাজেরা ছদ্মবেশেই থাকে। বিনয়ই তাদের অলংকার, মণি-মাণিক্য নয়। যাক্‌ খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তারপর আলাপ হবে। আমি এখন উঠি গঙ্গাস্নান করব আজ।"

কবিরাজ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সুরের যে মায়ালোক সৃষ্ট হইয়াছিল সেটা সহসা যেন ভাঙিয়া গেল। বাড়ীর মেয়েরা তখন আগাইয়া আসিল। পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে সবাই এসেছে কেবল তুমি ছিলে না। সুখ ছিল না কারো মনে। কতদিন পরে যে তোমাকে দেখলুম। চল, বাড়ীর ভিতর চল।"

পৃথ্বীশ সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিলেন। সূর্যসুন্দর একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে-ছিলেন। বলিলেন, "যাও এখন খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর একটু। তারপর তোমার কথা শুনব।"

পৃথ্বীশ উঠিয়া পুরসুন্দরীর সহিত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর ছেলে মেয়েরাও অনুসরণ করিল তাঁহাকে। বাড়ীর অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। স্বাতী চিত্রা তাঁহাকে দেখেই নাই, উশনার ছেলেমেয়েরাও নয়। ইহাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। বীরু, উশনা, কুমার, কিরণ, ঊষা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যা পারে নাই। পৃথ্বীশ যখন চলিয়া যান তখন খুব ছোট ছিল সে। সন্ধ্যা সকলের সঙ্গে পৃথ্বীশের পিছু পিছু গেল না। দূর হইতে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—কত বয়স হইয়াছে মেজদার? ষাটের কাছাকাছি নিশ্চয়। কিন্তু মনে হয় যেন চল্লিশ। যেন ছোড়দারই সমবয়সী। মুখে কি স্নিগ্ধ শুচি শান্ত ভাব। সন্ধ্যা মুখে কিছু বলিল না বটে, কাছেও গেল না, কিন্তু দূর হইতে সে শ্রদ্ধার ডালি নীরবে উজাড় করিয়া দিল তাহার মেজদার পায়ে, তাহার মেজদা অথচ সে অপরিচিত আগন্তুক, যাহার কথা সে একদিনও ভাবে নাই।

সেদিন বহুলোক প্রথমে পৃথ্বীশকে একটি মাত্র প্রশ্নই করিল—তুমি এতদিন কোথা ছিলে। পৃথ্বীশও একটিমাত্র উত্তরই সকলকে দিলেন—আমি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা সময়ে ছিলাম। কখনও একস্থানে বেশীদিন থাকি নাই। কিন্তু লোকে একটিমাত্র প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহার পর নানারূপ প্রশ্ন বর্ষিত হইতে লাগিল। এসব প্রশ্ন অবশ্য বাড়ীর লোক করে নাই, গ্রামের চেনাশোনা লোকেরাই বেশী কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নলিখিত ধরনের—

"তুমি কি সন্ন্যাসী হয়েছিলে?"

"না।"

"শুনেছিলাম তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছ।"

"তাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দেখলাম সন্ন্যাসী হবার যোগ্যতা আমার নেই। ভালো গুরুও কোথাও পাইনি।"

"কি করতে তাহলে—"

"এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

"ঘুরতে হলে তো পয়সা চাই। পয়সা কোথায় পেতে?"

"যেখানে থাকতাম সেখানে কোন না কোন কাজ জুটে যেত। যে কাজ হাতের কাছে পেতাম তাই করতাম। পয়সার অভাব হয়নি কখনও।"

"কি কাজ করতে?"

"অনেক রকম। টিউশনি করেছি অনেক জায়গায়, গান-বাজনা শিখিয়েছি অনেককে, স্কুলে মাস্টারিও করেছি কিছুদিন, বড় বড় সাধুদের শাগরেদি করেছি। কুলির কাজ, ফেরিওলার কাজ, চাকরের কাজ সব রকম কাজই করেছি। মানে, যখন যা হাতের কাছে পেয়েছি তাই করেছি। কাজের কোন বাছ-বিচার করিনি। অভাবে পড়িনি কখনও।"

এই সব শুনিয়াই সবাই মোটামুটি সন্তুষ্ট হইয়া গেল। একটু হতাশই হইল বরং। তাহারা আশা করিয়াছিল পৃথ্বীশ যদি কোন দিন ফেরে জটাজুটধারী বিরাট সন্ন্যাসীরূপেই ফিরিবে, এক হাতে ত্রিশূল অন্য হাতে কমণ্ডলু, মুখে হর-হর-ব্যোম-ব্যোম-ধ্বনি। সে যে আধময়লা একটা লংক্লথের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া এবং মলিন কেডস পরিয়া ফিরিয়া আসিবে একথা সকলের কল্পনাতীত ছিল। বিরাট পর্বত যেন একটা মূষিক প্রসব করিল শেষকালে।

কুমার তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্ন করিবার সাহসই হয় নাই তাহার। বীরুবাবুও প্রথম দিন তাঁহাকে কিছু বলেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বলিলেন, "চল একটু বেড়িয়ে আসি। পীরবাবার পাহাড়ের দিকে যাই চল দুজনে ছেলেবেলায় ওখানে কতদিন গেছি, মনে আছে সে সব কথা ?"

"মনে আছে বইকি।"

"চল তাহলে ওইখানেই যাওয়া যাক।"

বীরুবাবু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর হনহন করিয়া হাঁটিয়া গেলেন তাহার পর হঠাৎ দেখিলেন পৃথ্বীশ একটু পিছাইয়া পড়িয়াছেন। বীরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীশ কাছে আসিলে বলিলেন—"তুমি এতদিন কি করেছ জানি না। জানবার কৌতূহলও নেই তেমন। গগন দিগন্তও নিজের মনে যা খুশি করে, আমি খবর রাখি না। তবে ভালো কাজ করেছ দেখতে পাচ্ছি। বেহালা বাজানোটা ভালো করে শিখেছ আর শরীরটাকে ভালো রেখেছ। জোরে হাঁটতে পারছ না কেন ?"

"জোরে হাঁটতে পারি। কিন্তু হেঁটে লাভ কি ? বেড়াতে বেরিয়েছি যখন আস্তে আস্তে যাই চল না।"

"বেশ তাই চল।"

কিন্তু বীরুবাবু ছটফটে লোক, হনহন করিয়া হাঁটাই অভ্যাস, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া মাঝে মাঝে আগাইয়া পড়িতেছিলেন। এবং আবার তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত পৃথ্বীশকেও তাঁহার গতিবেগ বাড়াইয়া দিতে হইল।

পীরপাহাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পৃথ্বীশ একটু অবাক হইয়া গেলেন।

"এখানটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে না ? মনে পড়ছে এখানে ছোট একটা বাগানের মতো ছিল। প্রকাণ্ড জামগাছ ছিল, একটা গোলাপজামের গাছও ছিল, আমগাছ ছিল, লিচু ছিল—"

"সব কেটে ফেলেছে। শুনছি ওখানে বাড়ী হবে একটা। চারদিক ইটে আর সিমেণ্টে ছেয়ে গেল, গাছরা জীবনযুদ্ধে হটে যাচ্ছে—"

তারপর হঠাৎ আবার বলিলেন—"মানুষ অতীতকে খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় বর্তমানের রূপকে নষ্ট করতে ইতস্তত করে না। আমরাই কবর আর পুরোনো ইমারত খুঁজতে গিয়ে কত জায়গা খুঁড়ে খেঁড়ে তছনছ করেছি—"

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—পীরপাহাড় খুড়লেও আমার বিশ্বাস অতীতের অনেক কিছু পাওয়া যাবে। চল তোমাকে দেখাই চল—"

বীরুবাবু পৃথ্বীশকে লইয়া সোৎসাহে আগাইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস এবং মতিগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীশের নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই করিলেন না তিনি। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কথার ফাঁকে সেটাও জানিয়া লইবেন, কিন্তু কথার ফাঁক পাওয়া গেল না।

পৃথ্বীশের আকস্মিক আবির্ভাবে উশনা যদিও আনন্দিত হইয়াছিলেন কিন্তু এ আবির্ভাবটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। প্রত্যাশা করেন নাই বলিয়া তাঁহার হিসাবেও গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। পৃথ্বীশ আর আসিবে না ইহা ধরিয়া লইয়াই তিনি মনে মনে বাবার বিষয়ের একটা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন কুমারের সংগে সে বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীশ ফিরিয়া আসাতে হিসাবে গোলমাল হইয়া গেল। এখন পৃথ্বীশকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন হইবে না ইহাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং পৃথ্বীশের সহিত নির্জনে একটু আলাপ করিবার জন্য মনে মনে তিনি ওৎ পাতিয়া রহিলেন। পৃথ্বীশকে কিন্তু একা পাওয়া শক্ত হইল! পৃথ্বীশকে বাড়ীর ছেলে মেয়েরা—বিশেষ করিয়া ঊষা, স্বাতী, চিত্রা, জীবু, শিবু, লীলা, ইলা,—সুযোগ পাইলেই ঘিরিয়া বসিতেছে। ঘিরিয়া বসিতেছে গল্প শুনিবার জন্য। তাহারা টের পাইয়া গিয়াছিল যে পৃথ্বীশ বহু দেশ ঘুরিয়াছে, তাহার গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কবিরাজ মহাশয়ও তাহাদের দলে যোগ দিতেন। সেদিন উশনাও একটু দূরে একধারে বসিয়াছিলেন। ঠিক গল্প শুনিবার জন্যই বসেন নাই, বসিয়াছিলেন যে গল্পটা শেষ হইলেই মেজদাকে ধরিয়া বাহিতলার দিকে লইয়া যাইবেন এবং সেই সময় বৈষয়িক আলোচনাও করিবেন। পৃথ্বীশের গল্প শুনিয়া কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন তিনি, বৈষয়িক আলোচনার কথা মনে রহিল না। পৃথ্বীশ যমুনোত্রী তীর্থের গল্প বলিতেছিলেন। তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল সকলে। মুখর কবিরাজ মহাশয়ও নীরব হইয়া গিয়াছিলেন।

"যম আর যমুনা সূর্যের ছেলেমেয়ে। আমরা ভাই-ফোঁটার সময় এঁদের স্মরণ করি। এই যমুনারই মন্দির আছে যমুনোত্রীতে। যমুনা নদী এই যমুনোত্রী থেকেই বেরিয়েছে, আর হৃষিকেশ প্রয়াগে এসে মিশেছে গঙ্গার সঙ্গে। এই যমুনা নদীর তীরে অনেক বড় বড় শহর আর তীর্থ। হৃষিকেশ, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবনের কথা তো আপনারা সবাই জানেন। হিমালয়ের উপর আরও অনেক তীর্থ আছে। আমি হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী গিয়েছিলাম। এখন যাওয়ার অনেক সুবিধা হয়েছে, বাস অনেক দূর পর্যন্ত যায়। আমি পাকদণ্ডীর হাঁটাপথ দিয়েই গিয়েছিলাম। পথের আশ্রয় মাঝে মাঝে কালীকমলিওয়ালার চটি আর ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলি। সে সব দোকানে দুধ আর খাবারও পাওয়া যায়। দোকানীরা প্রায়ই পাহাড়ী গাড়োয়ালী। খুব ভদ্র আর সস্নেহ ব্যবহার তাদের। ধরাসুর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ধরাসুতে গঙ্গা যমুনা দুইই দেখা যায়। সেখানে আমার সম্বল গেল ফুরিয়ে। ধরাসুর ধর্মশালায় একটি ধনী ভদ্রলোক দেখলাম মালপত্র নিয়ে একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন। সঙ্গে চাকর নেই। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম, আমি আপনার সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার মোটও আমি বয়ে নিয়ে যাব। যে দোকানে চা খেয়ে আমার শেষ পয়সাগুলি দিয়েছিলাম সেই গাড়োয়ালী দোকানদারটি কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, বাবু, সামনে অনেকখানি খাড়াই, মনে হ'চ্ছে আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, মালের বোঝা নিয়ে চড়তে পারবেন কি? কেন এ

কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন। বললাম, পয়সা ফুরিয়ে গেছে। রোজগার করতে হবে। এখানে রোজগারের আর অন্য কি উপায় আছে। সে বললে, আপনি কি ইংরেজি জানেন? বললাম, জানি। দোকানদার বললে, তাহলে আজ যাবেন না। আমি আপনাকে কাজ দেব। আমি থেকে গেলাম। সবাই যখন চলে গেল তখন কতকগুলো ছেঁড়া খাতা বার করে বললে মহারাজার যে কর্মচারীটি আমার গাঁয়ের দেখা-শোনা করে সে ইংরেজি-জানা লোক। খাজনার দায়ে সে আমার জমি আটক করে বসে আছে, মাঝে মাঝে ভয় দেখাচ্ছে যে নীলাম করে দেবে। অথচ আমি খাজনা দিয়েছি, এই দেখুন আমার খাতায় সব লেখা আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, রসিদ নেই? সে বললে, না রসিদ দেয়নি। আমার এই খাতায় সব লেখা আছে। ওদের লোকই আমার খাতায় লিখে দিয়েছে। আমি তো লিখতে পড়তে জানি না। ওদের লোকেরাই লিখে দিয়েছে। আপনি ইংরেজীতে বেশ ভালো করে গুছিয়ে লিখে দিন যে আমার খাতায় সব লেখা আছে, হুকুম পেলে আমি গিয়ে সব দেখিয়ে আসব। লিখে দিলাম ইংরেজীতে একটা দরখাস্ত। এর বদলে আমাকে সে দশটা টাকা দিলে। অবাক হ'য়ে গেলুম, অত টাকা পাব আশা করিনি। দোকানদার আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। মনে হলো আমাকে টাকা দেওয়াটাই তার মূল উদ্দেশ্য, দরখাস্ত-লেখানোটা ছুতো। অবশ্য কথাটা সে আমাকে খুলে বলেনি। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'তে লাগল। মনে হ'তে লাগল আমি অন্যায়ভাবে ওর কাছ থেকে এ টাকাটা নিচ্ছি। বললাম সে কথা। তা শুনে সে আরও দশটা টাকা আমাকে দিয়ে বললে—বাবুজি, বিদেশে হাতে কিছু টাকা থাকা দরকার। তুমি আমার কাজ করে দিয়েছ, আমি তার মজুরি দিলাম। বেশী দিয়েছি কি কম দিয়েছি তা নিয়ে এখন মাথা ঘামিও না। যদি বেশী মনে হয় বাড়ী ফিরে গিয়ে বাড়তি টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিও। এখন যাও। বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খাড়া চড়াই। পাইন বনের ছায়া না থাকলে পথচলা অসম্ভব হতো। কল্যাণী পার হ'য়ে কুমরারী চটিতে এসে যখন পৌঁছলাম তখন আমি প্রায় আধমরা। সেইখানে থেকে গেলাম একদিন। সেখানে একটি চা-ওলার সঙ্গে আলাপ হলো। সে দেখলাম ধরাসুর চা-ওলাকে চেনে। কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। ধরাসুর চা-ওলার এক ছেলে নাকি যমুনোত্রী দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি। জনশ্রুতি সে নাকি পয়সার অভাবে পড়ে একজনের মোট বইছিল। চড়াই উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। একথা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল, আমাকে টাকা দেওয়ার সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে কি! যোগ আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়নি। কিন্তু মন বলছিল, আছে। যমুনোত্রী থেকে যখন ফিরলুম, ধরাসুতে সেই বুড়োকে কিন্তু আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম সে হঠাৎ মারা গেছে। তার কাছে আজও ঋণী হ'য়ে আছি।"

পৃথ্বীশ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন নিজের মনের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন।

ঊষা জিজ্ঞাসা করিল—"যমুনোত্রী কেমন দেখলে মেজদা?"

পৃথ্বীশ চোখ খুলিয়া আরও কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকদিন পূর্বে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাই যেন মনে মনে আবার দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চারিদিকে বরফ আর বরফ। আকাশ থেকেও বরফ ঝরে পড়ছে

পালকের মতো, পেঁজা তুলোর মতো। দূরে থেকে যমুনাকে মনে হয় অতি শান্ত, অতি স্বচ্ছ একটি রুপোলী পাড় যেন লেগে আছে তুষার-শুভ্র হিমানীর বুকে। কাছে গেলে দেখা যায় ভীষণা এক নদী বরফ ভেদ করে বেরুচ্ছে। প্রতিটি ঢেউয়ের উপর ভাসছে বরফের কুচি, মনে হয় যেন একরাশি অভ্র প্রবল বেগে এগিয়ে আসছে ভীষণ গর্জন করতে করতে। দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। মুখে কথা সরে না। মথুরা-বৃন্দাবনে যে যমুনাকে দেখা যায় এ যেন সে নয়। মথুরা-বৃন্দাবনের যমুনা যেন প্রৌঢ়া গৃহিণী আর যমুনোত্রীর যমুনা যেন উন্মত্তা যুবতী, কলকলরবে হেসে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে সমতলের দিকে। কোন উপমা দিয়েই ঠিক বোঝানো যায় না কি অনুপম তার রূপ।"

"মন্দির আছে সেখানে ?"

"আছে বৈকি। অতি সাধারণ একটি মন্দির। সে মন্দিরে কোন জাঁকজমক নেই। মানুষের জাঁকজমকপ্রিয়তা সেখানে যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। যে মন্দির গড়েছিল যেন সে বুঝতে পেরেছে এই বিরাট পরিবেশের পটভূমিকায় তার যে কোনও জাঁকজমকই হাস্যকর হবে। তাই বোধহয় মন্দিরটিকে কোন রকম অলংকারের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত করেনি। মন্দিরটি নিতান্ত নিরাভরণ। বিনয়ের প্রতিমূর্তি যেন।"

"কিসের মূর্তি আছে‥"

"গঙ্গা-যমুনার।"

উশনা বলিলেন, "জীবন সার্থক করে এসেছ তুমি মেজদা। আমরা আর পারব না। চল এখন একটু বেড়িয়ে আসি—"

"কোথা যাবে—"

"চল, আমাদের বাগানের দিকে যাই।"

"চল।"

পৃথ্বীশ উঠিয়া পড়িলেন।

পৃথ্বীশ উঠিয়া পড়িবার পরই সভা ভাঙিয়া গেল। তাহার পর চন্দ্রসুন্দর আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। পৃথ্বীশ আসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ কথা হয় নাই। চন্দ্রসুন্দরের ইচ্ছা তাহার সহিত একান্তে বসিয়া একটু আলাপ করেন। সে যখন তীর্থে তীর্থে এতদিন ঘুরিয়াছে তখন নিশ্চয়ই কোন সাধুমহাত্মার দেখা পাইয়াছে সে এবং মন্ত্রও লইয়াছে, যদিও সে নাকি বলিতেছে যে কোন সাধুর নাগাল সে পায় নাই, কিন্তু ওসব কথা চন্দ্রসুন্দর বিশ্বাস করিতে চান না। তিনি জানেন এবং অনুমোদনও করেন যে এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করা উচিত নয়। পৃথ্বীশ এতদিন যে বাহিরে ছিল নিশ্চয় কোন অবলম্বন ছিল তাহার। কি সে অবলম্বন ? নিশ্চয় ধর্ম। ধর্মই মানুষের একমাত্র সত্য অবলম্বন যাহা ধরিয়া সে সুখে থাকিতে পারে। অধর্ম-পথে মানুষ বেশীদিন থাকিতে পারে না। অধার্মিকদের চেহারাতেও এমন একটা শ্রীহীন ভাব ফুটিয়া ওঠে যে দেখিলেই তাহাদের চেনা যায়। পৃথ্বীশের মুখ দিব্যকান্তি, মনে হয় তাহার অন্তরে দীপ জ্বলিতেছে। সে দীপ কে জ্বালিয়াছেন ? নিশ্চয়ই কোন গুরু।

সে গুরুর খবর শুনিবার জন্য চন্দ্রসুন্দর উৎসুক। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে।

"পৃথ্বীশ কোথা গেল ?"

ঊষা বাহির হইয়া আসিল। সে বলিল—"সেজদার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন। কাকাবাবু আপনি ভিতরে চলুন, বৌদি আপনার জন্যে তোলা-উনুনে একটা নতুন ধরনের জলখাবার করেছেন। গরম গরম খেতে ভালো লাগবে। আমি আপনাকে ডাকতেই যাচ্ছিলুম।"

"নতুন ধরনের কি খাবার করছে আবার বৌমা।"

"ছানার পাকৌড়ি। বৌদি ওটি শিখেছে মেজদার কাছে। দিল্লীতে নাকি খুব পাওয়া যায়। পাতলা ব্যাসনে ডুবিয়ে ছানা ভাজা। জান কাকাবাবু মেজদা একটু আগে যমুনোত্রীর গল্প করছিল—সে যে কি অপূর্ব তা আর কি বলব ! মেজদা নাকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে—সব তীর্থ দেখা হয়ে গেছে।"

"পৃথ্বীশ তোদের গল্প বলছিল বুঝি—"

"হ্যাঁ, সবাই তো ছিল। তুমি পুজো করছিল বোধহয়।"

"হ্যাঁ। মহিম স্তোত্রটা রোজ পড়ি। ওটা খুব লম্বা তো—"

"চল, পাকৌড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে ভালো লাগবে না।"

ভিতরে যাইবার মুখে কিন্তু আবার একটা বাধা পড়িয়া গেল।

"ঊষা, ঊষা, শোন, শোন—"

ঊষা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল রাধানাথ গোপ হনহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিছনে একটা কুলি। কুলির মাথায় একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি, ঝুড়িতে কিছু পাকা কলা, কিছু কাঁচকলা, দুইটা মোচা এবং কিছু থোড়।

"আমার বাগান থেকে মাস্টারমশায়ের জন্য এসব নিয়ে এলাম।"

চন্দ্রসুন্দর প্রথমে অবাক, পরে পুলকিত হইলেন। গর্বে স্নেহে তিনি যেন বিগলিত হইয়া গেলেন। রাধানাথকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমার এখনও মনে আছে যে আমি থোড় মোচা ভালোবাসি ?"

"সব মনে আছে। আপনি যে ডুমুর ভালোবাসেন তা-ও ভুলিনি। ডুমুরও এনেছি কিছু।"

"বাঃ ! খুব খুশী হলুম। সুখে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হও।"

চন্দ্রসুন্দর আবেগভরে রাধানাথের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

"তুমি কোথা যাচ্ছ এখন।"

"বাইরে থেকে অনেক লোক এসেছে। কুমারবাবু একা সামলাতে পাচ্ছেন না। আমিও যাই।"

রাধানাথ বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। চন্দ্রসুন্দর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই সূর্যসুন্দরের ঘরে গেলেন। রোজই পুজোর পর দাদার ঘরে তিনি কিছুক্ষণ বসেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। তিনি ঘুমাইতেছেন কি না ঠিক বোঝা গেল না। মনে হইল তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ কাল প্রায়ই ফুটিয়া ওঠে। চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া

গেলেন। ঊর্মিলা অনড় হইয়া সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে বসিয়া ছিল। ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না সূর্যসুন্দর জাগিয়া আছেন না ঘুমাইতেছেন। খুব আস্তে সে একবার ডাকিল—"বাবা—"

সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"ফলের রস দেব একটু।"

"এখন থাক।"

ঠিক সেই সময় গগনের শ্বশুর এবং শাশুড়ী শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছু পিছু গগনও। গগনের শ্বশুর শাশুড়ী দুজনকেই একটু উত্তেজিত বলিয়া মনে হইল। গগনের মুখে মৃদু একটা হাসি চিকমিক করিতেছে।

গগনের শ্বশুর বলিলেন, "মহা মুশকিল হয়েছে একটা। গগনের ব্লাড প্রেসার মাপবার যন্ত্রটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল। স্প্রিংটা খারাপ হয়েছে বোধহয়। চম্পার আজ ব্লাড প্রেসার নেওয়াই হলো না।"

শাশুড়ী বলিলেন, "অথচ ওখানকার ডাক্তাররা বলেছেন সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই যেন ব্লাড প্রেসার নেওয়া হয়।"

গগন বলিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। Pulse থেকেও খানিকটা আন্দাজ করা যায়। Pulse তো দেখলুম, প্রেসার বেড়েছে বলে মনে হলো না।

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া নির্নিমেষে ইহাদের দেখিতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি যে লোকে ছিলেন তাহা অতীত লোক। সেখানে রাজলক্ষ্মী, বামুন দিদি, ত্রিপুরারি সিং, রায় মহাশয়, এবং আরও অনেকে ভিড় করিয়াছিল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন তাহারা কেহ নাই, নূতন লোকেরা ভিড় করিয়া আছে। তাহাদের কথাবার্তা নূতন রকম। কিন্তু তিনি নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন, "হাসপাতালের যন্ত্রটা নিয়ে এস না।"

"সেটাও খারাপ হ'য়ে গেছে"—গগন উত্তর দিল।

"ও। তাহলে এক কাজ কর তোমরা, যন্ত্রটা কাটিহারে পাঠিয়ে দাও। সেখানে রাজু বলে এক ঘড়িওলা আছে, সে স্প্রিংটা ঠিক করে দিতে পারবে। কুমারকে বল রাজুকে একটা চিঠি লিখে দিক। আর চম্পাকে আমার কাছে নিয়ে এস দেখি তার Pulseটা—"

তারপর গগনের শ্বশুর শাশুড়ীর ভীতচকিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা বস।"

ঘরের একধারে দুইটি চেয়ার ছিল তাহাতেই তাঁহারা বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তাহারা যেন নৌকাডুবি হইয়া একটি দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছেন। একটু পরে ধীর পদক্ষেপে আনতমস্তকে গগনের পিছু পিছু চম্পা আসিয়া প্রবেশ করিল। সে মুখে যদিও কিছু বলিতেছিল না, কিন্তু তাহার গমন-ভঙ্গিমা হইতে বোঝা যাইতেছিল যে এসব তাহার ভালো লাগিতেছে না। তাহাকে লইয়া বাবা মা কী যে অনর্থক হইচই করিতেছেন! তাহার শরীর তো বেশ ভালো আছে। ধীরে ধীরে সে গিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানার উপর বসিল। সূর্যসুন্দর তাঁহার সুস্থ হাতটি দিয়া তাহার নাড়ী অনেকক্ষণ ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই, ভালো আছে—"

প্রবীণ ডাক্তারের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়াও কিন্তু গগনের শ্বশুর শাশুড়ী নিশ্চিন্ত হইলেন না। যন্ত্রের উপরই তাঁহাদের বেশী বিশ্বাস। গগনকে বলিলেন, "তুমি বাবা তোমার instrumentটা এখনই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।"

"হ্যাঁ দিচ্ছি।"

গগন বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছু পিছু তাহার শ্বশুর শাশুড়ীও গেলেন। গগন কি করে তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে চান। যন্ত্রটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের স্বস্তি নাই। কিন্তু বাহিরে গিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তাঁহারা। কুমারের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে একটা বড় রুইমাছ ঝুলাইয়া বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। মাছটি প্রায় দশ সের হইবে। একজন মহলদার মাছটি ভেটস্বরূপ পাঠাইয়াছে। গগনের মুখে সব কথা শুনিয়া বলিল, "আমি এখুনি কাটিহারে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যাবেলা নাগাদ সব ঠিক হ'য়ে যাবে। হয়তো রাজু নিজেই চলে আসবে।"

গগনের শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন, "রাজু কি তোমার পরিচিত ?"

"সে আমার বন্ধু। আমার জমির পাশে তার জমি।"

"রিলায়েবল্ লোক তো ?"

"খুব রিলায়েবল্। ও সব ঠিক করে দেবে।"

তবু গগনের শ্বশুরের মুখভাব প্রফুল্ল হইল না। তিনি তাঁহার গৃহিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, সে মুখও মেঘাচ্ছন্ন।

॥ ২৫ ॥

উশনা পথে যাইতে যাইতেই পৃথ্বীশকে তাঁহার নিজের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। বক্তব্যটা বৈষয়িক।

"তুমি বোধহয় জান না বাবা একটা উইল করেছেন। সে উইলে তিনি কাকাবাবুকে দু'শ বিঘে জমি দিয়েছেন, একশ বিঘে দিয়েছেন কুমারকে, আর বাকিটা আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অবশ্য আমাদের বাগান আর বাড়ীটা আমাদের থাকবে। বাগানের আয় আমরা সবাই এক এক বছর পাব। প্রতি পঞ্চম বছরে সেই আয় থেকে বাড়ী সারানো হবে। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমি পড়েছে। আমি তো এখানে থাকব না। তাই ঠিক করেছি আমার অংশের জমিটা বিক্রি করে দিয়ে মায়ের নামে যা হোক কিছু একটা করব। কি করব তা অবশ্য এখনও ঠিক করিনি। কুমারের সঙ্গে সেটা পরামর্শ করতে হবে। তোমার প্ল্যান কি ? তুমি কি এখানেই থাকবে ? যদি না থাক তাহলে তোমার জমিটাও ওই একই কাজে লাগতে পারে। সকলে মিলে আলোচনা করে প্ল্যানটা তাহলে এখনই ঠিক হ'য়ে যেতে পারে। আমার যতদূর মনে হয় দাদা বোধহয় এখানে ফিরে আসবে। এখনও পর্যন্ত তো কোথাও বাড়িটাড়ি করেনি। দাদার সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে তার প্ল্যান কি। তুমি কি এতদিন কেবল ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছ ? আমাদের সকলের ধারণা হয়েছিল সন্ন্যাসী হয়েছ তুমি ! কিন্তু তোমাকে দেখে তাতো মনে হ'চ্ছে না। অবশ্য অনেক প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসীও থাকেন,

বাইরে গেরুয়া নেই, ভেতরে গেরুয়া, সংসারে থেকেও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কিন্তু তুমি তো বললে এখনও পর্যন্ত কারো কাছে দীক্ষা নাওনি। তোমার ফিউচার প্ল্যান কি ?"

পৃথ্বীশ মৃদু হাসিলেন একটু। কোন জবাব দিলেন না।

"বিয়ে করার ইচ্ছে আছে ?"

"পৃথ্বীশ আর একটু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না। আমার কোন ফিউচার প্ল্যানও নেই। প্রতিদিনই আমি নূতন প্ল্যান করি, যেদিন যেরকম সুবিধে হয়। আমার অংশের জমিটা তুমি নিয়ে মায়ের নামে কোনও কিছু করতে পার, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি দেখেছি এ ধরনের স্মৃতিচিহ্ন শেষ পর্যন্ত টেকে না। পরবর্তী বংশধরদের কাছে সেগুলো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মন্দির, লাইব্রেরী, যাই কর তা নিয়ে পরে একটা ঝগড়া আর দলাদলি হয়। ওসব রক্ষা করাই একটা দায়। বিশেষত আমাদের দেশে।"

উশনা চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তাহার পর বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম মায়ের নামে একটা শিবমন্দির করিয়ে দেব।"

"আমি তো অনেক জায়গায় ঘুরেছি, দেখেছি অনেক শিবমন্দির বেওয়ারিস হ'য়ে পড়ে আছে। কেউ তার দেখাশোনা করে না। শিবমন্দিরে জন্তু জানোয়ার আর বদমায়েস লোকের আড্ডা হয়েছে। পাথরের শিব পালাতে পারে না, দেখেছি কুকুরে তার মাথায় পেচ্ছাপ করছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উশনা বলিলেন, "তাহলে কী করব বল। আমরা তো এখানে থাকব না, আমাদের জমিগুলোর কি হবে তাহলে—"

"কুমারের কাছেই থাক না। সেই ভোগ করুক। কিম্বা সে যা ভালো বোঝে তাই করুক।"

"তাহলে তুমি বলছ—"

"হ্যাঁ যেমন চলছে তেমনি চলুক না। ওই যে দাদাও আসছে এদিকে। দাদার পিছনে একটা চাকর কি যেন মাথায় করে আনছে। কি ওটা—"

"পাথর। দাদা এখন পীরপাহাড়ের চারদিকে যেসব পাথর পড়ে আছে সেইগুলো নিয়ে মেতে আছে। একটা পাথরই আনছে বোধহয়।"

দেখিতে দেখিতে বীরুবাবু আসিয়া পড়িলেন। দেখা গেল তিনি খুবই অন্যমনস্ক এবং উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছেন। পৃথ্বীশ উশনার সামনে আসিয়া তিনি থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য জিনিস দেখিলেন।

"ও তোমরা ! এখানে হঠাৎ ?"

পৃথ্বীশ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উশনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এই মেজদার সঙ্গে গল্প করছিলাম একটু। অনেক দিন পরে দেখা হলো তো।"

"ওর পেটের কথা বার করতে পারলে কিছু ? ও তো এখনও মিস্ট্রিম্যানই হ'য়ে আছে। কি করছিল ও এতদিন টের পেলে ?"

"না—"

"কোন্ দিকে যাচ্ছিলে তোমরা।"

"বাগানের দিকে—"

"চল আমিও যাই। 'বাহির-কেলুয়া' গাছটাকে একবার দেখে আসি। ওর আম আমার বড় প্রিয়—"

চাকরটার দিকে ফিরিয়া বীরুবাবু বলিলেন—"ওটা বাড়ীতে নিয়ে যা।"

তাহার পর বলিলেন—"এখানে যে সব পাথরটাথর দেখি, সেগুলো মনে হচ্ছে বুদ্ধযুগের। এই পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব ভাবছি—"

তাহার পর হঠাৎ উশনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমরা বোধহয় মনে করছ এসব বাজে ব্যাপারে মেতেছি। কিন্তু মোটেই বাজে নয়। এসব ফার-রিচিং অবশ্য ধরতে পারা চাই।"

এভাবে আক্রান্ত হইয়া উশনা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। মুখে যদিও তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন, "না আমি সে সব কিছু ভাবছি না তো"—কিন্তু সত্যই তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, দাদা কি যে সব বাজে ব্যাপার লইয়া মাতিয়া আছে। পৃথবীশ একটু মুচকি হাসিলেন শুধু। বীরুবাবু কথাটা বলিয়াই এমনভাবে মাথা নীচু করিয়া হনহন করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন যেন মাটিতে তিনি কিছু খুঁজিতেছেন। দুইজনেই অনুসরণ করিতে লাগিলেন তাঁহার। একটু পরেই আমবাগানে পেঁাছিয়া গেলেন তাঁহারা। বাহির-কেলুয়া গাছটার তলায় একটা বিছানা ছিল।

"বাঃ, এখানে চৌকি পাতলে কে।"

গাছের পিছন হইতে একটি কালো লম্বা যুবক আসিয়া প্রণাম করিয়া কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইল।

"আমিই পেতেছি বাবু। কুমার আমাকে এই ক্ষেতটা আধি দিয়েছে।"

"তুমি কে—"

"আমি জিতুর ছেলে। কুমার আমার সঙ্গে পড়ত।"

জিতু নামটা যেন বীরুবাবুর স্মরণপথে উদিত হইল।

"জিতু মহলদার ?"

"জি হাঁ।"

"ভালো ফানুস বানাত ?"

"জি হাঁ।"

বীরুবাবুর মনে পড়িল ছেলেবেলায় কালীপুজার সময় জিতু মহলদার তাঁহাদের আকাশ-প্রদীপ তৈয়ারি করিয়া দিত। নানা রঙের কাগজ দিয়া বৃহৎ এক আকাশ-প্রদীপ-ফানুস। জিতু মহলদার জেলে ছিল, মাছ ধরিত। কিন্তু জিতুর মাছের কোন চিত্র বীরুবাবুর মনে আঁকা নাই। তাঁহার মনে জিতু মহলদারের যে ছবিটি আঁকা আছে তাহার পাশে দুলিতেছে একটি বিচিত্র রঙের ফানুস। বীরুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ফানুস তৈরি করতে পার ?"

"না।"

"মাছ ধর ?"

"না, মাছের ব্যবসা করি না।"

"কি কর তাহলে—"

"ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে রেলের একটা চাকরীতে ঢুকেছিলাম, কিন্তু স্টেশন

মাস্টারকে ঘুষ দিতে পারলাম না বলে সে চাকরি চলে গেল। সংসার বড় কষ্টে চলছিল, তাই কুমার বললে—এই দশ বিঘে ক্ষেত তুই আধিতে কর। তাই করছি—"

"তোমার কি নাম।"

"কার্তিক।"

কার্তিকের দশ-আনা-ছ-আনা-চুল-কাটা মাথার দিকে চাহিয়া বীরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। এমন সময় কুমারকে দূরে দেখা গেল। সে বেশ দ্রুতপদেই আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল।

"কার্তিক তুই এখানে। তুই এই চিঠিটা নিয়ে আর গগনের কাছ থেকে একটা যন্ত্র নিয়ে এখুনি কাটিহারে রাজুর কাছে চলে যা। রাজুকে বলিস যন্ত্রটা ঠিক করে যেন সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসে। চলে যা এখুনি, ট্রেনের বেশী দেরি নেই!"

কার্তিক চলিয়া গেল।

উশনা বলিলেন, "তুই এসে গেছিস ভালোই হয়েছে। এই সময়েই পরামর্শটা করে ফেলা যাক।"

"কিসের পরামর্শ"—বীরুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমাদের বিষয়ের সম্বন্ধে।"

"আমাদের বিষয়ের সম্বন্ধে!"

বীরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উশনার দিকে চাহিলেন এবং উশনা যতক্ষণ ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন ততক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াই রহিলেন, যেন উশনা একটা কিম্ভূতকিমাকার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। উশনার কথা শেষ হইলে তিনি কেবল বলিলেন, "পাগল হয়েছ! কোন স্মৃতিচিহ্ন টেঁকে না। বাপ মার স্মৃতি-চিহ্ন আমরা আর আমাদের বংশধরেরা। আমরা যতদিন টিকে থাকতে পারব আমাদের বাবা মার স্মৃতি ততদিন থাকবে। তারপর সব শেষ। বাবার বিষয়-আশয় কুমার দেখছে, কুমারই তার ব্যবস্থা করুক। আমরা কেউ যদি কখনও বিপদে পড়ি এখানে সব থাকব। আমি তো এই সোজা বুঝি।"

এই বলিয়া তিনি পৃথ্বীশের মুখের দিকে চাহিলেন।

পৃথ্বীশ বলিলেন—"আমারও তাই মত।"

উশনা হাত উলটাইয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে, আমারও তাই।"

কুমার পৃথ্বীশের দিকে চাহিয়া বলিল—"মেজদা, এখানে গ্রামে কয়েকজন string instrument বাজিয়ে আছে। দুটো সেতার, তিনটে এস্রাজ, একটা বেহালা, একটা গীটার আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা ওদের একদিন কম্পিটিশন হোক—ও একশ টাকা প্রাইজ দেবে। তোমাকে judge হ'তে হবে।"

"সন্ধ্যাটা এত হুজুকে—ছ্যা ছ্যা" বীরুবাবুর সমস্ত মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

॥ ২৬ ॥

কুমারের স্বভাবে একটা নির্লিপ্ততা আছে। যদিও বাড়ীর এত রকম কাজকর্মের সব ব্যবস্থা সেই করিতেছে কিন্তু কোন কাজেই সে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে নাই। সব ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়াও নিজের জন্য একটু নির্জনতা আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা তার আছে। বাড়ীর কাছে বাগান এবং বাগানের মধ্যে একটি ছোট ঘর থাকাতে তাহার সুবিধাও হইয়াছে। একটু ফাঁক পাইলেই সে বাগানে আসিয়া ছোট ঘরটিতে আশ্রয় লয়। সেদিনও খাওয়াদাওয়ার পর সে সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা লইয়া বাগানে চলিয়া গিয়াছিল। বাবার প্রথম জীবনের এই কাহিনীটা তাহার উপন্যাসের মতো মনোরম মনে হইতেছিল। নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল সে।

"মামার জেদে আমার বিবাহ হইয়া গেল বটে, কিন্তু দেখা গেল বিধাতার অভিপ্রায় অন্য রূপ ছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই আমার বালিকা পত্নীটি মারা গেল। বিবাহের পর তাহার সহিত কিছু আলাপ পরিচয় হইয়াছিল বইকি। নব-বধূকে কেন্দ্র করিয়া যে সব মোহ জীবনকে রঙীন করিয়া তোলে সে মোহ আমার জীবনকেও রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু রঙীন বুদ্বুদ ফাটিয়া গেল। সেই ফাটা বুদ্বুদের শোক স্মৃতিও আমার জীবনে বেশী দিন থাকে নাই। কবে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি। আজ লিখিতে বসিয়া তাহার কথা মনে পড়িল। জীবন নদীর স্রোতের মতো, কত কিছু ভাসিয়া আসে আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। যাহারা ভাসিয়া চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না। কিছুদিন পরে তাহাদের স্মৃতিটাও ভাসিয়া চলিয়া যায়। এই নিয়ম। কিছুদিন পরে পত্নী-শোক ভুলিয়া আবার পড়াশুনায় মন দিলাম। বস্তুত পড়াশুনাই তখন আমার জীবনে ধ্যানজ্ঞান ছিল। ভালো ছেলে বলিয়া আমার সুনাম হইয়াছিল, ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষের মতো দুঁদে দুর্মুখ ভয়ংকর হিরণ্যকশিপুও আমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমার এই মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্য আমার চেষ্টার অন্ত ছিল না। আমার এ চেষ্টা সফল হইত না যদি বিপিন এবং পালিতবাবু আমার সহায় না হইতেন। বিপিন আমার সহপাঠী ছিল, দুইজনেই একঘরে থাকিতাম। রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িলে তাহার বই লইয়া রাত জাগিয়া আমি সেগুলি টুকিতাম। এইভাবেই বেশ চলিতেছিল। কিন্তু যেদিন আমি ক্লাসে ফার্স্ট হইয়া জয়টিকা লাভ করিলাম সেদিন বিপিনের মনোভাবও একটু পরিবর্তিত হইল। যেদিন আমাদের পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইল সেদিন বিপিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সন্ধ্যাবেলায় সে প্রকাণ্ড একটা ঠোঙায় অনেক খাবার কিনিয়া আনিয়া আমার সামনে সেটা ধরিয়া দিল।

"নে রে নেপো আরও দই খা!"

"তার মানে!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম।

বিপিন বলিল—"তুই তো একটি ফার্স্টক্লাস নেপো দেখছি। বই কিনে মলুম আমি আর তুই হলি ফার্স্ট। খাবারগুলোও খা—"

দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঈর্ষার আগুন ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে। তখনই বুঝিতে পারিলাম সে মদও খাইয়াছে। কাহারও সহিত ঝগড়া করা আমার স্বভাব ছিল না। আমি গরীবভাবে মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিলাম, স্বভাবটাই ভীতু-গোছের হইয়া গিয়াছিল।

বলিলাম, "কেন রাগ করছিস ভাই। ফার্স্ট হয়েছি সেটা কি আমার দোষ। তোর ঋণ কি আমি জন্মে শোধ করতে পারব ভাই। খাবার এনে ভালোই করেছিস, ক্ষিধে পেয়েছে। আয় দুজনে মিলে খাই—"

বিপিনের হাতে একটা শিঙাড়া তুলিয়া দিলাম। আবার ভাব হইয়া গেল। কিন্তু যে ফাটলটা হইয়াছিল তাহার দাগ মিলায় নাই। সেদিনের পর হইতে প্রায়ই বিপিনকে মদ খাইতে দেখিতাম। সে সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া যাইত। যখন ফিরিত তখন তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইতাম। প্রচুর এলাচ দারচিনি খাইয়াও এ গন্ধ সে ঢাকিতে পারিত না। তাহাকে কিন্তু কোনদিন মাতাল হইতে দেখি নাই। মদ খাইলে তাহার চোখের কোণ দুইটা লাল হইয়া যাইত। একটু উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলিত এবং ঘনঘন এলাচ দারচিনি চিবাইত। বিপিনের স্বভাবটাই একটু রাগী ধরনের ছিল। রাগিয়া গেলে চাকর ঠাকুরদের চড়টা চাপড়টা মারিয়া বসিত। তাহার এই রাগের একটা গল্প হঠাৎ মনে পড়িল। আমাদের মেসের জন্য রোজ সকালে বাজার করিতে হইত। একদিন বিপিন আর আমি নাপতে বাজারে মাছ কিনিবার জন্য গিয়াছিলাম। এক মেছুনীর কাছে গিয়া বিপিন কাটা রুই মাছের দর করিতে লাগিল। তখন কাটা রুই মাছের দর ছিল চার আনা সের। সেদিন মেছুনী বলিল—পাঁচ আনা সেরের কম দিতে পারব না আজ। কালো কালো মোটাসোটা বলিষ্ঠ গড়নের মেয়েটি। নাকে প্রকাণ্ড নথ, নথে টানা দেওয়া। বিপিন বলিল—আমাদের দু'সের মাছ লাগবে। সঙ্গে তো আট আনার বেশী আনিনি। মেছুনী চোখ ঘুরাইয়া বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল—আজ তাহলে মাছের আঁশ নিয়ে যাও। কাল বেশী পয়সা এনে মাছ নিয়ে যেও। সঙ্গে সঙ্গে বিপিন তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিল। বিপিনের বুড়ো আঙুলটা তাহার নথের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল। এক টানে সেটাকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া নাক কাটিয়া নথটা নাসিকাচ্যুত হইল। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। বিপিন চড় মারিয়াই চম্পট দিয়াছিল। আমি ভিড়ের মধ্যে ধরা পড়িয়া গেলাম। আমি বিপিনের সহিত ছিলাম বটে কিন্তু আমি একটি কথাও বলি নাই, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। সেই মেছুনীই আমাকে ভিড়ের হাত হইতে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "ও কিছু করেনি। সে অন্য একটা ছোঁড়া।" আমি ছাড়া পাইয়া গেলাম। ভিড় হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম বিপিন বড় রাস্তার মোড়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমাকে এক ধমক দিয়া বলিল, কি হাঁদারাম, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি। বেগতিক দেখলেই সরে পড়তে হয় এটা জানিস না? পরবর্তী জীবনেও দেখিয়াছি বিপিন আবেগের মুখে কিছু একটা করিয়া বেগতিক দেখিলে শেষ পর্যন্ত সরিয়া পড়িয়াছে। বিপিন ডাক্তারি পাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্ভবত তাহার এই মেজাজের জন্য শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি করিতে পারে নাই। ডাক্তারি করিতে হইলে যে মনের জোর, অবিচলিতভাবে শেষ পর্যন্ত হাল ধরিয়া থাকিবার যে শক্তি থাকা প্রয়োজন বিপিনের তাহা ছিল না। সে উদ্ধত প্রকৃতির ছিল বলিয়া কোথাও চাকরিও করিতে পারে নাই। সে অবশেষে

এক মাড়োয়ারির সহিত জুটিয়া ব্যবসা করিয়া বড়লোক হইয়াছিল। অনেকদিন পরে এই সময় তাহার সহিত আমার একবার দেখা হয়। তখন বীরুর মায়ের খুব অসুখ, তাহাকে ডাক্তার বিধান রায়ের দ্বারা চিকিৎসা করাইব বলিয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলাম। কোথাও বাড়ী খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সেওড়াফুলিতে মামার বাড়ীতে ছিলাম। মামা তখন সেওড়াফুলিতেই থাকিতেন। হঠাৎ খবর পাইলাম বিপিন খুব বড়লোক হইয়াছে, কলিকাতায় বেশ বড় বাড়ী করিয়াছে। সে বাড়ী খালিই পড়িয়া থাকে, বিপিন তাহার হাওড়ার বাড়ী হইতে যাতায়াত করে। যিনি খবর দিলেন তিনি বিপিনের ব্যবসারই একজন দালাল। তাঁহার নিকট হইতে বিপিনের কালকাতার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া তাহার সহিত দেখা করিলাম। আমাকে দেখিয়া বিপিন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং সব শুনিয়া বলিল, আমার বাড়ী তো তোরই বাড়ী। এখনই সবাইকে নিয়ে আয়। তাহার উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম। দুই দিন পরেই সপরিবারে তাহার বাসায় আসিয়া উঠিলাম। আমার স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হইল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে সন্ধ্যাও অসুখে পড়িয়া গেল। বিধানবাবু আসিয়া বলিলেন টাইফয়েড হইয়াছে। সেকালে টাইফয়েড দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। আরোগ্য হইয়া সুস্থ হইতে প্রায় মাস তিনেক লাগিত। ব্যাপার দেখিয়া বিপিন ঘাবড়াইয়া গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে সে যদিও আমাকে আহ্বান করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাহার উদারতা বজায় রাখিতে পারিল না। আমাকে একদিন বলিল এ বাড়ীতে তাহার এক আত্মীয়ের মেয়ের বিবাহ হইবে, সুতরাং আমার আর সেখানে থাকা চলিবে না। পরে শুনিয়াছিলাম তাহার সে আত্মীয়ও এমন কিছু নিকট আত্মীয় নহে। সইয়ের মায়ের বকুল ফুল গোছের আত্মীয়। সে নিজেও বিপিনের বাড়ীতে তাহার মেয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করে নাই। বিপিনই নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আহ্বান করে। সম্ভবত ফন্দি করিয়া আমাকে তাড়াইবার জন্য। এসব পরে আমি তাহার ওই আত্মীয়ের নিকট হইতেই শুনি। বিপিন কোন ব্যাপারেই শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার ব্যবসাও গুটাইতে হইয়াছিল। ঠিক কি ঘটিয়াছিল জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি অংশীদার মাড়োয়ারীই নাকি তাহার সব কিনিয়া লইয়াছিল, এমন কি বাড়ীটা পর্যন্ত। আসল কারণ বোধহয়, ঋণ। বিপিনের শেষ জীবনটা নাকি বড়ই দুঃখে কাটিয়াছিল।

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এবার গোড়ার কথায় ফেরা যাক। আমি যখন ফার্স্ট হইয়া ক্লাস প্রমোশন পাই তখন বিপিনের একটু বিরূপ মনোভাব দেখিয়াছিলাম একথা আগেই বলিয়াছি। যদিও বিপিনের সহিত আমার পরে ভাব হইয়া গিয়াছিল কিন্তু আমি আর তাহার বই লইয়া কখনও পড়ি নাই। আমি লাইব্রেরী হইতে যতটা পারিতাম পড়িয়া আসিতাম। কিছুদিন পরে আর একটা সুবিধাও হইয়া গেল। পালিতবাবুর কথা আগেই বলিয়াছি। তিনি আলাদা একটি ঘর লইয়া থাকিতেন। চাকরির অবসরে পড়াশোনা করিতেন। তাঁহার ঘরে আলমারিতে অনেক বই থাকিত। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিলাম তিনি বগলে করিয়া কিছু বই লইয়া বাহিরে যাইতেছেন। সিঁড়িতে আমাদের মুখামুখি হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এত বই নিয়ে কোথা যাচ্ছেন? পালিতবাবু বলিলেন, এগুলো এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে এসেছিলাম। মাস শেষ হ'য়ে গেছে এবার ফেরত দিতে যাচ্ছি। শুনিয়া আমি

অবাক হইয়া গেলাম। বই ভাড়া পাওয়া যায় তাহা জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম—ভাড়া কত? তিনি বলিলেন—ভাড়া খুব বেশী নয়, বই পিছু মাসে চার আনা। তবে দোকানে কিছু টাকা জমা রাখতে হয়। কেন, তোমার কোন বই চাই? বলিলাম—বই পেলে ভাল হতো। আমি চার আনা ভাড়া দিতে পারব। কিন্তু দোকানে জমা রাখবার মতো টাকা তো আমার নেই। পালিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আমি দোকানে পঞ্চাশ টাকা জমা রেখেছি। তুমি যে বই নেবে তা আমার নামেই নিতে পার। জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে ডাক্তারি বইও পাব তো? পালিতবাবু বলিলেন—দোকানটি পুরাতন পুস্তকের, সেখানে সব রকম বই পাওয়া যায়। সেইদিনই পালিতবাবুর সহিত গিয়া দোকান হইতে দুইটি বই লইয়া আসিলাম। আমার বইয়ের সমস্যার সমাধান হইল। ভাবিয়া দেখিলাম মাসে চারখানি করিয়া বই লইতে পারিলে আমার পড়াশোনা বেশ ভালোভাবে হয়। কিন্তু আমি যে টাকা পাইতাম তাহাতে আমার কোনক্রমে চলিত। চিন্তা হইল তাহা হইতে এক টাকা বাঁচাইব কি করিয়া? মরিয়া হইয়া বাবাকে একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম। সেই বোধহয় বাবাকে আমার প্রথম চিঠি লেখা। লিখিলাম—ডাক্তারি বইয়ের দাম অনেক বেশী। তাহা কিনিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। এখানে একটি দোকানে বই ভাড়া পাওয়া যায়। আপনি যদি আমাকে মাসে এক টাকা বেশী পাঠান আমি বই ভাড়া লইয়া পড়িতে পারি। বাবা কোনও উত্তর দেন নাই, কিন্তু পরের মাস হইতে আমাকে আরও দুই টাকা করিয়া বেশী পাঠাইতে লাগিলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে আমি পড়াশুনা শুরু করিলাম। এই সময় পালিতবাবুকে আমি ভালো করিয়া চিনিতে পারিলাম। তাঁহার মতো মহৎ এবং পণ্ডিত লোক আমি আমার জীবনে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সব সময়ে তাঁহাকে পড়িতে দেখিতাম। বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাহার পরই আবার বই লইয়া বসিতেন। তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়িতেছে। তিনি ছাতা ছাড়া কখনও বাহির হইতেন না। তাঁহার একটি রেলির ছাতা ছিল। ছাতার উপর একটি সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন করাইয়া লইয়াছিলেন। সেটি বগলে করিয়া তিনি সব সময়ে বাহির হইতেন। কোন রকম বিলাসিতা ছিল না। একজোড়া কমদামি স্যুট ছিল, তৈরী করানো নয়, চাঁদনি হইতে 'রেডি-মেড' কেনা। তাহাই পরিয়া তিনি আপিসে যাইতেন। আপিস হইতে ফিরিয়াই সেগুলি নিপুণভাবে পাট করিয়া বিছানার নীচে রাখিয়া দিতেন। বাড়ীতে পরিতেন থান ধুতি ও লংক্লথের ফতুয়া। তাঁহার একটি লংক্লথের কামিজও ছিল, সেটি বেড়াইতে যাবার সময় পরিতেন। বাহিরে যাইবার জন্য তাঁহার কালো রঙের প্যানেলার ফিতাহীন স্প্রিং-দেওয়া জুতা ছিল। ইহা ছাড়া তাহাকে অন্য জুতা পরিতে দেখি নাই। এরকম জুতা আজকাল দেখি না। আমিও পরে ওই ধরনের জুতা ব্যবহার করিয়াছি। খুব আরামপ্রদ জুতা। পালিতবাবু যখন বাসায় থাকিতেন তখন খড়ম ব্যবহার করিতেন। তাঁহার একটি তোলা উনুন ছিল, ঠিকে ঝি সেটি দুবেলা ধরাইয়া দিয়া যাইত। তাহাতেই তিনি সংক্ষেপে ভাতে-ভাত ফুটাইয়া লইতেন। দুধটাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে জানিয়াছিলাম তিনি অনেক গরীব ছেলের স্কুলের বেতন দিতেন। আমি যে চারখানি করিয়া বই লইতাম তাহার ভাড়াও তিনি নিজে দিয়া দিতেন। আমি টাকাটা পরিশোধ করিতে গেলে বলিতেন, ব্যস্ত কি, পরে দিলেও চলত। আমি কখনও

টাকাটা বাকি রাখি নাই। মনে পড়িতেছে একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এ আত্মসম্মানবোধ যেন চিরকাল এমনি অম্লান থাকে।

আমার ক্যাম্বেলে পড়ার সময় আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। একটা ঘটনা কেবল মনে পড়িতেছে। খোঁড়া অশ্বিনী একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বলিল—তাহার বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল করিয়া মারা গিয়াছে। তাই তাহার পড়াশোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাবার মৃত্যুর পর সে আপিসের বড়সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিল। তিনি তাহাকে একটা চাকরিতে বহাল করিয়া লইয়াছেন। ভালো করিয়া কাজ করিলে চাকরিতে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। পরে অশ্বিনীর উন্নতিও হইয়াছিল। উচ্চপদস্থ রেলোয়ে কর্মচারী হইয়া সে রিটায়ার করে। আমি যখন পাশ করিয়া মনিহারিতে ডাক্তারি আরম্ভ করি তখন অশ্বিনী আমার কাছে ছুটি পাইলেই আসিত। অশ্বিনীর অনেক গুণ ছিল। যখন সে চাকুরিতে কিছু উন্নতি করিয়া বড় পোস্ট পাইল তখন অনেক গরীবের ছেলের সে চাকরি করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মেজাজটা সাহেবী ছিল। বাঙালী-চরিত্রের ঢিলাঢালা ভাব সে মোটেই পছন্দ করিত না। নিয়মানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা, স্পষ্ট-ভাষণ, সততা তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। কাহারও মধ্যে এসব জিনিসের অভাব দেখিলে সে চটিয়া যাইত। সাধারণত বাঙালী-চরিত্রে এসবের বড়ই অভাব। এজন্য তাহার বাঙালী বন্ধু খুব কম ছিল। এক আমি ছাড়া তাহার বাঙালী বন্ধু বোধহয় ছিলই না। সাহেব বন্ধু অনেক ছিল। তাহার চারিত্রিক গুণের জন্য সাহেবরা তাহাকে ভালোবাসিত। সেই জন্য জীবনে সে উন্নতিও করিয়াছিল। সে বড় পোস্ট পাইয়া যখন অনেকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিল তখন তাহার আপিসের সকলে তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। খুব কড়া অফিসার ছিল। কাহারও চারিত্রিক কোন ত্রুটি সহ্য করিত না। সে অনেকের যেমন চাকরি করিয়া দিয়াছিল তেমনি আবার অনেকের চাকরি খাইয়াও ছিল। ছুটি পাইলে সে আমার নিকট মাঝে মাঝে আসিত এবং আমার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া আমাকে নানারূপ উপদেশ দিত। তখন আমার বাড়ীতে অনেক বেকার লোকের আড্ডা ছিল। তাহাদের বেকার বলিতেছি বটে, তাহারা নিজেরা তেমন অর্থোপার্জন করিতে পারিত না এ হিসাবে তাহাদের অবশ্য বেকার বলা চলে, কিন্তু তাহারা আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ছিল না। তাহারা না থাকিলে একা ওই অজ পাড়াগাঁয়ে আমি হয়তো টিকিতেই পারিতাম না। তখনও আমি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করি নাই, তখন ওই বেকার লোকগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই আমার সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাই নয়, তাহাদের উৎসাহ তাহাদের স্বতোৎসারিত আনন্দ তাহাদের ভালোবাসা তাহাদের ভক্তি আমার জীবনের স্বাদ ফিরাইয়া দিয়া আমাকে আমার নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল, একথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তাহাদের জন্যই আমার মনিহারির একক জীবনে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছি।

আমি যখন ক্যাম্বেল হইতে পাশ করিয়া বাহির হইলাম তখন আমার বয়স কুড়িও হয় নাই। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করিয়াছিলাম বলিয়া আমার শিক্ষকগণ আমার উপর খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং মেকেন্‌জি সাহেব। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন আমি যেন তাঁহাদেরই কীর্তি।

ম্যাকেন্‌জি সাহেব বলিলেন, তোমাকে এখনই একটা ভালো চাকরি দিতেছি, তুমি কাজে লাগিয়া যাও। ডাক্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার বয়স কম, কষ্ট করিবার শক্তি তোমার আছে, লেখাপড়াও ভালো করিয়া শিখিয়াছ, তুমি সাহেবদের দাসত্ব করিবে কেন, তুমি কোন গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দাও। দেশের সেবা কর। আমাদের দেশে অনেক গ্রামে মাইলের পর মাইল কোন ডাক্তার নাই, সর্বত্র বিনা চিকিৎসায় হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে রোগীরা বেঘোরে প্রাণ হারাইতেছে, তুমি গিয়া তাহাদের বাঁচাও। তাহাদের আপন লোক হও। সেখানে উপার্জনও কম হইবে না। খাইয়া পরিয়া শুধু সুখেই থাকিবে না, দশজনের একজন হইয়া থাকিবে।

'হিরণ্যকশিপু'র মুখে একথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। দেশে তখনই জাতীয় জাগরণের সুর ধীরে ধীরে গুঞ্জরিত হইতেছিল, ইংরেজরা যে আমাদের মিত্র নহেন, শত্রু, একথা সাহিত্যিকরা, নেতারা নানাভাবে আমাদের বুঝাইতে শুরু করিয়াছিলেন। ধর্মজগতে, সাহিত্যক্ষেত্রে এবং রাজনীতিতে বিদ্রোহের অরুণাভাষ ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা যে ডাক্তার ঘোষের মতো সাহেবিভাবাপন্ন লোকবেও এতটা নাড়া দিয়াছে তাহা ভাবিতে পারি নাই।

পালিতবাবুকে আসিয়া সব কথা বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, ডাক্তার ঘোষ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই। চাকরি করিলে ক্রমশ মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়াও চাকরি করা যায়, কিন্তু তাহাতে চাকরির উন্নতি হয় না। মনিবরা খোশামোদ চায়। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করিতে হইলে কিন্তু গোড়ায় কিছু টাকার দরকার। তাহা যদি যোগাড় করিতে পার তাহা হইলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করাই ভালো। তুমি তোমার অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই কর।

আমি সাহেবগঞ্জ যাইবার আগে একটি পত্র বাবাকে, একটি পত্র মামাকে এবং একটি পত্র দিদিমাকে দিলাম। জানিতাম দিদিমা আমার লেখা চিঠি পড়িতে পারিবেন না কিন্তু তাঁহার নামে চিঠি আসিয়াছে এই সংবাদেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইবেন। আমি কবে কোন্ ট্রেনে ফিরিব পত্রে সে কথা লেখা ছিল। একটা সূক্ষ্মগর্বে আমার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যদিও সামান্য একটা ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার মনে হইতেছিল যেন একটা দিগ্বিজয় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। সকলে ঠিক করিয়াছিল আমি মামার নুনের গোলায় খাতা লিখিব, আমার মতো গবেট ছেলের আর কিছু হওয়ার আশা নাই কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ ছিল। আমি কিন্তু সেদিন ভগবানের কথা ভাবি নাই, মনে হইয়াছিল কৃতিত্বটা বুঝি আমারই। পণ্টুমামার কথা অবশ্য একদিনও ভুলি নাই। তিনি আমার জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে যদি উপস্থিত না হইতেন তাহা হইলে আমি ডাক্তার হইতে পারিতাম না। ক্যাম্বেল স্কুলের খবরই আমার নিকট অজ্ঞাত থাকিত। সময় পাইলেই তাঁহার বাসায় আমি গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। তিনিও একটা মেসে থাকিতেন। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বেলা পাঁচটার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি তখন আপিস হইতে ফিরিয়া মুড়ি খাইতেছিলেন। সামনে একটি রেকাবিতে দুইটি রসগোল্লা ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জলখাবার খাইয়া আসিয়াছি কি না। উত্তর দিলাম,

আসিয়াছি। প্রশ্ন করিলেন, বিকালে কি জলখাবার খাই। বলিলাম, ছোলা-ভিজে আর গুড়। তখন তিনি একটি রসগোল্লা তুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এটিও খাও। দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই তিনি বদান্যতার এ অভিনয়টি করিতেছেন। রসগোল্লাটি খাইয়া ফেলিলাম বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে আর কখনও পাঁচটার সময় তাঁহার কাছে যাই নাই। সময় পাইলে সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে যাইতাম। তখন দেখিতাম তিনি তাঁহার এক বন্ধুর সহিত দাবাখেলায় নিমগ্ন আছেন। আমার সহিত হুঁ হাঁ করিয়া দুই একটা কথা বলিতেন মাত্র। আমারও বলিবার মতো কথা বিশেষ থাকিত না, কর্তব্যবোধে মাঝে মাঝে যাইতাম। বাড়ী ফিরিবার পূর্বে তাঁহার সহিত গিয়া দেখা করিলাম। আমি পরীক্ষায় ফল ভালো করিয়াছি শুনিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, তোমার জন্মদিনে আমি তোমার মামার বাড়ীর উঠানে উপস্থিত ছিলাম। ঘটনাচক্রে তোমার ডাক্তারি পড়ার সময়ও আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছি। আহা, তোমার মা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! সে হতভাগিনী চিরকাল কষ্ট করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে হয়তো সুখের মুখ দেখিতে পাইত। ছাত্রজীবনে তোমার মামা তোমার বিবাহ দিয়া অন্যায় করিয়াছিল। শুনিয়াছি তোমার সে বউও অকালে মারা গিয়াছে। একহিসাবে ভালোই হইয়াছে। নিজের পায়ে না দাঁড়াইয়া বিবাহ করিলে প্রায়ই দুঃখভোগ করিতে হয়। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজের ঘর বাঁধ, তাহার পর বিবাহের কথা চিন্তা করিও। তোমার মামা হয়তো আবার এখনই তোমার বিবাহের চেষ্টা করিবে। মামার কথা শুনিও না। আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। পঞ্চুমামা বলিলেন, একটু দাঁড়াও। পৈতায় তাঁহার বাক্সের চাবিটি বাঁধা থাকিত। তিনি সেই চাবি দিয়া নিজের বাক্সটি খুলিলেন এবং বাক্স হইতে পঁচিশটি টাকা বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই টাকা দিয়া তুমি একটি স্যুট করাইয়া লইও। চাকরিই কর বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসই কর আমার দেওয়া স্যুটটি পরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে ইহাই আমার অনুরোধ। আমি টাকাটা হাতে করিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পঞ্চুমামার কৃপণ বলিয়া বদনাম ছিল। এখন আবিষ্কার করিলাম রুক্ষ বালির নীচে ফল্গুধারা বহিতেছে। পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই। তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করি নাই। তাঁহার টাকা দিয়া একটি ভালো স্যুট তৈয়ারি করাইয়া তাহা পরিয়াই প্র্যাকটিস শুরু করি।

আমি যেদিন সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া যাই সেদিন খুব দুর্যোগ। একে শীতকাল, তাহার উপর ঝড় জল। সাহেবগঞ্জে ট্রেন রাত্রি দুইটার সময় পেঁছিত। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে বৃষ্টি যদি না কমে তাহা হইলে রাতটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটাইয়া ভোরে বাড়ী যাইব। কিন্তু ট্রেন হইতে নামিয়া অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম বাবা আমার জন্য একটি শাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সঙ্গে বিষ্ণুপ্রসাদ। আমি প্রথম যেদিন কলিকাতায় যাই সেদিন বাবা কি বলিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল। আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম, প্রণাম করিতেই বাবা শালটি আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আর কোন কথা বলিলেন না। বিষ্ণুপ্রসাদের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া যেন একটি পরম রমনীয় এবং অতি-প্রত্যাশিত দৃশ্য

উপভোগ করিতেছিল। একটি কথাও বলে নাই। আমি যখন তাহাকে প্রণাম করিতে গেলাম তখন সে আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আরে কর কি কর কি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ। আমি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলাম—আপনি আমার দাদা। বাবা কোন মন্তব্য করিলেন না। দেখিলাম তাঁহার চোখে মুখে একটা অপূর্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে। জিনিসপত্র নামানো হইলে বাবা প্ল্যাটফর্মের গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি বিষ্ণুপ্রসাদকে বলিলাম—এত বৃষ্টিতে আমরা যাব কি করে? বিষ্ণুপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল—হরিদাস মাড়োয়ারির গাড়িটা এনেছি। হরিদাস মাড়োয়ারি সাহেবগঞ্জের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার একটি সুদৃশ্য বড় বিলাতী জুড়ি গাড়ি ছিল। প্রকাণ্ড একজোড়া ঘোড়া সেটা টানিত। সেই গাড়ি আমার জন্য স্টেশনে আসিয়াছে এই অবিশ্বাস্য সংবাদে আমার চোখে মুখে সম্ভবত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইয়া বলিল—"হরিদাসবাবু এখন গুরুজির মস্ত বড় ভক্ত্! আমার কাছে খবরটা শুনে নিজেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গুরুজি গাড়িতে আসতে চাইছিলেন না, আমি অনেক বলে কয়ে রাজী করিয়েছি। চল, চল তাড়াতাড়ি যাই তা না হলে উনি হয়তো হেঁটেই চলে যাবেন।" বাহিরে গিয়া দেখিলাম বাবা নাই। কোচোয়ান বলিল, গুরুজি মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন। চলুন আপনাদের পেঁছাইয়া দিতেছি। বাবা হাঁটিয়া চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃষ্টির বেগ কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও একেবারে থামে নাই। সে বলিল, ডাক্তার তুমি গাড়িতে চলে যাও, আমি দেখি গুরুজি কোন্ দিকে গেলেন। হন্তদন্ত হইয়া বিষ্ণুপ্রসাদও চলিয়া গেল। আমি একাই গাড়িতে চড়িয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চলিতে লাগিল। এতো ভালো গাড়িতে আমি ইতিপূর্বে আর চড়ি নাই। স্প্রিংয়ের গদির উপর বসিয়া সর্বাঙ্গ দুলিতে লাগিল। মনেও একটা নূতন ধরনের উন্মাদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। নৈশ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ওয়েলার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ নির্জন পথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ খপ্ খপ্। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বসিয়া রহিলাম। মামার বাড়ী স্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়, অল্পক্ষণেই সেখানে পেঁছিয়া গেলাম। মামার বাড়ীটা অন্ধকারে প্রেতের মতো দাঁড়াইয়া আছে মনে হইল। সহিসের সহায়তায় জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া লইলাম। যদিও আমি আসিব বলিয়া পূর্বেই চিঠি লিখিয়াছিলাম কিন্তু বাড়ীতে কেহ যে আমার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহা মনে হইল না। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম দ্বিতলের একটি ঘরের জানালা হইতে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাইতেছে, বুঝিলাম দিদিমা জাগিয়া আছেন। আর কেহ না করুক তিনি আমার প্রত্যাশা করিতেছেন। সহিস আমার বাক্স বিছানাটা রাস্তায় নামাইয়া দিয়াছিল। সে আমাকে প্রশ্ন করিল—"বাবু এবার আমরা যাই?" আমার পক্ষে বাক্স বিছানা বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাহাকে বলিলাম—"তুমি একটু অপেক্ষা কর। এদের ওঠাই। বাক্স বিছানাটা তুমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও।" নীচের তলায় কার্তিক মামা থাকিতেন। তাঁহার কপাটেই গিয়া ধাক্কা দিলাম। অনেক ধাক্কাধাক্কির পর কপাট খুলিল। যিনি কপাট খুলিয়া বাহির হইলেন তিনি কার্তিক মামা নন। প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই, কপাট খুলিতেই বলিলাম, কার্তিক মামা কেমন আছ? এদিকে এস, প্রণামটা করি। সসংকোচে আর

এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, কার্তিকবাবু নেই। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছেন। আমি নগেন, ডাক্তারবাবুর কম্পাউন্ডার। একটু অবাক হইয়া গেলাম, কার্তিক মামা যে কখনও চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন ইহা আমার কল্পনাতীত ছিল। নগেনবাবুর ঘরেই আমার বাক্স বিছানাটা সহিসের সহায়তায় রাখাইলাম। তাহার পর যাহা করিলাম তাহা আমার মতো দারিদ্রের হয়তো করা উচিত ছিল না। কিন্তু তখন আমার দারিদ্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার কাছে তখন দুইটি টাকা মাত্র ছিল। সে দুইটিই আমি সহিস কোচোয়ানকে দিয়া দিলাম। তাহারা যখন সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল তখন যে আনন্দ আমার সারা মনকে প্লাবিত করিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়।

"কে রে সুয্যি এলি নাকি—"

নেত্যর কণ্ঠস্বর। ছাতের আলিসা হইতে সে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

"হ্যাঁ আমি। যাচ্ছি—"

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দিদিমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দিদিমা অন্ধ চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া আছেন।

"সুয্যি এলি—"

আমি গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চোখের জল যেন বাঁধ ভাঙিয়া আমার সমস্ত সত্তাকে বিগলিত করিয়া দিদিমার নিকট নিজেকে নিবেদন করিল। অনুভব করিলাম দিদিমাও কাঁদিতেছেন। তিনি আমার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন। একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম তিনি কাঁদিতেছেন। একটু পরে তিনি কথা বলিলেন।

"মুখ হাত ধুয়ে কিছু খা। তোর জন্যে দুধ রেখেছি। নেত্য সেটা গরম করে দিক।"

আমি উঠিয়া দেখিলাম নেত্যও ঘরের মেঝেতে এক কোণে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। আমি উঠিয়া বসিতেই নেত্য হাঁটুর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল। তাহার চোখ দুটিও হাসিতে লাগিল। হাসি-কান্না মাখা তাহার সে দৃষ্টি আমি এখনও ভুলি নাই।

"তুমি বস, আমি এখনই দুধ গরম করে দিচ্ছি—"

"চিনি একটু বেশী করে দিস। সমস্ত রাত খায়নি বোধহয় কিছু।"

"আমি দুখানা রুটিও রেখে দিয়েছি। দুধ রুটি খাবি ?"

"খাবে না কেন। তুই এনে দেনা পোড়ামুখী। অনুমতি নেবার দরকার কি—"

আমি ট্রেনে কিছু খাই নাই। কিন্তু তবু এই ভোরে দুধ রুটি খাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু সে কথা বলিতে পারিলাম না। জানিতাম বলা বৃথা, খাইতেই হইবে।

খাওয়া শেষ হইলে দিদিমা বলিলেন—"আয়, আমার কাছে বস।" দিদিমার কাছে বসিতেই দিদিমা আমার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন—"খুব রোগা হ'য়ে গেছিস দেখছি।" আমি রোগা হই নাই, বরং একটু মোটাই হইয়াছিলাম। কিন্তু জানিতাম দিদিমাকে সে কথা বোঝানো শক্ত। চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর দিদিমা বলিলেন, "তোর মামা এখনও ওঠেনি। এই ফাঁকে

তোকে একটা কথা বলে নি।" দিদিমা বলিলেন আমি পাশ করিয়াছি এই খবর এখানে আসাতে অনেকের মনে, বিশেষত মামীমার মনে একটা আশঙ্কা হইয়াছে যে আমি যদি এখানে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করি তাহা হইলে মামার প্র্যাকটিস হয়তো কমিয়া যাইবে। ইহা লইয়া অনেকেই নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। এ শহরে বাবার নাকি খুব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হরিদাস মাড়োয়ারি প্রভৃতি বড় বড় ধনী লোকেরা বাবাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বাবা যদি একটু ইঙ্গিত করেন তাহা হইলে তাহারা বাজারে এখনি আমার জন্য বড় ডিসপেন্সারি করিয়া দিবে। মামা যদিও মুখে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সম্ভবত মনে মনে তাঁহারও ভয় হইয়াছে। দিদিমা হঠাৎ বলিলেন, "তোকে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—এখানে তুই প্র্যাকটিস করতে বসবি না।" আমি বলিলাম, "তোমাকে কথা দিচ্ছি এখানে আমি প্র্যাক্‌টিস করতে বসব না। মামা যা বলবেন যেমন বলবেন আমি তেমনি করব। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

দিদিমার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনুভব করিলাম তাঁহার বুক হইতে চিন্তার একটা গুরুভার নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর দিদিমা বলিলেন, "ওরা এখন আর কেউ উঠবে না। এই দুর্যোগে কি কারো ঘুম ভাঙে। তুই আমার বিছানাতেই শুয়ে পড়। নেত্যর ঘরের তাকে আমার একটা পুরানো লেপ আছে সেইটে বরং নিয়ে আসুক। আমার লেপটা ছোট, দু'জনের কুলুবে না।"

"লেপ আনবার দরকার নেই। বাবা আমাকে একটা শাল দিয়েছেন, গায়ে দিয়েই শুয়ে পড়ছি—"

"তোর বাবা আবার তোকে শাল দিলে কবে?"

"এখনি। বাবা শাল নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন যে। হরিদাস মাড়োয়ারির জুড়ি গাড়িও আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।"

"তাই নাকি?"

দিদিমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"কই শাল কই?"

"এই যে আমি গায়ে দিয়ে আছি।"

"সরে আয় দেখি ভালো করে।"

দিদিমার দৃষ্টি ছিল না, তিনি কম্পমান হাত দুইটি দিয়া সাগ্রহে শালটাকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া দেখিতে লাগিলেন।

"খুব নরম তো দেখছি, কি রং—"

"শাদা—"

নেত্যও অবাক হইয়া শালটা দেখিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল—"শালের সারা গায়ে কি সুন্দর কাজ করা। এমন জমকালো আঁচলা আমি আর দেখিনি।"

দিদিমা শালের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "হতভাগী তোর সুখের দিন এতদিন পরে এল, আর তুই অকালে কোথা চলে গেলি।" সম্ভবত আমার মাকে স্মরণ করিয়াই কথাগুলি বলিলেন।

আমারও কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। আমি দিদিমার পাশেই শুইয়া পড়িলাম।

সকালে উঠিয়া মামার সহিত দেখা হইল। প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা করিলেন। "এস বাবা এস। কাল রাত্রে কখন এসেছ আমি টেরই পাই নি। আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ তুমি বাবা। বেঁচে থাক। জীবনে উন্নতি কর। আহা, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকত—" মামার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল। দেখিলাম তাঁহার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছে। বাম হাত দিয়া তিনি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

"তোমার মামীমার সঙ্গে দেখা করেছ ?"

"না, কই তিনি।"

"এখনও ওঠেনি বোধহয়। ওকে ভালো করে দেখ দিকি ওর তলপেটে একটা ব্যথা অনেকদিন ধরে হচ্ছে। ওষুধপত্র দিলে কমে, আবার হয়। তুমি একটু দেখ দিকি—"

মামা ফুলের সাজিটি লইয়া খড়ম চট চট করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ীর পিছনে ছোট একটি বাগান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফুল তুলিয়া রোজ তিনি পূজা করিতেন। মামা চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম মামীমার ঘরে যাইব কি না। তাঁহার ঘরের কপাট বন্ধ দেখিয়া ইতস্তত করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার কপাট বেশীক্ষণ বন্ধ রহিল না। সুধীর কপাট খুলিয়া উঁকি দিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর চিনিতে পারিবামাত্র আনন্দে তাহার সব দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল। ছুটিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল সে। তাহার পর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"সুশীল নন্তি আয়, দেখ, কে এসেছে।" মামার চারটি ছেলেমেয়েই আমাকে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তাহাদের প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে যেন নূতন একটা ভাব জাগিয়া উঠিল। এ ভাব আগে কখনও আমার মনে জাগে নাই। হঠাৎ মনে হইল ইহারা যদিও আমার মায়ের পেটের ভাইবোন নয় তবু আমি উহাদের দাদা। উহাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার জোরেই আমি উহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছি। সেখান হইতে আমাকে কেহ নড়াইতে পারিবে না। একথা আগে কখনও আমার মনে হয় নাই। সেদিনই প্রথম মনে হইল।

"মামীমা উঠেছেন ?"

"হাঁ, উঠেছে তুমি এসো না।"

নন্তি আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

মামীমার ঘরে গিয়া দেখিলাম মামীমা উঠিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু আমার ভালো লাগিল না। মুখটা কেমন ফোলা-ফোলা ফ্যাকাসে। প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনার চেহারাটা তো ভালো লাগছে না মামীমা। জ্বর হয়েছে নাকি—।"

"কি হয়েছে জানি না বাবা। শরীর মোটে ভালো নেই। জ্বর হয় মাঝে মাঝে। আর তলপেটে একটা ব্যথা লেগেই আছে।"

"আচ্ছা আমি দেখব পরে।"

মামীমার ঘর হইতে বাহির হইয়া সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"চন্দর কোথা ? সে কোন্ ঘরে শোয়।"

"ছোটদা পিসেমশায়ের বাড়ীতে শোয়। চল না—"

বাবার বাসায় গিয়া দেখিলাম বাবা নাই, মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র ঘরের কোণে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছে। আগেই বলিয়াছি বাল্যকাল হইতেই চন্দর একটু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন। জানি না, হয়তো বাবার প্রভাব উহার উপর পড়িয়াছিল। বাবাই উহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। আমার উপনয়ন দিয়াছিলেন মামা। গঙ্গার ধারে শিব-মন্দিরের চত্বরে ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। বিশেষ কোন ধুমধাম হয় নাই। দিদিমার আগ্রহে নমো নমো করিয়া মামা নিয়ম-রক্ষামাত্র করিয়াছিলেন। তাই আমার মনে ওই ধরনের লোক-দেখানো আধ্যাত্মিকতা কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমাকে মাথা ন্যাড়া করিয়া কান বিঁধাইয়া কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। মামার ভয়ে এবং মামাকে দেখাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিতাম। সে কথাও এখন ভুলিয়া গিয়াছি, এখন দিনান্তে একবারও গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করি না। এজন্য বিশেষ অসুবিধাও ভোগ করি নাই। হঠাৎ পদ্মাসনে আসীন নিমীলিত নয়ন আমার অনুজকে দেখিয়া আমি একটু ঘাবড়াইয়া গেলাম। কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় দেখিলাম বিষ্ণুপ্রসাদ রান্নাঘর হইতে খানিকটা গরম দুধ লইয়া প্রবেশ করিল।

"আরে ডাক্তারবাবু যে। তোমার জন্যেও দুধ গরম করব নাকি। এটা চন্দরবাবুর জন্যে।"

"না, আমি দুধ খেয়ে এসেছি দিদিমায়ের কাছে। চন্দর রোজ সকালে পুজো করে নাকি -"

বিষ্ণুপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, রোজ।" তাহার পর উচ্চকণ্ঠে হিন্দীতে বলিয়া উঠিল—"হো চন্দরবাবু, পহলে দুধঠো খা লেও, পিছে পুজা করিও। দুধ ঠাণ্ডা হো রহা হয়। আউর দেখো, কোন আঁয়ে হে'।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চন্দর উঠিয়া পড়িল এবং হাসিমুখে বাহিরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। সহসা যেন সেদিন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম চন্দ্র রূপবান। ধপধপে ফরসা রং দিব্যকান্ত এই কিশোর যে আমার ভাই ইহাতে আমি সেদিন একটু গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম।

"কি রকম পড়াশোনা হচ্ছে—"

চন্দ্র লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, "ভালোই—"

বিষ্ণুপ্রসাদ বলিল, "চন্দরবাবু এবার তো ফাস্ট হয়েছে। সকলে আশা করছে ও এবার স্কলারশিপ পাবে।"

"ও, তাই নাকি!"

সত্যই তখন ভ্রাতৃগর্বে আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখনই মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিলাম চন্দরকে ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। আমি অর্থাভাবে যে কষ্ট পাইয়াছি চন্দরকে তাহা পাইতে দিব না। চন্দর যতদূর পড়িতে পারে আমি পড়াইব। তাহাকে মানুষ করাই এখন আমার জীবনের লক্ষ্য হোক।

সুধীর বলিল, "দাদা, আমরা একটা টিয়া পুষেছি। কি সুন্দর যে টিয়াটা—দেখবে?"

চন্দর দুধ খাইতেছিল। সে খানিকটা দুধ খাইয়া সুধীরকে বলিল, "আমি এত খেতে পাচ্ছি না, তুই খেয়ে নে।"

হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল বিষ্ণুপ্রসাদ।

"আরে সুধীরকে দুধ আমি দিচ্ছি। তুমি ওটুকু খেয়ে নাও না—"

সুধীর সাগ্রহে বাকি দুধটুকু খাইয়া ফেলিল। চন্দ্র মুচকি হাসিয়া বিষ্ণুপ্রসাদের দিকে চাহিতেই সে বলিল, "গুরুজি আসুন, আমি বলে দিচ্ছি, তুমি দুধ খাও না। কালও খাওনি।"

বিষ্ণুপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা কখন ফিরবেন ?"

"তিনি দুপহরের আগে ফিরবেন না। মন্দিরে পুজা সেরে আফিসে যান আজকাল। আফিসের কাজ শেষ করে এখানে আসেন। এসে নিজের হাতে রান্না করে খাবেন। একটু পরে মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ আসবে। হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, তুমি আজ দুপুরে এখানেই খেও, গুরুজি বলে গেছেন। উনি মহাপ্রসাদ নিজেই রাঁধেন রোজ, খেয়ে দেখো কি ফার্স্ট ক্লাস রান্না। পেঁয়াজ দেন না। খালি রসুন, গোলমরিচ, লংকা, জিরা, আদা। কোন কোন দিন রসুন না দিয়ে হিং দেন, চমৎকার খেতে হয়। চন্দরবাবু মাংস খেতে পারে না। বদনসিব—"

ইহার পর বিষ্ণুপ্রসাদ যাহা করিল তাহাতে একটু বিস্মিত হইয়া গেলাম। বিষ্ণুপ্রসাদ পকেট হইতে তামাকপাতা বাহির করিয়া কুচি কুচি করিয়া বাঁ হাতের তালুতে রাখিল এবং তাহার পর একটি ছোট কৌটা হইতে চুন বাহির করিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া চুনের সহিত তামাকপাতাগুলিকে দলিতে লাগিল।

"এসব কি হচ্ছে।"

"খইনি ধরেছি। ওতে দাঁত ভালো থাকে। দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ত, গুরুজি বললেন খইনি ধর। খৈনি খাবার পর থেকে আর রক্ত পড়ে না।"

তামাকপাতার সহিত চুন যখন বেশ মিশিয়া গেল তখন বিষ্ণুপ্রসাদ ডান হাত দিয়া তাহার উপর একটি চাপড় মারিয়া সেটি নীচের ঠোঁটে পুরিয়া ফেলিল।

"দাদা, টিয়াটা দেখবে না ?"—সুধীর আবার তাগাদা করিল।

"চল—"

সকলে আমরা বাড়ী চলিয়া গেলাম।

প্রথমে মাস তিনেক হৈ হৈ করিয়া কাটিয়া গেল। আমি উহার পর কি করিব, কোথায় বসিব, কোথায় বসা উচিত সে সব কিছুই ঠিক হইল না। আমি আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের দলে গিয়া ভিড়িলাম। সাহেবগঞ্জে তখন পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মন্মথই মাতব্বর হইয়া উঠিয়াছিল। সে খোলাখুলিভাবে থিয়েটারের পাণ্ডাগিরি করিতেছিল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই নবযুবকদের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল একটা। আমরা যখন পাঠশালায় পড়িতাম তখনই তাহার কাপ্তেনী করার একটা সহজ প্রবণতা ছিল। দেখিলাম তাহাই এখন ফুলে ফলে বিকশিত হইয়াছে। রেলের ছোকরা কর্মচারীরা তাহাকে দেবতার মতো মান্য করে। তাহার কথায় ওঠে বসে। রেলের এই কর্মচারীদের লইয়াই নবনাট্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। মন্মথর বাবা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। আমি গিয়াই মন্মথদের বাড়ীতে গেলাম মন্মথর মাকে প্রণাম করিবার জন্য। কি অকৃত্রিম স্নেহভরে তিনি যে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন তাহা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নাই। মনে হইল আমিই যেন তাঁহার একমাত্র পুত্র, বহুদিন

বিদেশবাস করিবার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাকে লইয়া যে কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, কি খাইতে দিবেন তাহা যেন তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। গরম সিঙাড়া খাইতে ভালোবাসিতাম, দেখিলাম সে কথাটা তিনি ভোলেন নাই, চাকরকে ছুটাইয়া দিলেন ভগবতীর দোকান হইতে শিঙাড়া আনিবার জন্য। তখন ভগবতীই সাহেবগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিঙাড়া-শিল্পী ছিল। শিঙাড়ার পুরে বাদাম দিত। তাহার মোটা কালো চেহারাটা এখনও মনে আছে। খুব উদার লোক ছিল সে। কোনও ছোট ছেলে তাহার দোকানের সামনে গিয়া দাঁড়াইলে সে তাহাকে ডাকিয়া খাবার দিত, কখনও পয়সা চাহিত না। ছেলেটি যখন খাইত তখন সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিত কেবল। কোন ছেলে তাহাকে পয়সা দিতে গেলে তাহাও সে ফিরাইয়া দিত না, তাহা লইয়া আরও কিছু খাবার দিত তাহাকে।

বরদাবাবু—মন্মথর বাবা—আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার হ'য়ে তো বেরুলে, এবার কি করবে? চাকরি?"

"না, চাকরি করব না।"

"তবে? প্রাইভেট প্র্যাকটিস?"

"হ্যাঁ, তাই করতে হবে।"

"কোথায় বসবে ঠিক করেছ? এই খানেই বস না, তোমার মামার সাহায্য পাবে।"

"মামা যা বলবেন তাই করব। দিদিমার ইচ্ছে নয় যে আমি এখানে বসি।"

"ও তাই নাকি! তোমার বাবার কি মত?"

"বাবার সঙ্গে এ নিয়ে কোনও কথা হয়নি।"

সত্যই বাবা এ বিষয়ে আশ্চর্যরকম উদাসীন হইয়া রহিলেন। মনে হইতে লাগিল আমাকে ডাক্তারি পাশ করাইয়া তিনি যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। ইহার পর যেন তাঁহার করণীয় আর কিছু নাই। চন্দর তাঁহার বাসায় থাকিত বটে, কিন্তু তাহার প্রতিও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার পোষা হরিণটাই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাহাকে তিনি স্বহস্তে খাওয়াইতেন। খুব ভোরে উঠিয়া তাহার জন্য কচি ঘাস স্বহস্তে তুলিতেন। যখন আশেপাশে ঘাস পাওয়া যাইত না তখন বিষ্ণুপ্রসাদ কোনও ঘাসওয়ালীকে বলিয়া ঘাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিত। সে ঘাসগুলি বাবা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া তবে খাইতে দিতেন তাহাকে। মন্দির হইতে ফিরিবার সময় মাঝে মাঝে তাহার জন্য কুলপাতা আনিতেন। মন্দিরের চাকর চিতুয়া সেটি সংগ্রহ করিয়া দিত। বাবা দিনে কখনও ঘুমাইতেন না। আহারাদির পর সেতার লইয়া উঠানে বসিতেন। হরিণটাকেও খুলিয়া দিতেন। হরিণটা তাঁহার আশেপাশেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কখনও বাহিরে যাইত না। কপাট খোলা থাকিলেও বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না সে। বাবাই তাহার জগৎ ছিল। বাবার কাছাকাছিই সে ঘুরিত এবং মাঝে মাঝে তাহার বিশাল চোখ দুটি তুলিয়া বাবার দিকে চাহিয়া থাকিত। বাবা যখন সেতার বাজাইতেন তখন সমঝদার শ্রোতার মতো সে বাবার সামনে আসিয়া বসিত এবং কান নাড়িয়া নাড়িয়া সেতার-বাজনা উপভোগ করিত। তাহার বড় বড় কালো চোখ দুইটি ভাষাময় হইয়া উঠিত, ওই দুইটিই ছিল তাহার মনের দর্পণ। আমিও ঘাস খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া তাহার সহিত ভাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী বশ করিয়াছিল মামার ছোট

মেয়ে নন্তি। তাহার সাড়া পাইলেই হরিণের কান দুইটা খাড়া হইয়া উঠিত। এবং তাহাকে দেখিতে পাইলেই সে দাঁড়াইয়া উঠিত। নন্তি প্রায়ই রান্নাঘর হইতে শাক-পাতা আনিয়া তাহাকে খাওয়াইত। মাঝে মাঝে তাহার গলা জড়াইয়া আদরও করিত খুব। হরিণের শিং গজাইতেছিল, তাহার গলা জড়াইয়া আদর করা একটু বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু নন্তি তাহা গ্রাহ্য করিত না।

সন্ধ্যার সময় আমাদের আড্ডা বসিত জগন্নাথবাবুর বাড়ীতে। ডি. টি. এস. আফিসে অশ্বিনীর বাবার জায়গায় তিনি আসিয়াছিলেন। অকৃতদার পুরুষ ছিলেন তিনি। সংসারে অন্য কোন ঝামেলা ছিল না। থিয়েটারই তাঁহার জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল। থিয়েটার লইয়াই থাকিতেন। যাহারা থিয়েটার করিতে পারিত তাহারাই তাঁহার আত্মীয় ছিল। তাঁহার বাড়ীতে ফটোর অনেক অ্যালবাম ছিল। তাহাতে যাহাদের ফটো তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই তাঁহার আত্মীয় নন, সকলেই থিয়েটার শিল্পী। অথচ আর একটা মজার ব্যাপার এই যে নিজে তিনি কোনও দিন থিয়েটার করেন নাই, কারণ কোন ভূমিকায় অবতরণ করিয়া হাততালি কুড়াইবার লোভ তাঁহার ছিল না। তিনি নেপথ্যে থাকিয়া মুরুব্বিগিরি করিতে ভালোবাসিতেন। কে কোন পার্টের উপযুক্ত, অনিচ্ছুক কোন ছোকরাকে কি ভাবে প্রভাবিত করিলে সে থিয়েটারে নামিয়া ফিমেল পার্ট লইবে, কোন দোকানে ভালো সাজপোশাক পাওয়া যায়, সস্তায় কি করিয়া সিন্ উইংস প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভব, এই সব সমস্যাই তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত এবং এই সব সমস্যা সমাধান করিয়া তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার বাড়ীটাই থিয়েটারের আখড়া হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সেইখানেই রিহার্সাল হইত। সে বাড়ীতে অনেক গৃহহীন বেকার থিয়েটার-শিল্পীকে তিনি আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই তাহাদের চাকরিতে ঢুকাইয়া দিতেন। মন্মথ জগন্নাথবাবুর হৃদয় হরণ করিয়াছিল। সে ভালো গান গাহিতে পারিত, ভালো অভিনয় করিতে পারিত। এসব ছাড়াও অভিনয় শিখাইবার ক্ষমতাও সে অর্জন করিয়াছিল। দেখিতে সুন্দর তো ছিলই। এক ব্যক্তির মধ্যে এতগুলি গুণের সমাবেশ দেখিয়া জগন্নাথবাবু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার চেষ্টায় ও বিশেষ সুপারিশে মন্মথর একটি ভালো চাকুরি জুটিয়া গিয়াছিল। চাকরিটির বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে ফাঁকি দিবার প্রচুর অবসর ছিল। মন্মথ থিয়েটারের ব্যাপার লইয়াই মাতিয়া থাকিত, কাজ কিছুই করিত না। জগন্নাথবাবু তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কাগজে কলমে জগন্নাথবাবুই মন্মথর মনিব ছিলেন বলিয়া কোন অসুবিধাই হইত না, মন্মথ বুঝিয়াছিল থিয়েটার করাই তাহার চাকরি। আমিও কয়েকদিন পরে মন্মথর সহিত জগন্নাথ-বাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইলাম। গিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল যে ঘরটায় রিহার্সাল হয় সেখানে রাসবিহারীবাবুর একটা বড় ফটো টাঙানো রহিয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন। সাহেবগঞ্জের থিয়েটারের তিনিই স্থাপয়িতা এবং প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিয়াছে দেখিয়া খুব ভালো লাগিল। যাইবামাত্র জগন্নাথবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই ভালো লাগিয়া গেল। হৃষ্টপুষ্ট, হাস্যমুখ, গোঁফদাড়িকামানো, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড বর্মা-চুরুট, অত শীতেও সাধারণ ফতুয়া গায়ে ভদ্রলোককে দেখিয়াই অনুভব করিলাম যেন কোনও

সহৃদয় আত্মীয় সন্নিধানে আসিয়াছি। তাঁহার চোখ মুখ দিয়া একটা আন্তরিক প্রসন্নতা বিচ্ছুরিত হইতেছিল, আমার পরিচয় পাইয়াই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মন্মথ হাসিয়া বলিল—"আমাদের একটা ভাবনা ঘুচে গেল। রাম পাওয়া গেছে।"

"কোথা ?"

"এই যে আপনার সামনেই। নাদুসনুদুস চেহারা, লম্বাও আছে, খাসা মানাবে।"

জগন্নাথবাবু একটু পিছাইয়া গিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"তা মানাবে। বেশ মানাবে।"

উহারা তখন 'সীতার বনবাস' বইখানা নামাইবে ঠিক করিয়াছিল, কিন্তু মনোমত 'রাম' পাওয়া যাইতেছিল না। আমি সেইদিনই রামের ভূমিকায় সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হইয়া গেলাম এবং সেইদিনই আমার একটা নূতন জীবন আরম্ভ হইল যেন। মনে কিন্তু একটা ভয় ছিল। প্রকাশ্য থিয়েটারে নামিলে মামা কিংবা বাবা যদি রাগ করেন। জগন্নাথবাবুকে সে কথা বলিতেই তিনি বলিলেন—"সে ভার আমার। তোমার মামা বাবা দুজনকেই আমি রাজী করাব, সে ভার আমার। তাঁরা আপত্তি করবেন না।"

তাঁহারা আপত্তি করিয়াছিলেন কি না জানি না, আপত্তি করিয়া থাকিলেও জগন্নাথবাবু কিভাবে তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন তাহাও আমার অজ্ঞাত কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আমি নিয়মিতভাবে রিহার্সালে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি বরাবরই একটু কুনো লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। থিয়েটারের দলে জুটিয়া আমার স্বভাবের এই আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গেল। দিনকতক পরেই প্রথম শ্রেণীর আড্ডাধারী হইয়া উঠিলাম আমি।

আড্ডাটা অবশ্য সন্ধ্যার পর জমিত। দিনের বেলা আমি মামার ডিসপেন্সারিতেই বসিতাম এবং মামারই নির্দেশ অনুসারে মামার রোগীদের দেখিতাম। পাকাপাকিভাবে আমি যে কোথায় বসিব তাহা মামাও প্রথমে ঠিক করিতে পারেন নাই। মামার বয়স হইতেছিল, তিনি সব রোগী দেখিয়া উঠিতে পারিতেন না। এজন্য অনেক রোগী হাতছাড়া হইয়া যাইতেছিল। আমি আসাতে মামার সুবিধাই হইল। রোগী দেখিয়া আমি যে ফি পাইতাম তাহা মামাকেই দিয়া দিতাম। মামার ডিসপেন্সারির আয়ও কিছু বাড়িল। মামা এইসব দেখিয়া হঠাৎ একদিন আমাকে বলিলেন, "তুই এখানেই বসে যা। ঘরের খেয়ে এখানেই প্র্যাকটিস কর। কোথায় আর যাবি। আজকাল ক্যাপিটেল না হলে কোথাও বসা যায় না। আমিও একা আর এখানে রোগীর ভিড় সামলাতে পাচ্ছি না।" আমার তখন থিয়েটারের নেশা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল, জমাট আড্ডা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার ইচ্ছাও তেমন ছিল না, মামার কথাগুলি বেশ ভালো লাগিল। দিদিমাকে গিয়া বলিলাম। আশা করিয়াছিলাম দিদিমা শুনিয়া খুশী হইবেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, তোমার এখানে বসা চলবে না। এখানে বসলে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হ'য়ে যাবে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আলাদা সংসার গড়তে হবে তোমাকে। ভাইকে মানুষ করতে হবে। মামার তল্পি বয়ে বেড়ালে তা কোনও দিন হবে না। মামার সঙ্গে সদ্ভাবও নষ্ট হ'য়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। এখানে তোমার বসা চলবে না। অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে যদি বসতে না পার, তাহলে চাকরি নাও।" সুরথবাবু তখনও বাঁচিয়া

ছিলেন। আমি তাঁহার সহিত একদিন গিয়া দেখা করিলাম। আমাকে প্রথমে তিনি চিনিতে পারেন নাই। মামার পরিচয় দেওয়াতে চিনিতে পারিলেন।

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ শক্তিবাবুর বড় ভাগনে ডাক্তারি পড়ছিল শুনেছিলাম।"

চোখ মুখ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অন্যদিকে তাকাইয়া রহিলেন। সম্ভবত নিজের পুত্রদের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার তিন ছেলের মধ্যে একজনও মানুষ হয় নাই। একজনও তাঁহার কাছে ছিল না। বড়টি জাহাজের খালাসী হইয়া জাঞ্জিবরে চলিয়া গিয়াছিল। সেখানেই নাকি বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে। একটা চিঠি দিয়াও খবর লয় না। মেজো ছেলেটি বেশীদূর লেখাপড়া করে নাই। বরদাবাবুর অনুগ্রহে তাহার রেলের একটি চাকরি হইয়াছিল। সুরথবাবুর সামাজিক সম্ভ্রমকে পদদলিত করিয়া সে একটি নীচবংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বউকে লইয়া কর্মস্থলে থাকে। তাহার সহিতও সুরথবাবুর কোনও সম্পর্ক নাই। তৃতীয় ছেলেটি গাঁজাখোর। বিরজাপণ্ডিত তাহার মস্তকটি চর্বণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নাই। সুরথবাবু তাহার সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুরথবাবু বিপত্নীকও হইয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। বাড়ীতে আছেন একটি বিধবা বোন। সেই এখন তাঁহার দেখাশোনা করে। সুতরাং আমি পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়াছি এ খবর সুরথবাবুর কর্ণে মধুবর্ষণ করিল না। যাহাদের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ তাহারা প্রায়ই অপরের সুখের সংবাদে আনন্দিত হয় না। অনেক সময় সে সংবাদটাকে বাঁকাইয়া তাহার কুৎসিত দিকটা দেখাইবার চেষ্টা করে। মনে হয় যাহা বলিতেছে তাহা বিরাট দূরদর্শিতার ফল কিন্তু আসলে তাহা পরশ্রীকাতরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সুরথবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রতিবছরই তো দলে দলে ডাক্তার পাশ করে বেরুচ্ছে। মাছির মতো ভন ভন করছে চতুর্দিকে। আজকাল পাশকরা ডাক্তারদের চেয়ে কোয়াক্ ডাক্তারের প্রতিপত্তিই তো বেশী। অনর্থক অতগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি! তোমার মামাকেই দেখ না, উনিও পাশ করেন নি, লেখাপড়াও তেমন জানেন না, অথচ ও'র প্র্যাকটিসের বহরটা দেখ।"

কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম।

"এখন কি করবে ঠিক করেছ ?"

"ঠিক করিনি কিছু।"

"চাকরি পেলে চাকরি নাও। আমরা বাঙালী জাত, গোলামি ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।"

অনুভব করিলাম সুরথবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়া ভুল করিয়াছি। তিনি এখানকার একজন প্রবীণ চিকিৎসক বলিয়াই মনে হইয়াছিল তাঁহার সহিত দেখা না করিলে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে, বিশেষত তিনি যখন আমাদের পরিবারের সহিত এককালে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম ঘনিষ্ঠতার মাধুর্য অবলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মন এখন পরশ্রীকাতরতার গরলে পরিপূর্ণ।

"আচ্ছা, এবার উঠি।"

আসিবার সময়ও সুরথবাবু আর একবার দংশন করিতে ছাড়িলেন না।

"শুনলাম এখানে এসেই মন্মথর দলে ভিড়ে গেছ।"

সুরথবাবু যে এ সংবাদটাও জানেন তাহা প্রত্যাশা করি নাই।

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "হ্যা সন্ধ্যের সময় ওখানেই যাই।"

"আমার ছোটছেলে জগুও ওখানে যেত। ছোটখাটো পার্টও দিত তাকে ওরা। তার কি হয়েছে জানো?"

আমি জানিতাম, কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

সুরথবাবু নিজেই সেটা ব্যক্ত করিলেন, "সে এখন গাঁজাখোর চোর হয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। সুরথবাবুর কথা একটু বিশদ করিয়া বলিলাম কারণ সুরথবাবুর মতো লোক আমাদের সমাজে অনেক আছেন। ইঁহাদের কাছে আসিলে সমস্ত মন অপ্রসন্ন হইয়া ওঠে, কারণ ইঁহাদের অন্তর বিষে পরিপূর্ণ। ইঁহাদের কথাবার্তা, আচরণ সমস্তই বিষাক্ত। ইঁহাদের সান্নিধ্য পীড়াদায়ক, ইঁহাদের দেখিলে রাগ হয়। কিন্তু ইঁহাদের উপর রাগ হওয়া উচিত নয়, কারণ ইঁহারা প্রায়ই বড় দুঃখী, কিন্তু সে কথা অনেক পরে বুঝিয়াছি। তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা বাসনের উপর রাগ করা হাস্যকর। তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা বাসন মেরামত করিয়া ব্যবহার করা চলে, কিন্তু তোবড়ানো, ফাটা বা ছ্যাঁদা মানুষের মেরামত হয় না। সেইজন্য তাহা আরও বেশী করুণ

আমি কোথায় প্র্যাকটিস করিতে বসিব এই প্রশ্নটা সবাই যেন এড়াইয়া চলিতে লাগিল। মামা এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন না, দিদিমাও একদিন বলিলেন, "যতদিন পারিস আমার কাছে থাক, তারপর তো দূরে চলে যেতে হবেই। তোর মামার কাছে হাতে-কলমে কাজকর্ম না হয় শিখে নে কিছুদিন। শক্তি ডাক্তারি করেই তো এত বড় সংসারটাকে খাড়া রেখেছে। ওর কাছে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারবি। তোর বাবাকে জিগ্যেস করেছিস এ বিষয়ে?"

"বাবার সঙ্গে কথা কইবার অবসরই তো পাই না। সমস্ত দিন তো ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যের সময় 'কারণ' পান করেন আর সেতার বাজান। ওঁর কাছে এসব কথা পাড়তেও ভয় করে।"

"চন্দর বলছিল তুই রোজ বিকেলে ওখানে মাংস খেতে যাস।"

"হ্যাঁ যাই। বাবা আমার জন্যে রোজ খানিকটা মাংস তুলে রেখে দেন। বিকেলে গিয়ে সেটা খেয়ে আসি।"

"শুধু মাংস খাস? না, তার সঙ্গে ভাতও?"

"বিষুণপ্রসাদ পরোটা করে দেয়।"

"খুব মজায় আছিস তাহলে"—খবরটা শুনিয়া দিদিমা বেশ খুশী হইলেন। "যখন মাংস খেতে যাস তখন তোর বাবা কোথায় থাকে।"

"বাবা তখন গঙ্গার চরে হাঁটতে বেরিয়ে যান। হরিণের জন্য ঘাস নিয়ে আসেন রোজ।"

"তুই তোর বাবাকে একদিন জিগ্যেস কর। ওর মতটাও তো জানা দরকার।"

"বাবার সঙ্গে কথা কইতে আমার বড় ভয় করে।"

"বাপের সঙ্গে কথা কইবি তাতে আবার ভয় কি।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

"আজ সন্ধ্যের পর কোথাও বেরুসনি। বাবাকে গিয়ে জিগ্যেস কর এখন আমি কি করব—"

চুপ করিয়া রহিলাম।

"কি রে কথার জবাব দিচ্ছিস না যে।"

"আচ্ছা বলব একদিন।"

বাবার ঘরে মা কালীর একটি ছবি টাঙানো থাকিত। বাবা সেই ছবির সামনে রোজ সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেন এবং 'কারণ' পান করিতেন। সে সময় বাবার নিকট কেহ যাইতে সাহস করিত না। এমন কি বিষ্ণুপ্রসাদও নয়। ছবির ঠিক নিচেই একটি প্রদীপ জ্বলিত এবং প্রদীপের পাশেই কয়েকটি ধূপকাঠি। স্বল্পালোকিত ধূপধূমাচ্ছন্ন সেই ঘরের পরিবেশ রহস্যাবৃত মনে হইত। মনে হইত সমস্ত পরিবেশটাই যেন গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছে। বাবা এবং মা কালীর সেই ছবি উভয়েই যেন সে গানের শ্রোতা। কম্পিতশিখা প্রদীপটাও মনে হইত সে গানের সুরে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই রহস্যময় পরিবেশকে বিঘ্নিত করিবার সাহস আমার ছিল না। আমি যেদিন বাবার সহিত কথা বলিবার জন্য গেলাম সেদিন ঘরের ভিতর ঢুকিতে পারিলাম না। ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চন্দরও সন্ধ্যার সময় এখানে পড়িত না। সে সুধীর ও সুশীলের সহিত গিরীন মাস্টারের বাড়ীতে পড়িতে যাইত। বিষ্ণুপ্রসাদও এই সময় থাকিত না। থানার সিপাহীদের একটি আড্ডা ছিল, সেই আড্ডায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঢোলক ও খঞ্জনি বাজাইয়া 'রামা হো' 'রামা হো' গান হইত। বিষ্ণু এই আড্ডার একজন সম্মানিত সভ্য ছিল। সেখানে গানের পর সেতার বাজাইয়া সে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিত। বাবার নিকট যাহা শিখিত তাহা এইখানেই আস্ফালন করিত সে। আমি জানিতাম বাবার এই অদ্ভুত পূজা শেষ হইবার পর বাবাও বাগচি মহাশয়ের বাসায় চলিয়া যাইবেন। সেখানে তিনি বাবার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বাবা গেলে নিজের সেতারের তারগুলি আলগা করিয়া দিয়া আবার সেগুলি বাঁধিতেন। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইয়া মিলাইয়া তারগুলি বাঁধিতেন বাবা ততক্ষণ নীরবে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন। মনে হইত তিনি যেন ধ্যান করিতেছেন। সুর মিলিয়া গেলেই বাবার চোখ খুলিয়া যাইত এবং চোখের দৃষ্টি হইতে মৃদু হাসি বিকীর্ণ হইত। বাগচি মশাই সুর মিলাইতে মিলাইতে বাবার নিমীলিত নয়নের দিকে মাঝে মাঝে সাগ্রহে চাহিয়া দেখিতেন চোখ খুলিল কিনা। তিনি জানিতেন সুরটি মিলিয়া গেলেই বাবার চোখ খুলিবে। দুই বন্ধু মিলিয়া প্রত্যহ এই সুরের খেলা খেলিতেন। সুর মিলিয়া গেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাগচি মশাই সেতারটি বাবার দিকে ঠেলিয়া দিতেন। বাবা তখন আলাপ করিতেন তাহাতে। রিটায়ার্ড টিকিট কালেকটার গুপীবাবু তবলায় সঙ্গৎ করিতেন। গুপীবাবু লোকটি কুদর্শন ছিলেন। কালো রঙ, সমস্ত মুখে জরার চিহ্ন। মনে হইত মানুষের মুখ নয়, যেন বেগুনপোড়া। আজানুলম্বিত কোট গায়ে দিতেন। সামনের দিকে ঝুঁকিয়া ময়লা ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া কাঁধে একটা ভাঙা ছাতা লইয়া যখন তিনি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন কেহ বুঝিতে পারিত না যে উনি অতি বড় গুণী লোক। বাবা গুপীবাবুকে খুব খাতির করিতেন।

আমি ঠিক করিয়াছিলাম বাবা যখন বাগচি মহাশয়ের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির

হইবেন তখনই তাঁহাকে ধরিব।...একটু পরেই বাবা বাহির হইলেন। আমি বারান্দার চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম।

"কে—"

"আমি সূর্য্য।"

"এখানে বসে আছ কেন। থিয়েটারের রিহার্সালে যাওনি আজ ?"

কথাটা শুনিয়া আমি একটু ঘাবড়াইয়া গেলাম! আমি থিয়েটারের রিহার্সাল দিতেছি এ খবর যে বাবা জানেন এবং তাহা বাবার মুখ হইতে শুনিব তাহা কল্পনা করি নাই। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম. "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

"কি কথা।"

"আমি এখন কি করব, কোথায় প্র্যাকটিস করতে বসব, তা এখনও ঠিক করতে পারিনি। তাই—"

"সে দু'দিন পরে আপনিই ঠিক হ'য়ে যাবে। এখন দু'দিন আমোদ-প্রমোদ করছ কর।"

বাবা চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি তাঁহার পিছু পিছু যাইতে যাইতে আবার মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "অনেকে বলছেন চাকরি নিতে—"

"চাকরি নিলে নিজের ভাগ্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। তা করবার দরকার কি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করাই ভালো।"

আমি কোন মন্তব্য না করিয়া তাঁহার পিছু পিছুই চলিতে লাগিলাম। বাবার বাড়ীর সামনে যে সরু গলিটা ছিল বাবা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও করিলাম। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। পূর্ণিমার চাঁদ নয়, শুক্লা সপ্তমীর বা অষ্টমীর চাঁদ। এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছিল সেই অন্ধকার গলিটাতে। মনে হইতেছিল এক অবাস্তব রূপকথালোকের অজানা পথ বাহিয়া আমরা দুইজনে চলিয়াছি। মুখে কোনও কথা বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলাম না। নীরবেই চলিতেছিলাম। কিছুদূর গিয়া বাবা হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং যে প্রশ্ন করিলেন তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

"শুনলাম তুমি রামের ভূমিকায় অভিনয় করবে। রামের চরিত্র সম্বন্ধে পুরো ধারণা আছে তোমার ?"

"কিছু কিছু আছে।"

"কিছু কিছু থাকলে ভালো অভিনয় করতে পারবে না। রাম যে ভগবানের অবতার, তিনি যে সমাজে একটা মহৎ আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এটা ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে, তবে অভিনয় ভালো হবে।"

আবার তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। আর কোন কথা বলিলেন না। আমিও আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলাম না। আমি সোজা জগন্নাথবাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম রিহার্সাল বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। জগন্নাথবাবু একটা মোটা বর্মা চুরুট ধরাইয়া এককোণে মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"কি ডাক্তার এত দেরি যে। কোনও কলে বেরিয়েছিলে না কি।"

"না। অন্য একটা দরকারে আটকে পড়েছিলুম।"

বাবার সহিত যে কথা হইয়াছিল তাহা আমি কাহাকেও বলি নাই।

সেইদিনই জগন্নাথবাবুও আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "ডাক্তার তুমি রেলের চাকরি করবে? তাহলে তোমাকে চেষ্টাচরিত্র ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারি। মেডিকেল ডিপার্ট-মেণ্টের দু' একজন ওপরওলার সঙ্গে আমার খাতির আছে।"

বলিলাম, "না আমি চাকরি করব না ঠিক করেছি।"

জগন্নাথবাবু মুখ হইতে চুরুটটি নামাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন।

"বাঙালীর ছেলে, চাকরি করবে না! কি রকম কথা হলো এটা! চাকরিই আমাদের লক্ষ্মী। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখা যাবে।"

ইহার পর আর একটি ঘটনা ঘটাতে আমার প্র্যাকটিস-প্রসঙ্গ কিছুদিনের মতো চাপা পড়িয়া গেল। মামার দুই মেয়ে সুশীলা এবং কুসুমের বিবাহের বাজনা বাজিয়া উঠিল। মামা পাত্র দুইটি নাকি পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুইজনেই সদ্বংশজাত কুলীন পাত্র, দুইজনেরই গ্রামে বাড়ী আছে, পুকুর আছে, গাই আছে। সেকালে ইহার বেশী আর কিছু কাম্য ছিল না। পাত্রেরা গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছিল, তাহাদের চেহারাও নিন্দনীয় ছিল না। মামার সৌভাগ্যে সকলেই ধন ধন্য করিতে লাগিলেন। সুশীলার বয়স তখন দশ বৎসরের বেশী নয়, কুসুমের বোধ্য হয় আট। সাধারণতঃ ওই বয়সেই তখন ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েদের বিবাহ হইত। মেয়ের বয়স এগারো বৎসর হইয়া গেলেই সমাজপতিদের টনক নড়িত, মেয়ের মা-বাপেরা দুশ্চিন্তায় ঘুমাইতে পারিতেন না। মামা একসঙ্গে দুইটি মেয়েকে পার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মামার হিতৈষীদের আনন্দের সীমা রহিল না, মামার শত্রুদের মনে ঈর্ষা জাগিল। এখন ব্যাপারটা অশোভন মনে হইতেছে, কিন্তু তখন ইহা মোটেই অশোভন ছিল না, খুব স্বাভাবিক ছিল। গৌরীদান করিতে পারিলে তখন সজ্জনরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিতেন।

এই বিবাহে শংকরা হইতে মামার অনেক জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা আসিয়াছিলেন। মামীমার বাপের বাড়ী হইতেও আসিয়াছিলেন কয়েক জন। মামীমার নিজের পিসীকে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। অমন লম্বা স্ত্রীলোক আমি তো আর কখনও দেখি নাই। শুধু লম্বা নয়, বেশ শক্তসমর্থ। প্রত্যহ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। গঙ্গা আমাদের বাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল তখন। একবেলা আহার করিতেন, স্বপাক হবিষ্যান্ন। কিন্তু একবেলাতেই তিনি যে পরিমাণ খাইতে পারিতেন তাহা আমরা তিনবেলাতেও পারিব কিনা সন্দেহ। সে সময় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। নকুলই গল্পটি বলিয়াছিল। হ্যাঁ নকুলের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নকুলকে দেখিতে পাই নাই। তাঁহার দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া মামা তাহাকে নাকি দূর করিয়া দিয়াছিলেন। সে পড়াশোনা তো করিতই না, কেবল বদমাইশি করিয়া বেড়াইত। একদিন সে মামার এক রোগীর ঘোড়ায় চড়িয়া উধাও হইয়া গিয়াছিল। একবেলা বাড়ী ফেরে নাই। সেইদিনই মামা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের ভিড়ে সকলের সঙ্গে নকুল আবার মামার সংসারে আসিয়া জুটিয়া গেল এবং এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল

যেন কিছুই হয় নাই। আমাকে বলিল, "আমি ভাই চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম লেখাপড়া আর ভালো লাগে না। গিরীন-মাস্টারের বেত কাঁহাতক আর খাওয়া যায়।"

এই নকুলের মুখেই পিসীমার গল্পটি শুনিয়াছিলাম। নকুল আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—"পিসীমাকে ঘাঁটাতে যাসনি। ও'র গায়ে ভয়ানক জোর। যদি একটি চড় মারেন তাহলে আর উঠে পথ্যি করতে হবে না। উনি যখন বিধবা হন তখন সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। সবাই যখন জোর করে ওঁকে স্বামীর চিতায় চড়াতে যায় তখন এক ঝটকায় উনি হাত ছিনিয়ে নিয়ে চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ তুলে ছিরু ভট্‌চাজের মুখে মেরেছিলেন। সেই থেকে তার নামই হয়ে গেল মুখপোড়া ভট্‌চাজ। তারপর সেই জ্বলন্ত চ্যালা কাঠ ঘোরাতে ঘোরাতে উনি একটা জঙ্গলে পালিয়ে যান। সেখানে তিন চার দিন কাটিয়ে তারপর বাড়ী ফেরেন। আমি তো ও'র ত্রিসীমানায় কখনও যাই না।"

বিবাহ উপলক্ষে আরও দুইজন আসিয়াছিলেন, পটল-কর্তা ও পটল-গিন্নী। আমি খুব ছেলেবেলায় ই'হাদের শংকরাতে দেখিয়াছিলাম। তখন কেবল পটল-কর্তার পায়েই গোদ ছিল, এখন দেখিলাম পটল-গিন্নীর ডান পাটাও বেশ ফোলা। ই'হারা সম্পর্কে মামার কাকা-কাকী ছিলেন, সম্পর্কটা অবশ্য দূর, কিন্তু মামা ই'হাদের খুব খাতির করিতেন। মামা যদিও কখনও স্টেজে নামেন নাই কিন্তু এখন মনে হয় তিনি বেশ অভিনয়-পটু ছিলেন। তিনি এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন পটল-কর্তা পটল-গিন্নীই তাঁহার অভিভাবক এবং তাঁহাদের হুকুমমতোই তিনি চলিতেছেন। অনেক লোক বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বরযাত্রীদের খাওয়াইবার পর দেখা গেল দই, সন্দেশ এবং মাছ ফুরাইয়া গিয়াছে। মামা বলিলেন, তোমরা ইহা লইয়া আর গোল করিও না। কাকা নিজেই সব ফর্দ করিয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ লোক, জগদ্ধাত্রী-পূজার সময় প্রতি বছরই অনেক লোক খাওয়ান, তিনি নিজেই যখন সব ভার লইলেন তখন আমি আর কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। যাই হোক ব্যাপারটা এখন চাপিয়া যাও, কাকা-কাকীর কানে যেন না যায়। কাকা রগ-চটা লোক, শুনিলে কি যে করিবেন তাহা বলা যায় না। হয়তো পরের ট্রেনেই চলিয়া যাইবেন। কাকী হয়তো উপবাস শুরু করিয়া দিবেন। পটল-কর্তা পটল-গিন্নী নিমন্ত্রিত অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ ভোজের ব্যাপারে ফর্দ করিতে গেলেন কেন এবং মামাই বা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলেন কেন তাহা ঠিক স্পষ্ট হইল না। তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া কিন্তু একবারও মনে হয় নাই যে তাঁহারা ভোজের ব্যাপারে মাথা ঘামাইতেছেন। মামা কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কাকা-কাকী যেন ব্যাপারটা জানিতে না পারেন।

পটল-কর্তা যে খুব বদরাগী লোক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুই একটা গল্প আগে বলিয়াছি। যদিও তিনি বেঁটে এবং ঈষৎ মোটা ছিলেন, পায়ে গোদ থাকাতে দেহটাও ভারী হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাগিয়া গেলে তিনি দ্রুতবেগে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা কিছু করিয়া ফেলিতেন যাহা তাঁহার দেহের এবং বয়সের সহিত খাপ খাইত না। এসময় তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন একটা ক্রুদ্ধ বোলতা। রাগিয়া গেলে তাঁহার গলার ভিতর হইতে একটা গুন্‌ গুন্‌

গুনু শব্দও হইত। বিবাহবাড়ীতে আসিয়াও তিনি একদিন এইরূপ একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

রেলের এক বাবু মামার রোগী ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার লোক। বিবাহ উপলক্ষে তিনি দেশ হইতে প্রায় এক বোরা মুড়ি আনাইয়া মামাকে উপহার দিয়াছিলেন। ধপধপে সাদা বড় বড় মুড়ি। মুড়ি দেখিয়া দুইজন বৃদ্ধ যুগপৎ প্রলুব্ধ হইলেন, খেতু মামা এবং পটল-কর্তা। খেতু মামা বলিলেন তিনি ঘৃতসহযোগে চিনি মাখিয়া মুড়ি খাইবেন, পটল-কর্তা বলিলেন তাঁহার তেল-নুন-লংকা চাই। কিন্তু কি করিয়া জানি না এই সরল ব্যাপারটাও জটিল হইয়া গেল। ভুল-ক্রমে পটল-কর্তার কাছে ঘি-চিনি-মাখা মুড়ির বাটি পৌঁছিয়া যাইতেই তিনি রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, গলার ভিতর হইতে গুনু গুনু গুনু শব্দ বাহির হইল। মুড়ির বাটিটাতে তিনি তো একটা লাথি মারিলেনই কিন্তু তাহার পর যাহা করিলেন তাহা সত্যই বিপজ্জনক। বাড়ীর বুড়ী ঝি প্রভা ছাদের একধারে বসিয়া চুল শুকাইতেছিল। তাহার পিঠটা খোলা ছিল. পটল-কর্তা ছুটিয়া গিয়া তাহার পিঠে কামড়াইয়া দিলেন। প্রভা হাউমাউ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

পটল-কর্তা আমার জীবনেও কিছুকাল পরে একটা বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিব। বিবাহ উপলক্ষে সন্তোষের মা এবং হাবুমামাও আসিয়াছিলেন। সন্তোষের মা আমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন। তিনি দেখিলাম বেশ বুড়া হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল আমার মা বাঁচিয়া থাকিলেও নিশ্চয় এইরূপ বুড়া হইয়া যাইতেন। মায়ের যে অপরূপ তরুণী মূর্তি আমার মনে আঁকা আছে তাহা আর থাকিত না। মায়েরও হয়তো ওইরূপ চুল উঠিয়া যাইত, মুখে জরার চিহ্ন দেখা দিত, নানা ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তিনিও হয়তো সংসারের অবাঞ্ছনীয় আপদরূপে গণ্য হইতেন। সেই দিনই মনে হইল, প্রথম মনে হইল, মায়ের অকালমৃত্যু হইয়া ভালোই হইয়াছে। যে সংসারে সর্বদাই অভাব, অপমান এবং লাঞ্ছনা পুণ্যবতীরা সে সংসারে বেশী দিন থাকেন না। মা আমার পুণ্যবতী ছিলেন তাই তাহার অকালমৃত্যু হইয়াছে।

সন্তোষের মায়ের মাথায় টাক পড়িয়াছিল, চুল পাকিয়াছিল, গালের চামড়াতে চোখের কোলে বলি-রেখা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দাঁত পড়ে নাই। আগে যেমন তিনি সমানে পান চিবাইতেন এখনও দেখিলাম তেমনি চিবাইতেছেন। আরও দেখিলাম তাঁহার দেহটা বুড়া হইয়াছে বটে কিন্তু মনটা আগেকার মতোই সতেজ এবং সবুজ আছে। আগেকার মতোই তিনি রসিকতা করিয়া, হাসিয়া, হাসাইয়া চতুর্দিকে আনন্দ বিকিরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিলাম বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একত্র করিয়া এখনও তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথার আসর বসাইতেছেন। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হইতেই তিনি বলিলেন, "তোর সইমাকে চিনতে পারছিস? চিনতে না পারবারই কথা, চেহারার আর সে জলুস নেই।" প্রণাম করিতেই বলিলেন, "বড্ড লম্বা হ'য়ে গেছিস। ব'স দেখি, একটা চুমু খাই, সেই সেকালে যেমন খেতাম।" বসিতেই তিনি আমার দুই গালে সত্যই চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "সেই ছেলেবেলায় তোকে যেমন কোলে করে নিয়ে ঘুম পাড়াতুম এখনও ইচ্ছে করছে সেই রকম করি।

কিন্তু এখন তা তো আর হয় না। অনেক বড় হ'য়ে গেছিস যে। গল্প শুনতে ভালোবাসিস এখনও ? সন্ধের সময় আসিস গল্প বলব।"

"সন্ধের সময় আমি থিয়েটারের রিহার্সাল দিতে যাই।"

সন্তোষের মা গালে হাত দিয়া হাস্যদীপ্ত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "ওমা, থিয়েটার করিস না কি ! কি পালা হচ্ছে ?"

"সীতার বনবাস—"

"আমাকে তোদের রিহার্সালে নিয়ে যাবি ? দেখতাম তুই কেমন কচ্ছিস। ভুলটুল হলে শুধরে দিতে পারতাম। কি সাজবি তুই ?"

"রাম।"

"ওরে বাবা তাহলে পারব না। একদিন রিহার্সালে না গেলে কি হয় ? জানিস তোকে দেখতেই আমি এসেছি, নেমন্তন্ন খেতে নয়। কালই তো চলে যাব।"

"কালই ? কেন এত তাড়াতাড়ি কেন।"

"কুটুম বাড়ীতে আর কতদিন থাকব বাবা। তাছাড়া সোডাওয়াটারের বোতল কাল যাচ্ছে, ওর সঙ্গেই চলে যাই। পরে আবার সঙ্গী পাব কোথা।"

"সোডাওয়াটারের বোতল আবার কে—"

মুচকি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে সন্তোষের মা বলিলেন, "ওই তোমরা যাকে পটল-কর্তা বল !"

পটল-কর্তার এমন লাগসই নাম সন্তোষের মা ছাড়া আর কেহ দিতে পারিত না। জিজ্ঞেস করিলাম—"সন্তোষের কি খবর ? সে কি করছে—"

"সে-ও রিহার্সাল দিচ্ছে।"

"কিসের রিহার্সাল ?"

"ডাক্তারির।"

"কার কাছ থেকে ডাক্তারি শিখলে ও ? স্কুলে তো পড়েনি।"

"বাড়ীতে বাংলা বই পড়ে নিজে-নিজেই দিগগজ হয়েছে।"

"রুগী হয় বেশ ?"

"হয় বৈকি। সব বিনা-পয়সার রুগী। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কি করে তাড়াতে হয় তা যদি দেখতে চাও, তোমার বন্ধুটিকে একবার গিয়ে দেখে এসো।"

তাহার পর কণ্ঠস্বরে মিনতি ফুটাইয়া আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "শংকরায় তো অনেকদিন যাসনি। আয় না একবার—"

"আমি এখন কোথায় কি করব, কোথায় বসব তা ঠিক হয়নি। ঠিক হলেই যাব শংকরায় একবার।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। বারাহীর একখানা শাড়ি আমার কাছে আছে। তোকে দিয়ে দেব। তোর বউ এলে তাকে দিস। সম্বন্ধ কোথাও ঠিক হয়েছে ?"

"আমি এখন বিয়ে করব না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই. তারপর ওসব ভাবা যাবে।"

"কিন্তু শুনছি তোর মামা নাকি দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন। বলেছেন মোটা পণ নিয়ে তোর বিয়ে দেবেন। কয়েক জায়গায় নাকি দর কষাকষি চলছে।"

"কই, আমি শুনিনি তো।"

"ঠিক হয়ে গেলেই শুনবি। তোর মতো সোনার চাঁদ ছেলের তো মোটা পণ পাওয়াই উচিত। সন্তোষের জন্যেই সাধাসাধি করছে কেঁকালার মুখুজ্জেরা পাঁচশো টাকা নিয়ে।"

"সন্তোষের এখন বিয়ে দেবে না কি। ওর রোজগার কি রকম।"

"রোজগার কিছুই নয়। জমিজমা থেকেই সংসার চলে। তবু বিয়ে দিতে হবে, ওর বিয়েতে যা পাব ভেবেছি তাই নিয়ে রাজুর বিয়ের যোগাড় করব। ওরও তো দশ বছর পেরিয়ে যাবে এই পোষে।"

সেদিন সন্ধ্যার সময় রিহার্সালে যাই নাই। সন্তোষের মায়ের গল্পের আসরে গিয়া বসিয়াছিলাম। আসরটা বসিয়াছিল একতলায় গুদোম ঘরে। ঘরটা লম্বাগোছের ছিল এবং তাহার একদিকটা বাড়ীর ভাঙাচোরা জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই ঘরের মেঝেতে গোটা দুই কম্বল পাতিয়া বসিয়াছিলাম আমরা। ঘরের এককোণে মিটমিট করিয়া রেড়ির তেলের বাতি জ্বলিতেছিল। স্বল্পালোকে পরিবেশটা বেশ স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সন্তোষের মা সেদিন যে গল্পটা বলিয়াছিলেন তাহা অন্য কোন পরিবেশে বেসুরো মনে হইত। গল্পের সবটা আমি শুনিতে পাই নাই। গোড়ার দিকটা যতটুকু শুনিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি।

"পিতামহ ব্রহ্মার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একবার মর্ত্যে পালিয়ে এসেছিলেন। এসে আমাদের বেগমপুরের মাঠের মাঝখানে যে বড় বটগাছটা আছে তার উপর লুকিয়ে বসেছিলেন। কতদিন যে ছিলেন তা বেগমপুরের লোকেরা জানতেই পারেনি প্রথমে। জানবে কি করে। রাত্তিরে তো কেউ ওই মাঠে বেরুত না। বেরুলে বুঝতে পারত ইন্দ্রের ছোঁয়া লেগে রাত্তির বেলা ওই গাছের কি অপরূপ চেহারা হয়েছে। দিনে কিন্তু যেমনকার গাছ তেমনি থাকত। দিনের বেলা ইন্দ্র ওই গাছে থাকতেন না, ভোর হতে না হ'তেই পাখী হয়ে উড়ে যেতেন গাছ থেকে। কোন দিন টিয়া হতেন, কোনদিন ময়না, কোনদিন চড়ুই, কোনদিন কাঠঠোকরা। যেদিন যেমন খুশি। রাত্রে কিন্তু তিনি ইন্দ্র হয়ে গাছটিতে বসে থাকতেন। আর গাছের প্রত্যেকটি পাতা ঝলমল করত। মনে হতো প্রত্যেকটি পাতা যেন সাঁচ্চা জরি দিয়ে তৈরী আর প্রত্যেকটি পাতায় যেন জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। আকাশে যেদিন চাঁদ থাকত সেদিন তো করতই, যেদিন না থাকত সেদিনও করত। গাছ হয়ে উঠত যেন বিরাট এক সিংহাসন আর সেই সিংহাসনে বসে থাকতেন দেবরাজ ইন্দ্র। রাত্তির বেলা আর এক কাণ্ড হতো। দিনের বেলা তিনি পাখী হয়ে ফলটা পাকড়টা খেয়ে থাকতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কি তাতে তৃপ্তি হয়? স্বর্গে খবর পাঠিয়ে ছিলেন লুকিয়ে, শচী দেবী রোজ রাত্রে দু'জন অপ্সরা পাঠিয়ে দিতেন, তাদের হাতে থাকত সুধাভাণ্ড। ইন্দ্রকে সুধা পান করিয়ে আবার স্বর্গে ফিরে যেত তারা। অপ্সরীরা যখন আসত তখন সেই বটগাছের শোভা আরও বেড়ে যেত। মনে হতো দুটো অদ্ভুত ইন্দ্রধনু যেন জড়িয়ে ধরেছে গাছটাকে। সে এক আশ্চর্য শোভা। কিন্তু বেগমপুরের লোকেরা তা দেখতে পেত না, তারা ঘুমুত তখন। কিন্তু একদিন তারা দেখতে পেয়ে গেল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলে আর বৌয়ের কল্যাণে।

অনেক দূরের এক গাঁয়ে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর ছেলের বিয়ে হয়েছিল। বরযাত্রীরা আগেই চলে এসেছিল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর বেয়াই বললেন এক গরুর গাড়িতে যেতে

হবে তো বর-ক'নেকে, কাল-রাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে যাও। তাই হলো। কাল-রাত্রি কাটিয়ে তার পরদিন ছেলে-বউ নিয়ে বেরুল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। একটার বেশী গরুর গাড়ি পাওয়া গেল না গ্রামে। পালকি তো পাওয়াই গেল না। অজ-পাড়াগাঁ একেবারে। যে গরুর গাড়িটা জুটল সেটাও অমজবুত গোছের। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী বলল, কুছ পরোয়া নেই, আমি হেঁটেই যাব। ছেলে-বউকে এখনি রওনা করে দাও। আজ ফুলশয্যা, সকাল-সকাল রওনা করে না দিলে সময়ে পৌঁছতে পারবে না। তাই হলো। গরুর গাড়ি ছই বেঁধে মেঠো-পথে রওনা হলো দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে দেখা যেতে লাগল নতুন বউয়ের চেলির আঁচল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী পাগড়ি বেঁধে ছাতা ঘাড়ে করে হাঁটতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। গাড়ির গরু দুটো যদি ভালো হতো তাহলে তারা ঠিক সময়ে পৌঁছে যেত। কিন্তু গরু দুটো ভালো ছিল না, বুড়ো গরু, টিকিস্ টিকিস্ করে চলতে লাগল। গাড়োয়ান গরু দুটোকে দমাদ্দম মারছিল। বউটি গাড়োয়ানকে বললে, তুমি অমন করে মেরো না বাপু গরু দুটোকে। বউটির নরম মনের সুযোগ নিয়ে গরু দুটো আরও আস্তে আস্তে চলতে লাগল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী অবশ্য চেঁচামেচি করতে লাগল খুব, কিন্তু গাড়োয়ান বউমার কথা অগ্রাহ্য করে গরু দুটোকে আর মারতে রাজী হলো না। খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল তারা।

আস্তে আস্তে চলেও রাত্রি এগারোটা নাগাদ তারা বেগমপুরে পৌঁছে যেত, কিন্তু বেগমপুরের মাঠে সেই বটগাছটার তলায় এসে গরুর গাড়ির একটা চাকাই গেল ভেঙে। একেবারে অচল অবস্থা হ'য়ে পড়ল তখন। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী গাড়োয়ানকে বকতে যাচ্ছিল কিন্তু গাছটার দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে গেল সে। সমস্ত গাছ যেন জড়োয়ার গয়না পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ নয় যেন জুয়েলারির দোকানের বিরাট শো-কেস—এমন বিরাট শো-কেস কোন জুয়েলারির দোকানেও দেখা যায় না। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাঁ করে চেয়ে রইল গাছটার দিকে। বউটা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আজ ফুলশয্যার রাত্রি, এ কি হলো আজ। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী নিমেষমধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক তো, তার বুঝতে দেরি হলো না যে এই অন্ধকার রাত্রে তেপান্তর মাঠের মাঝখানে সারা গাছ জুড়ে যে কাণ্ডটা হচ্ছে তা অলৌকিক কাণ্ড। হয় দেবতা, না হয় উপদেবতা ভর করেছেন ওই গাছে। গরুর গাড়ির চাকা ভেঙে ফেলাটাও হয়তো তাঁরই কীর্তি। দেবতা-উপদেবতার সঙ্গে জোরজবরদস্তি চলে না, চোখ রাঙিয়ে কাজ আদায় করা যায় না তাদের কাছ থেকে। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাতজোড় ক'রে গাছের দিকে চেয়ে ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—দোহাই বাবা, রক্ষা করো। আমি গরীব ব্রাহ্মণ রক্ষা করো আমাকে। গাছের ভিতর থেকে গম্ভীরকণ্ঠে আওয়াজ এল, 'কে তুমি ?' মহেন্দ্র গাঙ্গুলী করুণকণ্ঠে বলল—'আমি বেগমপুরের মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছি, আজ ফুলশয্যা। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে গরুর গাড়ির চাকাটা ভেঙে গেছে। কি করে যে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না।' গাছের ভিতর থেকে আবার গম্ভীর গলায় আওয়াজ এল—'সব ঠিক হয়ে যাবে। চুপ করে চোখ বুজে বসে থাক সবাই।' তাই হলো।

মহেন্দ্র গাঙ্গুলী, তার ছেলে, তার বউ, গাড়ির গাড়োয়ান—সবাই চোখ বুজে বসে রইল। চোখ বুজে না থাকলে তারা দেখতে পেত দুটি ধপধপে শাদা পরী ডানা

মেলে উড়ে গেল গাছ থেকে আর দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আকাশে। আকাশের নক্ষত্ররা সরে সরে তাদের পথ করে দিতে লাগল। চোখ বুজে বসে রইল ওরা। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর অস্বস্তি হচ্ছিল একটু। এক একবার লোভ হচ্ছিল চোখটা একটু ফাঁক করে দেখি গরুর গাড়ির চাকাটা আপনা-আপনি গোটা হয়ে যাচ্ছে কি না। কিন্তু ভয়ে সে চোখ খুলতে পারল না। কি জানি কিছু যদি হ'য়ে যায়। খামখেয়ালী দেবতা ভালোও যেমন করতে পারেন সর্বনাশও তেমনি করতে পারেন। ভুরু কুঁচকে চোখ বুজে বসে রইল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর মনে হলো কুলকুল করে একটা শব্দ হচ্ছে যেন। শব্দটা ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর সন্দেহ রইল না যে একটা নদী এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। জোলো ঠাণ্ডা হাওয়াও এসে গায়ে লাগতে লাগল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলে মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। হঠাৎ সানাই বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর থেকে ইন্দ্র হুকুম দিলেন—'চোখ খোল।' অবাক হয়ে গেল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী চোখ খুলে। চারদিক আলোয় আলো, সামনে সত্যিই একটা নদী আর নদীর উপর ভাসছে একটা ময়ূরপংখী। নদীর জল যেন গলানো সোনা, ময়ূরপংখীর সারা গায়ে জ্বলছে মণি-মাণিক্য আর তাকে ঘিরে দুলছে নানা রঙের ফুলের মালা। ময়ূরপংখীর ছাদের উপর বসে যারা সানাই বাজাচ্ছে তাদের মতো অদ্ভুত সুন্দর লোক মহেন্দ্র গাঙ্গুলী আর কখনও দেখেনি। তারা যে কিন্নর, দেখবে কি করে। গাছ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ইন্দ্র আবার আদেশ দিলেন—'স্বর্গ থেকে স্বয়ং মন্দাকিনী ময়ূরপংখী নিয়ে এসেছেন তোমার ছেলে-বউকে বেগমপুরে পেঁছে দেবেন বলে। তোমরা ওই ময়ূরপংখীতে চড়ে চলে যাও।"

ঠিক এই সময়ে মন্মথ আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। আমার জন্য নাকি রিহার্সাল আটকাইয়া গিয়াছে। জগন্নাথবাবু খুব রাগারাগি করিতেছেন। গল্পের আসর ছাড়িয়া আমাকে উঠিতে হইল। জানি না, সন্তোষের মা ওই কিন্নরদলকে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাড়ীতে লইয়া গিয়া লুচি-মণ্ডা খাওয়াইয়াছিলেন কি না। সন্তোষের মা তাহার পরদিন ভোরেই পটল-কর্তার সহিত চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে তাঁহাকে কথা দিতে হইল আমি আমার বসিবার একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া শংকরায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিব। সন্তোষের মায়ের সহিত হাবুমামারও যাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্টেশনে যাইবার সময় আবিষ্কৃত হইল হাবুমামা নাই। সে নাকি রেলের ডি. টি. এস. এবং কয়েকটি ছোকরার সহিত গঙ্গা পার হইয়া পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছে। আমরা আশংকা করিয়াছিলাম মামা ইহা লইয়া রাগারাগি করিবেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না, বরং বলিলেন, "ওর পেটে তো বিদ্যে এক ছটাকও নেই, শিকারটিকার করে যদি ডি. টি. এস-এর নজরে পড়ে যায় তাহলে চাকরি হয়ে যাবে একটা।" আমি কিন্তু বলিতে পারি হাবুমামা চাকরি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই সেদিন শিকারপার্টিতে যোগদান করে নাই। হাবুমামার অত বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না। যে কোনও হুজুকে মাতিবার জন্য হাবুমামা সর্বদা পা বাড়াইয়া থাকিত। সে হুজুকে অজানার আহ্বান, অনিশ্চয়তাজনিত কষ্ট এবং পরোপকার করিবার সুযোগ থাকিলে হাবুমামার আগ্রহের আর সীমা থাকিত না। এই শিকারের গল্প পরে আমি শুনিয়াছিলাম। শিকারপার্টিতে ডি টি. এস এবং তাঁহার মেমসাহেবও

গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিল রেলের কয়েকটি ছোকরা এবং হাবুমামা। ডি. টি. এস-এর জন্য আলাদা তাঁবু পড়িয়াছিল।

বলা বাহুল্য সে তাঁবুতে কোন 'নেটিভ' ছোকরার স্থান হয় নাই। তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল এক গোয়ালাবাড়ীর চালাঘরে। শীতকালে গঙ্গার চরে চারিদিক-খোলা চালাঘরে থাকা বেশ কষ্টকর। শুকনো গোবর এবং শুকনো কাঠের টুকরা একজায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া গোয়ালারা তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ইহাকে তাহারা 'ঘুর' বলে। এই ঘুরের চারিদিকে কম্বল পাতিয়া হাবুমামারা সেদিন রাত কাটাইয়াছিলেন। আমি জানি এই কষ্ট করিয়া থাকাটাই হাবুমামার প্রধান আনন্দের কারণ হইয়াছিল। শুধু ইহাই নয়, ইঁট পাতিয়া উনুন করিয়া, গোয়ালাদের নিকট হইতে 'বাটলোই' এবং চাল-ডাল-আলু লইয়া রান্নাও করিতে হইয়াছিল হাবুমামাকে! পশ্চিমা গোয়ালারা যদিও দাঙ্গাবাজ, কিন্তু তাহারা খুব অতিথিসেবক। তাহারা তাহাদের যথাসাধ্য করিতেছিল। কিছু দুধ এবং কিছু খাঁটি 'ঘি'ও দিয়াছিল তাহারা। হাবুমামা তাহা লইয়া নাকি 'সুফেদ পোলাও' (শাদা পোলাও) প্রস্তুত করিয়াছিল। হাঁড়িতে চাল-ডাল-আলু-দুধ-ঘি সব একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়াছিল। অতিশয় উপাদেয় হইয়াছিল নাকি। খাইবার সময় কিন্তু মুশকিল হইয়াছিল একটু।

হাবুমামার সহিত জন ছয়েক রেলের ছোকরা ছিল। গোয়ালারা অতগুলি লোকের জন্য থালা যোগাড় করিতে পারিল না। বাড়ীতে কলাগাছ ছিল, কিন্তু রাত্রে কলাগাছের পাতা কাটিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন হাবুমামা প্রশ্ন করিল—"কাছেপিঠে কোনও দোকানে শালপাতা পাওয়া যাবে না?" একজন গোয়ালা বলিল, একটি দোকান আছে, কিন্তু সেটি প্রায় এক মাইল দূরে। গোয়ালাদের বাড়ীর কেহ গেলে তাহারা হয়তো পাতা দিবে না। কারণ সম্প্রতি গোয়ালাদের সহিত উক্ত দোকানদারের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। তবে কোনও বাবু যদি যান 'বুলাকি' (গোয়ালার বড় ছেলে) তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দূর হইতে দোকানটা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে পারে।

হাবুমামাকেই যাইতে হইয়াছিল, অন্য কোন বাবু যাইতে সম্মত হন নাই। আমি জানি হাবুমামা সোৎসাহে এবং সানন্দে গিয়াছিল। সারাজীবনই সে এই ধরনের কাজে আনন্দ পাইয়াছে। শিকারের অংশস্বরূপ হাবুমামা সেদিন ছোট একটি হাঁস পাইয়াছিল। তাহা লইয়াও মুশকিল কম হয় নাই। আমাদের বাড়ীতে বুথা মাংস রান্না হইবে না মামীমা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন। হাবুমামা তখন কেলনারের রহিম বাবুর্চীর সহিত একটা প্যাক্ট করিতে উদ্যত হইল। চার আনা পয়সা লইয়া সে হাঁসটি রাঁধিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়া শেষে বলিল তাহাকে মাংসেরও একটু ভাগ দিতে হইবে। ইহা লইয়া দরদস্তুর চলিতেছে এমন সময় মন্মথ আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, কুছ পরোয়া নেই, আমাদের বাগানে চল, সেখানেই আমরা রান্না করব। মা সব ব্যবস্থা করে দেবে। মন্মথর মা এসব কাজে বেশ উৎসাহী ছিলেন। তিনিই বলিলেন—ওইটুকু মাংসে তোদের এতগুলো লোকের কুলুবে কি করে! দাঁড়া, আমি কিছু আলু ভেজে দিচ্ছি।

হাবুমামাই সেদিন রান্না করিয়াছিল। প্রচণ্ড ঝাল দিয়াছিল এইটুকু শুধু মনে আছে। আর মনে আছে সেদিন তরকারিতে আলুর ভিড়ে মাংস হারাইয়া গিয়াছিল।

মন্মথর ভাষায়—বিরাট আলুর ক্ষেতের উপর দিয়ে ছোট্ট হাঁসটা কখন কোন্ দিক দিয়ে যে উড়ে গেল, টেরই পেলাম না। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও মনে পড়িল। আমাদের মাংস-লোলুপতা দেখিয়া মন্মথর মা আমাদের মঙ্গলার্থে কালীবাড়ীতে একটি কুচকুচে কালো পাঁঠা পরের অমাবস্যাতে বলি দেওয়াইয়াছিলেন। এবং নিজের হাতে সে মাংস রান্না করিয়া ভুরিভোজন করাইয়াছিলেন আমাদের। সেকালে পূজার মাংসে পেঁয়াজ দেওয়া চলিত না। মাংসে হিং দিয়া মন্মথর মা যে চমৎকার রান্না করিয়াছিলেন তাহার তুলনা হয় না। বহুকাল পরে এইসব স্মৃতির কণিকা আহরণ করিতে বসিয়া সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া যাইতেছে।

হাবুমামার কথাই বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে আজ। হাবুমামা বিদ্বান ছিল না, বড় চাকরি কখনও করে নাই, যে সব ছোটোখাটো চাকরি মাঝে মাঝে পাইত তাহাতেও টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না, তাহার এমন একটা স্বাধীন বেপরোয়া খামখেয়ালী স্বভাব ছিল যে কোনও চাকরির খাঁচায় সে বেশী দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই। মামা তাহাকে নিজের নুনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এজন্য তাহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইত। এই সময় নানারকম লোকের সহিত আলাপ হইয়াছিল তাহার। অনেকের সহিত খুব বন্ধুত্বও হইয়াছিল। যাহার সহিত আলাপ হইত তাহার সহিতই বন্ধুত্ব হইয়া যাইত তাহার। তাহার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা উদার মন-খোলা আহ্বান ছিল যে তাহাতে সকলেই সাড় দিত। তাহার বন্ধুদের সংখ্যা এবং পরিচয় সব আমি জানি না। একবার তাহার সহিত হাওড়া হইতে মোকামা পর্যন্ত আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম প্রায় সব স্টেশনেই তাহার একটা-না-একটা চেনা লোক বাহির হইয়া যাইতেছে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ,—হিন্দু, মুসলমান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বাঙালী, বিহারী—সব রকম লোকই হাবুমামার বন্ধু। হাবু-মামাকে দেখিয়া সকলের মুখই আনন্দে উদ্ভাসিত। এই ধরনের বন্ধুত্বের জন্যই হাবুমামা শেষ পর্যন্ত মামার কাজে টিঁকিয়া থাকিতে পারে নাই। ব্যাপারটা ভাবিলে এখন অবাক লাগে। হাবুমামা তখন তিন পাহাড়ে ছিল। মামা তাহাকে লিখিলেন—তুমি চলিয়া এস। এখানে অনেক কাজ আছে। উত্তরে হাবুমামা জানাইল, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। আমার বন্ধু রঞ্জনবাবুর মেয়ের বিয়ে। রঞ্জনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাসায় কাজ করিবার লোক কেহ নাই। তাই তাঁহার দায়টি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমি যাইতে পারিব না। বলা বাহুল্য মামা খুব চটিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লিখিয়া দিলেন—তোমাকে আর আসিতে হইবে না। তোমার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন হতভাগাকে দিয়া আমার কাজ চলিবে না। হাবুমামার নিকট অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোনও মূল্য ছিল না, সুনিশ্চিত বর্তমানকে লইয়াই সে ব্যাপৃত থাকিতে ভালোবাসিত। হাবুমামার যখন কোথাও কিছু জুটিত না তখন সে আমার নিকট চলিয়া আসিত। আমি তাহাকে কম্পাউণ্ডারি কিছু কিছু শিখাইয়াছিলাম, ডাক্তারিও একটু আধটু শিখিয়াছিল, মন দিয়া টিঁকিয়া থাকিলে কোনও গ্রামে বসিয়া অনায়াসেই সে বেশ কিছু উপার্জন করিতে পারিত। কিন্তু জীবনে কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে সে পারিল না। তাহার মতো লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। কিন্তু সেকালে অবিবাহিত থাকিবার উপায় ছিল না। সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহ দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতা সামাজিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিতেন। সময়ে ছেলেমেয়ের বিবাহ

না দিলে সমাজে মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইত। আর একটা কারণেও হাবুমামাকে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিতে হইয়াছিল। হাবুমামার এক দিদি ছিল। সে দিদির বয়স বারো পার হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহার বিবাহ দিতে পারা গেল না, হাবুমামার মা পদ্মদিদি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। সে অন্ধকারে আলো আনিলেন হাবুমামার যিনি শ্বশুর হইয়াছিলেন তিনি। তাঁহার একটি কুৎসিত কন্যা এবং একটি মূর্খ পুত্র ছিল। তিনি পদ্মদিদিকে বলিলেন, তুমি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দাও তাহলে তোমার মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করে নিতে পারি। তাহাই হইল। হাবুমামার প্রথম জীবনে কোনও ছেলেমেয়ে হয় নাই, তাই সে বেপরোয়া হইয়া যখন যেখানে খুশি থাকিতে পারিত। তাহার বউ থাকিত তাহার মায়ের কাছে। কিন্তু মা যখন মরিয়া গেল তখন দেশে গিয়া বছর পাঁচেক থাকিতে হইল হাবুমামাকে। এই সময়ই হাবুমামার একটি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হাবুমামা এতদিন মুক্ত বিহঙ্গম ছিল, এইবার সে লোহার শিকলে বাঁধা পড়িল। ইহার পর কলিকাতার সদাগরী আপিসে যে চাকরিটি সে পাইয়াছিল সেটি আর ছাড়ে নাই। বালিতে একটি ঘর ভাড়া লইয়া সেইখানেই পরিবারকে আনিয়াছিল। সেখান হইতেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিত সে। চাকরিটি সে পাইয়াছিল তাহার এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুর সুপারিশে। এক বড় সাহেব কোম্পানীর গুদামঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত সে। তাহার নাম ছিল গোডাউন মাস্টার। সে আপিসে আমি একবার গিয়াছিলাম। বিরাট এক চারতলা বাড়ীর চতুর্থ-তলায় সে আপিস। চারিদিকে বড় বড় বারান্দা। সে বারান্দায় দাঁড়াইলে কলিকাতা শহরের অনেকটা অংশ ছবির মতো দেখা যাইত। মনে পড়িতেছে সেখানে দাঁড়াইয়া আমি মনুমেণ্ট এবং গড়ের মাঠ দেখিয়াছিলাম। ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি খেলা-ঘরের ট্রাম ঘোড়ার গাড়ির মতো দেখাইতেছিল। সেই চারতলার উপর হাবুমামা একা থাকিত। তাহার একমাত্র সঙ্গী ছিল একটা ছোঁড়া উড়ে চাকর বাঞ্ছারাম। সে-ও কোম্পানীর চাকর ছিল। ক্লাইভ স্ট্রীটের হেড আপিস হইতে বড়সাহেব যখন মাল ছাড়িবার অর্ডার দিতেন তখন বাঞ্ছারাম গুদামঘরের চাবি খুলিয়া দিত, হাবুমামার কাজ ছিল গণিয়া গণিয়া মালগুলি বাহির করিয়া দেওয়া এবং যাহারা মাল লইতে আসিত তাহাদের নিকট হইতে রসিদ লওয়া। ঘড়ি ধরিয়া ঠিক তিনটার সময় হাবুমামা চা খাইত। চা তৈরি করিবার সমস্ত সরঞ্জাম ওই চারতলার আপিসঘরেই রাখিয়াছিল সে। বাঞ্ছারাম জল দুধ গরম করিয়া চায়ের জিনিসপত্র ধুইয়া ঠিক করিয়া দিত সব, হাবুমামা ঘড়ি ধরিয়া পাঁচ মিনিট চা ভিজাইয়া তাহার পর স্বহস্তে চা ছাঁকিত। চা করা তাহার বিলাস ছিল একটা। ওই একটিমাত্র 'হবি'ই সে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। ভালো দার্জিলিং চা ছাড়া কিনিত না। আর কিনিত ভালো কনডেন্সড মিল্ক। তাহার আপিসে গিয়া আমি চা খাইয়াছিলাম। ছোট ছোট কাচের গ্লাসে সকলকে চা দিত হাবুমামা। নিজেও কাচের গ্লাসেই খাইত। একটি সুদৃশ্য দামী-চীনেমাটির পেয়ালা ছিল। সেটি বড়সাহেবের জন্য রিজার্ভড থাকিত। বড়সাহেব মিঃ মরিসন মাঝে মাঝে আসিয়া হাবুমামার সহিত চা খাইতেন। শুনিয়াছিলাম হাবুমামাকে বড়সাহেব খুবই স্নেহ করেন। ঠিক পাঁচটার সময় হাবুমামার আপিস হইতে ছুটি হইত। তখন আর এক ধরনের কাজ শুরু হইত তাহার। বাজার করা। নিজের জন্য নহে, পরের জন্য। কলিকাতায় কোথায় কোন্ জিনিস সস্তা পাওয়া যায় তাহা তাহার জানা ছিল।

চাঁদনির কোন বিশেষ দোকানটিতে, পোস্তার কোন্ বিশেষ গলিতে, চাঁদনিবাজারের কোন্ বিশেষ লোকের কাছে গেলে ভালো জিনিস সস্তায় পাওয়া যাইবে তাহার খবর রাখিত হাবুমামা এবং তাহার এই বিস্ময়কর জ্ঞানের খবর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন-দেরও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত কাহারও কোন জিনিস কলিকাতা হইতে আনিবার দরকার হইলে হাবুমামার কানে কথাটা তুলিয়া দিলেই চলিবে। সস্তায় ভালো জিনিস আসিয়া যাইবে। হাবুমামাকে ফরমাশ করিবার আর একটা সুবিধা ছিল। অনেক সময় জিনিসের দাম সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইত না। হাবুমামা নিজের পয়সা খরচ করিয়া বা দোকান হইতে ধারে কিনিয়া আনিত জিনিসপত্র। পছন্দ না হইলে জিনিস ফেরত দিয়াও আসিত। অনেক দোকানদারের সহিত হৃদ্যতা ছিল হাবুমামার। বড়বাজারের, কলেজ স্ট্রীটের, এমন কি হগ্ সাহেবের বাজারেরও অনেক দোকানদার হাবুমামাকে খাতির করিত। তাহারা ভাবিতেও পারিত না যে হাবুমামার মতো লোক তাহাদের ঠকাইবে। হাবুমামা তাহাদের কাহাকেও কখনও ঠকায় নাই, নিজেই ঠকিয়াছে। যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা জিনিসপত্র আনিবার জন্য তাহাকে অকাতরে ফরমাশ করিত তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে দাম দিবার বেলায় কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে ইহা আমি নিজে জানি। তাহাদের মধ্যে অনেককে গোপনে এ আলোচনা করিতেও শুনিয়াছি যে হাবুমামা সস্তায় খেলো জিনিস কিনিয়া আনিয়া বেশী দাম আদায় করে। কলিকাতা হইতে পরের জন্য জিনিসপত্র বহিয়া আনা তাহার একটা ব্যবসায়, দোকানদারগণের নিকট হইতে সে নাকি কমিশন পায়। হাবুমামার কানেও এসব কথা নিশ্চয় ঢুকিত, তবু তাহাকে কখনও নিরস্ত হইতে দেখি নাই। তাহাকে এই কিছুদিন আগেও একবার হাওড়া প্ল্যাটফর্মে দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। লম্বা কোট পরা, কোটের মাঝে মাঝে উঁচু হইয়া আছে। হাবুমামা অনেক-পকেট-ওয়ালা কোট ফরমাশ দিয়া প্রস্তুত করাইত—সেই সব পকেটে ফরমায়েশী জিনিস আনিবার সুবিধা হইত। তাহার দুই হাতে দুইটি লম্বা থলিও থাকিত। বলা বাহুল্য থলি দুইটি নানারকম জিনিসপত্রে ভরতি। আমি যেদিন তাহাকে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে দেখিয়াছিলাম, সেদিন তাহার চেহারা আরও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। তাহার এক কাঁধে একটা কোরা শাড়ি আর এক কাঁধে একটা পাট করা কোরা চাদর ঝুলিতেছিল। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। হাবুমামাকে ফেরিওলা বলিয়া মনে হইতেছিল। আমার সহিত দেখা হওয়াতে হাবুমামা যেন অকূলে কূল পাইল। বলিল, এ দুটো আমার কাঁধ থেকে নাবিয়ে নাও তো। বার বার পড়ে পড়ে যাচ্ছে। তুমিও এই ট্রেনে যাচ্ছ নাকি। ভালোই হলো। জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব কি এত নিয়ে যাচ্ছ? হাবুমামা হাসিয়া বলিল, আর বোলো না। পাড়ার লোকের কত ফরমাশ! হাবুমামাকে একটু জ্ঞানদান করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম, কেন এসব ভূতের ব্যাগার খেটে মর। লোকে কি বলে জান? লোকে কি বলে তাহা বিবৃত করিয়া বলিলাম। সব শুনিয়া হাবুমামা দুইবার ঘনঘন নিশ্বাস টানিয়া সহাস্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, সব জানি। আর একটা কথাও জানি, বলিয়া হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি সেটা? হাবুমামা অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, ওরা ভারী গরীব। এই সামান্য কথা কয়টি সহসা সেদিন হাবুমামার চরিত্র-মাহাত্ম্য আমার নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। হাবুমামার নিজের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল

ছিল না, প্রচলিত অর্থে সেও গরীব ছিল, কিন্তু তাহার মুখে সেদিন ওই কথা কয়টি শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম হাবুমামা সত্যই বড়লোক। তাহার মতো ভদ্রলোকও আমি খুব বেশী দেখি নাই। সে সকলের সহিত ভদ্র আচরণ করিত। ভালো লোকের আর একটা লক্ষণ থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। হাবুমামা মাঝে মাঝে যখন আমার কাছে আসিয়া থাকিত তখন আমার ছেলেমেয়েদের সহিতেই তাহার ভাব হইত বেশী। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখা খুব একটা ফ্যাসন হইয়াছিল। একবার হাবুমামা যখন কলিকাতা হইতে আসিল তখন দেখি তাহার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি! গ্রামের লোকেরা তাহার দিকে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। আমার বড় ছেলে বীরুর বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর। তখন সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড আমাদের সম্রাট্। খামে পোস্টকার্ডে ডাকটিকিটে তাঁহার ছবি। বীরু একদিন একটা পোস্টকার্ডে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের ছবি দেখিয়া হাবুমামাকে বলিয়াছিল—তোমার দাড়ি ঠিক এইরকম। নয়? হাবুমামা সঙ্গে সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে উত্তর দিল—চুপ, চুপ। ঠিক ধরেছিস তুই। কাউকে বলিস না, আমি ছদ্মবেশী সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড। তোকেই আমি আমার প্রাইম মিনিস্টার করব ঠিক করেছি! বীরুর বয়স তখন খুব কম। 'প্রাইম মিনিস্টার' কি ব্যাপার তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তবে সে এটা বুঝিয়াছিল যে হাবুমামা তাহাকে একটা কিছু করিয়া দিবে। কয়েকদিন পরেই হাবুমামা হঠাৎ একদিন সকালে কাটিহারে চলিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা ফিরিল দুইটি 'সেলার স্যুট' লইয়া। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির মতো সেকালে ছোট ছেলেদের জন্য 'সেলার স্যুট'-এর খুব প্রচলন হইয়াছিম। হাবুমামা কাটিহার হইতে বীরু এবং পৃথ্বীশের জন্য দুইটি সেলার স্যুট লইয়া হাজির হইল সন্ধ্যার সময়। পরদিন সকালে দুইজনকে সেই সেলার স্যুট পরাইয়া বলিল—বীরু আমার বড় প্রাইম মিনিস্টার, পৃথু ছোট প্রাইম মিনিস্টার। উশনার তখন জন্ম হয় নাই। এড্‌ওয়ার্ড দি সেভেন্‌থ্ তাঁহার দুই প্রাইম মিনিস্টারকে লইয়া রাজকীয় মর্যাদায় রোজ বেড়াইতে বাহির হইত। ছবিটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি···জীবনকাহিনী লিখিতে বসিয়া কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। পরের কাহিনী আগেই লিখিয়া ফেলিতেছি। আমার প্র্যাকটিস আরম্ভ এবং দ্বিতীয়বার বিবাহের কথাটা না বলিয়াই বীরু এবং পৃথ্বীশের ছেলেবেলার কথাটা উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নহি, এ লেখা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে সে আশাও কম, তাই সন তারিখের পারম্পর্য লইয়া আমি তেমন মাথাও ঘামাইতেছি না। স্মৃতির স্রোতে যখন যে কথাটা মনে আসিতেছে তাহাই লিখিয়া যাইতেছি···"

কুমার একাগ্রচিত্তে পড়িয়া যাইতেছিল। পশ্চিমগগনে সূর্য অস্তোন্মুখ! মেঘের অপূর্ব বর্ণ-বিন্যাসে চক্রবালরেখায় যে দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। মাঠের ফসলের উপর, গাছের সর্বাঙ্গে, আকাশে, বাতাসে, চতুর্দিকে যে স্বর্ণ-রক্তাভ কিরণমালা প্রসারিত হইয়াছিল তাহারও তুলনা মেলা ভার। কিন্তু কুমার এসব কিছুই দেখিতেছিল না। তাহার মনের আকাশে সূর্যসুন্দরের জীবনকাহিনীও অদ্ভুত শোভা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতেই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল সে।

"অত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছ কুমারবাবু।"

কুমার মুখ তুলিয়া দেখিল রাজু দাঁড়াইয়া আছে।

"ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্র ঠিক করে এনেছি। বউদির প্রেসার মাপা হ'য়ে গেছে। গগন বললে ভয়ের কোন কারণ নেই, ঠিক আছে।"

"ট্রেন কতক্ষণ হলো এসেছে? টেরই পাইনি।"

"চল বাড়ী চল। আজ এখানে থেকে যাব ভাবছি। দাবাবড়েগুলো হারায়নি তো?"

"না, সব আছে।"

"অনেকদিন তোমার সঙ্গে খেলিনি। আজ খেলব ভাবছি।"

"বেশ।"

রাজু খুব ভালো দাবাখেলোয়াড়। কাটিহারের সমস্ত দাবাখেলোয়াড়কে সে পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু কুমারকে সে হারাইতে পারে নাই। কুমার তাহার চেয়েও ভালো খেলোয়াড়।

॥ ২৭ ॥

চম্পার সাধ উপলক্ষে যে ভোজ হইয়া গেল তেমন ভোজ সম্প্রতি আর হয় নাই, ইহাই সকলে বলিতে লাগিল। বছর দুই আগে তহশিলদার সাহেবের নাতির বিবাহ উপলক্ষে একটা বড় ভোজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এত বড় নহে। কারণ তাহা প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাহাতে অনাহুত রবাহুতের সংখ্যাও এত অধিক হয় নাই। নিখিলবাবু আসিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানায় বসিয়া ছিলেন এবং সূর্যসুন্দরকে ভোজের একটা আনুমানিক ব্যয়ের আভাস দিয়া বলিতেছিলেন—"আমাদের দু'শো টাকার বেশী খরচ হয়নি। লোকে এত জিনিস দিয়েছিল যে তাতেই সব কুলিয়ে গেছে। ওই দু'শো টাকা বীরু আমাকে দিয়ে দিতে চাইছিল। আমাদের মালিক তখন সেখানে বসে ছিলেন, তিনি বাঁ চোখ কুঁচকে ইশারায় আমাকে টাকাটা নিতে বারণ করলেন। বীরুবাবু চলে গেলে তিনি বললেন—ও টাকাটা বীরুবাবুর কাছ থেকে নেবেন না। ওটা মনু আর টুনুর নাম করে আমাদের স্টেট থেকেই দিয়ে দিন। মনু টুনু যদি এসে শোনে তাদের নাম করে কিছু দেওয়া হয়নি তাহলে তারা বড়ই রাগারাগি করবে। সোমাও সেই কথা বলছে। মুশকিলে পড়েছি কিন্তু বীরুকে নিয়ে। তার সঙ্গে এখুনি দেখা হলো একটু আগে। সে বলছে আমি আমার বৌমার সাধে দু'শো টাকা খরচ করব ঠিক করেছিলাম। সে টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে। তা না নিলে গগনের মায়ের মনে একটু দুঃখ হবে। অনেকদিন থেকে টাকাটা ও জমিয়ে রেখেছিল। আমি বললাম বড়বৌমা তো চম্পাকে একটা ভালো হার দিয়েছে, আবার খরচ করার কি দরকার। তাছাড়া ভোজের ব্যাপার তো মিটেই গেল, আর কিসে খরচ করব আমরা। বীরু বলছে যা হোক কিছু একটা করুন। কি করা যায় বলুন তো।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "সেটা আপনারাই ঠিক করুন, আমি আর কি বলব। আপনার হাতে ওই খাতাটা কিসের?"

নিখিলবাবুর হাতে একটা ছোট খাতা ছিল। তিনি বলিলেন, "এটা কুমারকে

দেব। এতে ভোজের সমস্ত বিবরণ লেখা আছে। কত লোক খেয়েছে, কোন কোন গ্রাম থেকে তারা এসেছিল, কে কি কি জিনিস দিয়েছে। আমরা কি কি জিনিস কিনেছি, আর তার দাম কত। কারা কারা খেটেছে তাদের নাম—সব টোকা আছে ওতে।"

"আপনি সব টুকেছেন?"

"আমার কাছে ফিগারগুলো ছিল, কিন্তু ওটা লিখেছে দিগন্ত।"

"দিগন্ত?"

"হ্যাঁ, ভোজের সময় দিগন্ত বললে দাদু আমাকেও কিছু একটা কাজ দিন। সবাই কাজ করছে, আমার চুপ চাপ বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তখন আমি তাঁকে বললাম তাহলে তুমি এই ভোজের বিবরণটা লিখে ফেল। আমার কাছে সব ফিগার আছে। ওটা একটা ফ্যামিলি রেকর্ড হ'য়ে থাকবে। লেখ দিকি ভালো করে। সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছে। কুমার এটা ভালো করে রেখে দিক।"

"কই আমাকে দিন তো—"

সূর্যসুন্দর সাগ্রহে খাতাটি লইয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া দিলেন।

"আপনি কি পড়তে পারবেন?"

"দেখব চেষ্টা করে।"

কবিরাজ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বউমা বাড়ীতে বলে দাও বড়বৌমাকে আজ আমার জন্যে যেন বার্লি ছাড়া আর কিছু না করেন।"

"কি হলো"—নিখিলবাবু প্রশ্ন করিলেন।

"মরা পেটে ক্রমাগত 'রিচ্ ফুড' খাচ্ছি তো। সহ্য হ'চ্ছে না।"

"খাচ্ছেন কেন?"

"কেন আর, লোভ।"

অকৃত্রিম আনন্দে কবিরাজ মশাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"এই তৃতীয় রিপুটাই মাঝে মাঝে বড়ই বিপন্ন করে ফেলে আমাকে।"

নিখিলবাবু বলিলেন, "বার্লিই বা খাবেন কেন, আজ উপবাস করুন!"

"ওরে বাবা, তা পারব না। আমি যে আছি, মরে যাইনি, এই ধারণাটা নিজের কাছে জাগ্রত রাখবার জন্যে সামান্য কিছু খেতে হবে। আর সবই তো গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, অরণ্যের আর বাকি কি! ওই লোভটুকুই আছে. ওইটেকে আঁকড়ে ধরে আর অতীত জীবনের সুখ-স্মৃতিটাকে লবেঞ্চুসের মতো চুষে চুষে বেঁচে আছি! আপনার তো খুব খাটুনি গেল, শরীর কেমন আছে—"

সূর্যসুন্দরই উত্তর দিলেন।

"খাটলে নিখিলবাবুর শরীর খারাপ হয় না। হাঁটাহাঁটি করলে উনি ভালোই থাকেন।"

নিখিলবাবু বলিলেন, "তাছাড়া, আমি ভোজের একটি জিনিসও খাইনি। আমি রোজ যেমন কম মসলা দেওয়া মাছের ঝোল আর পুরোনো চালের ভাত খাই ভোজের দিনও তাই খেয়েছিলাম।"

কবিরাজ মহাশয়ের মুখ ঈষৎ ফাঁক হইয়া গেল, তিনি বিস্ফারিত-নয়নে নিখিলবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন।

"বলেন কি ? আপনি কিছু খাননি ?"

"কিচ্ছু না। এমন কি জল পর্যন্ত না। আমাকে ইউনান সাহেব ডিস্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার (distilled water) খেয়ে থাকতে বলেছেন। আমার 'স্টোন' হয়েছিল কিনা।"

কবিরাজ মহাশয় দুই হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি মহাপুরুষ। আমি অতি সাধারণ দুর্বল মানুষ। আমারও স্টোন আছে, বাত আছে, দাঁত নড়ে, হজম হয় না, মাথা ঘোরে তবু আমি প্রাণ তুচ্ছ করে সব খেয়েছি, কারণ জানি এমন সুযোগ জীবনে আর পাব না। অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের এই মেলায় দু'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচছি, যদিও আমি নাচের কিছুই জানি না এবং যদিও ভয় আছে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারি—"

কবিরাজ মহাশয় সত্যই দুই হাত তুলিয়া নাচিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বাধা পড়িল। গগনের শ্বশুর শাশুড়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিখিলবাবুর মুখে নিখুঁত ভদ্রতা ফুটিয়া উঠিল।

"কোনও অসুবিধা হ'চ্ছে না তো ? বাবুর্চীটা কেমন রান্না করেছিল কাল ?"

"না আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। রান্নাও বেশ চমৎকার হয়েছিল। তবে রাত্রে চারিদিকে শিয়াল ডাকছিল তো, গিন্নীর ভয় করছিল একটু। মফঃস্বলে এমন বাবুর্চী আপনারা পেলেন কোথা ? অনেকদিন অমন 'ক্লিয়ার সুপ' খাইনি।"

"এককালে এখানে নীলকুঠির সাহেবরা থাকত। যে বাড়ীতে আপনারা আছেন, সেই বাড়ীতেই থাকত তারা। যে আপনাদের রান্না করেছে তার বাবা টেলার সাহেবের পেয়ারের বাবুর্চী ছিল, তাকে টেলার সাহেব বিলেত পর্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দেশ ছেড়ে সে যেতে চায়নি। নিজের ছেলেকে সে রান্না শিখিয়ে গেছে কিছু কিছু। মাছ রাঁধে না। আমার ভয় ছিল আপনাদের ও খুশী করতে পারবে কি না।"

"না অখুশী হবার কিছু নেই। He is tolerably a good cook".

গগনের শ্বশুর শাশুড়ী ইংরেজিভাবাপন্ন বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাদের জন্য জমিদারের কুঠিতে আলাদা ইংরেজি খানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তুরিকুলোদ্ভব ত্রিলোকী রান্না করিয়া তাঁহাদের খুশী করিতে পারিয়াছে জানিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

গগনের শাশুড়ী মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "রান্নাটান্না সবই ভালো, ঘরগুলিও বেশ বড় বড়, চমৎকার। কিন্তু আপনাদের ওই শিয়ালগুলোর জ্বালায় কাল ভালো করে ঘুমুতে পারিনি।"

কবিরাজ মহাশয় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আমাদের গ্রামের ওই অসভ্য জানোয়ারদের অভদ্র ব্যবহারের জন্য আমরা খুবই লজ্জিত। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে ওদের কাছে ঋণী, তাই ওদের উপর খুব বেশী রাগ করতে পারি না।"

"শেয়ালের কাছে ঋণী ? ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

গগনের শ্বশুর স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিলেন।

"গল্পটা বলছি। আপনারা একালের শহুরে লোক, এ গল্প হয়তো আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি যেমন বিদূষক, বড়লোকের দরবারে দরবারে ভাঁড়ামি করে বেড়াই, আমার ঠাকুরদাও তেমনি এক বিদূষক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে দরবারে দরবারে ঘুরে বেড়াতে হতো না। একটি রাজার দরবার আঁকড়েই তাঁর সংসারের সমস্ত

অভাব ঘুচেছিল। সপরিবারে খেতে পরতে পেতেন, বেশ ভালো একটি থাকবার বাড়ী পেয়েছিলেন, জমিজমাও কিছু করে দিয়েছিলেন তাঁকে রাজাসাহেব। এ ছাড়া বুদ্ধিবলে কিছু উপরি রোজগারও করতেন আমার ঠাকুরদা। দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শীতকালে এক রাত্রে শিয়ালের ডাক শুনে রাজাসাহেবের হঠাৎ মনে হলো—ওরাও তো আমার প্রজা, নিশ্চয়ই ওরা আমার কাছে কিছু বলতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না। আমার ঠাকুরদাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কিছু বুঝতে পারছ? ঠাকুরদা বললেন, পারছি বইকি। রোজই ওরা এই এককথা বলে, কিন্তু ইচ্ছে করেই আপনাকে সে কথা শোনাই নি। কারণ শুনলেই আপনি এখনি হুহু করে টাকা খরচ করে ফেলবেন। পরের দুঃখের কথা শুনলে আপনার তো আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। রাজাসাহেব উৎসুক হ'য়ে উঠলেন। জিগ্যেস করলেন—কি ব্যাপার খুলেই বল না। আমার ঠাকুরদা তখন বললেন—ও কিছু নয় হুজুর। শেয়ালগুলো রোজই বলে এত বড় রাজার আশ্রয়ে আমরা বাস করছি, কিন্তু শীতে মরে গেলুম। রাজাসাহেব বললেন তখন, কি করলে ওদের শীত নিবারণ হবে? ঠাকুরদা বললেন, কম্বল কিনে দিন। অন্তত হাজার পাঁচেক কম্বল লাগবে। 'বেশ কিনে দাও কম্বল'—তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়ে দিলেন রাজাসাহেব তাঁর ম্যানেজারকে। ম্যানেজার আর ঠাকুরদা কম্বলের দামটা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিলেন। শুনেছি, আমি এখন যে বাড়ীটাতে থাকি সে বাড়ীটা ওই টাকায় কেনা হয়েছিল। আবার যখন শেয়ালগুলো ডাকতে লাগল তখন রাজাবাহাদুর জিগ্যেস করলেন—কম্বল কিনে দেওয়ার পরও ওরা আবার ডাকছে কেন? ঠাকুরদা বললেন, ওরা আপনার জয়ধ্বনি করছে হুজুরের কম্বল পেয়ে। রাজাসাহেব খুব খুশী হলেন। এই সূত্রে আর একটা গল্পও মনে পড়ল, সেটাও শুনুন। আগেকার বড়লোকেরা ব্যাংকে বা পোস্টাফিসে টাকা রাখতেন না। মাটির নীচে পুঁতে রাখতেন সব। ঠাকুরদা একদিন রাজাসাহেবকে বললেন, হুজুর খবর পেলাম জিনাবাদের রাজার সমস্ত টাকায় ঘুণ ধরেছে। রাজাসাহেব শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন, সর্বনাশ, আমারও যে অনেক টাকা পোঁতা আছে! সেগুলোকে কি করে বাঁচান যায়। ঠাকুরদা পরামর্শ দিলেন—রোদে দিন হুজুর। তাই হলো। অনেক টাকা ছিল রাজাসাহেবের। মাটির তলা থেকে সেগুলো বার করে ওজন করে রোদে দেওয়া হলো টাকা। অত টাকা গুনবে কে। রোদ থেকে যখন সেগুলো তোলা হলো দেখা গেল কয়েক সের কম পড়েছে। ঠাকুরদা রাজাসাহেবকে বোঝালেন—কম তো হবেই হুজুর, শুক্‌তি বাদ যাবে না? রাজাসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলেন—ও হ্যাঁ, তাতো বটেই। আপনারা ভাবছেন রাজাটা বোধহয় অত্যন্ত গাড়োল ছিল। ঠাকুরদাও তাই ভাবতেন, কিন্তু রাজাসাহেবের মৃত্যুকালে যা দেখা গেল তাতে 'থ' হ'য়ে গেলেন ঠাকুরদা। রাজাসাহেব মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদাকে ডেকে বললেন, 'দেখ সিংজী, আমার আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে। মরবার আগে তোমাদের একটা কথা বলে যেতে চাই। আমাকে তোমরা যত বোকা মনে করতে আমি তত বোকা ছিলাম না। শীতকালে শিয়ালরা যে জমিদারের কাছে কম্বল চায় না, অথবা কম্বল পেয়ে জয়ধ্বনি করে না এটা আমি বুঝতুম। টাকায় ঘুণ ধরে, টাকা রোদে দিলে সে ঘুণ চলে যায়, শুক্‌তির জন্য টাকার ওজন কমে যায় এসব আজগুবী কথা আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিনি। আমি বোকা সেজে থাকতুম তোমরা কিছু পাবে বলে। আমি যতদিন মালিক ছিলাম ততদিন তোমরা দু'হাতে টাকা লুটেছ

আমি কোনও বাধা দিইনি, কারণ তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত, তোমরা আমার যে খোশামোদ করতে যদিও তা অনেক সময় বেশ মোটা বলে মনে হতো তবু তা আমার কানে মধুবর্ষণ করত— এই সব কারণে তোমাদের আমি সহ্য করেছি এবং তোমরা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পার তার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আর তো আমি থাকব না, তাই তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি আমার সঙ্গে তোমরা যে সব চালাকি খেলতে চেষ্টা করেছ, আমার ছেলের সঙ্গে তা যেন কোরো না, তাহলে মুশকিলে পড়ে যাবে। সে একালের ছেলে, ভিক্ষা দেওয়াকেও অন্যায় বলে মনে করে। অর্থশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেছে, কম কথা বলে, নেশা ভাং করে না, তার কাছে মোটা খোশামোদ বা মিথ্যে ভাঁওতা একদম চলবে না। আমার পরামর্শ, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আর এ দরবারে থেকো না। কারণ এখানে আর তোমরা টিকতে পারবে না। তোমাদের বাড়ী জমিজায়গা সবই করে দিয়েছি তাই নিয়েই তোমরা থাক গিয়ে।' এই কথা বলে রাজা অযোধ্যানারায়ণ চক্ষু বুজলেন এবং তাঁর শ্রাদ্ধাদি হ'য়ে যাবার পর আমার ঠাকুরদাও চলে এলেন সেখান থেকে। এখন সবই শেষ হ'য়ে গেছে। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। আমি জগদীশবাবুর পৌত্র এখন কবিরাজি করবার ছুতোয় গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াই আর রাজা অযোধ্যানারায়ণের পৌত্র এম. এল. এ. হবার জন্যে গ্রামে গ্রামে ভোট ভিক্ষা করে বেড়ান। দুজনেই ভিখারী হ'য়ে গেছি। কিন্তু ওই শিয়ালগুলোর কল্যাণে আমাদের যে বাড়ীটা ঠাকুরদা কিনেছিলেন সেটা এখনও আছে আর সেটা আছে বলেই মাথা গোঁজবার একটা জায়গা আছে আমার। শিয়ালগুলো রাত্রে ডাকলেই তাই আমার মনে হয় যে আমি ওদের কাছে ঋণী—"

নিখিলবাবু মুচকি হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

"কবিরাজ মশাই, আপনার ঝুলিতে এরকম আষাঢ়ে গল্প আর কত আছে।"

"তা কি আমিই জানি। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে এক একটা। আপনি উঠছেন কেন।"

"মালিকদের একটু তত্ত্বাবধান করি গিয়ে। ও'দের আজকের পোগ্রাম কি তা জানা নেই—"

গগনের শ্বশুর বলিলেন, "কুঠির ওদিকটায় যাঁরা আছেন তাঁরা কে বলুন তো—"

"তাঁরা এ অঞ্চলের জমিদার—"

"ওই যে মেয়েটি রয়েছে। তিনি কে।"

"তিনি জমিদারের মেয়ে। ও'র স্বামীও জমিদার। ডাক্তারবাবুকে দেখতে এসেছেন ও'রা।"

"মেয়েটি খুব ভদ্র। নিজে এসে ভোরে আমাদের চা তৈরি করে খাইয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কে। মুচকি হেসে বললেন, আমি সম্পর্কে আপনাদের বেয়ান হই।"

কবিরাজ মহাশয় এ সংবাদে খুবই পুলকিত হইলেন।

"এ ধরনের শিয়ালও যেমন শহরে পাবেন না, এ ধরনের বেয়ানও তেমনি শহরে কম মিলবে। এখানে আমরা এখনও মধ্যযুগে বাস করছি।"

নিখিলবাবু চলিয়া গেলে গগনের শ্বশুর বলিলেন, "নিখিলবাবু আমাদের খাওয়াদাওয়ার প্রচুর আয়োজন করেছিলেন, তার উপর বেয়ানও অনেক রকম রান্না করে

পাঠিয়েছিলেন এখান থেকে। অত কি খাওয়া সম্ভব। বেয়ানকে একটু অনুরোধ করতে হবে অত খাবার আমাদের পাঠাবেন না। অপচয় করে লাভ কি।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"অনুরোধ করতে চান করুন, কিন্তু ফল হবে না, কারণ এ বাড়ীর সবাই পদ্মা নদীর মতো, দুই কুল প্লাবিত না করতে পারলে এদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। হিসাবের বাঁধ দিয়ে এদের বাঁধতে পারবেন না। আপনার বেয়াই বীরুবাবুর পৈতের সময় এত মাছ হয়েছিল যে বেরাল কুকুরেরও মাছে অরুচি হ'য়ে গিয়েছিল। বিশ মণ মাছ পুঁতিয়ে দিতে হয়েছিল…"

সূর্যসুন্দর সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল তাঁহার স্মৃতিপটে। বীরুর পৈতার সময় বৃদ্ধ যোগাম্বর রায় নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। গাড়িতে আসেন নাই, হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার পায়ে একজোড়া নূতন জুতা দেখিয়া সবাই অবাক হইয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ জুতা পায়ে দিতেন না। খাইবার সময় তিনি আর কাহারও সহিত বসিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে আলাদা জায়গায় খাবার দেওয়া হইল। সূর্যসুন্দরের মনে তাঁহার পায়েস খাওয়ার ছবিটা আবার ফুটিয়া উঠিল। প্রচুর লুচি তরকারি মাছ প্রভৃতি খাওয়ার পর তিনি প্রকাণ্ড এক পরাৎ পায়েস অনায়াসে নিঃশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—এখন বুড়ো হয়েছি, আর আগেকার মতো খেতে পারি না। খাওয়ার পর সূর্যসুন্দর বলিলেন, আপনাকে একটা গাড়ি করে দি, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। রায় মহাশয় প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—আরে না, না, গাড়ির দরকার কি। হেঁটে গেলে হজম হ'য়ে যাবে। মেদিনীপুরে মোয়ারদের বাড়ীতে এক ছিলিম তামাক খাব, তারপর সন্ধে নাগাদ বাড়ী পেঁৗছে যাব। গাড়ির দরকার কি। কিন্তু দেখা গেল তিনি বাড়ীর সামনে কিছুদূরে গিয়াই বসিয়া পড়িয়াছেন। সূর্যসুন্দর তাড়াতাড়ি গেলেন সেখানে। গিয়া দেখিলেন তিনি নূতন জুতার ফিতাগুলি খুলিয়া ফেলিতেছেন। সূর্যসুন্দরকে দেখিয়া বলিলেন—নাতির উপনয়ন উপলক্ষে একজোড়া নতুন জুতো পরে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি নতুন জুতো পরে ভালো চলতে পাচ্ছি না। জুতাজোড়া খুলিয়া তিনি গামছায় বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইলেন, তারপর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।… সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া বীরুর উপনয়ন-উৎসবের স্মৃতিতে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে পড়িল রাজলক্ষ্মী এই উপলক্ষে বেগুনে রঙের বেনারসী শাড়িটা পড়িয়াছিল। তখন বেনারসী শাড়ির পাছাপাড় থাকিত। শাড়িটা বেনারসের একজন নিপুণ কারিগর বিশেষ করিয়া রাজলক্ষ্মীর জন্যই নিজের হাতে করিয়া দিয়াছিল। শাড়ির উপর আসল জরির বড় বড় সোনালী ফুল ছিল। ফুলগুলা সূর্যসুন্দরের চোখের সামনে জ্বলিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল নিখিলবাবুকে। সে ভোজের ভারও নিখিলবাবু লইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স অনেক কম ছিল। চমৎকার গোঁফ ছিল একজোড়া। নিখিলবাবুর স্ত্রী মাছ রান্না করিয়াছিলেন। মামাও আসিয়াছিলেন। সন্দেশ পরিবেশন করিয়াছিলেন নিজে হাতে। হাবুমামাও ছিল। হঠাৎ মোহন ঝার কথা মনে পড়িল। মৈথিল ঠাকুর মোহন ঝা। ধপধপে ফরসা রং। বিড়ালের মতো কটা চোখ। গোঁফও লালচে। মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। স্নান করিয়া এক বিচিত্র কৌশলে দুই হাত দিয়া যখন টিকির জল ঝাড়িত তখন পত্ পত্ পত্ পত্ করিয়া শব্দ হইত একটা। ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ কৌতুকের ব্যাপার ছিল

এটা। মোহন ঝার কথাই ভাবিতে লাগিলেন সূর্যসুন্দর। মনে পড়িল তাঁহার চাকুরি জীবনে কিছুদিনের জন্য তিনি পূর্ণিয়াতে বদলী হইয়াছিলেন। সেখানে অল্পদিনের জন্য গিয়াছিলেন বলিয়া রাজলক্ষ্মীদের লইয়া যান নাই। আমেদাবাদ কুঠির নায়েব চৌবেজি মোহন ঝাকে পাচকরূপে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, দেহাতি লোক, ভালো রাঁধিতে পারিবে না, কোনরূপে চাল ডাল সিদ্ধ করিয়া দিবে, দুই একটা ভাজাভুজিও বানাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু লোকটি সরল, চোর ছ্যাঁচড় নয়। মোহন ঝা সত্যই খুব সরল লোক ছিল। শহরে গিয়া অবাক হইয়া গেল সে। আগে সে কখনও পাকা বাড়ী দেখে নাই। সূর্যসুন্দরের পাকা কোয়ার্টারটার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। এ কি রকম বাড়ী! খড় নাই, বাঁশ নাই, খাপরা নাই, সমস্তই বিলাতী মাটি দিয়া বানানো, অদ্ভুত কাণ্ড তো। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া উর্ধ্বমুখে ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। হাবুমামাও সঙ্গে ছিল। হাবুমামার দিকে ফিরিয়া ঝা বলিল—এ তো আজব কিসমের বাড়ী দেখছি বাবু। বর্ষাকালে জল আটকায়? হাবুমামা উত্তর দিয়াছিল—এ বাড়ীতে কখনও জল পড়ে না। একবার এরকম বাড়ী করিয়া ফেলিতে পারিলে—বাস, নিশ্চিন্ত! দ্বিতীয়বার আর ছাওয়াইবার দরকার হয় না। সত্যি? ভারি তাজ্জবের ব্যাপার তো! মোহন ঝার শতজীর্ণ খড়ের বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ সেই চিত্রটাই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তখন। সেদিন আর এক কাণ্ডও হইয়াছিল—মোহন ঝা ভাত ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, তরকারিতে নুন দিতে ভুলিয়াছিল, ডালটা ভালো করিয়া সিদ্ধ করে নাই। আলুর ভাজিগুলি কয়লার টুকরা বলিয়া মনে হইতেছিল। পরদিন এক সাহেব ও মেমসাহেব রোগী সূর্যসুন্দরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজেদের রোগবিষয়ে নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। মোহন ঝা ইতিপূর্বে সাহেব মেমও দেখে নাই। সে রান্নাঘর হইতে সন্তর্পণে বাহির হইয়া অদ্ভুত পোশাক পরা প্রাণী দুইটিকে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সাহেব মেম যখন চলিয়া গেলেন তখন মোহন ঝা হাবুমামাকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—উহারা কে। হাবুমামা বলিয়াছিল, উহারা সাহেব মেম। মোহন ঝা সাহেব মেম দেখে নাই বটে, কিন্তু সাহেব মেমের নাম শুনিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে একটা আতংকও ছিল তাহার। নীলকুঠির এক সাহেব নাকি তাহার ঠাকুরদাকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। মোহন ঝা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—সাহেব মেম? কেন আসিয়াছিল উহারা? হাবুমামা বলিল, তোমারই খোঁজে; শহরে তোমার রান্নার খ্যাতি এমন রটিয়া গিয়াছে যে ওই সাহেব তোমাকে বাবুর্চী হিসাবে বহাল করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। খাওয়া পরা ছাড়া বেতন পঁচিশ টাকা দিবে। মোহন ঝা বিশ্বাস করিল কথাটা। সরলভাবে বলিল, বেশ তো ডাক্তারবাবুর যদি আপত্তি না থাকে আমি সাহেবের নিকট চাকরি করিতে পারি। হাবুমামা হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ, তাহার পর বলিল—ডাক্তারবাবুর কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু সাহেবের ওখানে চাকরি করিতে হইলে তোমাকে টিকি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, হলদে কাপড় পরা চলিবে না, পরিতে হইবে প্যাণ্টালুন আর বুট জুতা। খইনি খাওয়াও চলিবে না, তাহার বদলে চুরুট খাইতে পার। আর মাঝে মাঝে শিস দিতে হইবে। এমনি করিয়া—। হাবুমামা শিস দিয়া দেখাইয়া দিল। সূর্যসুন্দর পাশের ঘর হইতে সমস্ত দৃশ্যটা উপভোগ করিতেছিলেন। এতদিন পরে সেই ছবিটা তাঁহার মনে আবার ফুটিয়া উঠিল যেন। মোহন ঝার পরবর্তী ইতিহাসও মনে

পড়িল তাঁহার। মোহন ঝা শহর হইতে আর ফেরে নাই। পূর্ণিয়া হইতে সে এক বাবুর সহিত কলিকাতা চলিয়া যায়। বাবু গভর্নমেণ্টের চাকুরিকরিতেন। তিনি মোহন ঝাকে নিজের আপিসে চাপরাসীরূপে বহাল করিয়া লইয়াছিলেন, বাড়ীতে রাঁধিবার জন্য আলাদা বেতনও দিতেন। বেশী টাকার লোভে মোহন ঝা কলিকাতায় চলিয়া যায়। বছর তিনেক পরে মোহন ঝা যখন সূর্যসুন্দরের কাছে ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যসুন্দর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। রূপের সে জলুস ছিল না। জরাজীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, মাথায় টিকি নাই. দশ-আনা-ছ'-আনা চুল, গালের হাড় দুইটা উঁচু, ক্রমাগত কাসিতেছে। মোহন ঝার যক্ষ্মা হইয়াছিল। বেশী দিন বাঁচে নাই।··· সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া সেকালের ছবি দেখিতেছিলেন। বর্তমান তাঁহার নিকট অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ কবিরাজ মহাশয়ের উচ্চহাস্যে তাঁহার স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। কবিরাজ মহাশয় বাহিরের বারান্দায় কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। ঊর্মিলা মাথার শিয়রেই বসিয়া ছিল।

"বৌমা, বাইরের বারান্দায় আর কে আছেন ?"

"গগনের শ্বশুর।"

"বেয়ান কোথা।"

"তিনি ভিতরে গেছেন। আপনার ফলের রস খাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে, যাই দিদির কাছ থেকে আপনার ফলের রসটা নিয়ে আসি।"

ঊর্মিলা চলিয়া গেল। ফলের রস খাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি মানা করিলেন না, জানেন মানা করিলে ইহারা শুনিবে না এবং বেশী জেদ করিলে সকলে হইচই করিয়া উঠিবে। অশান্তির সৃষ্টি হইবে একটা। তাই তিনি আজকাল নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়াছেন। ইহাদের ইচ্ছার স্রোতেই ভাসাইয়া দিয়াছেন নিজেকে। হঠাৎ তাহার কানে গেল কবিরাজ মহাশয় গগনের শ্বশুরকে বলিতেছেন—"আজ অবশ্য খাব না, কিন্তু ঘন গাঢ় দুধই আমি পছন্দ করি। কারণ এখনও ওটা পাওয়া যায়।"

"তার মানে ?"

"মানে সব চেয়ে উপাদেয় হ'চ্ছে ঘন গাঢ় প্রেম। কিন্তু তা তো দুর্লভ। গাঢ় প্রেমের স্বাদ আমি গাঢ় দুধ দিয়ে মেটাই—যদিও হজমের গড়বড় হয় মাঝে মাঝে—"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন কবিরাজ মহাশয়। কবিরাজ মহাশয়ের মানসিক তারুণ্য এখনও অম্লান আছে একথা মনে হওয়ামাত্র সূর্যসুন্দর ইহাও অনুভব করিলেন তাঁহার মনের নবীনতাও বোধহয় লুপ্ত হয় নাই। হইলে প্রেমের কথায় তাঁহার রাগ হইত। কিন্তু তাহা তো হইতেছে না, কথাটা শুনিয়া ভালোই লাগিল বরং। কবিরাজ মহাশয়কে তিনি বলিতে চাহিলেন যে গাঢ় দুধ যখন হজম হইতেছে না, তখন গাঢ় প্রেমেরই সন্ধান করুন, গাঢ় প্রেম একেবারে দুর্লভ নয়। আমার জীবনে আমি অনুভব করিয়াছি—কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, পুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন, মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"কই, বেয়াইকে তো এখানে দেখছি না।"

"তোমার বেয়াই বাইরে বারান্দায় বসে গল্প করছেন কবরেজ মশায়ের সঙ্গে।"

বাহিরে গিয়া ডাকাটা সমীচীন হইবে কি না ভাবিয়া পুরসুন্দরী ইতস্ততঃ করিতে

লাগিলেন। এমন সময় গঙ্গা আসিয়া প্রবেশ করাতে সমস্যাটার সমাধান হইয়া গেল।

"গগনের শ্বশুরকে ডেকে দাও তো। বল, মা ভিতরে ডাকছেন।"

খবর পাইয়াই ভিতরে আসিলেন তিনি।

"চলুন, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে—"

"চা তো এইমাত্র খেয়ে এলাম।"

"চা দুবার খেলে দোষ কি। আসুন—"

গগনের শ্বশুর আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, পুরসুন্দরীর পিছু পিছু অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ও ভিতরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"বৌমা, আজ আমাকে একটু বার্লি দেবেন শুধু নেবু দিয়ে। এবেলা আর কিছু খাব না।"

পুরসুন্দরী মাথা ঈষৎ কাৎ করিয়া জানাইলেন, "তাই দেব। ঊর্মিলা বলেছে আমাকে—।"

গগনের শ্বশুরকে লইয়া পুরসুন্দরী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে বলিলেন, "কাচপোকা যেমন আরসোলাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় বড়বৌমা বেয়াইকে ঠিক তেমনি যেন টেনে নিয়ে গেলেন। একটু আগেই উনি বলেছিলেন আজ আর জলস্পর্শ করব না। কিন্তু বৌমা ডাকবামাত্র সুট সুট করে চলে গেলেন দেখলেন ?"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"ওটা হলো শিভ্যলরি। আজকালকার ইংরেজীনবীশ লোকেরা স্ত্রীলোকদের খুব খাতির করেন।"

"খাতির করুক আপত্তি নেই, কিন্তু বেশী খেয়ে শেষকালে অসুখে না পড়ে যায়।"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গা অকারণে আসে নাই। সে সূর্যসুন্দরকে বলিল—"কাজিগ্রামের ধনপতিয়ার ছেলে এসেছে। সে আপনাকে আজ ভালুক নাচ দেখাতে চায়। ওদিকের জানালাটা খুলে দিলে আপনি শুয়ে শুয়েই দেখতে পাবেন।"

"ধনপতিয়ার ছেলে তো পালিয়ে গিয়েছিল।"

"হ্যা। সে এক মাদারির সঙ্গে ছিল এতদিন। ফিরেছে কাল। তার মা তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার মা-ও আসবে একটু পরে।"

যাহারা বাজি দেখায় তাহাদের এদেশের লোক মাদারি বলে। ইংরেজী ভাষায় ইহাদের 'ম্যাজিশিয়ান' বলা চলে। এক একজন মাদারির অলৌকিক সম্মোহনী শক্তি থাকে। যে মাদারি ধনপতিয়ার ছেলে তুনকাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাকে সূর্যসুন্দর দেখিয়াছিলেন। তাহার চেহারাটা মনে পড়িল। কুচকুচে কালো রং বড় বড় চোখ। অদ্ভুত সে চোখের দৃষ্টি, যেদিক চাহিয়া থাকিত সেদিক হইতে সহজে চোখ ফিরাইত না। মনে হইত তাহার দৃষ্টি যেন সেখানে গাঁথিয়া গিয়াছে। চোখের শাদা অংশটা একটু বেশী ছিল, কুচকুচে কালো রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আরও বেশি শাদা মনে হইত। তাহা ছাড়া ছিল একমাথা কাল বাবরি চুল এবং একজোড়া প্রকাণ্ড জুলফি। শুধু কালো নয়, তৈল-চিক্কণ। গায়ে একটা কালো রঙের আলখাল্লা, গলায়

নানারঙের স্ফটিকের মালা, কানে দুইটি বড় বড় পিতলের কুণ্ডল, সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো চেহারা ছিল তাহার। এখানে যখন হাটের উপর সে প্রকাণ্ড একটা ভালুক লইয়া আসিয়াছিল তখন চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কাজিগ্রামের ধনপতিয়া। হীরু দোসাদের মেয়ে। তুনকার জন্মের তিন চার বছর পরে তাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। তুনকার শৈশবে নানারকম অসুখ হইয়াছিল, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, পেটের অসুখ, এমন কি ডিপ্‌থিরিয়া পর্যন্ত। সূর্যসুন্দরের চিকিৎসাতেই জীবনরক্ষা হয় তাহার। সূর্যসুন্দর তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নিজের পয়সা খরচ করিয়া ডিপ্‌থিরিয়া অ্যান্‌টিটক্‌সিনও কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বয়স যখন দশ বছর তখন তুনকা সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে 'চরবহা' (রাখাল) রূপে বাহাল হইল। ধনপতিয়ার নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্যই সূর্যসুন্দর তাহার ছেলেকে বাহাল করিয়াছিলেন। বেতন অবশ্য তেমন বেশী দিতে হইত না, মাসে মাত্র আট আনা, কিন্তু সিধা দিতেন। রোজ এক সের করিয়া গম, মকাই বা বুট—যখন যেটা সুবিধা হইত। ধনপতিয়া কাজ করিতে পারিত না, কারণ তাহার হাঁপানি ছিল। সূর্যসুন্দরই তাহাকে কাজ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। সে মাঠে বসিয়া সূর্যসুন্দরের ফসল পাহারা দিত। এজন্য সে কোন বেতন লইতে চাহিত না। রাজলক্ষ্মী তাহাকে পুরাতন শাড়ি, জামা, র‍্যাপার প্রভৃতি দিতেন মাঝে মাঝে—মাদারি হাটের উপর যখন ভালুক লইয়া জনারণ্যের মাঝখানে মূর্তিমান বিস্ময়ের মতো আবির্ভূত হইল তখন ধনপতিয়া ক্ষেপিয়া গেল। তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল যে তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী রামদাসই মাদারি-বেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। যদিও বাবরি চুল এবং জুলফি রাখিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সে, কিন্তু ধনপতিয়ার চোখে ধুলা দেওয়া শক্ত। একদিন মাদারি যখন হাটের উপর ভালুক নাচাইতেছিল তখন ধনপতিয়া পাগলিনীর মতো তাহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—তোমাকে ভালুক নাচাইতে হইবে না, তুমি ঘরে এস। আমি তোমার বিবাহিত বউ, তুনকা তোমার ছেলে, ডাক্তারবাবু এতদিন আমাদের অন্নসংস্থান করিয়াছেন, তুমি যদি এখানে থাক তোমারও করিবেন। ডাক্তারবাবুর অনেক জমি, তোমার কাজের ভাবনা হইবে না। মাদারি জনতার দিকে চাহিয়া বলিল—তোমরা এই বাউরা মৌগীকে (পাগলী মাগীকে) এখান হইতে হটাইয়া দাও। আমি কামরূপ মুলুকের লোক, কামাখ্যাদেবীর চেলা, আমি কোথাও বিবাহ করি নাই। ধনপতিয়া কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ওই আমার স্বামী। মিথ্যা ছলনা করিতেছে। উন্মত্তা হইয়া সে একদিন মাদারির কেশাকর্ষণও করিয়াছিল। তাহার পরদিনই মাদারি চলিয়া গেল, দেখা গেল তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুনকাও চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে সেই তুনকার প্রত্যাবর্তন সংবাদে সূর্যসুন্দর বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

"সত্যি সে ভালুক এনেছে ?"

"প্রকাণ্ড ভালুক। জানলাটা খুলে দিলেই দেখতে পাবেন। খুলে দেব ?"

"সে তো দিতেই হবে। ওদিকের বারান্দায় তাহলে বসবার জায়গা করে দাও, বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও দেখবে তো।"

সকালবেলা কাজের সময় ভালুক আনাতে গঙ্গা তুনকার উপর মনে মনে চটিয়াছিল। অনর্থক এ কি ঝামেলা ! সূর্যসুন্দরের উৎসাহ দেখিয়া সে আরও বিপন্ন

বোধ করিল। ওদিকের বড় বারান্দা পরিষ্কার করাইয়া সেখানে বাড়ীর এতগুলি লোকের বসিবার ব্যবস্থা করা কি সোজা কথা! কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। গঙ্গা বাহিরে গিয়া দেখিল চাকরেরা সব মাঠে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর চাকরদের ফরমাশ করিলে বড়বৌমা রাগিয়া আগুন হইয়া যাইবে। অতবড় বারান্দাটা ঝাড়ু দিয়া তাহার পর শতরঞ্জি মাদুর চেয়ার পাতা কি সোজা কথা। হঠাৎ গঙ্গার নজরে পড়িল বাগানের দিক হইতে পার্বতী আসিতেছে। তাহার হাতে কলাপাতায় মোড়া কিছু ফল।

"পারু দিদি কোথায় যাচ্ছ? হাতে ও কি।"

"ছোটদাদু পুজো করবেন, তাঁর জন্যে ফুল তুলতে এসেছিলাম।"

"ভালুক নাচ দেখবে?"

"কোথায় ভালুক নাচ হ'চ্ছে?"

"এইখানে এখুনি হবে। ওদিকের বারান্দায় তোমরা গিয়ে গুছিয়ে বস, আমি ডেকে নিয়ে আসছি ভালুকওলাকে।"

পার্বতী বোকা মেয়ে নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "গুছিয়ে বসব মানে?"

"বারান্দাটা পরিষ্কার করে শতরঞ্জি মাদুর চেয়ার এই সব পাততে হবে তো।"

"সে কি আমি পাতব? চাকররা কোথা?"

"সব মাঠে গেছে। চল না আমরা দুজনে মিলে—"

"আমার এখন সময় নেই। ছোটদাদুর পুজোর যোগাড় না করে দিয়ে কিছু করতে পারব না। আমি স্বাতীকে খবর দিয়ে দিচ্ছি, সে মহাহুজুগে, এখনই সব করে ফেলবে—"

পার্বতী চলিয়া গেল। গঙ্গা কিন্তু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্বাতীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে জামাইবাবু আছেন তাহাকে দিয়া এসব কাজ করানো কি শোভন হইবে? তাহাকে বলিলেই সে লাফাইয়া চলিয়া আসিবে তাহা গঙ্গা জানে, কিন্তু জামাইবাবু সঙ্গে আছেন, সেটা কি উচিত? কিন্তু সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। গঙ্গা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল ধনপতিয়া আসিতেছে। আর তাহার পিছু পিছু আসিতেছে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের চুমানা করা স্বামী কেশোলাল। ধনপতিয়া দীর্ঘকাল তাহার স্বামী পুত্রের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার আশা ছিল তুনকা অন্ততঃ ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু অনেক দিন কাটিয়া যাইবার পরও কেহ যখন আসিল না তখন সে বাধ্য হইয়া কেশোলালকে চুমানা করিয়াছে। একা আর কতদিন থাকিবে। কেশোলাল একটা কমবয়সী ছোঁড়া মাত্র, তাহাকে ধনপতিয়ার ছেলে বলিয়া মনে হয়। তাহার মুখভাবে কিশোর বালকের রূপ পরিস্ফুট। ধনপতিয়াকেও দেখিয়া মনে হয় না যে তাহার খুব বেশী বয়স হইয়াছে। তাহার আসল বয়স বত্রিশ বছর, কিন্তু দেখিয়া মনে হয় কুড়ি পঁচিশ। সে এককালে রূপসী ছিল, তাহাকে দেখিয়া থানার এক জাঁদরেল হাবিলদার সাহেব বহুপূর্বে নাকি প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিলেন, ধনপতিয়ার সে রূপ এখনও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ওই রূপের শিখাতেই বয়ঃকনিষ্ঠ কেশোলাল তাহার পাখা দুইটি পুড়াইয়াছে। ধনপতিয়াকে দেখিয়া গঙ্গা নিশ্চিন্ত হইল।

"ধনপতিয়া, বাড়ীর সবাই ভালুক নাচ দেখবে, তুই পশ্চিমদিকের বারান্দাটা পরিষ্কার করে দে তো।"

ধনপতিয়া কেশোলালকে দেখাইয়া বলিল—"ওকে ঝাড়ু দাও, ওই সব ঠিক করে দেবে। আমি বাবুর সঙ্গে আগে কথা বলব একটু। বাবু জেগে আছেন, না ঘুমোচ্ছেন ?"

"জেগে আছেন।"

ধনপতিয়া সূর্যসুন্দরের শয়নগৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গঙ্গা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। ধনপতিয়া সূর্যসুন্দরের কাছে বসিয়া বকবক করিবে ইহা গঙ্গার ভালো লাগিতেছিল না, কিন্তু কি করিবে, ধনপতিয়াকে রুখিবার সাধ্য তাহার নাই। কিছু বলিলে এখনি হয়তো চেঁচামেচি করিয়া একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। কেশোলালের দিকে চাহিয়া গঙ্গা বলিল—"পশ্চিমদিকের বারান্দাটা পরিষ্কার করে ওখানে বসবার জন্য শতরঞ্জ কম্বল চেয়ার পেতে দিতে হবে। পারবি তো ?"

"হ্যাঁ, জরুর।"

অনুগত ভৃত্যের মতো কেশোলাল গঙ্গার অনুসরণ করিল।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ধনপতিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। মাথার শিয়রে ঊর্মিলা বসিয়া একটা বই পড়িতেছে।

ধনপতিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা, বাবু কি ঘুমুচ্ছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"কে, ধনপতিয়া ? তোর ছেলে তো ফিরে এসেছে শুনলাম। সে-ও ভালুক নাচাচ্ছে গঙ্গা বলছিল—"

"হ্যাঁ, ওর বাপই ওকে সব শিখিয়েছে। ভালুকও সেই দিয়েছে—"

"সেই ভালুকওলাই ওর বাপ ?"

"তাতে সন্দেহ নেই।"

"সে কোথা ?"

"সে তুনকাকে শিখিয়ে পড়িয়ে একটা ভালুক এনে দিয়ে আবার সরে পড়েছে। তুনকা বললে আসামের জঙ্গলে আবার ভালুকের বাচ্চা ধরতে গেছে সে। ভালুকের বাচ্চা ধরে বিক্রি করাও তার একটা রোজগার নাকি।"

সূর্যসুন্দর মানসচক্ষে বালিকা ধনপতিয়াকে দেখিতে লাগিলেন যে রাজলক্ষ্মীর নিকট আসিয়া মুড়ির মোয়া খাইত।

ধনপতিয়া বলিল, "আমি এখন কি করব তা বলে দিন—তুনকা বলেছে চলে যাব। বলেছে সৎ-বাপের সঙ্গে থাকা আমার পোষাবে না।"

"কেশোলাল কি বলে।"

"ওর কিছুতেই আপত্তি নেই। বলছে—হলেই বা কাঠ-ব্যাটা—তোমার যদি সুখ হয় আমি ওর সঙ্গেই থাকব। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু তুনকাই থাকতে চাইছে না। আপনি যদি ওকে বলেন ও থাকবে। ও আমাদের এখনি ভালুক নাচ দেখাবে, তারপর আপনি ওকে ডেকে বলে দিন তুমি তোমার মাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

"তুই আবার বিয়ে করেছিস, ও যদি তোর কাছে না থাকতে চায়, কারো কিছু বলবার নেই। ও এখন তো আর ছেলেমানুষ নেই।"

"ছেলেমানুষই আছে বাবু, দেখতে বড়সড় হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ও এখনও

খুব ছেলেমানুষ। তা না হ'লে নিজের মাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়! আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি—আমি তোর জন্যে এতদিন পথ চেয়ে বসে ছিলাম—এতদিন অপেক্ষা করে তবে বিয়ে করেছি—ছেলেমানুষ বলেই বুঝতে চাইছে না, আপনি একটু ধমকে দিলে ঠিক বুঝবে। আপনাকে ছাড়া ও আর কাউকে ভক্তি করে না, ওর বিশ্বাস আপনি বেঠিক কথা বলবেন না—আপনি বললেই ও আপনার কথা মেনে নেবে।"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সেইজন্যেই তো কিছু বলা মুশকিল। এসব ব্যাপারে জোর করলে কোনও লাভ হয় না।"

হঠাৎ ধনপতিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সূর্যসুন্দরের মনে হইল পুতুল হারাইয়া ফেলিয়া একটা ছোট মেয়ে যেন কাঁদিতেছে। আবার তাঁহার মানসপটে বালিকা ধনপতিয়ার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল—রাজলক্ষ্মীর নিকট হইতে মুড়ির মোয়া পাইয়া লোভীর মতো একটু একটু করিয়া খাইতেছে। তাহার বাবা বধুকেও মনে পড়িল। সে শীতকালে ভোরে আসিয়া খেজুররস খাওয়াইত সকলকে। ধনপতিয়ার কান্না কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে একটা পালকী আসিয়া থামিয়াছিল। পালকি হইতে সোমা নামিয়া আসিল। আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন কাকাবাবু?"

"ভালোই।"

"গগনের শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ হলো। খুবই ভালো লাগল।"

"তুমি ওদের চা করে খাইয়েছ নাকি।"

সোমার মুখে একটা সলজ্জ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"বোয়াই বেয়ান তো, সে অধিকার নিশ্চয়ই আছে আমার"—তাহার পর হঠাৎ সে যেন ঊর্মিলাকে আবিষ্কার করিল।

"ছোট বউদি না?"

ঊর্মিলা মৃদু হাসিল শুধু। সূর্যসুন্দর বলিলেন, "হ্যাঁ, তুই একে দেখিস নি। কুমারের বিয়ের সময় তুই জেলে ছিলি।"

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সোমা জেল খাটিয়াছিল। তাহার চোখে মুখে সর্বদা যে বালকসুলভ উৎসাহ ও পবিত্র সততার দীপ্তি আভাসিত হয় তাহা অন্যের চোখে মুখে সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে তাঁহার যে মুখভাব আমরা দেখি এ যেন অনেকটা সেই ধরনের মুখভাব।

ঊর্মিলার দিকে চাহিয়া সোমা বলিল, "আমি কুমারদার চেয়ে মাত্র একমাসের ছোট। তুমি সম্পর্কে আমার চেয়ে বড় কিন্তু মনে রেখো আমি তোমার স্বামীর বয়সী।"

দুষ্টু ছেলের মতো সে হাসিতে লাগিল।

"বাড়ীতে অনেক সব নতুন লোক এসেছে আলাপ করে আসি।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে ডুগডুগ করিয়া ভালুক নাচের বাজনা বাজিল।

"ও কি"—সোমা ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"কাজিগাঁয়ের তুনকা পালিয়ে গিয়েছিল। শুনছি সে ভালুক নাচাতে শিখে ফিরে

এসেছে। আমাদের দেখাবে আজ তার কৃতিত্বটা! ওদিকের বারান্দায় বসে তোমরা দেখ—"

সোমা মুচকি হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গঙ্গা আসিয়া সূর্যসুন্দরের চোখের সামনে যে বড় জানালাটা ছিল সেটা খুলিয়া দিল। দেখা গেল তুনকা আসিয়া সামনের মাঠে দাঁড়াইয়া ডুগডুগি বাজাইতেছে আর সেই বাজনার তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে প্রকাণ্ড একটা ভালুক। সূর্যসুন্দর লক্ষ্য করিলেন তুনকার চেহারাও অনেকটা তাহার বাবার চেহারার মতো হইয়াছে। তাহার মাথাতেও বাবরি চুল। চুল তেমনি তৈল-চিক্কণ। তাহার ভালুক নাচাইবার নিপুণতা দেখিয়াও সূর্যসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। চোখ ঘুরাইয়া সে ভালুককে যাহা আদেশ করিতেছে ওই প্রকাণ্ড হিংস্র জানোয়ারটা তাহাই করিতেছে। তুনকার চোখও অনেকটা তাহার বাবার চোখের মতো। বেশ বড় বড় এবং চোখের শাদা অংশটা বেশী। যে তুনকা গরু চরাইত, যে ভয়ে তাহাদের জংলী-গাইটার কাছে ভিড়িত না, সেই এখন অনায়াসে ভালুক নাচাইতেছে! ভালুক তাহার কথায় উঠিতেছে, বসিতেছে, জ্বরে কাঁপিতেছে, থাবা তুলিয়া সেলাম করিতেছে। সে একটা লাঠি ঘাড়ে রাখিয়া তাহার উপর ছোট বাঁখারি ঘষিয়া বেহালা বাজাইতে লাগিল আর তুনকার গলা দিয়া বাহির হইতে লাগিল বেহালার সুর। তাহার পর সে লাঠিটার উপর একটা পুঁটুলি ঝুলাইয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল। তাহার চলিবার ভঙ্গী এবং মুখভাব দেখিয়া মনে হইল সে যেন ভালুক নয়, বিদূষক। একটু পরে তুনকা হাঁকিয়া বলিল— ভালুক এবার ঘোড়া হবে। কে ওর পিঠে চড়তে চাও চলে এস। ঊষার ছেলে তিনটি—এমনি খুব দুষ্ট যদিও, কিন্তু তাহারা কেহ সাহস করিয়া ভালুকের কাছে যাইতেই পারিল না, পিঠে চড়া দূরে থাক। কিন্তু ঊষার মনে একটি কুসংস্কার বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ভালুকের পিঠে ছেলে চড়াইলে সে ছেলে নাকি খুব বলবান এবং শত্রুজিৎ হয়। কিন্তু নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া সে ছেলেদের ভালুকের কাছে লইয়া যাইতে পারিল না। তাহার মনে হইল এ সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যাইবে না। কি করা যায় তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না, এমন সময় স্বাতী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে গাছ-কোমর বাঁধিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—"আমি চড়ব। তুনকা নিয়ে আয় ভালুকটাকে এদিকে।"

তুনকা ভালুকটাকে বলিল—"ঝমরু, মাইজিকে সেলাম কর।"

ঝমরু সেলাম করিল। তাহার পর স্বাতী মুচকি হাসিতে হাসিতে তাহার পিঠের উপর গিয়া চড়িয়া বসিল। আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল সকলে। স্বাতী বেশ নির্ভয়ে ভালুকের পিঠের উপর বসিয়া রহিল। ভালুক তাহাকে পিঠে করিয়া চারিদিকে 'চক্কর' দিতে লাগিল। এদিকের বারান্দায় পুরুষরা বসিয়াছিল। ভালুক সেদিকে আসিতে কবিরাজ মহাশয় স্বাতীকে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"এতদিন জানতাম শক্তি সিংহবাহিনী, আজ তাঁর ভল্লুকবাহিনী মূর্তি দেখে কৃতার্থ হলাম।" ইহার উত্তরে স্বাতী নাক মুখ কুঁচকাইয়া তাহাকে একটু ভেংচাইয়া দিল। স্বাতীকে নির্ভয়ে ভালুকের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া এক দুই তিনেরও ভয় ভাঙিল। তুনকা একে একে তাহাদেরও ভালুকের পিঠে চড়াইতে লাগিল।

সূর্যসুন্দর পুনরায় দিবাস্বপ্নে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। তুনকার ভালুক ঝমরু

তাঁহাকেও অনেক দূরে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে ঝমরু আর ঝমরু ছিল না, মটরু হইয়া গিয়াছিল। দারোগা চন্দ্রভান সিংয়ের কাশ্মীরি ভেড়া মটরু। বদলী হইয়া যাইবার সময় উশনাকে তিনি ভেড়াটি উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। চমৎকার ভেড়া, গা-ভরা শাদা লোম, লোম মাটিতে লুটাইয়া পড়িত। সকলেই তাহার পিঠে চড়িত। এমন কি মধুয়া চাকরটা পর্যন্ত। তাহার পিঠে চড়িয়া তাহার গলাটা দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিতে হইত, না ধরিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। পিঠে চড়িলেই ঘোড়ার মতো ছুটিত সেটা। বোনু মিস্ত্রী কেরোসিন কাঠের বাক্স দিয়া একটি গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল উশনাকে। ভেড়াটা সেই গাড়ি টানিত। ভেড়ার শিং দুইটাতে রঙীন দড়ি দিয়া লাগামও করিয়া দিয়াছিল বোনু। প্রকৃত শিল্পী ছিল সে, খুটুর খুটুর করিয়া ধীরে ধীরে কাজ করিত, কিন্তু যে কাজটি করিত তাহা নিখুঁত। তাহার কানে একটা ছোট আব ছিল। সূর্যসুন্দর সেটা কাটিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে আপত্তি করিয়া বলিল—কাটিয়া দিলে সকলে তাহাকে কানকাটা বলিবে। যেমন আছে থাক।

"সেলাম হুজুর—"

সূর্যসুন্দরের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। তিনি খোলা জানলাটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন সামনের মাঠটা ফাঁকা, তুনকা চলিয়া গিয়াছে। কেহ নাই, কোনও কলরবও শোনা যাইতেছে না। তিনি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? পাছে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায় তাই কি সকলে চলিয়া গিয়াছে? যে ঘুম কখনও ভাঙিবে না সেই ঘুম যখন তাঁহার চোখে নামিবে তখনও কি সকলে তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? তাঁহার কেমন যেন একটু ভয় হইল।

"বউমা?"

"কি বলছেন বাবা—"

"এরা সবাই কোথা গেল? তুনকার ভালুকের খেলা হ'য়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাবা। তাই ভিতরে গিয়ে বসেছে সবাই।"

গঙ্গা আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি চিঠি।

"থানার নতুন দারোগাবাবু একটা চিঠি পাঠিয়েছেন হাবিলদার সাহেবের হাতে। হাবিলদার সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"সেলাম হুজুর"—বাহিরে হাবিলদার সাহেবের গম্ভীর কণ্ঠ আবার শোনা গেল।

"হাবিলদার সাহেবকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এসে বসতে দাও।"

হাবিলদার সাহেব ভিতরে আসিয়া আর একবার মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। হাবিলদার রামনগিনা সিং ভক্ত লোক। প্রত্যহ সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ করেন। তিনি আসিয়া বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিলেন যে তিনি প্রত্যহ কুমারবাবুর নিকট হইতে সূর্যসুন্দরের খবর লইয়া যান। তাঁহার মতে সূর্যসুন্দরের এই অসুখ ইন্দ্রপাতের সহিত তুলনীয়। এ 'দিগরের' (অঞ্চলের) সমস্ত লোক—আপামর ভদ্র সকলেই—তাঁহার এই অসুখে অনাথ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারই শুধু পক্ষাঘাত হয় নাই এ প্রদেশটারই পক্ষাঘাত হইয়া গিয়াছে। তবে সবই রামজীর ইচ্ছা, তাঁহার বিধান মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে। সূর্যসুন্দর রামনগিনাকে চিনিতেন, জানিতেন

একবার রামজী প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে রামনগিনা সহজে থামিতে পারিবেন না। ক্রমাগত তুলসীদাস আবৃত্তি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে শেষে অশ্রুমোচন পর্যন্ত করিবেন।

সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা সাহেব কিসের চিঠি পাঠিয়েছেন—"

রামনগিনা বলিলেন, "আপনাদের দামাদ' (জামাই) সুব্রতবাবু, তাঁহার এলাকার কলেকটার সাহেবকে কি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। কিন্তু সেই পত্রের ফলে সেখানকার দারোগা এক কনেস্টবলের সঙ্গে সুপর্ণ সিংহ নামে এক বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমাদের থানায় আসিয়াছে। এই খবরটি দারোগাবাবু সুব্রতবাবুকে জানাইয়াছেন। যদি বলেন সুপর্ণবাবুকে এখানেই লইয়া আসিতে পারি।"

সূর্যসুন্দর সুপর্ণবাবুর কোনও খবর জানিতেন না। তিনি গঙ্গাকে বলিলেন—"হাবিলদার সাহেবকে সুব্রতর কাছে নিয়ে যাও।"

॥ ২৮ ॥

ঠিক হইল সুব্রত আমবাগানে গিয়া সুপর্ণ সিংহের সহিত দেখা করিবে। সঙ্গে থাকিবে গগন আর কুমার। সুব্রত অনুকেও লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে যাইতে রাজী হইল না। গগনের শ্বশুর ও শাশুড়ীর নিকট হইতেও অনুর অনুরোধে ব্যাপারটা গোপন রাখা হইল। চম্পা এবং পার্বতী ছাড়া বাড়ীর আর কেহ ব্যাপারটা জানিত না। সুপর্ণ সিংহ যে আসিয়াছেন এ সংবাদ তাহারা কিন্তু পায় নাই। গগন তাহাদের নিকটও ব্যাপারটা আপাততঃ প্রকাশ করিতে চাহিল না। সুপর্ণবাবু যে আসিয়া পড়িবেন তাহা গগনও প্রত্যাশা করে নাই। তাহারই চেষ্টায় যে এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে একথা সে যতই ভাবিতেছিল ততই অপরিসীম আত্মপ্রসাদে তাহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া তাহাকে যেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো আকাশে উড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল। বার বার তাহার মনে হইতেছিল এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করা গেল। দিগন্ত দাদার প্রফুল্ল মুখভাব এবং চোখের উদ্ভাসিত দৃষ্টি দেখিয়া আন্দাজ করিতেছিল দাদা একটা কিছু লইয়া মনে মনে মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা সে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিল না। চশমার লেন্স দুইটা ভালো করিয়া মুছিয়া সে দাদার মুখের দিকে দুই একবার চাহিল মাত্র। কোনও প্রশ্ন করিল না। সে জানে দাদা যথাসময়ে তাহাকে সব বলিবে। সে গঙ্গার ধারে টেবিল চেয়ার লইয়া গিয়া সেইখানে বসিয়াই 'থীসিস' রচনা করিতেছিল। তাহাতেই পুনরায় মন দিল।

কুমার কয়েকখানা চেয়ার আগেই বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছিল। শুধু চেয়ার নয়, চায়ের সরঞ্জাম এবং কিছু বিস্কুটও। নার্সটিকে কেন্দ্র করিয়া যে ভিতরে ভিতরে এত সব কাণ্ড প্রকাণ্ড হইয়া আছে তাহা সে ঘুণাক্ষরেও জানিত না। গগনের নিকট সব শুনিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। প্রেমিকপ্রবর সুপর্ণ সিংহ যে এখানে আসিয়া থানায় বসিয়া আছেন এ খবরটাও ভারি মনোরম। একটা চাপা উত্তেজনা লইয়া বাগানে চেয়ার টেবিল সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল সে। তাহার ইচ্ছা করিতেছিল বড় জামাইবাবু কৃষ্ণকান্তকেও দলে টানিতে। তিনি যদি তাঁহার রাইফেলটা লইয়া একটা

চেয়ারে কেবল বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলেও অনেক কাজ হইত। কিন্তু গগন সুব্রতকে না জানাইয়া কৃষ্ণকান্তকে কিছু বলাটা উচিত হইবে কি না তাহা সে স্থির করিতে পারে নাই। তাহাদের যদি আপত্তি না থাকে কৃষ্ণকান্তকে সে সহজেই ডাকিয়া আনিতে পারিবে। তিনি পাশেই 'বাহি' নদীর ধারে রাইফেল লইয়া বসিয়া আছেন। কিছুদিন পূর্বে বাহি নদীতে একটা কুমীর ঢুকিয়াছে। অনেকের ছাগল বাছুর তাহার পেটে গিয়াছে। তাহাকেই খতম করিবার আশায় নদীর ধারে বসিয়া আছেন কৃষ্ণকান্ত। প্রয়োজন বুঝিলে কুমার তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়া আনিতে পারিবে। তিনি এখন একাগ্র হইয়া বাহি নদীর জলে সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া আছেন কখন কুমীরের নাকটি জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে এই আশায়।

কুমার দেখিতে পাইল গগন ও সুব্রত আসিতেছে। সুব্রত একেবারে 'ফুল' মিলিটারি পোশাকে সজ্জিত। তাহার কোমরের বেল্ট্ হইতে একটা রিভলভারও দুলিতেছে। হাতে একটি পাতলা বেতের ছড়ি। গগন তাহাকে লইয়া বাগান দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু পরেই থানার দারোগা সাহেব, হাবিলদার সাহেব, দুইজন কনেস্টবল এবং তাহাদের পিছু পিছু সুপর্ণ সিংহ আসিয়া হাজির হইলেন। সুব্রতকে দেখিয়া দারোগা সাহেব, হাবিলদার সাহেব এবং কনেস্টবল দুইজন মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করিতেই সুব্রত আগাইয়া গিয়া সুপর্ণ সিংহকে নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি আমার চিঠি পেয়ে এসেছেন এতে খুবই আনন্দিত হলাম। বসুন। আচ্ছা চলুন, আগে আপনার সঙ্গে কথাটা সেরেই আসি, তারপর চা খাওয়া যাবে। দারোগা সাহেব আপলোক বৈঠিয়ে, ইন্‌সে প্রাইভেট মে থোড়া বাত করনা হ্যায়। ছোটকাকা, আসুন—"

সকলে বাহি নদীর দিকেই গেলেন। কিছুদূর গিয়াই সুব্রত আসল কথাটি পাড়িল।

"মিস্টার সিনহা, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি। অনুপমা বসু বলে কোনও মেয়ের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কখনও ?"

মিস্টার সিনহা কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "ছিল। কেন বলুন তো।"

"আপনি কি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ?"

"চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি নিজেই পিছিয়ে গেলেন। তাঁর বাবারও এতে মত ছিল না।"

"বাবুল কি আপনারই ছেলে ?"

এ প্রশ্নের জন্যই সুপর্ণ সিংহ প্রস্তুত ছিলেন না। এ সব খবর ইঁহারা কি করিয়া টের পাইলেন তাহাও তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না। একটু ভয় পাইয়া গেলেন।

"এ সব খবর আপনারা কোথা থেকে পেলেন ? তাছাড়া আমার নিতান্ত প্রাইভেট ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথাই বা ঘামাচ্ছেন কেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। এইজন্যেই কি আপনারা এখানে আমাকে টেনে এনেছেন।"

সুব্রত গম্ভীরভাবে বলিল—"হ্যাঁ। মিস বোস এখানে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তাঁর কাছে আমরা সব কথা শুনেছি। তিনি আপনাকে বিয়ে করতে চাননি, নিজেই পিছিয়ে গেছেন, আপনার এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না, মাপ করবেন। তিনি আপনাকে সর্বদাই বিয়ে করতে চেয়েছেন, এখনও তাঁর আপত্তি নেই।"

"অনু এখানে এসেছে ?"

"হ্যাঁ। এখনই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখাও হবে। এখনি তাঁকে এখানে আনতে পারতাম। কিন্তু এমনিই তিনি নানাভাবে অপমানিত হচ্ছেন, তাঁকে নিয়ে টানাটানি করবার ইচ্ছে নেই আমাদের। I appeal to your sense of honour."

"অনু নানাভাবে অপমানিত হয়েছে ? কে তাকে অপমান করেছে—"

গগন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এইবার কথা কহিল।

বলিল, "আপনি। আপনি তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করে সরে পড়েছেন। এখন আপনাকেই এর প্রতিকার করতে হবে।"

সুপর্ণ সিংহ গগনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কুমার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "উনি যখন আমাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছেন তখন এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে। আমরা আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।"

কাছেই দুম করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। সিংহ মহাশয় বিহ্বল দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, বন্দুকের আওয়াজে চমকাইয়া উঠিলেন। বন্দুকের আওয়াজটা যেন একটা প্রচণ্ড ধমকের মতো শুনাইল।

"আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

সুব্রত বেতের ছড়িটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "একটিমাত্র কাজই আছে যা করলে সব ব্যাপার মিটে যায়। মিস বোসের উপর অবিচার করে আপনি যে সাংঘাতিক ভুলটা করেছিলেন সেটা অবিলম্বে সংশোধন করে ফেলুন। অনায়াসেই পারেন সেটা।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—"

"বিয়ে করে ফেলুন মিস বোসকে"—গগন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল।

"বেশ, ফিরে যাই। তারপর সে ব্যবস্থা করব।"

"আপনাকে যখন হাতের মধ্যে পেয়েছি তখন আপনাকে ছেড়ে দেব না আমরা। বিয়ে করে তবে যাবেন" গগনের কণ্ঠস্বরে আর ভদ্রতার লেশমাত্র রহিল না।

"কোথায় বিয়ে হবে ?"

কুমার শান্তকণ্ঠে বলিল—"এইখানে, এই বাগানে। আমরা সে ব্যবস্থা করব। আজ রাত্রেই বিয়ের একটা লগ্ন আছে। কালও আছে। আপনি রাজী হোন। বাকি ব্যবস্থা আমি করব।"

মিস্টার সিংহ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হাসিটা ঠোঁট হইতে যেন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।

"আপনারা সবাই শিক্ষিত লোক, আপনাদের জানা উচিত এরকম জোর করে বিয়ে দেওয়া নিতান্ত অসভ্য সমাজেও আজকাল প্রচলিত নেই। আফ্রিকার বর্বর সমাজে আছে শুনেছি কোথাও কোথাও।"

গগনের কণ্ঠস্বরে এবার বেশ উত্তাপ দেখা দিল।

"আপনি শিক্ষিত হ'য়ে যা করেছেন তা আফ্রিকার বর্বর সমাজের কেউ করে কি না আমাদের জানা নেই। জোর করে বিয়ে দিলে তার ফল যে ভালো না-ও হ'তে পারে তা আমরা জানি। বিয়ে করেও আপনি মিস বোসকে ছেড়ে পালাবেন এ সম্ভাবনাও অস্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। তবু আমরা বিয়ে দিতে চাইছি কেবল বাবুলের জন্য।

ওই নিরপরাধ শিশুর ললাটে যে কলঙ্ক আপনি লেপন করে দিয়েছেন সেটা আপনাকে মুছে দিতে হবে। এ বিষয়ে আপনি মনঃস্থির করে ফেলুন।"

সুব্রত সবিস্ময়ে গগনের দিকে চাহিল। সে যে এমন শুদ্ধ বাংলা অনর্গল বলিতে পারে তাহা সে জানিত না। মিস্টার সিংহের দিকে চাহিয়া সে মৃদুকণ্ঠে ইংরেজিতে বলিল—"We appeal to your sense of honour Mr. Sinha."

সুপর্ণ সিংহ মরিয়া হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ধরুন যদি আমি বিয়ে না করতে চাই তাহলে কি করবেন আপনারা।"

"The law will be after you. আপনার বিরুদ্ধে অনেক চার্জ আছে। ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাকে arrest করবার জন্যে ওয়ারেণ্ট বার করেছেন একটা। আপনি বাসরঘরে যদি যেতে না চান আপনাকে জেলে যেতে হবে।"

ঠিক এই সময় কৃষ্ণকান্ত পিছন দিকের জঙ্গল হইতে বাহির হইলেন।

"একি তোমরা এখানে কি করছ?"

"কুমীরটাকে মারতে পারলেন?"—কুমার জিজ্ঞাসা করিল।

"মারতে পেরেছি কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এখনও। একটা নৌকো পেলে গিয়ে দেখতাম জলটা লাল হয়েছে কি না। গুলিটা লেগে থাকলে রক্ত বেরুবেই। নৌকো নেই?"

"না, নৌকো তো নেই।"

"তাহলে যতক্ষণ না ভেসে ওঠে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এ ভদ্রলোক কে!"

কুমার সুব্রতর দিকে চাহিয়া বলিল, "জামাইবাবুকে বলি ব্যাপারটা—"

"বলুন।"

সব শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত ঊর্ধ্বমুখ হইয়া গলার সামনের দিকটা চুলকাইতে লাগিলেন। তাহার পর সুপর্ণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি শিকারী লোক। পশু-পাখীকে ঘায়েল করাই আমার কাজ। কিন্তু ওদের আমি মনে মনে খাতিরও করি। আপনাকেও করছি। মাঝে মাঝে ওদের দেখে হিংসেও হয়, মনে হয় আমরাও যদি ওদের মতে নিরংকুশ, ওদের মতো নির্ভীক, ওদের মতো ক্ষিপ্র, ওদের মতো লীলাময় হ'তে পারতুম। কিন্তু ওদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করি বলে ওদের ছেড়ে কথা কই না। বাগে পেলেই গুলি ছুঁড়ি। অনেক সময় গুলি ফসকে যায়, তখন ওদের প্রতি শ্রদ্ধাটা বাড়ে, কিন্তু গুলি যখন লাগে তখন ওদের ছেড়ে দিই না, বা চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাকি না। সুন্দরবনের একটা বাঘকে আমি খুব খাতির করতুম, সে চারবার আমার গুলি এড়িয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চমবার সে ধরা পড়ল একটা ফাঁদে। এখন এক মহারাজার চিড়িয়াখানায় বেচারা সীমাবদ্ধ সভ্য জীবন যাপন করছে। আপনিও ফাঁদে ধরা পড়ে গেছেন, আর এ ফাঁদ এমন ফাঁদ যে পালাবার উপায় নেই, এবার আপনাকে দাম্পত্যজীবনের খাঁচায় ঢুকতেই হবে। আমার পরামর্শ হ'চ্ছে প্রসন্নমুখে ঢুকে পড়ুন।"

সুপর্ণ সিংহ কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনারা আমার দিকটা শুনবেন না? অনুকে কেন বিয়ে করিনি তার নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কারণ আছে। এবং সে কারণ যে বাজে কারণ নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে অনেক সাক্ষীও আমি হাজির করতে পারি—"

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই পারেন। সমস্ত মৌমাছিরা আপনার

স্বপক্ষে এসে সাক্ষী দেবে। কিন্তু অনুর বিরুদ্ধে যত গুরুতর অভিযোগই আপনি করুন না কেন, আমরা তা বিশ্বাস করব না। হাজার হাজার সাক্ষী এসে বললেও করব না, কারণ আমাদের বিশ্বাস অনু সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। আমাদের এ বিশ্বাস আপনি টলাতে পারবেন না। বিয়েটা করেই ফেলুন। ব্যাপারটা গোপনে গোপনেই সেরে ফেলব আমরা। বুঝতে পারছি আপনার চক্ষুলজ্জা হচ্ছে। সে লজ্জার আবরণ আমরা দেব। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।"

কুমার বলিল, "আজ রাত্রেই তাহলে ব্যবস্থা করে ফেলি ? রাত দুটোর সময় লগ্ন আছে একটা—"

"সত্যিই জোর করে বিয়ে দেবেন আপনারা !"—সুপর্ণ সিংহ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "তাইতো দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবীতে জোরেরই জয়। ওকেই আমরা শক্তি নাম দিয়ে পুজো করেছি নানা রূপে যুগে যুগে। আপনি শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন এতে লজ্জার কি আছে। আমরা সবাই তো তাই করছি। আপনি নিজে যদি জোর দেখাতে পারতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আপনার হুকুম মেনে নিতুম। হনুমান এক লংকায় গিয়ে লংকাকাণ্ড করে এসেছিল, অতগুলো জাঁদরেল রাক্ষস তার কিচ্ছু করতে পারেনি, বাল্মীকি শতমুখে তার জয়ধ্বনি করেছেন। আপনি ওই রকম কিছু একটা করুন না। এই কুমারই তখন আপনাকে নিয়ে কাব্য করবে। আমরা সবাই করব। আসুন তো দেখি আপনার পাঞ্জায় কি রকম জোর ? আরে আসুন না, লজ্জা কি—"

সুপর্ণ সিংহ অনিচ্ছা সহকারে কৃষ্ণকান্তের পাঞ্জা ধরিলেন এবং পরমুহূর্তেই "উহু ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন" বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"আমি ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এরা ছেড়ে দেবে না। এদের পাঞ্জা আমার চেয়েও শক্ত। আমার বিবেচনায় রাজী হ'য়ে যাওয়াই এখন আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। জোরটোরের কথা আর তুলবেন না।"

একটা চাকর আসিয়া খবর দিল চা প্রস্তুত হইয়াছে।

"চল হে, চা খেতে খেতে বাকি কথাটা শেষ করে ফেলা যাবে। সুপর্ণবাবু চলুন—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া পড়াতে গগন, সুব্রত এবং কুমার নির্বাক হইয়া গিয়াছিল। গুরুজনের সম্মুখে বাচালতা করাটা অশোভন, তাহারা কৃষ্ণকান্তের অদ্ভুত যুক্তি খুব উপভোগও করিতেছিল।

চা-পানান্তে দারোগা সাহেব, হাবিলদার সাহেব এবং কনেস্টবলরা চলিয়া গেল। সুপর্ণ সিংহকে কেন এখানে আনা হইয়াছে তাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখাই সংগত মনে করিল সুব্রত। তাহার পর স্থির হইল সুপর্ণবাবুকে সুব্রতর একজন বন্ধু বলিয়া বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইবে। বাড়ীর পিছন দিকে যে ছোট ঘরটায় কুমার নিজের ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি করিয়াছে সেইখানে সে সুপর্ণবাবুর শুইবার ব্যবস্থাও করিয়া দিবে। অনুপমা যে তাঁবুতে থাকে সেটাও ওই ঘরেরই পাশে। সুতরাং অনুপমার সহিত দেখা করাও বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

সুব্রত প্রশ্ন করিল—"বিয়েটা তাহলে কবে হবে ? কাল না আজ ? আমি পরশু

দিন চলে যাব, আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। যাবার আগে শুভকার্যটা সমাধা করে যেতে চাই।"

সুপর্ণ সিংহ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর যে জবাবটা দিলেন সেটা একটু বাঁকা গোছের।

"অনুর সঙ্গে আগে দেখা হোক, তারপর সেটা ঠিক করা যাবে।"

সুব্রতর মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। গগনের চোখের দৃষ্টিও অগ্নিবর্ষী হইয়া উঠিল আবার। কুমারও মনে মনে খুব চটিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখভাবে তাহা ফুটিয়া ওঠে নাই। সে শান্তকণ্ঠেই বলিল, "দেখুন সুপর্ণবাবু, একটি কথাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি, আজ হোক কাল হোক আপনি বিয়ে করতে প্রস্তুত কি না। সেইটেই সোজা করে বলুন। অনুপমার ইচ্ছা অনুসারেই আমরা আপনাকে এখানে আনিয়েছি। সুতরাং আপনি বিয়ে করবেন কি না তা ঠিক করবার জন্যে অনুপমার সঙ্গে দেখা করবার দরকার নেই। দেখা করবার আগেই সেটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বিয়ে যদি আপনি না করতে চান তাহলে অনুপমার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।"

গগন বলিল, "আমাদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আপনি যেরকম ব্যবহার করছেন তাতে আমাদের ভদ্রতার বাঁধ কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না। আর সে বাঁধ যদি একবার ভেঙে যায় তখন যা হবে তার জন্যে কিন্তু আমরা দায়ী হব না।"

সুব্রত কিছু বলিল না। সে উঠিয়া পড়িল এবং ছড়ি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল সে অবিলম্বে একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিতে চায়।

হঠাৎ থামিয়া সে গগনকে বলিল, "বড়দা, আপনি আর একবার থানায় চলে যান, দারোগাবাবুকেই ডেকে আনুন। সুপর্ণবাবু যতক্ষণ না মনঃস্থির করতে পারছেন ততক্ষণ উনি থানায় দারোগাবাবুর হেপাজতেই থাকুন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে ওয়ারেন্টটা আমাকে পাঠিয়েছেন সেটাও ওকে দিয়ে আসুন, এতক্ষণ আমি ওটা ওঁকে দিইনি। কিন্তু দেখছি সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বেঁকাতে হবে।"

পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া সে গগনকে দিল।

কুমার বলিল, "আমার সাইকেলটা নিয়েই যাও।"

বাগানের ঘরে কুমারের সাইকেলটি ছিল, গগন সেটি আনিবার জন্য যাইতেছিল এমন সময় কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একটু দাঁড়াও।"

তাহার পর তিনি উঠিয়া গিয়া সুব্রতকে একটু দূরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসের ওয়ারেন্ট?"

"এখন যিনি ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁকে আমি সব কথা খুলে লিখেছিলাম আর অনুরোধ করেছিলাম সম্ভব হলে একজন পুলিশের সঙ্গে সুপর্ণবাবুকে পাঠিয়ে দিন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটা ওয়ারেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। চার্জ হচ্ছে abduction. আমাকে লিখেছেন যদি he is willing to rectify his mistake তাহলে আর ওয়ারেন্টটা ব্যবহার করবেন না। কিন্তু আমি দেখছি শেষ পর্যন্ত ওটা ব্যবহার করতেই হবে।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "উনি গভীর জলের মাছ। টোপ গিলেছেন, এবার খেলিয়ে

খেলিয়ে ওকে তুলতে হবে। হড়বড় করলে উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে, অবশ্য অনুপমার সঙ্গেই বিয়ে দেওয়ার যদি উদ্দেশ্য হয়, ওকে জেলে পুরে আমাদের লাভ কি। তুমি আর গগন যেমন রেগেমেগে চলে যাচ্ছ, তেমনি চলে যাও, আমি একটু বেয়ে চেয়ে দেখি—"

"আপনি নতুন আর কি বলবেন ওকে—আমরা তো যথেষ্ঠ বললাম।"

"আমি বলব যে আমি তোমাদের কাছে দু'ঘণ্টার সময় চেয়ে নিয়েছি। আমি যেন ওর হিতৈষী এইরকম একটা অভিনয় করব। আমার মনে হয় তাতে কাজ হবে। কুমার এখানে থাক, তোমরা বাড়ী যাও। কিরণকে বোলো আমার ফিরতে যদি একটু দেরি হয় সে যেন ব্যস্ত না হয়। আমি ভালো আছি, আমার ক্ষিধেও পায়নি।"

"বেশ।"

সুব্রত ও গগন চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত সুপর্ণবাবুর নিকট গিয়া বসিলেন এবং কুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ছোটবাবু, কুমীরটার খবর একটু নিয়ে এস না। এত তাড়াতাড়ি ভাসবে না, তবু দেখে এস একবার। অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়।"

কুমারও উঠিয়া গেল।

তখন কৃষ্ণকান্ত নিম্নকণ্ঠে সুপর্ণবাবুকে বলিলেন—"দেখুন মশাই, আপনার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্রীলোকদের পারতপক্ষে এড়িয়ে চলাই উচিত। নিজের সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝেছি। কিন্তু আপনি যে রকম প্যাঁচে পড়েছেন তাতে কি করে যে উদ্ধার পাবেন তা তো ভেবে পাচ্ছি না। এরা সবাই গোঁয়ার। এরা হয় আপনার বিয়ে দেবে না হয় আপনাকে জেলে দেবে। এখনই ওরা ওয়ারেণ্টটা নিয়ে থানায় যাচ্ছিল, আমি অনেক বলে কয়ে ওদের কাছ থেকে দু'ঘণ্টা সময় নিয়েছি। এর মধ্যে ভেবে চিন্তে একটা উপায় বার করুন, যাতে দুকুল বজায় থাকে—"

"কিসের ওয়ারেণ্ট—"

কৃষ্ণকান্ত একটু কল্পনার আশ্রয় লইলেন।

"অনুপমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন যে আপনি তাঁর মেয়ের সর্বনাশ করে সরে পড়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেইজন্যেই আপনাকে এখানে পুলিশের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। অনুপমার সঙ্গে যদি আপনার মিটমাট হয়ে যায় তাহলে তো চুকেই গেল, আর তা না হলে ওই ওয়ারেণ্টের জোরে আপনাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। জেল-আদালত করতে হবে আপনাকে। আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি—দেখুন সেটা যদি আপনার মনোমত হয়।"

"কি বলুন—"

"আমি বলছি আপনি বিয়েটা করে ফেলুন। দুটো কারণে একথা বলছি। প্রথমত পুলিশের ফাঁড়াটা কেটে যাবে দ্বিতীয়ত, আপনার একটি ছেলে আছে শুনেছি, তার প্রতিও একটা সুবিচার করা হবে। তারপর আপনার বিবাহিত জীবন যদি ভালো না লাগে অনায়াসেই ফের কেটে পড়তে পারেন। অনুপমা ভালো রোজগার করে শুনেছি, সুতরাং সেদিকে আপনার কোন ভাবনা থাকবে না। আর তার সঙ্গে যদি আপনার ভাব হয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

স্ত্রী-পুরুষের রোজগারে সংসার আরও সচ্ছল হয়ে উঠবে। সেটা বড় কম কথা নয়। আপনি কি করেন?"

"আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার।"

কৃষ্ণকান্তের মুখে হাসির মৃদু আভা ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি বলিলেন—আপনার মতো সোশ্যাল ওয়ার্কার আরও আছে নাকি। সর্বনাশ!

সুপর্ণ সিংহ শুধু বিব্রত নয়, বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না সম্পূর্ণ অপরিচিত এই ভদ্রলোকেরা অনুপমার সম্বন্ধে এত দরদ দেখাইতেছেন কেন। অনুপমা কায়স্থ ইহারা ব্রাহ্মণ। যোগাযোগটা কিরূপে হইল!

"অনুপমার সঙ্গে আপনাদের কতদিনের আলাপ? ওকে নিয়ে আপনারাই বা এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন।"

"অনুপমার সঙ্গে আমাদের আলাপ মাত্র কয়েকদিনের। আমার শ্বশুর ডাক্তার সূর্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় এ অঞ্চলে খুব নামজাদা এবং সম্মানিত লোক। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে আমরা সবাই এখানে এসে পড়েছি। আমি হচ্ছি ও'র বড় জামাই। গগন ও'র পৌত্র। সুব্রত ছোট জামাই। গগনের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, তার সঙ্গে অনু নার্স হয়ে এসেছে গগনের শ্বশুরবাড়ী থেকে। গগনের শশুর শাশুড়ীও এসেছেন। আত্মীয়স্বজনে বাড়ী ভরতি। আমার শ্বশুরমশায় এখন একটু ভালো আছেন। অনুর ইতিহাসটা সম্ভবত গগন তার বৌ চম্পার কাছ থেকে শুনেছে। শোনবামাত্র তার আর্য-রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার বিশ্বাস ওই সুব্রতকেও উত্তেজিত করেছে। বাড়ীর আর কেউ এ খবর জানে না আমিও তো জানতাম না, এখনই শুনলাম। কুমারও বোধহয় আপনি আসার পর শুনেছে। আপনি জিগ্যেস করছিলেন আমরা একটা নার্সকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন। খুবই সংগত প্রশ্ন। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন আমাদের মাথাই একটু ঘর্মপ্রবণ, মানে আজব ধরনের। কখন পট্ করে যে কি কারণে ঘেমে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না। এ অঞ্চলের সবাই জানে আমরা খামখেয়ালি, একগুঁয়ে। আর শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন তা সত্ত্বেও সবাই আমাদের খাতির করে খুব। এ অঞ্চলের যত অফিসার, যত জমিদার, যত ধনী লোক সবাই শ্বশুরমশাইকে ভক্তি করে। গরীবরা এদের বলে 'মাই বাপ'। আজই সকালে এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। সবাই এ বাড়ীর আপন লোক। তাই অনুপমাও এদের আপন লোক হয়ে গেছে অনায়াসে। তার জন্যে they will fight tooth and nail, move heaven and earth. আপনি যদি বিয়ে করতে রাজী না হন সহজে রেহাই পাবেন না। তাই বলছি আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখুন।"

"বেশ তবে তাই হোক।"

সুপর্ণ সিংহ হাত দুইটি উলটাইয়া ঈষৎ হাসিয়া এমন একটা ভাব প্রকাশ করিলেন যেন অযৌক্তিক জানিয়াও তিনি নিতান্ত ভদ্রতাবশে তাঁহাদের এই অসংগত আবদারটা রক্ষা করিতেছেন।

"গুড, ভেরি গুড"—কৃষ্ণকান্ত সানন্দে বলিয়া উঠিলেন। "আজ রাত্রেই লাগিয়ে দেওয়া যাক তাহলে—কি বলুন।"

"আজ রাত্রে থাক। আপনাদের আর একটা অনুরোধও করব। বেশী লোকজন যেন জানতে না পারে—"

"কেউ জানতে পারবে না। গগন, কুমার, সুব্রত আর আমি ছাড়া আর কাউকে জানাবার দরকার নেই।"

"পুরোহিত ?"

"আমিই হব। দু'একটা বিয়ে আমি দিয়েওছি ইতিপূর্বে। বইটাও অবশ্য এব দেখে নিতে হবে, তা সে কুমার যোগাড় করে দিতে পারবে। শালগ্রাম শিলাও একটা। সেটাও কুমার ব্যবস্থা করবে। ওই হচ্ছে এ বাড়ীর দক্ষিণহস্ত। অদ্ভুত ছেলে চলুন শুভসংবাদটা ওকে দেওয়া যাক—"

দুইজনে বাহি নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল কুমার আসিতেছে। তাহার মুখ উদ্ভাসিত। তাহার পিছু পিছু আসিতেছে সর্বাঙ্গ-সিক্ত একটা ছোঁড়া।

"জামাইবাবু, কুমীরটা যদিও এখনও ভেসে ওঠেনি, কিন্তু ওর গায়ে গুলি লেগেছে ঠিক।"

"কি করে জানলে—"

"ফাগুয়া সাঁতরে গিয়ে দেখে এল। জল লালে লাল হয়ে গেছে।"

ফাগুয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আগাইয়া আসিল এবং সামনের সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া বলিল—"হঁা বাবু, পানি একদম লাল সুরুক ছে।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ছোঁড়াটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ মহ কে।"

"ভজুয়া বলে আমাদের একটা চাকর ছিল এ তারই নাতি। এ এখন প্রিয়গোপালদের গরু চরায়। নদীর ধারে গরু চরাচ্ছিল. ওকে বললুম তোকে দু'আনা পয়সা সাঁতরে দেখে আয় নদীর জল লাল হয়েছে কি না।"

কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিলেন।

"আমি ওকে পয়সা দিয়ে দিয়েছি।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার মতে খুব কম দিয়েছ। এমন একজন মহাপুরু জীবনের দাম দু'আনার চেয়ে অনেক বেশী। মহাপুরুষ ছাড়া অমন নির্ভয়ে এব আহত কুমীরের কাছে কেউ যেতে পারত না।"

কৃষ্ণকান্ত ফাগুয়াকে একটি দশ টাকার নোট দিলেন। ফাগুয়া হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত, তাহার পর যখন বুঝিতে পারিল যে ইহা স্বপ্ন নয় সত্য, তখন ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"তুই নদীর ধারেই থাকবি তো ? একটু লক্ষ্য রাখিস, কুমীরটা ভেসে উঠলেই দিবি, বুঝলি ?"

ফাগুয়া সানন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে নদীর তীরে সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে। বলিয়া একছুটে চলিয়া গেল। একটু দূর গিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল— "এ গে মাইও—।"

কুমার হাসিয়া বলিল, "ওর মা পাশের ক্ষেতে ঘাস কাটছে, তাকেই টাকাটা দিতে গেল। যাক কুমীরটার ভবলীলা এতদিন পরে সাঙ্গ হলো। আমি দুবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। মাত্র নাকের ডগাটুকু ভেসে থাকে তো, লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত।"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "আর একটা লক্ষ্যও ভেদ করেছি। ইনি বিয়ে করতে

রাজী হয়ে গেছেন। আজ হবে না, কাল হবে। এঁর একটা অনুরোধ আমরা চারজন ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ যেন না জানতে পারে।"

"পুরুত আর নাপিত চাই—"

"পুরুতের কাজ আমি করব। নাপিতের কাজটা না হয় তুমি কর। মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এ তো শাস্ত্রেরই বিধান। তাছাড়া নাপিতের দরকারই বা কি। Safety razor আর nail cutter তো রয়েছে। আচ্ছা, সে সব বাড়ী গিয়ে পরামর্শ করা যাবে। আমি সেই ভোরে বেরিয়েছি, তোমার দিদি এতক্ষণে হয়তো হাঙ্গার স্ট্রাইক করে বসে আছে। চল আর দেরি করা ঠিক নয়।"

তিনজনেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

॥ ২৯ ॥

নিস্তব্ধ অপরাহ্ন। একটু আগে খাওয়াদাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। এই সময়টা সকলেই একটু বিশ্রাম করে। সূর্যসুন্দরও চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। আজকাল তিনি প্রায়ই চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম হয় না। তিনি ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন এই অসুখই তাঁহার জীবনের শেষ অসুখ। তাঁহার পক্ষাঘাত আর সারিবে না। কাহাকেও তিনি জানিতে দেন না যদিও, তবু নিরন্তর মনে মনে তিনি একটি প্রার্থনাই করিতেছেন, ভগবান এবার আমাকে মুক্তি দাও। এভাবে বেশী দিন আর পরাধীন করিয়া রাখিও না। পরাধীন হইয়া এত লোকের সেবা আমি ভোগ করিতেছি, এত লোক সাগ্রহে আমার খবর লইতেছে, আমার সামান্য কষ্ট দূর করিবার জন্য এত লোক ব্যগ্র—ইহাও একটা সুখ বটে। অসুখ হইয়াছে বলিয়াই আত্মীয়স্বজন সবাই ভিড় করিয়া আসিয়াছে, ইহাও কম আনন্দের কথা নয়। কিন্তু তিনি জানেন এ সুখ এ আনন্দ বেশী দিন থাকিবে না, একটু পরেই অনিবার্যভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকা নামিয়া আসিবে। হঠাৎ তাঁহার জগদল পাঁড়ের কথা মনে পড়িল। জগদল পাঁড়েরও পক্ষাঘাত হইয়াছিল। তাহার পক্ষাঘাতের খবর পাইয়া তাহারও পুত্র কন্যা আত্মীয়-স্বজনরা আসিয়া তাহার বাড়ীতে ভিড় করিয়াছিল দিন কতক। তিনি যখন তাহাকে চিকিৎসা করিতে যান তখন তাহার বাড়ীতে বিরাট হৈ হৈ কাণ্ড। কিন্তু কিছুদিন পরে সব থামিয়া গেল। সবাই চলিয়া গেল, বাড়ীতে রহিল কেবল তাহার তৃতীয়পক্ষের যুবতী স্ত্রী। তিনি জগদলকে বুড়াবয়সে বিবাহ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। জগদল বলিয়াছিল—ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে মেয়েরা কেহ এখানে থাকে না, সবাই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। আমার অসুখ হইলে আমাকে দেখিবে কে? এক ঘটি জল আগাইয়া দিবার মতো লোকও তো বাড়ীতে নাই। তাই, নিরুপায় হইয়া বিবাহ করিতেছি। কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত তাহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী সুমিত্রা তাহার কোনও কাজে লাগিল না। সে তাহার বিছানায় তো বসিতই না, ঘরেও কম ঢুকিত। ঘরে ঢুকিবার আগে একটা চাকরকে দিয়া প্রথমে ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিত, তাহার পর নাকে কাপড় দিয়া ঢুকিত। জগদলকে সেবা করিয়াছিল তাহার বৃদ্ধ চাকর ছোনু সিং আর এতবারিয়া মেথর। সে দুইবেলা আসিয়া জগদলের মলমূত্রমাখা কাপড় বিছানা বদলাইয়া দিয়া যাইত। এতবারিয়া যতক্ষণ না আসিত ততক্ষণ মলমূত্র মাখিয়াই পড়িয়া থাকিতে

হইত জগদ্দলকে। সে তারস্বরে চীৎকার করিত, অশ্রাব্য ভাষায় স্ত্রীকে গালাগালি দিত, কিন্তু সুমিত্রা তাহার কাছে আসিত না। অনেকের ধারণা ছিল সুমিত্রা চরিত্রহীনা। জগদ্দলের কামতের বলিষ্ঠ চাকর মুন্সীর সহিত তাহার নাম জড়াইয়া অনেকে তাহার দুর্নাম রটাইত। একদিন সূর্যসুন্দর গিয়া দেখিয়াছিলেন জগদ্দল মলমূত্র মাখিয়া শুইয়া শুইয়া চীৎকার করিতেছে, কাছে কেহ নাই। বাহিরে গিয়া দেখিলেন সুমিত্রা একটি শৌখিন শাড়ি পরিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতেছে। সূর্যসুন্দর তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, মেথরের কাজ কখনও করি নাই। আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আমি ওই সব ময়লা স্পর্শ করিতে পারিব না। উহার ঘরে ঢুকিলেই আমার 'ওকি' (বমি) আসে। আপনি এতবারিয়া মেথরকে বলুন সে দিন রাত এখানে আসিয়া থাকুক। আমার জেবর (গহনা) বিক্রয় করিয়া আমি তাহার বেতন দিব। সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ছোনু সিং কোথা। সুমিত্রা বলিল, তাহাদের শত্রুপক্ষ রাবণ মিশির তাহাদের সমস্ত মহিষগুলিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে হাঁকাইয়া লইয়া গিয়া আড়গড়ায় (খোঁয়াড়ে) দিয়া আসিয়াছে। ছোনু সিং সেই মহিষগুলি ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছে। সূর্যসুন্দর নিজেই সেই জগদ্দল পাঁড়েকে যতটা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। জগদ্দলকে তিন বৎসর এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর একটা কৌতূহলজনক ঘটনাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িয়া গেল। জগদ্দলের মৃত্যুর পূর্বেই সুমিত্রার মৃত্যু হইয়াছিল। 'বউ-খেকো' জগদ্দল তাহাকেও ছাড়ে নাই। হঠাৎ কলেরা হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ইহলীলা সংবরণ করে। জগদ্দলকে সূর্যসুন্দর চেষ্টাচরিত্র করিয়া পূর্ণিয়া সদর হাসপাতালে ভরতি করাইয়া দেন। সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয়। সূর্যসুন্দর জানিতেন জগদ্দলের মতো শোচনীয় অবস্থায় তিনি কখনও পড়িবেন না, তবু তাঁহার ভয় হইল। আবার তাঁহার মনে হইল, এবার তো গেলেই হয়, সকলের সহিতই তো দেখা হইয়া গেল। সকলেই তো আসিয়াছে, এমন কি পৃথ্বীশও। জীবনের সমস্ত কামনা কাহারও কখনও পূর্ণ হয় না, তাঁহারও হয় নাই। কিন্তু যতটুকু হইয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট নয়, তাহাই বা কয়জনের হয়। তাঁহাকে যে এত লোক ভালোবাসে এই ধারণাটা অটুট থাকিতে থাকিতেই তো বিদায় লওয়া ভালো।

"বৌমা—"

ঊর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল।

"কি বাবা।"

"নিখিলবাবু তখন দিগন্তর লেখা যে খাতাটা দিয়ে গেলেন সেটা কোথায় রেখেছ—"

"এই যে এখানেই আছে।"

"কোন্ কোন্ গ্রাম থেকে কারা কারা এসেছিল তাদের নামগুলো পড়ে যাও তো।"

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে পড়িতে লাগিল।

দিয়াড়া—রহমতুল্লা, কাজি রমজান, মিঞাজান, জনাব আলী। কাজিগ্রাম—শিবু মিস্ত্রী, খেতু পাঠক, গহর, গহরের মা, বিলাতি মণ্ডল। মেদিনীপুর—নগেন মোয়ার, সুরেন মোয়ার, জিতু মণ্ডল, যোগেশ সাহা, বসন্ত সাহা। দিলারপুর—গোপী চৌধুরী,

সুবাদার সিং, শেখাওৎ আলী। মাদারিচক—বিশ্বেশ্বর সিং, দেবেন সিং, কুলাই মণ্ডল, খেতরা, মিনিয়া, সরবতিয়া। পাটনী—সুবাতালী তহশিলদার, রেয়াজৎ আলী, সরফুদ্দিন আরসদ আলী। হাঁসুয়ার বোচন মিশির, ভগ্‌গু মাঝি, বুধলাল। দোশাদ পাড়ার ভাগিয়া, লেংড়া, বোধিয়া, মাদারি—ইহাদের বউ ছেলেমেয়েরা। নবাবগঞ্জের বুতুত্ বাবু ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা, প্রিয়লাল সিং, মাধব রায়, গোবিন্দ মণ্ডল। বৈরিয়া—মোফিল, শোফিল, আবিদ, মকুই মণ্ডল, শনিচরা মাঝি ও তাহার দলের প্রায় শতাধিক সাঁওতাল সাঁওতালনী। আমদাবাদ—যোগীন সাহা, বিছন মাঝি, কলাবতী, বেদবতী, নিরঞ্জন ঝা, বিরোচন ঝা, রামজোরাবর সিং, বোরা মহাবীর···

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে পড়িয়া যাইতেছিল। সূর্যসুন্দর সাগ্রহে শুনিতেছিলেন। তাঁহার চোখের সামনে বিরাট একটা মিছিল চলিয়াছিল যেন, নানা বয়সের নানা জাতের নর নারীর মিছিল—ইহাদের কেন্দ্র করিয়াই এতদিন তাঁহার এই নশ্বর জীবন আবর্তিত হইয়াছে। আশ্চর্য, এত লোক তাঁহাকে ভালোবাসিত! অথচ, ইহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে! বোরা মহাবীর নামটা শুনিয়া তাঁহার মনে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ একটা লোকের ছবি ফুটিয়া উঠিল। এখন মহাবীর যদিও বুড়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এককালে সে বেশ বলিষ্ঠ ছিল। খুব খাইতে পারিত। তাহার বোরা মহাবীর নামটার একটা ইতিহাস আছে। 'সার' বা 'রায়বাহাদুর' উপাধির ন্যায় 'বোরা' উপাধিটাও মহাবীর সগর্বে তাহার নামের পূর্বে ব্যবহার করে। একবার গঙ্গার চরে একটা নৌকা আটকাইয়া গিয়াছিল। ভীষণ দুর্যোগের জন্য মাঝি নৌকা খুলিতে সাহস করে নাই। নৌকাতে ছিল মহাবীর এবং একটা বুড়ী মুড়িওয়ালী। মুড়িওয়ালীর সঙ্গে একবোরা মুড়ি ছিল। ক্ষুধিত মহাবীর নাকি সেই একবোরা মুড়ি নিঃশেষ করিয়া বোরা উপাধিটি অর্জন করে। বোরা মহাবীরের আর একটা গল্পও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। কিরণের তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, নূতন জামাই কৃষ্ণকান্ত প্রথম আসিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত মাংস ভালোবাসে, কিন্তু তখন গ্রামে কোন কসাই ছিল না সুতরাং মাংস পাওয়া দুষ্কর হইল। ফরিদ বলিয়া একটা চাকর ছিল, সে বলিল যদি খাসি একটা যোগাড় হয় সে কাটিয়া সব ঠিক করিয়া দিতে পারে। কিন্তু খাসিও পাওয়া গেল না। বীরু তখন বোরা মহাবীরকে গিয়া বলিয়াছিল যে জামাইবাবুকে মাংস খাওয়াইতে না পারিলে আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। অবিলম্বে ইহার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বোরা মহাবীর অবিলম্বেই ইহার ব্যবস্থা করিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বেশ বড় একটা খাসির কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া হাজির করিল। বীরু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কাহার খাসি কত দাম দিতে হইবে বল। বোরা মহাবীর নাকি উত্তর দিয়াছিল—আমি সে সব জানি না। মাঠে খাসিটা চরিতেছিল ধরিয়া আনিলাম। তোমরা কাটিয়া ফেল! তাহার পর খাসির মালিক আসিলে তাহার সহিত দরদস্তুর করা যাইবে। সূর্যসুন্দর এসব কিছুই জানিতেন না। কিন্তু একটু পরেই যখন তুরীটোলার ঢোঁঙয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে আসিয়া হাজির হইল এবং বলিতে লাগিল যে বোরা মহাবীর তাহার খাসিটা লুট করিয়া আনিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে তখন ব্যাপারটা আর গোপন রাখা গেল না। বোরা মহাবীর বলিল, ও তো খাসি বেচিবার জন্যই পুষিয়াছে, আর একটু বড় করিয়া বেচিলে হয়তো দু'পয়সা বেশী পাইত। বাজারে ও খাসির দাম এক টাকার বেশী নয়, যাই হোক আমরা উহাকে দেড়

টাকা দিব। সূর্যসুন্দর বলিলেন, না, তাহা হয় না। তোমরা যখন উহার বিনা অনুমতিতে খাসিটা কাটিয়াছ তখন ও যে দাম চাহিবে তাহাই তোমাদিগকে দিতে হইবে। ঢোঁড়য়া পাঁচ টাকা দাম চাহিল এবং সূর্যসুন্দর তাহাকে পাঁচ টাকাই দিয়া কলে বাহির হইয়া গেলেন। ইহার পর বোরা মহাবীর নাকি যাহা করিয়াছিল তাহা আরও অদ্ভুত। তাহার মাথায় যে গামছাটা পাগড়ির মতো বাঁধা থাকিত সেটা হঠাৎ খুলিয়া নিজের দুই চোখে বাঁধিয়া সেনাকি ঢোঁড়য়াকে বলিয়াছিল, তুই আমার চোখের সামনে আর থাকিস না। টাকা পাইয়াছিস, চলিয়া যা। আমি আর তোর মুখ দেখিব না। যে কিরুণিকে (কিরণকে) তুই কোলে করিয়া খেলাইয়াছিস তাহারই দুলহার (বর) জন্য তোর খাসিটা আমরা কাটিয়াছি আর সেই খাসির দাম তুই পাঁচ টাকা লইলি! আর তোর মুখ দেখিব না, তুই যক্ষিন (যক্ষিণী) তুই পিশাচীন (পিশাচিনী)। তখন ঢোঁড়য়া গালে হাত দিয়া বলিল কিরুণির দুলহার জন্য খাসি কাটা হইয়াছে, এ কথা তাহাকে তো কেহ বলে নাই। তাই যদি হয় সে খাসির দাম লইবে না। এই বলিয়া টাকা পাঁচটা ঝনঝন করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল সে। কিন্তু মহাবীর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমরা থুতু ফেলিয়া আবার সেটা চাটিয়া লই না। ডাক্তারবাবু ও টাকা আর কিছুতেই ফেরৎ লইবেন না। তোর সত্যই যদি আক্কিল (আক্কেল) জাগিয়া থাকে তাহা হইলে কিরুণির দুলহার জন্য তুই ওই পাঁচ টাকার ভালো মিষ্টান্ন কিনিয়া পাঠাইয়া দে! ও টাকা আমরা ছুঁইব না। ঢোঁড়য়া তাহার পর দিন সত্যই পাঁচ টাকার টিকরি (বালুসাই) কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। বোরা মহাবীরও প্রত্যুত্তর দিয়াছিল ইহার। পরের রবিবারের হাটে ঢোঁড়য়াকে একখানা খুব সৌখিন পাছা-পাড় শাড়ি কিনিয়া দিয়াছিল সে। বোরা মহাবীর নামটার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মনের ঘুড়ি অতীতের আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ তাঁহার কানে গেল ঊর্মিলা পড়িয়া চলিয়াছে—ভালুকা—গোরাকিশোর চৌবে, হরদৎ সিং, ভোলা রায়…। মনে হইল একটা মৌমাছি যেন গুন গুন করিয়া চলিয়াছে।

"আর কত আছে?"

"এখনও পনের পাতা আছে।"

"থাক আর পড়তে হবে না।"

সূর্যসুন্দর মনে মনে একটা ছবি দেখিতেছিলেন, একটা বিরাট মেলার মাঝখানে তিনি যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, সকলেই তাঁহার চেনা, সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া হাসিমুখে নমস্কার করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মনে হইতেছে আর একজন অতি-চেনা যেন মেলায় হারাইয়া গিয়াছে, সে যে কে তাহাও তাঁহার ঠিক মনে পড়িতেছে না, অথচ ইহাও মনে হইতেছে তাহাকে না পাইলে এই মেলার আনন্দ বৃথা, মেলাও বৃথা। কে সে? রাজলক্ষ্মী কি? না রাজলক্ষ্মী তো কখনও এমনভাবে মেলার মধ্যে আসে নাই। মেলার মধ্যে তাহাকে সূর্যসুন্দর কোনদিন তো প্রত্যাশা করেন নাই। যেখানে তাহাকে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন সেখানে সে তো অক্ষুণ্ণ মহিমায় আজও বিরাজ করিতেছে। না, মেলার মধ্যে তিনি আর একজনকে খুঁজিতেছেন, সে কে? প্রশ্নটা যেন রহস্যাবৃত কুয়াসার রূপ ধরিয়া তাঁহার মনের দিগন্তে প্রহেলিকার মতো সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"আমাদের এবার বিদায় দিন—"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া দেখিলেন গগনের শ্বশুর শাশুড়ী দাঁড়াইয়া আছেন। গগনের শাশুড়ী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা এইবার যাচ্ছি। তাই আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম। খুব আনন্দ পেয়ে গেলাম এখানে এসে। এ যুগে আপনারা যে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না।"

গগনের শ্বশুরও প্রণাম করিলেন।

তাহার পর ইংরাজীতে বলিলেন, "Really we are proud to see that you are an uncrowned king here. এতটা দেখব প্রত্যাশা করিনি। চম্পার জন্যে আমাদের মনে একটু অস্বস্তি ছিল, এ পাড়াগাঁয়ে তার ঠিকমতো ব্যবস্থা হবে কি না এ নিয়ে আমার স্ত্রী বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের ব্যবস্থা দেখে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি আমরা।—আমার স্ত্রী অবশ্য এখনও একটু খুঁতখুঁত করছেন, ব্লাডপ্রেসার মাপবার যন্ত্রটা মাঝে খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা—"

গগনের শাশুড়ী খুকীর মতো কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখে দিয়া বলিলেন, "আমি ভারি ভীতু। আমার সর্বদাই ভয় করে, কখন কি হয়ে যাবে—"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা এত শিগগির যাচ্ছেন কেন। ট্রেনের তো এখনও অনেক দেরি—"

গগনের শাশুড়ী বলিলেন, "আমি যে তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে পারি না আমার প্যালপিটেশনের ব্যারাম আছে। নিখিলবাবু তাই বললেন আপনারা তাহলে একটু আগে থাকতে ঘাটে চলে যান। সেখানে খালি স্টীমারে গুছিয়ে বসে থাকুন। তাই আমরা পালকি করেই ঘাটে যাচ্ছি একটু আগে থাকতে—। খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম এখানে। চম্পার খবরটা আমরা রোজ যেন পাই, একটু বলে দেবেন গগনকে।"

"আচ্ছা।"

তাঁহারা নিখুঁত সৌজন্যসূচক হাসি মুখে ফুটাইয়া পুনরায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। সূর্যসুন্দরের মনে হইল এইবার চলিয়া যাইবার পালা শুরু হইল।

॥ ৩০ ॥

রাত্রি কত হইয়াছে তাহা সুপর্ণ সিংহ আন্দাজ করিতে পারিলেন না, কারণ তাঁহার হাত-ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঘড়িটিতে দম দিতে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কুমার তাঁহাকে সুব্রতর বন্ধু হিসাবে বাড়ীতে আনিয়াছিল। তাঁহার অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। তবু অপমানে ক্ষোভে তাঁহার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল। অনুপমা তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনিয়াছে জোর করিয়া বিবাহ করিবে বলিয়া? অনুপমা চরিত্রের এদিকটা তাঁহার জানা ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল অনুপমা অত্যন্ত লাজুক, অত্যন্ত ভীতু। সে যে এমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনাই করিতে পারেন নাই। ইহার তাঁহার মনে পড়িল যে বাবলুর যখন জন্ম হয় তখন অনুপমা তাঁহাকে লিখিয়াছিল যে সে তাঁহাকে স্বামী কল্পনা করিয়াই মাথায়

সিঁদুর পরিয়াছে এবং হাসপাতালে স্বামী বলিয়া তাঁহারই নাম লিখাইয়াছে। সুপর্ণ সিংহ এ চিঠি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই। কল্পনার স্বর্গে অনুপমা যদি সতী সাজিয়া থাকিতে চায়, থাক না, তিনি আপত্তি করিবেন কেন। কিন্তু আজ হঠাৎ এ কি বিষম পরিস্থিতিতে পড়িয়া গেলেন তিনি! অবশ্য যে বড়লোকের মেয়েটির মোহে পড়িয়া তিনি অনুপমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সে-ও তাঁহাকে ছাড়িয়া বহুদিন আগে জাপানে চলিয়া গিয়ছে। সেখানে সে একজন ধনী জাপানীকে বিবাহ করিয়া ওদেশেই বসবাস করিতেছে। সুপর্ণ সিংহের হৃদয়সিংহাসন এখন খালি, অনুপমা সেখানে এখন অনায়াসেই আরোহণ করিতে পারে, হয়তো তিনি শেষ পর্যন্ত অনুপমাকে খবরও দিতেন, কিন্তু অনুপমা এ কি করিয়া বসিল! সে কি ভাবিয়াছে জোর করিয়া তাহাকে এভাবে আটকাইয়া ফেলিবে? সুব্রতবাবু তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা খুব ভদ্র চিঠি। তাহাতে ছিল একটি বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে এখানে আসিতে হইবে। ভয়ের কোনও কারণ নাই। না আসিলেই বরং বিপদ হইবার সম্ভাবনা। সুপর্ণবাবু স্থানীয় একটি কো-অপারেটিভের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে কিছু টাকার গোলমাল হইয়াছিল এবং অডিটার এজন্য তাঁহাকেই দায়ী করিয়াছিলেন। অডিটারের সহিত সুব্রতবাবুর আলাপ ছিল। তাই তাঁহার মনে হইয়াছিল সুব্রতবাবু সম্ভবতঃ ওই ব্যাপারের জন্যই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিয়া একটি ওয়ারেন্টও আনাইয়া লইয়াছেন তাহা তিনি জানিতেন না। এখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন সবটাই অনুপমার চক্রান্ত। কৃষ্ণকান্তবাবুই ঠিক পরামর্শ দিয়াছেন মোগলের হাতে যখন পড়া গিয়াছে তখন তাহার সাথে খানা খাইতেই হইবে। তাহার পর নিরাপদ দূরত্বে গিয়া গলায় আঙুল দিয়া খানাটা বমি করিয়া দিলেও চলিবে। তখন আর বাধা দিবে কে। সুপর্ণ সিংহ কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঝিল্লীধ্বনি, মাঝে মাঝে দুই একটা পেচকও ডাকিতেছে। মানুষের কোনও সাড়াশব্দ নাই। কত রাত হইয়াছে কে জানে। অনুপমা নাকি নিকটে একটা তাঁবুতে থাকে। গগনবাবু বলিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত এখনই দেখা হইবে। কিন্তু কই? কাহারও তো সাড়াশব্দ পর্যন্ত নাই। সুপর্ণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল নিজেই যদি অনুপমার তাঁবুটা কোথায় খোঁজ করি, তাহাতে ক্ষতি কি। নিজেই যদি যাই অশোভন হইবে কি? এমনভাবে চুপচাপ একা বসিয়া থাকাও তো অসম্ভব। কপাটটা খুলিয়া বারান্দায় তো বাহির হওয়া যাক। কপাটের খিলটা খুলিয়াই কিন্তু তাঁহাকে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। কপাট বাহির হইতে বন্ধ! তবে কি তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে? কপাটটা ধরিয়া টানাটানি করিলেন, তাহার পর তাহাতে লাথি মারিলেন একটা। বারান্দায় ল্যাংল্যাং ঘুমাইতেছিল। ঘুম ভাঙিয়া সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সুপর্ণ সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর গিয়া বিছানায় বসিলেন, তিনি বুঝিলেন এ অবস্থায় চীৎকার চেঁচামেচি করাটা সুবুদ্ধির কাজ হইবে না। তিনি নীরবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। ল্যাংল্যাং সমানে ডাকিতেই লাগিল। একটু পরে ছুঁচাকিও আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহার পর কাহার যেন তাড়া খাইয়া তাহারা ডাকিতে ডাকিতে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কপাট খুলিল প্রায় এক ঘন্টা পরে। কপাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অনুপমা নয় গগন।

"মাপ করবেন, আমি কপাটে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলাম। আপনাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। অনুপমাকে আমরা সব খুলে বলেছি। সে বলছে আপনার যখন বিয়ে করবার মোটেই ইচ্ছে নেই, তখন প্যাঁচে ফেলে সে আপনাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে না। আপনার মনের ভাবটা কি তাই জানবার জন্যে সে আপনাকে এখানে আনিয়েছিল। আপনি আপনার মনের ভাব গোপন করেন নি বলে সে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে, আর সেই জন্যে সে আপনার সঙ্গে আর দেখা করতেও চাইছে না। তবে একটা জিনিস সে চাইছে। সে বলছে—আপনি আমাদের ক'জনকে সাক্ষী রেখে একটা কাগজ লিখে সই করে স্বীকার করুন যে আপনি বাবুলের বাবা। বাবুল মাঝে মাঝে তার বাবার কথা জিগ্যেস করে। অনুপমা তাকে এতদিন বলে এসেছে তোমার বাবা বিদেশ গেছেন, ফিরে এলে তোমার কাছে আসবেন। তাই অনুপমা এ অনুরোধও জানিয়েছে যে তিনি যদি মাঝে মাঝে এসে বাবুলের সঙ্গে দেখা করেন তাহলেই তার আর কোন নালিশ থাকবে না।"

সুপর্ণ সিংহ বলিলেন, "তারপর?"

"এসব যদি করতে রাজী থাকেন তাহলেই আপনার ছুটি। অনুপমা আপনাকে ছেড়ে দিতে বলেছে—"

"আমাকে কি লিখতে হবে—?"

"এই যে অনু সেটা ছকে দিয়েছে—"

গগন পকেট থেকে একটা শক্ত নীল রঙের কাগজ বাহির করিয়া দিল। সুপর্ণ সিংহ দেখিলেন তাহাতে গোটা গোটা অক্ষরে এই কথাগুলি লেখা রহিয়াছে:—আমি এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমতী অনুপমা বসু আমার ধর্মপত্নী এবং বাবুল আমারই পুত্র। আমরা পরস্পরের ইচ্ছা অনুসারেই এখন পৃথক জীবন যাপন করিতেছি।

সুপর্ণ সিংহ খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "অনুপমার সঙ্গে তো আমার বিয়ে হয়নি। তাকে আমি ধর্মপত্নী বলে কি করে স্বীকার করব?"

"আমাদের শাস্ত্রে অনেকরকম বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহও ধর্মবিবাহ, দুই পক্ষের যদি তাতে সম্মতি থাকে। দুষ্মন্ত শকুন্তলারও এই ব্যাপার হয়েছিল। আশা করি পৌরাণিক এ গল্পটা আপনি জানেন। বাবুলের পিতৃত্ব আশা করি আপনি অস্বীকার করেন না।"

"না।"

"তাহলে সই করে দিন।"

গগন পকেট হইতে ফাউণ্টেন পেন বাহির করিয়া সেটা খুলিয়া বাড়াইয়া ধরিল।

"বেশ।"

সুপর্ণ সিংহ সত্যই সহি করিয়া দিলেন।

"গুড"—গগনের মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—"এইবার আমরা এতে সাক্ষী হিসেবে সই করব। আপনি এইখানে যদি একটা লাইন লিখে দেন তাহলে আরও ভালো হয়। লিখে দেন—আমি নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে স্বেচ্ছায় এই স্বীকৃতিপত্রে সহি করিলাম। এর নীচে সুব্রত, ছোটকাকা, বড় জামাইবাবু, আর আমি নাম সই করে দেব।"

সুপর্ণ সিংহ ইহাতেও আর আপত্তি করিলেন না। গগন যাহা বলিল তাহা লিখিয়া দিলেন তিনি। গগন কাগজটি আর একবার পড়িল, তাহার পর বলিল, "বাস্, এইবার আপনার ছুটি। You may go wherever you like. কাল সকালেই ওপারে যাওয়ার জাহাজ পাবেন। সুব্রত কাল আপনার ফিরবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে।"

গগন কাগজটি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল সুপর্ণ সিংহ বাধা দিলেন। বলিলেন, "একটা কথা দয়া করে বলে যান।"

"কি বলুন।"

"আপনারা অসুখের বাড়ীতে এত সব হাঙ্গামা করতে গেলেন কেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আর কেউ করেনি আমিই করেছি। আমি কখনও অন্যায় সহ্য করতে পারি না। অনুপমার কাহিনীটা আমি জানতাম। সে যখন আমাদের বাড়ীতে এল তখন তার মুখ দেখে বড়ই কষ্ট হতো আমার। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই নাকি সে কাঁদে এ খবরও পেলাম। আমাদের সংসার সুখের সংসার। আমার দাদুর অসুখ সত্ত্বেও রোজ এখানে আনন্দ উথলে পড়ছে চারিদিকে। এর মধ্যে অনুপমাকে কেমন যেন বেমানান মনে হতো। তারপর জানতে পারলুম সুব্রত এখন যে জেলার এস পি. আপনিও নাকি সেখানে আছেন। সুব্রত বলল চেষ্টা করলে সে আপনাকে এখানে আনাতে পারে। অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করলাম সেও সাগ্রহে রাজী হলো। ওর মনে অশান্তির আসল কারণটা ছিল বাবুলকে নিয়ে। আপনি আজ সে কাঁটাটা তুলে দিলেন। ভালই হলো। অনুপমার সঙ্গে আপনার ফর্মাল বিয়েটাও হয়ে যেতে পারত, কিন্তু সব শুনে অনুপমা তাতে রাজী হলো না। হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। অনুপমা বলেছে আপনি যেখানেই থাকুন কখনও যদি অর্থকষ্টে বা অন্য কোনও কষ্টে পড়েন অনুপমাকে স্মরণ করবেন। তাকে খবর দিলেই সে তার ব্যবস্থা করবে। আচ্ছা গুড নাইট।"

গগন চলিয়া গেল।

সুপর্ণ সিংহ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

॥ ৩১ ॥

কুমার রাত্রে বাগানের সেই ছোট বাড়ীটাতেই ছিল। সে প্রত্যাশা করিতেছিল কৃষ্ণকান্ত, সুব্রত এবং গগন সুপর্ণ সিংহ ও অনুপমাকে লইয়া বাগানে আসিবেন এবং সকলে মিলিয়া ঠিক করিবেন কাল বিবাহ কোথায় কিভাবে হইবে। বাড়ীতে তাহার শুইবার স্থানও ছিল না, কারণ সুপর্ণ সিংহকেই সে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়াছিল। একা এই বাগানে সে আগেও অনেক রাত কাটাইয়াছে, বিশেষতঃ আমের সময়। ঘরটির ভিতর একজনের উপযুক্ত সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। খাট, বিছানা, ইজি-চেয়ার, টেবিল, খান দুই টিনের ফোলডিং চেয়ার, টুল, স্টোভ, চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, বন্দুক, একটা পেট্রোম্যাক্স, একটা সাধারণ লণ্ঠন, প্রয়োজনীয় সব জিনিসই ছিল সেখানে।

কুমার রাত্রির খাওয়া শেষ করিয়াই আসিয়াছিল। কেবল সে উর্মিলাকে গোপনে বলিয়া আসিয়াছিল, "এখানে তো শোবার জায়গা নেই। আমি বাগানে শুতে চললাম। যদি কোনও দরকার হয় সেইখানেই খবর দিও। সুব্রতর বন্ধু সুপর্ণবাবু আমার ঘরটাতে শুয়েছেন।" ইহার বেশী সে আর কিছু বলে নাই।

…কুমার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বন্দুকটা খুলিয়া দেখিল সেটা ঠিকমতো 'লোডেড' আছে কি না। টর্চটা একবার জ্বালিল। সব ঠিক আছে। তাহার পর হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল সে। নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া শব্দ হইল—'হুম্ হুম্' তাহার পর আর একটু দূরে হইতে কে যেন প্রত্যুত্তর দিল—'হুম্ হুম্'। কুমারের মুখে একটা সস্নেহ হাসি ফুটিল। একজোড়া হুতোম প্যাঁচা গভীর রাত্রে এই বাগানে আসিয়া আলাপ করে তাহা কুমার জানিত। অনেক দিন পরে তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে আনন্দিত হইল। তাহার পর সে হঠাৎ লক্ষ্য করিল লণ্ঠনের আলোটা কমিয়া যাইতেছে। উঠিয়া নাড়িয়া দেখিল তেল নাই।

"বোধিয়া—"

বোধিয়া চাকরটা বাহিরের বারান্দায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়াছিল।

"জি—"

"লণ্ঠনটায় তেল নেই। তেল ভরে দে। টিনে তেল আছে তো?"

"জি—"

বোধিয়া লণ্ঠনটা ঠিক করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। বোধিয়ার একটা অসাধারণ শক্তি আছে। তাহার ঘুম যত গভীরই হউক না কেন এক ডাকে সে উঠিয়া পড়ে এবং কাজকর্ম সারিয়া আবার শুইলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে। কুমার একটু পরেই তাহার নাসিকা ধ্বনি শুনিতে পাইল। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার শোনা গেল—'হুম হুম'। এবার কুমারের মনে হইল—গুম্ গুম্। মনে হইল কোনও রহস্যময় অন্ধকার দুর্গের চিররুদ্ধ কপাটে কে যেন অধীরভাবে করাঘাত করিতেছে—এ তাহারই শব্দ। কুমার আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কি যেন একটা করিবার ছিল কিন্তু কাজের চাপে করা হয় নাই। তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল। বাবার ডায়েরিটা এখনও শেষ করিতে পারে নাই সে। ডায়েরিটা এখানেই সে রাখিয়া গিয়াছিল। ইহার কথা কাহাকেও সে বলে নাই, কাহাকেও দেখায় নাই। ভয় ছিল জানাজানি হইয়া গেলে সবাই কাড়াকাড়ি করিবে। আগে তাহার পড়া হইয়া যাক তাহার পর সে দাদাকে বলিবে। দাদার হাতেই খাতাটা দিয়া দিবে সে। কারণ দাদাই একদা বাবাকে স্মৃতিকথা লিখিবার জন্য এই খাতাটা দিয়াছিলেন। খাতাটা বাহির করিয়া সে পড়িতে শুরু করিল।

"ইহার পর মামীমার অসুখের কথাটা মনে পড়িতেছে। হঠাৎ একদিন প্রচুর 'হেমারেজ' হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। ভাগলপুর হইতে ডাক্তার আসিল। দুইজন ডাক্তার। একজন সাহেব সিভিল সার্জন এবং আর একজন পাগলা যোগেন। পাগলা যোগেন নামে যে ডাক্তারটি তখন ভাগলপুরে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি সত্যই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। বিলাতফেরত ডাক্তার ছিলেন তিনি। লোকে তাঁহাকে 'পাগলা' আখ্যা দিয়াছিল তাঁহার মহত্ত্বের জন্য। তিনি সেইসব কলেই আগে

যাইতেন যেখানে পয়সা পাওয়া যাইবে না। তাহার পর সময় থাকিলে এবং প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বড়লোকের বাড়ী যাইতেন। আমি যখন তাঁহাকে ডাকিতে গেলাম তখন মফস্বলের আর একটি বড়লোকও তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছিল। কিন্তু পাগলা যোগেন যেই শুনিলেন যে আমি ডাক্তার, আমার মামী অসুস্থ এবং আমার মামাও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী তখনই তিনি সেই বড়লোককে বলিলেন, "আমাকে আজ এখানে যেতে হবে। কারণ এঁরা আমার আত্মীয়। আপনার ওখানে কাল যাব। আজ যেতে পারব না।" বড়লোকটি মনে করিল ফিস বাড়াইয়া দিলে হয়তো তিনি মত পরিবর্তন করিবেন। বলিলেন, "হুজুর, আমি ডবল ফিস দেব। আজই চলুন আমার ওখানে।" পাগলা যোগেন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাহলে আপনার ওখানে আর যাওয়াই হবে না দেখছি। আপনার টাকা বেশী আছে, আপনি কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসুন। আমি বড়লোকের বাড়ী যাই না। আমি গরীবের ডাক্তার।" তিনি আরও কয়েকটি কল প্রত্যাখান করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। সিভিল সার্জন ছাড়া আমাদের সঙ্গে লেডি ডাক্তারও আসিয়াছিলেন একজন। যোগেনবাবুই তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা মামীমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, মামীমার জরায়ুতে (uterus) cancer হইয়াছে। অপারেশন করিলে সারিবে এ আশ্বাসও দেওয়া যায় না, কারণ রোগ বেশ পুরাতন হইয়াছে। মামীমা ওই রোগেই মারা যান। মামীমা যতদিন অসুস্থ ছিলেন ততদিন আমার অন্য কোথাও প্র্যাকটিস করিতে বসার কল্পনাও কেহ করে নাই, আমিই মামীমার সেবার ভার লইয়াছিলাম। পয়সা দিয়াও মামীমাকে সেবা করিবার কোন লোক পাওয়া যায় নাই। পচা ক্যানসার হইতে একটা দুর্গন্ধ বাহির হইত, সে দুর্গন্ধে সমস্ত ঘর এমন কি ঘরের সামনের বারান্দা পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া থাকিত। কেহ সেখানে যাইতে চাহিত না। মামা ছেলেমেয়েদের সেখানে যাইতে দিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল রোগটা ছোঁয়াচে। আমি দিনে তিনবার তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিতাম। জরায়ুর ভিতর হইতে রোজ খানিকটা পচা মাংস ও রক্ত বাহির হইত। আমিই তাহা পরিষ্কার করিয়া 'ড্রেস' করিয়া দিতাম। তাঁহার মলমূত্রও আমাকে পরিষ্কার করিতে হইত। অন্য সময়ে মামার ডিসপেন্সারিতে বসিতাম। সন্ধ্যার সময় থিয়েটারের রিহার্সালে যাইতে হইত। যতদূর মনে পড়িতেছে ইহাই তখন আমার দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল। সীতার বনবাসে রামের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া আমার বেশ সুনাম হইয়াছিল। মামাও নাকি আমার অভিনয় দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা ইহার পরের বই 'আলিবাবা' করিব ঠিক করিয়াছিলাম। একটু হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম বলিয়া আমাকে দস্যুসর্দারের ভূমিকায় সকলে মনোনীত করিয়াছিলেন। এই সব ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলিই তখন আমার জীবনের প্রধান ঘটনা। আজ এগুলিকে কত সামান্য, কত অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছে। এই সময় আমার জীবনের যে প্রধান ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল সে বিষয়ে কিন্তু আমার স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়। যতদূর মনে হয় নরসিং পাঁড়ে নামক একজন ভোজপুর সিপাহী আমাকে বলিয়াছিল যে আপনি যদি গঙ্গার ওপারে মনিহারী গ্রামে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন তাহা হইলে আপনার প্র্যাকটিস ভালো হইবে। আপনার হাত যশ আছে। নরসিং পাঁড়ের ক্রনিক্ ব্রংকাইটিস ছিল। আমার ঔষধ খাইয়া কাসি সারিয়া গিয়াছিল তাহার। সে বলিয়াছিল আমি যদি যাইতে চাই সে

আমাকে বসিবার সাহায্য করিবে। ওপারে 'অংরেজি দাবাই' দিবার কোনও ডাক্তার নাই। ওপারের সকলের জীবন-মরণ কবিরাজদের হাতে। আমার মামার কাছে মাঝে মাঝে ওপারের রোগী আসে। সেই সূত্রে ওপারের দেওয়ানজির সহিত মামার বেশ খাতির আছে। মামা যদি দেওয়ানজিকে একটা চিঠি লিখিয়া দেন তাহা হইলে তো কোন ভাবনাই থাকিবে না। দেওয়ানজি থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। দেওয়ানজি নিজে অবশ্য 'অংরেজি দাবাই' করেন না—নীলকণ্ঠ মিশির নামক কবিরাজের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তবু মামার চিঠি লইয়া গেলে কাজ হইবে। আমি তখন অসুস্থ মামীমাকে লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাই এ বিষয়ে তেমন গা করি নাই। ছয় মাস নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া মামীমা মারা গেলেন। মরিবার আগে তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, যদিও তোমাকে পেটে ধরিনি, কিন্তু তুমিই বাবা আমার ছেলের কাজ করেছ। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজরাজেশ্বর হবে। আমি নিশ্চিন্তে মরছি, সুশীলা আর কুসুমের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দুটো ছোট, ভগবানই ওদের রক্ষা করবেন।" মামার পদধূলি মাথায় দিয়া হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গোদক পান করিয়া সজ্ঞানে তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুর আশ্চর্য মহিমা। মামীমা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার প্রতি আমার একটা বিরূপ মনোভাব ছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরূপতা অন্তর্হিত হইয়া গেল। মনে হইল আমি যেন দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হইলাম। মামার ছেলেমেয়েরা আমাকেই ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আমাকে দাদা বলিত, দাদার সম্মান ও ভালোবাসা দিতে তাহারা কোনদিন কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু তবু একটু যেন পার্থক্য ছিল। আমি যে মাতৃহীন, আমি যে মামার বাড়ীতে অনুগৃহীত পোষ্যমাত্র আমার নিজের মনে এই ভাবটা ছিল বলিয়া আমি এতদিন প্রসন্নমনে তাহাদের ভালোবাসার অর্ঘ্য লইতে পারি নাই। মামীমার মৃত্যুর পর আমার মনের সে ভাবটা কাটিয়া গেল, মনে হইল উহারাও আজ মাতৃহীন, উহারাও আজ আমারই মতো অসহায়, এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে উহারাও আজ আমার নৌকায় আসিয়া উঠিয়াছে। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব এখন আমারই। ভগবান জানেন, আমার এ দায়িত্ব পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। না পারিবার প্রধান কারণ আমি আইনতঃ উহাদের অভিভাবক ছিলাম না। এসব বিষয়ে আমার পরামর্শ মামা কখনও শোনেন নাই। মামীমাই যে মামার ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর বোঝা গেল। মামার সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার পর হইতেই ক্রমশঃ মামার ভাগ্যোদয় হয়। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন মামার উন্নতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই অবনতি শুরু হইল। মৃত্যুর মাস দুই পরেই শুনিলাম মামার নুনের ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান হইয়াছে। বাঙালীদের অনেক ব্যবসায়ে লোকসান হইতে দেখিয়াছি। বস্তুতঃ, বাঙালী ব্যবসায়ী একটানা ব্যবসা করিয়া জীবনে উন্নতি করিয়াছেন, এরকম উদাহরণ আমার জানা-শোনার মধ্যে বড় একটা নাই। অল্প মূলধন লইয়া যাহাদের ব্যবসা করিতে হয় তাহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি সদগুণ থাকা প্রয়োজন যাহা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে। সাধারণতঃ যে সব বখা বাঙালী ছোকরা অন্য অন্য সব ক্ষেত্রে বিফলমনোরথ হইয়া ব্যবসার নামে প্রহসন করে তাহাদের উন্নতি হইলেই আশ্চর্য বোধ করিতাম। মামার কিন্তু মূলধন

অল্প ছিল না, মামার চারিত্রিক গুণও অনেক ছিল, কিন্তু মামা ব্যবসার কিছু দেখিতেন না। তাঁহার ব্যাপারীদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তিনি। দুই নৌকায় একসঙ্গে পা দিয়া চলা শক্ত। মামা ভাবিয়াছিলেন ডাক্তারি করিতে করিতে ফাঁকতালে ব্যবসা করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি ব্যবসায়ের হিসাবপত্র দেখিবার সময় পাইতেন না, আমার মনে হয় ব্যবসার বিশেষ কিছু বুঝিতেনও না। তাই যাহা কিছু হইয়াছিল তাহা কর্মচারীদের পেটেই গেল। মামা তখনই যদি ব্যবসা উঠাইয়া দিতেন তাহা হইলে ব্যাপারটা চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না, করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল ব্যবসা উঠাইয়া দিলে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, তাঁহার শত্রুপক্ষ আড়ালে ব্যাপারটা লইয়া হাসাহাসি করিবে, ব্যবসাটাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকগুলি লোকের অন্নসংস্থান হইতেছিল, ব্যবসা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলে তাহারাও মুশকিলে পড়িবে। এই ব্যবসার জন্য সত্যই অনেক লোক মামার বাসায় আহার করিত। তাহাদের জন্য পৃথক একটা রন্ধন ব্যবস্থাই ছিল। শুধু ব্যাপারীরা নয়, অনেক দুঃস্থ আত্মীয়ও সেখানে দুইবেলা দুই মুঠো খাইয়া চাকরির চেষ্টা করিত। এই জন্যই মামা বিশেষ করিয়া ব্যবসাটা উঠাইয়া দিতে পারিলেন না। হরিদাস মাড়োয়ারির নিকট ঋণ করিয়া ব্যবসার ক্ষতিপূরণ করিলেন। তিনি বাহিরে এমন একটা ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন কিছুই হয় নাই।

জগন্নাথবাবুর চেষ্টায় আমাদের থিয়েটারের বেশ সুনাম হইয়াছিল। আমরা মাঝে মাঝে অন্য স্টেশনেও রেলের বাবুদের নিমন্ত্রণে থিয়েটার করিতে যাইতাম। কহলগাঁ, মিরজাচৌকি, তিনপাহাড় প্রভৃতি স্টেশনে আমরা 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিয়া বহুলোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিলাম। সে যুগে রেলের কর্মচারীরা অতি সহজেই একটা স্টেজ খাড়া করিতে পারিত। মোটা রেলের স্লীপার দিয়া, বাঁশ যোগাড় করিয়া বেশ ভালো স্টেজ করিত তাহারা। আমরা আমাদের 'সীন' ও পোশাক লইয়া যাইতাম। লইয়া যাইবার কোনও খরচ ছিল না। মালগাড়িতে বিনা খরচায় চলিয়া যাইত। অন্য স্টেশনে থিয়েটার করিবার একটা বিশেষ আমোদ ছিল। যে স্টেশনে আমরা থিয়েটার করিতে যাইতাম সেখানে প্রচুর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন তো থাকিতই খাতিরও খুব পাওয়া যাইত। যাইবামাত্র আমাদের প্রত্যেকের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দেওয়া হইত, বাড়ীর মেয়েরা আমাদের জন্য স্বহস্তে বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন। বয়স্থা বধূরা আমাদের স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। সম্মানিত অতিথির সমাদর পাইতাম আমরা। থিয়েটার করিবার জন্য আমরা কোনও পয়সা লইতাম না। থিয়েটারের জন্য কোনও টিকিটও বিক্রয় করা হইত না। একটা বিরাট পিকনিক করিবার যে আনন্দ আমরা সকলে মিলিয়া উপভোগ করিতাম আজকালকার দিনে তাহার তুলনা মেলা ভার। সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরিয়া থাকিতেন জগন্নাথবাবু। আমাদের কাহারও কোনও বেচাল তিনি সহ্য করিতেন না। একটা কথা মনে পড়িতেছে। ফটিক সীতা সাজিত। সেবার আমরা পীরপৈঁতি স্টেশনে থিয়েটার করিব বলিয়া গিয়াছি। হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল ফটিক লুকাইয়া এক বোতল মদ আনিয়াছে। জগন্নাথবাবু তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন, "শুনলাম তুমি মদ নিয়ে এসেছ ?" ফটিক নিরুত্তর।

"বোতলটা কোথায়, আমাকে দাও।"

আমতা আমতা করিয়া ফটিক বলিল, "আমি সামান্যই খাব। একটু না খেলে শরীরে জুৎ পাই না।"

"না এখানে ওসব চলবে না। বোতলটা দাও আমাকে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমাকে আমি একদিন ছুটি দেব, এক বোতল মদও দেব। ঘরে খিল দিয়ে যত ইচ্ছে খেও। এখানে ওসব বদচাল চলবে না। সীতা মদ খাচ্ছে একথা প্রকাশ পেলে আর থিয়েটার জমবে না। লোকে গায়ে থুতু দেবে—"

ফটিক জগন্নাথবাবুর আপিসে কাজ করিত। আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। মদের বোতলটি বাহির করিয়া দিল। সেদিন আমাদের অভিনয় খুব ভালো হইয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম জগন্নাথবাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সত্যই ফটিককে একদিন ছুটি এবং এক বোতল মদ দিয়াছেন। সেকালে এসব অসম্ভব সম্ভব হইত।

বাবার সহিত আমার আন্তরিক যোগাযোগ কোনদিনই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাঁহাকে ভক্তি করিতাম, অনুভব করিতাম তিনি ভিন্ন জগতের লোক এবং আমার চেয়ে অনেক বড়। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার সাহস বা ক্ষমতা আমার ছিল না। তাঁহার মতো নিস্পৃহ এবং নির্বিকার লোক আমি অন্ততঃ দেখি নাই। তিনি সংসারে থাকিয়াও সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষ্ণুপ্রসাদই বাবার সংসার চালাইত। বাবা যাহা কিছু রোজগার করিতেন তাহাকেই দিতেন। সেই সব করিত। আমি বাবার বাসায় রোজ একবার বৈকালের দিকে যাইতাম। বাবা তখন থাকিতেন না। বিষ্ণুপ্রসাদ থাকিত—সে আমাদের জন্য গরম পরোটা করিয়া দিত। বাবার হাতের রান্না মাংসও থাকিত খানিকটা। আমি মাংস আর পরোটা খাইয়া রোজ রিহার্সালে চলিয়া যাইতাম। বাবার সহিত প্রায়ই দেখা হইত না। চন্দরও রোজ বৈকালে বাবার বাসায় জলখাবার খাইতে যাইত। সে মাংস খাইতে চাহিত না বলিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ তাহার জন্য প্রত্যহ আলুর দম বানাইয়া দিত। একদিন আমি খাইয়া চলিয়া যাইতেছি এমন সময় বিষ্ণুপ্রসাদ নিম্নকণ্ঠে বলিল, "সুরযুবাবু, আজ তো বড় একটা তাণ্ডব কাণ্ড হয়ে গেল। গুরুজী কাল আমাকে বললেন পোস্টাপিসে আমার যত টাকা জমা আছে সব বার করে নিয়ে এস। পোস্টাফিসে সাড়ে তিনশ' টাকা সাড়ে ছ' আনা ছিল। আজ সব বার করে এনে দিলাম। কেন টাকা বার করতে চাইছেন তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস হলো না আমার। টাকা বার করে আনবার পর তিনি বললেন একটা মনিঅর্ডার ফর্ম নিয়ে এস। ফর্ম নিয়ে এলাম। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের এক ঠিকানায় রামরতন বাইয়ের নামে সব টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন। মনিঅর্ডার ফর্মের কুপনে হিন্দীতে লিখলেন, 'বেটি, আজকাল আমার গুরুজীর আখড়া কোথায় তা আমি জানি না। আশা করি তুমি ঠিকানাটা জান। সেই ঠিকানায় এই টাকা জমা করে দিও।'—বাস, আর কিছু লেখেন নি। টাকাটা আজ আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পোস্টাফিসের রসিদটা যখন তাঁকে এনে দিলাম তখন তিনি সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ওই দেখ, এখনও পড়ে আছে।" দেখিলাম সত্যই কুচিকুচি-করা রসিদটা উঠানে পড়িয়া আছে। বিষ্ণুপ্রসাদ সভয়ে বলিল, "ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।" আমিও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিতে কিন্তু বেশী দেরি হয়

নাই। তাহার পর দিনই গিয়া একটু অবাক হইয়া গেলাম। দেখিলাম বাবা গঙ্গার চরে বেড়াইতে বাহির হন নাই, বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার হরিণটিকে কচি ঘাস খাওয়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি আজ রাত্রে কোথাও বেরিও না। এখানেই থাকো। আজ ভোরে আমাকে যেতে হবে—"

বাবা মাঝে মাঝে সংগীতের আসরে নিমন্ত্রিত হইয়া বাহিরে যাইতেন। আমার মনে হইল সেইরূপ কোনও আসরে যাইবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

"কোথায় যাবেন?"

"একেবারে চলে যাব। তোমার মা ক'দিন থেকে রোজ আসছে। বলেছে আর একা থাকতে পাচ্ছে না সে। তাকে কথা দিয়েছি আজ ভোরে যাব।"

বাবা এমনভাবে কথাগুলি বলিলেন যেন তিনি অতি সাধারণ কথা সহজভাবে বলিতেছেন। কথাগুলি বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে হইল বাবার কারণের মাত্রাটা আজ বোধহয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছে। তাই এলোমেলো কথা বলিতেছেন। সেদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া আবার খবর লইলাম। শুনিলাম বাবা বাগচি মহাশয়ের বাড়ীতে যান নাই। সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছেন। পরদিন ভোরে বাবার বাসায় চলিয়া গেলাম। বিষ্ণুপ্রসাদ বলিল, "গুরুজী এখনও ওঠেন নি। অন্যদিন এ সময়ে উঠে গঙ্গাস্নানে চলে যান। শরীরটা বোধহয় ভালো নেই।" কপাট ঠেলিয়া আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম বাবা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। যে কালীর পটটাকে রোজ তিনি পূজা করিতেন, দেখিলাম সেটা পূজার জায়গায় নাই, সেটাকে তিনি মাথার শিয়রে টাঙাইয়া দিয়াছেন। ডাকিয়া তাঁহার সাড়া পাইলাম না। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া চাদর সরাইয়া গায়ে হাত দিলাম। গা বরফের মতো শীতল। নাড়ি নাই। সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। বাবার এই অদ্ভুত মৃত্যুর কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিষ্ণুপ্রসাদ বাবার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। একটু পরেই সে কিন্তু উঠিয়া পড়িল। বলিল, "একটা মহাত্মা চলে গেল। মহাত্মাকে মহাত্মার মতোই বিদায় দিতে হবে। আমি সব ব্যবস্থা করছি।" একটু পরেই লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। দুই দল কীর্তনীয়া আসিয়া হাজির হইল। প্রচুর ফুল ফুলের মালায় বাবার দেহকে ঢাকিয়া রাজকীয় মর্যাদায় বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাতীরে বহু নরনারী আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল। মামা হাপুসনয়নে কাঁদিতে-ছিলেন। সুধীর এবং চন্দ্রও খুব কাঁদিতেছিল। আমি নির্বাক হতভম্ব হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই আমি কাঁদিতে পারিতেছিলাম না। বুকের মধ্যে একটা অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ কোথা হইতে বেলকাঠ যোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। হরিদাস মাড়োয়ারি কিছু চন্দনকাঠও লইয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম হরিণটা উৎসুকনেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে। ঘাস জল কিছুই খায় নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর খাওয়াইতে পারি নাই। বাবার মৃত্যুর আট দিন পরে সে-ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। যতক্ষণ বাঁচিয়াছিল দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া ছিল, চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছিল। এমন নীরব গম্ভীর শোকের দৃশ্য

আমি আর দেখি নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহাকেও গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া দাহ করিলাম। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার শিং দুটি রাখিয়া দিয়াছিলাম। তাহা এখনও আমার নিকট আছে।

বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পরে আরও দুইটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিল। সুশীলা এবং কুসুম দুজনেই বিধবা হইয়া গেল। সুশীলার স্বামী মারা গেল কলেরায়, কুসুমের স্বামী—যক্ষ্মায়। মামার সংসারে এবং আমাদের জীবনে একটা অমঙ্গলের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। দিদিমা দিবারাত্রি কাঁদিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি কেবল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডী, এবার আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

নানারকম অশান্তির মধ্যে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

হঠাৎ মামা একদিন আমাকে বলিলেন, "তোমার বিয়ের ঠিক করেছি একজায়গায়। তারা লিখেছে তোমাকে দেখতে আসবে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। তাহার পর মনে পড়িল কে যেন আমাকে বলিয়াছিল যে মামা মোটা রকম পণ দাবি করিয়া এক বড়লোকের মেয়ের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। মামার প্রস্তাব শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না।"

মামা বলিলেন, "সে ব্যবস্থা আমি করেছি। তুমি ওপারে মনিহারিতে গিয়ে বসবে। আমি দেওয়ানজিকে চিঠি লিখে দেব। নরসিংহ পাঁড়ে আমাকে একথা বলেছিল। ভেবে দেখলাম সে ঠিক কথাই বলেছে। ওপারে বসলে প্র্যাকটিস ভালোই হবে। আমি দেওয়ানজিকে চিঠি লিখে দিলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। ওদের তাহলে কবে আসতে লিখব ?"

"এখন কিছু লিখবেন না। আমি আগে মনিহারীটা দেখে আসি। আপনি একটা চিঠি লিখে দিন।"

"বেশ। কালই চলে যাও তাহলে। তুমি ফিরে এলেই চিঠি লিখব ওদের। ওরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে, কন্যাদায় তো ওদের। ওরা এসে একেবারে আশীর্বাদ করে যাবে তোমাকে।"

ইহার উত্তরে তখন আর কিছু বলিলাম না।

দিদিমার কাছে গেলাম। আমি যাইতেই তারাপদ পুরোহিত সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন দেখিলাম। তারাপদ পুরোহিত মামার একজন পারিষদ ছিলেন। মামার খোশামোদ করিয়া মামার নিকট হইতে তিনি নানারকম সুখ-সুবিধা আদায় করিতেন। শংকরায় মামার যে বিষয়সম্পত্তি ছিল খেতুমামার উপরই এতদিন তাহার দেখাশোনার ভার ছিল। কিন্তু খেতুমামা বৃদ্ধ হইয়া চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছিলেন না। তাই শংকরার বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভার তারাপদ পুরোহিতের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। এই ছুতায় তিনি কিছুদিন শংকরায় এবং কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিতেন। শিবু নামে তাঁহার একটি বখাটে ছেলে ছিল। সেই ছেলেটিকেও তিনি মামার নুনের ব্যবসায়ে ব্যাপারীরূপে নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। মামার শালা নকুলের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। নকুলও মামার নুনের ব্যবসায়ে ব্যাপারীর কাজ করিতে

শুরু করিয়াছিল। এই সময়টা তারাপদ পুরোহিতই মামার প্রধান পরামর্শদাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারাপদ পুরোহিত উঠিয়া গেলে দিদিমাকে আমি সব কথা বলিলাম। সব শুনিয়া দিদিমা যাহা বলিলেন তাহাতে বিস্মিত হইয়া গেলাম। আমার মনে হইয়াছিল দিদিমার সম্মতিক্রমেই মামা বোধহয় আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দিদিমা বলিলেন, "তুই এখন কিছুতেই বিয়েতে মত দিস নি। আগে তুই নিজের পায়ে দাঁড়া তারপর বিয়ে করিস। বিয়ে করে বউকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখিস। এই ভাঙা সংসারে আর তোর বউ এনে কাজ নেই।"

"কিন্তু মামা যে বলছেন—"

"কেন বলছে জানিস? ও আবার বিয়ে করবে। ওই তারাপদ পুরুত কোথা থেকে এক সম্বন্ধ এনেছে। দ্বিতীয়পক্ষের বউ তো আর রান্নাঘরে ঢুকে হাঁড়ি ঠেলবে না। তোর বউকে দিয়ে সেই কাজটা করাবে। তুই খবরদার এখন বিয়ে করবি না। ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, যা খুশি করুক! খবরটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়া কোনও কথা সরিল না। দিদিমা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুই যত শিগগির পারিস এখান থেকে পালা।"

লক্ষ্য করিলাম তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুর ধারা নামিয়াছে।

পরদিনই মামার নিকট হইতে চিঠি লইয়া মনিহারীর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। মামা তখনও জানিতেন না যে আমি শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ করিব না। জানিলে হয়তো তিনি হকরু চৌধুরীকে চিঠি দিতেন না।

হকরু চৌধুরী কালা ছিলেন। খুব আস্তে কথা বলিতেন। আমি গিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজের পরিচয় দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মামার চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতে পারি নাই, কারণ তখন তিনি মহাসমারোহে একটা জলচৌকির উপর বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। আমি গিয়া পেঁীছিয়াছিলাম বেলা দশটায়। অত বেলায় কেন মুখ ধুইতেছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই। সাধারণতঃ লোকে খুব ভোরেই মুখ ধোয়। কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম দেওয়ানজির দৈনন্দিন জীবনধারা একটু স্বতন্ত্র। তিনি খুব ভোরে উঠিয়া একটা 'কুল্লা' করিয়া (কুলকুচা করিয়া) পদব্রজে গ্রামের বাহিরে গিয়া একটা মাঠে বসেন। সেখানে জমিদারের একচক্ষু ম্যানেজার এবং বধির দেওয়ান জমিদারি সংক্রান্ত গোপন পরামর্শে লিপ্ত হন। খুব চীৎকার করিয়া কথা না বলিলে হকরু চৌধুরী শুনিতে পান না। কাছারিতে বসিয়া চীৎকার করিয়া পরামর্শ করিলে তাহা আর গোপন থাকে না। তাই চতুর রায় মহাশয় এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। খুব ভোরে মাঠের মাঝখানে কোন লোক থাকে না। সেইখানেই নিশ্চিন্ত মনে উহারা পরামর্শ করেন। রায় মহাশয় যাহা বলিবার তাহা চীৎকার করিয়া বলেন. চৌধুরী মহাশয় সব শুনিয়া খুব আস্তে আস্তে তাহার উত্তর দেন। পরামর্শ হইয়া গেলে সমস্ত গ্রামটা ঘুরিয়া চৌধুরী মহাশয় বেলা প্রায় নয়টা নাগাদ বাড়ী ফেরেন এবং মুখ ধুইতে বসেন। বারান্দার উপর একটি জলচৌকি পাতাই থাকে আর থাকে তাহার দুই ধারে দুই বালতি জল। একটি গামছা এবং দুইটি দাঁতন লইয়া তাঁহার 'খাওয়াশ' (ভৃত্য) অপেক্ষা করে তাঁহার জন্য। তিনি আসিয়া প্রথমে নিমের দাঁতন লইয়া মুখ ধুইতে আরম্ভ করেন। নিমের দাঁতন দিয়া প্রত্যেকটি দাঁতের সামনে পিছনে ঘষিয়া

ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রথম বালতির জলে বহুবার 'কুল্লা' করেন। তাহার পর দ্বিতীয় দাঁতন। সেটি বাঘাশ্ডির, অর্থাৎ বাঘভেরেণ্ডার। তাহা নিয়াও অনেকক্ষণ দাঁত এবং বিশেষ করিয়া দাঁতের মাড়ি মাজেন। তাহার পর জিব পরিষ্কার করিবার পালা। প্রথমতঃ আঙুল দিয়া, তাহার পর দাঁতন দিয়া। এ ব্যাপারটা শব্দবহুল এবং দৃষ্টি-কটু। মনে হয় যেন বমি করিতেছেন। পাড়ার সমস্ত লোক বুঝিতে পারে দেওয়ানজি মুখ ধুইতেছেন, এইবার আহারে বসিবেন। পাড়ার দুই তিনটি ছোট ছোট গরীব ছেলেকেও এই সময় তিনি খাইতে দেন। তাঁহার জিব-ছোলার শব্দ পাইলেই তাহারা আসিয়া হাজির হয়। আমি যখন গেলাম তখন দ্বিতীয় বালতির জলও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি আমার পরিচয় দিলাম, কিন্তু তিনি কিছু শুনিতে পাইলেন না। আমার দিকে শুধু একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। তাঁহার 'খাওয়াশ্' বলিল "হুজুর, বৈঠিয়ে" এবং আমাকে একটি মোড়া আগাইয়া দিল। মুখ ধোওয়া শেষ করিয়া দেওয়ানজি হাত মুখ মুছিয়া আর একটি মোড়ায় যখন বসিলেন তখন আমার চিঠিটি তাঁহাকে দিলাম। চিঠিটি একবার উল্টাইয়া পালটাইয়া দেখিলেন তাহার পর সেটি তাঁহার খাওয়াশের হাতে দিয়া বলিলেন, "ছত্তিস বাবুকো বোলাও।"

গোমস্তা সতীশবাবু ও অঞ্চলে 'ছত্তিস্ বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দেওয়ানজির দক্ষিণ হস্ত। দেওয়ানজি লেখাপড়া কতদূর জানিতেন তাহা কখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। বরাবর দেখিয়াছি সেরেস্তার যাবতীয় লেখাপড়ার কাজ ছত্তিস্‌বাবুই চালাইতেন। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় কিছু কিছু জ্ঞান ছিল সতীশবাবুর। চিঠি আসিলে তিনিই তাহা পড়িয়া তাহার মর্মার্থ দেওয়ানজিকে শুনাইয়া দিতেন। কিন্তু সতীশবাবু বেশী চীৎকার করিতেন না। দেওয়ানজির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া গুন গুন করিয়া কথা কহিতেন। দেওয়ানজিও চিঠির উত্তরটা মুখে মুখে বলিয়া দিতেন এবং সতীশবাবু তদনুসারে উত্তরটা লিখিয়া পাঠাইতেন। উত্তর সতীশবাবুর নামে লেখা হইত। দেওয়ানজি তাহাতে সহি পর্যন্ত করিতেন না। কেবল উপরে লেখা থাকিত—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীত্রিপুরারি সিংহের দেওয়ান শ্রীহকরু চৌধুরীর আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। পত্রের নীচে সহি থাকিত সতীশবাবুর। ত্রিপুরারি সিংহ নাকি 'শতং বদ, মা লিখ' এই নীতি অনুসরণ করিতেন। তাঁহার ম্যানেজার এবং দেওয়ানরা যেন সহসা কোনও লিখিত ব্যাপারের মধ্যে না ঢোকেন ইহাই তাঁহার নির্দেশ ছিল।

তাঁহার 'খাওয়াশ্' সতীশবাবুকে ডাকিতে যাইবার একটু পরেই ভিতর হইতে আর একটি চাকর আসিয়া খবর দিল যে 'জলা খৈ' দেওয়া হইয়াছে। চাকরটি আমাকেও আহ্বান করিল।

দেওয়ানজি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "চলুন, কিছু খাবেন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দুইটি আসন পাতা হইয়াছে। একটিতে আমি গিয়া বসিলাম আর একটিতে দেওয়ানজি। খাবার যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা আজকাল হয়তো অনেকের বিস্ময় কিংবা হাস্য উদ্রেক করিবে। চা, বিস্কুট, কেক বা লুচি কচুরি নয়, ছিল কয়েক প্রকার লাড়ু এবং অনেকটা ক্ষীর। লাড়ুগুলি বেশ শক্ত, দাঁতের জোর না থাকিলে সে লাড়ুকে কায়দা করা যায় না। দেওয়ানজি অবলীলাক্রমে সেগুলি খাইয়া ফেলিলেন। আমিও খাইয়া ফেলিলাম, কারণ আমারও তখন দাঁতে বেশ জোর ছিল।...

...আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সতীশবাবু আসিয়াছেন। কালো বেঁটে মোটা মানুষটি। চোখে মুখে হাসি চিকমিক করিতেছে। প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ভালো লাগিয়া গেল। মামার চিঠিটি পড়িয়া তাহার ভাবার্থ তিনি দেওয়ানজির কানে গুন গুন করিয়া জানাইলেন।

দেওয়ানজির ভাব-লেশ-হীন চোখের দৃষ্টি একটু যেন প্রদীপ্ত হইল। বলিলেন. "আপনি শন্তুবাবুর ভাগনে, আপনি এখানে প্র্যাকটিস করতে আসবেন, এ তো খুব আনন্দের কথা। আমি আমার গোয়ালের পাশে একটা মাটির নতুন ঘর করেছি। ভেবেছিলাম ওটাতে গাই গরুর জন্যে গমের ভুসো রাখব। তা আপনিই এসে ওখানে থাকুন এখন। আমি আলাদা একটা ভুসকার করিয়ে নেব। কি বল ছত্তিস্ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো অনায়াসে হতে পারে।"

"তাহলে আপনি চলে আসুন একদিন। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।"

সতীশবাবু সেদিন আমাকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। দেখিলাম তিনি স্বপাক আহার করেন। সাধারণতঃ ভাতে ভাতই তিনি খান। দুধটাই প্রধান খাদ্য। তিনি বীরভূম জেলার লোক। মনে পড়িতেছে সেদিন আমার জন্য আলু পোস্ত ও টক ডাল করিয়াছিলেন। খুব তৃপ্তিসহকারে খাইয়াছিলাম সেদিন।

সতীশবাবু সেদিন আমাকে একটি অমূল্য উপদেশও দিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করব ? আপনি স্বপাক খান দেখে একটু ভাবনায় পড়েছি। আমাকেও কি রেঁধে খেতে হবে ? আমি তো আগে কখনও রাঁধিনি।"

"আপনি যদি এখানে আসেন তাহলে আপনার খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। আমাদের ম্যানেজার রায় মশায় কিংবা দেওয়ানজি নিজেই হয়তো আপনাকে বলবেন ওদের কাছারিতে খেতে। কাছারিতে আমলাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনিও সেখানে খেতে পারবেন। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি শোনেন, খাবেন না। কোথাও অন্নদাস হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়। স্বাধীনতা থাকে না।। ত্রিপুরারিবাবু দাঙ্গাবাজ জমিদার, আপনার মতো একজন ডাক্তারকে নিজেদের বশীভূত করে রাখলে ওদের সুবিধে হবে। তার মানে ওদের কাছারিতে যদি আপনি খান তাহলে আপনাকে ওদের কথায় উঠতে বসতে হবে। তা আপনি করবেন কেন ? ভাতে ভাত চড়িয়ে দিয়ে নাবিয়ে নিতে কিই বা বিদ্যেবুদ্ধির দরকার হয় ? তাছাড়া দুধ এখানে খুব সস্তা। টাকায় বত্রিশ সের খাঁটি দুধ। দু পয়সার দুধ কিনলেই যথেষ্ট। আমি ওদের চাকরি করি, কিন্তু আমি ওদের অন্নদাস হইনি। নিজেই রেঁধে খাই। পরিবারকে আনতে পারতুম, কিন্তু পরিবার আনতে সাহস হয় না। এদের রোজই একটা না-একটা দাঙ্গা লেগে আছে। টেলার সাহেবের জমিদারি কিনেছে এরা, কিন্তু সাহেব দখলদারি দিচ্ছে না। রোজই একটা-না-একটা হুজ্জৎ লেগেই আছে। তাই পরিবার আর আনিনি। কাঁটাক্রোশের নায়েব ফৌজদালের ঘরে সাহেবের লোকেরা আগুনই ধরিয়ে দিয়েছিল একদিন। আপনি আসুন, এলেই সব বুঝতে পারবেন হালচাল। চলে আসুন, এখানে ভালো ডাক্তার একেবারে নেই। টিকে থাকতে পারলে এখানে প্র্যাকটিস হবে—।"

সেই দিনই আমি সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া আসিলাম। হাতে পয়সা কম ছিল। ফিরিবার সময় ট্রেনে-স্টিমারে ফিরি নাই। পারঘাটায় পার হইয়া গঙ্গার চরের উপর দিয়া হাঁটিয়া

আসিয়াছিলাম। মনে আছে সেইদিনই পারঘাটার মাঝি ভগ্গ্রুর সহিত আলাপ হইয়াছিল। আমি যে নৌকায় পার হইয়াছিলাম সে নৌকায় দর্জী দুলারনও ছিল মনে পড়িতেছে। আমি মনিহারিতে আসিয়া ডাক্তারি করিব এ কথায় সে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল সে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। আমি ডাক্তার শুনিয়া নৌকার অন্যান্য যাত্রীরাও উৎসুক নেত্রে আমার দিকে চাহিতে লাগিল - আমি যেন একটা অদ্ভুত অসাধারণ প্রাণী। গঙ্গার চরে শিরসাবাদিয়া নামে একদল মুর্শিদাবাদী মুসলমান চাষী বাস করিত। তাহারা গ্রামই পত্তন করিয়াছিল একটা। এদেশের লোক সংক্ষেপে তাহাদের নামকরণ করিয়াছিল 'বাধিয়া'। সেই নৌকায় 'বাধিয়া'দের মোড়ল রমজান আলী ছিলেন। বেশ শক্তসমর্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তি। একমুখ কস্‌কসে কালো দাড়ি। গোঁফটি কামানো। তিনি আদাব করিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহার পায়ে যে চুলকানি হইয়াছে তাহার কোন ব্যবস্থা আমি করিতে পারি কি না জানিতে চাহিলেন। আমার পকেটে ছোট একটা 'নোটবুক' এবং পেন্সিল ছিল। আমি নোটবুক হইতে পাতা ছিঁড়িয়া নৌকাতে বসিয়াই তাঁহাকে একটি প্রেসক্রপশন লিখিয়া দিলাম। এ অঞ্চলে সেখ রমজান আলীই আমার প্রথম রোগী। পরে তাঁহার সহিত গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি যে গ্রামের মোড়ল ছিলেন সে গ্রামের সমস্ত রোগীর চিকিৎসা আমিই পরে করিতাম।

সাহেবগঞ্জে ফিরিয়াই শুনিলাম আমাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য লোক আসিয়া গিয়াছে। তারাপদ পুরোহিত পাঁজি দেখিয়া দিনক্ষণ সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। পরদিন সকাল নটার সময় আমার হবু শ্বশুর আমাকে নাকি আশীর্বাদ করিবেন। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটিবে তাহা প্রত্যাশা করি নাই। একটু ভয় পাইয়া গেলাম। দিদিমার কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন—"তুই গা ঢাকা দিয়ে সরে পড় এখান থেকে। এ বিয়ে তোকে করতে হবে না। নেত্য নাকি খবর পেয়েছে মেয়ে শুধু কালো নয়, খোঁড়াও।"

গা ঢাকা দিয়া চোরের মতো সরিয়া পড়িতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। মামাকে গিয়া বলিলাম, "আমি এখন ওখানে বিয়ে করব না। ওঁদের যেতে বলুন।"

তারাপদ পুরোহিত নিকটেই বসিয়া ছিলেন।

"বেশ তো বাপু, বিয়ে পরেই কোরো। আশীর্বাদটা হয়ে থাক না তাতে ক্ষতিটা কি। আশীর্বাদের এক বছর পরেও বিয়ে হতে পারে।"

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "আমি নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করব না। সেটা কবে হবে তার ঠিক নেই। ভদ্রলোকদের অনর্থক আশায় আশায় রাখতে চাই না।"

মামা নির্নিমেষে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। এইবার বলিলেন।

"আমি ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছি। পণের কিছু অগ্রিম টাকাও ওঁরা নিয়ে এসেছেন, এ অবস্থায় তাঁদের ফিরিয়ে দেব কি করে! তুমি মনিহারীতে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছ, ওই টাকাটা পেলে তোমারই সুবিধে হবে। বিয়ে তো করবেই একদিন—"

"আমি পণ নিয়ে বিয়ে করব না। আপনি ওঁদের যেতে বলুন।"

"এটা যে আমার পক্ষে কত বড় অপমান তা কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ? আমার বাড়ীতে থেকে তুমি আমাকে অপমান করবে ?"

"বেশ, আপনার বাড়ীতে আর আমি থাকব না, চললুম—"

তৎক্ষণাৎ আমি মামার বাড়ী ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সাহেবগঞ্জে কোথাও থাকিতে আর সাহস হইল না। সেই রাত্রেই সোজা গঙ্গার পারঘাটায় চলিয়া গেলাম। সেখানে যখন পেঁছিলাম তখন কত রাত্রি হইয়াছিল জানি না, আমার ঘড়ি ছিল না। পারঘাটায় গিয়া দেখিলাম চাঁদ অস্ত যাইতেছে। অস্তমান চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় গঙ্গায় জল ঝলমল করিতেছে। সেই আশ্চর্য শোভার দিকে চাহিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙিল গান শুনিয়া। কে যেন গান গাহিতে গাহিতে এইদিকে আসিতেছে। লোকটি তীরে আসিয়া ঝপাৎ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। আমি আর একটু আগাইয়া গেলাম। অন্ধকার ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। আমি গঙ্গার ধারে বালুর উপরই বসিয়া পড়িলাম! লোকটি স্নান সারিয়া উঠিল। অন্ধকার আর একটু স্বচ্ছ হইল। পূর্বদিগন্তে উষার অরুণাভা দেখা দিল। লোকটি স্নান সারিয়া উঠিতেই তাহাকে চিনিতে পারিলাম। ভগ্গু মাঝি। ভগ্গু মাঝিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

"আরে, ডাক্তারবাবু, এত সকালে ?"

"ওপারে যাব।"

"নৌকা ছাড়তে তো এখনও দেরি আছে।"

"অপেক্ষা করি—"

"চলুন, আমার বাসায় চলুন—ওই যে আমার বাসা—এখানে কোথা বসবেন।"

একটু দূরে খড়ের একটি কুটির দেখা গেল।

কুটিরে ঢুকিয়াই প্রথমে নজরে পড়িল ভগ্গুর উলকি-পরা বউ হুঁকায় তামাক খাইতেছে। আমাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল।

"ডাক্তারবাবু এসেছে, ডাক্তারবাবুর জন্যেও একটু দুধ গরম কর—"

তখন চায়ের ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। দেখিতে পাইলাম ভগ্গুর কুটিরের ওপাশে একটি কালো গাই বাঁধা আছে। ভগ্গু নিজেই গাইটি দুহিয়া ফেলিল।

"আপনি চূড়া খাবেন ?"

"না—"

"ছাতু ?"

"না, আমার কিছুই দরকার নেই।"

"না, দুধ আপনাকে একটু খেতে হবে! আমি কোনও বাহানা শুনব না।"

বলা বাহুল্য, ভগ্গুর সহিত আমার হিন্দীতেই কথাবার্তা হইয়াছিল, আমি সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

এক গ্লাস টাটকা গরম দুধ খাইয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলাম। সাড়ে পাঁচটায় নৌকা ছাড়িল। আমিই একক যাত্রী। মনিহারীতে পেঁছিয়া যখন দেওয়ানজির বাসায় গেলাম তখন আমার কাছে মাত্র এগারো আনা পয়সা ছিল। উহাই আমার ক্যাপিট্যাল। উহারই সাহায্যে নূতন জীবন আরম্ভ করিলাম। দেওয়ানজির সহিত দেখা হইল না। শুনিলাম তিনি আর ম্যানেজার রায় মহাশয় সদরে মালিকের সহিত দেখা করিতে

গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে টেলার সাহেবের লোকদের সহিত একটা দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সেই সম্পর্কে যে মকদ্দমা হইতেছে তাহারই তদ্বিরে সকলে ব্যস্ত। সতীশবাবুর কাছে গেলাম। তিনি সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আজই চলে এলেন? ভালো দিনেই এসেছেন। আজ আমাদের কাছারিতে মা কালীর বিশেষ পূজো হচ্ছে একটা। আপনার জিনিসপত্র কই?"

"আমার জিনিসপত্র কিছু নেই। এখানেই সব সংগ্রহ করতে হবে।"

"কি রকম?"

"সব বলছি।"

প্রথমে আমার একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত সতীশবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলিব কি না। বলিলে আমার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হইবে না তো? আমার মতো সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র লোককে তিনি গলগ্রহ বলিয়া মনে করিবেন না তো? কিন্তু আমার গত্যন্তর ছিল না। আমি একটা জায়গায় প্র্যাকটিস করিতে আসিয়াছি অথচ আমার সঙ্গে কোনও বিছানাপত্র নাই, ঔষধ নাই, আছে মাত্র সাড়ে এগারো আনা পয়সা, এই হাস্যকর ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা না দিলে সতীশবাবু আমার সম্বন্ধে যে ধারণা করিবেন তাহা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হইবে। তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। এমন কি আমার মামা অগ্রিম পাঁচশত টাকা পণ লইয়া আমার যে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন তাহা ভাঙিয়া দিয়া আমি যে গোপনে এখানে চলিয়া আসিয়াছি সে কথাও বলিলাম তাঁহাকে। লক্ষ্য করিলাম সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র ঈষৎ বিস্ফারিত হইতেছে। বুঝিলাম সতীশবাবু উত্তেজিত হইয়াছেন। কিন্তু এ উত্তেজনাটা আমার প্রতি ক্রোধবশতঃ না সহানুভূতি-জনিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার একটু ভয় হইল। সতীশবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিলেন, তাহার পর ধমকের সুরে রাগতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই, হয়েছে কি। সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই।"

তাহার পর তিনি হাঁক দিলেন—"চৌবে জি—"

একটি বলিষ্ঠকায় সিপাহী আসিয়া দাঁড়াইল।

"বেচন মিশির কেমন আছে?"

সতীশবাবু সকলের সহিত বাংলাতেই কথাবার্তা বলিতেন। চৌবেজি অবশ্য উত্তর দিলেন হিন্দীতে। বলিলেন মিশিরজির জ্বর এখনও ছাড়ে নাই। লছমন কবিরাজ বলিয়াছেন যে তাহার 'হালৎ' আশাপ্রদ নহে, কারণ বায়ু পিত্ত এবং কফ তিনটাই নাকি কুপিত হইয়া উঠিয়াছে। সতীশবাবু তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বেচন মিশির আমাদের একজন বিশ্বাসী কর্মচারী। কাঁটাক্রোশে তিনি থাকেন। কয়েকদিন থেকে খুব অসুস্থ হয়ে আছেন। আপনি গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ভারটা নিন। স্টেট থেকেই আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনার 'ফি' আমরাই দেব।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ভিতর হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

"এই নিন আপনার ফি। কাঁটাক্রোশ বেশী দূরে নয়। চৌবেজি, আমাদের পালকিটা ঠিক করতে বল। আর তুমি ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে মিশিরজির বাড়ী নিয়ে যাও—"

'জি হুজুর' বলিয়া চৌবেজি বাহির হইয়া গেলেন।

আমি এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে কয়েক মুহূর্ত আমার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কখন যে আমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ যখন তাহা টপটপ করিয়া গালের উপর গড়াইয়া পড়িল তখন আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। সতীশবাবুকে টাকা পাঁচটি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"এখন আমি ফি নেব না। আগে মিশিরজিকে দেখে আসি, ভগবানের দয়ায় আমার চিকিৎসায় উনি আগে ভালো হয়ে উঠুন তারপর ফিয়ের কথা ভাবা যাবে।" আমি উঠিয়া পড়িলাম। সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র আবার বিস্ফারিত হইতে লাগিল।

সহসা তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"বাস, আর আপনার ভাবনা নেই। এইবার আপনি আমাদের আপন লোক হয়ে গেলেন।"

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে স্টেথোসকোপ আছে, কিন্তু ওষুধ তো কিছু নেই।"

সতীশবাবু বলিলেন, "আমি সাহেবগঞ্জ থেকে ওষুধ আনিয়ে নেব। আপনি আগে গিয়ে দেখে আসুন।"

আমি গিয়া দেখিলাম মিশিরজির ম্যালেরিয়া হইয়াছে। আশা হইল দুই তিন দিনের মধ্যে তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিব। সেইদিনই ফিরিয়া আসিয়া বিষ্ণুপ্রসাদকে একটি চিঠি লিখিলাম। যে লোক মিশরজির ঔষধ আনিতে গেল সেই চিঠিটি লইয়া গেল। আমি কাটাক্রোশ হইতে ফিরিবার একটু পরেই এক হাঁড়ি দই, এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা এবং কিছু চিড়া লইয়া তিনজন লোক আসিয়া উপস্থিত। তাহারা বলিল, মিশিরজি আমার জন্য কিছু 'ভেট' পাঠাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র আবার বিস্ফারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাস্, এইবার তো সব হয়ে গেল। আপনার ঘরে আমি একটা নতুন চৌকি আর কিছু বিছানাও পাঠিয়ে দিয়েছি। রামকিষণ বোধহয় এক কলসী জল, একটা ঘটি আর গেলাসও রেখে এসেছে। আপনার উনুনও করিয়ে দেব কাল। কাল হাটও আছে, সেখান থেকে এক পয়সার মাটির বাসন কিনলেই আপনার চলে যাবে আপাতত। আজ আসুন ফলার করা যাক, মিশিরজি তো সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়েই দিয়েছেন। আমিও আজ রাঁধব না। বাস্, সব ঠিক হয়ে গেল। এইবার চলুন একটু গল্প করা যাক। না, না, আপনিই ওই ইজি চেয়ারটায় বসুন। আমি সোজা হয়ে বসতে ভালোবাসি। ইজি চেয়ারে খানিকক্ষণ বসলেই কোমরে ব্যথা হয়। আপনি বসুন—"

সেদিন ইজি চেয়ারে বসিয়া সতীশবাবুর সহিত অনেক গল্প হইল। আমার জীবনের প্রায় সব ঘটনা তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম। সব শুনিয়া সতীশবাবু বলিলেন, "আপনার বাবার কথা যা বললেন তাতে মনে হয় জীবনে আপনি কোনও কষ্ট পাবেন না। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর বুকটা কি লাল ছিল?"

"খুব লাল ছিল। কেন বলুন তো—"

"ওটা একটা সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ।"

সতীশবাবু শূন্যে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। কাহাকে করিলেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ বাবাকেই।

বৈকালে বেচন মিশিরের ঔষধ আসিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রসাদও আসিয়া পড়িল। দেখিলাম সে আমার বিছানাপত্র ট্রাঙ্ক সব লইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম মহাখুশী হইয়াছে সে।

"এ তো তাজ্জব কাণ্ড করলে তুমি সুরযূবাবু। বাড়ীতে তোমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে লোক বসে আছে আর তুমি ফট্‌সে গায়েব হয়ে গেলে! পাঁচ শ' টাকার দিকে ফিরেও তাকালে না!"

তাহার বড় বড় চোখ দুইটি হইতে বিস্ময় এবং হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর তাহাকে আমার ঘরটি দেখাইলাম। বিষ্ণুপ্রসাদ নিজেই আমার বিছানা পাতিয়া দিল। রামকিষণা এক কলসী জল ভরিয়া রাখিয়াছিল। দেখিলাম কলসীর নিকট একটি পিতলের ঘটি এবং একটি কাঁসার গ্লাশও রহিয়াছে। সতীশবাবুই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সম্ভবতঃ। ঘরের একধারে দেখিলাম একটি দড়ির আলনাও টাঙানো রহিয়াছে এবং তাহাতে ঝুলিতেছে একটি নূতন গামছা, এক জোড়া নূতন কাপড় এবং একটি কম্বলের আসন। বুঝিলাম এ সমস্ত সতীশবাবুই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও এ সমস্তই আমার প্রয়োজন, তবু সতীশবাবুর এই বদান্যতায় মনে মনে একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। তাঁহার একটা উক্তি মনে পড়িল—"এইবার আপনি আমাদের আপন লোক হয়ে গেলেন। আর ভাবনা নেই"—তাঁহার এই কথাগুলি মৌখিক না আন্তরিক তাহা নির্ণয় করিবার উপায় তখন ছিল না। কিন্তু একটা বিষয় আমি মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, কাহারও অনুগ্রহ আমি লইব না, নিজের জোরেই নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াইতে হইবে। জীবনের সম্বন্ধে তখন অভিজ্ঞতা কম ছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই যে সমাজে বাস করিতে হইলে অনুগ্রহের আদান-প্রদান না করিলে চলে না। ইহা প্রায় অনিবার্য। একমাত্র সন্ন্যাসীরাই কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষা না করিয়া নিজের পায়ের উপর সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শক্তিই তাঁহাদিগকে বলবান করে। প্রখর আত্মসম্মান আস্ফালন করিয়া যে সব লোক সাধারণতঃ সমাজে বিচরণ করেন তাঁহারা প্রায়ই অহংকারী। অহমিকার মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই তাঁহারা আত্মসম্মানের আড়ম্বর করেন। আত্মজ্ঞান না হইলে প্রকৃত আত্মসম্মানী হওয়া যায় না। কিন্তু তখন আমার এ জ্ঞান হয় নাই তাই সতীশবাবুর অনুগ্রহে বিপন্ন বোধ করিতেছিলাম। অথচ সতীশবাবুর উপহার প্রত্যাখান করিবার সাহসও হইতেছিল না। বিষ্ণুপ্রসাদও আমাকে আর একটা বিপদে ফেলিয়া দিল। সে আমার বিছানা পাতিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিল। ফিরিয়া বলিল, "আমি গ্রামটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। বেশ ভালো গ্রাম। এখানকার পোস্টমাস্টার বলরামবাবুর সঙ্গেও আলাপ হলো। অত্যন্ত ভালো লোক। এখানে আমি একটা সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট খুলব ভেবেছি।"

আমি শুনিয়া একটু অবাক হইলাম। এখানে সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট খুলিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ কি করিবে?

"এখানে অ্যাকাউণ্ট খুলবেন কেন।"

"এখানে কিছু ব্যবসা করবার ইচ্ছা আছে। আজ রাত্রে এখানে থাকব।"

সেদিন রাত্রে বিষ্ণুপ্রসাদই স্বহস্তে পরোটা এবং আলুর দম প্রস্তুত করিয়া আমাদের খাওয়াইল। সতীশবাবু যদিও স্বপাকে অভ্যস্ত এবং রাত্রে দুধ ছাড়া কিছু খান না, তবু তিনি বিষ্ণুপ্রসাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না। সন্ধ্যার পর বিষ্ণুপ্রসাদ রামায়ণের গান গাহিয়া মুগ্ধ করিয়া দিল সকলকে। সে যে এমন সুন্দর গান করিতে

পারে তাহা আমিই জানিতাম না। বাবার কাছে সে সেতার শিখিত এইটুকুই শুধু জানা ছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ সেদিন হঠাৎ আসিয়া আমার সহিত সকলের পরিচয় যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া দিল। আমার বাবা যে কত বড় সাধক এবং গুণী ছিলেন, আমি যে কিরূপ কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারি পাশ করিয়াছি, আমি যে কিরূপ চরিত্রবান ভালো ছেলে, আমি যে কত ভালো অভিনয় করিতে পারি এসবের বিশদ বর্ণনা সকলের নিকট করিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ একরাত্রির মধ্যেই আমাকে যে মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিল তাহা আমি এক বৎসরেও করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। পরদিন বিষ্ণুপ্রসাদ পোস্টাফিস হইতে কয়েকটি উইথড্রয়াল ফর্ম আনিয়া আমাকে বলিল— "তুমি এগুলোতে এখানে সই করে দাও।"

সেভিংস ব্যাংক সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না।

"আমি সই করব কেন!"

"আরে যা বলছি কর না।"

ধমক খাইয়া আমি তিনটি ফর্মে সহি করিয়া দিলাম। আমার মনে হইল সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউণ্ট খুলিতে হইলে বোধহয় একজন সাক্ষীর দরকার হয়। একটু পরে বিষ্ণুপ্রসাদ সেভিংস ব্যাংকের খাতা এবং উইথড্রয়াল ফর্মগুলি আনিয়া আমার ট্রাঙ্কে রাখিয়া দিয়া বলিল, এগুলো এখানেই থাক। যখন দরকার হবে টাকা বার করা যাবে। তখন আমি ভালো করিয়া দেখি নাই। বিষ্ণুপ্রসাদ চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে দেখিয়াছিলাম। বিষ্ণুপ্রসাদ পোস্টাফিসে তিনশত টাকা জমা করিয়া গিয়াছিল এবং উইথড্রয়াল ফর্মগুলিতে নিজে সহি করিয়া এবং আমাকে দিয়া সহি করাইয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াছিল যাহাতে আমি তিন কিস্তিতে টাকাটা বাহির করিতে পারি। প্রতি কিস্তিতে একশত করিয়া টাকা বাহির করিবার ব্যবস্থা ছিল। বিষ্ণুপ্রসাদ চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে তাহার একটি চিঠি পাইয়া অবাক হইয়া গেলাম। খামের চিঠি। জীবনে সেই প্রথম খামের চিঠি পাইলাম। চিঠিটা খুলিবার পূর্বেই বেশ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। খামে কে চিঠি লিখিল! খুলিয়া দেখি বিষ্ণুপ্রসাদের দীর্ঘ পত্র। নূতন বাংলা শিখিতেছিল সে। বাংলাতেই বড় বড় অক্ষরে চিঠি লিখিয়াছিল। মনে হইতেছিল কোনও ছোট ছেলে চিঠি লিখিয়াছে। চিঠির ভাষা আমার এখন মনে নাই, ভাবটি মনে আছে। লিখিয়াছিল—আমি সেদিন তোমার সহিত ছলনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার সামনে সব কথা বলিবার সাহস হইল না সেদিন। তুমি যদি বিগড়াইয়া ওঠ এই ভয়ে আসল কথা বলিতে পারি নাই। কৌশলে তোমার জন্য মনিহারী পোস্টাফিসে তিনশত টাকা জমা করিয়া আসিয়াছি। যে তিনটি উইথড্রয়াল ফর্ম রাখিয়া আসিয়াছি, তাহার সাহায্যেই তুমি অনায়াসে টাকা বাহির করিতে পারিবে। তুমি যখন স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিতেছ তখন তোমার টাকার দরকার হইবেই। তাই অনেক ভাবিয়া এই কৌশল করিলাম। তুমি হয়তো ভাবিবে, টাকাটা কাহার, আমি লইব কেন। আমি বলিতেছি টাকাটা তোমার। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল। ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়া বলি। গুরুজী আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার কাছে এতদিন আমি যাহা পাইয়াছি তাহা অমূল্য। মূল্য দিয়া সে মহত্ত্বের দাম শোধ করা যায় না। তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণীই থাকিতে হইবে। কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা ছিল—প্রণামীস্বরূপ

তাঁহাকে কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিব। তাঁহাকে দুই একবার একথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হন নাই কিন্তু আমি তাঁহার জন্য প্রতিমাসে কিছু কিছু টাকা জমাইয়া রাখিতাম। ভাবিয়াছিলাম যখন তিনি রাজী হইবেন তখন তাঁহাকে দিব। কিন্তু আমাকে তিনি সে সুযোগ দিলেন না, হঠাৎ একদিন চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাইবার পূর্বে তিনি আমাকে একটা ইঙ্গিত (বিষ্ণুপ্রসাদ লিখিয়াছিল 'ইশারা') দিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজে তিনি তাঁহার সমস্ত টাকা বাহির করিয়া তাঁহার গুরু-দক্ষিণা দিয়া গিয়াছেন। রমা-রতন বাঈয়ের নামে মনি-অর্ডার আমিই করিয়াছি। পরে খবর লইয়া জানিয়াছি রমা-রতন বাঈ ওঁর গুরুজীর নাতনী। আমিও তাঁহার পথ অনুসরণ করিলাম। আমার সামান্য গুরু-দক্ষিণা তোমাকেই দিয়া আসিলাম। যাহা গুরুজীর জন্য রাখিয়াছিলাম তাহা যদি তোমার কাজে লাগে আমি কৃতার্থ হইব। তুমি গুরুজীর বড় ছেলে, তোমাকে আমি আপনার ভাই বলিয়া মনে করি। যতদিন বাঁচিব ততদিন আমাদের এই সম্পর্ক অটুট থাকিবে।...বিষ্ণুপ্রসাদের এই চিঠি পাইয়া আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা শক্ত। এ চিঠি পাইবার পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথাও আর ভাবিতে পারিলাম না। বিষ্ণুপ্রসাদকে লিখিয়া দিলাম তুমি এখানে আর একবার এস, তখন এ বিষয়ে কথা হইবে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রসাদ আর আসে নাই। মাসখানেক পরে খবর পাইলাম সে মারা গিয়াছে। সে নাকি ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছিল, সেখানেই কলেরা হইয়া একদিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। খবরটা শুনিয়া অযৌক্তিকভাবে মনে হইয়াছিল বাবাই বোধহয় তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রসাদের টাকাটা অনেকদিন আমি পোস্টাফিস হইতে তুলি নাই। প্রায় বছর দুই পরে খবর পাইলাম অর্থাভাবে তাহার পরিবার নাকি বড় কষ্টে আছে। সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারীই আমাকে খবরটা দিল একদিন। তাহারই সহায়তায় বিষ্ণুপ্রসাদের দেশের ঠিকানাটা যোগাড় করিয়া তাহার স্ত্রীর নামে টাকাটা পাঠাইয়া দিলাম। বিষ্ণুপ্রসাদের পরিবারের সহিত আমার কোন যোগাযোগ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম কাশীরই লোক। আমার জীবনে বিষ্ণুপ্রসাদ কিন্তু আজও অমর হইয়া আছে। তাহার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। অধিকাংশই মোটামুটি ভালো লোক, কিন্তু মহৎ লোকের সংখ্যা কম। আমি যে কয়জন মহৎ লোক দেখিয়াছি বিষ্ণুপ্রসাদ তাহার মধ্যে একজন।..."

হঠাৎ ল্যাংল্যাং ছুঁচোক ঘেউঘেউ করিয়া বাহিরে ডাকিয়া উঠিল। তাহারা কুমারের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং ঘরের পিছন দিকে পোয়ালগাদার পাশে ঘুমাইতেছিল। তাহাদের ডাক শুনিয়া কুমারের মনে হইল সুব্রত গগনের আসিবার কথা ছিল, তাহারাই বোধহয় আসিতেছে। কুমার টর্চ লইয়া বাহির হইল। দেখিল কে যেন টর্চ জ্বালিতে জ্বালিতে আগাইয়া আসিতেছে। কাছে আসিতে চিনিতে পারিল, গগন। গগনের সঙ্গে একটি চাকর এবং তাহার মাথায় একটি বিছানা।

কুমার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কি ব্যাপার ?"

গগন হাসিমুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বিয়ে হবে না। অনু বিয়ে করতে চাইছে না। সে বললে আমি ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে

বিয়ে করতে চাই না। বাবলু যে ওর ছেলে ও যদি কেবল এইটুকু মেনে নেয় তাহলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব!"

"ভদ্রলোক মেনে নিয়েছেন?"

"এই দেখ। এতে তোমাকেও সই করতে হবে।"

গগন পকেট হইতে সুপর্ণ সিংহের সই-করা কাগজটি বাহির করিয়া দিল।

"চল ভিতরে যাই—"

ভিতরে গিয়া কুমার কাগজটি পড়িয়া বলিল—"অনুপমা মেয়েটি তো অসাধারণ দেখছি।"...

"গ্রেট। অথচ আমি জানি ও সত্যিই সুপর্ণকে ভালোবাসে। তুমি কাগজটায় সই করেই দাও। কাল সুব্রত আর পিসেমশাইকে দিয়েও সই করিয়ে নেব।"

"তুই বিছানা আনলি কেন।"

"ভাবলাম এখানে তুমি একা আছ। তোমার কাছে এসে শুই।"

"ক'টা বেজেছে, আমি ঘড়িটা আনিনি।"

গগন নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল—"বেশী রাত হয়নি। পোনে একটা। চায়ের ব্যবস্থা আছে এখানে তো। একটু চা করি?"

"এত রাত্রে চা খাবি।"

"Let us celebrate our victory—টলস্টয়ের ওয়ার এণ্ড পীসে কুটুজভ্ এই কথা বলেছিল। ওয়ার এণ্ড পীস পড়েছ?"

"না।"

"পোড়ো। আমার কাছে আছে, দিয়ে যাব। দিগন্তই পড়িয়েছিল আমাকে বইটা। অনেক বাজে বক্তৃতা আছে, কিন্তু 'গ্রেট বই'।"

"বাবাকে দেখে এসেছিস?"

"হ্যাঁ। একটু আগে দাদুকে ওভালটিন করে খাওয়ালাম। তারপর চম্পার একটা গান হলো। গান শুনতে শুনতে দাদু ঘুমিয়ে পড়লেন। সবই ভালো আছে, তবে pulseটা একটু weak মনে হলো।"

"তাই নাকি? ভয়ের কিছু নেই তো?"

"না আপাতত কিছু নেই। খাওয়াটা কম হচ্ছে যে। দাদু কিছু খেতে চান না। কাল থেকে মনে করছি খাওয়াটা একটু বাড়িয়ে দেব। দাদুর খাওয়ার গল্প শুনছিলাম কবরেজ মশাইয়ের কাছে। দাদু 'কল' থেকে ফিরে এসে আট দশখানা আটার রুটি, একবাটি ছোলার ডাল আর ক্ষীর খেতেন। এই ছিল জলখাবার। তারপর রাত্রে খেতেন আবার প্রচুর মাছটাছ দিয়ে ভাত। একটা বড় মুড়ো রোজ বরাদ্দ ছিল। তার উপর একবাটি ঘন দুধ। এখন খেতে হচ্ছে হরলিকস্, ফ্রুট জুস, সুকতো, চচ্চড়ি, যতসব ভুসিমাল। নাড়ি তো দুর্বল হবেই। কাল থেকে ভাবছি 'জাগ্ সুপ' করে দেব। চিকেন পাওয়া যাবে? কিংবা পায়রার বাচ্চা?"

"পাওয়া সবই যাবে। কিন্তু বাবা খাবেন না। ওসবে ওঁর রুচি নেই এখন—"

"দেখি কাল বলে কয়ে যদি রাজী করাতে পারি।"

গগন স্টোভ জ্বালিতে বসিল। কুমার সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা তুলিয়া এমন জায়গায় রাখিল যাহাতে গগন সেটা দেখিতে না পায়।

কুমার এবং গগন পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ আগেই ঘুমটা আসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন কুমারের অদৃষ্টে বিশ্রাম ছিল না। ল্যাংল্যাং ছুঁচকি আবার চীৎকার করিতে লাগিল। কুমারের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার কানে গেল দূরে একটা কলরব হইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখিল একদল লোক লাঠি, সড়কি, পেট্রোম্যাক্স লইয়া বাগানে ঘোরাফেরা করিতেছে। বোধিয়া চাকরটারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। কুমার তাহাকেই পাঠাইয়া দিল ব্যাপার কি জানিবার জন্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুম দুম করিয়া বন্দুকেরও আওয়াজ হইল। কুমার আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। নিজেই তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়াই দেখিল সকলে তাহার কাছেই আসিতেছে। সকলের পুরোভাগে কৃষ্ণকান্ত। তাঁহার হাতে বন্দুক।

"ব্যাপার কি জামাইবাবু—"

"ভালুক। সংস্কৃতে যার নাম ঋক্ষ—"

"কি রকম ?"

"তোমাদের ধনপতিয়া এমন একটা কাণ্ড করেছে যে সেটা তোমাদের এই গ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সত্যিই বীরাঙ্গনা—"

কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণকান্ত বলিতে লাগিলেন—"ধনপতিয়ার ছেলে তুনকা তার মায়ের কাছে থাকতে চাইছিল না। বলেছিল তোমার চেয়ে ভালুকই বড় আমার জীবনে। ধনপতিয়া একথা মানেনি। সে অতবড় জোয়ান ছেলেটাকে মেরে ঘায়েল করে ফেলেছে। তারপর তাকে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। তারপর যা করেছে তা আরও বীরত্বব্যঞ্জক। ওই প্রকাণ্ড ভালুকটার বাঁধন খুলে দিয়ে ঝাঁটা-পেটা করে তাড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে। ওদের ছেকা-ছেনি ভাষায় যা বলেছে তার বাংলা অনুবাদ—পোড়ারমুখো, আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিবি তুই ? দেখি তোর কত বড় হিম্মৎ। মারের চোটে পালিয়েছিল ভালুকটা। একটু পরেই শোনা গেল বন্ধনমুক্ত পশুটা গ্রামে ঢুকে জখম করেছে একটা মেয়েকে। সকলে বলছে মেয়েটা নাকি ধনপতিয়ার মতোই দেখতে। হৈ হৈ পড়ে গেছে গ্রামে। সবাই লাঠি সড়কি বার করে ঘেরাও করেছিল ভালুকটাকে। কিন্তু ভালুক সবেগে ব্যূহ ভেদ করে একটা লোককে আঁচড়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকেছে তোমাদের বাগানে। ঢুকে উঠে পড়েছে বড় কাঁঠাল গাছটায়। আর সেখান থেকে তর্জনগর্জন করছে। কেউ কাছে যেতে সাহস করছে না, যদি মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে! তখন রামপ্রসাদ আমার কাছে গিয়ে হাজির হলো। আমিও ছুটে চলে এলাম। হার্ডল্ রেস করে বলতে পার। তোমার দিদিকে চেনো তো !—"

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হাসিয়া চুপ করিলেন।

"তারপর ? ভালুকটার কি হলো ?"

"যা হবার তাই হলো! গাছতলায় পড়ে আছে। যদি দেখতে চাও দেখে আসতে পার।"

"গগনটাকেও ওঠাই—"

"সে এখানে ঘুমুচ্ছে বুঝি! এত গোলমালেও ওর ঘুম ভাঙেনি ? দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ দেখছি—! ওঠাও ওকে—"

অনেক ডাকাডাকির পর গগনের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"ব্যাপার কি!"

"ভয়ানক কাণ্ড!"

সমস্ত শুনিয়া গগন বলিল, "অমন সুন্দর ভালুকটাকে মেরে ফেললেন!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন, "এ-অবস্থায় আর কি করা সম্ভব ছিল বল। একটা লোককে ঘায়েল করেছে, না মেরে ফেললে আরও দু'একজনকে করত। গ্রামে একটা 'প্যানিক' হয়ে গেছে। তোমার মনে হঠাৎ করুণার সঞ্চার হলো কেন।"

"আমার দুঃখ হচ্ছে তুনকার জন্য। মনে পড়ছে ছেলেবেলায় একটা টিয়াপাখী পুষেছিলাম। সেটা যেদিন মরে গেল সেদিন কি যে কষ্ট হয়েছিল আমার—"

"টিয়াপাখী সাধারণতঃ মরে না। কি হয়েছিল তার?"

"দোষ আমারই। আমি বাজার থেকে রং কিনে এনে খাঁচায় লাগিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রঙীন খাঁচায় পাখীটাকে আরও সুন্দর দেখাবে। পাখীটা যে কাঁচা রং চেটে চেটে খাবে তা ভাবতে পারিনি। স্কুল থেকে এসে দেখি পাখীটা খাঁচার ভিতর মরে পড়ে আছে। মা বললে সারা দুপুর রং খেয়েছে—"

"বাংলা রং, ইংরেজী wrong হয়ে গেল।"

কৃষ্ণকান্ত মৃদু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন। রামপ্রসাদ বাহির হইতে উঁকি মারিয়া বলিল, "জামাইবাবু, ভালুকটাকে এখানে আনব? সবাই ওর লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।"

"আমরা ভালুক নিয়ে কি করব? ওটা তুনকার মাকে দিয়ে দাও। সে যা খুশী করুক। কী বল কুমার?"

"বেশ তো। ধনপতিয়াকে বলিস চামড়াটা যেন নষ্ট না করে। বিক্রী করলে ভালো দাম পাবে—"

"আচ্ছা।"

রামপ্রসাদ সদলবলে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে দেখছি। ভোরও হয়ে এল—"

"হ্যাঁ, এখুনি করে দিচ্ছি। একটু আগেই চা খেয়েছি আমরা। বোধিয়া কাপগুলো ধুয়ে ফেল—"

গগন সোৎসাহে স্টোভ জ্বালিতে বসিয়া গেল। সহসা চতুর্দিকে পাখীরা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। আনন্দকাকলীতে ভরিয়া গেল সারা বাগানটা। দ্বারপ্রান্তে বাতায়নপথে দেখা দিল ভোরের শুচি স্নিগ্ধ আলো। অপ্রত্যাশিতভাবে আর একজনও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুপর্ণ সিংহ। তাঁহাকে সোচ্ছ্বাসে অভ্যর্থনা করিলেন কৃষ্ণকান্ত।

"আসুন, আসুন, তারপর কি ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত।"

গগন বলিল, "আপনাকে সব এখনও বলা হয়নি। কাগজটা আমার কাছেই আছে। আপনাকেও এতে সই করতে হবে।"

"কি কাগজ।"

গগন কাগজটা বাহির করিয়া দিল। কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িলেন সেটা,

তাহার পর বলিলেন, "ও তাহলে তো আপনি ছাড়া পেয়ে গেছেন দেখছি। ভালোই হলো, সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না!"

সুপর্ণ সিংহ এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিয়া একবার গলাখাঁকারি দিলেন তাহার পর বলিলেন—"আমি ছাড়া পেতে চাই না। আমি ওই কাগজটায় সই করবার পর সমস্ত রাত আর ঘুমোইনি। আমার কেবলি মনে হয়েছে কোথায় যেন একটা ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। একটা কাগজে সই করে দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ হয় না। অনু যদি রাজী থাকে তাকে আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত আছি। সে বিয়ে এখানে আজই হতে পারে কিংবা পরে অন্য কোথাও হতে পারে। সেটা অনু ঠিক করুক। আপনারা শুধু দয়া করে তাকে এই কথাটা জানিয়ে দিন যে এখন আমি যা করতে চাইছি তা বাইরের চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে করতে চাচ্ছি না। নিজের মন থেকেই ঠিক করেছি এটা। অনু যখন আমায় মুক্তি দিলে তখন আমার মনে হলো এ মুক্তি অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে আমার জীবনে। আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। অনুকে আমার জীবনের সঙ্গিনী করতেই হবে। তাকে আর আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।"

সুপর্ণ সিংহ চুপ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত লক্ষ্য করিলেন কথা বলিতে বলিতে তাঁহার গলার স্বর শেষের দিকে কাঁপিয়া গেল। হাস্যপ্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া নির্নিমেষে তিনি চাহিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিলেন—"আপনি যা করলেন তা মানুষ ছাড়া আর কেউ পারে না।"

সুপর্ণ সিংহ কথাটার তাৎপর্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি যা বলছি তা অন্তর থেকেই বলছি।"

"তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি মানুষ বলেই একথা বলতে পারলেন। মাছ হলে কখনই বলতেন না, আমি টোপটি গিলেছি এবং গিলেই থাকব আপনারা আমাকে টেনে তুলুন।"

সকলেরই মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন চা খান, তারপর একটু ঘুমুন। আমরা এখান থেকে এখনই চলে যাব। এই ঘরেই শুয়ে পড়ুন আপনি। একটু ঘুমুলে মাথাটা সাফ হয়ে যাবে তখন যা হয় করবেন। তাড়াহুড়ো করে কিছু করাটা ঠিক নয়।"

"আমি তাড়াহুড়ো করছি না। সমস্ত রাত ভেবেছি—"

"কেবল ভাবলে এসব ব্যাপারের কূলকিনারা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় আপনাকে কূল থেকেই আরম্ভ করতে হবে আবার। পরে গভীর জলে গিয়ে হাবুডুবু খাবেন—"

"ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কি বলতে চাইছেন আপনি। কূল থেকে মানে?"

"গোড়া থেকে। অর্থাৎ অনু দেবীকে সত্যি যদি পেতে চান আবার নতুন অভিযান করতে হবে। একবার পেয়ে তাকে হারিয়েছেন, আবার যদি পেতে চান নতুন করে খুঁজতে হবে। এসব ব্যাপারে পুরোনো দলিল অচল। আমার মতে আপনি এখন লম্বা একটি ঘুম দিয়ে নিন। তারপর অনুর সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করুন। অবশ্য তিনি যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন। না-ও হতে পারেন। যদি না হন তাহলে আপনার এখন এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। পরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন—"

সুপর্ণ সিংহ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। গগনের চোখে মুখে একটা নিস্তব্ধ হাসি চিকমিক করিতেছিল। জলন্ত স্টোভটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল সে। কুমার চালের বাতা হইতে একটা নিমের দাঁতন পাড়িয়া সেটা চিবাইতে লাগিল। চালের বাতায় তাহার জন্য নিমের দাঁতন রাখাই থাকে। সে বাগানে আসিলেই নিমের দাঁতন চিবাইয়া মুখটা ধুইয়া ফেলে। অনেকদিনের অভ্যাস। কুমারের মুখে দাঁতন দেখিয়া বোধিয়া ইঁদারা হইতে জল তুলিতে গেল।

॥ ৩২ ॥

সূর্যসুন্দর সত্যই একটু দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। তাঁহার ভিতরটা কেমন যেন খালি-খালি মনে হইতেছিল। কিন্তু তবু যখন জগাই আসিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইল, তখন তিনি যেন একটু ভালো বোধ করিতে লাগিলেন। আসিয়া অবধি জগাই একটু স-সংকোচে দূরে দূরে সরিয়াছিল, এত কাছে আসিয়াও নিজের স্থানটিতে সে যেন ঠিক বসিতে পারিতেছিল না। তাহার দুঃখ সূর্যসুন্দর অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাও তিনি বুঝিতেছিলেন ইহা লইয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলে জগাইয়ের দুঃখ আরও বাড়িবে। সন্তোষের ছেলে জগাই। অনেকদিন আগে যখন ছোট ছিল সে, তখন এখানে যখন আসিত রাজলক্ষ্মীর পাশে শুইত। আর একটু যখন বড় হইল তাঁহার বিছানায় শুইত। পরে তাহার গা হাত পা টিপিয়া দিত। এখন তাঁহার বিছানায় আসিয়া বসিতেও তাহার সংকোচ হইতেছে। অর্ধনিমীলিত নয়নে জগাইকে তিনি দেখিতেছিলেন। জগাই মানুষ হয় নাই। এজন্য কি তিনিই দায়ী ? না, তিনি দায়ী নন। জগাই, মাধাই, বিলুর ভার তিনি যখন লইয়াছিলেন, ইহাদের সকলকে লইয়া সন্তোষ যখন তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তখন জগাইয়ের বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর, গোঁফ দাড়ি উঠিয়া গিয়াছিল, তখনই নানারকম নেশাভাঙে অভ্যস্ত হইয়াছিল সে। সূর্যসুন্দরের আর কিছু করিবার ছিল না। মাধাই এবং বিলুকে তিনি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া চাকরি করিতেছে। একজন রেলে আর একজন ব্যাংকে। তাহারা তাহার অসুখের খবর পাইয়াছে কি ? সূর্যসুন্দর ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মাধাই এবং বিলুর চেহারা তাঁহার মনে পড়িল। দুইজনেই খুব ভালো ছেলে। যতদিন এখানে ছিল সর্বদা যেন সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। চাকরের মতো সর্বদা খাটিত। তাহারা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল এ বাড়ীতে তাহাদের সত্য অধিকার নাই। রাজলক্ষ্মীও ব্যাপারটাকে সহজভাবে লইতে পারে নাই। তাহার ভাই তিনটি ছেলে লইয়া সম্পূর্ণভাবে তাহাদের গলগ্রহ হইয়া চিরকাল থাকিবে ইহাতে তাহার আত্মসম্মান যেন আহত হইয়াছিল। তাহার উঁচু মাথা যেন বার বার নীচু হইয়া যাইত। সে কিছুতেই এ মর্মান্তিক ব্যাপারের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। সে বরাবর বীরু পৃথ্বীশ উশনা কুমারের সহিত ইহাদের একটা পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিত। কখনও সমান মর্যাদা দেয় নাই। তাহার ভাবটা ছিল যখন উহারা অনিবার্যভাবে এ সংসারে আসিয়াই পড়িয়াছে তখন এটোকাঁটা খাইয়াই মানুষ হোক। সূর্যসুন্দর ইহার প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মী

মুখঝামটা দিয়া বলিত, "ভগবান যাদের দুঃখে রাখতে চান আমরা তাদের ভালো করতে চাইলে দুঃখ আরও বাড়বে। ওরা দুঃখেই মানুষ হোক। ওরা যখন দেশে ছিল তখন এইভাবেই থাকত। চাল বাড়িয়ে আর দরকার নেই।" সূর্যসুন্দর কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার মনে হইত অন্যায় হইতেছে। তাঁহার মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইয়াছে সন্তোষকে এখানে আনিয়া তিনিই কি ব্যাপারটাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন? কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তরও তো ছিল না। ধারে সন্তোষের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাঁধা পড়িয়াছিল। বিষয় অবশ্য বেশী ছিল না। কয়েক বিঘা ধেনো জমি আর ভদ্রাসনটুকু। কিন্তু ওটুকুও থাকিত না যদি সূর্যসুন্দর সে সময় গিয়া উপস্থিত না হইতেন। ধারের দায়ে সব বিকাইয়া যাইত, সন্তোষকে ছেলেদের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইত। সন্তোষের স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে প্রায় বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা গিয়াছিল। ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা সন্তোষের ছিল না। নিজেই সে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিয়াছিল। কোন ফল হয় নাই। সূর্যসুন্দরের তখন মনে হইয়াছিল সে পুণ্যবতী তাই আগেই মারা গিয়াছে। সূর্যসুন্দর সন্তোষের সমস্ত ধার শোধ করিয়া দিয়া বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর নামে কিনিয়া লইয়াছিলেন। না লইলে সন্তোষ আবার সেটা বাঁধা দিয়া ধার করিত। কারণ সন্তোষের উপার্জনের কোনও পথ ছিল না। সেই পথ করিয়া দিবার জন্য সন্তোষকে তিনি এখানে আনিয়াছিলেন। কাঁটাক্রোশ গ্রামে তাহার ছোট একটি ডিসপেনসারিও করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে হোমিওপ্যাথি অ্যালোপ্যাথি দুই রকম ঔষধই থাকিত। কিছুদিন সন্তোষের ভালো রোজগারও হইয়াছিল, কিন্তু সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সন্তোষকে এখানে আনিয়াছিলেন বলিয়া জগাই, মাধাই, বিলুকেও আনিতে হইয়াছিল। তিনি যাহা করিয়াছিলেন ভালোর জন্যই করিয়াছিলেন। তিনি আর একটা কাজও করিয়াছিলেন। তিনি বীরু, পৃথ্বীশ, উশনা, কুমার সকলকে একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন যে সন্তোষের বিষয়টা তিনি রাজলক্ষ্মীর নামে কিনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যদি কোনওদিন সন্তোষের ছেলেরা বড় হইয়া বিষয়টা ফেরত চায় তাহা হইলে সেটা ফেরত দিতে হইবে। বিষয়টা কিনিবার জন্য তিনি দেড় হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তাহারা বড়জোর সেই টাকাটা দাবি করিতে পারে। তিনি আশাও করিয়াছিলেন সন্তোষের ছেলেরা দেড় হাজার টাকা দিয়া বিষয়টা আবার ফিরাইয়া লইবে, আবার তাহাদের বাস্তুভিটায় গিয়া ঘর বাঁধিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। জগাইকেও তিনি হাসপাতালে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের কাজে ভরতি করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁহাকে হতাশ হইতে হইয়াছিল। জগাইকে তিনি অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের কাজে বাহাল করিয়াছিলেন তাহাকে মাসে মাসে কিছু পয়সা পাওয়াইয়া দিবার জন্য। রাজলক্ষ্মী একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল—জগাই মাঝে মাঝে পয়সা চুরি করিতেছে, উহাকে দূর করিয়া দাও। একদিন নিজেই তিনি তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। জগাই ভয়ে ভয়ে বাড়ীর বাহির হইয়া হাটতলায় অশ্বত্থগাছটার নীচে একা চুপচাপ বসিয়াছিল। সূর্যসুন্দরই সেদিন ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাহাকে। বলিয়াছিলেন, 'তোমার যখন পয়সার অভাব হবে চেয়ে নিও, চুরি কোরো না। ভদ্রলোকের ছেলে কি চুরি করে?' জগাই কিন্তু কিছুদিন পরে আবার চুরি করিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দর শেষে অনুভব করিলেন জগাই বড় হইয়াছে, সিগারেট-বিড়ি ধরিয়াছে, উহার

কিছু হাত-খরচ না থাকিলে ও সৎপথে থাকিতে পারিবে না। এই জন্যেই তিনি সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করিয়া অ্যাপ্রেণ্টিস্ ড্রেসারের পদে তাহাকে বাহাল করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বোঝা গেল জগাই হাসপাতালে ঢুকিয়াও চুরি করিতেছে। একদিন দেখা গেল ব্র্যাণ্ডির বোতলটা শূন্য। একজন মুসলমান কম্পাউণ্ডার ছিল, সে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। বলিল, 'আমি বলতে পারি না, জগাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন।' জগাই বলিল, সে কিছু জানে না। হাসপাতালের স্টক হইতে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটও কমিয়া যাইতে লাগিল। একদিন মত্ত অবস্থায় জগাই ধরা পড়িল। সেদিন রাগের মাথায় সূর্যসুন্দর তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছিলেন। চড় খাইয়া জগাই যাহা বলিয়াছিল তাহা সূর্যসুন্দরের আজও মনে আছে। বলিয়াছিল, পিশেমশাই এই চড়টা যদি আরও বছর দশেক আগে মারতে পারতেন তাহলে হয়তো কিছু উপকার হতো। এখন আর কিছু হবে না। ইহার পর জগাই আর সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে আসে নাই, সেই দিনই গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল স্টেশনের কুলি ছট্টুর বাড়ীতে। তাহার বাড়ীতেই থাকিত এবং জাহাজঘাটে কুলির কাজ করিত। যাহা রোজগার করিত সবই ছট্টুর হাতে দিত। জাহাজঘাটের কুলি-কণ্ট্রাকটার ছিলেন ওঝাজী। তাঁহাকে বলিলে তিনি জগাইকে দূর করিয়া দিতেন। তিনি একদিন আসিয়া জগাইয়ের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন যে জগাইকে রাখিবেন কি না। জগাই কাজ ভালোই করিতেছে, কিন্তু উহাকে কুলি করিয়া রাখিলে ডাক্তারবাবুর মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবে না তো? ওঝাজীকে সূর্যসুন্দর সব কথাই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। ইহাও বলিয়াছিলেন যে আমার মানসম্ভ্রম ইহাতে নষ্ট হইবে এ আশংকা আমার নাই। জগাই যদি আপনার কাজ ভালো করিয়া করে আপনি উহাকে রাখুন না। ওই কাজ হইতেই সে হয়তো একদিন উন্নতি করিতে পারিবে। আপনিই তো তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ওঝাজীও একদিন স্টেশনে কুলির কাজ করিতেন। পরে চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসায় করিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছেন। সূর্যসুন্দরের কথা শুনিয়া ওঝাজী খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। জগাইকে কুলিদের সর্দার করিয়া দিয়াছিলেন। জগাইকে আর মোট বহিতে হইত না, কুলি খাটাইতে হইত, কুলিদের হাজিরা রাখিতে হইত। ইহাতে তাহার আয়ও বাড়িয়াছিল। কিন্তু সে যাহা রোজগার করিত সবই যাইত তাড়ির দোকানে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় সে আর ছট্টু তাড়ির দোকানে বসিয়া তাড়ি খাইত। ক্রমশঃ জগাইয়ের যে অবস্থা হইল তাহাতে তাহাকে ভদ্রসমাজে স্থান দিবার কথা আর কেহ ভাবিতে পারিল না। তাহার চেহারাও বদলাইয়া গিয়াছিল। চোখের কোলে কালি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে গালপাট্টা দাড়ি; তাহাকে সহসা দেখিয়া চেনা যাইত না। রাজলক্ষ্মী বা সন্তোষ তাহার নাম পর্যন্ত মুখে আনিত না। তাহার পর একদিন ছট্টু হঠাৎ রেলে কাটা পড়িল। রেললাইনের উপর বসিয়াই তাড়ি খাইতেছিল রাত্রে। জগাইও পাশে ছিল। জগাই বাঁচিয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা আরও মর্মান্তিক। কিছুদিন পরে শোনা গেল জগাই ছট্টুর বিধবাকে বিবাহ করিয়াছে। ইহার পর সে আর মনিহারিতে থাকে নাই। অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে কেহ তাহার নামোচ্চারণ পর্যন্ত করিত না। সূর্যসুন্দর তাহাকে কিন্তু ভোলেন নাই। তাহার মুখটা মাঝে মাঝে তাঁহার মনে পড়িত। যদিও তিনি স্পষ্টভাবে কাহাকেও বলেন নাই কিন্তু একথা তাঁহার মনে হইত যে জগাইয়ের এই শোচনীয় পরিণামের জন্য সন্তোষ

তো দায়ী বটেই, তিনিও অংশতঃ দায়ী। দেশে সে যদি তাহাদের গ্রামে থাকিতে পাইত, নিজেদের জমির দেখাশোনা করিবার সুযোগ পাইত তাহা হইলে হয়তো সে এত খারাপ হইত না। জগাই সসঙ্কোচে বিছানার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল। সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বস! মাধাই আর বিলুর খবর কি।"

"মাধাই কলকাতায় আছে, চাকরি করে। তার খবর মাঝে মাঝে পাই। তার একটি ছেলে, দুটি মেয়ে হয়েছে। বিলুর কোন খবর পাই না। শুনেছি সে বম্বেতে থাকে—"

"তুই আজকাল কি করিস।"

"আগে যা করতাম তাই করছি। একটা ছোট তেলেভাজার দোকানও করেছি।"

জগাই স-সঙ্কোচে থামিয়া গেল। তাহার মনে হইল এইবার বোধহয় ছটুর বিধবার কথা উঠিয়া পড়িবে। ছটুর বিধবাই যে তেলে-ভাজার দোকানটি চালায়, তাহার গর্ভেই যে সে তিনটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, ছটুর দুইটি পুত্র সমেত সবসুদ্ধ পাঁচটি সন্তানের ভরণপোষণ যে তাহাকে করিতে হয় এসব সূর্যসুন্দরের কাছে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ঠিক করিয়াছে আজই সে চলিয়া যাইবে। চন্দ্রসুন্দর, হাবুমামা, বীরু, উশনা সকলেই তাহার দিকে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে তাহা অস্বস্তিজনক। অপমানজনক কোন কথা কেহ বলে নাই। কেহ মুচকি হাসিয়াছে, কেহ বলিয়াছে, "আরে তুমি যে! হঠাৎ!" কেহ আবার তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যেই আনে নাই। কবিরাজ মশাই হাসিমুখে তাহার দিকে আগাইয়া আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আরে আরে তুমিও এসে গেছ। বাঃ, বাঃ বাঃ। তাই ভাবছিলাম এই কংগ্রেসে সন্তোষবাবুর বংশের কোনও রিপ্রেজেনটেটিভ এলো না কেন? তুমি এসে গেলে, ভালোই হয়েছে; বাঃ! কৃষ্ণকান্ত তাহাকে দেখিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ জগাই বুঝিতে পারে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—হ্যালো মিস্টার ইউলিসিস্ খবর সব ভালো তো? বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে অনেকে চিনিতেই পারে নাই। যাহারা পারিয়াছিল তাহারা শোভন ভদ্রতারক্ষা করিয়াছে, কেহই উচ্ছ্বসিত হয় নাই। পুরসুন্দরী তাহাকে রান্নাঘরের বারান্দাতেই খাইতে দিয়াছিলেন, কিন্তু কাঁসার বাসনে দেন নাই। দিয়াছিলেন মাটির বাসনে। হয়তো বাড়ীতে কাঁসার বাসন ধোয়া ছিল না, হয়তো বা আর কিছু, কিন্তু একটা কথা মনে পড়াতে জগাইয়ের মনটা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাহার মনে পড়িয়াছিল বাড়ীতে যখন কোন মুসলমান বা ক্রীশ্চান অতিথি আসিত তখন রাজলক্ষ্মী তাহাদের চিনে-মাটির বাসনে খাইতে দিতেন। সে-ও আজ ইহাদের নিকট অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ীতে কাঁসার বাসনে খাইবার অধিকার আর তাহার নাই। গগন তাহাকে দেখিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিল, ও জগুকাকা! আপনাকে চিনতেই পারিনি। ভালো আছেন তো? একটা প্রণামও করিয়াছিল, কিন্তু জগাইয়ের মনে হইয়াছিল দায়সারা প্রণাম। দিগন্তর কাছে সে যাই নাই। দিগন্ত একটা ঘরে বসিয়া একমনে কি যেন লিখিতেছিল, তাহাকে গিয়া বিরক্ত করিতে সাহস হয় নাই তাহার। উষা সন্ধ্যাকে সে ছেলেবেলায় কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এখন তাহারা যেন নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। উষা আসিয়া অনেকক্ষণ বকবক করিল, তাহার ছেলেমেয়েদের কথা জানিতে চাহিল, তাহাদের জামাকাপড় কিনিবার জন্য কিছু টাকাও দিয়াছে সে, কিন্তু তবু জগাইয়ের মনে হইল ঠিক যেন আন্তরিকতা

নাই, তাহারা যাহা করিতেছে সবই যেন ভদ্রতারক্ষা করিবার জন্য করিতেছে, দয়া করিয়া করিতেছে। সন্ধ্যা ছট্টুর বউয়ের সম্বন্ধে নানারকম খুঁটিনাটি খবর জানিতে চাহিল। সে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত কি কি করে, ওখানে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য নাইট স্কুল আছে কি না, কুটির-শিল্প শিখাইবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি না— এইসব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া সে একটা খাতায় টুকিয়া রাখিল সব। তাহাদের ঠিকানাটাও টুকিয়া রাখিয়াছে, শেষ পর্যন্ত কি করিবে কে জানে। দুইখানা রঙিন শাড়িও সে দিয়াছে ছট্টুর বউয়ের জন্য। সবাই যেন কৃপা করিতেছে তাহাকে। স্বাতী আর চিত্রা তাহাকে প্রণাম করিল বটে, কিন্তু প্রণাম করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, যেন কোনও একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর একটু দূরে গিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া হাসিয়া কি যেন বলাবলি করিল। সে বীরু, পৃথ্বীশ, উশনার কাছে যায় নাই, তাহাদের এড়াইয়া চলিতেছিল সে। কুমার তাহাকে বলিয়াছে, আপনি জগুদা বাগানের ঘরটাতে গিয়ে থাকুন, সেখানে আরামে থাকবেন। জগাইয়ের মনে হইল কুমার তাহাকে বাড়ীর পরিবেশ হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছে। ভাবিল সত্যই তো সে এখানে বেমানান। এখানে আর না থাকাই উচিত। সে সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি এই ট্রেনে চলে যাচ্ছি—"

"এই ট্রেনেই ?"

"হ্যাঁ।"

সূর্যসুন্দরের মনে হইল তাঁহার প্রথম যৌবনের সহিত যে সব স্মৃতি জড়িত হইয়া ছিল সেগুলি একে একে মুছিয়া যাইতেছে। সন্তোষ অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। তাহার ছেলেরা দূরে দূরে চলিয়া গিয়াছে। জগাই হঠাৎ আসিয়াছিল, সে-ও চলিয়া যাইতে চায়। চলিয়া যাইবেই, পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সূর্যসুন্দরের একবার ইচ্ছা হইল জগাইকে আরও দুই চারিদিন থাকিতে বলেন। কিন্তু তাঁহারও মনে হইল জগাই এখানে বেমানান। থাকিতে বলিলে তাহারই হয়তো অসুবিধা হইবে।

"বৌমা—"

ঊর্মিলা মাথার শিয়রেই চিত্রার্পিতবৎ বসিয়াছিল। দিগন্ত তাহাকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই দিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল, দাদুর ঘুম ভাঙলে তাঁকে পড়ে শুনিও যদি শুনতে চান। গগন বলিয়াছিল খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতে। কিন্তু সূর্যসুন্দর খবরের কাগজ শুনিতে চান নাই। চন্দ্রসুন্দর গীতা আর রামায়ণের কথা পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর তাহাতেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। দিগন্তের কথায় তিনি কিন্তু রাজী হইয়াছেন। ঊর্মিলা 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা বাছিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সূর্যসুন্দরের ঘুম ভাঙিলেই তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইবে।

সূর্যসুন্দর আবার ডাকিলেন, "বৌমা—"

"কি বাবা—"

"জগাইকে কুড়িটা টাকা এনে দাও।"

ঊর্মিলা উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে কুড়িটি টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। জগাইয়ের হাতে টাকাগুলি দিয়া সে আবার নিজের স্থানটিতে গিয়া বসিল। জগাই নোট দুইখানা হাতে করিয়া নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল। সূর্যসুন্দর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—

"হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" তাহার পর চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন। উর্মিলা ভাবিয়াছিল কবিতা পড়িয়া শুনাইবে। কিন্তু সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। পাখাটি তুলিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল সে। সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঠিক ঘুম নয়. তাঁহার সমস্ত সত্তা যেন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই তন্দ্রার ঘোরে তিনি প্রায়ই স্বপ্ন দেখেন। অতীতের স্বপ্ন। সন্তোষকেই স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন তিনি। ছিপেছিপে লম্বা ধপধপে ফরসা সন্তোষ যেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পরিধানে সিমলার ফিতা-পাড় ধুতি, ভেলভেটের পাম-শু। হাতে সিগারেট। হঠাৎ যেন সূর্যসুন্দর দেখিতে পাইলেন তাহার অনামিকায় যে আংটিটা ছিল তাহা নাই।

"তোর হাতে আংটিটা দেখছি না?"

"ওটা বেচে দিয়েছি। নতুন প্যাটার্নের করাব একটা। ওসব সেকেলে আংটি আজকাল আর কেউ পরে না।"

"টাকাগুলি কি করলি?"

সন্তোষ এমনভাবে অন্যদিকে চাহিয়া রহিল যেন সে কিছুই শুনিতে পায় নাই। সূর্যসুন্দর বুঝিতে পারিলেন টাকাটা সে কোনও বাজে ব্যাপারে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। একটু পরেই সে নূতন একটা সিগারেট হোল্ডার বাহির করিয়া তাহাতে সিগারেট পরাইতে লাগিল। তাহার পর একটা রঙীন চশমা পরিয়া আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বটি নিরীক্ষণ করিল খানিকক্ষণ। দেখিতে দেখিতে সন্তোষের এ চেহারাটা মিলাইয়া গেল। ফুটিয়া উঠিল আর একটা ছবি। বারান্দায় বসিয়া সন্তোষ নির্বিকারভাবে কানে একটি দিয়াশালাইকাঠি ঢুকাইয়া কান চুলকাইতেছে। রাজলক্ষ্মী আসিয়া একবার তাহাকে বকিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন বামুনদিদি। তিনিও বকিলেন। সন্তোষ কিন্তু নির্বিকার। বকুনির ঝড় থামিয়া গেল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কোঁচা দিয়া পা দুইটি ঝাড়িল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সন্তোষ পারতপক্ষে কাহারও কথার কোন উত্তর দিত না। ঘুমের ঘোরেই সূর্যসুন্দরের কিন্তু মনে পড়িল মাঝে মাঝে ছোটখাটো রসিকতা করিত সে। সূর্যসুন্দরের বন্দুকটা লইয়া এক একদিন সে শিকারে বাহির হইত। মনে পড়িল একদিন সে খুব সকালে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্যসুন্দর যখন 'কল' সারিয়া ফিরিলেন তখন প্রায় বেলা দুইটা। তখনও সন্তোষ ফেরে নাই। সূর্যসুন্দরের স্নানাহার হইয়া গেল, তবু সন্তোষের পাত্তা নাই। বামুনদিদি সপ্তমে স্বর চড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। সন্তোষকে যে ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিলেন তাহা রাজলক্ষ্মীর আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করিল। সে বলিল—'আমার দাদাকে অমন করে গাল দিচ্ছ কেন তুমি। তোমার যদি ক্ষিধে পেয়ে থাকে তুমি খেয়ে নাও। আমি দাদার জন্যে বসে থাকব।' ইহাতে বামুনদিদি চামুণ্ডার মতো উঠানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার রোষের পরিধি আরও বাড়িয়া গেল। সূর্যসুন্দরকেও তিনি হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া হাড়-বোকা, পর-ভালানে ঘর-জ্বালানে প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া শেষে নিজেরই দুরদৃষ্টকে এবং দুরদৃষ্টের জন্য দায়ী ভাগ্যদেবতাকে ঝাঁঝালো ভাষায় সম্বোধন করিতে করিতে উঠানময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় উঠানের আর এক প্রান্তে

আবির্ভূত হইল সন্তোষ। হাতে কেবল বন্দুক। একটিও পাখী নাই। সূর্যসুন্দর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আগাইয়া গেলেন।

"কিরকম শিকার হলো ?"

"পেয়েছিলাম চারটে হাঁস। গরুর গাড়ির পিছনে ছিল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে অদ্ভুত কাণ্ড হলো একটা। বামুনদিদির গলার আওয়াজ পেয়ে মরা হাঁসগুলো ঝটপট করে উড়ে পালিয়ে গেল।"

সন্তোষ কখনও জোরে হাসিত না। তাহার চোখে মুখে একটা হাসির আভা ফুটিয়া উঠিত শুধু। তন্দ্রার ঘোরে সূর্যসুন্দর সন্তোষের সেই হাসিটি দেখিতে লাগিলেন। আর একটা ছবিও তাহার পর ফুটিয়া উঠিল ধীরে ধীরে। সন্তোষের ছেলে মাধাই-এর বিবাহের ছবিটা। বিবাহের দিন কন্যাপক্ষের বাড়ীতে সন্তোষের নতুন পামশু জোড়া হারাইয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। একটু পরে কন্যার পিতাও হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'আমারও জুতোজোড়া পাওয়া যাচ্ছে না।' সন্তোষ মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, 'তোমার জুতো তো মানুষ নেবে না। কুকুরপাড়ায় খোঁজ কর গে।' মাধাই-এর বিবাহপ্রসঙ্গে সূর্যসুন্দরের আর একটা কথাও মনে পড়িল। মন্মথর ছোটভাই বসন্ত তাঁহাকে দাদা বলিত এবং দাদার মতো খাতিরও করিত। সেও ডাক্তার হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদে বেশ ভালো প্র্যাক্‌টিস্‌ হইয়াছিল তাহার। সূর্যসুন্দরের অনুরোধে মাধাইকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াইয়াছিল সে। মাধাই যখন প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া রেলে চাকুরি পাইল (এ চাকুরিটিও করিয়া দিয়াছিল তাঁহার বন্ধু খোঁড়া অশ্বিনী) তখন স-সংকোচে একটা অনুরোধ করিয়াছিল সে। তাহার ছোট মেয়েটি কালো এবং ঈষৎ ট্যারা ছিল। বসন্ত অনুরোধ করিয়াছিল সন্তোষ যদি মাধাই-এর সহিত তাহার বিবাহ দেয়—সন্তোষ এ অনুরোধ রক্ষা করে নাই। কৃতজ্ঞতা বলিয়া সন্তোষের কিছু ছিল না। বসন্তের নিকট কোন পণ দাবি করিতে পারিবে না বলিয়াই সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে মাধাই-এর ও মেয়ে পছন্দ নয়। মাধাই যদি এ মিথ্যার প্রতিবাদ করিত তাহা হইলে হয়তো বিবাহ হইয়া যাইত। কিন্তু মাধাই চুপ করিয়া রহিল, যাহারা তাহাকে মানুষ করিল, যাহাদের সাহায্য না পাইলে তাহাকে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইত (কারণ তাহাকে বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া পড়াইবার সামর্থ্য সন্তোষের তো ছিলই না, সূর্যসুন্দরেরও ছিল না। সূর্যসুন্দর নিজের তিনটি ছেলেকে বোর্ডিংএ পাঠাইয়া তখন হিমশিম খাইতেছিলেন)—বসন্ত বাড়ীতে স্থান না দিলে মাধাই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিত না—বসন্তের মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে তাহার নিজেরও সামাজিক মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যাইত, কারণ বসন্ত পরে একজন নামজাদা কংগ্রেসী হইয়াছিল —কিন্তু মাধাই শেষ পর্যন্ত চুপ করিয়াই রহিল। পরে শোনা গেল সন্তোষ জনৈক ভদ্রলোকের নিকট কিছু টাকা অগ্রিম লইয়াছিল। প্রথমে ধার বলিয়াই লইয়াছিল। সুদে আসলে সে টাকা বাড়িয়া নাকি তিন হাজার টাকায় দাঁড়ায়। তখন সন্তোষ বলে টাকা আমি আর ফেরত দিতে পারিব না, আপনি আমার পালটি ঘর, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনার মেয়েটিকে পুত্রবধূ করিয়া লইতে পারি। মেয়েটি দেখিতে মোটেই ভালো ছিল না। অনেকেই নাকি তাহাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু কেহই পছন্দ করে নাই। সন্তোষ তাহারই সহিত মাধাইয়ের বিবাহ দিল। যদিও সন্তোষ

সূর্যসুন্দরের বাড়ীতেই থাকিত তবু তাহার নিজের হাতে কিছু টাকা না থাকিলে সে স্বস্তি পাইত না। বাবু লোক ছিল সে, যখন তখন টুকি-টাকি শৌখিন জিনিস কিনিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, এসব কারণেই হাতে কিছু টাকা না থাকিলে সে স্বস্তি পাইত না। টাকা সংগ্রহ করিবার প্রধান উপায় ছিল অবশ্য ধার। সূর্যসুন্দরের খাতিরে অনেকে তাহাকে ধার দিত। নিজের পুরাতন শৌখিন জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় সে ধার শোধও করিয়া দিত। পুরাতন ঘড়ি, পুরাতন আংটি, পুরাতন শাল সবই একে একে বিক্রয় করিয়াছিল সে। দেশে তাহার বিঘা দেড়েক ধেনো জমি ছিল যাহা সূর্যসুন্দর কিনিয়া লইতে পারেন নাই এবং যাহা তাহার ঋণের আওতাতে পড়ে নাই। এ জমির অস্তিত্ব সূর্যসুন্দর জানিতেনও না। সন্তোষ সে জমিটুকুও বিক্রয় করিয়া দিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল এবং কিছুদিন স্ফূর্তিতে ছিল। পরিষ্কার জামা-কাপড়, পরিষ্কার বিছানা, সুন্দর জুতা, রঙীন চশমা, চমৎকার একটি হাত আয়না, শীতকালে মুর্শিদাবাদের বালাপোশ, একটু এসেন্স, ভালো রুমাল এসব না থাকিলে সন্তোষ কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। এসবের জন্য সে সূর্যসুন্দরের নিকট টাকা চাহিতে পারিত না। তাই নানাস্থানে ধার করিতে হইত তাহাকে। কোথাও ভিক্ষা করিতে পারিত না। যদিও সে সর্বস্বান্ত হইয়াছিল তবু তাহার আত্মসম্মানবোধ প্রবল ছিল। তাহার মনোভাব ছিল ওমর খৈয়ামের মতো। আর তাহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইত সে যেন কোনও নির্বাসিত রাজা। ঘটনাচক্রে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু সিংহাসনের আশা একেবারে ত্যাগ করে নাই। তাহার মনের এই আভিজাত্যকে সূর্যসুন্দর সম্মান করিতেন। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িত সন্তোষের বাড়ীতে একদিন কি প্রাচুর্যই না ছিল। বাড়ীর পিছনে হাঁসের ডিমের খোলার একটা ছোটখাটো পাহাড়ই হইয়া গিয়াছিল। মাছ দুধ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়ীর খিড়কিতে বেশ বড় পুকুর ছিল, উঠানে গাই বাঁধা থাকিত। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুবই খুঁতখুঁতে ছিল সন্তোষ। তরকারির নানারকম বাছ-বিচার ছিল। এখানে আসিয়া সেই ব্যক্তি বামুনদিদির বকুনি শুনিতে শুনিতে যাহা পাইত তাহাই খাইয়া ফেলিত। কোনও মন্তব্য করিত না। স্বভাবতঃ নীরব প্রকৃতির লোক ছিল সে। নিজেকে লইয়া আনমনে থাকিতেই ভালোবাসিত। রায়মহাশয়—ত্রিপুরারি সিংহের প্রবলপরাক্রান্ত ম্যানেজার চন্দন রায়, সন্তোষের এই স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের একজন সমঝদার ছিলেন। সন্তোষের সহিত তাঁহার একটা মধুর সম্পর্কও গড়িয়া উঠিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে শুধু যে নানারকম পরিহাস বিনিময় হইত তাহা নয়, রায়মহাশয় সন্তোষের আভিজাত্যকে সম্মানও করিতেন। একটা ছবি সূর্যসুন্দরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সন্তোষ হাতী হইতে নামিয়া যাইতেছে। বহুকাল আগে একবার সন্তোষকে লইয়া সূর্যসুন্দর ত্রিপুরারি সিংহের অসুস্থ স্ত্রীকে দেখিতে তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথ হইলে অনেক সময় সূর্যসুন্দর সন্তোষকে সঙ্গী হিসাবে লইতেন। হাতীতে চড়িয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা। কিন্তু ত্রিপুরারী সিংহের স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া সূর্যসুন্দর অনুভব করিলেন যে তাঁহাকে দুই একদিন থাকিতে হইবে। নিউমোনিয়া হইয়াছে, ক্রাইসিসের সময় থাকা দরকার। তখন তিনি চন্দন রায়কে বলিলেন, "আমি থাকব। আপনি সন্তোষকে বরং পাঠিয়ে দিন। বাড়ীতে না হলে ভাববে।" চন্দন

রায় বলিলেন, "বেশ তো হাতীটাই দিয়ে আসুক ও'কে। সঙ্গে একটা সিপাহীও দিয়ে দিচ্ছি।" হুকুম দিয়া দিলেন। সন্তোষ হাতীতে চড়িল। সিপাহীটা হাতীর পিছনে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। চন্দন রায় বারান্দার চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁহার ভ্রূদুইটি কুঞ্চিত হইয়া গেল।

"কিছুদূরে গিয়ে হাতীটা বসল কেন?"

খবর জানিবার জন্য আর একটা সিপাহীকে বাইকে করিয়া ছুটাইয়া দিলেন। সে খবর লইয়া আসিল সে সন্তোষবাবু হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যে সিপাহীটা সন্তোষবাবুর সহিত যাইতেছিল সে হাতীর লেজ ধরিয়া হাতীর পিঠে চড়িয়া সন্তোষবাবুর পাশে গিয়া বসিয়াছিল। ইহাতে সন্তোষবাবু বোধহয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি হাতী থামাইয়া নামিয়া গিয়াছেন। চন্দন রায়ের এক চক্ষু হইতে আগুন ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি সিপাহীটিকে বলিলেন, "তুমি আবার যাও। ওই রামদৎ সিংহকে কান ধরে হাতী থেকে নামিয়ে এখানে নিয়ে এস। আর মাহুতকে বল সে যেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সন্তোষবাবুকে আবার তুলে নেয়।" একটু পরেই রামদৎ সিং আসিল এবং চন্দন রায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

চন্দন রায় সন্তোষকে খুব ভালোবাসিতেন। ভয়ের মধ্যে হাস্য পরিহাসের একটা দ্বন্দ্বও চলিত। চন্দন রায় খাইতে বসিয়া কথা বলিতেন না। একদিন চন্দন রায় খাইতে বসিয়াছেন। পাচক ক্ষীরের বাটিটা থালার নিকট হইতে একটু দূরে রাখিয়া গিয়াছে। সন্তোষ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"রায় মশায়, ক্ষীরের বাটিটা সরিয়ে রেখেছেন যে। খাবেন না বুঝি? আমি তাহলে খেয়ে ফেলি, কি বলেন।"

রায় মহাশয় খাইতে শুরু করিয়াছিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না। নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন সন্তোষ মহানন্দে সমস্ত ক্ষীরটি নিঃশেষ করিতেছে। খাওয়া শেষ করিয়াও তিনি সন্তোষকে কিছু বলিলেন না। তাঁহার চক্ষুটি কেবল হাসিতে লাগিল। সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "কেমন ঠকিয়েছি আপনাকে। বলেছিলাম না, খেতে বসে নির্বাক হয়ে থাকেন, একদিন ঠকবেন?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "মানুষ কিসে ঠকে কেমন করে ঠকে এসব বিষয়ে তোমার জ্ঞান তো টনটনে দেখছি। আচ্ছা, দেখা যাবে—"

"আমাকে আপনি ঠকাতে পারবেন না।"

রায় মহাশয় কিছু বলিলেন না। তিনি অযথা বাক্যব্যয় করিতেন না।

মাসখানেক পরে রায় মহাশয় একদিন বারান্দায় বসিয়া কাজ করিতেছেন। একজন মিস্ত্রী একটি খাটিয়ার ফ্রেম বারান্দায় রাখিয়া গেল এবং বলিল যে সে মধুয়াকে বলিয়াছে, কাল আসিয়া দড়ি দিয়া খাটটি বুনিয়া দিয়া যাইবে। খাটটি বারান্দায় পড়িয়া রহিল, রায় মহাশয় কাজ করিতে লাগিলেন। তারপর চাকরকে বলিলেন, "এই খাটটার উপর একটা চাদর ভালো করে পেতে দাও তো।" চাকরটা একটু বিস্মিত হইল. খাটের ফ্রেমে কি করিয়া চাদর বিছাইবে! রায় মহাশয় বলিলেন, "ফ্রেমের উপরই বিছিয়ে দাও, মোটা ভারী চাদরটা নিয়ে এস।" তাহাই হইল। চাকর চাদরটি খাটের উপর টান করিয়া বিছাইয়া দিয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে সন্তোষ আসিতেছে। রায়

মহাশয় তাহাকে দূর হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। সন্তোষ যখন বারান্দায় উঠিল তখন রায় মহাশয় কেবল মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এস। রোদে বড্ড কষ্ট পেয়েছ মনে হচ্ছে—"

"বাঃ, সুন্দর বিছানা পেতে রেখেছেন দেখছি। একটু শোয়া যাক্—"

ধপাস্ করিয়া বিছানায় বসিতেই সঙ্গে সঙ্গে চিৎপাত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল সে।

রায় মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "লাগে নি তো? দেখে শুনে বসতে হয়।"

"একটা খাটের ফ্রেমে চাদর বিছিয়ে রাখবার মানে?"

সন্তোষ সত্যই খুব অপ্রস্তুত হইয়াছিল। রায় মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আর একটা ঘটনাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। রায় মহাশয় কলিকাতা গিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় বেলুনওড়া এবং বেলুন হইতে প্যারাস্যুটের সাহায্যে নামিয়া আসা লইয়া খুব একটা হইচই হইতেছিল। রায় মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া ফলাও করিয়া এ বিষয়ে গল্প করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন— "আমি আর একটা জিনিসও দেখে এলাম। তার খবর কাগজে এখনও বেরোয় নি। সম্ভবতঃ বেরুবেও না, কারণ গভর্মেণ্ট মানা করে দিয়েছে। জাপানীরা আবিষ্কার করেছে সেটা।"

আমরা সকলেই উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম।

"জাপানীরা? কি বলুন তো।"

"খুবই সহজ, অথচ খুবই অদ্ভুত। বেলুনের সাহায্য না নিয়েও আকাশে ওড়া যায়। কেবল দুটি ছাতা চাই।"

"কি রকম?"

"কি রকম তা বলে বোঝাব কি করে। হাতে নাতে করে তাহলে দেখিয়ে দিতে হয়। দুটো বড়ো ছাতা চাই কেবল। আর একটা বড় লাঠি আর কিছু লাকলাইনের মজবুত দড়ি। ব্যস আর কিছু চাই না।"

"সবই তো এখানে পাওয়া যাবে।"

"বেশ তাহলে যোগাড় করে ফেল। আমাদের কাছারিতে আমার বাসায় করব প্রথমে। বাইরের লোক থাকবে না সেখানে। উড়বে কে? মোটা লোককে ওড়াতে পারব না। পাতলা লোক চাই। সন্তোষ উড়বে? তুমি বেশ ছিপছিপে আছ। সোঁ করে উড়ে যাবে।"

"উড়ে গিয়ে তারপর নামব কি করে?"

"লাকলাইনের সুতো বাঁধা থাকবে। অনায়াসে নামিয়ে নিতে পারব।"

বিকালবেলা রায় মহাশয়ের বাসায় আমরা সবাই সমবেত হইলাম। রায় মহাশয় প্রকাণ্ড লাঠিটা সন্তোষের পিঠের দিক দিয়া লম্বা করিয়া ধরিলেন। তাহার পর সন্তোষকে বলিলেন, "এইবার হাত ছড়িয়ে দাও দু'দিকে বেশ লম্বা করে। এইবার দড়িটা দাও।" পিছন দিক হইতে সন্তোষের দুই হাতের সহিত লাঠিটি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন তিনি।

"ঠিক হয়েছে। এইবার ছাতা দুটো খোল। খোলা ছাতা দুটো দু'হাত দিয়ে শক্ত মুঠো করে ধর এবার সন্তোষ।"

মুঠোর উপরও দড়ি দিয়া তিনি ছাতা দুইটিকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর রায় মহাশয় যাহা করিলেন তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমরা আঁতকাইয়া উঠিলাম। ফস্ করিয়া তিনি সন্তোষের পরনের কাপড়টা খুলিয়া দিলেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া সন্তোষ ঘরময় নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"উড়ছে, উড়ছে, ওই দেখ উড়ছে—"

মৃদু হাসিয়া রায় মহাশয় বাহির হইয়া গেলেন। আর ফিরিলেন না। শুনিলাম বাহিরে তাঁহার জন্য ঘোড়া অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি বেরিয়া কাছারিতে চলিয়া গিয়াছেন। দিন সাতেক পরে তিনি ফিরিলেন। ফিরিয়া সন্তোষকে একজোড়া ভালো ফরাসডাঙার ধুতি, জরি পাড় দেওয়া চাদর এবং পাঞ্জাবি করাইবার জন্য উৎকৃষ্ট আদ্দি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গে একটি ছোট চিঠিও ছিল। চিঠিতে লেখা ছিল : 'ভাই সন্তোষ, আমাকে মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জমিদারির কাজ বড়ই কঠোর ও শুষ্ক। এই মরুভূমিতে তুমিই একমাত্র ওয়েসিস। তাই তোমার উপর মাঝে মাঝে অত্যাচার করি। ক্ষমা করিও। তুমি ক্ষীর ভালোবাস। কাল তোমার জন্য এক হাঁড়ি ক্ষীরও পাঠাইয়া দিব।' ইহার পর সন্তোষের রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। রায় মহাশয় সত্যই সন্তোষকে খুব ভালোবাসিতেন। বাহিরের লোকের কাছে তিনি গম্ভীর রাশভারী লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে যমের মতো ভয় করিত। একমাত্র সন্তোষের কাছেই তিনি মাঝে মাঝে প্রগল্ভ হইতেন। সন্তোষকে নানাভাবে তিনি আর্থিক সাহায্য করিবারও চেষ্টা করিতেন। সন্তোষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিত। সন্তোষের কাছে মাঝে মাঝে তিনি রোগী পাঠাইয়া দিতেন। দূরের রোগী হইলে সন্তোষ সহজে যাইতে রাজী হইত না। সন্তোষের হাতে যতক্ষণ টাকা থাকিত ততক্ষণ উপার্জনের কোনরূপ প্রয়াস করিত না সে। একবারের একটি ঘটনার কথা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। মনিহারী হইতে প্রায় মাইল দশেক দূরে আমদাবাদ বলিয়া একটি গ্রাম আছে, সেখান হইতে একদিন একটি লোক আসিয়া বলিল—"আমার ছেলের অসুখ হয়েছে অনেকদিন থেকে। পেটের গোলমাল। কিছুতেই সারছে না। রায়জী আমাকে বললেন সন্তোষবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। তাঁর ওষুধই খাওয়াও। আমি গাড়ি এনেছি।" সন্তোষ যাইতে রাজী হইল না। বলিল গরুর গাড়ি চড়িয়া অতদূরে সে যাইতে পারিবে না। লোকটি কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। বলিল; তাহার গরুর গাড়িতে ভালো বিছানা আছে। গরু দুটিও ভালো, ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে পারে। নগদ কুড়ি টাকা ফি দিতেও সে রাজী। তবু সন্তোষ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বলিল একা অতদূর যাইতে তাহার মন সরিতেছে না। সূর্যসুন্দরেরও একটা 'কল' ছিল আমদাবাদের কাছেই। তিনিও সন্তোষের সহিত যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "একসঙ্গেই যাওয়া যাক চল। আমার গাড়িটা পিছনে পিছনে আসুক।" তখন সন্তোষ আর 'না' বলিতে পারিল না। একবার শুধু বলিল, "তুমি যখন ওই দিকে যাচ্ছ, তখন তুমিই দেখে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। আমাকে আর টানছ কেন।" তখন সে লোকটি বলিল, "রায়জী সন্তোষবাবুকে নিয়ে যেতে বলেছেন। সন্তোষবাবু যদি না যান তাহলে আমার উপর উনি ভয়ানক চটে যাবেন। আর রায়জী চটলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনি চলুন বাবু দয়া করে।" তখন যাইতেই হইল। প্রায় মাইলখানেক যাইবার পর গাড়িটি রাস্তার একটা

গর্তে পড়িয়া কাৎ হইয়া যাইতেই সন্তোষ হিন্দী ভাষায় যাহা বলিয়াছিল তাহা সূর্যসুন্দরের এখনও মনে আছে। বলিয়াছিল—"আনেকা বখৎ তো আকাশকা চাঁদ পাড়কে হাত মে দিয়া থা! আভি ক্যা হুয়া।" গাড়োয়ান বিহারী, কিন্তু সন্তোষের এ হিন্দী সে বুঝিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "হুজুর হামারা নাম চাঁদ নেহি হ্যয়। হামারা নাম রঘুবীর।" সন্তোষের নানা কথা টুকরো টুকরো ভাবে মনে পড়িতে লাগিল সূর্যসুন্দরের। একবার বাড়ীতে খাসি কাটা হইয়াছিল। সেজন্য পশ্চিমদিকের বারান্দায় মধুয়া চাকর মসলা বাটিতেছিল। একটু দূরে সন্তোষ বসিয়া কানে কাঠি ঢুকাইয়া ধীরে ধীরে সেটি ঘুরাইতেছিল। আরামে চোখ দুইটি বুজিয়া আসিয়াছিল তাহার। পাশের ঘর হইতে সূর্যসুন্দর তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ মধুয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু দেখুন তো, আরও মসলা কি বাটতে হবে?" সন্তোষ কান হইতে কাঠিটি বাহির করিয়া মসলাগুলির দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার পর বলিল, "বাটতে হবে বইকি। ওটুকুতে কিচ্ছু হবে না। অতবড় একটা জানোয়ারকে খাব আমরা, অনেক মসলা দরকার।" কতদিন আগেকার কথা, কিন্তু কথাগুলি সূর্যসুন্দরের মনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইল যেন এখনই শুনিয়াছেন। মনে হইল সন্তোষ যেন পাশেই আছে। তাহার চোখ দুইটি খুলিয়া গেল। গোড়া হইতেই তাঁহার একটা চোখ ভালো করিয়া খুলিতেছিল না। এখনও তাহার মনে হইল ওটা যেন আরও বেশী বুজিয়া আসিতেছে। তবু তিনি সামনের দেয়ালে রাজলক্ষ্মীর ছবিটি দেখিতে পাইলেন। অনেকক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন সেদিকে। আবার যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন যাহা ছিল তাহা আর নাই, যাহা আছে তাহাও আর থাকিবে না। অস্ফুটকণ্ঠে আবার বলিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" আবার তাঁহার চোখ দুইটি বুজিয়া গেল। আবার তিনি সন্তোষেরই নানা ছবি দেখিতে লাগিলেন মনে মনে। অতীত মরিয়াও মরে না। নানা বেশে বার বার ফিরিয়া আসে সে। তিনি দেখিতে লাগিলেন সন্তোষ যেন নিজের বিছানাটি পাতিতেছে। প্রতিদিন খাইবার পূর্বে নিজের বিছানাটি সে নিজে হাতে পাতিত। অপর কাহারও পাতা বিছানা পছন্দ হইত না তাহার। ধপধপে শাদা চাদরটি টান করিয়া পাতিয়া, তাহার উপর বালিশগুলি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া রাখিবার পর একটু দূরে দাঁড়াইয়া সে দেখিত, লোকে যেমন ভালো ছবি দেখে অনেকটা সেইরকম। বিছানায় বা বালিশে সামান্য ময়লা বা কোঁচ থাকিতে দিত না সে। বিছানাটি করিয়া তামাক সাজিতে বসিত। ভালো অম্বুরী তামাক বড় কলিকায় অনেকক্ষণ ধরিয়া সাজিত। কলিকায় তামাক দিবার আগে ঠিকুরেটা পরিষ্কার করিত দুই আঙ্গুল দিয়া। তাহার পর তামাকটা গুঁড়া গুঁড়া করিয়া তাহার উপর দিত। তাহার পর দিত তাওয়া। তাহার পর টিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাওয়ার উপর সাজাইয়া দিত নিপুণভাবে। তাহার পর টিকেতে আগুন দিয়া কলিকাটি বসাইয়া দিত গড়গড়ার মাথায়। একটি শৌখিন গড়গড়া ছিল তাহার। গড়গড়াটি বিছানার একাধারে রাখিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিত সে। তাহার পর হাত দুইটি মুছিত একটি ফরসা তোয়ালেতে। এইসব করিতে বেশ কিছুক্ষণ সময় যাইত। বামুনদিদি খাবার দিয়া ডাকাডাকি করিতেন। দেরি হইলে বকিতেন। সন্তোষ কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করিত না। সমস্ত নিপুণভাবে শেষ করিয়া তবে খাইতে বসিত। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় বসিয়া গড়গড়ার

নলটি তুলিয়া ধীরে ধীরে টান দিত সে। আরামে তাহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিত। সন্তোষের ভাগ্যহত ছন্নছাড়া জীবনে এইটুকুই ছিল একমাত্র বিলাস। কিন্তু এটুকুও কেহ যেন সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য সবাই রাগ করিত তাহার উপর। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আলাদা সাবান দিয়া কাচাইত সে, কিন্তু সেজন্য লোক চাই, সাবান চাই, রাজলক্ষ্মী এজন্য প্রসন্ন ছিল না। গড়গড়াটা ধারে কিনিয়া আনিয়াছিল বলিয়া সূর্যসুন্দর বকিয়াছিলেন তাহাকে। তাহার পর ধার শোধ করিয়া দিবার জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। সন্তোষ টাকা লয় নাই। বলিয়াছিল, আমার ধার আমি শোধ করব। ও নিয়ে চিন্তিত হয়ো না তুমি! সন্তোষের বাক্সে যে একটা রূপার পানের ডিবা ছিল তাহা এক রাজলক্ষ্মী ছাড়া আর কেহ জানিত না। কিছুদিন পরে নিখিলবাবুর জামাইকে যখন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইল তখন রাজলক্ষ্মী বলিল "দাদা, আমাদের সেই রূপোর ডিবেটা বার করে দাও না। জামাইকে পান দেব।" দেখা গেল ডিবেটি নাই। সন্তোষ নির্বিকারভাবে বলিল, "সে ডিবে তো অনেকদিন আগেই বিক্রী হয়ে গেছে।" সূর্যসুন্দর বুঝিলেন ডিবা গড়গড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। সন্তোষ সম্বন্ধেই এলোমেলো নানাকথা মনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই তো কিছুদিন আগেই, সন্তোষের মৃত্যুর বছরখানেক পূর্বে বোধহয়, সে ভারী একটা মজার কথা বলিয়াছিল। সূর্যসুন্দর তখন দাঁত বাঁধাইয়াছেন। কি একটা ব্যাপার লইয়া খুব রাগারাগি করিতেছিলেন তিনি। সন্তোষ বারান্দার একধারে বসিয়া সন্তর্পণে কানে কাঠি দিয়া কান চুলকাইতেছিল। কাঠিটি কান হইতে বাহির করিয়া বলিল, "বেশী দাঁত কড়মড় ক'রো না, বাঁধানো দাঁত ভেঙে যাবে। খরচায় পড়ে যাবে—।" দেখিতে দেখিতে সব ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল। সূর্যসুন্দর সত্যই এবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আশ্চর্য একটা স্বপ্নলোকে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন যেন। অতীত সেখানে যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী, দিদিমা, মামা, সন্তোষ, রায় মহাশয়, বামুনদিদি, মন্মথ, ত্রিপুরারি সিং সকলেই সেখানে রহিয়াছেন। এমন কি হাতকাটা দুধনাথ পাঁড়েও রহিয়াছেন সেখানে। তাঁহাকে দেখিয়া এক হাতেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল সে, আগে যেমন করিত।

॥ ৩৩ ॥

সুব্রত এবং সোমনাথ দুইজনেরই ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছিল। এইবার তাহাদের যাইতে হইবে। চিত্রা এবং স্বাতী কিন্তু এত শীঘ্র যাইতে রাজী নয়। তাহারা আরও কিছুদিন থাকিতে চায়। কুমার আশ্বাস দিয়াছে যে সে যথাসময়ে তাহাদের পেঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং ঠিক হইয়াছে সুব্রত এবং সোমনাথ একা একাই যাইবে। উশনাও থাকিতে পারিবে না। সে নাকি কয়েকটা জরুরী কাজ ফেলিয়া আসিয়াছে। দুই একদিনের মধ্যে তাহাকেও সপরিবারে ফিরিতে হইবে। চন্দ্রসুন্দর একটা ভালো দিন দেখিবার জন্য পাঁজি বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু উশনা তাহাতে বাধা দিল। বলিল, "আমাদের যখন যেতেই হবে, কামাই করবার যখন কোনও উপায় নেই তখন আপনি আর পাঁজির ফরকট্ তুলবেন না কাকাবাবু। দুর্গা

বলে বেলপাতা শুকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমিও ভাবছি সুব্রত আর সোমনাথের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। দাদার এ জামাই দুটির সঙ্গে আমার তেমন আলাপ হয়নি। যেতে যেতে আলাপ করা যাবে। সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত অনেক সময় পাব।"

সূর্যসুন্দর খবরটা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কোনও মন্তব্য করিলেন না। কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

উশনা বলিল, "আমার কয়েকটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছি, তাই চলে যেতে হচ্ছে। তবে আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে থেকে যাব। কিছু টাকা না হয় লোকসান হবে—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "না কাজ ক্ষতি করে থাকতে হবে না। দেখা তো হয়ে গেল। এই যথেষ্ট—।"

সূর্যসুন্দর আর কিছু বলিলেন না। অর্ধনিমীলিত নয়নে রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল রাজলক্ষ্মী যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে—"ওদের আর কিছুদিন থাকতে বললে না কেন। ওদের চাকরি বা ব্যবসা কি তোমার চেয়েও বড। ওরা কি কিছুদিন ছুটি নিতে পারে না? ওদের তুমি থাকতে বল।"

সূর্যসুন্দরের মনে হইল রাজলক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকিলে এই কথাই বলিত। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন উশনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি হয়তো কিছু বলিতেন, সেটা আর বলা হইল না। আর একবার অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

"বাবা, ঘুমিয়েছেন?"

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া রাজলক্ষ্মীর কথাই ভাবিতেছিলেন। চোখ খুলিয়া দেখিলেন চম্পা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে একটি ফিডিং কাপ এবং রঙীন তোয়ালে।

"ওভালটিন এনেছি—"

পাশের ঘর হইতে গগনও আসিয়া প্রবেশ করিল। সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "কত আর খাব। এইতো একটু আগে কি যেন একটা খেলাম।"

"সামান্য একটু আঙ্গুরের রস খেয়েছেন"—গগন বলিল—"ও তো আপনার কাছে কিছুই নয়। ওভালটিনটা খেয়ে নিন! আমি আপনার জন্য পায়রার বাচ্চা আনতে দিয়েছি, বিকেলে 'জগ্ স্যুপ' করে দেব—"

সূর্যসুন্দরের ওসব খাইবার—কোন কিছু খাইবারই—বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গগন তাঁহার জন্য এই সব ব্যবস্থা করিতেছে ইহাতে তাঁহার সমস্ত মন মাধুর্যে ভরিয়া গেল। চম্পা নিপুণভাবে তাঁহার গলার চারিধারে রঙীন তোয়ালে জড়াইয়া ওভালটিন খাওয়াইতে লাগিল। সূর্যসুন্দর আর আপত্তি করিলেন না। ওভালটিন খাওয়া হইয়া গেলে তিনি উদ্ভাসিত চক্ষে গগনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জগ্ স্যুপ? সে তো চমৎকার হবে। তোর বাবার ছেলেবেলায় নিউমোনিয়া হয়েছিল, তখন পূর্ণিয়া থেকে সাহেব সিভিল সার্জন দেখতে এসেছিলেন। তিনি বীরুকে চিকেনের জগ্ স্যুপ করে দিতে বলেছিলেন। তোর দিদি নিজে হাতে সেটা তৈরী করতেন। তারপর বীরুকে সেটা খাইয়ে গঙ্গাজলে স্নান করে ফেলতেন। ডাকবাংলায় পচুনা বলে একটা খানসামা ছিল সে কেটেকুটে সব ব্যবস্থা করে দিত।"

"আমিও ছোটকাকাকে চিকেন আনতে বলেছিলাম। কিন্তু চিকেন পাওয়া গেল না। কালীপদ পণ্ডিতের বাড়ী থেকে পায়রার বাচ্চা নিয়ে এসেছে।"

"ওতেও চমৎকার স্থপ হবে। তুই নিজে করবি নাকি?"

"হ্যাঁ। আমি আলাদা একটা তোলা উনুন আনিয়েছি। মধু কুটে দিলেই চড়িয়ে দেব। ও আপনি এসেছেন? আজই যাচ্ছেন নাকি?"

সুপর্ণ সিংহ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সূর্যসুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

গগন বলিল, "ইনি আমার একজন বন্ধু। অনুর আত্মীয়। আজই যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ আজই যাব।"

সুপর্ণ সিংহ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন। গগনও তাঁহার পিছু পিছু গেল।

"অনুর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?"

"হয়েছে। গঙ্গার ধারে এতক্ষণ আমরা ছিলাম।"

"কি ঠিক হলো—"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুপর্ণ সিংহ বলিলেন, "আমি এখনই ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি। কিন্তু অনু বলছে সে ওর বাবাকে আগে চিঠি লিখবে। তিনি যা বলবেন তাই হবে। বাবাকে লুকিয়ে ও আর কিছু করতে রাজী নয়। আমিও বললাম, বেশ তাই হোক।"

বাগানের বেড়ার কাছে পার্বতীকে দেখা গেল। মুচকি হাসিয়া সে সুপর্ণ সিংহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "জামাইবাবু, আসুন, অনুদির ঘরে আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

পার্বতী গগনের দিকে চাহিয়াও আর একবার হাসিল। তাহার পর এক ছুটে চলিয়া গেল। দূর হইতে আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"শীগগির আসুন, ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই।"

সুপর্ণ সিংহের কানের ডগা দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজের হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ট্রেনের তো দেরি নেই। আমি বরং সোজা স্টেশনেই চলে যাই। তা না হলে ট্রেন পাব না।"

"খেয়ে যান। ট্রেন আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি ব্যবস্থা করছি।"

গগন এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিতে পাইল গঙ্গা বাগান হইতে এক ঝুড়ি তরকারি লইয়া আসিতেছে।

"গঙ্গাকাকা, শোন একবার—"

গঙ্গা দ্রুতপদে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার আবার কি হুকুম। পায়রা তো এসে গেছে। মধু একটু পরে আসছে, বানিয়ে দেবে।"

"তুমি ছুটে একটু স্টেশনে যাও। স্টেশনমাস্টারকে বোলো আমাদের বাড়ী থেকে একজন লোক যাবে। যদি তাঁর স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয় ট্রেনটা যেন একটু ডিটেন করেন।"

গঙ্গা চলিয়া গেল।

সুপর্ণ সিংহ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"ট্রেন ডিটেন করবে?"

"করবে। আপনি যান খেয়ে নিন।"

সুপর্ণ সিংহকে পাঠাইয়া দিয়া গগন আবার সূর্যসুন্দরের কাছে গেল।

"উনি এখনই চলে যাচ্ছেন বুঝি।"

"হ্যাঁ।"

"দিগন্ত কোথায়, তাকে দেখছি না।"

"সে তার থীসিস নিয়ে ব্যস্ত।"

"কি সম্বন্ধে লিখছে।"

"সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে। সে প্রমাণ করতে চাইছে যে সংস্কৃত সাহিত্য মরেনি, এখনও প্রবলভাবে বেঁচে আছে। গ্রীক সাহিত্য যেমন য়ুরোপে, সংস্কৃত সাহিত্য তেমনি উত্তর ভারতবর্ষের সব সাহিত্যকে রূপ দিয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবধারা আজও পুরোনো হয়ে যায়নি, চির-আধুনিক চির-উজ্জ্বল।"

"বাঃ—। সতীশবাবু বলে একজন সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনিও এই কথা বলতেন। সংস্কৃতে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজীতেও। খুব রসিক লোক ছিলেন ভদ্রলোক। কাউকে খোশামোদ করতেন না। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে ওরকম লোক বেশী দেখিনি আমি—"

গগনের আশঙ্কা হইল বেশী কথা বলিয়া দাদু হয়তো ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন।

"বেশী কথা বোলো না দাদু। একটু ঘুমোও।"

সূর্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"ঘুমের প্রতীক্ষাই তো করছি ভাই।"

"চোখ বুজে শুয়ে থাক। কাকীমা ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দাও, দাদুর চোখে আলো লাগছে।"

সূর্যসুন্দর বাধা দিলেন—"না থাক। আলো ভালোই লাগছে—তোমার যখন হুকুম তখন চোখই বুজে ফেলছি।"

গগন বাহিরে চলিয়া গেল। সূর্যসুন্দর জানালা দিয়া আর একবার নারিকেল গাছটার দিকে চাহিলেন। এ জানালাটা সূর্যসুন্দর বন্ধ করিতে দেন না, কারণ এই জানালা দিয়া তরুণ নারিকেল গাছটা দেখা যায়। এদেশে নারিকেল গাছ ভালো হয় না। রাজলক্ষ্মীর শখ হইয়াছিল বাড়ীর উঠানে একটি নারিকেল গাছ করিতেই হইবে। তখন আশুবাবু ছিলেন। তিনিই তখন চাষবাস দেখাশোনা করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় নারিকেল গাছটি পোঁতা হয়। অনেক দূরে পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া প্রায় দশ বারো সের নুন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর চারাটি লাগানো হয়। নারিকেল গাছ এখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সবুজ চিক্কণ পাতা হইতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার সর্বাঙ্গে আজ যৌবনের মহিমা। কিন্তু রাজলক্ষ্মী আশুবাবু কেহই বাঁচিয়া নাই। তাঁহারও যাইবার সময় আসন্ন। সূর্যসুন্দর আজকাল গাছটিকে বার বার দেখেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ বুজিয়া আসিল। যে সতীশবাবুর কথা একটু আগে গগনকে বলিতেছিলেন, তাঁহারই কথা মনে পড়িল। এই প্রসঙ্গে সন্তোষের ছেলে জগাই এবং পাঁচকড়িবাবু উকিলের কথাও স্মরণ করিলেন তিনি। সত্যই অদ্ভুত লোক ছিলেন সতীশবাবু। ছিপছিপে ফরসা নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব লোকটির ছবি তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। সিভিল সার্জন রূপেই তাঁহার সহিত আলাপ। আগে সাহেবরাই সিভিল সার্জন হইতেন। সতীশবাবু স্বীয় যোগ্যতার জোরেই

অ্যাসিস্টেন্ট সার্জনের পদ হইতে সিভিল সার্জনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। মেডিসিন, সার্জারি এবং গাইনিকলজি তিনটি বিষয়েই তাহার সমান পারদর্শিতা ছিল। তিনি যেদিন প্রথম মনিহারী ডিসপেন্সারি ভিজিট করিতে আসেন সেদিনের কথা সূর্যসুন্দরের আজও মনে আছে। তাঁহার আগে যে সব সাহেব সিভিল সার্জন আসিতেন তাঁহারা একটু দূরে দূরে থাকা পছন্দ করিতেন। ডাক্তারের নিকট হইতে কোনওরকম ব্যক্তিগত উপকার বা সুবিধার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের ছিল না। পূর্ণিয়া হইতে আগে একটি ট্রেন সকালে আসিত এবং আর একটি ট্রেন সন্ধ্যায় যাইত। সমস্ত দিন আর কোনও ট্রেন ছিল না। সুতরাং সিভিল সার্জনরা আসিলে তাঁহাদের সমস্ত দিন থাকিতে হইত। তখন ডাকবাংলো ছিল না, তখন তাঁহারা ডিসপেন্সারির বারান্দাতেই সমস্ত দিন কাটাইতেন। স্বভাবতঃই তাঁহাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন সূর্যসুন্দর। সাহেব সিভিল সার্জনরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেন, কিন্তু কখনও কোন খাবার বা অন্যায় সুবিধা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। চায়ের জন্য সামান্য দুধটুকু পর্যন্ত কেহ কখনও লন নাই। তাঁহাদের সঙ্গে খাবারের বাস্কেট থাকিত, একটি চাপরাসীও থাকিত। বাস্কেট হইতে পাউরুটি, মাখন, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, সিদ্ধ মাংস এবং নানারকম ফল বাহির হইত। স্টোভে জল গরম করিয়া চাপরাসী 'কনডেনসড্ (Condensed) মিল্ক দিয়া চা প্রস্তুত করিয়া দিত। এইসব খাইয়াই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন তাহারা। প্রয়োজনের বেশী কোন কথা বলিতেন না। তাঁহাদের ভদ্রতা নিখুঁত ছিল, কিন্তু তাহারা মাখামাখি করিতে চাহিতেন না। কেহ সমস্ত দিন বই পড়িয়া কাটাইয়া দিতেন। নীল সাহেব বলিয়া একটি সাহেব আসিয়াছিলেন, তিনি তো একবার একটা ভিমরুলের চাক লইয়াই সমস্ত দিন তন্ময় হইয়া রহিলেন। বাগানের একধারে একটা ভিমরুলের চাক হইয়াছিল। নীল সাহেব আগ্রহভরে ভিমরুলদেরই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভিমরুলেরা উড়িয়া উড়িয়া যাওয়া আসা করিতেছে, নিপুণভাবে চাক প্রস্তুত করিতেছে ইহা দেখিয়াই সাহেবের সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। তিনি একটি ছোট ক্যামেরা বাহির করিয়া চাকের এবং ভিমরুলদের কয়েকটা ফোটোও তুলিয়াছিলেন। আর একজন সাহেবের কথা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তিনি আউটডোরের রোগীদের ভিতর হইতে তিন চারটি রোগী বাছিয়া লইতেন এবং সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাদের ভালো করিয়া পরীক্ষা করিতেন। প্রত্যেক রোগীর নাম, ধাম, বংশপরিচয়, রোগের বিবরণ, পরীক্ষা করিয়া কি কি পাইলেন তাহার ফর্দ, অসুখের ডায়াগনোসিস এবং ঔষধের প্রেসক্রপসন কাগজে লিখিয়া যাইবার সময় সূর্যসুন্দরকে দিয়া যাইতেন।

সাহেব সিভিল সার্জনদের কথা ভাবিতে ভাবিতে সূর্যসুন্দরের হঠাৎ রেট সাহেবের কথা মনে পড়িল। রেট সাহেবকে লোকে পাগলা সাহেব বলিত। নানারকম পাগলামি ছিল তাঁহার। ভারতবর্ষে আসিবার আগে খুব সম্ভবতঃ তিনি মেকলে সাহেবের লেখা বাঙালী-চরিত পাঠ করিয়াছিলেন। তখন অধিকাংশ ডাক্তারই বাঙালী, রেট সাহেব নানা কৌশলে তাঁহাদের দোষ ধরিবার চেষ্টা করিতেন এবং দোষ পাইলে প্রায়ই কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি আসিবার কিছুদিন পরেই দুইজন বাঙালী ডাক্তার সাসপেন্ডেড হইলেন। সাধারণতঃ সিভিল সার্জনরা কোন ডিসপেন্সারি 'ভিজিট' করিবার পূর্বে একটা খবর দিয়া আসিতেন। কিন্তু রেট সাহেব হঠাৎ

আসিতেন বিনা খবরে। 'সারপ্রাইজ' ভিজিট দেওয়াই তাঁহার নিয়ম ছিল। সূর্যসুন্দরের সহিতও তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় নাটকীয় পরিস্থিতিতে। তখন সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে নকুল, যোগেশ, বিধু প্রভৃতি কয়েকজন আশ্রিত পোষ্য ছিল। পরগাছা-জাতীয় বেকার উপকৃত আত্মীয়েরা প্রায়ই প্রচ্ছন্ন শত্রু হয়। সূর্যসুন্দরের প্রতাপপ্রতিপত্তি তাহাদের অন্তরে শূল বিদ্ধ করিত। তাহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া উপরে একটি বেনামী দরখাস্ত পাঠান যে সূর্যসুন্দর কেবল প্র্যাকটিস করিয়াই বেড়ান, হাসপাতালের কাজ কিছুই দেখেন না। তখন সিভিল সার্জনরাই ডাক্তারদের হর্তাকর্তাবিধাতা ছিলেন। অন্য সিভিল সার্জন থাকিলে হয়তো এরকম বেনামী দরখাস্ত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। কিন্তু রেট সাহেব জো পাইয়া গেলেন। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিলেন তিনি। তখন সকালের ট্রেন সাড়ে সাতটায় আসিত। রেট সাহেব সেই ট্রেনেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ট্রেন হইতে নামিয়া সোজা ডিসপেন্সারিতে গেলেন না। ডিসপেন্সারির ঠিক পাশেই একটা অড়হরের ক্ষেত ছিল, তিনি তাহার ভিতর আত্মগোপন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ডিসপেন্সারির কাজ ঠিকমতো চলিতেছে কি না। ডিসপেন্সারির কাজ ঠিকমতোই চলিতেছিল, ডিসপেন্সারির বারান্দায় রোগী-পরিবৃত হইয়া সূর্যসুন্দর বসিয়া ছিলেন। ঘণ্টাখানেক অড়হর ক্ষেতের জঙ্গলের মধ্যে কষ্টভোগ করিয়া রেট সাহেব অবশেষে হঠাৎ রোগীর ভিড়ের মধ্যে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। সূর্যসুন্দর প্রথমে রেট সাহেবকে দেখিতেই পান নাই, তাঁহার সামনে, পিছনে এবং দুই পাশে রোগীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সাহেব দেখিয়া রোগীরাই সরিয়া গেল এবং রেট সাহেব নিজের হ্যাট তুলিয়া বলিলেন, গুড্ মর্নিং ডক্টার! আই অ্যাম ইওর নিউ সিভিল সার্জন। সূর্যসুন্দর তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া যথোচিত সংবর্ধনা করিলেন। রেট সাহেব বলিলেন, তুমি ব্যস্ত হইও না, কাজ কর। আমি এখানেই বসিতেছি। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, রেট সাহেব সেইটার উপরই বসিয়া পড়িলেন। মেয়ে পুরুষ সব রোগীই সূর্যসুন্দরকে ঘিরিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মেয়েদের বসিবার জন্য আলাদা কোনও ঘর ছিল না। থাকিলেও তাহারা সেখানে বসিত না। রেট সাহেব দেখিলেন একটি যুবতী মেয়ে সকলের সামনে বারান্দার একপাশে বসিয়া নিজের কোলের ছেলেটিকে স্তনদান করিতেছে। তাহার বুকের কাপড় অসংবৃত। রেট সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন শুনিলেন যে সূর্যসুন্দর সকলের সামনেই একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তাহার পায়খানা প্রত্যহ পরিষ্কার হয় কি না তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্ষুদ্র একটি শিস দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সূর্যসুন্দরকে ডাকিয়া রোগীর ভিড় হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে গিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিলেন, ডাক্তার, তুমি একি করিতেছ! লেডিজ্‌রা (Ladies) পুরুষদের সহিত এমনভাবে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া আছে, একটি লেডি দেখিলাম সকলের সামনে বসিয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে, শুনিলাম তুমি একটি লেডিকে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পায়খানা পরিষ্কার হয় কি না—এসব তো বড়ই অসংগত কাণ্ড। বিলাতে সভ্যসমাজে একথা কেহ ভাবিতেই পারে না। সূর্যসুন্দর উত্তর দিলেন—এদেশ তো বিলাত নয়, এদেশের লজ্জাবোধ এবং সামাজিক আইন কানুনের মানদণ্ড আলাদা। ইহারা ডাক্তারকে পিতৃতুল্য মনে করে এবং তাহার কাছে তাহাদের কোনও লজ্জাই

নাই। এদেশে 'বাথরূম' নাই, একটু পরে দেখিতে পাইবেন, ওই গঙ্গার ধারে বালুর চরকেই উহারা 'বাথরূম' করিয়াছে। ব্যাপারটা আপনার কাছে যতটা অশোভন মনে হইতেছে উহাদের কাছে ততটা মনে হয় না। এসব লইয়া উহারা মাথাই ঘামায় না।

"ইজ্ ইট সো"—রেট সাহেব আর একবার ছোট্ট একটি শিস দিয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তবু শোভনতা ও আইন রক্ষার জন্য একটি ফিমেল ওয়েটিং রূম থাকা উচিত। রেট সাহেবের ইচ্ছা অনুসারেই কিছুদিন পরে একটি ফিমেল ওয়েটিং রূম করা হয়। কিন্তু কোনও 'ফিমেল' সেখানে বসিত না। ডিসপেন্সারির চাকর পচনারই সুবিধা হইয়াছিল, সে সেখানে রাত্রে শুইত। রেট সাহেব প্রথম যেদিন আসিয়াছিলেন সেদিন সূর্যসুন্দরকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি তুমি সত্য কথা বলিবে।"

সূর্যসুন্দর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় বলিব, আমি ব্রাহ্মণ, কখনও মিথ্যা কথা বলি না।"

"ভেরি গুড্। তোমার নামে এখান-হইতে দরখাস্ত গিয়াছে। দরখাস্তকারীরা লিখিয়াছে যে তুমি নাকি সকালে ডিসপেন্সারি ছাড়িয়া প্র্যাকটিস করিয়া বেড়াও।"

"ইমারজেন্সি কল আসিলে আমাকে যাইতে হয়। কারণ আমি এখানে একমাত্র ডাক্তার। কিন্তু সাধারণত আমি সকালে বাহির হই না। আপনাদের আইন অনুসারে আমি দশটার পর বাহিরে যাইতে পারি। কারণ ডিসপেন্সারির সময় সকাল ছয়টা হইতে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু আমি রোজ বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত থাকি। এখানে বেলা আটটার আগে রোগী আসে না। বারোটা পর্যন্ত ভিড় থাকে। তাহার পর আমি প্র্যাকটিস করিতে বাহির হই।"

"তুমি এখানে কতদিন আছ?"

"সাত আট বছর—"

"এতদিন একজায়গায় আছ?"

"এখানে আগে আমার নিজেরই ডিসপেন্সারি ছিল। সে সময় কমিশনার সাহেব এ অঞ্চলের টাল জঙ্গলে শিকার করিতে আসেন। টাল জঙ্গলেই অসুস্থ হইয়া পড়েন তিনি। আমি গিয়া তাঁহার চিকিৎসা করি এবং তিনি সুস্থ হন। তাঁহারই চেষ্টাতে এখানে সরকারী ডিসপেন্সারি হয়। কমিশনার সাহেবের ইচ্ছাতেই আমি এখানে চাকুরি করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু একটি শর্তে। শর্তটি এই যে আমি স্বেচ্ছায় যাইতে না চাহিলে আমাকে এখান হইতে বদলি করা হইবে না। সেজন্য আমি গোড়া হইতে বরাবরই এখানে আছি—"

"তুমি এখান হইতে অন্য কোথাও যাইতে চাও না।"

"না—"

"কিন্তু গভর্নমেন্টের আইন অনুসারে এক জায়গায় এক লোককে বেশী দিন রাখা যায় না। কমিশনার সাহেবরাও এই আইন অনুসারে বদলি হন।"

"আমাকে যদি বদলি করা হয়, আমি চাকরি ছাড়িয়া দিব।"

রেট সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর আপিসের খাতাপত্র তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। এমন কি টুলের উপর চড়িয়া আলমারির মাথাগুলিও উঁকি মারিয়া দেখিলেন সেখানে ময়লা জমিয়া আছে কি না। সেদিন রেট সাহেব ভিজিটার্স বুকে

যে সব মন্তব্য লিখিলেন তাহা তিনি আর কোথাও লেখেন নাই। লিখিলেন এই ডিসপেন্সারি পরিদর্শন করিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এখানকার মেডিকেল অফিসার শুধু যে ডাক্তার ভালো তাহাই নয়, লোকও খুব ভালো, এখানকার পাবলিক তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। এই ডিসপেন্সারির আরও উন্নতি হওয়া উচিত। একটি ফিমেল ওয়েটিং রুম অবিলম্বে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

রেট সাহেব সূর্যসুন্দরের প্রতি কত প্রসন্ন হইয়াছেন তাহার প্রমাণ কিছুদিন পরে পাওয়া গেল। কিছুদিন পরেই মনিহারী ঘাটে যে অর্ধোদয় যোগের বিরাট মেলা হয়, সেই মেলা লইয়া রেট সাহেব মাতিয়া উঠিলেন। আগের বার অর্ধোদয় যোগের মেলায় কলেরা হইয়া বহুলোক মারা গিয়াছিল। রেট সাহেব বলিলেন বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতির যুগে কলেরায় রোগী মারা যাইবে কেন? সুবন্দোবস্ত করিলে একটি রোগীও মারা যাইবে না। সুবন্দোবস্ত করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। গঙ্গার ঘাটে খড় ও দরমা দিয়া আড়াইশত রোগীর জন্য ঘর প্রস্তুত হইল। বাঁশ, দরমা এবং খড় দিয়া আড়াইশত বিছানাও প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দিলেন তিনি। বলিলেন যে বিছানায় কলেরা রোগী ভর্তি হইবে সে বিছানা আর দ্বিতীয় রোগীর জন্য ব্যবহৃত হইবে না। সে বিছানার খড়, দরমা এবং প্রয়োজন হইলে কম্বলও পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। গঙ্গার ধারেই ঔষধাদির জন্য প্রকাণ্ড একটি ডিসপেন্সারিও নির্মিত হইল— এটিও খড়ের। দশ জন ডাক্তার, কুড়িজন কম্পাউণ্ডার এবং পঁচিশজন পুরুষ-নার্সও নিযুক্ত হইল এজন্য। এবং এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটার শীর্ষদেশে তিনি স্থাপন করিলেন সূর্যসুন্দরকে। সূর্যসুন্দরই ইন্-চার্জ হইয়া সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরিয়া রহিলেন। যাত্রীদের স্নান করিবার জন্য দশটি ঘাট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক ঘাটের কাছে বাংলা হিন্দী উড়িয়া ও আসামী ভাষায় সাইনবোর্ড টাঙাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রেট সাহেব। প্রত্যেক ভাষায় লেখা ছিল—গঙ্গায় ডুব দিয়া স্নান কর, কিন্তু গঙ্গার জল এক বিন্দুও যেন পেটে না যায়। গেলে কলেরা হইবার সম্ভাবনা। পানের জন্য ফুটানো-জল জালা করিয়া রাখা আছে। সে জলও গঙ্গাজল। পুলিসকে বলিলেই সে জল পাওয়া যাইবে। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল অত লোকের জন্য গঙ্গাজল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া বড় বড় জালায় ঢালিয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে মেলার তিন চার দিন আগে হইতেই প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। এজন্য স্থানীয় জমিদারের সিপাহী এবং চাকরদের সহায়তা না পাইলে তাঁহাকে মুশকিলে পড়িতে হইত। প্রতি ঘাটে দুইজন করিয়া পুলিস মোতায়েন ছিল। তাহারা প্রত্যেক গঙ্গাস্নানপ্রার্থীকে স্নান করাইয়া খাবারের দোকানে পেঁছাইয়া দিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। খাবারের দোকানে দোকানে স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেক্‌টাররা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা দেখিতেছিলেন কোনও খাবারে যেন মাছি না বসে বা কোনও পচা খাবার যেন বিক্রয় না করা হয়। সন্দেহ হওয়াতে দুই একটি দোকানের সমস্ত খাবার তাঁহারা মাটিতে পোতাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মোট কথা রেট সাহেব পুলিস এবং ডাক্তারের দল লইয়া সমস্ত মেলায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া কলেরার বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছিলেন তাহা জমিদার, পুলিস, গঙ্গাস্নানার্থী, মেলার দোকানদার কাহারও সমর্থন লাভ করে নাই। দুই একজন হিতৈষী উপরে কমিশনার সাহেবকে টেলিগ্রামও করিয়াছিলেন যে রেট স্বধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। শোনা যায়

কমিশনার সাহেবের আপিস হইতে একজন লোকও নাকি চিঠি লইয়া রেট সাহেবের কাছে আসিয়াছিল। তাহার উত্তরে রেট সাহেব নাকি কমিশনার সাহেবকে জানান যে জেলার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি পাবলিকের নিরাপত্তার জন্য বিজ্ঞানসম্মত যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে ধর্মহানির কোনও আশংকা নাই। যাহারা ইহা লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছে সম্ভবতঃ ইহাতে তাহাদেরই স্বার্থহানি ঘটিয়াছে। তাহারা পাবলিকের শত্রু, তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিস কেস করা উচিত। কমিশনার সাহেব ইহা লইয়া আর রেট সাহেবকে কোনও চিঠি লেখেন নাই। নিজেই একদিন মেলা পরিদর্শন করিবার জন্য আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন এবং রেট সাহেবের ব্যবস্থা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় রেট সাহেব সূর্যসুন্দরের সহিত কমিশনার সাহেবের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—এই ইয়ং ডাক্তারটির সাহায্য না পাইলে আমি এসব ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না। সমস্ত প্রশংসা ডাঃ মুখার্জিরই প্রাপ্য। এই পরিচয় পরে কাজে লাগিয়াছিল। কিছুদিন পরে যখন স্কুল কলেজে ভরতি হইবার জন্য বা চাকুরির জন্য ডোমিসাইল (domicile) সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হইতে লাগিল তখন এই কমিশনার সাহেব তাঁহাকে জোর-কলমে একটি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি মর্মান্তিক কথাও সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। অর্ধোদয় মেলার পূর্বে রেট সাহেব তাঁহার অ্যাসিসটেন্ট সার্জনকে সাত দিনের ছুটি দিয়া বলিয়াছিলেন তুমি পূর্ণিয়া জেল হইতে পাঁচশত কম্বল লইয়া মেলার ঠিক আগের দিন মনিহারী ঘাটে উপস্থিত থাকিবে। সেখানে আড়াইশত বেডের (bed) ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বেডের জন্য দুইটি কম্বল চাই। মেলার ঠিক আগের দিন রেট সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাসিসটেন্ট সার্জন ভদ্রলোকও আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র রেট সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "কম্বল কই ?"

"কম্বল গুডস্ ট্রেনে (goods train) বুক (book) করে দিয়েছি। এখনও এসে পেঁছে নি।"

আশ্চর্য কাণ্ড, শুনিবামাত্র রেট সাহেব সকলের সামনে অ্যাসিসটেন্ট সার্জনের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিলেন। তাহার পর গর্জন করিয়া উঠিলেন—"আমার চাপরাসী গিয়াও গুডস্ ট্রেনে কম্বল 'বুক' করে দিতে পারত। তোমাকে সাত দিনের ছুটি দিয়েছিলাম তুমি কম্বল সঙ্গে করে আনবে বলে ! কই কম্বল ?"

অ্যাসিসটেন্ট সার্জন গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর দিলেন, "আমি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এসেছি। আমার সঙ্গে কম্বল আনলে অনেক খরচ হতো।"

"খরচ গভর্নমেন্ট দিত। তুমি দিতে না। গো অ্যান্ড ব্রিং দি ব্ল্যাংকেটস্ অ্যাট ওয়ান্স। (Go and bring the blankets at once). যেমন করে হোক কম্বল অবিলম্বে এসে পেঁছানো চাই।"

সূর্যসুন্দরের সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবুর খুব খাতির ছিল। তিনি বলিলেন একটি খালি ইনজিন একটু পরে কাটিহার যাইবে, অ্যাসিটেন্ট সার্জন সেই ইনজিনে কাটিহারে গিয়া খোঁজ করুন। সম্ভবতঃ কম্বল এতক্ষণ কাটিহারে পেঁছিয়াছে। আমি কাটিহারের স্টেশন মাস্টারকে চিঠি লিখিয়া দিতেছি মালগাড়িটি যদি অবিলম্বে মনিহারীতে না আসে তাহা হইলে কম্বলের গাড়িটি যেন সন্ধ্যার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে

জুড়িয়া দেওয়া হয়। তাহাই হইল, অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন ইনজিনে চড়িয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা নাগাদ কম্বল আসিয়া পড়িল।

অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনের মুখচ্ছবিটাই সূর্যসুন্দরের মনে বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সূর্যসুন্দরের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। রেট সাহেবের বর্বর আচরণের পর তিনি সূর্যসুন্দরের বাহিরের ঘরে বসিয়া অধোবদনে অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিলেন। এই ছবিটা আবার তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। সূর্যসুন্দর তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, "আপনি চাকরি ছেড়ে দিন এবং রেট সাহেবের নামে মকোর্দমা করুন। আমরা আপনার হয়ে সাক্ষী দেব।" এ প্রস্তাবে অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়া ছিলেন, "তিন ফিগারের চাকরি ছাড়া অত কি সহজ মশাই! দশ বৎসর চাকরি করছি। ঘরে এক পাল ছেলে মেয়ে আত্মীয়স্বজন। বুড়ো বাপ মা এখনও বেঁচে আছেন। সকলেরই ভরসা আমি। হঠাৎ চাকরি ছাড়লে চলে? এ বয়সে কোথায় প্র্যাকটিস করতে বসব, প্র্যাকটিস হবে কি না, সবই অনিশ্চিত। চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতেই পারি না। রেট সাহেবের ব্যবহারটা একটু অভদ্র হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভেবে দেখলাম আমারও দোষ ছিল। কম্বলগুলো সঙ্গে করে আনাই উচিত ছিল আমার।" কম্বল আসিয়া পৌঁছিবার পর তিনি রেট সাহেবের নিকট গিয়া নিজের কর্তব্যচ্যুতির জন্য অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। চড়টা মারিয়া রেট সাহেবও অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন মনে মনে। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কাজটা অশোভন, অনুচিত এবং অভদ্র হইয়া গিয়াছে। অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জন যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তখন রেট সাহেবের আর এক মূর্তি দেখা গেল। তিনি অ্যাসিস্‌টেণ্ট সার্জনের হাত দুইটি ধরিয়া বিনয়-নম্র কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "O, doctor, I am myself so sorry for my rude and unpardonable conduct of yesterday. I could not check my temper, which I should have done. Please pardon me."

("ডাক্তার, আমি গতকল্য তোমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি তাহা অভদ্র এবং অমার্জনীয়। তজ্জন্য নিজেই আমি খুব লজ্জিত হইয়াছি। আমার রাগটা সামলানো উচিত ছিল, কিন্তু তাহা আমি পারি নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।")

সূর্যসুন্দর পরে জানিতে পারেন রেট সাহেব তাঁহাকে একটি ভালো 'পেইং' ডিসপেন্সারিতে (যে ডিসপেন্সারিতে প্র্যাকটিস খুব ভালো হয় সে ডিসপেন্সারিকে 'পেইং' বলা হইত) বদলি করিয়া দেন এবং তাঁহার সার্ভিস বুকে এমন প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন যে তাহার জোরেই তিনি পরে সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সতীশবাবুর কথা ভাবিতে গিয়া প্রথমে সূর্যসুন্দরের সাহেব সিভিল সার্জনদের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সাহেবদের বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাতন্ত্র্য, পারতপক্ষে তাঁহাদের অধীনস্থ ডাক্তারদের সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। বাঙালী সিভিল সার্জন সতীশ মিত্র আসিয়াই কিন্তু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতার সুর বাজিয়াছিল, বুঝা গিয়েছিল তিনি বাঙালী, বাঙালী-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁহার সঙ্গেও একজন আরদালী আসিয়াছিল। আরদালীর সঙ্গে একটি বেতের বাস্কেটও ছিল। সে বাস্কেটের ভিতর খাবারও ছিল নানারকম। কিন্তু সতীশবাবু

আসিয়াই নমস্কার করিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিয়া ছিলেন—"প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ। এখানে টুর প্রোগ্রাম করেই একটি বাসনা মনে জেগে ছিল, যদি অভয় দেন নিবেদন করি।"

সূর্যসুন্দর একথা শুনিয়া মনে মনে একটু শশব্যস্ত হইয়াছিলেন। সিভিল সার্জনের মুখে এ কি কথা! মৃদুহাস্য করিয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিয়াছিলেন, "কি বলুন—"

"গঙ্গার তীরে আপনার বাড়ী। ইচ্ছা আছে, দুপুরে গঙ্গায় অবগাহন স্নান করে আপনার বাড়ীতে চারটি প্রসাদ পাই। সাহেবী খানা খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে! স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বাঙালী খাবার কপালে জোটে না। খানসামারাই ভরসা।"

"বেশ তো, বেশ তো, এ আর বেশী কথা কি।"

"মাকে বলবেন বেশী কিছু যেন না করেন। আলুভাতে, ঘি, একটু সুক্তো, একটু মোচার ঘন্ট, দু'একটা ভাজাভুজি, একটু মুগের ডাল আর বাঙালী ধরনের রান্না মাছের ঝোল বা ঝাল। সামান্য একটু চাটনি বা অম্বল, তারপর দই আর একটা মিষ্টি। এর বেশী আর কিছু করবেন না যেন। মাংস খাব না। রোজ মাংস খাই।"

"বেশ তাই হবে।"

নিখুঁত সাহেবী স্যুট পরা সতীশ মিত্রের দিকে সূর্যসুন্দর একটু অবাক হইয়াই চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা হইতে যে আলোর ছটা সেদিন বিকীর্ণ হইতেছিল সেটাও আজ যেন সূর্যসুন্দর দেখিতে পাইলেন। সতীশবাবু আর একটি কথাও বলিয়াছিলেন।

"আমি আপনার কাজের খুঁত বা দোষ ধরতে আসিনি। আমি পুলিস নই, ডাক্তার। আমরা ডিটেকটিভগিরি অবশ্য করি, কিন্তু তা চোর ধরবার জন্য নয়, রোগ ধরবার জন্যে। আপনি কাজ করুন, ডাক্তারি ব্যাপারে আমার যদি কোনও সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন বলবেন, আমি যথাসাধ্য করব।"

সাধারণতঃ সিভিল সার্জনরা আসিয়া যে সব খাতাপত্র দেখিতেন তাহা তিনি দেখিলেন না। একটি উদরী রোগী আসিয়াছিল তাহাকে লইয়াই আলোচনা করিলেন খানিকক্ষণ। কি কি কারণে পেটে জল জমিতে পারে এবং কি কি লক্ষণ দ্বারা তাহা বোঝা যায় সে সম্বন্ধেই তিনি চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া সূর্যসুন্দর বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন সেদিন।

সতীশ মিত্রের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হইয়াছিল সূর্যসুন্দরের। পরে যখন তিনি আসিতেন সন্ধ্যার ট্রেনে আসিতেন। সমস্ত রাত সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে থাকিতেন। সকালের ট্রেনে ফিরিয়া যাইতেন। তখন সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় গানের আসর বসিত, থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে আসরে তবলা বাজাইত সন্তোষ এবং গান গাহিত সন্তোষের ছেলে জগাই। জগাই বেশ সুকণ্ঠ এবং সুরজ্ঞ ছিল। জগাইয়ের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সতীশবাবু। মুগ্ধ হইবার আর একটা কারণও ছিল। কিছুদিন পূর্বে সতীশবাবুর বড়মেয়েটি মারা গিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত মন তখন শোকে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। জগাই তাঁহাকে যে গানটি শুনাইয়াছিল তাহার প্রথম দুই কলি সূর্যসুন্দরের এখনও মনে আছে। 'কেমন মাটি এদেশের মা, যাহা গড়ি ভেঙে যায়। যতই গড়ি সযতনে কিছুতে থাকে না হায়।' বেহাগ সুরে এই

গানটি অপরূপ একটি ভাবলোক সৃষ্টি করিয়াছিল। বীরু তখন কলেজে পড়িত, কবিতাও লিখিত। গানটির সেই নাকি রচয়িতা। গানটি শুনিয়া সতীশবাবু মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যে চাকরি জগাই পরে নিজের দোষে রাখিতে পারে নাই সেই ড্রেসারির চাকরিটি সতীশবাবুই করিয়া দেন তাহাকে।

সতীশবাবুর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। তিনি খুব বাবুলোক ছিলেন। পোষাকপরিচ্ছদে সর্বদা ছিমছাম 'টিপ্‌টপ্‌' হইয়া থাকিতেন। আপিসের কাজে যখন বাহির হইতেন তখন নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরিতেন। টাইয়ের 'নট্‌' বা ট্রাউজারের ক্রিজ্‌ (Crease) নিখুঁতভাবে ঠিক থাকিত। আপিসের বাহিরে কিন্তু তিনি পুরা বাঙালি। কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেন্ট লেদারের দামী পামশু। হাতে বেশ দামী একটি ঘড়ি। এসেন্স পছন্দ করিতেন না। আতর তাঁহার প্রিয় ছিল। প্রত্যহ পোশাক পরিয়া বাহির হইতে তাহার অনেকটা সময় ব্যয় হইত। এই প্রসঙ্গে সূর্যসুন্দরের পাঁচকড়িবাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি একজন বিদ্বান নামজাদা অ্যাড্‌ভোকেট ছিলেন। বেশ ঘন ভ্রূ ছিল তাঁহার, কিন্তু তাহা তিনি কাঁচি দিয়া 'ক্লিপ্‌' করিতেন। গোঁফও ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতেন। দাড়িটা কামাইতেন প্রত্যহ। ঘাড়ের চুলও খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা থাকিত। এত ছোট যে মনে হইত ক্ষুর দিয়া চাঁছিয়া ফেলিয়াছেন। বেশ ভারী চর্বিবহুল মুখ ছিল তাহার। চোখ দুইটি কিন্তু ছোট ছোট। হাসিলে চোখ বুজিয়া যাইত। খুব ভালো ইংরাজীতে অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল একবার তিনি এক ফাঁসির আসামীকে বাঁচাইয়াছিলেন, সে সময় কোর্টে যে ওজস্বিনী বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন তাহা সূর্যসুন্দরকেও শুনাইয়া গিয়াছিলেন একদিন। ছবিটি সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। পিছনে দুই হাত রাখিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন। খুব বিদ্বান লোক ছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, শেলী, কীট্‌স্‌, ব্রাউনিং গড়গড় করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারও। কিন্তু তাহার মস্ত দোষ ছিল অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ এবং রগচটা লোক ছিলেন তিনি। মনিহারীতে আসিয়া সূর্যসুন্দরেরই আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিতেন। আসিতেন নিজের জমি তদারক করিবার জন্য। মনিহারী হইতে দুই ক্রোশ দূরে তাহার কিছু জমি ছিল। জমিদার তাহার মক্কেল ছিলেন, নিখিলবাবুই তাহাকে পঞ্চাশ বিঘা জমি সস্তায় কিনিয়া দিয়াছিলেন। এই জমি তিনি 'আধি'তে চাষ করাইতেন এবং মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন আধি-দার ঠিক মতো চাষ করিতেছে কি না, কত ফসল পাইবার সম্ভাবনা, জমির আল ঠিক আছে কিনা, এইসব। মাঠে যাইবার সময় তিনি জমিদারদের গোমস্তা উপেনবাবুকে প্রায়ই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তিনি আসিবার আগে টেলিগ্রাম করিতেন, চিঠিও লিখিতেন। তিনি আসিলে রাজলক্ষ্মীর একটু মুশকিল হইত। কারণ তিনি সকাল আটটার সময় আসিয়াই ভাতে-ভাত খাইয়া গরুগাড়ি চড়িয়া জমি দেখিতে যাইতেন। রাজলক্ষ্মীকে ভোরে উঠিয়া তাঁহার জন্য রান্না করিয়া রাখিতে হইত। বামুনদিদি তখনও ছিলেন, কিন্তু তিনি ভোরে উঠিতে চাহিতেন না। আটটার সময় উঠিয়া তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন। বেলা দশটার আগে

রান্নাঘরে ঢুকিতে পারিতেন না। সুতরাং পাঁচকড়িবাবুর জন্য রাজলক্ষ্মীকেই রান্না করিতে হইত। শুধু ভাতে-ভাত ভদ্রলোককে দেওয়া যায় না, রাজলক্ষ্মী দুই একটা তরকারিও করিতেন। পাঁচকড়িবাবু ফিরিতেন বেলা দুইটা আড়াইটা নাগাদ। তাঁহার ট্রেন সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু বেলা তিনটা হইতেই তিনি বাড়ীর ভিতর খাবারের জন্য তাগাদা দিতেন। অবশ্য ভদ্রভাবে। ধরনটা ছিল অনেকটা এইরকম। বীরু বা পৃথ্বীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেন, খোকা, মা কি করছেন এখন? বীরু বা পৃথ্বীশ হয়তো বলিল, মা ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছেন? ও, তাহলে এখন বিরক্ত কোরো না। এখন তিনটে বেজেছে। একটু পরে কিন্তু উঠিয়ে দিও, বোলো পাঁচকড়িবাবুকে সন্ধ্যের ট্রেনে যেতেই হবে। কাল কোর্টে একটা জরুরী কেস আছে। আধ ঘণ্টা পরে আবার তাগাদা পাঠাইতেন। মা উঠেছেন? মাকে এবার উঠতে বলো। দিনে বেশী ঘুমোনো ভালো নয়। আমাকে আজ সন্ধ্যের ট্রেনটা ধরতেই হবে। বিকালে সাধারণতঃ তিনি গরম লুচি ও তরকারি খাইয়া যাইতেন। কিন্তু পাঁচটা নাগাদ সে খাবার প্রস্তুত না হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন তিনি। অনেক সময় নিজেই উঠানের দরজায় গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, কই বউমা, হলো? বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আমি না হয় বালগোবিন্দ হালুয়াইয়ের দোকানেই খেয়ে নিচ্ছি। রাজলক্ষ্মীকে তখন বলিয়া পাঠাইতে হইত, এখনই খাবার হয়ে যাবে। লুচি বেলচি। তখন পাঁচকড়িবাবু একটু আগাইয়া উঠানের ভিতর ঢুকিয়া উঁকি মারিয়া স্বচক্ষে দেখিবার চেষ্টা করিতেন সত্যই লুচি বেলা হইতেছে, না বউমা তাঁহাকে স্তোক দিতেছেন। পাঁচটা নাগাদ গরম গরম লুচি তরকারি খাইয়া স্টেশনে চলিয়া যাইতেন এবং বার বার স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন—ট্রেন ঠিক রাইট টাইমে আসছে তো? স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু তাঁহাকে চা খাওয়াইয়া এবং নানারূপ গল্পগুজব করিয়া অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আর একটি বিশেষত্ব ছিল। চিঠি লিখিয়া নিজে মোটরে করিয়া পোস্টাপিসে যাইতেন এবং স্বহস্তে চিঠিগুলি পোস্টমাস্টার মহাশয়কে দিয়া আসিতেন। একবার পূর্ণিয়ার পোস্টমাস্টার তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন তাহা সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল। তখন এক পয়সা দামের ছোট পোস্টকার্ড ছিল। পাঁচকড়িবাবু একটি পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখিতে গিয়া এমনভাবে 't'-এর মাথা কাটিয়াছিলেন যে টিকিটে সপ্তম এডওয়ার্ডের মুখেও কলমের খোঁচা লাগিয়াছিল। পোস্টমাস্টার সবিনয়ে জানাইয়াছিলেন এ চিঠি বেয়ারিং হইয়া যাইবে। পাঁচকড়িবাবু নামজাদা উকিল, সহজে একথা মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, কোন্ আইন অনুসারে ইহা বেয়ারিং হইবে তাহা আমাকে ছাপার অক্ষরে দেখান। না দেখাইলে I shall move heaven and earth. তুলকালাম্ কাণ্ড করিব। পোস্টমাস্টার তাড়াতাড়ি বলিলেন, ঠিক আছে। আমারই ভুল হইয়াছিল। তিনি পাগলকে আর ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। নিজের পকেট হইতে টিকিট কিনিয়া চিঠিটিতে সাঁটিয়া দিয়াছিলেন। পাঁচকড়িবাবুর আর একটা গল্পও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। সেবার তিনি আসিবার আগে শুধু সূর্যসুন্দরকে নয়, কুঠির গোমস্তা উপেনবাবুকেও টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, চিঠিও লিখিয়াছিলেন। উপেনবাবুকে জানাইয়াছিলেন তিনি আসিয়াই তাঁহার জমির উদ্দেশে যাত্রা করিবেন, সাতটার সময় গরুর গাড়ি যেন প্রস্তুত থাকে। আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখন সূর্যসুন্দরকে বলিলেন, আমি এবার না খেয়েই যাব। আমার মক্কেল চন্দ্র সিংয়ের জমি

আমার জমির পাশেই। সে আজ পিকনিক করছে সেখানে। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। সেখানেই খাব। কিন্তু গরুর গাড়ি তো নেই দেখছি। উপেনবাবুকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। একটু পরেই দেখা গেল উপেনবাবু আসিতেছেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। চন্দর সিং আমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে। এলাহী কাণ্ড করেছে শুনলাম—দুটো খাসি কাটা হয়েছে। পাঁচকড়িবাবু অধীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু গাড়ি কই? আপনাকে আগে থাকতে টেলিগ্রাম করেছিলাম। উপেনবাবু উত্তর দিলেন, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আপনার টেলিগ্রাম পেয়েই ঝকস্থু গাড়োয়ানকে ঠিক ছ'টার সময় গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিলাম, সে আসবে বলেওছিল, কিন্তু আসেনি। রামপীড়িত সিপাহীকে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে এক্ষুণি। আধঘণ্টা পরে লাঠি ঘাড়ে রামপীড়িত আসিয়া খবর দিল যে ঝকস্থু গাড়োয়ানের একটি বলদ কাল রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে। সেইজন্য সে আসে নাই, তাহার ছেলে ভাগিয়া সেটি খুঁজিতে গিয়াছে। আমি গিয়া দেখিলাম ভাগিয়া ফেরে নাই। তখন আমি ঝকস্থুকে বলিলাম তুমি তোমার লাঙলের একটি 'বয়েল' (বলদ) গাড়িতে জুতিয়া অবিলম্বে চল। সে এখনই আসিতেছে। একটু পরেই দেখা গেল ঝকস্থু সত্যই আসিতেছে। পাঁচকড়িবাবু উপেনবাবুকে লইয়া অবিলম্বে গাড়িতে উঠিলেন। কিন্তু হাট পর্যন্ত যাইতে না যাইতে নব-নিয়োজিত বয়েলটি বাঁকিয়া দাঁড়াইল এবং জোয়াল হইতে কাঁধ সরাইয়া লইয়া দড়ি ছিঁড়িবার উপক্রম করিল। পাঁচকড়িবাবু গাড়ি হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন। ঝকস্থু বলিল—এ বয়েলটা খচ্চর। লাঙল টানিবার সময়ও নানারকম বদমাইশি করে। মনে হইতেছে এ গাড়ি টানিবে না। পাঁচকড়িবাবু তখন উপেনবাবুর দিকে তর্জনী আস্ফালন করিয়া বলিলেন, বাংলা ভাষায় যাকে বলে ওয়ার্থলেস, আপনি তাই। আমি হেঁটেই চললুম। এই বলিয়া তিনি হনহন করিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। সূর্যসুন্দর বহুকাল পূর্বে ডিসপেন্সারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। এতকাল পরে আবার সেটি দেখিতে পাইলেন। পাঁচকড়িবাবু, উপেনবাবু, ঝকস্থু কেহই এখন বাঁচিয়া নাই। স্মৃতিরোমন্থন করিবার জন্য তিনিই কেবল আছেন এখনও। তাঁহারও দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। পাঁচকড়িবাবুর অতি-ব্যস্ততার জন্য সতীশবাবু সিভিল সার্জনের নিকটও তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া স্মৃতি-রোমন্থনই করিতে লাগিলেন আবার। পাঁচকড়িবাবু একবার সতীশবাবুকে 'কল' দিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সতীশবাবু বলিয়াছিলেন, এখন যেতে পারব না, ঠিক চারটের সময় যাব। পাঁচকড়িবাবু তিনটার আগেই গিয়া হাজির। চাপরাসী বলিল, এখন সাহেব ঘুমাইতেছেন। সাড়ে তিনটার আগে উঠিবেন না। পাঁচকড়িবাবু খানিকক্ষণ ড্রইংরুমে বসিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দুই হাত পিছনে রাখিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া তাঁহার ধৈর্যের সীমা যখন অতিক্রান্ত হইল তখন তিনি আবার চাপরাসীকে গিয়া বলিলেন, দেখ সাহেব উঠিয়াছে কি না। চাপরাসী ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেব উঠিয়াছেন, গোসলখানায় আছেন এখন। পাঁচকড়িবাবু আবার খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বলিলেন—এইবার দেখ তো। চাপরাসী বিরক্ত হইতেছিল, তবু সে আবার গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেব তো পাশের ঘরেই আছেন,

পোশাক পরিতেছেন। পাশের ঘরের জানালাটা খোলা ছিল, পাঁচকড়িবাবু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, আগাইয়া গিয়া জানলার ভিতর মুণ্ড গলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন সত্যই সতীশবাবু পোশাক পরিতেছেন কি না। সতীশবাবু তখন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় প্যান্টালুনের ভিতর পা গলাইতেছিলেন, পাঁচকড়িবাবুর মুণ্ড দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার ক্রোধ ফাটিয়া পড়িল। তিনি চাপরাসীকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন—বাবুকো নিকাল দেও, হাম উনকা ঘরমে নেহি যায়েংগে। পাঁচকড়িবাবু তাঁহার নামে মর্কোদ্দমা করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সতীশবাবু ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন মর্কোদ্দমা করিলে পাঁচকড়িবাবুই বিপদে পড়িবেন, কারণ তিনি যে চোরের মতো আমার বাথরুমের আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন আমার চাকররা দিবালোকে তাহা দেখিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে হলফ করিয়া কোর্টে সাক্ষীও দিবে। শেষ পর্যন্ত কিছু হয় নাই! সতীশবাবুর সহিত পরে তাঁহার ভাবও হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্রের চিকিৎসা করিয়া তিনি তাহাকে নিরাময়ও করিয়াছিলেন। সতীশবাবু নির্ভীক লোক ছিলেন। কাহারও খোশামোদ করিতেন না। সতীশবাবুর সম্বন্ধে আর একটা গল্পও মনে পড়িল সূর্যসুন্দরের। তখন বিহার ও বাংলা একই প্রদেশ ছিল। আলাদা হইয়া যায় নাই। গ্রীষ্মকালে গভর্নরের সেক্রেটেরিয়েট দার্জিলিঙে চলিয়া যাইত। একবার সেক্রেটেরিয়েটের জনকয়েক বাবুর সহিত সতীশবাবুর দেখা হইয়াছিল। কথা-প্রসঙ্গে বাবুরা এমন ভাব দেখাইলেই যে তাঁহারাই যেন গভর্নমেন্টের মালিক। সতীশবাবু হাসিয়া বলেন, তাতে আর সন্দেহ কি। আপনারা হচ্ছেন গভর্নমেন্টের পুত্র, গভর্নমেন্টের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করেন, কিসে গভর্নমেন্টের আয় বাড়বে তা নিয়ে মাথা ঘামান। আর আমরা হচ্ছি গভর্নমেন্টের জামাই। নানাভাবে গভর্নমেন্টের অর্থ শোষণ করি। আমাদের সামান্য একটি ছুরির দামও পাঁচ ছ'টাকা। এ কথা শুনিয়া একজন বাবু বলিলেন, তা ঠিক, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমাদের কলমের এক খোঁচায় আপনার চাকরিও চলে যেতে পারে। সতীশবাবু উত্তরে বলিলেন, একটা কথা জেনে রাখবেন। আমরা চাকরি করি নিজেদের যোগ্যতার জোরে। কারো কলমের জোরে নয়। আমাদের চাকরি না করলেও অনাহারে মরবার ভয় নেই। কিন্তু আপনাদের প্রভুপাদপদ্মে ভোমরার মতো বরাবর গুনগুন করে যেতে হবে। এই ঘটনার কিছুদিন পরে গভর্নরের দার্জিলিং অধিবেশন শেষ হইল। আর একটি ঘটনাও ঘটিল ঠিক এই সময়ে। পূর্ণিয়া হাসপাতালে একটি রোগী মারা গেল, সতীশবাবু সন্দেহ করিলেন তাহার প্লেগ হইয়াছিল। সতীশবাবু কাটিহারে গিয়া গভর্নরের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, এখানে একটি প্লেগ কেস হইয়াছে। আপনার পরিবারের সকলে ভালো আছেন তো? গভর্নর বলিলেন, আমাদের শরীর ভালোই আছে। থ্যাঙ্কয়ু। সতীশবাবু বলিলেন, বেশ আপনারা তাহা হইলে কলিকাতা ফিরিয়া যান। কিন্তু আমি আপনার সেক্রেটেরিয়েটের সকলকে পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাই না। মনিহারী ঘাটে তাহাদের সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আপনি সেইরূ   আদেশ দিয়া যান। গভর্নর তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন। াহেবরা প্লেগকে বড় ভ করিতেন। মনিহারী ঘাটে বালির চড়ায় সেক্রেটেরিয়েটের কেরানীকুলকে নামিতে হই । তখন বিহারের বিখ্যাত 'পছিয়া' হাওয়া প্রবল প্রতাপে

আত্মপ্রকাশ করিয়া ধুলাবালি উড়াইয়া বালির চড়ায় তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। তাহার মধ্যেই সেক্রেটেরিয়েটের বাবুদের নামিতে বাধ্য করিলেন সতীশবাবু। সদর হাসপাতাল হইতে কয়েকজন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, লেডী ডাক্তার আসিয়া পড়িল। তাহাদের লইয়া সতীশবাবু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে একে একে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিতে শুরু করিলেন প্লেগের কোনও চিহ্ন কাহারও অঙ্গে আছে কি না। প্রত্যেকের টেম্পারেচার লওয়া হইল, প্রত্যেকের শরীরের গ্লাণ্ডগুলি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যে ভদ্রলোক কলমের জোরের বড়াই করিয়াছিলেন তিনিও সে দলের মধ্যে ছিলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া সতীশবাবু বলিলেন—"আসুন, আপনাকে পরীক্ষা করি। আশংকা করছি, আমার উপর খুব চটেছেন। আপনার তো কলমের খুব জোর, হয়তো পরে কলমের এক খোঁচায় আমাকে কাৎ করে দেবেন। এখন আপনি ওই টেবিলের উপর কাৎ হোন, আমি আপনার শরীরের গ্লাণ্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখি। বিশ্বাস করুন যা করছি, আপনার ভালোর জন্যেই করছি—"

সূর্যসুন্দরের মনে পড়িল শেষ জীবনে সতীশবাবু অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। পারিবারিক নানা শোক দুঃখ তাঁহার জীবন-অপরাহ্ণকে বড়ই বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। ডায়াবিটিস রোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া শেষে তিনি মারা যান। সেকালে ডায়াবিটিসের ভালো চিকিৎসা ছিল না। অনেকে অহিফেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সতীশবাবু অহিফেন সেবন করিয়া তাঁহার সদা-জাগ্রত সদা-তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে চাহেন নাই। ডায়াবিটিসের আর একটা চিকিৎসা খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে সাবধান হওয়া। সতীশবাবু তাহাও করেন নাই। সূর্যসুন্দর তাঁহার এক আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছিলেন সতীশবাবু নাকি বলিতেন—সারাজীবন নানারকম নিয়ম মেনে পরাধীনতার জেলখানায় কাটিয়েছি। শেষ জীবনটা একটু স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। আমি যে রোগে ভুগছি তার নাম ক্যানসার, কর্মফলের ক্যানসার। এর কোনও ওষুধ নেই। প্রায়শ্চিত্তই এর একমাত্র ওষুধ। তাই করছি। আমাকে তোমরা বিরক্ত কোরো না।

সতীশবাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতেই সূর্যসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যেও সতীশবাবু নানাবেশে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। একবার যেন মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "সবই কর্মফল। এ বেড়াজাল থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই।"

উর্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া গীতাঞ্জলি পড়িতেছিল, সহসা সে চোখ তুলিয়া দেখিল দিগন্ত দাঁড়াইয়া আছে। সে কখন প্রবেশ করিয়াছে উর্মিলা বুঝিতে পারে নাই। তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই সে ঠোঁটের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া ইঙ্গিত করিল—কথা বলিও না। তাহার পর কপালের উপর বিলম্বিত ঝাঁকড়া চুলের গোছা সরাইয়া উর্মিলার কানে কানে ফুসফুস করিয়া বলিল, শুনলাম দাদু আমাকে খুঁজছেন তাই এলাম। উঠলে আমাকে খবর দিও। আমি চললুম। আবার সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

॥ ৩২ ॥

দিগন্ত পিছনের দিকে একটা ঘরে বসিয়া লিখিতেছিল। সামনে খোলা জানালা। জানালার সামনে একটা পেয়ারাগাছের কয়েকটা ডাল দুলিতেছে। সেই ডালে ল্যাজঝোলা বাদামী রঙের একটা পাখী মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছে এবং সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো দুই পায়ে ছোট একটা ডাল ধরিয়া নানাভাবে শরীরটাকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া পোকা ধরিতেছে। মুখটি কালো। চোখ দুটি লাল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। দিগন্তকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আপনমনে পোকা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ দিগন্ত লক্ষ্য করিল তাহার লম্বা ল্যাজটিও সুন্দর। কালো রঙের ধারে ধারে শাদা বর্ডার দেওয়া। দিগন্তের মনে হইল এই পাখীটার নামই ল্যাজঝোলা। যে ল্যাজঝোলার কথা ছড়ায় আছে—'আয় রে পাখী ল্যাজঝোলা খোকাকে নিয়ে কর খেলা'। হঠাৎ দেখিতে পাইল ভাগিয়ার ছেলেটা একটু দূরে ফড়িং ধরিতেছে। তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল সে। কাছে আসিতেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওই পাখীটার নাম কি রে?"

"কোট্রি।"

শুনিয়া দিগন্ত হতাশ হইল। বাংলা নাম 'হাঁড়িচাঁচা' শুনিলে আরও হতাশ হইত।

"তুই ফড়িং ধরছিলি কেন।"

সে তাহার ছেকা-ছিনি ভাষায় যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ—একটু আগে হাস্নাহানা ঝোপের ভিতর হইতে যে পাখীর ছানাটি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, পার্বতী দিদি সেটি লইয়া একটি খাঁচায় রাখিয়াছেন। সেই পক্ষিশাবকের জন্যই সে ফড়িং সংগ্রহ করিতেছে। দিগন্তর হঠাৎ মনে হইল বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট হইতেছে। আবার সে লিখিতে শুরু করিল। খানিকক্ষণ একটানা লিখিয়া ফেলিল। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পড়িল সেটা। হাওয়ায় একগোছা চুল উড়িয়া তাহার চশমার উপর খেলা করিতে লাগিল। মনে হইল তাহারা আনন্দে যেন নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। দিগন্তর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পড়িয়া খ্যাচ করিয়া সমস্ত কাটিয়া দিল সে। পছন্দ হইল না। আবার নূতন করিয়া লিখিতে শুরু করিল।

"ছোটবাবু এখানে আছ নাকি।"

কৃষ্ণকান্ত প্রবেশ করিলেন। দিগন্ত সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল, ভাবটা যেন কিছু একটা অন্যায় কাজ করিতেছিল ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

"একটা দরকারের জন্য তোমার তপোভঙ্গ করলাম। গগন বললে আসবার সময় তুমি মোগলসরাই স্টেশনে নাকি খুব ভালো একটি ছুরি কিনেছ। কোথায় সেটা—"

"আমার স্যুটকেসে আছে। আপনার চাই?"

"হ্যাঁ। সদানন্দের জন্য কয়েকটা ফাৎনা করে দেব। পুকুরে নাকি বড় বড় রুই কাৎলা রয়েছে কিন্তু ভালো ফাৎনার অভাবে সদানন্দ তাদের ধরতে পারছে না। আমি কয়েকটা 'কুইল' কিনে আনিয়েছি। বাড়ীতে ভালো ছুরি নেই। কুড়ুল আছে, দা আছে, খাঁড়া আছে, হাঁসুয়া আছে, ছুরি নেই। ব্লেড দিয়ে চেষ্টা করলাম হলো না। তোমার ছুরিটা যদি দাও—"

"এক্ষুণি দিচ্ছি—"

"লিখছ নাকি কিছু—"

"সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছি—"

কথাটা বলিয়া দিগন্ত আরও যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

"বাংলা ভাষায় লিখছ তো? অর্থাৎ আমাদের মতো লোক বুঝতে পারবে কি না—"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ইংরেজী আছে। আপনি শুনবেন? একজন কাউকে না শোনালে ঠিক বুঝতে পারছি না কেমন হচ্ছে। আপনার সময় নেই হয়তো—"

"আমাকে শোনাবে! আমাকে শোনানোও যা ওই পেয়ারাগাছটাকে শোনানোও তাই। তবু শুনব। আগে ফাৎনাটা তৈরি করে ফেলি। ছুরিটা দাও আমাকে—"

যাইতে যাইতে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"এখানে কবিরাজ মশাই খুব রসিক লোক। তাঁকেও ডেকে নেব। ডাকবাংলোটা খালি আছে, সেখানে গিয়েই বসা যাবে।"

দিগন্ত যখন ছুরিটি বাহির করিয়া দিল তখন কৃষ্ণকান্ত অবাক হইয়া গেলেন।

"ও বাবা, এ তো শুধু ছুরি নয়, একেবারে ওয়ার্কশপ্! সব রকম আছে দেখছি।"

"এতে কাজ হবে আপনার?"

"খুব হবে। চমৎকার জিনিসটি কিনেছ—"

শিশুসুলভ হাসিতে দিগন্তর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দাদা প্রথমে কিনতে চাইছিল না। বলছিল কি হবে ওই জবড়জং জিনিসটা কিনে। আমি তোর পেন্সিল বাড়াবার জন্য ভালো একটা 'স্ক্যালপেল' দেব। তারপর শেষ মুহূর্তে কি মনে হলো বললে—আচ্ছা কেন। ভাগ্যে কিনেছিলুম, দেখুন কেমন আপনার কাজে লেগে গেল।"

"তুমি কি দাদার মত নিয়েই সব কেনাকাটা কর নাকি—"

"না—তা নয়—"

লজ্জিত হইয়া পড়িল দিগন্ত। তাহার পর বলিল—"আমি তো অন্য জায়গায় থাকি। তবে দাদাই আমাকে নানা জিনিস কিনে পাঠিয়ে দেয়। দাদার মতের বিরুদ্ধে কিছু করলে দাদা বড্ড রেগে যায় যে।"

"হ্যাঁ, ওকে আমারও ভয় করে—"

কৃষ্ণকান্ত ছুরি লইয়া ফাৎনা বানাইতে চলিয়া গেলেন। দিগন্ত আবার আসিয়া লেখার টেবিলে বসিল।

॥ ৩৫ ॥

ডাকবাংলোর বারান্দায় কবিরাজ মহাশয় ও কৃষ্ণকান্ত ছাড়া দিগন্তর আর একটি শ্রোতা জুটিয়াছিল। জগদম্বা ডাকবাংলোর নূতন চাপরাসী। কৃষ্ণকান্ত আসিয়াই তাহার সহিত ভাব করিয়াছিলেন। যাহাদের আমরা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া দূরে দূরে রাখি কৃষ্ণকান্ত তাহাদের সহিতই আগে ভাব করিয়া ফেলেন। কারণ তিনি

তাঁহাদের নিকট হইতে এমন সব খবর পান যাহা তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা দিতে পারে না। জগদম্বার নিকট হইতে তিনি জানিয়াছেন 'পানচাক্কা' নামক বিলে ডাহুক পাখী আছে। জগদম্বা আরও খবর দিয়াছে গভীর রাত্রে বাখরপুর দিয়ার চরে ভালো ভালো হাঁস নাকি নামে। শৌখিন বন্দুকধারীরা এখনও তাহাদের সন্ধান পায় নাই। জামাইবাবু যদি বাখরপুরে গিয়া তাহার সমুধি (বেয়াই) রামসঙ্গমের বাড়ীতে রাত্রিতে থাকেন তাহা হইলে সে অনুগৃহীত হইবে, কারণ ডাক্তারবাবু (সূর্যসুন্দর) একবার রামসঙ্গমের জাং (উরু) চিরিয়া অনেক পিপ্ (পুঁজ) বাহির করিয়া তাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। সে কৃষ্ণকান্তর খাইবার শুইবার এবং শিকার করিবার 'পুরা বন্দোবস্ত্' করিয়া দিবে। কৃষ্ণকান্ত এখনও 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা আছে ঘন্টুকে লইয়া তিনি একদিন বাখরপুরে যাইবেন। অবশ্য সবই নির্ভর করিতেছে কিরণের মেজাজের উপর। কিন্তু একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি 'পানচাক্কা'য় যাইবেনই তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। একটা ডাহুক মারিয়া সেটাকে 'স্টাফ্' করাইতে হইবে। একটি বড় সোনাব্যাঙ আগেই তিনি স্টাফ্ করাইয়া রাখিয়াছেন। একটি হার্টের ছবিও তাঁহার কাছে আছে। এই হার্টের ছবি, সোনাব্যাঙ এবং ডাহুক সহ তিনি বিদ্যাপতির বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত কলিটি—'মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকি, ফাটি যাওত ছাতিয়া' একজন আর্টিস্টকে দিয়া লিখাইয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু চৌধুরীকে পাঠাইবেন অনেক দিন আগেই ঠিক করিয়াছিলেন। আর্টিস্ট বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পটভূমিকায় কবিতার লাইনটি অশ্রু-ঝাপসা করিয়া লিখিয়াছে। এতদিন ডাহুকের অভাবে ওটি পাঠানো হয় নাই। ঝণ্টু মিস্ত্রী বলিয়াছে ডাহুক আসিয়া গেলে সে সমস্ত জিনিসগুলি চমৎকার একটি সেগুনকাঠের কেসের ভিতর কাচ দিয়া ফিট করিয়া দিবে। ঝণ্টু মিস্ত্রী শিকার লাইনে কৃষ্ণকান্তের শিষ্য। মিস্ত্রীও ভালো। শিকারীও ভালো। সে-ও নিম্নশ্রেণীর লোক, কিন্তু কৃষ্ণকান্তর বন্ধু। কৃষ্ণকান্ত এই ধরনের লোক লইয়া তাঁহার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে প্রিয় বন্ধু চৌধুরীকে তিনি এই উপহারটি পাঠাইতে চান তিনিও আসাম জঙ্গলের একজন ফরেস্ট অফিসার। ভদ্রলোকের বিশেষত্ব তিনি উড়ন্ত পাখী মারিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু জীবনে যে রঙীন পক্ষিণীটিকে তিনি ঘায়েল করিতে চাহিয়াছিলেন সে তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাই চৌধুরী চিরবিরহী। বিবাহ করেন নাই। অবসর পাইলেই কবিতা লেখেন। জগদম্বার মধ্যেও কৃষ্ণকান্ত একজন কবিকে আবিষ্কার করিয়াছেন। জগদম্বা নাকি যৌবনে 'লোণ্ডা' নাচের একজন পাণ্ডা ছিল, নিজে স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া নাচিত। এখন প্রত্যহ সন্ধ্যায় তুলসী রামায়ণ গান করে। মুখে মুখে কবিতাও নাকি বানাইতে পারে। দিগন্ত যখন খুব ছোট ছিল তখন কিছুদিন পুরসুন্দরী অসুস্থ হইয়া পড়েন। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে তখন নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিলেন কিছুদিন। সেই সময় জগদম্বা দিগন্তের 'রাখোয়ালি' অর্থাৎ তত্ত্বাবধান করিয়াছিল। সেই হিসাবে দিগন্তের উপর তাহার একটু পক্ষপাতিত্বও আছে। জগদম্বা যখন কৃষ্ণকান্তের নিকট শুনিল যে দিগন্ত নাকি বিরাট পণ্ডিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত কবিতার উপর যে প্রবন্ধ লিখিয়া সে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিবে সেই প্রবন্ধটি সে তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে চায় তখন প্রথমে সে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পরে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। ছেলেবেলায় বিরক্ত করিত বলিয়া যাহার নাম সে 'দিক্' বাবু

রাখিয়াছিল, যাহাকে সে সিকন্দর খাঁর ভাই দিকন্দর খাঁ বলিত সেই দিগন্ত দিগগজ পণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহাকে প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে চায়—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বড়া জামাইবাবু যখন বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই 'ঝুট বাত্' নয়। কৃষ্ণকান্ত আগেই দিগন্তকে বলিয়াছিলেন—"তোমার আর একটি শ্রোতা জুটেছে। তোমার বাহন জগদম্বা—"

"জগদম্বা? সে কি বুঝতে পারবে?"

"পারবে। সে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবে না, হৃদয় দিয়ে বুঝবে। তুমি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তার দিকে চেও, তাহলেই হবে। আর গিয়েই বোলো—জগু আমার থীসিস্‌টা কেমন হয়েছে একবার শোনো তো—তাহলেই সে কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

দিগন্ত পড়িতেছিল। বারান্দার এক কোণে জগদম্বা উবু হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার ভ্রূকুঞ্চিত ললাট এবং দমবন্ধ ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল সে যেন কোনও দুরূহ তপস্যা করিতেছে। কবিরাজ মহাশয় এবং কৃষ্ণকান্ত দুইটি ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিলেন। দিগন্ত বার বার তাহার অবাধ্য চুলগুলাকে কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে টেবিলের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

"সংস্কৃত কাব্যকে যাঁহারা আধুনিক মনে করেন না, যাঁহাদের বিশ্বাস যে বিশেষ একটা আধুনিক ছাঁচে বা আঙ্গিকে লেখা না হইলে বুঝি কাব্যকে আধুনিক বিশেষণে ভূষিত করা যাইবে না, যাঁহাদের মতে যাহা আধুনিককালোদ্ভব তাহাই বুঝি আধুনিক তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত বলা দরকার 'আধুনিক' বিশেষণটি কাব্যের ক্ষেত্রে অবান্তর। কাব্যের ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য তাহা রসোত্তীর্ণ কাব্য কি না। ফুল আধুনিক কি না সে বিচার কেহ করে না। ফুল যদি রূপে রসে গন্ধে বর্ণে পুষ্পত্ব লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট, সে কোন্ সময়ে ফুটিয়াছে অথবা তাহার প্রসাধনে আধুনিক উপাদান আছে কি না ইহা লইয়া রসিকেরা মাথা ঘামান না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিকতার অর্থ আছে। গরুর গাড়ির তুলনায় বর্তমানের আকাশচারী মহাযান নিশ্চয়ই আধুনিক, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, গতির সাধনায় সে অবশ্যই অধিকতর কৃতিত্বের দাবি রাখে—কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য নয়। কাব্য পাঠ করিয়া রসিকেরা যে পরমানন্দে অভিভূত হন তাহার উৎস প্রত্যেক রসোত্তীর্ণ কাব্যেই আছে। রসের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের কবিতে আর রবীন্দ্রনাথে বিশেষ তফাত নাই। উভয়ের কাব্য পাঠ করিয়া রসিক পাঠক একই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ প্রাচীনকালে লিখিত বলিয়া রসিকের কাছে অবজ্ঞেয় নয়। ঋগ্বেদের উর্বশী ও পুরুরবার কাহিনী প্রেমের চিরন্তন কাহিনী। ঋগ্বেদের কবি উর্বশীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'প্রাক্র-মিষমুষসামগ্রিয়েব' 'দুরপনা বাত ইবাহমস্মি'—আমি উষার মতোই চিরন্তনী, বায়ুর মতোই অধরা। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাতেও সেই উষার আলো পড়িয়াছে, সেই একই অধরা, অবন্ধনা, অকুণ্ঠিতা সৌন্দর্যপ্রতিমা রঙে রসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে আবার। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ওই বৈদিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার শিল্প-সুষমা, বাক্যবিন্যাস, তাহার ছন্দ-নিক্কণ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। একই মাটি লইয়া দুইজন মৃৎশিল্পী যেন দুইটি প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলিতেছেন—"পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনী প্রথম পাওয়া গেল ঋগ্বেদের একটি

সূক্তে (১০৯৫)। তাহার পর ব্রাহ্মণে, মহাভারতে ও কালিদাসের নাটকে এই কাহিনীর কালানুসারী ও ভাবানুযায়ী রূপান্তর ও বিকাশ দেখিয়াছি। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উর্বশী চিরন্তন মানুষের সৌন্দর্য পিপাসার প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই কালানুসারী ও ভাবানুযায়ী রূপান্তর ও বিকাশই হয়তো যুগে যুগে 'আধুনিক' আখ্যালাভ করিতেছে। ছন্দ, শব্দ, বাক্যবিন্যাস, অলংকার, উপমার নূতনত্ব কবি-কৃতিত্বের নিদর্শন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাব্য-বিচারে গোড়ার কথাটা ভুলিলে চলিবে না—কাব্য রসোত্তীর্ণ হওয়া চাই। কাব্যের আঙ্গিক অনেকটা পোশাকের মতো। যুগে যুগে পোশাকের চেহারা বদলায়। কিন্তু যে পোশাক পরিবে সেই মানুষটার কথাই কাব্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ বস্তু। দোকানের 'শো-কেসে' ঝোলানো কতকগুলো পোশাক দেখিয়া রসিকের মন ভরে না। পোশাকের অন্তরালে সে রক্তমাংসের মানুষকে দেখিতে চায়। আর সে মানুষের মূল প্রবৃত্তি ও অনুভূতি সব যুগেই প্রায় একরকম। প্রেম, ঘৃণা, হিংসা, লোভ, কাম, নিতান্ত-মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা—সুখ-দুঃখের সমারোহ, অতীন্দ্রিয় লোকের উদ্দেশে ভূমার সন্ধানে কল্পনার রথে চড়িয়া অভিযান—এই সমস্তই সর্বকালের সর্বযুগের সর্বদেশের মানবের হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে। ইহাই কাব্যের উপাদান, সেকালেও যেমন ছিল, একালেও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে। সুতরাং কাব্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতার দাবি তেমন জোরালো নয়। আঙ্গিকের দাবি অর্থাৎ পোশাকের দাবি অবশ্য আছে। কারণ যুগে যুগে আঙ্গিক বদলাইয়াছে। আমার এই প্রবন্ধে তাহাই আমি দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ডঃ সুকুমার সেন আর একটি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছেন। বৈদিক যুগের পরই কালিদাসই প্রথম কবি যিনি সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশিষ্টরূপে অলংকৃত করিয়াছেন। অবশ্য বৈদিক যুগের পর উপনিষদের যুগ ঃ বৈদিক যুগের কথা বলিতে গিয়া ডঃ সেন উপনিষদের কথাও বলিয়াছেন। উপনিষদেও অনেক কাব্যগুণ আছে। 'কেন' উপনিষদের—

> ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ
> ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈ তদনুশিষ্যাৎ।

নয়ন, বাক্য, মন যেখানে যাইতে পারে না, যে ব্রহ্মের স্বরূপ জানি না, তাহা অপরকে কেমন করিয়া জানাইব, তাহাও জানি না।

কঠোপনিষদের—

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

ওঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। কবিরা বলেন ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম ওই পথও তেমনি দুর্গম।

> অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্
> তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
> অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
> নিচাষ্য তম্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিহীন, যিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত,

যিনি মহৎ, পরম এবং ধ্রুব তাঁহাকে অবগত হইলেও মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

কঠোপনিষদের ঋষি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিয়াছেন, কিন্তু 'কেন' উপনিষদ বলিতেছেন ব্রহ্মের স্বরূপ কেমন তাহা বলিতে পারিব না। উপনিষদের এরূপ অনেক শ্লোক আছে যাহার উদাত্ত ভাব পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে নানাভাবে নানা সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমরা—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"একটু থাম। আমার একটা অসুবিধা হচ্ছে প্রথমেই সেটা বলি। যতটুকু শুনলাম তাতেই তোমাকে প্রণাম বরতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তুমি বয়সে ছোট বলে পাচ্ছি না। মনে মনে একটা টাগ্-অব্-ওয়ার চলছে। দ্বিতীয় অসুবিধা—আমার মূর্খতা। ফুলের গন্ধে বর্ণে অবশ্য মুগ্ধ হচ্ছি, কিন্তু ফুলের তত্ত্ব কিছু জানি না বলে আপসোস হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"আমারও খুব ভালো লাগছে। আমারও মনে হচ্ছে তোমার এ থীসিস বিচার করার অধিকার আমার নেই। আমার মতো মোল্লার দৌড় কলেজ রূপ মসজিদ পর্যন্ত। তারপর আর বেশীদূর এগোতে পারিনি। প্রবন্ধ কিন্তু তোমার বেশ ভালো হচ্ছে। লিখে যাও। আর একটা কাজ কোরো—সংস্কৃত সাহিত্যে পশু বা পাখীর নাম পেলে সেটা টুকে রেখো। যেখানে পাবে টুকবে। বর্ণনা যদি পাও তাও সংগ্রহ করবে। ডক্টর লাহার 'কালিদাসের পাখী' বইটা পড়েছি। কিন্তু ওতে সব পাখীর কথা নেই।..."

গাছকোমর বাঁধিয়া পার্বতী আসিয়া হাজির হইল।

"তুমি এখানে! আমি চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—গগন তোমাকে ডাকছে। এই নাও চিঠি।"

পার্বতী একটি চিঠি দিগন্তর হাতে দিল। গগন লিখিয়াছে—"দিগন্ত তুই চলে আয়। দাদুকে আপেলকোরা আর নারকোলের দুধ দিয়ে চিকেনের মালাই কারি করে দেব। বাড়ীতে নারকোল আর আপেল কোরবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। মা সবাইকে একটা-না-একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। তোমার বৌদিকে দাদু নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছেন—কোথাও নড়তে দেবেন না। অনেক কষ্টে একটা কুরুনি যোগাড় করেছি। তুই চলে আয়। আমরা দু'জনে মিলেই যা পারি করব—"

দিগন্ত উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন—"কি হলো—"

"দাদা ডাকছে—"

লেখার ফাইলটি বগলে করিয়া দিগন্ত পার্বতীর অনুগমন করিল।

"এরকম লক্ষ্মণ তো এ যুগে দেখা যায় না।"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"লক্ষ্মণ সূর্যবংশেই জন্মেছে। ওরা সব যুগেই জন্মায়। আমরা কখনও দেখতে পাই, কখনও দেখতে পাই না। প্রবন্ধটি খুবই ভালো লাগছিল। যদিও বুঝতে পারছিলাম না মাঝে মাঝে। আমি উঠি। চন্দরবাবুর গলায় ব্যথা হয়েছে, রাধানাথ গোপ ওঁর জন্যে তেজপাতা, লবঙ্গ, বচ আর বড় এলাচ সিদ্ধ করে তাতে চা দিয়ে একটা কবিরাজী চা তৈরি করছে আমার প্রেসক্রিপসন অনুসারে। দেখে আসি সেটার কতদূর হলো।"

"আপনিও খাবেন না কি—"

"আমি তো খাবই। আমার তো সর্বদাই গলায় ব্যথা। কিন্তু ওরকম চা খাবার পয়সা নেই। এখানে পেয়ে গেছি খেয়ে নি একটু—"

হাসিতে হাসিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

জগদম্বা স্তব্ধ বিস্মিত হইয়া বসিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া যাইতেই সে প্রশ্ন করিল—"দিক্ বাবু তুলসীদাস কি লোণ্ডা নাচের বিষয় কিছু বলিল কি?"

প্রশ্ন করিল অবশ্য হিন্দীতে। কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—"তুলসীদাস বা লোণ্ডা নাচ সংস্কৃত কাব্যের এলাকায় পড়ে না।"

জগদম্বা ইহাতে বিস্মিত হইল। ভ্রূযুগল কপালে উত্তোলন করিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর মন্তব্য করিল—"লিখাপঢ়িমে ভি ইলাকাকা বাত ছে?"

"জরুর"—কৃষ্ণকান্ত এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বাক্যটি উচ্চারণ করিলেন যে জগদম্বা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তাহার পর বলিল—"হম্ তো কুচ্ছু নেই সমঝ্লিয়ে—"

"পানচাক্কায় কবে যাবি? ডাহুক আমার একটা চাইই—"

"যব্ খুশি চলো—"

এমন সময় গঙ্গা আসিয়া উপস্থিত।

"জামাইবাবু বড়দি আপনাকে ডাকছেন। আজ ঘণ্টুর জন্মতিথি যে। বড়দি তাঁকে নিয়ে পীরবাবার ওখানে যাচ্ছেন। আপনিও চলুন—"

"ও তাই নাকি! চল—"

॥ ৩৬ ॥

কুমার আমবাগানে গিয়াছিল সেই চালাঘরটিতে বসিয়া আবার সূর্যসুন্দরের ডায়েরি পড়িবে বলিয়া। গিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সামনের মাঠে প্রকাণ্ড একটা হাড়গিলা পাখী—ইংরেজীতে যাহাকে বলে Adjutant Stork—চরিয়া বেড়াইতেছিল। পড়িতে পড়িতে কুমার মাঝে মাঝে সেটার দিকে চাহিতেছিল। তাহার গম্ভীর চালচলন, তাহার জঙ্গী পোশাক কুমারের মনে সম্ভ্রম উদ্রেক করিতেছিল। হাড়গিলা পাখীকে সাধারণতঃ লোক কুৎসিত মনে করে কেন এ প্রশ্নও মাঝে মাঝে জাগিতেছিল তাহার মনে। দূরে তালগাছটাকে কেন্দ্র করিয়া একঝাঁক তালচোঁচ উড়িতেছে। কুমারের মনে হইতেছিল ওই পাখীগুলার সদা-চঞ্চলতা যেমন সুন্দর এই হাড়গিলার ধীর স্থির গম্ভীর চালচলনও তেমনি সুন্দর। আরও দূরে যমুনিয়া মহিষটাও চরিতেছিল সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কুমারের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সামনের আমগাছে বসিয়া কয়েকটা ফিঙা কি মিষ্ট সুরে মাঝে মাঝে ডাকিতেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় কয়েকটা শকুনি ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। অনেক উঁচুতে উড়িতেছে তাহারা। মনে হইতেছে কয়েকটা কালো বিন্দু যেন। ঘরের ভিতর প্রাইমাস স্টোভটা জ্বলিতেছিল হঠাৎ তাহার শব্দটা বন্ধ হইয়া গেল। মদ্ধু ঘরের ভিতর চা করিতেছে। একটু পরেই সে একটি ছোট টেবিল আনিয়া কুমারের পাশে রাখিয়া গেল। কুমার তাহাকে বলিল, "তুই আমাকে চা-টা দিয়েই চলে যা হীরু

মহলদারের কাছে। আমার সাইকেলটা নিয়েই যা। একটা পাঁচ-ছ' সের ওজনের রুই মাছ চাই। ঘণ্টুর আজ জন্মদিন। বড় মাছের মুড়ো দরকার।"

মদ্ধু নীরবে ভিতরে চলিয়া গেল। সে কথাবার্তা কম বলে। একটু পরেই এক পেয়ালা চা আনিয়া সে টেবিলের উপর রাখিল।

"কলসীতে জল আছে তো?"

"আছে—"

"আমি চায়ের পেয়ালা ধুয়ে রেখে দেব। তুই হীরুর কাছে চলে যা—"

"আমি ভোরে হীরু মহলদারের কাছ থেকে মাছ এনেছি।"

"কোথায় মাছ—"

"এই যে এখানেই আছে।"

মদ্ধু ঘরের ভিতর হইতে বড় একটি লাল রুই বাহির করিয়া দেখাইল।

"তুই তো এতক্ষণ কিছু বলিস নি।"

মদ্ধু একথার কোন জবাব না দিয়া বলিল—"বড়দি কাল রাত্রেই আমাকে বলেছিল। নিখিলবাবুও মাছ পাঠাবেন।"

"তুই তাহলে এখন কি করবি—"

"আমাকে কিছু কলাপাতা কেটে নিয়ে যেতে হবে।"

"বেশ।"

কুমার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"মামা অবশেষে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। সকলকে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে আমি যদি বিবাহ করিতাম তাহা হইলে আমার বউ আসিয়াই সংসারের হাল ধরিতে পারিত। তাঁহাকে আর বুড়া বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইত না। কিন্তু আমি স্বার্থপর কুলাঙ্গার, চিরকাল তাঁহার খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়াছি, সামান্য একটা বিবাহ করিয়া তাঁহার উপকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু বাড়ীতে একটা গৃহিণী না থাকিলে সংসারই যে ভাসিয়া যায়, মায়ের যে বড় কষ্ট হইতেছে, মা-হারা ছেলেমেয়েদের যত্ন করিবে কে—তাঁহারই যখন সংসার তখন তাঁহাকেই ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যবস্থা মানে বিবাহ। সুতরাং অবশেষে তিনি বিবাহই করিয়া ফেলিলেন। তারাপদ পুরোহিত অনেকদিন আগেই একটি মেয়ে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবাহে কোন ধুম হয় নাই। আমাকে কোন খবরই দেওয়া হয় নাই।

আমার তখন প্র্যাকটিস বেশ ভালোই জমিয়া উঠিয়াছিল। দেওয়ানজির গোয়ালঘর হইতে দেওয়ানজি গরু-মহিষ সরাইয়া লইয়াছিলেন। আমার রোগীরাই সেখানে ভিড় করিত। আমাকে একটি ঘোড়াও কিনিতে হইয়াছিল। সকালে আমার রোগীদের ঔষধপত্র দিয়া আমি ভাতে-ভাত আর আধ সের খাঁটি গরুর দুধ খাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতাম। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমার একটা কাঠের বাক্স ছিল। তাহাতেই প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং ঔষধ মাপিবার যন্ত্রপাতি থাকিত। ছোটখাটো অপারেশন করিবার মতো একটা সার্জিকাল কেসও থাকিত তাহার ভিতর। প্রসব করাইবার একটা ফরসেপসও। খালি শিশিও লইয়া যাইতাম কয়েকটা। রোগীর বাড়ীতে বসিয়া নিজে হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতাম। আমার ঘোড়ার সহিসই

বাক্সটি মাথায় করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত। এজন্য রোগীর বাড়ী হইতে তাহাকে চার আনা পয়সা দেওয়া হইত। পচনা সহিস আমার কাছে বহুদিন ছিল। সে-ও নানারকমে আমাকে সাহায্য করিত। কাঁচি দিয়া সে সুনিপুণভাবে মিকশ্চারের শিশিতে কাগজের দাগ বানাইয়া আঁটিয়া দিত। মলম তৈরি করিতে পারিত। ছোট অপারেশনে একটু আধটু সাহায্যও করিতে পারিত সে। জাতে সে তুরী ছিল। আকারে ছিল খর্ব। কিন্তু খুব কাজের লোক ছিল সে। সে মারা যাইবার পর শনিচরা সাঁওতালও কিছু-কাল ছিল আমার কাছে। প্রথমে আমি কম্পাউণ্ডার রাখিতে পারি নাই। ঘোড়ার সহিসদের সাহায্যেই সব কাজ চালাইতাম। পরে অবশ্য সন্তোষ, হাবুমামা এবং আরও অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু যাহাদের আমি আশ্রয় দিয়াছিলাম (দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) আমার কম্পাউণ্ডাররূপে কাজ করিয়াছিল এবং আমার নিকট হইতে মোটামুটি ডাক্তারিও শিখিয়াছিল। কিন্তু এ বিদ্যাটা এক দুর্যোধন মণ্ডল ছাড়া আর কেহ বড় একটা কাজে লাগায় নাই। এই সময় সতীশবাবু প্রায় প্রত্যহই গুনগুন করিয়া একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বাজারের প্রান্তে প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মাটির বাড়ী বিক্রী ছিল। বাড়ির মালিক জমিদারী সেরেস্তারই একজন কর্মচারী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে দেশে গিয়াছিলেন, আর ফেরেন নাই। সেখানে তাঁহার একটি চাকুরি জুটিয়াছে, আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। এখানকার এই বাড়ীটি তিনি বিক্রয় করিয়া দিতে চান, সতীশবাবুকে বার বার পত্র লিখিতেছেন। সতীশবাবুর ইচ্ছা বাড়ীটি আমিই কিনি। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম আমি এখানে বরাবর থাকিব কি না তাহা কিছুদিন না গেলে স্থির করিতে পারিব না। বছর দুই কাটুক তখন ও বিষয়ে চিন্তা করিব। সতীশবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন—"আপনাকে এখানে থাকিতেই হইবে। মালিকের ইচ্ছা আপনি এখানে বসবাস করুন। কাল আমি সদরে গিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন ওই বাড়ীটা আপনিই স্টেট হইতে কিনিয়া লউন এবং ডাক্তারবাবুকে বলুন তিনি যেন ওটাতে বসবাস করেন। একটা ডাক্তারের পক্ষে কাহারও গোয়ালঘরে থাকা সম্মানজনক নয়।" সতীশবাবু খবরটি দিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, "বাড়ীটা আমরা কিনে নেব দু'শ টাকায়। আজই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার মতটা শুনবেন? আপনি এখন ও বাড়ীতে যাবেন না। যদি মনস্থির করতে পারেন তাহলে দু'শ টাকা আমাকে দিয়ে দেবেন আমি বাড়ী আপনার নামে লেখাপড়া করে দেব। মালিককে একথা এখনও বলিনি অবশ্য। রায়মশায়ের মারফত মালিককে বলব, তিনি খুশীই হবেন মনে হয়। তিনি নিজে আত্মসম্মানী লোক, যাদের আত্মসম্মান আছে তাদের তিনি খাতির করেন। বাড়ীটা না কিনে ওখানে যাওয়া উচিত হবে না আপনার। আপনি আমাকে বলেছিলেন হাজার টাকা না জমলে আপনি বাড়ী কেনার কথা চিন্তাই করবেন না। আজ বলরামবাবুর কাছে খবর নিয়ে এলাম আপনার অ্যাকাউন্টে বারশো সাতাশি টাকা তিন আনা জমেছে।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা ভেবে দেখি।" সতীশবাবু চলিয়া গেলেন। হয়তো সেইদিনই কিছু ঠিক করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। সাহেবগঞ্জ হইতে দিদিমার দূতস্বরূপ মন্মথ আসিয়া হাজির হইল। বলিল, "দিদিমা আমাকে পাঠিয়েছেন তোকে নিয়ে যেতে। জগন্নাথবাবুও

তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমাদের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' হচ্ছে। তোকে ভীম সাজতে হবে। তাছাড়া তোর নতুন মামীর সঙ্গে দেখা করবি না ?"

"নতুন মামী, মানে ?"

"শক্তিবাবু আবার বিয়ে করেছেন যে। তুই জানিস না ?"

"না। কোনও খবর পাইনি তো।"

"কাউকেই খবর দেননি। বউভাত টউভাত সব শঙ্করায় সেরে এসেছেন।"

নির্বাক হইয়া রহিলাম। মন্মথ বলিল—"শুনেলাম বউ আসবার আগে কমলা আর ননতিকে নাকি ঘরে শিকল তুলে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ওরা বিধবা, পাছে ওদের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়। তোদের ফুল মামী বিচক্ষণ লোক !"

"ফুল মামী ? খেতু মামার বউ ? তিনি এসেছেন নাকি ?"

"হ্যা। বউ আসবার আগেই তিন চারজন 'এয়ো'কে নিয়ে তিনি এসে গিয়েছিলেন। ওঁরাই তো সব করছেন।"

"কি করছেন—"

"সবই করছেন। রান্নাবান্না, ভাঁড়ার বার করা, নতুন বউকে উপদেশ দেওয়া, এইসব আর কি ! তোর দিদিমা ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে গেছেন। নতুন বউ তাঁকে দু'বেলা ভক্তিভরে প্রণাম করছে কেবল। তোর মামার ভক্তিও বেড়ে গেছে দেখলাম। একদিন তোদের বাড়ী গিয়েছিলাম। দেখলাম তোর মামা পুজো সেরে এসে দিদিমার ঘরে দাঁড়ালেন তারপর বললেন, কই মা চরণ দাও। তোর দিদিমা জানিসই তো ঠাণ্ডাকে বড় ভয় করেন, লেপটেপ মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন আরামে। কিন্তু তোর মামা সেই লেপের ভিতর তাঁর ঠাণ্ডা হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে চরণ-বন্দনা করলেন। তোর দিদিমার মুখখানা যা হলো তা অবর্ণনীয়। তোর নতুন মামীও দু'বেলা এসে চরণবন্দনা করছেন। আমি আজকাল প্রায় রোজই একবার যাই তোদের বাড়ীতে। কাল তোর দিদিমা চুপিচুপি বললেন— তুই যা, একবার সুয্যিকে ডেকে নিয়ে আয়। তাই চলে এলাম। চল তুই—"

মনে হইল পুরাতন নাটকের যবনিকা-পতন হইয়া গিয়াছে। এবার নূতন নাটকে নূতন দৃশ্য। সাহেবগঞ্জে গিয়া দেখিলাম শুধু খেতু মামা এবং ফুল মামী নয় পটল-কর্তা ও পটলগিন্নীও আসিয়া গিয়াছেন এবং মামার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মামা এমন একটা ভাব করিতেছেন যেন তাঁহারাই বাড়ীর মালিক, মামা আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। নূতন মামীটিকে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগিল। তের চোদ্দ বছরের কালো রোগা মেয়ে একটি। বড় বড় চোখ। সারা মুখে একটি স্নেহকাঙাল ভাব। আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট—একটু বেঁটে বলিয়া আরও ছোট দেখাইতেছিল—কিন্তু সম্পর্কে তিনি আমার মামীমা, আমার গুরুজনস্থানীয়া। দেখা হইতেই আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনিও পায়ের আঙুলের ডগায় ভর দিয়া হাত বাড়াইয়া অঙ্গুলি দিয়া আমার থুতনি স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন। তাহার পর সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি আমার বড় ছেলে বাবা। তোমাকে আমি বাবা বলেই ডাকব। আমি নিজের বাবাকে কখনও দেখিনি। তিনি আমার জন্মের আগেই মারা গেছেন। তুমিই আমার বাবা হও, কেমন ?" কেন জানি না, আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলিলাম—"আমার যথাসাধ্য নিশ্চয়ই আমি করব।" কথাটা বলিয়াই মনে হইয়াছিল কথাগুলো কেমন যেন থিয়েটারি-গোছের হইয়া গেল। হঠাৎ চোখে পড়িল মামীমা

একটি সুতীর লাল ডুরে পরিয়া আছেন। কাপড়টা কেমন যেন খেলো মনে হইল। শুনিলাম তাঁহার মা খুব গরীব। মেয়েকে কিছুই দিতে পারেন নাই। মামাই নাকি বিবাহের খরচ নির্বাহ করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিয়াছেন। নকুল—মামার আগের পক্ষের শালা—আমাকে গোপনে সব খবর বলিল। মামার এ বিবাহ নকুল সুচক্ষে দেখে নাই। সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার যে দিদি এতদিন তাহার সব দোষ ঢাকিয়া তাহাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার অবর্তমানে সে এ সংসারে টিকিতে পারিবে না। যদিও নূতন মামীমা নকুলকে দাদা সম্বোধন করিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নকুল তেমন আমোল দেয় নাই। সে সরিয়া সরিয়া বেড়াইতেছিল। সে আমাকে বলিল—"কি রকম চণ্ডী অভিনেত্রী দেখেছিস। সবাইকে তেল দিয়ে বেড়াচ্ছে। অতি হা-ঘরের মেয়ে। ওর মা তারাপদ পুরুতকে দু'কাঠা ধেনো জমি ঘুষ দিয়ে এই কাণ্ডটি করলে। কিচ্ছু দেয়নি। হাওড়া-হাটের খানকয়েক জ্যালজেলে শাড়ি। আর ওর মায়েরই হাতের খওয়া (ক্ষইয়া যাওয়া) চুড়ি আর লিকলিকে সরু একটা হার। চাটুজ্যে মশাইয়ের (আমার মামার) কাছ থেকে তারাপদ পুরুত ওদের দেবে বলে দুশো টাকা নিয়ে গিয়েছিল। দিয়েছে ভেবেছিস? একটি পয়সা দেয়নি। সব নিজে গাপ করেছে। অত্যন্ত কুচক্করে লোকটা।"—এই বলিয়া নকুল ঘোৎ করিয়া একটা শব্দ করিল। দেখিলাম এটি তাহার একটি নূতন মুদ্রাদোষ হইয়াছে। সেদিন আমি অদ্ভুত একটি কাণ্ড করিয়া বসিলাম। আমার কাছে পঞ্চাশটি টাকা ছিল। তাহা দিয়া আমি একটি ভালো বোম্বাই শাড়ি কিনিয়া আনিয়া মামীকে দিলাম।

"এ কি!"—মামী তো অবাক। এতো ভালো শাড়ি পরা দূরে থাক তিনি কখনও চোখেও দেখেন নাই। দাম শুনিয়া তিনি আকাশ হইতে পড়িলেন।

"এতো টাকা খরচ করে শাড়ি কেনবার কি দরকার ছিল বাবা।"

"বাবা কি কখনও মেয়েকে খেলো জিনিস দিতে পারে?"

মামীমা মাথা হেঁট করিলেন, দেখিলাম তাঁহার চক্ষে অশ্রু উদ্গত হইয়াছে। নূতন মামীমা সেইদিন হইতেই আমার বন্ধু হইয়া গেলেন। মামীমা যখন আমার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন তখন পটলকর্তা হঠাৎ আসিয়া পড়িলেন।

"তুমি এখানে কি করছ? ভেতরে যাও। ওটা কি—"

"বাবা আমাকে এই শাড়িটা কিনে দিয়েছে।"

"তুমি কিনে দিয়েছ!"—আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন পটলকর্তা—"হঠাৎ এত দামী শাড়ি কিনে দেবার মানে—"

মানে কি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না। বলিবার প্রবৃত্তিও হইল না।

পটলকর্তা বলিলেন—"ভালোই হয়েছে। আমার এক ভাইপোর বিয়ে হবে। এই শাড়িখানাই আমার বৌমাকে দিয়ে মুখ দেখব আমি। রেখে দাও, পাট ভেঙো না—"

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। বলিলাম—"আপনি নিজে শাড়ি কিনে আপনার বৌমার মুখ দেখুন, এ শাড়ি মামীর জন্যে কিনেছি, মামীই পরবেন। এ শাড়ি এখন আমার কাছে থাকবে, মামীকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে এই শাড়ি দিয়ে প্রণাম করব তাঁকে—"

পটলকর্তা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। তাঁহার গলা দিয়া সেই গুনগুনে শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুক্তকচ্ছ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন তিনি।

"কি! এত বড় আস্পর্ধা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। পেচ্ছাপ করে দিই তোর শাড়িতে। তুই নিজে থাকিস তো একজনের গোয়ালঘরে, মামীকে সেইখানে নিয়ে যাবি? চাল নেই, চুলো নেই, মামার অন্নে মানুষ—এত লম্বা লম্বা কথা তোর মুখে। দূর হয়ে যা এখান থেকে—"

একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। পটলগিন্নী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ছুটিয়া আসিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন—"রাঙা কাপড়-পরা ডবকা ছুঁড়ী দেখে মাথা ঘুরে গেছে মুখপোড়ার। নিজে একটা বিয়ে কর না। বিয়ে করে যত খুশি শাড়ি দে না তাকে। বিয়ের সম্বন্ধ তো এসেছিল, পালিয়ে গেলি কেন! এসব তো ভালো লক্ষণ নয়।"

পটলকর্তা আবার বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন—"দূর হ' এখান থেকে—"

আমি দিদিমার কাছে গিয়া শাড়িটা তাহাকে দিয়া বলিলাম, "এই শাড়ি আমি মামীকে কিনে দিয়েছি। পটলকর্তা তার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে। তোমার কাছে এটা রইল। আর কাল তুমি যা বলেছিলে তাতে আমি রাজী আছি। আজই তাদের খবর পাঠাও।"

আমি আসিবামাত্র দিদিমা একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"আমার কিছু সেকেলে গয়না আছে। কিছু সোনার, কিছু রুপোর। তোকেই সব দেব। ওগুলো বিক্রি করলে হাজারখানেক টাকা হবে। শুনেছি এখানে মাড়োয়ারীদের একটা বাড়ী বিক্রি আছে। ভালো দোতলা বাড়ী। গয়না বিক্রি করে ওই বাড়ীটা তুই কিনে নে। তারপর বিয়ে করে ওইখানেই সংসার পাত তুই। আমি তোর বৌয়ের কাছেই থাকব ও বাড়ীতে। এখানে আমার একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করছে না—বাড়ীটা কিনে ফেল তুই। আজই দেখে আয় বাড়ীটা। মম্মথকে বললেই সে নিয়ে যাবে" দিদিমাকে তখন বলিয়াছিলাম, "এখানে বাড়ী কিনে কি করব। আমি তো প্র্যাকটিস করছি অন্য জায়গায়। তাছাড়া তোমার গয়না মাথায় করে রাখব।" দিদিমা বলিলেন—"তাহলে তোকে গয়না দেব না, বিক্রি করে টাকাটাই দেব। আমি মরবার আগে দেখে যেতে চাই, তোর নিজের একটা বাড়ী হয়েছে। শহরের বাড়ী একটা সম্পত্তি, তুই যদি সেখানে না-ও থাকতে পারিস, ভাড়া পাবি। তোর একটা আয় হবে।" তখন দিদিমার একথার কোনও প্রত্যুত্তর দিই নাই। দিদিমা অত্যন্ত জেদী লোক ছিলেন। যাহা ঠিক করিতেন তাহাই করিতেন। মামার বিবাহের পরই তিনি নাকি মামাকে বলিয়াছিলেন—'আমাকে তুই শংকরায় আমার স্বামীর ভিটেতে রেখে আয়। এখানে আমি থাকব না।' মামা নাকি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন। নূতন মামীও। তিনি নাকি বলিরাছিলেন, 'মা, আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেন কেন। আমার কি দোষ। আপনি যদি শংকরায় যান আমিও শংকরায় যাব। আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানে থাকব। আপনি আমাকে কথা দিন আমাকে ফেলে কোথাও চলে যাবেন না।' মামী নাকি তাঁহার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিলেন, দিদিমার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া তবে উঠিয়াছিলেন তিনি। এসবই অবশ্য নকুলের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছিলাম। ইহার কতটা সত্য, কতটা অতিরঞ্জিত তাহা জানি না।

দিদিমার গহনা বিক্রয় করিয়া বাড়ী কিনিতে যদিও আমি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলাম কিন্তু পটলকর্তার নিকট অপমানিত হইয়া আমি মত পরিবর্ত্তন

করিলাম। পৃথিবীতে আমার যে মাথা গুঁজিবার মতো নিজের একটা বাড়ী নাই পটলকর্তার মন হইতে এ কথাটা মুছিয়া দিতে হইবে। তাঁহার ওই ব্যঙ্গোক্তি সত্য বলিয়াই আমার মনে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ঠিক করিলাম তিনি থাকিতে থাকিতেই বাড়ীটা কিনিয়া ফেলিতে হইবে। সেই দিনই গিয়া বাড়ীটা দেখিয়া আসিলাম। বড় রাস্তার মোড়ের উপর বেশ ভালো বাড়ীটি। আমার বেশ পছন্দ হইল। হরেরামবাবু বলিয়া একজন ভদ্রলোক সে বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন। তাঁহার একটি ছোটখাটো দোকান ছিল। জগন্নাথবাবুর থিয়েটার পার্টির লোক ছিলেন। নারী ভূমিকায় অভিনয় করিয়া জগন্নাথবাবুর মনোহরণ করিয়াছিলেন তিনি। রিজিয়ার ভূমিকায় এমন অভিনয় করিয়াছিলেন যে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার পরিবার বড় ছিল না। একটি মাত্র ছেলে কমলাকান্ত। বেশীদূর লেখাপড়া শেখে নাই। গোলোক পণ্ডিতের মারের চোটে অনেকদিন আগেই পাঠশালা ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল। ভালো দাবা খেলিতে পারিত। জগন্নাথবাবু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে রেলের একটা ছোটখাটো কাজে ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন। সে-ও থিয়েটারে ছোটখাটো পার্ট করিত। কখনও দূতের, কখনও দৌবারিকের। একবার লব সাজিয়াছিল। আমার সঙ্গে উহাদের পরিচয় ছিল। হরেরামবাবুর স্ত্রী, কমলাকান্তের মা পরিচিত মহলে মা-ডালিম নামে খ্যাত ছিলেন। বয়স ত্রিশের কোঠায়। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত ষোড়শী। টকটক করিতেছে গায়ের রং। মাথার চুল এবং চোখের তারা মিশ কালো। আমি বাড়ীটা কিনিব এ কথায় হরেরামবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বৈঠকখানায় ডাকাইয়া বসাইয়া বলিলেন—"বাড়ীটা ভালো।...আমার পয়সা থাকলে আমিই কিনতুম। কিন্তু আমার ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। আপনি কিনছেন এ তো খুব আনন্দের কথা।" হঠাৎ পাশের দুয়ার ঠেলিয়া ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা-ডালিম প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আমাকে কি বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে হবে ?"

"না না, উঠে যাবেন কেন। আমি তো এখানে থাকব না। আপনারা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। যা ভাড়া দিচ্ছিলেন তাই দেবেন।"

"আমরা মাসে কুড়ি টাকা ভাড়া দিতাম।"

"তাই দেবেন। আমার দিদিমাকে পাঠিয়ে দেবেন টাকাটা। তাঁর টাকাতেই বাড়ী কিনছি, তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন টাকাটা।

মা-ডালিম একটু মৃদু হাসিয়া চোখ নীচু করিয়া বলিলেন, "একটা অনুরোধ করব।"

"কি বলুন—"

"কুড়ি টাকা ভাড়া আমরা টানতে পাচ্ছি না। যদি কিছু কমিয়ে দেন—"

"কত হ'লে আপনাদের সুবিধে হয়।"

"পনেরো টাকা।"

"বেশ তাই হবে। তবে গৃহপ্রবেশের দিন আমি কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করব। পুজোটুজো হবে। আপনারাও থাকবেন। আপনাদের অসুবিধে হয়তো হবে একটু। তবে মাত্র এক দিন—"

"আমাদের কি আবার অসুবিধে হবে। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।"

মুচকি হাসিয়া মা-ডালিম ভিতরে চলিয়া গেলেন। পরে শুনিয়াছি যখনই কোনও

কঠিন কার্যোদ্ধারের প্রয়োজন হয় হরেরামবাবু মা-ডালিমকেই সামনে আগাইয়া দেন। কমলাকান্তের চাকরিটিও নাকি মা-ডালিমের অনুরোধে জগন্নাথবাবু করিয়া দিয়াছিলেন।

বাড়ী-কেনা নির্ঝঞ্ঝাটে হয় নাই। পটলকর্তা বাধা দিয়াছিলেন। আইনের প্রশ্ন তুলিয়া তিনি দাবি করিয়াছিলেন দিদিমার গহনা নাকি মামারই প্রাপ্য। পটলকর্তা অবশ্য আইনবিশারদ ছিলেন না। পরদিনই একজন মোক্তার তাঁহার কাছে ব্যাপারটা স্বচ্ছ করিয়া বলিয়া দিলেন—স্ত্রীধনে কাহারও অধিকার নাই। দিদিমা তাঁহার গহনা লইয়া যাহা খুশি করিতে পারেন। পটলকর্তা তবু নিরস্ত হন নাই। মামাকে দিদিমার কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মামা দিদিমাকে গিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার নুনের ব্যবসায়ে বড় লোকসান হইয়াছে। হরিদাস মাড়োয়ারির নিকট বাড়ী বাঁধা দিয়া তাঁহাকে প্রচুর ঋণ করিতে হইয়াছে। সে আর ধার দিবে না। কেহই দিবে না। সকলেই বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে চায়। দিদিমা যদি তাঁহার গহনাগুলো দেন তাহা হইলে তিনি টালটা সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন। দিদিমা উত্তর দিয়াছিলেন, কেন বৌমার গয়নাগুলো তো আছে। সেগুলো যদিও ওর ছেলেমেয়েদেরই প্রাপ্য, তবু আপাতত এইগুলো বন্ধক দিয়েই কাজ চালাও। আমার গয়না আমি সুষিকে দিয়ে দিয়েছি। তা দিয়ে ও বাড়ী কিনবে। সব ঠিক হয়ে গেছে। এখন ও কথার আর নড়চড় হবে না। মামা বলিতে পারিলেন না যে প্রথম মামীর সব গহনা বিক্রয় করিয়া দিয়া তিনি দ্বিতীয় মামীর বাপের বাড়ীতে কিছু জমি এবং একটা বাগান তাঁহার নামে কিনিয়া দিয়াছেন। তারাপদ পুরোহিত এ বিষয়েও মধ্যস্থতা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শিবু নাকি সেখানে একটি বাড়ীও করাইবার আয়োজন করিতেছে। একটি ইঁটের ভাটা নাকি পোড়ানো হইতেছে। এসব খবর অবশ্য নকুলই আমাকে বলিয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম সে মিথ্যা বলে নাই। পটলকর্তার চক্রান্ত সফল হইল না। আমি বাড়ীটি কিনিয়া ফেলিলাম। বাড়ী কিনিবার দুই দিন পরে একটা শুভদিন দেখিয়া গৃহপ্রবেশও হইল। মা-ডালিমই সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। আমাকে কিছুই করিতে হয় নাই। পূজার আয়োজন, খাওয়ার আয়োজন তো করিয়াছিলেনই বাড়ীটিকে নানারকম ফুল-লতা-পাতা রঙীন কাগজ দিয়া সাজাইয়াও ছিলেন। চারিদিকে বেশ একটা উৎসবের আবহাওয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন মা-ডালিমের কর্মতৎপরতা এবং শিল্পবোধ আমাকে চমৎকৃত করিয়াছিল। তাঁহারই নির্দেশে আমি বাবার খড়মজোড়া এবং হরিণের শিং তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিলাম। তিনি সেগুলি বৈঠকখানায় একটি বেদীর মতো করিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিলেন। আমি মামাকে গিয়া বলিয়াছিলাম—আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে আমার বাড়ী পবিত্র হবে না। আপনিই আমার বাবার মতো। সবাইকে নিয়ে আপনি যাবেন। মামা গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, "দিদি আর জামাইবাবুর কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে। দিদি আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন। সারাজীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করেই গেলেন। সুখের মুখ আর দেখতে পেলেন না।" পটলকর্তা আর পটলগিন্নীকেও আমি নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা দুইজনেই গুম্ হইয়া রহিলেন। একটি কথা পর্যন্ত বলিলেন না। শুধু যে তাঁহারা আমার ওখানে গেলেন না তাই নয় সেইদিনই তাঁহারা সাহেবগঞ্জও ত্যাগ করিলেন। গৃহপ্রবেশ-উৎসবে মন্মথর বাড়ীর

সকলে আসিয়াছিল। দিদিমাকে সেখানে পালকি করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। মা-ডালিম দিদিমার জন্য চমৎকার একটি বিছানাও পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। গালিচা-পাতা সেই বিছানায় বসিয়া দিদিমাও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা-ডালিম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এমন সুখের দিনে তুমি কাঁদছ কেন ঠাকুমা!" দিদিমা সেদিন যে উত্তরটা দিয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত। বলিয়াছিলেন, "আমি কাঁদছি না। আমার চোখ দিয়ে ওর মা কাঁদছে। আমার ভিতর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। তাই কাঁদছে। এ কান্নার অর্থ তোমরা বুঝবে না।" তাহার পর মা-ডালিম যখন পূজার ফুল তাঁহার হাতে দিলেন তখন তাহা মাথায় ঠেকাইয়া আমাকে ডাকিয়া তিনি আমার মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন—"জয়ী হও, সুখী হও।" থিয়েটারের জগন্নাথবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া পরিবেশন করিতে শুরু করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এবেলা শুধু একটা মিষ্টি খাব। ওবেলা খাব পেট ভরে। আমাদের ক্লাবে একটা ফিস্টের আয়োজন করেছি। তোমাকেই তার খরচ দিতে হবে। লুচি পাঁঠা আর রাবড়ি। কোন বাজে জিনিস করিনি। লুচি ভাজবে রামধন হালুয়াই, মাংস রাঁধবে গোপীচরণ। রাবড়ি ভাগলপুর থেকে আনাচ্ছি। সর্বসাকুল্যে তোমার খরচ পড়বে পনেরো টাকা। রাজী তো?" বলিলাম, "আপনার আদেশ কি অমান্য করিতে পারি?" জগন্নাথবাবু বলিলেন, "আর একটা পরামর্শ তোমার সঙ্গে করতে চাই। তোমার ওখানে আমাদের থিয়েটার পার্টির একটা ব্রাঞ্চ খুললে কেমন হয়! ওখানে গিয়েও আমরা মাঝে মাঝে থিয়েটার করব।" বলিলাম, "একদিন গিয়ে থিয়েটার করে আসতে পারেন। সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারব। কিন্তু ওখানে আপাততঃ ব্রাঞ্চ খুলবেন কি করে? আমি তো একজনের গোয়ালঘরে থাকি।" জগন্নাথবাবু দমিবার পাত্র নন। বলিলেন, "তবু আমরা যাব একদিন। দেখে আসব হালচাল। ওখানে বাঙালী আর কে আছেন?"

"সতীশবাবু আছেন। বলরামবাবু পোস্টমাস্টার আছেন। শ্যামবাবু স্টেশন মাস্টার আছেন—"

"শ্যাম সেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তো ভাবনাই নাই। তাঁরই ওখানে উঠব আমরা। তোমার সঙ্গে ভাব হয়েছে তাঁর?"

"আলাপ হয়েছে। তবে ভাব হয়নি। সময় পাই না—"

"সর্বাগ্রে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব কোরো। দেবতুল্য লোক—"

মনিহারীতে ফিরিবার পূর্বে হরেরামবাবুকে বলিয়া গেলাম তিনি যেন বাড়ীভাড়া দিদিমাকেই পাঠাইয়া দেন। আমি প্রতিমাসেই আসিব এবং তাঁহাকে রসিদ দিয়া যাইব। মনিহারীতে ফিরিয়া শুনিলাম আমার অবর্তমানে অনেক রোগী ফিরিয়া গিয়াছে। তাহাদের বাড়ী হইতে প্রতিদিনই লোক আসিয়া খোঁজ করিয়া যাইতেছে আমি কবে ফিরিব। ভিন্ন গ্রাম হইতে ডুলিবাহিত হইয়া দুইটি শক্ত রোগী আমার অপেক্ষা করিতেছে। শুনিলাম জমিদার ত্রিপুরা সিংও কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া কাছারিতে আসিয়াছেন এবং গরম জল ছাড়া আর কিছুই খাইতেছেন না। বলিতেছেন, ডাক্তার আগে আসুক, সে যদি ওষুধ খেতে বলে তারই ওষুধ খাব। স্বয়ং রায় মহাশয় আসিয়া

আমাকে খবরটি দিলেন। বলিলেন, "আমাকে মহালে বেরুতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি মালিককে সারিয়ে তুলুন। ও'কে অসুস্থ রেখে কোথাও যেতে পারব না।" কাছারিতে গিয়া দেখিলাম সিংয়ের সামান্য একটু জ্বরভাব হইয়াছে। মাথাটা ধরিয়া আছে। তিন দাগ মিকশ্চার করিয়া দিয়া বলিয়া আসিলাম—আজ আপনি দুধ সাবু খান। কাল নাগাদ সব ঠিক হয়ে যাবে। কাছারিতে গিয়া দেখিলাম অনেকগুলি বড় বড় ঝুড়ি বসানো রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ঝুড়ি নানারকম খেলনায় ভরতি। জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব কি? ত্রিপুরা সিং হাসিয়া উত্তর দিলেন—রায় মশাইকে জিগ্যেস করুন। আমরা টেলার সাহেবের একটা মহাল কিনেছি। কিন্তু ব্যাটা সেটা আমাদের দখল দিচ্ছে না। রায় মশায়ের মতে লাঠালাঠি করবার আগে প্রজাদের মনোরঞ্জন করা দরকার। তিনি তাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য ওই খেলনা কিনে এনেছেন। বিতরণ করবেন ওগুলো। আর প্রচার করে দেবেন তাদের একবছরের খাজনা মাপ করে দেওয়া হয়েছে। জমিদারি এখন টেলার সাহেবের নয়, আমাদের। টেলার সাহেবের লোক যদি খাজনা চাইতে আসে তারা যেন না দেয়। জোরজবরদস্তি করলে আমাদের খবর দিলেই আমরা সিপাহী পাঠিয়ে ওদের রক্ষা করব। টেলার সাহেবের একটা পাকা কাছারি আছে সেখানে। সায়েব কেতার কাছারি। ফায়ারপ্লেস আছে। চেয়ার টেবিলে বসে খানা খান সাহেব যখন যান ওখানে। ফজলু মিঞা ওখানকার দেওয়ান। নবাব একটি। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন রায় মশায়। সঙ্গে থাকবে পঞ্চাশজন বরকন্দাজ আর পালকি। উনি কারো বাড়ীতে উঠবেন না। পালকিতে শোবেন। গাছতলায় স্বপাক রেঁধে খাবেন। আমি বলছি কোর্টের মারফত আইনত আমরা দখলদারি নেব গভর্নমেণ্ট পুলিসের সাহায্যে। কিন্তু রায় মশায় তাতে রাজী নন। রায় মশায় কাছেই একটি মোড়ায় বসিয়া মালিকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। বলিলেন—টেলার সাহেব আর ফজলু মিঞা আইনকে টাকা দিয়ে কিনে ট্যাঁকে পুরে ফেলেছেন। আজকাল যে ম্যাজিস্ট্রেট—ওই লালমুখো বাঁদরটা—মদ খাবার জন্যে আর টেলার সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নাচবার জন্যে প্রায়ই টেলার সাহেবের বাংলোয় যায়। এ খবর গর্ভুর মুখে পেয়েছি। গর্ভু ওখানে কাজ করে কিন্তু সে আমাদের লোক। সে নাকি শুনেছে যে টেলার সাহেব ফজলু মিঞাকে বলেছেন এ ম্যাজিস্ট্রেট যতদিন আছেন ততদিন কাউকে এ মহালে নাক গলাতে দেব না। দেখি কতদূর কি করতে পারি।

আমি আমার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রোগী দেখিতে লাগিলাম। একটু পরে সতীশবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, মালিক বলছেন আপনি ওই বাড়ীটাতে চলে যান। আমাকে বললেন তুমি ডাক্তারবাবুর ও বাড়ীতে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। আর এই মৈথীল ঠাকুরটাকে পাঠিয়েছেন আপনার রান্না বাড়া করবার জন্যে। আপনি নিজে রান্না করে খাচ্ছেন এ শুনে মালিক আমাদের উপরই রাগ করছেন। একটি দিব্যকান্তি মৈথীল ঠাকুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সতীশবাবু তাহাকে বলিলেন—"তুমি এখন যাও, ওবেলা এস।" সে চলিয়া গেলে সতীশবাবু চুপি চুপি আমাকে বলিলেন—'আপনি গিয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করুন। দেখা করে বলে আসুন যে আমি যতক্ষণ নিজের টাকা দিয়ে ও বাড়ীটা কিনতে না পারছি ততদিন ওখানে যাব না। বলুন সাহেবগঞ্জে একটা বাড়ী কিনেছি। এখন হাতে আর টাকা নেই।

আর ওই মৈথীল বামুনটাকে আপনি রাখবেন না। ওরা সাধারণতঃ 'স্পাই' হয়। আপনার গতিবিধি সব লক্ষ্য করবে আর যথাস্থানে সেগুলি রিপোর্ট করবে। আমিই তিন চারটে ওইরকম স্পাই বহাল করে রেখেছি। পরে আমি ঠাকুর দেখে দেব আপনাকে। এখন আপনি মালিককে গিয়ে বলুন আপনার একটা ব্রত আছে সেটা উদ্‌যাপন না করা পর্যন্ত আপনাকে স্বপাক খেতে হবে।" শুনিয়া আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, "আমি তো মিথ্যে কথা বলতে পারব না। রাঁধুনী বামুনও আমি রাখব না। রাখবার ক্ষমতা নেই।"

সতীশবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া রাগতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দেখুন যুধিষ্ঠির টুধিষ্ঠির মহাভারতের গল্পেই মানায়। বেশ, যা খুশি করুন। কিন্তু একটি কথা বলে দিচ্ছি—ওই ত্রিপুরারি সিং সোজা লোক নন। তিনি সিংহও বটেন আবার গভীর জলের মাছও বটেন, ওঁর জমিদারিতে যদি থাকতে চান তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলতে হবে। কারণ লুকোনো গর্ত অনেক আছে। ওঁর পারিষদদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা আপনাকে সুনজরে দেখছে না। মালিক যে আপনার উপর এতটা ঝুঁকেছেন এতে গাত্রদাহ হয়েছে অনেকের। অনেকেরই রাতে ঘুম হচ্ছে না। সুতরাং হুঁশিয়ার থাকতে হবে।"

সেই দিনই ত্রিপুরারি সিংহের সহিত বৈকালে গিয়া দেখা করিলাম। তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, শুনিলাম তিনি আধ সের মহিষের দুধের সহিত আধ সের সাবুদানা সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার সহিত কিছু কিসমিস মোনক্কা দিয়া আমার নির্দেশ অনুসারেই চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আপনার হুকুম মতো দুধ সাবু দুইই খেয়েছি। কিছু মেওয়াও ওতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আর একটু কর্পূর। হজম হয়ে গেছে। রাত্রে কি খাব বলুন তো—।"

"আপনার জ্বর যখন ছেড়ে গেছে তখন রাত্রে সাধারণতঃ যা খান তাই খাবেন। কিন্তু একটু কম করে। কি খান রাত্রে?"

"লুচি—"

"বেশ লুচিই খান। কিন্তু খান ছয়েকের বেশী নয়। লুচির সঙ্গে কম মসলা দিয়ে আলুর তরকারি হোক। বেগুন ভাজাও খেতে পারেন দু'একটা—"

"অত কম খেলে রাত্রে ঘুম হবে কি। আমি বিশ পঁচিশখানা লুচি খাই—"

"না, অত আজ খাবেন না। ঘুম যদি না হয় আমি ওষুধ পাঠিয়ে দেব। ঘুম হবে—"

"বড় তেতো আপনার ওষুধ। আর খাব না।"

"আপনাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।"

"বলুন—"

"সকলের সামনে বলব না।"

ত্রিপুরা সিং তৎক্ষণাৎ তাঁহার পারিষদদের উঠিয়া যাইতে বলিলেন। আমি অকপটে তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ঠিক আছে। শুনে খুশী হলাম খুব। কিন্তু আপনার জন্যে দুশো টাকার কল আমি ঠিক করে রেখেছি। চাঁচলের রাজার বাড়ীতে কয়েকটি রোগী আছে। তাঁর ইচ্ছে এবং আমারও ইচ্ছে আপনি ওখানে গিয়ে দিন কয়েক থেকে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসুন। তিনি আপনাকে

দু'শো টাকা দেবেন আমি বলে দিয়েছি। আর আপনি যখন স্বপাক খাওয়াই পছন্দ করেন তখন তাই খান। তবে চলে যান ওই বাড়ীতে। টাকা চাঁচলের রাজা দেবেন। বৌমাকে আনছেন কবে?"

"এখনও বিয়ে করিনি—"

"করে ফেলুন!"

চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম—"ও বাড়ীতে যেদিন উঠে যাব সেদিন আপনি সে বাড়ীতে আগে যাবেন। পুজোর ব্যবস্থা করবেন। তারপর আমি যাব।"

ত্রিপুরারি সিং ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ডাক্তার, তুমি শুধু সজ্জন নও, বুদ্ধিমান লোকও বটে। বেশ তাই হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন সব ব্যবস্থা হবে।"

সতীশবাবু সব শুনিয়া গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনি যা করলেন আখেরে তাতে ভালো হবে কি না বুঝতে পারছি না। আমার মতে বড়লোকদের সঙ্গে লপটে থাকা বিপজ্জনক। মাখামাখি করলেই সম্ভ্রম নষ্ট হয়, এই আমার বিশ্বাস। আর সম্ভ্রমই তো আপনাদের মূলধন। ওটা গেলে তো সব গেল—"

"উনি নিজে প্রস্তাবটা করলেন আমি কি করে আপত্তি করি বলুন। ভালোবাসার দান কি প্রত্যাখ্যান করা উচিত—"

"বড়লোকের ভালোবাসা মুসলমানের মুরগী পোষার সামিল। এটা সর্বদা মনে রাখবেন। চাঁচল থেকে যদি ডাকতে আসে যাবেন। না ডাকতে এলে যাবেন না। আমি যতদূর জানি তাঁদের বাড়ীতে মালদা থেকে ডাক্তার আসে। আমাদের মালিক হয়তো জোর করে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তো। আপনার ওই দু'শ টাকা ফী নিজেই দিয়ে দেবেন। অর্থাৎ আপনাকে ওই বাড়ীটা নিয়ে নিতে বলবেন। ওঁর নানারকম ছলনা আছে। তবে একটা কথা বলব গুণী লোকের উনি সমজদার। আর সেই গুণী লোককে নিজের তাঁবে রাখবার জন্যেও উনি বদ্ধপরিকর। আপনাকে ওঁর ভালো লেগেছে তাই আপনাকে উনি রাখবেনই এখানে। যেমন করে হোক রাখবেন। তাই আপনাকে সাবধান করছি যেন শিলু হালদার বা রঞ্জিত নাপিত হয়ে যাবেন না। থাকলে ইজ্জতের উপর থাকবেন, তাই এত কথা বলছি আপনাকে। আপনি বড় বংশের ছেলে, দুনিয়ায় যেখানে যাবেন ডঙ্কা মেরে প্র্যাকটিস করবেন। কারো তোয়াক্কা করবার দরকার কি আপনার—"

"শিলু হালদার কে?"

ওই যে উটমুখো কালো সুঁটকো গলার-সাঁকি-বার-করা এক ছোকরা ওঁর কাছে ঘুরঘুর করে দেখেন নি? ফিনফিনে ফিতেপাড় কাপড় পরে? সহিসের মতো চুল ছাঁটা?"

"দেখেছি—"

"না দেখেন নি। ওর আসল রূপ দেখেন নি। দেখাচ্ছি—"

সতীশবাবু হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। হাতে একখানি ছবি।

"এই দেখুন—"

দেখিলাম চমৎকার একটি ছোট্ট শ্রীকৃষ্ণের ছবি। মনে হইল যেন জীবন্ত, এখনি কথা কহিবে।

"এই ছবি ওর আঁকা। নগদ এক টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে কিনেছি আমি। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বলে ওর কাছে খুব বড় ছবি ছিল একটা। অপূর্ব ছবি সেটা। একশ টাকা দাম চাইলে! খুব বড় অবশ্য। এখানে শ্যাম সেনের আগে হলধর বোস বলে এক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। আমরা তাঁকে হলুবাবু বলতাম। ওই শিলু হলুবাবুর ভাগ্নে। মামার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। ছবি এঁকে বিক্রি করত। দিনরাত ছবিই আঁকত। আমার দুর্বুদ্ধি হলো তাকে একদিন মালিকের কাছে নিয়ে গেলাম। বললাম, এ ছোকরা ছবি এঁকে বিক্রি করে। হুজুর যদি কিছু ছবি কেনেন তাহলে আপনাকে এনে দেখাবে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখে তাক লেগে গেল মালিকের। তৎক্ষণাৎ একশ টাকা দিয়ে কিনে ফেললেন ছবিখানা। আর বললেন, তুমি এখানেই থাক। তোমার সব ছবিই আমি কিনব। কাছারির একটা ঘরে ওর বাসা করে দিলেন। কাছারি থেকে খাওয়ার পরবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হাতখরচ হিসাবে বরাদ্দ হলো মাসে দশ টাকা। খাতায় নাম লেখা হলো শিলাদিত্য হালদার—মালিকের ব্যক্তিগত কেরানী। হাতের লেখাটি চমৎকার। মালিক যখন কাউকে কোনও ব্যক্তিগত চিঠি লিখতেন তখন মুখে সেটা বলে যেতেন, শিলু লিখত। এসব হলো দশ বছর আগের ঘটনা। এখন শিলু আর ছবি আঁকে না, দলিল জাল করে। এটা অবশ্য সঠিক জানি না। আপিং খায়, মালিকের খোশামোদ করে। শুনছি মেঘাপুরে তফিয়া নামে একটা রাঁড়ও রেখেছে। বড়লোকের সংস্পর্শে এসে পচে গেল অমন একটা প্রতিভাবান ছোকরা। তাই বলছি, এখানে আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। শিলু, রঞ্জিত বা চোখন হয়ে যাবেন না।"

"রঞ্জিতই বা কে চোখনই বা কে—"

"রঞ্জিত নাপিত। চমৎকার দাড়ি কামায়। বোঝাই যায় না যে গালের উপর ক্ষুর চলছে। আর এমন গা হাত পা টেপে যে তার তুলনা নেই। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। মালিক ওকে নিস্কর দশ বিঘে জমি দিয়ে ক্রীতদাস করে রেখেছেন। চোখনকেও তাই। চোখন মালিকের মহিষের গাড়ি চালায়। গাড়ি চালাতে চালাতে খাসা গল্প বলতে পারে নানারকম। পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। মালিক সাধারণতঃ পালকিতে, ঘোড়ায় বা হাতীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বর্ষার সময় তাঁর মোষের গাড়ি চড়বার শখ হয়। কিছুদিন আগে শোনপুরের মেলা থেকে প্রকাণ্ড দুটো মোষ নিজে গিয়ে কিনে এনেছেন। তাদের নাম দিয়েছেন 'মহাকাল' আর 'কালভৈরব'। কালো মুষকো একজোড়া সাক্ষাৎ যম যেন। ওই চোখন ছাড়া কেউ আর তাদের সামলাতে পারে না। ঝিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছে, গুরগুর করে মেঘ ডাকছে, ব্যাং ডাকছে ডোবায় ডোবায়, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার চারিদিকে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মালিক চলেছেন মোষের গাড়ি চড়ে. চোখন ভুতের গল্প বলছে। পিছনে পিছনে কিছু দূরে মালকাইন অবশ্য পালকিটা পাঠিয়ে দেন, রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায়, কিন্তু মালিককে মানা করতে পারেন না। অত্যন্ত খামখেয়ালী জেদী লোক তো। তাই বলছি এখানে আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে আর ইজ্জতের সঙ্গে থাকতে হবে—ক্রীতদাস হয়ে যাবেন না।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন? আপনার সঙ্গে কোনও ঠোকাঠুকি লাগে নি তো—"

"আমার বাবা এখানে আগে কাজ করতেন, মালিকের বাবার আমলে। বাবার মৃত্যুর পর মালিক আমাকে দুশো টাকা পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন—এ টাকাটা আমি স্বর্গীয় ললিতবাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পাঠাচ্ছি। ললিতবাবু আমাদের স্টেট থেকে কিছু টাকা পাবেন। আপনি এলে আপনাকে হিসাব করে দিয়ে দেব। আর আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনার বাবার জায়গায় আপনাকেই নিযুক্ত করতে পারি। আমি এলাম। 'নিকাশ' হলো। এদের জমিদারী সেরেস্তায় 'নিকাশ' একটা ভয়ংকর জিনিস। 'নিকাশ' হচ্ছে হিসাব নিকাশের সংক্ষেপ। বাবা স্টেট থেকে কত টাকা নিয়েছেন এবং খাজনা আদায় করে কত টাকা জমা দিয়েছেন, তাঁর হাত দিয়ে জমিদারী স্টেটের জন্য কত খরচ হয়েছে—এই সবের জটিল হিসাব পঁচিশ বছরের। বাবার মাইনে ছিল মাসে পাঁচ টাকা। অনেক উপরি রোজগার করতেন। উপরি মানে অসদুপায়ে রোজগার। আমি এসে বললাম—আমি অত হিসাবপত্র করতে পারব না। বাবার যদি কিছু পাওনা থাকে আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। দেখলাম বাবা এই পঁচিশ বছরে এক পয়সাও মাইনে নেন নি। তিনি যে স্টেট থেকে কিছু নিয়েছেন তারও লিখিত কোন প্রমাণ নেই। অথচ এই চাকরি করেই আমাকে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন, দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, দেশে পাকা বাড়ী করেছেন, পঁচিশ বিঘে ধানের জমি কিনেছেন। কোথায় তিনি টাকা পেলেন ভগবানই জানেন। মালিক আমার সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করলেন। বাবার মাইনে দেড়হাজার টাকা দিয়ে দিলেন আমাকে। আমি তখন বললাম, একটা কথা কিন্তু আপনাকে না বললে অন্যায় হবে। এই চাকরি করেই বাবা আমাকে পড়িয়েছেন, আমার বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন, দেশে বিষয়-আশয় করেছেন—অথচ আপনি বলছেন তিনি স্টেট থেকে একটি পয়সা নেননি। একথা শুনে মালিক কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আমার বাবার নাম ছিল ছত্রপতি সিং। বিরাট ছত্র ছিল তাঁর। তাঁর ছত্রের তলায় অনেকেই আশ্রয় পেয়েছিল। বাবা ললিতবাবুকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই 'খেলাত' (বকশিস) দিতেন তাঁকে। অনেক টাকা দিয়েছেন। তাঁকে এখানেই পঞ্চাশ বিঘে জমি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন এখানকার পঞ্চাশ বিঘের চেয়ে দেশের পঁচিশ বিঘে বেশী কাজে লাগবে তাঁর। সে জমিও বাবা কিনে দিয়েছিলেন তাঁকে। তিনি বিশ্বাসী মিত্র ছিলেন বাবার, কেবলমাত্র স্টেটের নায়েব ছিলেন না। আপনি যদি তাঁর জায়গায় কাজ করেন আমরা খুশী হব। কিন্তু দেওয়ানজীর কাছ থেকে আগে আপনাকে কাজ শিখতে হবে কিছুদিন। আমি উত্তর দিলাম—আমিও খুব খুশী হব যদি বাবার চাকরিটি পাই। কিন্তু চাকরি নেবার আগে আমি কিছু নিবেদন করতে চাই, শুনুন সেটা। আমি মাসিক পঁচিশ টাকার কমে থাকতে পারব না। কারণ গ্রামের স্কুলে ওই বেতনই আমি পাচ্ছি। তাছাড়া রোজ আমার খাওয়ার সিধা আর কিছু দুধ দিতে হবে। আমি স্বপাক খাব। আর আমি দুটি নিয়ম প্রবর্তিত করতে চাই। আমি ছাপা রসিদের প্রবর্তন করব। এক কপি রসিদ সেরেস্তায় থাকবে, আর একটি প্রজাদের কাছে আর তৃতীয়টি আমার কাছে। তিনটি রসিদেই আমার সই এবং প্রজার সই বা টিপ-সই থাকবে। আর আপনি আমার কাছে যখন কিছু টাকা নেবেন তখন আপনাকে লিখিত

আদেশ দিয়ে সেটা নিতে হবে আর টাকাটা পেলে সেই চিঠির উপর 'পাইলাম' লিখে সই করে দিতে হবে। মালিক হাসিমুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু বজ্র আঁটন ফসকা গেরো বলে একটা কথা আছে সেটা মনে রাখবেন। আপনার বিবেককে খুশী রাখবার জন্যে যা ইচ্ছে হয় তাই করবেন। আমি বাধা দেব না। আমি আপনাকে বিশ্বাস করব খালি। আপনি দেওয়ানজীর কাছে কাজ শিখুন। তাঁর কাজও কিছু করে দিতে হবে আপনাকে। তিনি বধির লোক। লেখাপড়া বিশেষ জানেন না। কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। বাবার আমলের লোক। বাবা বলতেন ফ্রান্স দেশে জন্মালে উনি নেপোলিয়ন হতেন। আমাদের স্টেটের সব চিঠিপত্রের জবাব উনি দেন। জবাবটা মুখে বলে দেন অন্য লোকে সেটা লিখে দেয়। আপনার বাবা এতদিন এ কাজ করতেন। এখন আপনি করুন। আপনাকে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনেই বাহাল করলাম। এ টাকাটা আপনি মাসে মাসে নিয়ে নিতে পারেন। বছরে এক টাকা করে আপনার মাইনে বাড়বে। পঞ্চাশ টাকার পর আর বাড়বে না। তখন বছরে আপনার মাইনে ছাড়া হয় নগদ টাকায় না হয় জমি দিয়ে আপনাকে কিছু 'উপরি' আমরা দেব। তার পরিমাণটা নির্ভর করবে জমিদারের লাভ লোকসানের উপর। এই ছককাটা বাঁধাধরা নিয়মে আমি আজ দশ বছর চাকরি করছি। এখনও পর্যন্ত তো কোনও ঠোকাঠুকি লাগে নি। মালিক অবশ্য দু'একবার আমাকে 'ঝুল' ব্যাপারে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। একবার গঙ্গার ধারে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় খাজনা আদায় নিয়ে দাঙ্গা হয়ে যায়, বিপক্ষদের সিপাহী খুন হ'য়ে যায় একজন। নিখিলবাবু তখন এসেছেন, তিনিই মেলার চার্জে ছিলেন, তাঁকে আসামী করে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। আমার একটা চেনাশোনা লোক মেলায় মিষ্টির দোকান করেছিল, তার দোকান লুঠ হয়ে যায়। মালিক বললেন, আপনি ওর হয়ে একটা মকোদ্দমা করুন যে বিপক্ষদল গুণ্ডা লাগিয়ে ওর দোকান লুঠপাট করেছে আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন সেটা। আমি রাজী হলাম না। বললাম, হুজুর, আমি ওসব ব্যাপারে নাক গলাতে অনিচ্ছুক। তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। মালিক এদিকে লোক খুব ভালো। কাউকে যদি তাঁর ভালো লেগে যায় তাহলে তাঁর মতেই মত দিয়ে চলতে চান তিনি। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্তর্পণে টোপ ফেলে চেষ্টা করেন যদি তাকে ক্রীতদাস করে ফেলতে পারেন। ওই শিলাদিত্য হালদারকে লোকে আজকাল কি বলে ডাকে জানেন? শিলুয়া! আপনাকে আমি বার বার সাবধান করছি 'শিলুয়া' হয়ে যাবেন না। এখানেই থাকুন, কিন্তু 'ডাঁটসে' থাকুন।"

কয়েকদিন পরে চাঁচল হইতেই একজন লোক আমাকে লইতে আসিলেন। সসম্মানে আমাকে লইয়া গেলেন তিনি। ট্রেনেই গেলাম। আমাকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিয়া দিলেন। সেই প্রথম ফার্স্ট ক্লাসে চড়িলাম। তখন খুব বড়লোকরা ছাড়া কেহ ফার্স্ট ক্লাসে চড়িত না। সাহেবরাই বেশী চড়িত। মনিহারী স্টেশনে অনেক দিন ফার্স্ট ক্লাস টিকিটই বিক্রয় হয় নাই। আমার টিকিট-কাটা উপলক্ষে বেশ একটু চাঞ্চল্যই সৃষ্টি হইল। সেই দিনই স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবুর সহিতও আলাপ হইল আমার। শ্যাম সেন ছিলেন মোটাসোটা ঈষৎ খর্বাকৃতি লোক। রেলের কালো কোট-প্যান্ট পরিয়া যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেন মনে হইত একটি কালো রংয়ের চওড়া বেঁটে তক্তা যেন ঘোরাফেরা করিতেছে।

আমাকে বলিলেন, "আপনার অনেক কথা শুনেছি লোকমুখে। কিন্তু সাহস করে যেতে পারিনি কোনও দিন। যদি অভয় দেন এবার যাব। সন্ধের পর কাটিহারের ট্রেনটা 'পাস' করে'ই আমার ছুটি। তারপর যাব। সন্ধ্যের পর কি করেন আপনি?" বলিলাম, "কিছুই করি না। রুগীটুগী দেখে এসে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ি। শোওয়ার আগে পড়ি একটু।" "গান বাজনার শখ আছে?" শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, "শখ আছে। আমার বাবা খুব বড় একজন গায়ক ছিলেন। আমি সাহেবগঞ্জের থিয়েটার পার্টি'র মেম্বার একজন। কিন্তু এখানে তো কোনও সুযোগ নেই। আমি নিজে অবশ্য গান গাইতে জানি না। কিন্তু শুনতে ভালোবাসি।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামবাবু হাসিমুখে নীরবে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—"অ্যাই দেখুন, মিল হয়ে গেছে। আমার হার্মোনিয়ম আছে, বাঁয়া তবলা আছে, বেয়ালা আছে, গ্রামোফোন আছে, রেকর্ড'ও আছে প্রচুর। কিন্তু আমি গান গাইতে পারি না, শুনতে ভালোবাসি। এখানে ফটিক বলে এক টালি ক্লার্ক ছোকরা আছে, চমৎকার গান গায়। তার এক মামা আছে কেশ মশাই তিনি চমৎকার বেয়ালা বাজান। তাদের নিয়েই সন্ধেটা কাটাই। আপনি ফিরে আসুন। তারপর সদলবলে আপনার ওখানে যাব। হার্মোনিয়ম, বাঁয়া তবলা, বেহালা, গ্রামোফোন, রেকর্ড সব আপনার ওখানে চালান করে দেব। গিন্নী ওসব হইচই পছন্দ করেন না। পিঠে, পুলি, বড়ি, আমসত্ত্ব, ছেঁচকি, সুকতো—এই সব নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন। আপনার শুনেছি এখনও বিয়ে হয়নি, সুতরাং আপনার ওখানেই আড্ডাটা ভালো জমবে। কি বলেন?"

"বেশ—"

চাঁচলে আমাকে প্রায় দশ দিন থাকিতে হইয়াছিল। রাজবাড়ীর তিনটি পুরাতন রোগী (তাহার মধ্যে একটি রোগিণী) এবং গ্রামের নানাবয়সের বহু লোকের চিকিৎসা করিলাম। রাজবাড়ীর রোগীদের রোগ বিশেষ ছিল না। অমিত আহারই তাঁহাদের বাত ও বহুমূত্রের হেতু। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর তাঁহারা প্রচুর আহার করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে ঢেঁকুর তোলা এবং পেট চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করিতেন না। আমি তাঁহাদের খাওয়া কমাইয়া দিয়া, কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলাম। যিনি অন্তঃপুরিকা তাঁহাকে বলিলাম ছাতে রোজ ঘড়ি ধরিয়া এক ঘণ্টা পায়চারি করিতে হইবে। পুরুষ দুইজনকে আমি সঙ্গে করিয়া বাহির হইতাম এবং সমস্ত গ্রামটা চষিয়া বেড়াইতাম। সকলেরই রাত্রে খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। বাবু দুইজন ইহাতে প্রথমে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম, তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিন, এ ছাড়া অন্য চিকিৎসা আমি কিছু করিব না, তখন তাঁহারা রাজী হইলেন। দশ দিনে একটু উপকারও হইল। কয়েকটি গরীব লোকের পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া জ্বর, সর্দিকাসি প্রভৃতির চিকিৎসা করিয়া কিন্তু বেশী আনন্দ পাইয়াছিলাম। গরীব লোকেদের চিকিৎসা করিয়া বরাবরই আনন্দ পাইয়াছি। বড়লোকদের পয়সা আছে, তাঁহারা মনে করেন বড় ডাক্তার দেখাইলেই বুঝি তাঁহাদের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি সারিয়া যাইবে, ফ্যাশনের খাতিরেও অনেক সময় তাঁহারা খ্যাতিমান ডাক্তারদের দ্বারস্থ হইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন, তাই বড়লোক

রোগীদের চিকিৎসা করিয়া সুখ নাই। তাঁহাদের ভগবানের উপরে নিয়তির উপরে বা ভালো লোকের উপরে বিশ্বাস কম, তাঁহারা মনে করেন টাকার জোরে বুঝি সব হইয়া যাইবে। চাঁচলের বাবুরা কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁহারা, কেন জানি না, আমার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রহিলেন। আমি তাঁহাদের বলিলাম - আমি যাহা বলিতেছি তাহা করলে আপনারা ভালো থাকিবেন। এ সব রোগ সারাইবার ঔষধ আমাদের অ্যালোপ্যাথিক নাই, নানারকম পেটেন্ট ঔষধ আছে তাহাতে আপনারা নিরাময় হইবেন না, আপনাদের পয়সা খরচ হইবে কেবল। তাই তাহা খাইবার পরামর্শ দিলাম না।

যেদিন আমি চাঁচল হইতে চলিয়া আসি সেদিন অনেক গরীব লোক আমাকে স্টেশনে বিদায় দিবার জন্য আসিয়াছিল। বাবুদের গোমস্তা আমার টিকিট কাটিয়া একটি থলি আমার হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহাতে কি আছে? তিনি বলিলেন—আপনার ফী তিনশত টাকা। আমি বলিলাম, এখন আমি ফী লইব না। ওঁরা আগে একটু সুস্থ হোন তখন ও কথা ভাবা যাইবে। যেদিন ফিরিলাম সেইদিনই সন্ধ্যার পর সতীশবাবু আসিয়া বলিলেন—"আপনি এইবার নতুন বাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। দলিলপত্র সব ঠিক হয়ে গেছে, কাল সই করে বাড়ীটার দখলদারি নিতে হবে। কত টাকা রোজগার করে আনলেন?" সতীশবাবুকে সব কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনার কাজকর্মই আলাদা দেখছি। আমি এদিকে ওদের বলে বসে আছি যে আপনিই নগদ টাকা দিয়ে দেবেন কাল ওদের।" আমি বলিলাম, "বেশ দিয়ে দেব, পোস্টাফিস থেকে তুলে। ভেবেছিলাম হাজার দুই টাকা জমিয়ে তবে ওতে হাত দেব, কিন্তু আপনি যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন আর উপায় কি। টাকা তুলতে হবে।" সতীশবাবু তবুও গুম হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখানে পোস্টাফিস থেকে টাকা তোলা অত সহজ নয়। বলরামবাবুকে আগে খবর দিতে হবে। তারপর তিনি হেড অপিসে খবর দেবেন। তারা টাকা পাঠালে তবে আপনি টাকা পাবেন। আমি আমার টাকা থেকেই তাহলে দিয়ে দিই আপাতত। আপনি আজই দরখাস্ত করে দিন। বলরামবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে? নেই? মহা কুঁড়ে লোক। দরখাস্ত করবার পর ক্রমাগত তাগাদা দিতে হবে। এখুনি দরখাস্তটা লিখে দিয়ে দিন আমাকে। বিকেলে গিয়ে তাগাদা করবেন পাঠালে কি না। দুটো বাঘ ওকে ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একটা হলো ওর বউ, আর একটা হলো মুদি জগগু। জগগুর দোকানে অনেক দেনা করেছেন ভদ্রলোক।" আমি চারিশত টাকা তুলিতে চাই এই মর্মে একটি দরখাস্ত লিখিয়া সতীশবাবুকে দিলাম। সতীশবাবু বলিলেন, "চারশ' টাকা তুলেছেন কেন। অত টাকা তো লাগলে না। আড়াইশ' টাকাই যথেষ্ট।" বলিলাম, "চারশ'ই তুলুন, খরচ না হয় আবার জমা দিয়ে দেব।" সতীশবাবু আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আপনাকে আমি বাজে খরচ করতে দেব না। আপনি যে গৃহপ্রবেশের হুজুকে মেতে জলের মতো অর্থব্যয় করবেন, তা হবে না বলছি। গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান যা কিছু আমি করব। গোটা দশেক টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। সে-ও ওই আড়াইশ' টাকার মধ্যে ধরেছি। বাড়াবাড়ি কিছু করবেন না। লোকের চোখ টাটাবে। যতটুকু না করলে নয় আপাতত ততটুকুই করুন। সব কিছু

রয়ে সয়ে করাই ভালো।" আমি কোনও প্রতিবাদ করিলাম না। সতীশবাবু আমার দরখাস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার প্র্যাকটিসের মোটামুটি একটা বর্ণনা আমি দিতেছি। আমার প্র্যাকটিস ভালোই হইয়াছিল। সকালবেলা হইতেই আমার বাড়ীর বারান্দায় এবং সামনের মাঠে অনেক রোগী আসিয়া জমিত। তাহাদের দেখিয়া আমি প্রথম প্রথম নিজেই ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতাম। যখন রোগীর সংখ্যা কম ছিল তখনই ইহা করা সম্ভব ছিল আমার পক্ষে। রোগীর সংখ্যা বাড়িলে আর এক জনের সাহায্য প্রয়োজন হইত। প্রথম প্রথম আমার সহিস পচনাই আমাকে সাহায্য করিত। পরে আমি গ্রামেরই একটি ছোকরাকে শিখাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন কাজ করিবার পর সে আর থাকিতে চাহিল না। মনে করিল ডাক্তারির যাহা কিছু শিক্ষণীয় তাহা তো সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে এইবার কোথাও গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিলে সে বেশী রোজগার করিতে পারিবে। আমি তাহাকে বাধা দিই নাই, বরং সাহায্য করিয়া কোনও দূরে গ্রামে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে অনেক 'কোয়াক্' ডাক্তার আমার সাহায্যে অনেক গ্রামে প্র্যাকটিস শুরু করিয়া পরে বেশ উন্নতি করিয়াছিল। আমার ইহাতে ক্ষতি হয় নাই। লাভই হইয়াছিল বরং। কারণ তাহারা যেখানে হালে 'পানি' পাইত না আমাকে ডাকিত। তাহাদের মাধ্যমেই অনেক দূর দূর গ্রাম হইতে আমার 'ডাক' আসিত। আমার 'ফী' ছিল গ্রামের ভিতর এক টাকা। গ্রামের বাহিরে গেলে ক্রোশ পিছু এক টাকা করিয়া বাড়িত। যাহারা দিতে পারিত না, তাহাদের কিছু লইতাম না। আমাকে ছোটখাটো সার্জিকাল অপারেশন, হাড় ভাঙিয়া গেলে তাহার ব্যবস্থা করা—সবই করতে হইত। অনেক সময় ধাত্রীর কাজও করিয়াছি, সুপ্রসব না হইয়া যদি কাহারও পেটে ছেলে আটকাইয়া যাইত, তখন আমারই ডাক পড়িত ছেলে 'খালাস' করিবার জন্য। এজন্য অনেক দুঃসাধ্য এবং দুঃসাহসিক কাজ করিতে হইয়াছে। না করিয়া উপায়ও ছিল না। প্রসূতির জীবন-সংশয় দেখিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। ভগবানের দয়ায় অনেক প্রসূতি এবং শিশু আমার সাহায্যে বাঁচিয়াও গিয়াছে। ত্রিপুরা সিংহের কন্যা সোমাকে আমিই প্রসব করাইয়াছিলাম। ট্রান্সভার্স প্রেজেনটেশন্ (transverse presentation) ছিল। ইহার পর সোমার মা আর একবার সন্তানসম্ভবা হন। সেবার তিনি কলিকাতায় ছিলেন। প্রসববেদনা ধরিলে ডাক্তার কেদার দাসকে ডাকা হইল। সোমার মা কিন্তু জেদ ধরিয়া বসিলেন—ঠাকুরপোকে খবর দাও। সে না এলে আমি অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখতে দেব না। সোমার মা আমাকে ঠাকুরপো বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরপোর মতো ব্যবহারও করিতেন আমার সংগে। টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল। গিয়া দেখিলাম তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু অন্য কোনও ডাক্তারকে দেখিতে দেন নাই। আমি গিয়া তাঁহাকে বকিলাম। বলিলাম, কেদার দাস জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার। আপনি করেছেন কি ? আবার ডাকুন তাঁকে। কেদার দাস আসিয়াই প্রসব করাইলেন। আমি তাঁহাকে সাহায্য করিলাম। প্রসূতি বাঁচিল কিন্তু শিশুটি বাঁচিল না। দুই দিন পরে মারা গেল। বউদি বলিলেন—"আপনি আমার সোমাকে বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার আমার ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলেন না। আপনি যদি প্রসব করাতেন বাঁচত। প্রকাণ্ড সাঁড়াশি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বার করলে কি ছেলে বাঁচে।

ফরসেপ্‌স্‌ ডেলিভারি হইয়াছিল, এজন্য শিশুটির মাথায় একটু আঘাতও লাগিয়াছিল। ইহার পর হইতে আর কোনও ডাক্তারকে তিনি কখনও কাছে ঘেঁষিতে দেন নাই। সাধারণ অসুখে তিনি কোনও ঔষধই খাইতে চাহিতেন না। বাড়াবাড়ি কিছু হইলে আমারই ডাক পড়িত। তাঁহার শেষ অসুখের চিকিৎসাও আমি করিয়াছিলাম। তিনি অন্য কোন ডাক্তার দেখিতে দেন নাই। যখন বলিলাম—বৌদি, আমার বিদ্যেতে আর কুলুচ্ছে না। অনুমতি দেন তো সিভিল সার্জনকে ডাকি। বউদিদি হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোমার হাতে যদি না সারে আমার এ অসুখ সারবে না। তোমার বিদ্যে যদি ফুরিয়ে থাকে তাহলে আমার পরমায়ুও ফুরিয়েছে। বিদ্যে ছাড়া তোমার আর যা আছে তা অফুরন্ত। তাতেই আমার এ ক'টা দিন কেটে যাবে। বউদির জরায়ুতে ক্যানসার হইয়াছিল। আমার ডাক্তারী জীবনের কথা মনে করিতে গিয়ে কত লোকের কথাই যে মনে পড়িতেছে। আগে মনে হইত আমি হয়তো অনেককে রোগমুক্ত করিয়াছি কিন্তু আজ মনে হইতেছে আমি কিছুই করি নাই, আর কেহ করিয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র ছিলাম। ইহাও মনে হইতেছে অনেক ভুল করিয়াছি, অনেকের মনে কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু তবু সকলে আমাকে ক্ষমা করিয়াছে ইহাই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনা।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়িতেছে। কপূর্রা গোয়ালার তখন জোয়ান বয়স ছিল। শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। সে একদিন আমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। মাথার উপর প্রকাণ্ড ফোড়া একটা। বলিলাম এ ফোড়া চিরিতে হইবে, ওষুধে সারিবে না। তখন হুসেন আলি বলিয়া এক ছোকরা আমার নিকট শিক্ষানবিসি করিতেছিল। তাহাকে বলিলাম, ফোড়ার আশপাশের চুলগুলা কামাইয়া, ভালো করিয়া টিঞ্চার আইয়োডিন লাগাইয়া দাও। ইহার বেশী কোনওরকম অ্যান্টিসেপটিক সাবধানতা লইতাম না। ছুরি কাঁচি প্রভৃতি ফুটাইয়া লইতাম। সব ঠিক করিয়া হুসেন বলিল—সব ঠিক হো গিয়া। আমি অপারেশন করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রোগীর ভিড় ছিল। তাহারা সবাই গোল হইয়া কপূর্রাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যেন কোন ম্যাজিক বা ওই জাতীয় কিছু হইবে। কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। ফোড়ায় ছুরি বসাইবামাত্র কপূর্রা লাফাইয়া উঠিল এবং আমাকে ঠেলিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। আমি আদেশ দিলাম—পকড়কে লে আও। আট দশজন লোক তাহার পিছু পিছু ছুটিল তৎক্ষণাৎ। একটু পরে তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল তাহারা। মাথা দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, তারস্বরে চীৎকার করিতেছে সে। লাফাইয়া ওঠাতে ছুরিটা অন্য কোথাও লাগিয়া গিয়াছে কিনা কে জানে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রিরি করিতেছিল। কাছাকাছি আসিবামাত্র তাহাকে ঠস্‌ করিয়া একটা চড় মারিলাম। চড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তবু আমার রাগ কমিল না। পায়ের জুতা খুলিয়া আচ্ছা করিয়া তাহাকে পিটাইলাম। ভিড়ের ভিতর হইতে তাহার মা-ই আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিল—'খুব পিটো বাবু, বড়া বদমাশ ছে।' তাহার পর তাহাকে কয়েকজনের সাহায্যে উপুড় করিয়া শোয়াইলাম। চারজন হাত ধরিল, চারজন পা, এবং একজন তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া রহিল। আমি তখন ফোড়াটি অপারেশন করিলাম। মাথার চামড়া মোটা হয় পুঁজটাও বেশ নীচে ছিল। অপারেশন করতে একটু সময় লাগিল। যতক্ষণ অপারেশন চলিতেছিল ততক্ষণ কপূর্রা কিন্তু টুঁ

শব্দটি করে নাই। অনেক পুঁজ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে অনেক লোক আমাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সামান্য একটা ফোড়া কাটিয়া আমি দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করিলাম। কপূর্রার মাথায় নিজেই বেশ ভালো করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। তাহাকে একটা গালপাট্টাবাঁধা দস্যুর মতো দেখাইতে লাগিল। এত কাণ্ডের পর যাহা ঘটিল তাহা আরও আশ্চর্যজনক। কপূর্রা আসিয়া হেঁট হইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, হামারা কসুর মাপ কিজিয়ে ডাক্তারবাবু। হামকো আওর ভি দো জুতা মারিয়ে, মগর মাপ কর দিজিয়ে। (আমার অপরাধ মাপ করুন ডাক্তারবাবু। আমাকে আর দু'ঘা জুতো মারুন কিন্তু আমাকে মাপ করিয়া দিন)। সেইদিন হইতে কপূর্রা আমার আপন লোক হইয়া গেল। যতদিন বাঁচিয়া ছিল আপনার লোকই ছিল। এইরূপ নানা ঘটনা মনে পড়িতেছে, সব লিখিতে গেলে মহাভারত হইয়া যাইবে।

আমার বাড়ী কেনার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে সতীশবাবুর হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। তিনি সেইদিনই একটু পরে আসিয়া আমাকে খবর দিলেন—দরখাস্ত আমি বলরামবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছি। আপনি আজ বিকেলে গিয়ে তাগাদা দেবেন। লোকটা গেঁতো, সকাল-বিকাল তাগাদা মারতে হবে। তা না হ'লে দরখাস্ত যাবেই না।"

বৈকালে বলরামবাবুর কাছে গেলাম। দূরে হইতে আগে দেখিয়াছিলাম তাঁহাকে। রোগা বেঁটে লোকটি। একটু কোলকুঁজো। গায়ে আড়ময়লা কামিজ। পায়ে ছেঁড়া চটি। ভীরু-ভীরু চোখ। কাহারও দিকে চোখ তুলিয়া বড় একটা তাকাইতেন না। যখনই দেখিয়াছি, রাস্তার একধার দিয়া ছেঁড়া ছাতাটি ঘাড়ে করিয়া হেঁটমুণ্ডে চলিয়াছেন। কোন অসুখ-বিসুখ উপলক্ষেও আমার কাছে আসেন নাই কখনও। বাড়ীতে ছোটখাটো একটা হোমিওপ্যাথীর বাক্স ছিল তাহাতেই ছোটখাটো অসুখ সারিয়া যাইত—এ খবরটা অবশ্য অনেক পরে জানিয়াছিলাম। আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবার অনেক পরে যখন তাঁহার বড় মেয়ের টাইফয়েড হইল তখন বলরামবাবু আমাকে ডাকিয়া চিকিৎসার ভার দিলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "ছোটখাটো অসুখে আপনাকে আর কষ্ট দিইনি, হোমিওপ্যাথীর ফোঁটা দিয়েই চালিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এই বিষমজ্বরে হোমিওপ্যাথী চালাতে ভরসা হচ্ছে না। আপনিই এর ভার নিন।"

সেদিন আমি যখন পোস্টাফিসে গেলাম তখম দেখিলাম বলরামবাবু আটহাতি একটি আড়ময়লা কাপড় পরিয়া খালি গায়ে টুলের উপর বসিয়া আপিসের কাজকর্ম করিতেছেন। টেবিলের উপর চতুর্দিকে কাগজপত্র ছড়ানো। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন বটে, আসুন, আসুন—কিন্তু বিব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বসুন, এই টুলটাতেই বসুন। শিউষতন ভিতর থেকে চেয়ারটা এনে দাও। শিউষতন পিওন, ভিতরে ঢুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। নারীকণ্ঠে শোনা গেল—চেয়ার এখন দেব কি করে ওর ওপর মসলাপাতি, তরিতরকারি সব রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বলিলাম, না আমি এখন বসব না। আমার দরখাস্তটা পাঠিয়েছেন কি না তাই কেবল জানতে এসেছি। বলরামবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, সতীশবাবু এই একটু আগেই ওটা দিয়ে গেছেন। আজই পাঠিয়ে দেব। বলিয়া

কাগজপত্র হাঁটকাইতে লাগিলেন। মনে হইল দরখাস্তখানি কোথায় রাখিয়াছেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন, দেখিলাম তাঁহার চোখের কোণে বলিচিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বড়ই অসহায় বোধ হইতে লাগিল ভদ্রলোককে। বলিলাম, 'আর একটা দরখাস্ত লিখে দেব ? একটা কাগজ দিন তাহলে।' আর একটা কাগজে দরখাস্ত লিখিতে গিয়া দেখিলাম কলমের নিব খুব খারাপ। খরখর করিতেছে। তবু কোনক্রমে দরখাস্তটা আবার লিখিয়া দিয়া বলিলাম, 'এটা এখনই পোষ্ট করে দিন আমার সামনে।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই দিচ্ছি'—আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন বলরামবাবু। আমার সামনেই দরখাস্তটা পোস্ট করাইয়া আসিলাম। শুনিলাম তাঁহার স্ত্রীই তাঁহার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মাঝে মাঝে আপিসে ঢুকিয়া তাঁহার টেবিলের কাগজপত্রও গুছাইয়া দিয়া যান। তাই অনেক সময় কাগজপত্র গোলমাল হইয়া যায়। স্ত্রীর কথায় প্রতিবাদ করিবার সাহস বলরামবাবুর নাই। সারাজীবন তিনি নাকি স্ত্রীর আদেশে উঠ-বোস করিতেছেন। পরে কিন্তু যখন বলরামবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল তখন কিন্তু আমার ধারণা বদলাইয়া গেল। মনে হইল এরূপ নিঃস্বার্থপর মহৎ লোক খুব বেশী দেখি নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি হৃদয়ংগম করিয়াছিলেন যে তাঁহার মতো স্বল্পবিত্ত লোকের পক্ষে বিবাহ করা অনুচিত হইয়াছে। তাঁহার বেতন মাত্র কুড়ি টাকা, অন্য কোন প্রকার আয়ের সম্ভাবনাও নাই, লেখাপড়াও বেশী জানেন না যে চাকুরিতে উন্নতি হইবে—এ অবস্থায় কি তাঁহার উচিত ছিল গোলাপরানীর মতো মেয়েকে বিবাহ করা ? সত্য বটে গোলাপরানীর বাবা ভঙ্গ কুলীন এবং তিনি নৈকষ্য, সত্য বটে গোলাপরানীর সামনের দাঁতগুলি বড় এবং মুখটা প্রকাণ্ড, কিন্তু ইহাও তো সত্য যে তাহার বাপের বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল, ইহাও তো সত্য সে বাপ মায়ের আদরিণী কন্যা ছিল, ইহাও তো সত্য যে তিনি—বলরাম চট্টোপাধ্যায়—নৈকষ্য কুলীনবংশোদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও রূপে গুণে অর্থে সামর্থ্যে সব দিক দিয়াই তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ উহাকে বিবাহ বিবাহ করিতে গেলেন কেন ? তাঁহার বাবা মা মামা—অর্থাৎ জোর করিয়া বিবাহ দিবার মতো অভিভাবক কেহই ছিল না। তাঁহার বন্ধু ফটিক ছাড়া কেহ তাঁহাকে জোরও করে নাই। গোলাপরানীর বাবা অবশ্যই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত, মেয়ের বয়স এগারো পার হইয়া গিয়াছিল, তিনি তো করিবেনই—কিন্তু বলরামবাবু কোন্ সাহসে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিলেন ? কি সম্বল ছিল তাঁহার ? এইসব চিন্তা করিবার পর বলরামবাবু বুঝিয়াছিলেন গোলাপরানীকে বিবাহ করিয়া তিনি ঘোর অন্যায় এবং একটি মহাপাপ করিয়াছেন। তাই ঠিক করিয়াছিলেন মুখটি বুজিয়া সারাজীবন ধরিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইবেন। বস্তুতঃ তাহাই তিনি করিতেছিলেন। মাহিনা পাইলেই সমস্ত টাকা গোলাপরানীর হাতেই আনিয়া দিতেন এবং তিনি যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন তাহাই হইত। বলরামবাবু একটুও আপত্তি করিতেন না। সংসার-পরিচালনায় গোলাপরানীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি আসিয়াই পোস্টাফিসের চারিপাশে নানারকম তরিতরকারি লাগাইয়া দিয়াছিলেন। পোস্টাফিসের আশেপাশে বেশ খানিকটা জায়গা ছিল। শাকসব্জি, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, ছাঁচি-কুমড়ো, শসা প্রভৃতি তো লাগাইয়াছিলেন কয়েকটা। পেঁপেগাছও ছিল। গোলাপরানী নিজে খুব কুঁড়ে ছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহাকে যে চারটি সন্তান

দিয়াছিলেন তাহারা বেশ করিতকর্মা এবং পরিশ্রমী ছিল। বড় ছেলেটির বয়স প্রায় বারো বৎসর, তাহার পরেরটি মেয়ে দশ বছরের, তাহার পরও দুইটি পুত্রসন্তান। ছোট ছেলেটির বয়স বছর ছয়েকের বেশী নয়। তাহারাই সংসারের সব কাজ চালাইত। রান্নাবান্না, ঘর ঝাড়ু দেওয়া. কাপড় কাচা, এমন কি বাগানের সমস্ত কাজও উহারাই করিত। পাশেই একটা পুকুর ছিল সেই পুকুর হইতে বালতি করিয়া জল টানিয়া বাগানে জল দিত তাহারা। প্রচুর তরিতরকারি ফলিত। গোলাপরানী হাটে সেগুলি বিক্রয় করিতেন। তরকারিওয়ালীরা নিজেরাই বাড়ীতে আসিয়া লইয়া যাইত। মাহিনা পাইলেই গোলাপরানী মাসের চাল ডাল কিনিয়া ফেলিতেন। দুই টাকার মধ্যেই তাহা হইয়া যাইত সেকালে। মাসের প্রথম দিকটায় সকালে তিনি রান্নাই করিতেন না। গোবিন হালুয়াইয়ের দোকান হইতে লুচি জিলাপি কিনিয়া আনিয়া খাইতেন। গোবিন কিছু তরকারিও দিয়া দিত। গোলাপরানীর মত ছিল হাতে যতক্ষণ পয়সা থাকিবে ততক্ষণ দুই বেলা রান্না করিতে যাইব কেন। এক বেলা লুচি জিলাপি খাইব। জিলাপিটা তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। রাত্রে খিচুড়ি খাইতেন, খিচুড়ির ভিতর কিছু তরকারি ফেলিয়া দিতেন। খিচুড়িটা ছেলে মেয়েরাই রাঁধিত। রান্না হইয়া গেলেই সকলকেই খিচুড়ি খাইয়া লইতে হইত, এমন কি বলরামবাবুকেও। বলরামবাবু নিড়বিড়ে লোক ছিলেন। রাত্রি দশটার আগে আপিসের কাজ শেষ করিতে পারিতেন না। আপিসের কাজের মধ্যেই গোলাপরানীর তাড়ায় উঠিয়া গিয়া খিচুড়িটি খাইয়া আসিতেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গোলাপরানী ছেলে মেয়েদের লইয়া পড়াইতে বসিতেন। তিনি বাল্যকালে নাকি কোন পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিছুদিন। সেই বিদ্যার জোরেই তিনি ছেলে মেয়েদের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্ট বুক, পাটীগণিত প্রভৃতি শিখাইতেন। পড়া না পারিলে ছেলেদের বেদম মারিতেনও। প্রায়ই তাহাদের কোলাহল-ক্রন্দনে সন্ধ্যার অন্ধকার বিঘ্নিত হইত। এই পরিস্থিতিতে পাশের ঘরে বলরামবাবু নীরবে বসিয়া আপিসের কাজে ক্রমাগত ভুল করিতেন, আবার সেগুলি সংশোধন করিতেন, আবার ভুল হইলে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। কিন্তু টুঁ শব্দটি করিতেন না। বেশী বিরক্ত হইলে ডান হাঁটুটি ঘনঘন নাচাইতেন। আর মাঝে মাঝে বিকৃত মুখে টেবিলের কাগজগুলির উপর চাহিয়া থাকিতেন। আর বেশী কিছু করিবার সাহস ছিল না তাঁহার। তিনি যতদূর সম্ভব গোলাপরানীকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের পর তিনি রাত্রে আলাদা ঘরে শয়ন করিতেন। আপিসের কাজ হইয়া গেলে আপিসের টেবিল হইতে খাতাপত্র নামাইয়া সেই টেবিলের উপরই শুইয়া পড়িতেন তিনি। আপিসের চেয়ার বেঞ্চি শেলফ্ সমস্তই গোলাপরানী দখল করিয়াছিলেন। সেগুলিতে তিনি তরিতরকারি মসলা প্রভৃতি রাখিতেন। একটি ছোট টুল আর টেবিল ছাড়া বলরামবাবুর আপিসে আর কিছু আসবাব ছিল না। ইহাতেও বলরামবাবু কোনও আপত্তি করেন নাই। তিনি সব মানিয়া লইয়াছিলেন। তবু কিন্তু তাঁহার রেহাই ছিল না। গোলাপরানীর পরিষ্কার বাতিক ছিল। মাঝে মাঝে তিনি ঝাঁটা হস্তে পোস্টাফিসের ভিতর হানা দিতেন, দেওয়ালের কোণের ঝুল ঝাড়িয়া, স্তূপীকৃত কাগজের ধুলা পরিষ্কার করিয়া, বলরামবাবুর আপিসের কাগজ-পত্রও গুছাইয়া দিতেন। কাজের সময় বলরামবাবু দরকারী কাগজগুলি আর খুঁজিয়া পাইতেন না। তাছাড়া আর একটা বিপদও ঘটিত। যেদিন এই সব ধুলা-ঝাড়াঝাড়ি

হইত সেই দিনই বলরামবাবুর পুরাতন হাঁপানিটা মাথা চাড়া দিত। তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিতেন না। গোলাপরানীর আর একটা বাতিকও ছিল। তিনি পুরাতন কাপড়, পুরাতন বিছানার চাদর প্রভৃতি দিয়া ছেলে মেয়েদের জামা, এমন কি বলরামবাবুর ফতুয়া পর্যন্ত প্রস্তুত করিতেন। করিতেন বলিলে ভুল হইবে, করাইতেন। গোলাপরানীর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল একটা, যেখানে যাহার কাছে স্বার্থসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত সেইখানেই গিয়া তিনি আত্মীয়তা জমাইবার চেষ্টা করিতেন। পোস্টাফিসের পাশেই গহর নামে একটা দরজীর দোকান ছিল। সে বিনামজুরিতে গোলাপরানীর পুরাতন শাড়ি ও চাদর হইতে জামা ফ্রক প্রভৃতি সেলাই করিয়া দিত। গোলাপরানী তাহাকে 'বাপজান' বলিতেন এবং মাঝে মাঝে কিছু খাবারটাবারও পাঠাইয়া দিতেন। একদিন দেখিয়াছিলাম বলরামবাবু একটি ডুরে ফতুয়া পরিয়া কাজ করিতেছেন। বলরামবাবুর একখানা দশহাতি পোশাকী কাপড় ছিল, যখন ক্বচিৎ কখনও বাহিরে যাইতেন, তখন গোলাপরানী সেটা বাহির করিয়া দিতেন। বাড়ীতে তাঁহাকে ছোট একটি আটহাতি বা নহাতি কাপড় পরিয়া থাকিতে হইত। বলরামবাবুর সহিত পরে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাই এত কথা জানিয়াছি। আমি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া বউকে লইয়া মনিহারীতে বসবাস শুরু করি তখন গোলাপরানী আমার স্ত্রীর সহিত গোলাপ পাতাইয়াছিলেন। সেই সুবাদে প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিতেন। মাসের প্রথম দিকে আমাদের জন্যও গোবিনের দোকান হইতে গরম কচুরি ও জিলাপি পাঠাইয়া দিতেন। ঘনিষ্ঠতা হইবার পর আবিষ্কার করিয়াছিলাম গোলাপরানীর মধ্যে শিল্প-প্রবণতা আছে। নানারকম বড়ি দিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের প্রস্তুত বড়ি খাইয়া বহুবার তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুরাতন শাড়ির পাড় হইতে রঙীন সুতা বাহির করিয়া এবং তদ্দ্বারা শাদা কাপড়ের উপর ফুল লতা পাতা চাঁদ সূর্য ময়ূর প্রভৃতি আঁকিয়া তিনি একবার আমার জন্য সুদৃশ্য একটি বালিশের ওয়াড় করিয়া দিয়াছিলেন। আমি যখন দূরের 'কলে' গরুর গাড়ি করিয়া যাইতাম তখন গাড়িতে বিছানা বালিশ থাকিত। নানারূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কালো অয়েলক্লথ দিয়া বালিশের ওয়াড় করিয়া দিয়াছিলাম। গোলাপরানী তাহার উপর ওই রঙীন ওয়াড়টি পরাইয়া দিয়াছিলেন। অনেক টুকরো টুকরো ছবি মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে তাঁহার উঁচু দাঁত সত্ত্বেও তাঁহার হাসির মধ্যে একটা অকৃত্রিম মাধুর্য ছিল। অর্থাৎ অত বড় বড় দাঁত থাকা সত্ত্বেও তিনি দেঁতো হাসি হাসিতে পারিতেন না। যখন হাসিতেন তখন খুব জোরে হো হো করিয়া হাসিতেন, তাঁহার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে অকৃত্রিম আনন্দ যেন উথলাইয়া পড়িত। যখন রাগিতেন তখনও তাঁহার দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকিত না। বেশী রাগিয়া গেলে বলরামবাবুর চুলের ঝুঁটি খামচাইয়া ধরিয়া ঝাঁকানিও দিতেন। বলরামবাবু সেদিন আপিস বন্ধ করিয়া আমার কাছে চলিয়া আসিতেন। 'এ সময়ে চলে এলেন যে। আজ ছুটি নাকি'—জিজ্ঞাসা করিলে বলরামবাবু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিতেন—'উনি একটু টেম্‌পার লুজ করেছেন। ঝড়টা বয়ে যাক, তারপর আমি যাব।' বলরামবাবু প্রায়ই আমার নিকট টাকা ধার করিতেন। বেশী নয়—দু'পাঁচ টাকা। আমি জানিতাম ও টাকা তিনি আর ফেরত দিবেন না। কত দিয়াছিলাম তাহার হিসাবও রাখি নাই, তাগাদাও দিই নাই। কিছুদিন পরে তিনি রিটায়ার করিয়া

দেশে চলিয়া গেলেন। তাহারও কিছুদিন পরে আমার নামে বাহাত্তর টাকার একটি মনি অর্ডার আসিল। কুপনে লেখা ছিল—টাকাটা ফেরত দিতে বিলম্ব হইল। ক্ষমা করিবেন। আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করা যাইবে না। শ্যামবাবুর ঋণও না। আপনারা আমার নমস্কার জানিবেন। শ্যামবাবুকেও জানাইবেন। তাঁহারা দেওয়া মাছের স্বাদ এখনও মুখে লাগিয়া আছে। জীবনের বাকি দিনগুলি আপনাদের স্মৃতি লইয়াই এই অজ পাড়াগাঁয়ে কাটাইয়া দিব।

মাসখানেকের মধ্যে বাড়ী কেনা হইয়া গেল। সতীশবাবুই গৃহপ্রবেশের একটা শুভ দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম—"দিদিমা, মামা মামীকে লইয়া আসিতে চাই।" সতীশবাবু রাজী হইলেন না। বলিলেন—"আগে একটু থিতু হয়ে বসুন, তখন ওদের আনবেন। এখন আপনার খাট বিছানা চেয়ার মোড়া কিছু নেই—ও'দের এনে শুতে বসতে দেবেন কোথা! গুরুজনদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি! আগে একটু থিতু হোন। জাহাজের মিস্ত্রী কাল্লুকে বলে দিয়েছি আপনার জন্যে একটা পালঙ্ক, তিনটে চৌকি, একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার করতে। বলেছি একশ' টাকায় সব করে দিতে হবে, মায় কাঠ, পালিস সব সমেত। জিনিস ডেলিভারি দিলে আমি তাকে টাকা দেব —আপনি কিছু দেবেন না যেন। ফার্স্ট ক্লাস মিস্ত্রী। জাহাজের সব ফার্নিচার ওই করে। আগে কলকাতায় সাহেববাড়ীতে কাজ করত। কিন্তু মহা ফাঁকিবাজ আর গল্পে। আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন তো ওর স্বরূপ জানতুম না, মজুরিতে বাহাল করেছিলাম আমার ওই খাটটা করাবার জন্যে। দেখলাম ওরে বাবা, এ তো আমাকে ফতুর করে দেবে। বারো দিনের মজুরি তিন টাকা দেওয়ার পরও দেখলাম খাটের কিছু হয় নি। নিজে তো কাজ করেই না, উপরন্তু আপনারও কাজ ভুলিয়ে দেবে গল্প করে করে। ওর সঙ্গে 'ঠিকে' ব্যবস্থা করাই ভালো। তবু মাঝে মাঝে আপনার কাছে 'খরচি' চাইবে। চাইলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন আমি কিছু জানি না সতীশবাবুর কাছে যাও—।"

গৃহপ্রবেশের দিন সতীশবাবু প্রচুর মুড়ি মুড়কি ও বাতাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুবেজি— স্থানীয় বৃদ্ধ পুরোহিত—গৃহপ্রবেশের আনুষ্ঠানিক পূজা করিয়া আট আনা দক্ষিণা, একটি লাল গামছা এবং পূজার জন্য ক্রীত ফলমূলাদি পাইয়াছিলেন। ইহাতেই খুব খুশী হইয়াছিলেন তিনি। সতীশবাবুকে আড়ালে বলিলাম— ওঁকে মাত্র আট আনা দক্ষিণা দিয়েছেন? পুরো একটা টাকা দিলেই পারতেন! সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"উনি সাধারণতঃ দু'আনা পান। আমি চারগুণ দিয়েছি। তাছাড়া একটা গামছা, পুজোর অত জিনিসপত্র—কেউ দেয় নাকি অত! বেশী বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। পট্ করে লোকের চোখ টাটিয়ে যাবে।"

সেইদিন আর এক কাণ্ড হইল। ত্রিপুরারি সিং অশ্বারোহণে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—"ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য আপনার মৌখিক একটা নিমন্ত্রণ করে আসা উচিত। না করলে অন্যায় হবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম - "ও'কেও কি মুড়ি মুড়কি বাতাসা দেবেন?" চোখ বড় বড় করিয়া সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"তাতে ক্ষতিটা কি আছে! অখাদ্য তো নয়।" গেলাম ত্রিপুরারি সিংকে নিমন্ত্রণ করিতে। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন—"আপনার গৃহপ্রবেশের খবর পেয়েই তো এসেছি আমি। আপনি তো

কোনও খবর দেননি। রায় মহাশয় খবরটা পাঠিয়েছেন আমাকে। তাঁর চর তো চারিদিকেই ঘুরছে। তিনিও আসতেন, কিন্তু তিনি গ্রামে গ্রামে খেলনা বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন। তাছাড়া সায়েবের সঙ্গে একটা দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন আপনার গৃহপ্রবেশটা ভালো করে হয়। তাই আমি চলে এলুম—"

"সতীশবাবুর উপরই সব ভার। তিনিই যা করবার তাই করছেন।"

"দেখি কি করেছেন তিনি।"

হাঁটিয়াই ত্রিপুরারি সিং আমার বাড়ীতে আসিলেন। তখনও কয়েকজন লোক মুড়ি মুড়কি ও বাতাসা চিবাইতেছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক জুটিয়াছিল। ত্রিপুরারি সিং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। মুখে মৃদু হাসি। একটি কথা বলিলেন না। আমার একটি মাত্র চেয়ার ছিল সেইটিতেই তাঁহাকে বসিতে দিলাম। সসংকোচে বলিলাম, "খাওয়াদাওয়ার বিশেষ কোন আয়োজন করতে পারিনি। সতীশবাবু মুড়ি মুড়কি আর বাতাসা কিনেছেন—"

"তিনটেই তো উৎকৃষ্ট জিনিস। দিন একটু খাই—"

সতীশবাবু কিছু মাটির থালা কিনিয়াছিলেন। তাহারই একটাতে মুড়ি মুড়কি ও বাতাসা আনিয়া দিলাম। ত্রিপুরারি সব খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর এক গ্লাস জল পান করিয়া বলিলেন—"আ—হ্—"

সতীশবাবু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"খুব চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন। এইবার আমাদের তরফ থেকে কিছু করতে হবে। গ্রামের যে কটা হালুয়াই আছে তাদের ডেকে পাঠান। তারা এইখানে এসে ভিয়ান চড়াক। আর সমস্ত গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তারা রাত্রে খাবে এখানে এসে। প্রচুর লুচি, বুটের ডাল, কয়েক রকম তরকারি আর মিষ্টি। আর দই। আর সাঁওতালটোলায় খবর দিন তারা এখানে এসে মাদল বাজিয়ে নাচ গান করুক। আর রঘুঘু পাশমানকে খবর পাঠান, তার লৌণ্ডা নাচের দল এখানে রাত্রে এসে নাচবে। সানাই পাওয়া যাবে ?"

"মুচিদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। জিতুর ঢোল আর খঞ্জনিও আছে।"

"সবাই আসুক। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সরগরম করে ফেলুন জায়গাটা। আর ওই ছেলেগুলোকে লাগিয়ে দিন রঙিন কাগজ কিনে এনে শিকল তৈরী করে বাড়ীটার চারধারে টাঙিয়ে দিক। আমাদের ডাক্তার চুপিচুপি গৃহপ্রবেশ করবেন, তা কি কখনও হয় !"

টিপুবাবু (ত্রিপুরারি সিংহকে লোকে আড়ালে টিপু সুলতান বলিত) এই সব ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে সতীশবাবু বলিলেন—"দেখলেন লোকটার কাণ্ড ! ভাবছিলাম সন্ধের পর নিরিবিলিতে বসে গল্পসল্প করব, ঝড়ের মতো এসে সব তছনছ করে দিলে !"

একটু পরেই একজন সিপাহী আসিয়া সতীশবাবুকে খবর দিল আপনাকে মালিক এখনই ডাকিতেছেন। সতীশবাবু বিরক্তমুখে চলিয়া গেলেন। আমার বাহিরের গ্রামে একটা 'কল' ছিল, আমিও চলিয়া গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া দেখি আমার বাড়ীর সামনে একদল লোক বসিয়া বাজনা বাজাইতেছে। দুইটা ঢোল, একটা কাঁসি এবং একটা সানাই তুমুল কোলাহল তুলিয়া প্রচুর লোকজন জমাইয়া ফেলিয়াছে।

সতীশবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "মালিকের হুকুম অনুসারে প্রতি ঘরে একটা করে চৌকি বিছিয়ে দিয়েছি আর আপনার ঘরে একটা পালঙ্ক। মাঝের ঘরটায় শতরঞ্চি পেতে একটা টেবিল আর খান চারেক চেয়ারও দিতে বলেছেন। আমাদের গুদোমে এসব ছিল। মালিক বললেন এখন ওগুলো ডাক্তারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। ও'র সব ফার্নিচার তৈরী হয়ে এলে ফেরত নিয়ে এস ডাক্তারের যদি তাই অভিপ্রায় হয়। মোট কথা যতদিন খুশি উনি ওগুলো ব্যবহার করতে পারেন।" সতীশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনোভাবটা কি তাহাই সম্ভবতঃ জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার মুখে কি ভাব ফুটিয়াছিল জানি না, কিন্তু সতীশবাবু উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ ঠিক। ও ফার্নিচার একটিও আমরা রাখব না, আমাদের ফার্নিচার হয়ে গেলেই ফেরত দেব। এখন দিয়েছেন থাক, ও'কে চটিয়েও তো লাভ নেই—"

সেইদিনই আমার বাড়ীর সব ঘরে শতরঞ্চি বিছানা প্রভৃতি আসিয়া গেল। বৈঠকখানা ঘরটি চেয়ার টেবিলে সুশোভিত হইল। সেইদিনই সতীশবাবু হাট হইতে হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি কিনিয়া আমার সংসার গুছাইয়া দিলেন এবং সীতাপতি নামে একটি ঠাকুরও বাহাল করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "এখন ভগবানের দয়ায় আপনার নামডাক হয়েছে, রোজগারও হচ্ছে মা লক্ষ্মীর কৃপায়, এখন আর আপনার হাত পুড়িয়ে রান্না করাটা ভালো দেখায় না। ঠাকুর একটা রেখে দিলাম, ছোকরা ভালো লোক, সিপাহীতে বাহাল হয়েছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু দৌড়ঝাঁপের কাজ ভালো পারে না, তাই ওকে বরখাস্ত করেছিলেন মালিক। একে আমি জানি—স্পাই নয়। ও বলছে রান্নার কাজ ও ভালো পারে। দেখুন কেমন পারে। মাইনে এখন মাসে এক টাকা, দু'বেলা খাওয়া, জলখে (জলখাবার)—তাছাড়া পুজো আর ফাগুয়াতে কাপড় গামছা নেবে। বলেছি যদি ভালো করে কাজ কর তাহলে কিছুদিন পরে তোমার মাইনে সওয়া টাকা করে দেব। তাতেই ও রাজী আছে। আপনার জন্যে একটা চাকরও দেখেছি। জাতে নাপতে। মধুয়া নাম। ওর বোনটাকে নিয়ে গ্রামে নানা কেলেঙ্কারি, তাই ওকে কেউ রাখতে চায় না। আমি বলেছি মাসে আট আনা করে পাবি, আর খেতে পাবি, ডাক্তারবাবুর ওখানে বাহাল হয়ে যা। ওর মায়ের নিমোনিয়া আপনি সারিয়েছিলেন। সেজন্য কি কৃতজ্ঞতা আছে ব্যাটার? কিছুমাত্র নেই। দাঁত বার করে বললে—মাসে এক টাকা না পেলে পারব না হুজুর। বারো আনায় রফা করেছি। যদি ভালো কাজ করে এক টাকাই করে দেবেন।"

সীতাপতির চেহারাটি সুন্দর। রাজপুত্রের মতো। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ। বাসন্তীরঙে ছোপানো কাপড় পরা। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। গলার উপবীতটিও হলুদরঙের।

আমাকে বলিল—"কাম বাতা দিজিয়ে—"

"আজ তো ভোজ হবে। সতীশবাবু যা করতে বলেন তাই কর। কাল থেকে আমার রান্না কোরো।"

"জি—"

"তুমি ভাত ডাল তরকারি মোটামুটি তৈরি করতে পারবে তো?"

হঠাৎ সীতাপতি বাংলায় উত্তর দিল—"সোব পারি ডাকটারবাবু, চাঁপ, কাটলিস ভি—"

"বেশ—"

সেদিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া হইচই কাণ্ড চলিল। ত্রিপুরারি সিং স্বয়ং আসিয়া সেই হুল্লোড়ে মাতিয়া গেলেন। শিলু হালদার প্রকাণ্ড একটা গামলায় খুব ভালো করিয়া সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া সকলকে পরিবেশন করিতেছিলেন। ত্রিপুরারি প্রকাণ্ড একটা রূপার গ্লাসের দুই গ্লাস পান করিলেন। ত্রিপুরারিবাবুর পারিষদবর্গের মধ্যেও অনেকেই দেখিলাম এ রসের রসিক। শিলু হালদার আমাকেও অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম ত্রিপুরারিবাবু ভুরুর ইশারা দ্বারা শিলুবাবুকে প্ররোচিত করিতেছেন যাহাতে তিনি আবার আমাকে অনুরোধ করেন। তিনি করিলেন। তখন আমাকে হাতজোড় করিয়া বলিতে হইল —"আমি ওসব কখনও খাইনি। আমাকে মাপ করুন আপনারা। খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ব।" শ্যামবাবু আসিয়াছিলেন—সেই দিনই তিনি প্রথমে আমার বাড়ীতে আসিলেন। মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। তিনি নিমন্ত্রণ পাইয়া সন্ধ্যার পর আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আসিয়াছিল রেলের একচক্ষু-লণ্ঠন-হাতে একটি কুলি। ইহার পর প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার বাড়ীতে আসিতেন। সঙ্গে থাকিত ওই একচক্ষু-লণ্ঠন-হাতে কুলি ফাগুয়া। শিলু হালদার তাঁহাকেও সিদ্ধি খাইবার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। শ্যামবাবু বলিলেন, "দেখুন, আমি মশাই মোটাসোটা মানুষ। সিদ্ধি খেয়ে যদি বে-এক্তার হয়ে পড়ি তাহলে কি যে করব তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় সিদ্ধি খেয়ে একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম। সেই থেকে কান মলেছি ওসব আর স্পর্শ করব না"—শ্যামবাবু আর একবার কান মলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লৌণ্ডা নাচও সেইদিন আমি প্রথম দেখিলাম। কিশোর দুইটি ছেলেকে মেয়ে সাজাইয়া রঘুঘু পাশমান সেদিন আসর জমাইয়া তুলিয়াছিল। আয়োজন বিশেষ কিছু ছিল না, সে নিজে ঢোলক বাজাইতেছিল আর একজন বাজাইতেছিল খঞ্জনি। তিন চার জন লোক আসরে বসিয়া গান গাহিতেছিল, একজনের গলা খুব সরু, আর বাকি তিনজনের বেশ মোটা। তাহাদের গানের সহিত মেয়েলী পোশাক পরা ছেলে দুইটি অঙ্গভঙ্গী করিয়া নাচিতেছিল। বেশ জমিয়াছিল। ত্রিপুরারি সিং রঘুঘু পাশমানকে নগদ দশ টাকা বখশিস দিয়াছিলেন। আমরা সেদিন রাত্রে যখন খাইতে বসিলাম তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ত্রিপুরারি সিংও স-পারিষদ আমাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিলেন। সকলের জন্য যাহা ব্যবস্থা হইয়াছিল আমাদের জন্যও তাহাই হইল। লুচি, কয়েক রকম নিরামিষ তরকারি, দই এবং কয়েক রকম মিষ্টান্ন। তবে আমাদের জন্য লুচি গরম ভাজিয়া দেওয়া হইল। দেখিলাম ত্রিপুরারি সিং বেশ 'খাইয়ে' লোক। প্রায় খান তিরিশেক লুচি ও সের খানেক দই একাই খাইয়া ফেলিলেন। শিলু হালদারও দেখিলাম তাঁহার যোগ্য সহচর। তবে তিনি নীরব কর্মী। ত্রিপুরারি সিং প্রতিটি তরকারি, প্রতিটি মিষ্টান্ন তারিফ করিয়া খাইতেছিলেন, শিলু হালদার একটি কথা বলেন নাই। নিঃশব্দে মুখ চালাইতেছিলেন।

সেইদিনই সাড়ম্বরে আমার গৃহপ্রবেশ হইয়া গেল। সকলে যখন চলিয়া গেল, শেষ রাত্রে একা আমি যখন ত্রিপুরারি সিংহের দেওয়া পালঙ্কে শয়ন করিলাম তখন প্রথমে মনে পড়িল মাকে, তাহার পর বাবাকে। মায়ের কথাই বেশী মনে হইতে

লাগিল। তখনই মনে হইল তাঁহারা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে আমার এই বাড়ীতে আসিয়া সুখী হইতেন কি? যে আবহাওয়ায় যে পরিবেশে তাঁহারা বিচরণ করিতেন তাহা তো এখানে নাই। বাবা নিশ্চয়ই এখানে থাকিতে পারিতেন না। মা কি পারিতেন? দাদার বাড়ীতে দাসীবৃত্তিতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, এ বাড়ীতে সর্বময়ী কর্ত্রী হইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল কি? আর সেই লাল চেলি-পরা নববধূটি? যে শুভদৃষ্টির সময় একবার তাহার ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার পর মহাকালের নিষ্ঠুর বিধানে সে অকালে চিরতরে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত। এই সব ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। সকালে নবনিয়োজিত পাচক সীতাপতির ডাকে ঘুম ভাঙিল। সে জিজ্ঞাসা করিল কি রান্না করিব। বলিলাম, "কালকের তরকারি কিছু আছে কি?" সে বলিল, অনেক আছে। আলু, পটল, কুমড়ায় একটা ঘর নাকি ভরতি। বলিলাম, "ভাত, ডাল আর আলু পটলের ডালনা বানাও, আর কুমড়োর ভাজি। মাছ যদি পাও, মাছেরও ভাজা আর ঝাল কোরো।" ঠাকুর চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

"বাইরের ঘরে অনেক রুগী এসেছে। আপনি আজ উঠতে অনেক দেরি করলেন দেখছি। টোপরা থেকে আর আমাদাবাদ থেকে কলও এসেছে দুটো। সমস্ত রাত মাতামাতি করে মালিকের শরীরটাও একটু বিগড়েছে।

আপনি টোপরা যাওয়ার আগে ওঁকেও একটু দেখে যাবেন। খবর পাঠিয়েছিলেন।"

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলাম অনেক রোগী বসিয়া আছে। আমার পুরাতন ডিসপেনসারি তখনও দেওয়ানজির গোয়ালঘরেই ছিল। তাহাদের লইয়া সেখানেই গেলাম। রোগীদের ঔষধও তখন আমাকেই প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। সুতরাং ফিরিতে দেরি হইল। টোপরা এবং আমদাবাদের রোগীদের বলিলাম আমি খাওয়াদাওয়া সারিয়া যাইব। তখনও ঘোড়া কিনি নাই, সাইকেল চড়িতেও জানিতাম না তাই গরুর গাড়ি করিয়াই যাইতে হইত। টোপরার রোগীর বাড়ী হইতে গরুর গাড়ি আসিয়াছিল। আমদাবাদের রোগী একটি ঘোড়া আনিয়াছিল। আমি ঘোড়ায় যাইব ঠিক করিলাম। টোপরার গাড়িতে আমার ঔষধের বাক্সটি লইয়া আমার নবনিয়োজিত চাকর মধুয়া গেল। মধুয়া খুব বুদ্ধিমান ছিল। প্রথম প্রথম আমার কম্পাউন্ডারি ব্যাপারেও সে সাহায্য করিত। শিশি ধোয়া, দাগ কাটা, লেবেল মারা, পুরিয়া তৈরি করা, ইমালশান তৈরি করা প্রভৃতি কাজে পরে সে বেশ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার একমাত্র দোষ ছিল বড় কামাই করিত। সতীশবাবু যদিও তাহার মাহিনা ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন মাসে বারো আনা, কিন্তু প্রায়ই সে আমার নিকট অগ্রিম কিছু লইত। তাহার পরই কামাই করিতে আরম্ভ করিত। লোক পাঠাইয়াও বাড়ীতে তাহাকে পাওয়া যাইত না। তাহার পর হঠাৎ একদিন ফিরিয়া আসিত আবার। সমস্ত বকুনি নীরবে সহ্য করিয়া আবার কাজে লাগিয়া যাইত। কিছুদিন কাজ করিয়া ঘাড় চুলকাইয়া পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রিম চাহিত আবার। এইভাবেই সে আমরণ আমার কাছে কাজ করিয়া গিয়াছে। আমিই তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম, বীরু পৃথ্বীশ হওয়ার পর যে বছর প্রথম ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিক হয় সেই বছরই মধুয়া সপরিবারে মারা যায়। তাহার অভাব

বহুদিন অনুভব করিয়াছি। আজ জীবন স্মৃতি লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে সেকালে মধুয়া আমার জীবনে কত অপরিহার্য ছিল। আজ তাহার কথা ক্বচিৎ মনে পড়ে। রোগীদের বিদায় করিয়া ত্রিপুরা সিংকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম তেমন বিশেষ কিছু হয় নাই। বলিলাম, "ওষুধ খাবার দরকার নেই। আজকের দিনটা আপনি উপবাস করুন। বিছানায় শুয়ে বিশ্রামও করুন, কোথাও বেরুবেন না।" ত্রিপুরা সিং বলিলেন, "না খেলে তো ঘুম হবে না। চুপচাপ বিছানায় বসে থাকাও তো কঠিন। শিলুর সঙ্গে দাবা খেলি তাহলে। খুব যদি ক্ষিদে পায় মাছের ঝোল ভাত খেতে পারি?" আমি রাজী হইলাম না। বলিলাম "আজ সমস্ত দিন জল ছাড়া আর কিছু খাবেন না। দাবা খেললেও বিশ্রাম হবে না। আপনি একটা ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন চোখ বুজে। ত্রিপুরা সিং মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি ডাক্তার না দারোগা? বেশ তাই হবে। চোখন তাহলে এসে গা হাত পা টিপুক আর গল্প বলুক। এতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।" চলিয়া আসিতেছিলাম এমন সময়ে ত্রিপুরা সিং বলিলেন, "নতুন বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এখন আপনার আর দেওয়ানজির গোয়ালঘরে বসে রোগী দেখা শোভা পাচ্ছে না। আপনার ঘরের লাগোয়া অনেকখানি জমি পড়ে আছে। ওইখানেই দু'খানা বড় বড় ঘর করিয়ে নিন। আমি দেওয়ানজিকে বলে দিয়েছি। বাঁশ খড় কাঠ যা লাগে তা আমরাই দেব। পাশেই পুকুর আছে, তার পাড় থেকেই মাটি খুঁড়িয়ে চওড়া দেওয়াল উঠিয়ে ফেলুন। সতীশবাবুকে বলে দেব আমি, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" শুনিয়া অস্বস্তি-বোধ করিয়াছিলাম। ধনী জমিদারের কোনও সাহায্য লইব না ইহাই মনে মনে ঠিক ছিল, কিন্তু ত্রিপুরা সিংকে বাধা দিব কি করিয়া? সতীশবাবুও চটিবেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। বাড়ীতে গিয়া স্নান করিয়া ফেলিলাম তাড়াতাড়ি। বাড়ীর উঠানেই একটি কুয়া ছিল। মধুয়া ঘড়ায় করিয়া জল তুলিয়া দিল। বলিল, গোটা দুই বড় বালতি সাহেবগঞ্জ হইতে আনাইতে হইবে। দেখিলাম একটি বড় জালা এবং কয়েকটি কলসী সে সকালেই কুমোরবাড়ী হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। স্নান করিয়া খাইতে বসিলাম। সীতাপতি কিছু ন্যাকোট ভাত এবং একগাদা কুমড়োভাজা দিয়া গেল। মনে হইল একটা গোটা কুমড়াই সে ভাজিয়া ফেলিয়াছে। একটা বাটিতে খানিকটা গরম ঘি-ও দিয়া গেল। বলিলাম, ডাল আন। সে বলিল— আনছি। আজ তো ডাল নেই বাবু, ডালনা হয়েছে। একটু পরেই সে ডালনা লইয়া আসিল। দেখিলাম মসুর ডালের ভিতর সে আলু পটল কুচাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। ডালনা বাক্যটির সহিত 'ডাল' যখন যুক্ত আছে তখন তাহা যে আর কিছু হইতে পারে ইহা সীতাপতির মাথায় আসে নাই। তাহাকে বলিলাম, বাঙালী ডালনা এরকম হয় না। তবে খাইতে বেশ ভালোই হইয়াছে। তাহার পর সীতাপতি মাছভাজা এবং মাছের ঝোল লইয়া আসিল। বলিল, টিশন মাস্টার শ্যামবাবু বড় একটি রুইমাছ পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডুগি, তবলা, হার্মোনিয়ম এবং বেহালাও আসিয়াছে। শ্যামবাবু সন্ধ্যার পর আসিবেন। 'গানা বাজানা' হোবে।

আমি টোপরা এবং আমদাবাদ সারিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন প্রায় রাত্রি দশটা। আসিয়া দেখি আসর গুলজার। একজন হার্মোনিয়ম বাজাইতেছেন, আর একজন বেহালা, ডুগি তবলায় সংগত করিতেছেন সতীশবাবু। গলা ছাড়িয়া গান

ধরিয়াছেন আর একজন—"মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি"। শ্যামবাবু একধারে স্মিতমুখে তাঁহার বিরাট অস্তিত্ব লইয়া বসিয়া আছেন। আমি প্রবেশ করিতেই হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন সকলে। গান থামিয়া গেল। সকলেই প্রায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলাম, একি আপনারা সব দাঁড়িয়ে উঠলেন কেন। গান চলুক। আমি কাপড়চোপড় বদলে আসছি। যেমন চলছে চলুক।

সেইদিনই সকলের সহিত পরিচয় হইল। যিনি বেহালা বাজাইতেছিলেন, তিনি কেশ মশাই। শ্যামবাবু বলিলেন, উনি সব রকম যন্ত্র বাজাতে পারেন, এমন কি কর্নেট পর্যন্ত। তাছাড়া নাচতে পারেন, গাইতে পারেন। আগে এক সার্কাসে জোকার ছিলেন, যাত্রার দলেও ছিলেন কিছুদিন। কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখি স্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে বেহালা বাজাচ্ছেন। সামনে একটা কাপড় বিছানো রয়েছে, আর লোক ঘিরে রয়েছে চারদিকে। কাপড়টার উপরে পয়সা পড়েছে অনেক, কিন্তু সেদিকে কেশ মশায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমিও দাঁড়িয়ে শুনলাম কয়েক মিনিট। তারপর একটা আধুলি ফেলে দিয়ে আপিসে এসে বসলুম আর মোতায়েন করে দিলুম পয়েন্টস-ম্যান মথুরাকে যে ওঁর বাজনা শেষ হলে আমার কাছে যেন নিয়ে আসে ওঁকে। নিয়ে এল একটু পরে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন আমি মুসাফির। আমাদের দেশের লোক গুণের সমাদর করে। বেহালা বাজিয়েই আমার দিন চলে যায়। কাল রাত্রের ট্রেনে এখানে নেবেছিলাম গঙ্গা আর কুশীর সঙ্গমে স্নান করব বলে। আজ চলে যাব। আমাকে ডেকেছেন কেন? বললাম, আপনার বেহালা-বাজনায় মুগ্ধ হয়ে। আজই চলে যাবেন কেন? থেকে যান না দু'একদিন। আমরাও একটু-আধটু গানবাজনা চর্চা করি। আমি নিঃসন্তান, আমার বাসায় সন্ধের সময় সবাই জমায়েত হয়ে একটু আনন্দ করি আমরা। আপনি আমার বাড়ীতে থাকুন, যদি আপত্তি না থাকে। কেশ মশাই সেই থেকেই আছেন আমার বাসায়। কেশ মশাই হাসিয়া বলিলেন, আমার পুরো পরিচয়টা উনি দিলেন না। শুধু গানবাজনায় নয়, নেশাভাঙেও আমি ওস্তাদ। তবে পয়সা জোটে না। সন্ধ্যাবেলায় এক গুলি কালাচাঁদ সেবা করি আর সকালে এক ছিলিম বড় তামাক। বলিয়া তিনি মিটিমিটি আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার কিছু দাড়ি গোঁফ ছিল। ঠোঁটের হাসিটা দেখা যাইত না। চোখ দুটি কেবল হাসিতে থাকিত। সে হাসি অপরূপ। গান গাহিতেছিলেন টিকিট কলেক্টার সুরেশ্বরবাবু। হার্মোনিয়ম বাজাইতেছিলেন শ্যামবাবুর দূরে সম্পর্কের শ্বশুর জলধর গুপ্ত। সুরেশ্বরবাবু বেশ হাসিখুশী লোক। পরে জানিয়াছিলাম তাঁহারও কিঞ্চিৎ পানদোষ আছে। জলধর গুপ্ত গম্ভীর লোক। শ্বশুরোচিত গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। হাসির কথা উঠিলেই মাঝে মাঝে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিতেন। তিনি শ্যামবাবুর শুধু পোষ্য ছিলেন না, শ্যামবাবুর সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত ছিল। হাটবাজার সমস্ত তিনিই করিতেন। তিনি নাকি শ্যামবাবুর স্ত্রীর মাসতুতো বোনের কাকা হইতেন। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিতেন না, বিবাহও করেন নাই। তাঁহার নিকটতম আত্মীয়স্বজনরা কেহই তাঁহাকে আমল দেন নাই। শ্যামবাবুর স্ত্রীই তাঁহাকে ডাকিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। ভালো হার্মোনিয়ম বাজাইতে পারিতেন। যৌবনে শখের থিয়েটারের বাতিক ছিল বলিয়াই লেখাপড়া হয় নাই। সেই সময়েই হার্মোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন।

অদ্ভুত হার্মোনিয়ম বাজাইতেন। সীতাপতি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিয়া প্রশ্ন করিল, "ই বেলা ভি একঠো বড়া মছলি এসেছে। আমি ভেজে রেখেছি। কিছু ঝোল করব কি?" শ্যামবাবু অপ্রতিভমুখে বলিলেন, "মহলদার এবেলাও একটা বড় রুই দিয়েছিল। এখানেই পাঠিয়ে দিলুম।" আমি বলিলাম, "আমি একা কত খাব? ঠাকুর এক কাজ কর তাহলে। মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিয়ে এস। সবাই ভাগ করে খাওয়া যাক।" সতীশবাবু উঠিয়া পড়িলেন—"আমার কাছে মুড়ি আছে টাটকা। আজই কিনেছি। নিয়ে আসি সেটা তাহলে।" সেদিন স-তৈল মুড়ি সহযোগে গরম মাছভাজা তাহাই করিল যাহা অনেকদিনের চেষ্টাতেও হয় না। সকলেই আমার অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া গেলেন। হার্মোনিয়ম এবং ডুগি তবলার উপর মুড়ির বাটি রাখিয়া কলাপাতার উপর স্তূপীকৃত মাছভাজা হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া লইয়া সেদিন অনাড়ম্বর যে ভোজটা শুরু হইয়াছিল তাহা সেইদিনই শেষ হয় নাই। ইহার পর রোজই আমার বাড়ীতে সান্ধ্য-আড্ডা জমিত। আমি বাড়ীতে না থাকিলেও আড্ডাধারীরা ঠিক আসিয়া হাজির হইতেন, ঠাকুরকে ফরমাশ করিয়া আহারের ব্যবস্থাও তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইতেন। কোনোদিন মুড়ি, কোনদিন চিঁড়েভাজা, কোনদিন বেগনী, কোনদিন হালুয়া হইত। একদিন সীতাপতি আলুর 'চাঁপ'ও বানাইয়াছিল। চিপি চিপি আলু-পোড়া গোছের। প্রচুর ঝাল এবং পেঁয়াজ দিয়াছিল বলিয়া খাইতে খুব খারাপ হয় নাই। কেশ মশাই অনেকগুলি খাইয়াছিলেন এবং হাসিয়া বলিয়াছিলেন, সীতাপতি তুমি রাবণ বধ করেছ, কিন্তু আমাদের কিছু করতে পারবে না।

॥ ৩৭ ॥

বীরুবাবু কয়েকদিন হইতে প্রত্যহ পোস্টাফিসে যাতায়াত করিতেছিলেন; অবশেষে তাঁহার প্রত্যাশিত চিঠিটি আসিল। লম্বা খামটি হাতে লইয়া তিনি হনহন করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন। বাড়ীর সামনে আসিয়া হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন এবং খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আর একবার পড়িলেন। তাহার পর আবার সেটা খামে পুরিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরে ঢুকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। আজকাল জাগিয়া থাকিলেও সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকেন। উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল। সে মাথার কাপড়টা টানিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

"বাবা ঘুমুচ্ছেন না কি"—মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন বীরুবাবু।

সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"কে, বীরু, কিছু বলবে—"

বীরু সূর্যসুন্দরের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলেন বিছানার উপর।

"হ্যাঁ, আমি বাবা চাকরিটা ছেড়ে দিলাম—"

"ছেড়ে দিলে?"

"হ্যাঁ। আরও তিন বছর কাজ করতে পারতুম। পুরো কাজ করলে আমার পেন্সন কিছু বেশী হতো। এখন রিটায়ার করলে শ তিনেক টাকা করে পাব। তেবে দেখলুম

ওতেই আমার চলে যাবে। তোমার কাছেই থাকি। চাকরি না ছাড়লে এখুনি গিয়ে আমাকে জয়েন করতে হবে। আমার ছুটি পাওনা আছে অনেক, আমি রিটায়ার করবার আগে সেই ছুটিটার জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। এক বছর ছুটির পর রিটায়ার করব এই লিখেছিলাম। আমার সে দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে। তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারব না এখন!"

সূর্যসুন্দর নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন বীরুর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে একটা দুর্দান্ত বালকের ছবি তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে বালকের নাম ছিল জংলিবাবু, যে রোগীদের ঘোড়া চড়িয়া প্রায়ই পলাইত এবং সেজন্য শাস্তি ভোগ করিত…।

"উশনা বিজনেসম্যান (businessman), তার আমরণ ছুটি নেই। সে চলে গেল। সুব্রত সোমনাথও চলে গেছে, ওদের নতুন চাকরি বেশী ছুটি নেওয়া চলবে না। কেষ্ট-রঙ্গনাথ-সদানন্দও যাই-যাই করছে। ওদেরও বেশীদিন আটকে রাখা যাবে না। পৃথ্বীশ আছে বটে, কিন্তু থেকেও নেই। গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। তাই ভাবলুম আমিই তোমার কাছে থাকব। আর চাকরি না-ই করলাম!"

"চাকরি ছেড়ে কি নিয়ে থাকবে?"

"নিজেকে নিয়েই থাকব। আমার বিশ্বাস এখানে পীড়পাহাড়ের চারিদিকে যদি 'এক্স্ক্যাভেশান (excavation) করা যায় তাহলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। আমি ওই নিয়েই লেখালেখি করব গভর্নমেণ্টের সঙ্গে। গভর্নমেণ্ট যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হন তাহলে আমি বিনা-বেতনে ওদের সাহায্য করব।"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"পীরপাহাড়ের চারদিকে খোঁড়াখুঁড়ি করলে এখানকার হিন্দু মুসলমান সবাই অসন্তুষ্ট হবে। তুমি তো জানই তোমার মা পীরবাবাকে কত মানতেন। পীরবাবার উপর খুব বিশ্বাস ছিল তাঁর। সকলেই এখানে পীরবাবাকে জাগ্রত দেবতা মনে করে। ওখানে কিছু করতে যেও না—"

বীরুবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিলেন। মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করিয়া ফেলিলেন বাবা যখন বারণ করিতেছেন তখন ও কাজে হাত দেওয়া চলিবে না। মা সত্যই পীরবাবাকে খুব ভক্তি করিতেন। একটা চিত্র সহসা তাঁহার মনে ফুটিয়া উঠিল। বীরু পাশ করার পর মা পীরবাবাকে শিন্নি দিয়াছিলেন। গোবিন হালুয়াই সওয়া দশ টাকার জিলাপি ভাজিয়া দিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী সকলকে লইয়া পীরপাহাড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল টকটকে-লাল-পাড় গরদ। পিছু পিছু বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তো ছিলই, আর ছিল পাড়ার ছেলেমেয়েরা। রাজলক্ষ্মী মাঠ হইতে রাখালদের এবং চাকরবাকরদেরও ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। বীরুবাবু কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইলেন—রাজলক্ষ্মীর পিছু পিছু একটা বিরাট মিছিল চলিয়াছে। মিছিলের পিছনে গোবিন হালুয়াইয়ের বড়ছেলে রামকিষুণ। তাহার মাথায় জিলাপির ঝুড়ি। বিরাট ঝুড়ি। সেকালে সওয়া দশ টাকায় অনেক জিলাপি পাওয়া যাইত। পীরপাহাড়ের উপর পীরবাবার কবরের কাছে একটি ছোট কুঁড়েঘরে বাস করিত একজন শীর্ণকায় ফকির। তাহার গলায় রুদ্রাক্ষের এবং বহুবর্ণের পাথরের নানারকম মালা থাকিত। রাজলক্ষ্মী বহুপূর্বে তাহাকে একটি বদনা এবং গেরুয়া আলখাল্লাও কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাই রাজলক্ষ্মী 'শিরণি' দিতে আসিলে সে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিত।

খুব ঘটা করিয়া 'উজু' করিত, তাহার পর নামাজ পড়িত। তাহার শীর্ণ মুখে সত্যই একটা পবিত্র ভক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিত। রাজলক্ষ্মী তাহাকে আট আনা পয়সা এবং কিছু জিলাপি দিতেন। তাহার পর সকলের হাতে একটি একটি করিয়া জিলাপি দেওয়া হইত। পীরপাহাড়ে গিয়াই সকলকে রাজলক্ষ্মীর নির্দেশে হাঁটু গাড়িয়া পীরবাবাকে প্রণাম করিতে হইত। এই ছবিটা বীরুবাবুর মনে আসিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিলেন পীরবাবা প্রোজেক্ট (project) তাঁহাকে বর্জন করিতে হইবে। আর একটা 'প্রোজেক্ট'ও তাঁহার মাথায় আছে। কিছু জমি লইয়া মসলার চাষ করা। সাধারণতঃ লোকে ধান গম যব ছোলা মটর প্রভৃতি চাষ করে, বীরুবাবুর ইচ্ছা কালোজিরা, ধনে, হলুদ, লংকা প্রভৃতি মসলা আবাদ করিবেন। অল্প জমিতে বেশী লাভ হয় নাকি তাহাতে। কিন্তু এসব ব্যাপারে কুমারের পরামর্শ লইতে হইবে। অনেক দিন আগে এসব বিষয়ে তিনি কিছু বই কিনিয়া কুমারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কুমার সেগুলি পড়িয়াছে কি? বীরুবাবু আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। হঠাৎ খুব আনন্দ হইল তাঁহার। মনে হইল বাবার ব্রেন (brain) তো বেশ ক্লিয়ার (clear) আছে। বলিলেন, "তাহলে ওসব ব্যাপারে আর যাব না। কুমারের সঙ্গে চাষই করব—"

ইহার উত্তরে সূর্যসুন্দর যাহা বলিলেন তাহাতে বোঝা গেল তাঁহার ব্রেন সত্যই বেশ ক্লিয়ার আছে।

"চাষ করবে? চাষের তো তুমি কিছু জান না। সব জিনিসেরই একটা ট্রেনিং চাই। আমার মতে তুমি এখন চাকরি ছেড়ো না। ছুটি নাও।"

"ছুটি নিতে হলে এখনই গিয়ে জয়েন করতে হবে। তারপর ছুটি পাব। এখন এখান থেকে যাবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি আপিসে খবর নিয়েছিলাম। তাই ঠিক করেছি আর কাজে জয়েন করব না। আমার যতটা পাওনা ছুটি আছে ওরা দিয়ে দিক। আজ চিঠি এসেছে ওরা তাতে রাজী আছে—।"

বীরু আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সূর্যসুন্দর বুঝিলেন বীরু আপিসের সহিত ঝগড়া করিয়াছে। আর কাজে যোগদান করিবে না। হঠাৎ তিনিও খুব আনন্দিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে। হঠাৎ যেন একটা ভরসা পাইলেন। আর কেউ না থাকুক বীরু শেষ পর্যন্ত থাকিবে। একবার মনে হইল না-ও যদি থাকিত, কি হইত তাহা হইলে? মৃত্যুর পর কে মুখাগ্নি করিবে, কে শেষ সময় মুখে গঙ্গাজলে দিবে, কে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইবে এই ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিয়া বীরুর চাকরির ক্ষতি করাটা কি সমীচীন? কিন্তু বীরু তো কাহারও কথা শুনিবে না! হঠাৎ তাঁহার আবার মনে হইল শেষ সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে মুখাগ্নি না পাইলে তাঁহার আত্মা কি তৃপ্ত হইবে? তৃপ্তি অতৃপ্তি ভোগ করিবার মতো কোনও অনুভূতিশীল মন কি মৃত্যুর পর বাঁচিয়া থাকে? এ প্রশ্নের নির্ভুল সুনিশ্চিত উত্তর কেহ জানে না। সূর্যসুন্দর নিজের মনের গহনে তলাইয়া গেলেন। এক সাধুর কথা মনে পড়িল— তিনি বলিয়াছিলেন আত্মার মৃত্যু নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে আত্মা সুখ-দুঃখে বিচলিত হয় না। তবে? কিন্তু এসব দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি এক অপরূপ মাধুর্যের সমুদ্রে ধীরে ধীরে যেন তলাইয়া গেলেন। বীরু শেষ পর্যন্ত থাকিবে—এই পরম আশ্বাসের আনন্দ তাঁহার

চেতনাকে প্লাবিত করিয়া দিল। তিনি অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—'বেঁচে থাকো, সুখী হও'।

ঊর্মিলা একটা গল্পের বই পড়িতেছিল। সে একটু ঝুঁকিয়া প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বাবা কিছু বলছেন?"

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

॥ ৩৮ ॥

যেদিন ঘণ্টুর জন্মতিথি উৎসব হইয়া গেল তাহার পরদিনই সে ফিরিয়া যাইতে চাহিল। বলিল, "আর তিন দিন মাত্র ছুটির মেয়াদ। পথেই সে তিন দিন কেটে যাবে। আমাদের ছুটি দেয় না, বাবা চিঠি না দিলে ছুটি পেতাম না।"

কিরণ জানিত না যে কৃষ্ণকান্ত ছেলের ছুটির জন্য চিঠি দিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া কিরণ বলিল—"তুমি তো ঘুণাক্ষরে একথা বলনি আমাকে—।"

কৃষ্ণকান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি ছুটি না পেত, তাহলে আমি বেকুব বনে যেতাম। মন্ত্রগুপ্তি বুদ্ধিমানরাই করে থাকে—"

"তোমাকে সায়েব যখন অত খাতির করে তখন লেখ না তাকে ছুটি বাড়িয়ে দিক আরও দু'চার দিন।"

"দড়ি বেশী টানলে ছিঁড়ে যায়। চল ঘণ্টু, দেখি তোর হাতের টিপটা কেমন হয়েছে! চল বেরোনো যাক। বেলা বেশী হয়নি, মোটে দশটা—"

"এখানে চাঁদমারি কোথাও আছে নাকি—"

"হাতের টিপ দেখবার জন্যে চাঁদমারির দরকার হয় না। চল বেরিয়ে পড়ি, লক্ষ্যবস্তু একটা না-একটা পাওয়া যাবেই—"

কিরণ বলিল, "কোথায় যাচ্ছ ওকে নিয়ে এখন আবার—"

"কোথাও যাচ্ছি না। এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়াব একটু।"

"চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই—"

"চল আপত্তি নেই।"

তাহারা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূর গিয়া দেখা গেল গঙ্গার ধারে যে বড় শিমুল গাছটা আছে তাহার মগডালে একটা রঙীন ঘুড়ি আটকাইয়া আছে।

"ওই তো চাঁদমারি। উড়িয়ে দাও দিকিন ঘুড়িটাকে—"

কৃষ্ণকান্ত ঘণ্টুর হাতে নিজের রাইফেলটা দিলেন। ঘণ্টু অনেকক্ষণ ধরিয়া 'তাক' করিয়া ফায়ার করিল। ঘুড়িটা শাখাচ্যুত হইয়া গেল বটে, কিন্তু পড়িল না। হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

"বাঃ! জীবন্ত 'কাইট' হলে পড়ে যেত। মারবে নাকি একটা জীবন্ত 'কাইট্'? ওই তো উড়ছে।"

কিরণ যে দৃষ্টি মেলিয়া ঘণ্টুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল তাহা অবর্ণনীয়। একথা শুনিয়া কিরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"শুধু শুধু জীব-হত্যে করে কি হবে!"

"দরকার নেই তাহলে। চিল খাওয়া যায় না, সত্যিই তো! চল তাহলে বাগানের দিকে যাওয়া যাক, যদি খাদ্য কিছু সংগ্রহ করতে পারি—"

"খাদ্যের অভাব আছে নাকি বাড়ীতে। আজ ভালো মাছ পায়নি; কুমার তাই খাসির মাংস আনিয়েছে। কত খাবে—"

"ও বাবা, আজ মাছ নেই নাকি। আমরা 'মচ্ছিখোর' বাঙালী আমাদের মাছ না হলে চলে? চল মাছেরই চেষ্টা করা যাক—"

"তুমি আবার মাছ কি করে পাবে এখন।"

"বাহুবলে। চল কুমারের পুকুরটার দিকে যাওয়া যাক। সেখানে সদানন্দ বসে আছে নিশ্চয় ছিপ নিয়ে।"

"হ্যাঁ। ও তো একগাদা বাটা ট্যাংরা পুটি ধরে নিয়ে যায় রোজ। আর উষা তাই দিয়ে ঝাল ঝোল করে। ও সব কাঁটার কুণ্ডু মাছ আমি খেতে পারি না বাপু। উষা কিন্তু খুব তারিয়ে তারিয়ে খায়। ও একটা বেড়াল!"

কুমারের পুকুরের দিকে তাহারা হাঁটিতে লাগিল। হঠাৎ কিরণ বলিল—"তোর সঙ্গে যদি ভালো ঘি দিয়ে দিই আলাদা খেতে পারবি?"

"আমরা মেসে খাই। সেখানে আলাদা আমি খাব কি করে? তাছাড়া সঙ্গে ঘি নিয়ে যাওয়া কি সোজা বখেড়া?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "জননীর অন্তরে শান্তিদান করবার জন্যে বখেড়া সহ্য করা উচিত। মাকে খুশী করবার জন্যে বিদ্যাসাগর দামোদর সাঁতরেছিলেন। তুমি ঘি-টা নিয়ে যাও, বাক্সে বন্ধ করে রেখো, আর যখন কেউ থাকবে না, তখন একটা চামচে দিয়ে একটু বার করে নিয়ে চিনি দিয়ে চট্‌ করে খেয়ে নিও। কি বল, বুদ্ধিটা ভালো দিই নি?"

ঘণ্টু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিরণ বেরসিক নয়। সেও হাসিয়া ফেলিল। কেবল মন্তব্য করিল—"সব তাতেই ইয়ার্কি!"

হঠাৎ ঘণ্টু দাঁড়াইয়া পড়িল।

"বাবা, দেখ দেখ কি সুন্দর শাদা ঘুঘু এক জোড়া।"

"হ্যাঁ। ওর নাম হচ্ছে ধাবাল। ধবল থেকে হয়েছে বোধহয়। তোমার মা ওর খুব ভালো রোস্ট করত এককালে। দিল্লী থেকে আগরা যাওয়ার রাস্তায় প্রচুর আছে। খাবি রোস্ট?"

"না, না, এখন ওসব থাক। বাড়ীতে এত লোকজন দু'একটা ঘুঘুতে কি হবে।"

পুকুরের কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইল পুকুরপাড়ে সদানন্দ তো আছেই—উষাও আছে। সদানন্দের দৃষ্টি ফাতনায় নিবদ্ধ। উষা বকবক করিতেছে।

"মাসীমা আমরাও এসে গেছি—"

"এ কি! বাঃ জামাইবাবু আর দিদিও—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "সদানন্দ কি রকম অবতার-নিধন করছে দেখতে এলুম—"

"অবতার-নিধন মানে?"—উষা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল।

"ভগবান যে মৎস্য অবতার হয়েছিলেন তা বুঝি জানা নেই ঠাকরুনের! তাই তো খেতে অত ভালো—"

"তার মানে তুমি বলতে চাও আমরা ভগবানকে খাই—"

"শ্রদ্ধাস্পদকে খাওয়াই তো প্রাচীন নিয়ম। ক্রীশ্চানদের ইউক্যারিস্ট (Eucharist) উৎসবে তাঁরা যখন মদ খান তখন সেটাকে যীশু খ্রীষ্টের রক্ত মনে করে খেতে হয়। বড়দা এ বিষয়ে অনেক জ্ঞানদান করতে পারবেন, তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র। এখন থাক ওসব কথা—কি মাছ পেয়েছ দেখি—"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"সব চুনো পুটি। এ পুকুরে বড় বড় রুই কাতলাও আছে, কিন্তু তারা কেমন যেন বুনো গোছের। টোপ গিলতে চায় না। ল্যাজটা দেখিয়ে চলে যায় শুধু। অথচ, বাংলা দেশে আমাদের পুকুরে বড় বড় রুই কাতলা ধরেছি। এরা কেমন যেন বুনো গোছের—"

"তাই নাকি—"

"তাই তো দেখছি। ওই দেখুন, বুড়বুড়ি কাটছে, ওটা খুব বড় মাছ।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন সেদিকে। তারপর রাইফেলটা তুলিয়া হঠাৎ ফায়ার করিয়া দিলেন একটা। অপ্রত্যাশিত শব্দে চমকাইয়া উঠিল সকলে।

"ওটা কি হলো!"

"বুনো জানোয়ারকে যেভাবে ঘায়েল করি বুনো মাছকে সেভাবে ঘায়েল করা যায় কি না দেখলাম—"

হঠাৎ পুকুরের জলে একটা আলোড়ন হইল। প্রকাণ্ড বড় একটা রুই লাফ দিয়া উঠিয়া আবার জলের তলায় তলাইয়া গেল।

"মনে হচ্ছে লক্ষ্য ভেদ করেছি। একটু পরেই ভেসে উঠবেন বাছাধন। কিন্তু জল থেকে মাছটাকে আনবে কে! কেউ সাঁতার জানে?"

কুমার যে ছোঁড়াটাকে সদানন্দের কাছে থাকিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল সে আগাইয়া আসিল।

"হ্যাঁ, জানেইছি।"

"তবে বসে লক্ষ্য কর মাছটা ভাসল কি না—ভাসলে টানতে টানতে নিয়ে আসবি। জল থেকে তুলিস না যেন বেশী ভারী লাগবে।"

ছোঁড়াটা পুকুরপারে ছুঁচলো মুখে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে জানে মাছটা তুলিয়া আনিতে পারিলে জামাইবাবু বখশিস দিবেন। কৃষ্ণকান্ত তখন সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ঘণ্টুর ছুটি ফুরিয়ে গেল, সে চলে যাচ্ছে। আমারও ছুটি ফুরিয়েছে, আমিও দিন চারেক পরে রওনা হব। তুমি তো কারো চাকরি কর না, থেকে যাও এখানে ক'দিন আরও। আমি গিয়ে তোমাকে মাছ-ধরা সম্বন্ধে ভালো বিলিতী বই পাঠিয়ে দেব একখানা। ভালো ছাপা, অনেক ছবি আছে—"

"বিলিতী মাছ—কার্প, স্টায়লিং, মেকেরেল আমি ধরেছি। ওদের হ্যাবিটস্ (habits) কিন্তু আলাদা রকম—এদেশের মাছ বিলিতী বই পড়ে ধরা যাবে না।"

"আরে না না। এদেশের রুই কাতলা মিরগেল বাটা এদের সম্বন্ধেই বইটা লিখেছেন এক সাহেব। মাগুর, শিঙি, আড়, চিতল সব রকম মাছের কথাই আছে তাতে। কাছিমের সম্বন্ধেও একটা চ্যাপটার আছে। সাহেবের নামটা মনে পড়ছে না। একটা কথা জেনে রাখ এদেশের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য জিনিস আমরা সাহেবদের

মারফতই পেয়েছি। পশু-পাখী, গাছপালা, পোকামাকড়, দেব, দেবী, বেদ-পুরাণ, এদেশের অধিবাসীদের পরিচয়, এদেশের ভাষা-বিজ্ঞান সব জেনেছি আমরা ওদের কাছ থেকেই। সেদিন দেখলাম একটা দেশী রান্নার বইও বেরিয়েছে, তাতে আমাদের সুক্তোর কথাও আছে—"

সদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "সবই মানছি দাদা। কিন্তু ওরা আমাদের এত অত্যাচার করেছে, মনে মনে ওরা আমাদের এত ঘৃণা করে যে ওদের হাতে মোওয়া খাবার প্রবৃত্তি হয় না। ওদের লাথি জুতো ঝাঁটার সঙ্গে ওদের তথাকথিত সংস্কৃতির মিল দেখতে পাই না। তাই ঘেন্না ধরে গেছে!"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"তোমার কথা শুনে সুখী হলাম। কিন্তু তবু বইটা তোমায় পাঠিয়ে দেব। উলটে পালটে দেখো একবার। কিন্তু যে কথা তোমায় বলছিলাম কথায় কথায় তার থেকে সরে এসেছি। তোমার বড় শালীটিকে একটু সদুপদেশ দাও দিকি। ও তোমাকে খুব ভক্তি করে। আমি ওকে বলছি—তুমি তো চাকরি কর না, তুমি বাবার কাছে থাক না কিছুদিন। আমার সঙ্গে তোমার ফিরে যাবার দরকার কি। সেটা কি ভালো দেখাবে? রঙ্গনাথও আমার সঙ্গে যাবে বলছে, কিন্তু বই সন্ধ্যা তো তার সঙ্গে যাচ্ছে না। সে বলছে এখানে গ্রামে সে যে নারী-কল্যাণ সমিতি করেছে তার একটা পাকা বনিয়াদ না করে সে যাবে না। কিরণ তো ওদের সভায় মস্ত বক্তৃতা করেছিল। প্র্যাকটিক্যালি ওই প্রেসিডেণ্ট হয়েছিল, ওর কি উচিত এমন একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ফেলে স্বামীর পিছু পিছু উদ্বাহু হয়ে ছোটা? তাছাড়া বাবার চেয়ে স্বামী বড় প্রকাশ্যভাবে সেটা ডেমনস্ট্রেট (demonstrate) করা কি শোভন?"

কিরণ বলিল—"যেতে চাইছি সাধে? ঘণ্টুকে ছেড়ে আমি বরং নিশ্চিন্ত থাকতে পারি কিন্তু ওঁকে ফেলে পারি না। উনি ঘণ্টুর চেয়েও ছেলেমানুষ। তাছাড়া খামখেয়ালী, জেদী আর হুজুকে। এখনও জোর করে নাওয়াতে হয়, খাওয়াতে হয়। আমি যদি সঙ্গে না যাই নাওয়া-খাওয়াই ভুলে যাবেন। গায়ের গেঞ্জি পর্যন্ত ছাড়বেন না! জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন খালি!"

"জঙ্গলে ঘোরাই তো আমার চাকরি। দিনরাত খুঁটোয় বাঁধা থাকলে কি চলে?"

উষা এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। সে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

"কি হলো—হঠাৎ হাসবার কারণটা কি।"

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া উষার দিকে চাহিলেন। উষা হাসিতে হাসিতেই জবাব দিল—"দিদিকে খুঁটি বললেন কি বলে! দিদির মতো নরম মানুষ কি আর আছে?"

"আমি তো শক্ত খুঁটি বলিনি, খুঁটি নরমও হতে পারে। ইল্যাস্টিকও হতে পারে। কিন্তু সঙ্গ ছাড়ে না, যতদূর যাও যেখানে যাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। সাবিত্রী এ বিষয়ে রেকর্ড রেখেছেন, তিনি যমের পিছু পিছুও ধাওয়া করেছিলেন। শক্ত খুঁটি এক হিসেবে ভালো, তা উপড়ে ফেলা যায়, কিন্তু নরম খুঁটি না-ছোড়! কি বলো সদানন্দ. তোমার অভিজ্ঞতা—"

"আমার অভিজ্ঞতা স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে রাখাই ভালো। দূরে দূরে থাকলেই ঝামেলা বেশী হয়।"

"তুমিও তাহলে যখন যাবে উষাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?"

"উষা যা বলবে তাই করবো। আমার মটো (motto) হচ্ছে—ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন গোছের। রেজিস্ট (resist) করে লাভ নেই—"

"আমাকে নইলে ওর চলে নাকি একদণ্ড"—উষা ফোঁস করিয়া উঠিল—"তাই ওই 'মটো'! আমাকে দিয়ে পা টেপায়, তামাক সাজায়, পান সাজায়। অপরের হাতের সাজা পছন্দ হয় না। রাত্তিরে ঘুম না হলে তাস খেলতে হয় ওর সঙ্গে বসে। দোকানে লোক-দেখানো যান একবার দশটা নাগাদ। আবার একটা নাগাদ ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগান চারটে পর্যন্ত। আপিসে গিয়ে ফোন করে রান্নার ফরমাশও দেওয়া হয়। আজ সুক্ত কোরো, আজ পোস্ত কোরো, আজ পলতা দিয়ে ব্যাসন কোরো। বিকেলে পাঁচটায় দোকানে গিয়ে আবার আটটা নটা নাগাদ ফিরে এসে বলেন—চলো যাত্রা দেখে আসি আজ। খুব ভালো একটা পালা নাবিয়েছে পাঁচু। উনি সিনেমা দেখতে চান না, যাত্রা পছন্দ করেন, আর আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে হয়। কারণ বাড়ীর আর কেউ যেতে চায় না—"

কিরণ বলিল—"ভগবান তোকে সুখ দিয়েছেন ভোগ করে নে। আমার মতো একটা দুর্দান্ত লোককে যদি সামলাতে হতো তাহলে বুঝতিস—"

কৃষ্ণকান্ত ঊর্ধ্বমুখ হইয়া চিবুকের নিম্নভাগটা চুলকাইতে লাগিলেন। সদানন্দের চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থির হাস্য নীরবে চিকমিক করিতে লাগিল। হঠাৎ সেই ছোঁড়াটা চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবু মছলি ভাসলো।" পরমুহূর্তেই সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবং আরও কয়েক মিনিট পরে প্রকাণ্ড একটা রুই মাছকে টানিতে টানিতে ডাঙায় তুলিয়া ফেলিল। রুই মাছটা ডাঙায় উঠিয়াও একটা লাফ দিয়া পাশের ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। সেখান হইতে সেটাকে কৃষ্ণকান্তই টানিয়া বাহির করিলেন।

"এই নাও। সের পাঁচেক হবে—"

"এ তো আপনি আশ্চর্য কাণ্ড করলেন দাদা। আমি দিনের পর দিন এসে ধন্না দিয়ে বসে খালি চুনো পুঁটি তুলে যাচ্ছি, আপনি একটা ফায়ারেই পাঁচ সের একটা রুই ঘায়েল করে ফেললেন। বাঃ—"

স্বামীগর্বে কিরণের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "তুমি একবার আমাদের ওখানে এস না। বড় বড় হরিণ মেরে খাওয়াবেন তোমাকে। একবার কি প্রকাণ্ড একটা হরিণ মেরে এনেছিলেন—শহরসুদ্ধ সবাইকে মাংস বিলিয়ে শেষ করতে পারি না। না রে ঘন্টু, তুই তো তখন ছিলি। হরিণের জিবটা দিয়ে উনি কি একটা বিলিতী খাবার তৈরি করলেন বই দেখে। ঘন্টু কোথা গেলি তুই।"

ঘন্টু একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছিল। মায়ের ডাকে সেটা ফেলিয়া দিয়া কাছে আসিল।

"কি বলছ ? বাঃ, চমৎকার মাছটা তো। দমপোক্ত কর মা আজকে—।"

"বেশ, চল এবার ফেরা যাক তাহলে তাড়াতাড়ি। এত বেলায় দমপোক্তর ফরকটু তুললে বৌদি আবার রাগ না করে। ঘন্টু তুইই তোর পিসিকে বলিস। তোকে বড্ড ভালোবাসে ও।"

ঘন্টু বলিল—"রাঁধবে কিন্তু তুমি। ও রান্নাটা তোমার হাতে চমৎকার ওতরায়।"

উষা ফোড়ন কাটিল—"দমপোক্ত বল আর যাই বল—কাঁচা লঙ্কা সরষেবাটা দিয়ে

গরগরে ঝালের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আমি মাছের ঝাল করব। খেয়ে দেখিস—"

কৃষ্ণকান্ত ছোঁড়াটাকে নগদ এক টাকা বখশিস দিলেন।

"তুইও আজ খাবি চল আমাদের সঙ্গে। মাছটা নিয়ে যেতে পারবি?"

"হাঁ—"

মাছটা সে কাঁধের উপর তুলিয়া লইল। সদানন্দ উষাকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—কড়কড়ে করে ভাজাও কোরো খানকয়েক। আমি কলকাতার লোক, ভাজাটাই আমার বেশী পছন্দ।"

উষা মুখ টিপিয়া বলিল, "তুমি না বললেও সেটা আমি করতাম!"

সকলে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

৩৯

চন্দ্রসুন্দর পূজা করিতেছিলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। শিব-স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন তিনি। রাধানাথ গোপ একটি চিঠি হাতে করিয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কাজ কমিয়া গিয়াছে। সূর্যসুন্দরের অসুখের সংবাদে বিচলিত হইয়া যে সব লোক বাহিরের নবনির্মিত চালা-ঘরগুলিতে সমবেত হইয়াছিল তাহাদের ভিড় কমিয়া গিয়াছে। যাহারা সত্যসত্যই চিন্তিত বা শংকিত হইয়া আসিয়াছিল তাহারা আসিয়া খবর লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন মুশকিল হইয়াছে একদল বেকার লোককে লইয়া। দশ বারোজন লোক সর্বদাই ওখানে বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে ভিখারীও আছে দুই চারিজন। রাধানাথ গোপ হয়তো তাহাদের ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিতেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, উহারা যতক্ষণ বসিয়া থাকিতে চায় থাক। উহারা আমার আপন লোক বলিয়াই আসিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং কুমারকে আরও কিছু চিঁড়া এবং গুড় যোগাড় করিতে হইয়াছে। চিঁড়া-গুড় বিতরণ করিবার সময় গঙ্গার মেজাজ ক্ষণে ক্ষণে বিগড়াইয়া যাইতেছে। এজন্য সে দায়ী করিয়াছে রাধানাথ গোপকে। বলিতেছে—ওই লোকটা যদি এখানে 'ধরমশালা' না বানাইত তাহা হইলে এ উৎপাত হইত না। কুমার আড়ালে তাহাকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। বার বার বলিতেছে এসব কথা যেন রাধানাথবাবুর কানে না যায়। গঙ্গা যদি চিঁড়া-গুড় পরিবেশন করিতে ক্লান্তি বোধ করে, খন্তা বা শান্তার উপর সে ভার দিলেই হয়। গঙ্গা ইহাতেও রাজী নয়। সে বলিতেছে—তাহলে তোমার ওই আধমণ চিঁড়া দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। খন্তা বা শান্তার বাড়ীতে গিয়া হাজির হইবে সে সব। আমি ওদের চিনি না? সুতরাং গঙ্গাই গজগজ করিতে করিতে চিঁড়া-গুড় লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। একটা লোক চিঁড়া-গুড় গামছায় বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। গঙ্গা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, এখানে বসিয়াই খাইতে হইবে। সে লোকটি গামছায় গিঁটের পর গিঁট বাঁধিতে লাগিল, কয়েক মিনিট কোনও উত্তর দিল না।

তাহার পর বলিল, ডাক্তারবাবুকে বলিয়া দিও আমি কিষুণপুরের ঠাকুর সা। পুজো না করিয়া খাই না। আজ সকাল সকাল চলিয়া আসিয়াছি—পুজো করিতে পারি নাই। গঙ্গা বিরক্ত সুরে প্রশ্ন করিল—আজ সকাল সকাল আসিবার এত তাড়া কি ছিল? পুজো করিয়া আসিলেই পারিতে। ঠাকুর সা উত্তর দিল, আজ ভোরে স্বপ্ন দেখিলাম যেন সুরজ (সূর্য) অস্ত যাইতেছে। ডাক্তারবাবু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাই আজ উঠিয়াই ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া আসিয়াছি। ডাক্তারবাবু আমার দিলি দোস্ত (অকৃত্রিম বন্ধু) তোমার বাবা আমাকে চিনিত। তুমি চেন না। তাই এ কথা বলিবার মতো সাহস তোমার হইয়াছে। আমার ঘরে চিঁড়া মুড়ি ধান চাল ছাতুর অভাব নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবুর বাড়ীর অন্ন আমার কাছে অমৃততুল্য। তাই বহিয়া লইয়া যাইতেছি। এ সুরজ (সূর্য) অস্ত গেলে আর উঠিবে না। তাই যতক্ষণ আছে একবার করিয়া খবর লইয়া যাই। লোকটি এই কথাগুলি বলিয়া গঙ্গার প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিল। তাহার পর উঠিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে মেদিনীপুর গ্রামের ছেদি বলিল, গঙ্গা তুমি আমাদের মতো 'হরহরা' সাঁপকে (হেলে সাপকে) অপমান করিয়া পার পাইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু আজ তুমি গহুমনার পুছঁড়িতে (গোখরোর ল্যাজে) পা দিয়াছ। আমরা গরীব মানুষ ডাক্তারবাবুর দৌলতে যদি দু'চার দিন খাইতে পাই তোমার তাহাতে এত রাগ কেন। গঙ্গা কোন উত্তর না দিয়া চিঁড়া ও গুড়ের ঝুড়িটা তাহাদের মাঝখানে নামাইয়া দিল—খাও, খাও যার যত খুশি খাও। আমি চললাম। দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাধানাথ গোপ বারান্দায় বসিয়া চন্দ্রসুন্দরের উদাত্ত কণ্ঠে নানা দেবতার মহিমা-কীর্তন শুনিতেছিলেন। বড় ভালো লাগিতেছিল তাঁহার। চন্দ্রসুন্দর খুব ভালো আবৃত্তি করিতে পারেন। এ অঞ্চলের সমস্ত ছাত্রদের আবৃত্তি তিনিই শিখাইয়াছেন। তাঁহারই শেখানো আবৃত্তি বীরুকে একদা এই জেলায় প্রসিদ্ধ করিয়াছিল। পরীক্ষকরা তাহার আবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'ফুল মার্কস' দিয়াছিলেন। সেকালে মাইনর প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় আবৃত্তিও একটা বিষয় ছিল। চন্দ্রসুন্দরের আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে রাধানাথ গোপ অতীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সেকালের সেই ডিভিশনাল ইনস্পেক্টার বিভুধন মণ্ডলকে তিনি যেন আবার দেখিতে পাইতেছিলেন। একটু বেঁটেখাটো মোটাসোটা হাস্যমুখ বিভুধন মণ্ডল ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চান ছিলেন। রাধানাথ শুনিয়াছিলেন বিভুধন মণ্ডলরা নাকি সাঁওতাল ছিলেন আগে। ক্রীশ্চান মিশনারিদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম বরণ করেন। কিন্তু অতিশয় ভালো লোক ছিলেন তিনি। তাঁহার হাস্যময় উদার সদ্ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় রাধানাথকে নির্বাচন করেন নাই, তবু কিন্তু রাধানাথ তাঁহার সুমিষ্ট স্নেহময় ব্যবহারের জন্য আজও তাঁহাকে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। রাধানাথ অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার স্কুল-জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু এবং চন্দ্রবাবুর চেষ্টায় এখানে মাইনর স্কুল হয়, কিন্তু ইঁহারা কখনও স্কুলের গায়ে নিজের নামের লেবেল লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই। দুই একজন ডাক্তারবাবুর নাম প্রস্তাবও করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাতে রাজী হন নাই।

…হঠাৎ চন্দ্রসুন্দরের স্তবপাঠ বন্ধ হইয়া গেল। রাধানাথ বুঝিলেন পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রসুন্দরও বাহিরে আসিলেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে চন্দনের টিপ। রাধাকান্তকে দেখিয়া তিনি প্রসন্ন হইলেন।

"কি, রাধানাথ যে! কি খবর—"

"আমি আপনার ছেলের চাকরির চেষ্টায় পূর্ণিয়া গিয়েছিলাম। আমার জামাই বললেন তাকে ব্যাংকের একটা কেরাণী করে তিনি আপাতত ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের এজেন্টের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে।"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন—"কাল তার চিঠি পেয়েছি সে আসবে না। যেখানে আছে সেখানে এক ওস্তাদের পাল্লায় পড়েছে। সেই ওস্তাদের বাড়ীতেই পেটভাতায় চাকরি করছে আর ধ্রুপদ শিখছে। আমার বাবাও বড় ওস্তাদ ছিলেন – বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু সংসার করেন নি। গানের আসরে আসরেই ঘুরে বেড়িয়েছেন চিরকাল। এ-ও হয়তো তাই করবে।"

দুই এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া চন্দ্রসুন্দর বলিলেন—"তোমরা চেষ্টা করলে কি হবে। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বিরূপ হলে সৎপরামর্শও কেউ শোনে না। আমার দাদা আমার জন্যে কম করেন নি। আমাকে পোস্টাফিসের একটা ভালো চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। সে চাকরি নিলে এতোদিনে আমি স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পোস্টাফিস হতে পারতাম। প্রথম পোস্টিং হয়েছিল সাঁওতাল পরগণার এক নির্জন পাহাড়ীজায়গায়। আমার মনে হলো পোস্টাফিসে তো টাকা থাকবে, যদি ডাকাতটাকাত পড়ে—তাহলে তো প্রাণ যাবে। ভয়ে আমি গেলুম না। যিনি গেলেন তিনি দিব্যি রইলেন, ডাকাতটাকাত কেউ এল না। এখন তিনি মোটা পেনশন নিয়ে স্থপারিন্-টেণ্ডেণ্ট অব পোস্টাফিস-এর পোস্ট থেকে রিটায়ার করেছেন। সবই বাবা অদৃষ্ট, বুঝলে। দাদা আমার ভালো করবার চেষ্টা বরাবরই করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা শুনিনি। তাই কষ্ট ভোগ করছি। সবই অদৃষ্ট, বুঝলে।"

আর একটু থামিয়া বলিলেন—"দাদা তো ভালো আছেন। আমি কাল চলে যাব ভাবছি। ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে স্থজিয়ে দেখি—যদি কিছু হয়। তোমার বাড়ীতে আগে ভালো চিঁড়ে হতো। এখনও কি হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি দশ সের চিঁড়ে আর কিছু ভালো ব্যাসন আর মুড়িও দিয়ে দেব আপনার সঙ্গে। আপনি ব্যাসনের ভাজা খেতে খুব ভালোবাসতেন মুড়ির সঙ্গে তা আমার মনে আছে—"

"বেঁচে থাক বাবা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এমন সময় দূরে দেখা গেল একজন কুলি সমভিব্যাহারে একজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। একটু কাছে আসিয়াই সে ভদ্রলোক বলিলেন—"কি রে চন্দর, চিনতে পারছিস? আমি নকুল।"

"কি রে তুই কোথা থেকে—"

"আমি দিনাজপুরে কণ্ট্রাকটারি নিয়েছি। শুনলাম সূর্যর পক্ষাঘাত হয়েছে, তাই চলে এলাম। খবর কি।"

"খবর ভালো। দাদা বেশ ভালো আছেন। তুমি আর ওদিকে যেও না, এইখানেই

থাকো। ওখানে তো সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড হচ্ছে। তুমি এখানেই পুজোআচ্চা করে নাও। কুমারকে বলে আমি আমার ঘরে খাটিয়া পাতিয়ে নিচ্ছি—"

"এখনই সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি"—রাধানাথ গোপ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

॥ ৪০ ॥

সাত দিন পরে। মেয়েরা জামাইরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা ছিল, অন্তত সে তাহাই প্রকাশ করিয়াছিল, যে সে থাকিয়া যাইবে। রঙ্গনাথও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কি যে হইল ঠিক বোঝা গেল না। সন্ধ্যা আসিয়া সূর্যসুন্দরকে বলিল, "আমি থাকব মনে করেছিলাম। উনিও আপত্তি করেন নি। কিন্তু উনি বলছেন গিয়েই গাছের খোঁজে নানা জায়গায় যাবেন। উনি যদি বাড়ীতে থাকতেন তাহলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু উনি একা একা ঘুরে বেড়াবেন এটা আমার ভালো লাগছে না। তাই ভাবছি—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"তুমি যাও। ওর সঙ্গেই তোমার থাকা উচিত। ও একটু অগোছালো মানুষ—"

ঊষা পাশের ঘরে ছিল। ঠোঁট উলটাইয়া স্বগতোক্তি করিল, "ঢঙ্গী! স্বামীর সঙ্গে তো আমরা সবাই যাচ্ছি। তুইও যা না। অত ঢং করবার দরকার কি!"

সবাই চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন—পরের ঘরকে আপন ঘর করিয়াই মেয়েদের জীবন সার্থক হয়। তাঁহার মেয়েদের জীবন সার্থক হইয়াছে ইহাতে তিনি আনন্দিত। তবু কিন্তু কষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া ঊষার জন্য। মেয়েটা ভারি সরল। উহার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা এ সরলতার মূল্য দিয়াছে কি না কে জানে। উশনা নির্বিঘ্নে পেঁছিয়া গিয়াছে—টেলিগ্রাম আসিয়াছে কাল। চন্দ্রসুন্দরেরও চলিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু নকুল আসাতে সে কয়েকদিন থাকিয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—"চন্দরবাবু নকুলবাবুর সঙ্গে দিনরাত কি যে এত ফুসফুস গুজগুজ করেন জানি না। নকুলবাবুর ভুরু কোঁচকানো, কপাল কোঁচকানো, চন্দরবাবু তন্ময়—ব্যাপারটা কি!"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "ছেলেবেলার বন্ধু যে—"

পৃথ্বীশ এখনও যায় নাই। কিন্তু সে সূর্যসুন্দরের কাছে কদাচিৎ আসে। সে কখনও গঙ্গার ধারে, কখনও পীরপাহাড়ে, কখনও বাঘাড় বিলের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রোজ সকালে খাইয়াই বাহির হইয়া পড়ে। ফেরে রাত্রে। পশ্চিমের দিকের বারান্দায় একটা খাটিয়া পাতা থাকে। তাহাতেই ঘুমায়। কাহারও সহিত বড় একটা কথা বলে না। গগন তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমল পায় না। গগন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ দিগন্তও চলিয়া গিয়াছে। কলেজ খুলিয়াছে তাহার। থীসিসটাও দাখিল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দিগন্ত কাছে থাকিলে গগন মনে মনে জোর পায়। সে জানে যে কোনও জটিল পরিস্থিতি হইতে দিগন্তই তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে। তাহার চিকিৎসায়

এবং শুশ্রূষায় সূর্যসুন্দর ভালো আছেন ইহাতে সকলেই তাহার তারিফ করিতেছে বটে, কিন্তু সে নিজে খুব উল্লসিত হইতে পারিতেছে না। দাদুর নাড়ীটা ক্রমশঃ যেন দুর্বল হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত soft pulse। অথচ দাদুকে বেশী খাওয়ানো যাইতেছে না। প্রদীপে তৈল কমিয়া গেলে প্রদীপের শিখা যেমন নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসে এ যেন অনেকটা তেমনি। সূর্যসুন্দর বাহিরে বেশ প্রফুল্ল আছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন নিবিয়া যাইতেছেন এ খবর গগন ছাড়া আর কেহ জানে না।

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন।

"সূর্য ঘুমুচ্ছে নাকি—"

নকুল মামা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সূর্যসুন্দরের চোখ খুলিয়া গেল।

"এস। চোখ বুজেই শুয়ে থাকি আজকাল। ঘুম বড় একটা হয় না—"

একথা সেকথার পর নকুল আসল প্রসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। একটু গলাখাঁকারি দিয়া বলিলেন, "চন্দরের কোনও একটা ব্যবস্থা করেছ তো ?"

"কি ব্যবস্থা—"

"আইনত সে তোমার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক। একান্নবর্তী পরিবার তো ছিল তোমাদের। সে হিসেবে—"

সূর্যসুন্দর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওকে আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি। কিন্তু বিয়ে হবার পর ও বরাবরই বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। এখানে স্কুলে কিছুদিন চাকরি করেছিল, কিন্তু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও অনেকদিন আগেই চ'লে গিয়েছিল। আমরা এক-অন্ন ছিলাম না। আমার বিষয়-সম্পত্তি সবই আমার স্বোপার্জিত। চন্দর রোজগার শুরু করবার বহু আগেই সে বিষয় আমি কিনেছি। স্টেটের খাতাপত্র থেকে তা সহজেই প্রমাণ করা যাবে। তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন।"

মাথায় হাত বুলাইয়া নকুল বলিলেন—"না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম। যাক তুমি আছ কেমন বল—"

"দিন গুনছি—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন—"অনেক দিন পরে এখানে এলে। কোন কাজে এসেছ নাকি। তুমি তো আজকাল বড় ব্যবসাদার—"

"হ্যাঁ। এখানে একজনকে টাকা ধার দিয়েছিলাম। সুদে আসলে সে টাকা প্রায় পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সে বলছে শোধ করতে পারব না। একশ' বিঘে জমি বন্ধকী দিয়ে টাকা নিয়েছিল। বলছে—ওই জমিটাই আপনি নিয়ে নিন। আমি এখানে জমি নিয়ে কি করব বল তো ? বাংলাদেশে ধেনো জমি পেলে বরং কাজ হতো। দেখি কি হয়—"

"তুমি খাবে এইখানেই তো—"

"না। কালীবাড়ীর পুরুত রামঝলক ঝা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। পাঁটার মুড়িঘন্ট খাওয়াবে বলেছে। যাকে টাকা দিয়েছিলাম সে ওই রামঝলকেরই আত্মীয়। রামঝলকই জমিটা নগদ দাম দিয়ে কিনে নিতে চাইছে। বলছে তিন হাজার টাকা নগদ দেবে। কি করব ঠিক করতে পাচ্ছি না। কি করব বল তো ?"

সূর্যসুন্দর কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন—"আমি যা বলব তা তুমি শুনবে না। সুতরাং বলে লাভ নেই। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু তুমি বড্ড বেশী কথা বলছ!"

আড়নয়নে গগনের দিকে চাহিয়া নকুল বলিলেন—"আমি উঠি এবার—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন—"গগন প্রণাম কর। ইনিও তোমার দাদু হন।"

গগন প্রণাম করিল।

"আমি এবার উঠি। সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি এখনও।"

নকুল চলিয়া গেলেন। গগন বলিল—"তুমি চোখ বুজে শুয়ে থাকো। চম্পাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে তোমাকে গল্প পড়ে শোনাক। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' পড়েছ?"

"না।"

"চম্পার কাছে 'নিষ্কৃতি'টা আছে। সে পড়ে শোনাক তোমাকে। তুমি কিন্তু বেশী কথা বোলো না—"

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া ফেলিলেন।

॥ ৪১ ॥

চন্দ্রসুন্দর অবশেষে অনেক লটবহর লইয়া সকালের ট্রেনে চলিয়া গেলেন। কুমার তাঁহার সহিত সব রকম ডাল এবং বাগানের তরিতরকারি প্রচুর দিয়াছিল। রাধানাথ গোপও অনেক জিনিস আনিয়াছিলেন। স্টেশন হইতে কুমার সোজা বাগানে চলিয়া গেল। বাগানে কয়েকটি 'জন' লাগানো হইয়াছে। সামনে বসিয়া কাজ না করাইলে তাহারা ফাঁকি দিবে। ভালো ঘি আনিবার জন্য গঙ্গা হাঁসুয়ারে তিলক গোয়ালার কাছে গিয়াছে। সে কুমারকে পই-পই করিয়া বলিয়া গিয়াছে কুমার যেন বাগানে গিয়া 'জন' খাটায়। কুমার বাগানে গিয়া দেখিল 'জন'রা কাজ করিতেছে। কুমারকে দেখিয়া একটি 'জন' (মজুর) উঠিয়া আসিরা 'ছেকাছেনি' ভাষায় বলিল—"তুরীটোলার বর্ষাতিয়ার মা তার লোক পাঠাইয়া বাগান হইতে দূব্রি ঘাস (দূর্বা ঘাস) কাটিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি মানা করিলাম কিন্তু সে শুনিল না। তাই আমি তাহার 'খুরপি' এবং কাচিয়া (কাস্তে) কাড়িয়া রাখিয়া দিয়াছি। সে একটু পরে হুজুরের কাছে আসিবে।" বলিয়া সে খুরপি ও কাস্তেটি বারান্দার উপর রাখিল। কুমার ইহাতে খুশী হইল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিরা বলিল—"তুমি নিজের কাজ ছেড়ে বর্ষাতিয়ার মায়ের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে কেন। এত দূব্রি রয়েছে, বর্ষাতিয়ার মা বকরির জন্য চারটি নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি।" লোকটার গাঁজাখোরের মতো চেহারা। ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল—"হাম্ সমঝলিয়ে—।" কুমার এক ধমক দিল—"তোমাকে আর সমঝাতে হবে না। তুমি যা করছ তাই কর গিয়ে। শিশুগাছের নীচটা আজ সাফ করে ফেলা চাই।"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া ক্যাম্প চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল। চুপ করিয়া শুইয়া রহিল খানিকক্ষণ। চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন সেই ছবিটা মনে পড়িল। স্টেশনে যাইবার পূর্বে সূর্যসুন্দরের পায়ে বার বার মাথা কুটিয়া বলিতেছিলেন—দাদা আমি মহাপাপী। আমাকে ক্ষমা কর। সূর্যসুন্দরের চোখ

দিয়াও জল পড়িতেছিল। তিনি একটি কথাও বলেন নাই কিন্তু তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলে ক্ষমা যেন মূর্তিমতী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অব্যক্তই যেন তাঁহার মুখের ভাবে ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছিল। সে অব্যক্ত যেন বলিতেছিল, আমি সব ক্ষমা করিয়াছি। এই চিত্রটাই কুমারের চোখের সামনে ভাসিতেছিল। হঠাৎ একটা সুমিষ্ট তরল সুরে কে যেন বলিয়া উঠিল—'খোকা হোক খোকা হোক'। সেই হলদে পাখীটা আসিয়াছে। কুমার উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। পাখীটাকে দেখিতে পাইল না। পাখীটা কোন্ গাছে কোন্ শাখার আড়ালে যে লুকাইয়া থাকে বোঝা যায় না। আর একবার বলিল—'খোকা হোক'। কুমার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নাঃ —উহাকে দেখা যাইবে না। তাহার পর হঠাৎ দেখিতে পাইল পাখীটা এক গাছ হইতে উড়িয়া আর একটা গাছে গিয়া অন্তর্ধান করিল। সোনার স্বপ্ন যেন উড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই শোনা গেল—বউ হলুদ কোট!

কুমার বাবার ডায়েরি পড়িতেছিল। সে সেই যুগে চলিয়া গিয়াছিল যে যুগে কন্যাদায় সত্যই একটা বিষম দায় ছিল। যখন মেয়ের বাবা মা কোথাও কোনক্রমে মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে পারিলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত তখন সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু কুমারীদাহ তখনও চলিতেছিল। সমাজের লেলিহান চিতার আগুনে অসংখ্য কুমারীরা তখনও পুড়িতেছিল। মেয়ের মা বাপের জাতিকুলমান রক্ষা করিবার জন্য কুলীনরা শত শত বিবাহ করিতেন। সময়ে বিবাহ দিতে না পারিলে সমাজে একঘরে হইতে হইত। ধোপা নাপিত বন্ধ হইত। বাড়ীতে কেহ মরিলে শবদাহ করিবার লোক জুটিত না। সূর্যসুন্দর ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

"অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন শংকরা হইতে একটি পত্র পাইলাম। অপরিচিত হাতের লেখা। অসংখ্য বানান ভুলে পরিপূর্ণ। দীর্ঘ খামের চিঠি। উলটাইয়া দেখিলাম চিঠির নীচে লেখা—সন্তোষের মা। একটু আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সন্তোষের মা তো কখনও চিঠি লেখে নাই আমাকে। লিখিয়াছেন,—'বাবা সূর্য, নিরুপায় হয়ে তোমাকে এই চিঠি লেখাচ্ছি ছিরু চৌধুরীর ভাইপোকে ধরে। আমি তো লিখতে জানি না তাই ওকে দিয়ে লেখাচ্ছি। আমি বাবা বড় আতান্তরে পড়েছি। তোমার বন্ধু সন্তোষের বিয়ে দিয়েছি কয়েক বছর হলো। তোমাদের খবর দেবার অবসর পাইনি। পাশের গাঁয়ের মেয়ে, সাতদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। বৌমাটি আমার খুব ভালো। একটি মেয়ে দুটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু মুশকিলে পড়েছি সন্তোষকে নিয়ে। তার রোজগারপত্র কিছু নেই। ডাক্তারির একটা ঢং করে বসে আছে। সব বিনি পয়সার রোগী! অথচ তোমর বন্ধুটির নবাবী কিছু কম নেই। শান্তিপুরী ধুতি ছাড়া পরবে না। রোজ ডিমের ডালনা আর লুচি চাই। ভাত পাতে মাছ নইলে চলবে না। সব হচ্ছে জমি বাঁধা দিয়ে দিয়ে। সন্তোষের বাবা পঞ্চাশ বিঘে ধেনো জমি কিনেছিলেন। শুনছি সন্তোষ তার থেকে কুড়ি বিঘে বিক্রি করে দিয়েছে। এইভাবে যদি চলে তাহলে বাকি জমিগুলোও বিক্রী করে ফেলবে। তারপর যে কি হবে তা ভাবতেও ভয় হয়। আমাদের জ্ঞাতিরা কেউ বন্ধু নয়, সবাই শত্রু। তারা ওকে টাকা ধার দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বিষয়টা হস্তগত করবে বলে। আমার মুখ চাইবার কেউ নেই। তারপর মুশকিল হয়েছে রাজুকে নিয়ে। এগারো বছর বয়স হলো। সন্তোষের বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, উনি আমার আর দুটি মেয়েকে গৌরীদান

করেছিলেন। রাজুর গৌরীদান তো দূরস্থান বিয়ে দিতে পারব কি না, সৎপাত্র পাব কি না এই দুর্ভাবনায় রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না। তোমার মামা আমাদের জ্ঞাতি। তাঁকে আমি চিঠি লিখেছিলাম তিন মাস আগে। কোনও জবাব পাইনি। শুনলাম তিনি দ্বিতীয়পক্ষ নিয়ে খুব ব্যস্ত। শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছি কিছু জমিজমাও কিনেছেন স্ত্রীর নামে। গুজব ওইখানেই নাকি শেষে গিয়ে বাস করবেন। তুমি যেন এসব কথা আবার বোলো না কাউকে। আমাদের সমাজে সব গুজব সত্যি হয় না। পরশ্রীকাতর লোকেরা মিথ্যে গুজব রটায়। এখানকার শ্রীনাথ চৌধুরী বড়লোক। কলকাতায় কারবার, সেখানেই থাকে। হঠাৎ তার নামে গুজব রটে গেল সে নাকি কলকাতায় লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করেছে। সন্তোষের জগুকাকা একের নম্বর বেকার। তাকে শ্রীনাথ চৌধুরীর বউ টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালে সঠিক সংবাদটা আনতে। জগুকাকা মাসখানেক কলকাতায় কাটিয়ে ফিরে এসে বললে—খবরটা সর্বৈব মিথ্যা। শ্রীনাথ চৌধুরীর বাসায় যে সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে নাকি তার কাকার শালী, সম্পর্কে শ্রীনাথের কাকীমা। বালবিধবা। গ্রামে কষ্ট পাচ্ছিল বলে শ্রীনাথ তাকে কলকাতার বাসায় এনে রেখেছে। মেয়েটির বয়স নাকি পঞ্চাশের কাছাকাছি। শ্রীনাথ যখন কলকাতায় থাকে রান্নাবান্না ঘরের কাজ সবই করে। আমাদের সমাজ পরনিন্দা, পরচর্চা নিয়েই আছে। কেউ কারো ইষ্ট করতে পারে না, অনিষ্ট করবার জন্যেই সবাই ব্যস্ত। তাই সমাজ ভেঙে যাচ্ছে। সেদিন গাঙুলী বাড়ীর বৌটা একটা দুলে ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। না গিয়ে কি করবে। তার স্বামীটা বদ্ধ পাগল। ওর লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটাকে নাকি কামড়ে দিত। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচল। লোকে বলছে কুলে কালি দিয়ে গেছে। কিন্তু যারা পাগল ছেলের লুকিয়ে বিয়ে দেয় তাদের কুলে শাদা কি কিছু ছিল যে কালি দিয়ে সেটা কলঙ্কিত করবে? এই পাষণ্ড সমাজে আমরা বাস করছি বাবা। রাজুকে নিয়ে আমার সর্বদা ভয়। ওকে কোনও সৎপাত্রের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এখন মরা ছাড়া আর কিছু করবার নেই—কিন্তু রাজুকে কার কাছে রেখে যাব? সন্তোষের যা গতিক দেখছি ওর উপর ভরসা নেই। যা করবার আমাকেই করতে হবে। কিন্তু কি করে করব বাবা। আশেপাশে আপনজন কেউ নেই। সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না এ নিয়ে ভণ্ডের মতো দুশ্চিন্তা প্রকাশও করে কেউ কেউ। কিন্তু আসলে সবাই মনে মনে মজা উপভোগ করছে। আমাদের সমাজ বন্ধুর সমাজ নয়, শত্রুর সমাজ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু। ছিঁচকে চোরের জ্বালায় বাড়ীতে লাউ কুমড়ো করবার জো নেই। আমাদের 'আনারসী' আমগাছটার কথা তোর মনে আছে? প্রতিবছর তাতে অজস্র ফল ধরে। এক বছরও বাদ যায় না। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের জন্যে একটি আম চোখে দেখতে পাই না। কষি থাকতে থাকতেই ক্রমাগত ঢিল মেরে মেরে সাবাড় করে ফেলে সব! অথচ কাউকে কিছু বলবার উপায় নেই। সব জ্ঞাতি-গুষ্ঠির ছেলে। সন্তোষ একদিন একটা ছেলেকে ধরে চাবকেছিল। সে নিয়ে কি হইচই। থানা পুলিস পর্যন্ত হলো। সন্তোষকে মারবে বলে ওরা শাসাল দিনকতক। সন্তোষের একটা বন্দুক আছে (ধার করে কিনেছে সেটা)—সেইটে হাতে করে ও ঘুরে বেড়াত। তুই ভাবছিস বোধহয় সন্তোষ বন্দুক নিয়ে কি করে? বন্দুকের কি দরকার ওর? ঘুঘু আর শরাল হাঁস মারে। সব দিন অবশ্য মারতে পারে না।

যেদিন পারে সেদিন সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে রাত্রি দশটা নাগাদ বাড়ী ফেরে একটা হাঁস কিংবা ঘুঘু নিয়ে। এসে হাঁকডাক। বউটার ভোগান্তি। সেগুলো তখনই ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে রেঁধে দিতে হবে। তা না হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে। সবই মানিয়ে যেত যদি পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু একটি পয়সা রোজগার করতে পারে না বাবা। জমির ধান, তালপুকুরের মাছ (তা-ও রোজ নয়, ধরবে কে ?) আর ঘরের ক'টা হাঁস আছে তাদের ডিম। আর উঠোনে কিছু শাক-শব্জি লাগিয়েছে বৌমা—তাই দিয়ে সংসার চলে। আর বুধী গাইটা আছে, বৌমা তার খুব সেবা করে। নিজে হাতে খড় কেটে, জাব মেখে দেয়। যখন দুধ দেয় তখন দু'বেলায় প্রায় সের তিনেক দুধ হয়। সন্তোষ তখন ক্ষীর খায়। যখন দুধ দেয় না তখন গোবর্ধন ভরসা। গোবর্ধন গোয়ালা দুধ টাকায় দশ সের করে দেয়। কিন্তু সে দুধ নয় জল। সে আমাদের জমি করে। ধান বা খাজনা কিছু দেয় না। সবই ওই দুধের দামে কাটা যায়। বড়ই কষ্টে আছি বাবা। তোর কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে এত কথা কেন বলছি তা তুই নিশ্চয় ভাবছিস। তুই আমার সই বারাহীর ছেলে—হঠাৎ, কেন জানি না, সেদিন মনে হলো তোর কাছে সব দুঃখের কথা বলবার অধিকার আমার আছে। অনেকের কাছে দুঃখের বোঝা নামিয়েছি বাবা—তারা সবাই আপন জন, রক্তের সম্পর্ক—কিন্তু কেউ সে বোঝার দিকে ফিরেও তাকায় নি। নিজের বোঝা আবার মাথায় তুলে পথ চলতে হয়েছে। তুইও হয়তো তাই করবি। পরের দুঃখের অংশ নেওয়া সোজা কাজ নয়। আমার ছেলেই সে সম্বন্ধে উদাসীন। শুনেছি তুই বড় ডাক্তার হয়েছিস, পসারও বেশ ভালো হয়েছে। তোর নিশ্চয়ই অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, তুই রাজুর জন্যে একটি সৎপাত্রের খোঁজ করিস বাবা। সৎপাত্র মানে ধনী লোক নয়, ভালো বংশের ছেলে। আর যেন রোজগেরে ছেলে হয়। অনেক বড় বংশের ছেলে দেখেছি—তারা রোজগার করে না কিছু—তাই ক্রমশঃ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বংশও খুব বড়, আমাদের পূর্বপুরুষদের অতিথিশালা, নাটমন্দির, দুর্গাপুজো এখনও তার সাক্ষী দিচ্ছে। বারো মাসে তের পার্বণ কোনটা বাদ যেত না। কিন্তু ওই বংশের ছেলে সন্তোষ একটা অমানুষ হয়েছে। আসল কারণ বিদ্যের অভাব, অর্থের অভাব। অথচ বিলাসিতাটি পুরোমাত্রায় আছে। নবাবী করবার সামর্থ্য নেই অথচ নবাবী করা চাই। তুমি বুদ্ধিমান, বিদ্বান তোমাকে আর বেশী কি লিখব। অভাগিনী সই-মায়ের কথাটা মনে রেখো—এই শুধু অনুরোধ। তোকে অনেকদিন দেখিনি। আমার পক্ষে যাওয়া তো অসম্ভব। কে আমাকে নিয়ে যাবে ? টাকাই বা কে দেবে ? তুই যদি পারিস একবার আসিস। সন্তোষের পরশু থেকে জ্বর হয়েছে ঠাণ্ডা লেগে। শীতকালে নদীর চরে নাকি হাঁস আসে, তাই তিনটের সময় উঠে। হাঁস একটিও মারা পড়েনি, মাঝ থেকে ঠাণ্ডা লেগে গেল। এইখানেই থামলুম। কত আর লিখি, যদিও থামতে ইচ্ছে করছে না। মনের ভিতর কত কথাই যে জমে আছে। সবই দুঃখের কথা। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও নিজেকে ভুলিয়ে রাখি। নাতি-নাতনীদের নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় রূপকথা বলি তোদের যেমন বলতাম সেই অনেকদিন আগে। আর নয়, এইবার থামি, ছেলেটাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছি, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে দীর্ঘায়ু হয়ে দশজনের উপকার কর, দেশের মুখোজ্জ্বল কর। আমার যে সাধ সন্তোষ পূর্ণ করতে

পারেনি, তুমি সেই সাধ পূর্ণ কর। তুমিও আমার ছেলে। আমার বুকের দুধ তুমিও খেয়েছ।"

সন্তোষের মায়ের এই চিঠিটা আমার কাছে ছিল। সবটাই আমার ডায়েরিতে টুকিয়া দিলাম। সন্তোষের মা অনেকদিন আগে মারা গিয়াছেন। আমার নিজের মা কখনও আমাকে চিঠি লেখেন নাই। তাই এ চিঠিখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার জীবনে এ চিঠিখানির কিছু গুরুত্বও আছে। চিঠিখানি পাইয়া আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে শঙ্করায় গিয়া সন্তোষের মাকে একবার দেখিয়া আসিব। কিন্তু হাতে একটা শক্ত রোগী ছিল তাই ঠিক কবে যাইব দিনস্থির করি নাই। চিঠি আসিবার চার পাঁচ দিন পরে এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। 'সন্তোষের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি অবিলম্বে চলিয়া এস।' অবিলম্বেই চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম সন্তোষের ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছে। অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাশের গ্রামের যে হাতুড়ে চিকিৎসকটি তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিল সে অবশ্য যথাসাধ্য করিতেছে দেখিলাম। কিন্তু নিউমোনিয়া অসুখটা সে ধরিতে পারে নাই। সাধারণ সর্দিজ্বরের ঔষধই দিয়া চলিয়াছে। সেকালে নিউমোনিয়ায় বুকে পিঠে গরম গরম তিসির পুলটিস দেওয়া হইত। তাহা দেওয়া হয় নাই। ব্র্যাণ্ডি এবং ষ্ট্রিকনিন দেওয়ার রীতি ছিল। তাও সে দেয় নাই। আমার কাছে অন্য সব ঔষধ ছিল কিন্তু ব্র্যাণ্ডি আনি নাই। শুনিলাম গ্রামের জমিদার মহাশয় রোজ সন্ধ্যায় নাকি ব্র্যাণ্ডি পান করেন। তাঁহাকে গিয়া বলিলাম—"সন্তোষের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, শুনিলাম আপনার কাছে ব্র্যাণ্ডি আছে, যদি আউন্স চারেক দয়া করে দেন—!" ভদ্রলোক এ কথা শুনিয়া যেন আঁতকাইয়া উঠিলেন। "দেব ? ব্র্যাণ্ডি ? বলেন কি ! এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি আমি কাউকে দিই না। দেবও না। ব্র্যাণ্ডি আমার প্রাণ। ব্র্যাণ্ডি না হইলে আমি বাঁচব না। সন্ধের পর ঘরের দেওয়াল বেয়ে সাপ নাবে—চন্দ্রবোড়া, গোখরো, ময়াল, করেত—যতক্ষণ না ব্র্যাণ্ডি খেয়ে চুর হয়ে যাই ততক্ষণ নাবতে থাকে। ভয়ে চীৎকার করতে করতে ব্র্যাণ্ডি খাই, না ভাই ব্র্যাণ্ডি আমি এক ফোঁটা হাতছাড়া করতে পারব না। এখানে ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যায় না। কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আনাতে হয়। আপনিও কলকাতায় কাউকে পাঠান। আমি বরং দোকানের ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। এরা খাঁটি ভালো মাল দেবে।"

কলিকাতাতেই লোক পাঠাইতে হইল। জমিদার মহাশয়কে বলিলাম—"আপনি এখন চার আউন্স আমাকে দিন, তার বদলে আমি আপনাকে পুরো এক বোতল ফেরত দেব। আমি দু'বোতল আনতে দিচ্ছি।" অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি চার আউন্স বাহির করিয়া দিলেন। যখন আলমারি খুলিলেন দেখিলাম সারি সারি ছয় বোতল মজুত রহিয়াছে। বলিলেন, এটা আমার স্টক। এক বোতল ফুরুলেই আনিয়ে রাখি। জীবন-মরণ ব্যাপার তো। কলিকাতা হইতে যখন দুই বোতল ব্র্যাণ্ডি আসিল তখন কথা মতো এক বোতল তাঁহাকে দিলাম। তিনি সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া সেটি লইয়া আলমারিতে পুরিয়া ফেলিলেন। সন্তোষ দিন সাতেক পরে ভালো হইল। তাহাকে পায়রার বাচ্চার 'জুগস্যুপ' বানাইয়া রোজ খাইতে দিতাম। ইহাতে সে তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিতে লাগিল। শুধু চিকিৎসা নয় সন্তোষের সেবার ভারও আমাকে খানিকটা লইতে হইয়াছিল। কারণ বুকে পিঠে

মালিশ করা পুলটিস দেওয়া অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব ছিল না। আমি আসিবামাত্র হাতুড়ে ডাক্তারটি সরিয়া পড়িয়াছিল (বেশ প্রবীণ লোক) এবং রটাইয়া বেড়াইতেছিল যে একটা ছোঁড়া ডাক্তারের পাল্লায় পড়িয়া সন্তোষের প্রাণ-পক্ষীটি এইবার খাঁচা-ছাড়া হইবে। আমরা শাক-চচ্চড়ি-খেকো বাঙালী আমাদের ধাতে কি ব্র্যাণ্ডি সহিবে? শুধু পরীক্ষা পাশ করিলেই ডাক্তার হয় না, অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, দেশকালপাত্র বিচার করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। সন্তোষের বউ ঘোমটা টানিয়া দূরে সরিয়া থাকিত। তাছাড়া তাহার সংসারের কাজও ছিল প্রচুর। রান্না করিত, ঘরদ্বার পরিষ্কার করিত, গরুর সেবা করিত, ছেলেমেয়েদের সামলাইত, তাহার উপর এক মাইল দূরের একটা পুকুর হইতে এক কলসী খাবার জল লইয়া আসিত। অবসর পাইলে সন্তোষের ঘরের দ্বারের সামনে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইত দুই এক মিনিটের জন্য, একটু ইতস্ততঃ করিত, তাহার পর চলিয়া যাইত। অনুভব করিতাম ঘোমটার ফাঁকে সশঙ্ক দৃষ্টি মেলিয়া সে তাহার রুগ্‌ণ স্বামীকে একবার দেখিয়া গেল। এতদিন পরে তাহার সম্বন্ধে একটি কথাই মাত্র মনে আছে। খুব ভালো রাঁধিতে পারিত। হাঁসের ডিমের ডালনা, আলুর দম এসব তো চমৎকার রাঁধিতই, থোড়ের ডালনা, মোচার ঘণ্ট, পালংশাকের ঘণ্ট প্রভৃতি সাধারণ তরকারিও তাহার হাতের গুণে অমৃতবৎ মনে হইত। সে সংসারের কাজই জানিত, সংসার লইয়াই থাকিত। রোগীর সেবার ভার আমাকেই লইতে হইয়াছিল। নিয়মিত টেম্পারেচার লওয়া, ঔষধ প্রস্তুত করা, ঔষধ খাওয়ানো সব আমিই করিতাম। একটা তোলা-উনুনে তাহার পথ্যও আমি করিয়া দিতাম। জগ্‌স্যুপ, পোরের ভাত, চা, ফলের রস সবই আমার তত্ত্বাবধানে হইত। আমার সহকারিণী ছিল রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মীর মতো অমন সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। ঠিক মনে হইত সাহেবের মেয়ে। চোখের তারা যদিও কুচকুচে কালো ছিল, কিন্তু মাথার চুল ছিল লাল। সর্বদাই গাছ-কোমর বাঁধিয়া থাকিত। পাড়ার লোকে বলিত দস্যি মেয়ে। দৌড়ে, সাঁতারে এমন কি হাডুডু খেলায় সে ছিল অদ্বিতীয়। বড় বড় গাছে চড়িতে পারিত। যদিও মাত্র এগারো বছরের মেয়ে, কিন্তু পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের সেই নেত্রী ছিল। তাহার প্রতাপে নাকি সবাই তটস্থ হইয়া থাকিত। রাগিয়া গেলে তাহার নাকি জ্ঞান থাকিত না, মেয়েদের উপর তো বটেই ছেলেদের উপরও হাত চালাইত। শুনিলাম রাগিলে সমস্ত মুখটা সিঁদুরের মতো রাঙা হইয়া ওঠে। আমি প্রথম যেদিন গেলাম সেদিন সন্তোষের মা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাকে লইয়া কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। সন্তোষের ছেলেমেয়েরা সন্তোষের বউ আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। সন্তোষের মা ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন—রাজু কোথা গেলি, দেখ কে এসেছে। তখন গ্রীষ্মকাল। বাড়ীর উঠানে একটা বড় আমগাছে অনেক আম ধরিয়াছিল। হঠাৎ সেই আমগাছ হইতে ধুপ করিয়া একটি মেয়ে লাফাইয়া পড়িল। বাঁ হাতে একটি পাকা আম, নীচের দিকে ছ্যাঁদা করিয়া চুষিয়া চুষিয়া রস খাইতেছে। আমার দিকে সপ্রতিভভাবে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া রহিল, পরমুহূর্তেই মুখটা ফিরাইয়া লইল। দেখিলাম লজ্জায় কানের কাছটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর মাথা হেঁট করিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষ যখন সুস্থ হইল তখন তাহার সহিত কিছু বৈষয়িক আলোচনা করিলাম

বলিলাম, "তোমার রোজগার কিছু হয় না শুনলাম। জমি বিক্রি করে ধার কর্জ করে নবাবী করছ—এটা তো ভালো নয়।"

সন্তোষ বলিল—"আমি ইতিহাসের নবাব না হতে পারি কিন্তু সত্যই আমি নবাব। আমার বাবা মা আমাকে নবাবের মতো মানুষ করেছেন। কখনো আমার পান থেকে চুন খসতে দেননি। যখন যা চেয়েছি তাই দিয়েছেন। ছেলেবেলায় চৌধুরীদের ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজোর সময় আমিও ভেলটের জুতো, ভেলভেটের জামা গায়ে দিয়েছি। চৌধুরীরা জমিদার কিন্তু তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়েই বরাবর চলেছি। বাবা আমাকে ঘোড়া কিনে দিয়েছিলেন, খরগোশ কিনে দিয়েছিলেন, নানারকম পায়রা কিনে দিয়েছিলেন। মাথায় ফুলেল তেল ছাড়া কিছু মাখতাম না। খারাপ খাওয়া কখনও খাইনি। মা বাবাই আমার এ অভ্যাস করিয়েছেন। অথচ লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেন নি। গ্রামের ওই কসাই পণ্ডিতের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে পড়াত না, কেবল ঠ্যাঙাত। বিদেশে ভালো ইস্কুলে যদি আমাকে পড়াতেন হয়তো কিছু লেখাপড়া শিখতে পারতাম। তুই যেমন শিখেছিস। কিন্তু মা আমাকে বিদেশে যেতে দিলেন না। পঞ্চুমামা একটা ইস্কুলের ব্যবস্থাও করেছিলেন। মাসে মাত্র পনেরো টাকা খরচ—থাকা খাওয়া স্কুলের মাইনে সব। বাবা টাকা দিতে রাজী ছিলেন, মা কিন্তু কিছুতেই আমাকে যেতে দিলেন না। বললেন—তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। হয়তো তোর মতো আমিও ক্যাম্বেল থেকে পাশ করে ভালো ডাক্তার হতে পারতাম। এ অঞ্চলে প্র্যাকটিসও খুব হতো। ওই হাতুড়েটা নাইবার খাবার সময় পায় না। ক্যাম্বেলপাশ হরিচরণবাবু দশঘরায় প্র্যাকটিস করেন। তাঁকে সাতদিন আগে 'কল' দিলে তবে পাওয়া যায়। এখানে এসে পঁচিশ টাকা 'ফি' নেন—তাছাড়া পালকি-ভাড়া। আমিও ওরকম হতে পারতুম। হরিচরণবাবুর বাবার অবস্থা আমার বাবার অবস্থার চেয়েও খারাপ ছিল। এখন তে-তলা বাড়ী হাঁকড়েছে। আমিও পারতুম। কিন্তু আমার মা আমাকে কাছ-ছাড়া করলেন না। ঘরে বসিয়ে বসিয়ে নবাব তৈরি করলেন। তাই নবাবীই করে যাচ্ছি। বাবার বিষয় যতক্ষণ আছে নবাবীই করে যাব। তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। অদৃষ্টই সব, বুঝলে।..."

সন্তোষ একটানা এতক্ষণ কথা আর কখনও বলিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সাধারণতঃ সে স্বল্পভাষী। সেদিন যেন সোডা-ওয়াটারের বোতলটা সহসা খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার মুখে সব শুনিয়া তাহার উপর রাগ হইল না। তাহাকে ভালো লাগিয়া গেল। মন্মথও সন্তোষের মতো বেপরোয়া, সন্তোষের মতো অসহায়। গান বাজনা লইয়া মাতিয়া থাকে। সে-ও বিবাহ করিয়াছে, তাহারও একটি ছেলে, একটি মেয়ে। কিন্তু কোনও রোজগার সে করে না। তাহার দাদাই তাহার পরিবারের ভার লইয়াছেন। মন্মথ বিলাসীও। ধারে দোকান হইতে তেল, সাবান, এসেন্স, রুমাল কেনে। দাদা ধার শোধ করেন। কেন জানি না বেপরোয়া বেহিসাবী লোককেই বেশী ভালো লাগে। মহৎ লোককে ভক্তি করি। মন্মথর দাদাকে ভক্তি করিতাম। একান্নবর্তী পরিবারের তিনি আদর্শ কর্তা ছিলেন। তাঁহার নিজের কোন বাহ্যাড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। সমস্ত সংসারটা তিনি মাথায় করিয়া থাকিতেন। মন্মথর বাবা বরদাবাবু যখন সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা গেলেন তখন মন্মথর দাদা এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন। সেই অবস্থায় গলায় কাছা লইয়া তিনি একটি দরখাস্ত লিখিয়া ডি. টি.

এস.-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মন্মথর বাবা ডি. টি. এস. আপিসের বড়বাবু ছিলেন, দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল তাঁর। বড়সাহেব পর্যন্ত তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। বস্তুতঃ তিনিই আপিস চালাইতেন। তিনি যেদিন মারা গেলেন সেদিন সাহেবগঞ্জে একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। শহরসুদ্ধ লোক শ্মশানঘাটে গিয়াছিল। মন্মথর দাদা শ্রাদ্ধের পর দিনই গিয়া ডি. টি. এস. সাহেবের সঙ্গে দরখাস্ত লইয়া দেখা করেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হইয়া যায়। মাহিনা কম, তবে উন্নতির আশা আছে। এই মাহিনা লইয়াই তিনি সমগ্র সংসারের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে দ্বিধা করেন নাই। এই টানাটানির মধ্যেও তিনি দূরসম্পর্কীয়া একটি বিধবা ভগিনীর ভারও লইয়াছেন। মন্মথর মা শুভংকরী দেবী দেবীর মর্যাদাতেই আনন্দার সংসারে আছেন। তাঁহার লোকলৌকিকতা পূজাপার্বণ খাবার করা সবই আগের মতন আছে। বাজারে ধার হইতেছে। আনন্দা গ্রাহ্য করেন না। তবে একটা সুরাহা, মন্মথর ছোট ভাই বসন্ত ডাক্তার হইয়াছে এবং একটা চাকরি পাইয়াছে। সে এখনও বিবাহ করে নাই। সমস্ত বেতনটি দাদাকে পাঠাইয়া দেয়। সে-ও বড় ভালো ছেলে। ইহাদের আমি মনে মনে ভক্তি করি। কিন্তু ভালোবাসি মন্মথকে। মন্মথ চাকরি-বাকরি কিছুই বরে না। থিয়েটার করিয়া গান গাহিয়া বেড়ায়। সংসারের কোনও দায়িত্ব বহন করিতে চায় না। আনন্দা দুই তিনবার তাহার চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন, রাখিতে পারে নাই। এক জায়গায় সাহেবের সঙ্গে ঘুষাঘুষি করিয়া পুলিস কেসে পড়ে। কিন্তু তাহার গান এবং অভিনয়ের জন্য সে ও অঞ্চলে বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই চেনে, খাতির করে, ভালোও বাসে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব (একজন বাঙালী ছিলেন তখন) মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। সন্তোষের কথা বলিতে বলিতে মন্মথর কথা মনে পড়িল। দুইজনেই প্রায় এক প্রকৃতির লোক। বেপরোয়া, বেহিসাবী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। তফাতের মধ্যে মন্মথর মাথার উপর দাদা আছে, সন্তোষের মাথার উপর আকাশ ছাড়া কেহ নাই। হাবু মামাও অনেকটা ওই জাতের লোক। স্রোতের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানকে লইয়াই ব্যস্ত, ভবিষ্যতের ভাবনা নাই। কেন জানি না, আমার ইহাদের ভালো লাগে। ইহারা অসহায়, আবার বিদ্রোহীও। ভবিষ্যৎকে কলা দেখাইয়া ইহারা নিজের মতে নিজের পথে চলিয়া বর্তমানকে উপভোগ করিতেছে। সন্তোষ যেদিন পথ্য পাইল তাহার দিন তিনেক পরে সতীশবাবুরও একটি পত্র পাইলাম। তাঁহাকে ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। সতীশবাবু লিখিয়াছেন—"আপনি ওখানে বড়ই বিলম্ব করিতেছেন। অবিলম্বে চলিয়া আসুন। আশা করি এতদিনে আপনার বন্ধুটি সুস্থ হইয়াছেন। আপনার অনেক রোগী ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের অনুরোধেই এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। মালিকও আপনাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে বলিতেছেন। ফিরিয়া আসিলে আবার আপনাকে চাঁচল যাইতে হইবে। সেখানে আপনার রোগীরা অনেক সুস্থ আছেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা, আপনি আর একবার তাঁহাদের দেখুন। চাঁচলের একটি অতিসার ব্যায়রা'মর রোগীও আপনার পথ চাহিয়া আছে। আপনি যখন চাঁচলে গিয়াছিলেন তখন সে মালদহে চিকিৎসার জন্য গিয়াছিল। সে চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। তিনি আপনাকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দুইবার লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আপনার অবর্তমানে হাবু মামাই আপনার ডিসপেন্সারির হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভালো লোক। কিন্তু

খাম-খেয়ালী। যেদিন মাছ ধরিবার খেয়াল হইল ডিসপেন্সারি বন্ধ করিয়া ছিপ লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আপনি আর দেরি করিবেন না। যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া আসুন। এখানে আপনার বাড়ীতে সান্ধ্য আড্ডাটা বেশ ভালোভাবেই জমিতেছে। জগন্নাথবাবু বলিতেছেন এবার 'জনা' নামাইবেন। প্রবীরের পার্টটা আপনাকে লইতে হইবে। হাবু মামা 'জনা' সাজিবেন। ছিপছিপে চেহারা, বেশ মানাইবে।"—আরও বার কয়েক 'আপনি আর দেরি করিবেন না' লিখিয়া সতীশবাবু পত্র শেষ করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর সহিত ভাব হইয়া গিয়াছিল। পত্র দেখিয়া রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিল—কার চিঠি? বলিলাম—মনিহারী থেকে সতীশবাবু লিখেছেন। এইবার আমাকে যেতে হবে। রাজলক্ষ্মী চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—এরই মধ্যে চলে যাবেন? বলিলাম—না গিয়ে উপায় নেই। অনেক রুগী ফিরে যাচ্ছে। কালই চলে যাব!

"কাল কি করে যাবেন? কাল তো তেরোস্পর্শ। মা কাল আপনাকে যেতে দেবে না। তাছাড়া, এখানে এসে তো আপনি দাদাকে নিয়েই দিনরাত কাটালেন। আসল কাজটাই তো করলেন না।"

"কি আসল কাজ?"

"তালপুকুরের মাছ ধরা। বিকেলের দিকে ছিপ ফেলে বসুন একবার। টপটপ সরল পুঁটি উঠবে। সে যে কি মজা—"

"আমি তো মাছ ধরতেই জানি না। কখনও ধরিনি—"

"ও আবার জানতে হয় নাকি। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ছিপটি ফেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকবেন, ফাৎনাটি ডুবে গেলেই এক হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে মাছ উঠে আসবে। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। আজ বিকেলে যাব—কেমন?"

"ছিপ কোথা—"

"দাদার ছোট বড় নানারকম ছিপ আছে।"

সেদিন বৈকালে বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাইতেছিল তখন আমি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলাম। রাজলক্ষ্মী পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া আমার গায়ে একটা ঠেলা দিল। চোখ চাহিতেই ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল বাহিরে আসুন। উঠিয়া তাহার পিছু পিছু তালপুকুরে গেলাম। বাড়ীর খিড়কিতেই তালপুকুর, সেখানে দেখিলাম ঘাটের ধারে রাজলক্ষ্মী আমার জন্য একটি ছিপ রাখিয়াছে। একটা ভাঁড়ে কিছু কেঁচোর টোপও আছে।

"আমি চার আগেই ছড়িয়ে দিয়েছি। আপনি ছিপটা নিয়ে এইভাবে বসুন।"

কিভাবে বসিতে হইবে তাহা নিজেই দেখাইয়া দিল।

"আমি বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে দিচ্ছি। আপনি ছিপটা ফেলে ফাৎনাটির দিকে চেয়ে থাকুন। ফাৎনা ডুবলেই হ্যাঁচকা টান নিয়ে ছিপটা তুলে নেবেন।"

এই উপদেশ সত্ত্বেও কিন্তু আমি তেমন সুবিধা করিতে পারিলাম না। কয়েকবারই ফাৎনা ডুবিল, আমি হ্যাঁচকা টানও মারিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখা গেল মাছে টোপটি খাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

"আপনি কোনও কাজের নয়, ঠিক সময়ে ছিপটা তোলেন না। সরুন আমি বসছি—"

সেদিন রাজলক্ষ্মী পাঁচটি পুঁটি এবং দুইটি বাটা মাছ ধরিয়াছিল। আমি একটিও পারি নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সন্তোষের মা বলিলেন, "রাজু মুখপুড়ি তোকে তালপুকুরে মাছ ধরতে নিয়ে গিয়েছিল বুঝি ? ও ওই সব নিয়েই তো আছে। ঘরে একদণ্ড থাকে না, দিনরাত দুদ্দাড় করে বেড়াচ্ছে। ও মেয়ে যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে তাই ভাবছি। বিয়েই হবে না বোধহয়, কে খুঁজে পেতে ওর বিয়ে দেবে বল। আমার তো অর্থসামর্থ কিছুই নেই—"

রাজলক্ষ্মী বারান্দার ওধারে বসিয়া প্রদীপ জ্বালাইতেছিল ঠাকুরঘরের জন্য।

বলিলাম, "আমি ওর জন্যে একটি পাত্র ঠিক করেছি। তবে আপনার পছন্দ হবে কি না জানি না—"

রাজলক্ষ্মী প্রদীপটির শিখাটিকে বাঁ হাত দিয়া আড়াল করিয়া আস্তে আস্তে ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল। দেখিলাম তাহার আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপের আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। মুখে একটা রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা রাগের, না লজ্জার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিছুদূর গিয়া সে পিছন ফিরিয়া আমার দিকে চাহিল এবং হঠাৎ জিব বাহির করিয়া আমাকে ভেংচি কাটিল।

সন্তোষের মা বলিলেন—"তোর যদি পছন্দ হয়ে থাকে আমার হবে না কেন। কি রকম দিতে থুতে হবে—"

"এক পয়সাও না।"

"তাই নাকি। ছেলের বয়েস কত।"

"ছাব্বিশ। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে একটু বেমানান হবে। ওর বয়েস তো এগারো—"

"বলিস কি তুই ! বেমানান হবে, সেদিন জানকী ভট্চায তার দশ বছরের মেয়েকে এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। মোটে ছাব্বিশ বছর ? এ তো জোয়ান ছেলে—। তোর মামা যে মেয়েকে বিয়ে করেছে তারও বয়েস তো দশ বারোর বেশী নয়। আমাদের সমাজে ছেলের বয়েস দেখে নাকি কেউ। সবাই কুল দেখে, আর ছেলের রোজগার দেখে। ছেলে কি করে ?"

"ডাক্তার। কিন্তু দোজবরে। তার প্রথম পক্ষের বউটি বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই মারা যায় ছ বছর আগে।"

"গোত্র কি ?"

"ভরদ্বাজ।"

"বাপ মা বেঁচে আছে ?"

"না—"

"কোথায় আছে সে—"

"তোমার সামনেই বসে আছে—"

বিস্ময়ে সন্তোষের মায়ের মুখটা একটু ফাঁক হইয়া গেল। তাহার পর তিনি আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন।

"সত্যি বলছিস্ ?"

"আমি পারতপক্ষে মিথ্যা কথা বলি না। কিন্তু একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। মামাকে আগে একটা চিঠি লিখুন। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁকেই চিঠি লিখতে বলতুম। এখন মামাই আমার অভিভাবক, ছেলেবেলা থেকে উনিই আমাদের মানুষ করেছেন। তাছাড়া দিদিমা এখনও বেঁচে।"

"লিখব কিন্তু এখানে চিঠি লেখানই মুশকিল। অপরকে দিয়ে লেখাতেও চাই না। কথাটা পাঁচ কান হয় এটা আমার ইচ্ছে নয়। তোমার বন্ধুটিকে বলে যাও সে যদি লিখে দেয়। তারই লেখা উচিত—"

"বেশ, তাকে দিয়ে লিখিয়ে চিঠি পোস্ট করে তবে আমি যাব। আজই চলে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু হলো না। কাল যেতেই হবে। ওখান থেকে জরুরী চিঠি এসেছে—"

"কালই চলে যাবি!"

"যেতেই হবে।"

"কাল রাত্রে আমি কিছু পিঠে পায়েস করব ভেবেছিলাম—"

"সকালে করুন তাহলে। আমাকে বিকেলে হরিপালে গিয়ে ট্রেন ধরতেই হবে—"

খোঁজ করিয়া দেখিলাম সন্তোষের কাছে চিঠি লিখিবার কোনও সরঞ্জামই নাই। কয়েক রকম ছিপ আছে, হুইল আছে, টোটা বন্দুক আছে, আয়না, সাবান, এসেন্স আছে, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, অ্যালোপ্যাথির কয়েকটা বাংলা বই আছে, শৌখিন জুতা আছে কয়েক জোড়া, চিরুনি, বুরুশ এবং ফুলেল তেল আছে, কিন্তু চিঠি লিখিবার কাগজ, কলম নাই, কালিও নাই। একটা জাবদা খাতা এবং একটা ভোঁতা পেন্সিল আছে দেখিলাম। সন্তোষ ওই খাতায় রোগীদের নাম, কি ঔষধ দিল, কোন্ তারিখে দিল তাহা পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখে। ঔষধের কত দাম পাইল তাহাও ওই খাতায় পেন্সিল দিয়া লেখা থাকে। দেখিলাম দামের অঙ্ক প্রায় শূন্যের কোঠায়। চাটুয্যে-পাড়ার কাছে ছোটখাটো একটি মনিহারী দোকান ছিল। সেখান হইতে চিঠি লিখিবার জন্য কাগজ, কলম, কালি কিনিয়া আনাইলাম। তাহার পর সন্তোষকে বলিলাম—"এইবার মামাকে একটা চিঠি লিখে ফেল।"

সন্তোষ কথাটা শুনিয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"একটা সিগারেট ধরাতে পারি? তুমি তো সব বন্ধ করে দিয়েছ।"

"না, এক মাস এখন সিগারেট চলবে না।"

তখন সে দিয়াশালাই-বাক্স হইতে একটি কাঠি বাহির করিয়া কানে ঢুকাইল এবং বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বেশ খানিকক্ষণ কান চুলকাইল। তাহার পর কাঠিটি বাহির করিয়া বলিল—তোমার মামা আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে কাকা। এ যাবৎ আত্মীয় হিসাবে তিনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় না, তাঁকে চিঠি লিখে বিশেষ কোনও ফল হবে। বিয়ের বাজারে তুমি সুপাত্র, অনেক টাকা পণ নিয়ে অনেক বড় ঘরে দিতে পারবেন। আমাদের মতো গরীবের কথা শুনে গলে যাবেন এ কথা বিশ্বাস করতে ভরসা পাই না। চিঠি লিখে মাঝ থেকে অপমানিত হব খালি।"

"যাতে অপমানিত না হও তার ব্যবস্থা আমি করব।"

সন্তোষ আরও খানিকক্ষণ কান চুলকাইল। তাহার পর বলিল—"বেশ, কি লিখব তাহলে বল, তুমি যা বলবে তাই লিখব। সব দায়িত্ব তোমার উপরই থাক। যদি কিছু না হয়—খুব সম্ভব হবে না—তখন যেন তোমরা বোলো না চিঠি লেখার দোষে সব ভেস্তে গেল। তুমি বলে যাও, আমি লিখে যাচ্ছি—"

লিখিবার আগে সে হালকা রঙের শৌখিন চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার চোখ খারাপ হয়েছে নাকি?" সন্তোষ হাসিয়া উত্তর দিল—"না এটা পরলে বেশ ভালো লাগে। যখন শিকারে বেরুই তখন পরি, বেশ ভালো লাগে। রোদের ঝাঁজটা চোখে লাগে না। বল, কি লিখব—"

রঙিন চশমা পরিয়া সন্তোষ বাগাইয়া বসিল। আমি ডিক্‌টেশন দিলাম।

শ্রীচরণেষু,

কাকা, আশা করি আপনি ও বাড়ীর সকলে ভালো আছেন। আমার ছোটবোন রাজলক্ষ্মীর এখনও বিবাহ দিতে পারি নাই। আমাদের অর্থ সামর্থ্যের কথা আপনি সবই জানেন। ভালো পাত্র জুটাইবার সাধ্য আমাদের নাই। সুর্যের সহিত রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দেন তাহা হইলে এই দায় হইতে সহজে উদ্ধার পাইতে পারি। আপনি আমার সম্পর্কে কাকা, তাই এ দায় আপনারও দায়। নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছি বলিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিলাম। আশা করি আপনি দয়া করিয়া সম্মতি দিবেন সুর্যের ইহাতে আপত্তি নাই। তাহার নিকট মত লইয়াছি। সে-ই আপনাকে পত্র লিখিতে বলিল। আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন। অন্যান্য গুরুজনদের দিবেন। বয়ঃকনিষ্ঠদের আশীর্বাদ জানাইতেছি। ইতি সেবক—

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষের হাতের অক্ষর বড় বড়। দাগড়া দাগড়া করিয়া লিখিয়াছে। এইটুকু চিঠিতেই দুই পাতা ভরাইয়া ফেলিয়াছে, বানান ভুলও অনেক। দেখিলাম কনিষ্ঠ বানান 'কোনিস্ট' লিখিয়াছে। সেটি কাটিয়া সংশোধন করিয়া দিতে বলিলাম। সেইদিনই চিঠিটি পোস্টাপিসে গিয়া রেজেস্ট্রিযোগে মামার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম। পোস্টাপিস হইতে ফিরিবার সময় একটা সজনে গাছের উপর রাজলক্ষ্মীর দেখা পাইলাম। সজনে ফুল পাড়িতেছিল। আমাকে দেখিয়াই গাছ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং একছুটে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মনিহারীতে ফিরিয়া দেখিলাম আমার বাড়ী সরগরম। দূর হইতে চারটি শক্ত রোগী আমার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে। দুইটি রোগী জমিদারের কাছারিবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। একজন আমার নব-নির্মিত ডিসপেন্সারি ঘরেই আছে। চতুর্থটি আছে গোলাদার প্রয়াগ সার বাসায়। কিছুদিন আগে প্রয়াগ সার সহিত আমার হৃদ্যতা হইয়াছিল। লোকটি গোলাদার বটে, কিন্তু তাঁহার মন কেবল গোলাদারিতেই আবদ্ধ নহে। রাধেশ্যাম তাঁহার হৃদয় হরণ করিয়াছেন। গলায় একটি তুলসীর মালা, হাতেও একটি তুলসীর মালা। প্রতিবৎসর এক কোটি রাধেশ্যাম নাম জপ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। গোলার গদিতে বসিয়া ক্রমাগত নাম জপ করেন এবং তাঁহার ব্যবসার দক্ষিণহস্ত বুলাকি সাহাকে চোখের ইঙ্গিতে বা ঠারেঠোরে যে আদেশ দেন তাহাতেই তাহার ব্যবসা সুচারুরূপে চলিয়া যায়। বুলাকি সাহার ভাগ্নেই হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রয়াগ সার গোলায় আশ্রয় লইয়াছে। আমি নাই দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইতেছিল প্রয়াগ সা-ই তাহাকে যাইতে দেন নাই। আমার উপর সা-জির খুব বিশ্বাস। তাঁহার নিজের কানে একবার নিদারুণ ব্যথা হইয়াছিল। রাধেশ্যাম নামে তিনি মন বসাইতে পারিতেছিলেন না, আমার ঔষধে তাঁহার ব্যথা সারিয়া গিয়াছিল। সেই হইতেই তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব। মাঝে মাঝে রাধেশ্যাম বিষয়েই

আমার সহিত তিনি আলাপ করেন। যদিও এ বিষয়ে আমি বিশেষ আলোকপাত করিতে পারি না, কিন্তু তিনি এই আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইতেছেন ভাবিয়া চুপ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ি। প্রয়াগ সার নামে অনেকে অনেক কুৎসা রটায়, আমি কিন্তু সে কুৎসার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার জন্য ব্যগ্র হই না। প্রয়াগ সা আমার সহিত ভদ্র ব্যবহার করেন ইহাই আমি যথেষ্ট মনে করি। প্রয়াগ সার কথা এখানে লিখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। লোকটি বরাবর আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে পরে যখন স্কুল করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে চাঁদা চাহিয়া বেড়াইতেছিলাম তখন ওই প্রয়াগ সা-ই আমাকে নগদ পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়া 'বৌনি' করেন। ইহাও বলিয়াছিলেন স্কুলের নাম যদি রাধেশ্যাম স্কুল রাখিবার ব্যবস্থা আমি করি তাহা হইলে স্কুল-ঘর করিবার সব খরচ তিনিই দিতে প্রস্তুত আছেন। গ্রামের লোক ইহাতে রাজী হয় নাই। অনেকে বলিয়াছিল স্কুলটা আপনার নামেই হোক। আমি তাহাতে রাজী হইতে পারি নাই। গ্রামের নামে স্কুলের নাম রাখাই সাব্যস্ত হইয়াছিল। প্রয়াগ সা কিন্তু স্কুলের চাঁদার খাতায় সর্বপ্রথমে পঁচিশ টাকা দিয়াছিলেন একথা আজও আমার মনে আছে। ত্রিপুরারি সিং একশ টাকা চাঁদা দিয়াছিলেন নিতান্ত আমার খাতিরে। আমাকে বলিয়াছিলেন—"স্কুল করছেন করুন, কিন্তু ভবিষ্যতে চাকর পাবেন না। স্কুলে দু'পাতা পড়ে সবাই বাবু হয়ে যাবে। কুলকর্ম'ও করতে পারবে না, বড় উঁচু কাজও করতে পারবে না। দু'য়ের বার হয়ে যাবে। তবে আপনার ঝোঁক হয়েছে করুন, কিছু চাঁদা আমি দেব। অক্ষর পরিচয় হলেই শিক্ষা হয় না, নিরক্ষর হলেই মূর্খ হয় না। আমার মা নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সমস্ত জমিদারিটা তিনিই চালাতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এম. এ পাশ নন, কিন্তু তা বলে কি তাঁকে মূর্খ বলবেন? সোমেনও গ্রামে গ্রামে ইস্কুল করে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে বলেছি—চাষা, ছুতোর, কামার, ভাল মিস্ত্রী এইসব যাতে হয় তাই কর। এ বি সি ডি পড়ে হবে কি! বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ আর শিশুবোধ পড়লে যে জ্ঞান হয় তাই যথেষ্ট।"—এই বক্তৃতাটি দিয়া তিনি সতীশবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—ডাক্তারকে একশ টাকা চাঁদা দিয়ে দিন। ওঁকে চটাতে চাই না।

শংকরা হইতে ফিরিয়া ত্রিপুরারির কাছে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—আপনাকে চাঁচল যেতে হবে। সেখান থেকে দুবার লোক ফিরে গেছে। সেখানে গতবার আপনি ফী নেন নি। সে ফী তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে, এবারের ফী-ও আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছি। আপনার বাড়ীর কাছে হরিবোল সা-র যে বাগানটা আছে সেটা শুনছি বিক্রি হবে। সাতশ' টাকা দাম চাইছে। আমি ছশ' টাকা বলেছি। মনে হয় ওতে রাজী হয়ে যাবে। তাহলে আপনার ওই চাঁচলের টাকা থেকেই হয়ে যাবে বাগানটা। ভালো ভালো আম আছে বাগানটাতে। কাঁটালও আছে। যখন এখানে বাসই করছেন তখন ভালোভাবে বাস করুন। গ্রামের কিছু জমিও বন্দোবস্ত করে নিন। কলাই মটর ছোলা বুট গম আখ খুব হবে। মকাইও খুব হবে। যখন এখানে বাসই করছেন, ভালোভাবে করুন। নেশরা থেকে ধান পাবেন, এখান থেকে ডালটালগুলো পাবেন। গাইগরু পুষুন, মোষও পুষুন। সব আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

বলিলাম—"কিন্তু আমি একা মানুষ, এ সবের দেখা শোনা করবে কে!"

"সব আধিতে বখরাতে লাগিয়ে দিন। কিছু কিছু চুরি যাবে অবশ্য, তবু যা

পাবেন তাতেই আপনার যথেষ্ট হবে। গোয়ালারা আপনার বাড়ীতে এসে দুধ আপনার সামনে দুয়ে নিয়ে যাবে। দশ সের দুধের বদলে এক সের খাঁটি ঘি দেবে। সামান্য পয়সা দিলে দই ক্ষীর পেতে দেবে। সে সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। আপনি চলে যাচ্ছেন কবে ?"

"এখানকার রুগীগুলোকে একটু সামলে নিই—সেখানে তো তাড়া তেমন নেই—"

"কিছুমাত্র না। তাঁরা বেশ ভালো আছেন। মোটা মধুবাবু শুনেছি হাডুডু-খেলার পাণ্ডা হয়েছেন। চর্বি ঝরে গেছে !"

"তাহলে আমার যাওয়ার দরকার কি—"

"তাঁরা আপনাকে দেখতে চান। গ্রামে আরও কয়েকটা রোগীও জমা হয়েছে। মোটকথা যেতেই হবে আপনাকে। কবে যাবেন, দিন ঠিক করে ফেলুন তারপর আমি তাঁদের চিঠি লিখব।"

"আচ্ছা—"

কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখিলাম আমার বাড়ীর সম্মুখে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে। শুনিলাম একটি মেয়েকে নাকি ভুতে ধরিয়াছে। ভিড়ের মধ্যস্থলে দেখা গেল একটি বুড়ি একটি মেয়েকে জাপটাইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া চীৎকার করিতেছে। ভিড় ঠেলিয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হইয়াছে, এত হাল্লা করিতেছ কেন ? বুড়ি কিছুতেই থামিতে চায় না। অনেক ধমকধামক দিয়া বলিলাম, কি হইয়াছে ব্যাপারটা আগে বল। সে বলিল, আমার বেটীকে ভুতে ধরিয়াছে। এ ভুত আমাদের গ্রামেরই একটা চামাইয়েনের (চামরানী) ভুত। সে বড়ই গরীব ছিল, তাহার পরনে কাপড় পর্যন্ত ছিল না। মরিবার সময় কাপড় কাপড় করিয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মরিয়াছিল। তাহারই ভুত ইহাকে ধরিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি করিয়া জানিলে ? বুড়ি বলিল—ও চামাইন যখন যাহাকে ধরে সেই তখন ঘরের লেপ কাঁথা কাপড়চোপড় টানিয়া গায়ে দেয়, আর ঠকঠক করিয়া কাঁপে। আমার ছেলেকেও একদিন ধরিয়াছিল। আমাদের পাড়ার আরও দুইচারিজনকে ধরিয়াছে। এই ভুতের জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। আপনি ডাক্তারবাবু অনেক ভুত জব্দ করিয়াছেন, দয়া করিয়া ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমরা অনেক ওঝা ডাকিয়াছি কেহ কিছু করিতে পারে নাই। আমার মনে হইল মেয়েটির ম্যালেরিয়া হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক দাগ কুইনিন মিকশ্চার খাওয়াইয়া দিলাম। বলিলাম—আমার এখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক। আরও দুই দাগ ঔষধ খাইতে হইবে। তাহার পর তিনদিনের ঔষধ লইয়া বাড়ী চলিয়া যাও। আর উহাকে ভুতে ধরিবে না। যাহাদের আগে ধরিয়াছিল তাহাদেরও এই 'দাবাই' দিতে হইবে। ম্যালেরিয়াই হইয়াছিল, কুইনিনের দাপটে চামাইয়েনের ভুত পলাইয়া গেল। এ দেশের লোকজন প্রায় আদি-বাসীদের মতো। শিক্ষাদীক্ষা তো কিছু নাই, তাহার উপর নানারকম কুসংস্কারের জালে জড়িত। ভাবিলাম ইহাদের জন্য কিছু যদি করিতে পারি তাহা হইলে আমার এখানে ডাক্তারি করা সার্থক হইবে। কিন্তু অনেক অময় আমার সামর্থ্যে কুলাইত না। সবাই প্রায় গরীব। ফী তো দিতে পারেই না ঔষধও অনেক সময় বিনামূল্যে দিতে হয়, অনেক সময় সাগু, বার্লি, পুরাতন চাউল পর্যন্ত দিতে হইয়াছে। এই ধরনের আরও দুই একটি অদ্ভুত রোগীর কথা মনে পড়িতেছে। একবার দিল্লী

দেওয়ানগঞ্জে সেখানকার জমিদারদের বাড়ী গিয়াছি। জমিদার গৃহিণী অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা করিয়া বারান্দায় বসিয়া আছি এমন সময় একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—দেওয়ানজির স্ত্রীকে সাপে কামড়াইয়াছে আপনি শীঘ্র চলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতক্ষণ আগে কামড়াইয়াছে, এখন কেমন আছেন তিনি? সে বলিল—একেবারে শেষ অবস্থা, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, কোনও জায়গায় সাড় নাই। ছুঁচ ফুটাইলেও বুঝিতে পারিতেছেন না। মুখে কুইনিন বা চিনি দিলেও স্বাদ পাইতেছেন না। একেবারে চৈতন্যহীন। বলিলাম—তাহা হইলে আমি গিয়া আর কি করিব। কতক্ষণ আগে কামড়াইয়াছে, জান? সে বলিল—ঠিক বলতে পারি না। তবে ভোরে তিনি নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় কামড়াইয়াছে। জমিদারবাবু এ খবর পাইয়া নিজে গেলেন, আমাকেও বলিলেন—চলুন। হয়তো শেষ অবস্থা, তবু আমাদের যাওয়া কর্তব্য। গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর মধ্যে চারজন লোকে উঠানে বসিয়া খোল করতাল বাজাইতেছে। কাছেই দুটি পায়রা বাঁধা আছে। মা মনসার কাছে বলিদান দেওয়া হইবে। খোল করতাল বাজাইয়া উহারা মা মনসার স্তব-গান করিতেছে শুনিলাম, যদিও গানের ভাষা কিছু বুঝিলাম না। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখি সেখানে আরও ভিড়। দমবন্ধ হইবার যোগাড়। মনে হইল লোক না সরাইলে 'সাফোকেশনেই' রোগী মরিয়া যাইবে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া রোগিণীর কাছে গিয়া তাহার 'পাল্স্' (pulse) দেখিলাম। নাড়ী বেশ ভালোই চলিতেছে, তবে একটু মন্দগতি। কয়েক জায়গায় চিমটি কাটিলাম। কোন সাড় নাই। তবে মনে হইল ভিতরে জ্ঞান আছে। দেখিলাম দুটি লোক খুব জোরে জোরে অবিচ্ছেদে মন্ত্র পড়িতেছে, পাছে মন্ত্রপাঠে কোনও ফাঁক পড়িয়া যায় এইজন্যই দুইজনে একই মন্ত্র পড়িয়া চলিয়াছে। যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে সেখানে 'জহর-মহরা' নামক একটা দ্রব্য দিয়াছে। সেটা লাগিয়া আছে। পিঠে থালা লাগাইয়া আর একজন মন্ত্র পড়িতেছে, পিঠে থালাটা লাগিয়া আছে। যেখানটা বাঁধিয়া দিয়াছে সেখানে দুই তিনটি ভেন্ (vein) খুব প্রমিনেণ্ট (prominent) হইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। আমাকে সকলে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল আপনি ইহার চিকিৎসার ভার লউন। আমি বলিলাম, ইহার আর কি করিব, এ তো প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহারা তবু ছাড়িল না। স্বয়ং দেওয়ানজি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আপনি যা করবার করুন। এরা সকাল থেকে কেবল হাল্লা করছে, ফল তো কিছুই হচ্ছে না!" ভাবিলাম আসিয়াছি যখন, একটা কিছু করি। ব্যাগ হইতে স্ক্যালপেল (Scalpal) বাহির করিয়া একটি prominent veinএ দুই একটা ইনসিসন (incision) দিলাম। গলগল করিয়া কালো রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সেই কাটার উপর খানিকটা কারবলিক এসিডও (Carbolic Acid) লাগাইয়া দিলাম। দেওয়ামাত্র রোগিণী একটা বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। ইহাতে আমিও বেশ ঘাবড়াইয়া গেলাম। রোগিণীর বড় মেয়ে তাহার বুকে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিতে লাগিল ডাক্তার আসিয়া আমার মাকে মারিয়া ফেলিল। ওঝা দুইজন তারস্বরে বলিল—আমরা বিষ প্রায় নামাইয়া আনিয়াছিলাম ডাক্তার আসিয়া সব পণ্ড করিয়া দিল। এখন আর রোগীকে বাঁচানো শক্ত। ঘরের মধ্যে বহু নারীকণ্ঠে একটা তুমুল ক্রন্দনরোল উঠিল।

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়। মনে হইল একটা দুস্তর সমুদ্রের মধ্যে আমি যেন একটা দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া আছি। পলাইবার উপায়ও নাই, দরজা দিয়া ক্রমাগত পাড়ার মেয়ে-পুরুষ ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে।

ভাবিলাম আর একবার নাড়ীটা দেখি। বুকের উপর হইতে মেয়েটাকে সরাইয়া অতিকষ্টে নাড়ীটা পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম নাড়ী ভালোই আছে, আগে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার চেয়েও ভালো। তখন আমি জোর দিয়া বলিলাম, তোমরা সরিয়া যাও, ঘরে হাওয়া আসিতে দাও, দেওয়ানজির স্ত্রী মরেন নাই, বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু তোমরা না সরিলে আমি চিকিৎসা করিতে পারিব না। সকলে বাহিরে চলিয়া যাও। দেওয়ানজি তখন শশব্যস্ত হইয়া নিজেই সকলকে বাহির করিয়া দিলেন। দেখিলাম রোগিণীর দাঁত-কপাটি লাগিয়া গিয়াছে, ফিটের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। চোখে মুখে জোরে জোরে জলের ছিটা দিয়া খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে বলিলাম। দাঁতের উপর দাঁত কিন্তু বসিয়াই রহিল, কিছুতেই খোলে না। স্মেলিং সল্টের শিশি খুলিয়া নাকে ধরিলাম। তখন জ্ঞান হইল। তখন আমি বলিলাম, মা তুমি তো ভালো হইয়া গিয়াছ, ছুরি দিয়া কাটিয়া আমি সমস্ত বিষ বাহির করিয়া দিয়াছি। 'ভেন' (vein) কাটিয়া দিতে প্রচুর কালো রক্ত বাহির হইয়া চাপ বাঁধিয়া মেঝেতে পড়িয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল আর ভয় নাই, সত্যই বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে। অমন কালো রক্ত! তখন আমি দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইঁহার পূর্বে কখনও হিস্টিরিয়া হইয়াছিল কি না। তিনি বলিলেন—আমার একটি মেয়ে কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে তাহার পর হইতে উঁহার মাঝে মাঝে 'ফিট' হয়। তখন আমি রোগিণীকে বলিলাম—মা তুমি তো ভালো হইয়া গিয়াছ, এইবার উঠিয়া বস। রোগিণী উঠিয়া বসিল। আরও কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের দরজায় আসিয়া ভিড় করিয়াছিল, আমি জবরদস্তি সকলকে উঠানে বাহির করিয়া দিলাম। তাহার পর রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি সাপটাকে সত্যই কামড়াইতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, না কামড়াইতে দেখি নাই। আমি ভোরে নদীতে স্নান করিতে যাইতেছিলাম। নদীর উঁচু পাড় হইতে সরু রাস্তা দিয়া আমি নদীর দিকে নামিতেছিলাম এমন সময় একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ ফণা বিস্তার করিয়া পাশের ঝোপ হইতে বাহির হইল এবং আমার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া যাই এবং পায়ে কিসের একটা আঘাত অনুভব করি। সকলে ধরাধরি করিয়া আমাকে বাড়ীতে লইয়া আসে। তাহার পর আমি আর কিছুই জানি না। যেখানটায় 'জহর-মহরা' বসাইয়াছিল সেখান হইতে জহর-মহরা তুলিয়া স্থানটি পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম সাপে কামড়াইবার কোন চিহ্ন নাই, একটা খোঁচা-লাগা ক্ষতের মতো রহিয়াছে। বোধহয় যখন তিনি ঘাটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান তখনই কোন পাথরে খোঁচা লাগিয়াছিল। ক্রমশঃ তাঁহার অনুভূতি সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ তিনি চিনি ও কুইনিনের পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন, চিমটি কাটিলে 'উঃ' করিয়া উঠিলেন।

হিস্টিরিয়া রোগীরা অনেক সময় যাহা মনে করে সেই সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। যেই তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন যে রক্তের সঙ্গে সব বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে অমনি তিনি সুস্থ হইলেন। অনেক সময় 'শক্'-এই (shock) হিস্টিরিয়া রোগীদের মৃত্যু

পর্যন্ত হয়। ভগবানের কৃপায় দেওয়ানজির স্ত্রী বাঁচিয়া গেলেন। আমারও খুব একটা নাম হইয়া গেল। ক্রমশঃ এই অঞ্চলেও আমার প্র্যাকটিস প্রতিষ্ঠিত হইল। দেওয়ানজি আমার একজন পরম হিতৈষী হইয়া উঠিলেন।

আর একটি এরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। হঠাৎ একদিন মেদিনীপুরের বল্লভ মৌয়ার ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি একজন বড় গৃহস্থ, কিছু জমিদারিও কিনিয়াছিলেন। একটি পালকি আসিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেল। বল্লভ মৌয়ারের কিন্তু দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তিনি অন্দরে আছেন। আমাকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিলেন। তাঁহার এক গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাহার অসুখ? তিনি বলিলেন—বাবুসাহেবের গাড়োয়ানের স্ত্রী কাল রাত্রে একটি মরা ছেলে প্রসব করিয়াছে, তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইতেছে না। আমি বলিলাম—তাহা হইলে এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা তো অনুচিত, আমাকে সেই গাড়োয়ানের বাড়ী লইয়া চলুন। এমনিতেই অনেক দেরি হইয়াছে, আর দেরি করিলে তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না। এই বলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। গোমস্তাটি একটি চাকর সঙ্গে দিলেন, সেই আমাকে সঙ্গে করিয়া গাড়োয়ানের বাড়ীতে লইয়া গেল। বাড়ীটি একেবারে গ্রামের প্রান্তে। হাঁটিয়া যাইতে প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগিল। পথে নেকি মাড়োয়ারির সহিত দেখা। কিছুদিন পূর্বে সে তাহার পুত্রের সর্দিজ্বরের ঔষধ আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিল। পুত্রটি ভালো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও দুর্বলতা কাটে নাই। তাই সে একটি 'টোনিক্' লইবার জন্য আমার কাছে যাইবে ভাবিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখানেই যখন আমার সহিত দেখা হইয়া গেল তখন আমি যদি দয়া করিয়া—। তাহাকে বলিলাম—আমি একটি শক্ত রোগী দেখিতে যাইতেছি, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, সেখানেই আপনাকে একটা প্রেসক্রিপসন্ (prescription) লিখিয়া দিব। নেকি মাড়োয়ারিও আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। ভাগ্যে আসিয়াছিল। রোগীর ঘরে ঢুকিয়া দেখি দুইজন 'চামাইন' (চামারনী) রোগিণীর পেট মলিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ঘরের মেঝে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে, কাপড়চোপড়ও রক্তে ভিজা। রোগিণীর নাড়ি অতি ক্ষীণ। অবিলম্বে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে বাঁচিবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার বাক্স হইতে রক্ত বন্ধ করিবার একটা ইন্‌জেকশন দিলাম। সহসা একটা দুর্গন্ধ উঠিল—মাংস পোড়া গন্ধ। জিজ্ঞাসা করিলাম—গন্ধ কিসের? একজন বলিল যে 'চামাইন' ইহাকে প্রসব করাইয়াছে সে একটা 'তুক্' করিতেছে। কি তুক্? ও ঘরে বসিয়া সে নাকি রোগিনীর 'ফুল'টা—ডাক্তারি নাম প্ল্যাসেণ্টা (placenta)—একটা কড়ায় চড়াইয়া তেলে ভাজিতেছে। ইহাতে নাকি রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। অবাক হইয়া গেলাম। আমি তো ইন্‌জেকশন দিয়াইছিলাম, মনে হইল এইবার ভালো করিয়া 'প্লাগ' (plug) করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু অত স্টেরাইল (sterile) ব্যাণ্ডেজ বা 'গজ' (gauge) তো আমার সঙ্গে আনি নাই। তখন নেকি মাড়োয়ারিকে কাজে লাগাইলাম। বলিলাম—আপনি এখনি ছুটিয়া গিয়া আপনার দোকান হইতে পাতলা একখান ব্যাণ্ডেজের কাপড় পাঠাইয়া দিন। সে বলিল—ব্যাণ্ডেজের কাপড় আমার দোকানে নাই। আমি তখন বলিলাম, যে কোনও প্রকার পাতলা কাপড়েই কাজ চলিবে। এমন কি পরনের কাপড় হইলেও চলিবে। আপনি তাড়াতাড়ি চলিয়া যান। কাপড়ের দাম যা

লাগে আমি দিব। শীঘ্র চলিয়া যান। নেকিরাম চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ছুটিতে ছুটিতে কিছু পাতলা কাপড় আনিয়া হাজির করিল। তখন আমি কাপড়গুলি ফালা ফালা করিয়া চিরিয়া ফেলিলাম। বাড়ীর লোকেদের বলিলাম একটা পরিষ্কার হাঁড়ি চাই। তাহারা গরীব লোক, মাটির হাঁড়িতে রান্না করে। পরিষ্কার হাঁড়ি নাই। নেকিরামই ছুটিয়া গেল এবং আমার ফরমাশ মতো একটি বড় পিতলের ডেকচি এবং একটা বড় চামচ লইয়া আসিল। পাশের ঘরে 'চামাইন' ফুলটা ভাজিতেছিল। তাহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার আর কত দেরি? সে বলিল, হইয়া গিয়াছে। এইবার রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। আমি বলিলাম, আমাকে উনুনটা খালি করিয়া দাও, আমি গরম জল চড়াইয়া দিব। আমি ভাবিয়াছিলাম সে আমার বিরোধিতা করিবে! কিন্তু আমাকে দেখিয়া হঠাৎ সে গড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, আপনি ডাক্তারবাবু আমার মুখ-রক্ষা করুন। আপনি আমার মেয়েকে বাঁচাইয়াছিলেন। কবে বাঁচাইয়াছিলাম, তাহা মনে পড়িল না। গরীব চামাইনটার মুখে একটা আশংকার ছায়া পড়িয়াছে দেখিলাম। এ রোগিণীটি যদি মারা যায় তাহা হইলে আর কেহ তাহাকে ছেলে প্রসব করিতে ডাকিবে না। বল্লভ মৌয়ার এ অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং এই গাড়োয়ানটি তাহার অতি প্রিয়-জন। বল্লভ মৌয়ার ইহার সেবায় এবং বাক্‌পটুতায় এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে ইহার কথাতেই ওঠেন বসেন। নিমু গাড়োয়ানই তাঁহার বন্ধু ও পরামর্শদাতা। ভাই ভাইপো গৃহিণী কাহারও কথায় ইনি কর্ণপাত করেন না, কিন্তু নিমু গাড়োয়ানের কথায় করেন। নিমু গাড়োয়ানের স্ত্রী মরিয়া গেলে 'চামাইন'টি সত্যই বিপদে পড়িয়া যাইবে। তাহাকে বলিলাম, তুমি ভালো করিয়া উনুনটা ধরাইয়া তাড়াতাড়ি জল চড়াইয়া দাও, আর তাহাতে এই কাপড়ের টুকরাগুলা ও চামচেটা ফুটাইয়া দাও। এখনও আশা আছে। এগুলো গরম জলে অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটিবে। তুমি উনুনটা ভালো করিয়া ধরাইয়া ফেল দিকি। চামাইন তৎপর হইয়া উঠিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাঁড়ির জল ফুটিতে আরম্ভ করিল। আধঘণ্টা ফুটাইয়া তাহার পর সেটি ঠাণ্ডা করিতেও বেশ কিছু সময় লাগিল। আমার বাক্সে খানিকটা ব্যাণ্ডেজ ছিল, আমি সেটাকেই স্পিরিটে ভিজাইয়া আঙুলের সাহায্যে যতটা পারিলাম ভিতরে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহাতেই একটু কাজ হইল। তাহার পর ফোটানো কাপড়গুলি ঠাণ্ডা হইলে চামচের বাঁট দিয়া খুব ঠাসিয়া 'প্লাগ' (plug) করিয়া দিলাম। রোগিণীর নাড়ী বড় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে ব্র্যাণ্ডি সহযোগে গরম দুধ একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। নিমু গাড়োয়ান একটি কথাও বলে নাই। সে সারাক্ষণ হাতজোড় করিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিলাম—তোমার স্ত্রী যদি বাঁচে তাহা হইলে তাহার পুনর্জন্ম হইল বুঝিতে হইবে। এই চামাইন অনেক মেহনত করিয়াছে। এ না থাকিলে আমি একা সামলাইতে পারিতাম না। বেচারী যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে। চামাইনটির চোখে সভক্তি কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সে আবার আমার পদধূলি লইল। ভবিষ্যতে আমার নিজের ছেলে-মেয়ে হইবার সময় বরাবর এই চামাইনকেই আমি ডাকিয়াছি। প্রসব অবশ্য আমি নিজে করাইতাম, কিন্তু আঁতুড়ের সব ভার উহার উপরই থাকিত। কাপড়-চোপড় কাচা, ছেলেকে তেল মাখানো, পোয়াতীর পায়ে কোমরে পিঠে তেল মালিশ করা সব সে-ই করিত। পুরা এক মাস ধরিয়া আঁতুড়ঘরে থাকিত সে। এক মাস পরে

আঁতুড় তুলিয়া দুই সের চাল একটি শাড়ি এবং দুইটি টাকা লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া যাইত। অবশ্য একমাসের খাওয়া আমিই তাহাকে দিতাম। আঁতুড়ঘরের একধারেই সে শুইত। মাঝে মাঝে মাসে অন্ততঃ দুইবার করিয়া সে হাসিমুখে আসিত নুনু (শিশু) কেমন আছে দেখিবার জন্য। তখনও দুই চারি আনা বকশিস্ পাইত সে। সে আমাদের ঘরের লোক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে আমরা 'দাই' আখ্যা দিয়াছিলাম।

নিমু গাড়োয়ানের বাড়ী হইতে ফিরিয়া দেখিলাম বল্লভ মোয়ার তখনও অন্দর হইতে সদরে আসিয়া পেঁাছিতে পারেন নাই। খুব নিড়বিড়ে লোক ছিলেন তিনি। কোথাও যাইবার জন্য বা কাহারও সহিত দেখা করিবার জন্য চট্ করিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের মনোমতভাবে ভদ্রপরিবেশে সাজিয়া বাহির হইতে বেশ দেরি হইত। কোথাও বাহির হইবার আগে তিনি সুগন্ধি সাবান যোগে গরম জলে স্নান করিতেন। তাহার পর গা মুছিয়া মাথায় ফুলেল তেল এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে গোলাপী আতর লাগাইতেন। তাহার পর তাঁহার তৃতীয় পত্নী কেয়ারি-করা বাবরি চুলগুলি সুন্দর করিয়া আঁচড়াইয়া দিত। তাহার পর তিনি কিছু ক্ষীর খাইতেন। কোথাও যাইবার পূর্বে—এমন কি অন্দর হইতে সদরে আসিবার সময় তিনি কিছু 'জলখই' (জলখাবার) খাইয়া তবে বাহির হন। ক্ষীরের সহিত লাড়ু তাঁহার প্রিয় খাদ্য। আমি গিয়া পেঁাছিবার প্রায় মিনিট পনেরো পরে বল্লভ মোয়ার বাহিরে আসিলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ তিনি। মাথাটা প্রকাণ্ড। কেয়ারি-করা বাবরি চুল সিংহের কেশরের মতো। একটি চুনোট-করা আদ্দির পাঞ্জাবি ও গোলাপী রঙের একটি শৌখিন কাপড় পরিয়াছেন দেখিলাম। পায়ে কার্পেটের পামশু। তাঁহার পিছু পিছু প্রকাণ্ড এবং সুদৃশ্য একটি রূপার পানের ডিবা বহন করিয়া তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনীর মতো যে রূপসী কিশোরীটি আসিল শুনিলাম সে নাকি বল্লভ মোয়ারের কনিষ্ঠ শ্যালিকা। বল্লভ মোয়ার আমাকে ঝুঁকিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমার প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইল, সেজন্য ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে ডাকিয়াছিলাম নিমুর স্ত্রীর জন্য। তাহাকে একবার দেখিয়া আসুন। গতরাত্রে একটা মরা ছেলে প্রসব করিবার পর হইতে সে কেমন যেন বেহালত্ (অসুস্থ) হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়ি যাহা লাগে সব আমি খরচ করিব। আমি বলিলাম—আমি তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি এবং সব ব্যবস্থা করিয়াছি। অবস্থা খুব ভালো নয়, কিন্তু ভগবান দয়া করিলে বাঁচিয়া যাইবে। আমার এখন আর কিছু করিবার নাই। কয়েকটি ইনজেকশন লিখিয়া দিতেছি। সেগুলি কাটিহার বা সাহেবগঞ্জ হইতে আনাইয়া রাখুন। ঔষধ আসিলে আমি ইনজেকশন্ দিয়া যাইব। বল্লভ মোয়ার বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। বলিলেন, ইহার মধ্যেই আপনি সব কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনার ক্ষমতার প্রশংসা করিতেছি। আমাদের 'কিসমত্' (ভাগ্য) খুব ভালো যে আপনার মতো 'ডাকটার' আমাদের এখানে প্র্যাকটিস করিতে বসিয়াছেন। আমাকে কুড়ি টাকা 'ফী' দিতে গেলেন। আমি বলিলাম, রোগী আগে বাঁচুক তখন ফীয়ের কথা ভাবিব। পুলকিত বল্লভ মোয়ার বলিলেন—বেশ তাহাই হইবে। এখন একখিলি পান খান তাহা হইলে। কিশোরীটিকে ইঙ্গিত করিতেই সে বাটা খুলিয়া এক খিলি সুগন্ধি পান বাহির করিয়া দিল। বল্লভ মোয়ারের বাটাতে তিন চার রকম ভালো পান, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ,

কিমাম জরদা ও খৈনি থাকে। একটি ছোট সুদৃশ্য জাতিও আছে দেখিলাম। নিজের হাতে সুপারি কুঁচাইয়া খাওয়া তাঁহার আর একটি বিলাস। পান খাইয়া উঠিতে যাইতেছি এমন সময় বল্লভ মোয়ার হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সামান্য কিছু ভেট আপনার সঙ্গে পাঠাইতেছি এটা দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। প্রশ্ন করিলাম, কি ভেট? বলিলেন, এখনি আমার 'কামত্' (চাষ বাড়ী) হইতে কিছু ভালো দই ও ঘি আসিয়াছে। আপনি কিছু লইয়া যান। আমার পালকির পিছনে একজন লোক দই ও ঘি লইয়া আসিতে লাগিল। হাতে ঘিয়ের ভাঁড়, মাথায় দইয়ের হাঁড়ি। এ ধরনের ঘটনা এখন বিরল হইয়া আসিয়াছে, আগে কিন্তু মোটেই বিরল ছিল না। তখন সম্পন্ন গৃহস্থরা এবং জমিদাররা আশপাশের ভদ্রলোকদের এবং অফিসারদের প্রচুর উপঢৌকন দিতেন। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু মহলদারদের নিকট হইতে এত মাছ পাইতেন যে আমার বাড়ীতে প্রত্যহ একটা করিয়া পাকা মাছ পাঠাইয়া দিতেন। আমিও সকলকে বিতরণ করিতাম। আজকাল দেশের সে ঐশ্বর্য আর নাই। এখন অধিকাংশ লোকেরই নুন আনিতে পান্তা ফুরাইয়া যায়। হৃদয়ের প্রসারতাও কমিয়া গিয়াছে। যন্ত্রসভ্যতাই বোধহয় ইহার কারণ। এখন প্লেনযোগে পূর্ণিয়ার মাছ-দুধ-ঘি কলিকাতা বোম্বাই তো বটেই আরও দূরদূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে। আগে আমরা ডাকাত পড়িলে তাহাদের লাঠিসোঁটা বন্দুক লইয়া ঠেকাইতাম, কিন্তু ট্রেন, বাস বা এরোপ্লেনরূপী ডাকাতদের তাড়াইবার সামর্থ্য আমাদের নাই। বর্গীরা নূতন রূপে দেশে দেশে হানা দিয়া ফিরিতেছে। ইহাদের কেন্দ্র করিয়া কতরকম কালো-বাজার, কতরকম আঙুল-ফুলিয়া-কলাগাছ-হওয়া, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা। এই ডাকাতদের আমরা মানিয়া লইয়াছি। সুতরাং আমাদের দরিদ্র দেশের দুর্দশা বাড়িতেই থাকিবে। আমাদের গঙ্গার ইলিশ—যাহা টাকায় আটটা করিয়া পাওয়া যাইত—তাহা এখন বহুমূল্যে ক্রীত হইয়া বিদেশে বিলাতী রেফ্রিজারেটারে শোভা পাইতেছে। ধনীরাই এখন ভোক্তা, দরিদ্রেরা বঞ্চিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ (Charles Dickens) ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনকে ব্যঙ্গ করিয়া 'হার্ড টাইমস্' নামে একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমি বইটি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাদৃশ পটু ছিলাম না বলিয়া বইটির সম্পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু যতটুকু পারিয়াছিলাম ততটুকুতেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে টাকা, আনা, পয়সার দিকে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ষোল আনা লোভ, তথাকথিত যুক্তির (reason) দিকে প্রবল প্রবণতা, হৃদয়াবেগকে বর্জন করিয়া কেবল স্বার্থের পিছনে ছোটা—এসব করিলে শেষ পর্যন্ত সুখও হয় না, মঙ্গলও নাই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দানবের শোষণ হইতে সনাতন মনুষ্যত্ব মাথা চাড়া দিয়া উঠিবেই। কিন্তু কবে উঠিবে কে জানে! আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনীরা কি এ ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারিবে? আমরা কিন্তু তখন যে যুগে বাস করিতাম তাহা স্বর্ণযুগ ছিল। মনুষ্যত্ব একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই, শ্রদ্ধা-প্রেম-ভালোবাসাকে লোকে মূল্য দিত, খাদ্যদ্রব্যও প্রচুর ছিল।

ভগবানের কৃপায় নিমু গাড়োয়ানের স্ত্রী ভালো হইয়া গেল। একটি antitetanic serum এবং গোটা তিনেক streptccoccal serum দিতে হইয়াছিল।

এ ধরনের বিচিত্র রোগী আমার প্রায়ই জুটিত। ডাক্তারি বিদ্যার সহিত

প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রচুর সহৃদয়তাই ছিল আমার সম্বল। আমি রোগীকে প্রচুর আশ্বাস দিতাম এবং বলিতাম ভগবানকে ডাক, পীরবাবাকে মানত কর, সব ঠিক হইয়া যাইবে। অধিকাংশই ঠিক হইয়া যাইত।

আমার বাড়ীতে এদিকে থিয়েটারের রিহার্সাল খুব জমিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত গান-বাজনা রিহার্সাল চলিত। আমি কিন্তু তাহাতে বড় একটা যোগ দিতে পারিতাম না। এই সময়কার দু'একটি ঘটনা কিন্তু এখনও মনে আছে। আমি শংকরা হইতে ফিরিবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই থিয়েটার-পার্টি একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করিলেন। সে প্রহসন খুব জমিয়া উঠিল সুখলাল পাঁড়ে বলিয়া একটি রেলের পয়েন্টসম্যানের জন্য। সুখলাল ভোজপুরবাসী। ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলিতে পারিত। ছোকরার তাগড়া চেহারা। এই জন্যই জগন্নাথবাবু তাহাকে একটি ক্ষত্রিয় দূতের ভূমিকা দিয়াছিলেন। দূতের বক্তব্যও বিশেষ কিছু ছিল না। কেবল বলিতে হইবে—'রাজা এখুনি আসছেন'। কিন্তু সুখলাল স্টেজে হতভম্ব হইয়া বলিয়া ফেলিল —'রাজা কাঁহা গিয়া চলি'। বলিয়াই মুচকি হাসিয়া পলায়ন করিল।

ত্রিপুরারি সিং থিয়েটার দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, সুখলালের অভিনয়ই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে আমি মেডেল দিব।

ত্রিপুরা সিংহের থিয়েটারের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া জগন্নাথবাবু আর এক কাণ্ড করিলেন। একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। 'জয় জয় জয় জয় ত্রিপুরারি, জয় জয় মুকুন্দ মুরারি। আমরা এসেছি মনিহারী, সাহায্য কর কিছু হে শক্তিধারী'। মন্মথ গলায় হার্মোনিয়ম ঝুলাইয়া তাঁহার কাছারির সামনে গিয়া মধুর কণ্ঠে গানটি গাহিতে লাগিল। কেশ মশাই হাতে একটি একতারা লইয়া পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল।

ত্রিপুরারি সিংহ জোড়হস্তে তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি সাহায্য চান আপনারা ?"

জগন্নাথবাবু বলিলেন—"আমাদের একটি স্টেজ করিয়া দিন। আপনার অনেক তক্তা আর 'স্লীপার' পড়ে আছে। আপনি অনুমতি দিলে ওগুলোর সাহায্যে আমরাই স্টেজ বানিয়ে নেব। কাল আমরা স্টেশনের স্লিপার নিয়ে অভিনয় করেছিলাম। শুনছি এজন্য নাকি শ্যামবাবুর নামে ওপরে রিপোর্ট চলে গেছে। একটি বাঙালী ছোকরাই নাকি রিপোর্ট করেছে। সে পার্ট চেয়েছিল, আমরা দিতে পারিনি। শ্যামবাবু ভদ্রলোক তাঁকে আমরা আর বিপন্ন করতে চাই না।" ত্রিপুরারি সিংহ বলিলেন—"এ আর বেশী কথা কি। তৈরি করুন আপনার স্টেজ। রায়মশায়ও এসে গেছেন, তাঁকে বলে দিচ্ছি।" ডাকিবামাত্র একচক্ষু রায় মহাশয় বাহিরে আসিলেন। ত্রিপুরাবাবু তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন—"এদের ছেলেমানুষী কাণ্ড দেখুন। দেশে গমের ফলন ভালো হয়নি সে চিন্তা না করে ও'রা থিয়েটার করতে যাচ্ছেন। ও'দের একটা স্টেজ করিয়ে দিন। এবার কি বই নাবাচ্ছেন ?" জগন্নাথবাবু সগর্বে বলিলেন— "'জনা', ডাক্তারকে প্রবীরের পার্ট দিয়েছি আমরা—"

ত্রিপুরা সিংহ পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া জগন্নাথবাবুকে দিলেন।

"এই নিন, সুখলালকে একটা মেডেল কিনে দেবেন—"

একচক্ষু রায় মহাশয় কোনও মন্তব্য করিলেন না, মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ত্রিপুরারি এই মাথায়-হাত-বোলানোর অর্থ কি তাহা জানিতেন।

"আপনার কি আপত্তি আছে কোন।"

রায় মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপত্তি নেই। আমিও কাল পিছনের দিকে বসে ওঁদের থিয়েটার দেখেছি। ওঁরা খুব উঁচুদরের অভিনেতা। আমি আইনের দিক দিয়ে ব্যাপারটা চিন্তা করছি। এখানকার জমিদারিতে আরও দুজন জমিদারের অংশ আছে। বল্লভ মোয়ার অবশ্য কিছু বলবেন না। কিন্তু টেলার সাহেব বলতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের টক্কা-টক্কি চলছে এবং আরও কিছুদিন চলবে।"

ত্রিপুরা সিংহ প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ছিলেন।

বলিলেন, "আমার যে খাস জমি আছে তাতেই ওঁরা স্টেজ তৈরি করুন। তাতে তো কোন বাধা হবে না—"

"আজ্ঞে না—"

"তাহলে সেই ব্যবস্থাই করে দিন। গঙ্গার ধারে আমার অনেক খাস জমি আছে। যেটা ওঁদের পছন্দ সেইখানেই ওঁরা স্টেজ বাঁধুন—"

পনেরো দিনের মধ্যে গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর স্টেজ বাঁধা হইয়া গেল। ত্রিপুরা সিংহই সব খরচ বহন করিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একটি সিপাহী মোতায়েন করিয়া স্টেজটা পাহারা দিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন।

আমি প্রশ্ন করিলাম—পাহারা দিবার প্রয়োজন কি? ত্রিপুরাবাবু বলিলেন—খুব প্রয়োজন। এখানকার লোকরা ভয়ানক চোর। পাহারা না থাকিলে ওই ফাঁকা মাঠের মাঝখান হইতে স্লীপার তক্তা সব একে একে সরিয়া যাইবে। আমার এত সিপাহী কাছারিতে বসিয়া বসিয়া ডালরুটি খাইতেছে, একজন ওখানে পাহারা দিক না। আমার প্রকাণ্ড বড় একটা 'তিরপল' আছে, স্টেজের উপরটায় একটা আচ্ছাদনও করিয়া দিব। সিপাহীটা রাত্রে স্টেজের উপর শুইতেও পারিবে। উহাকে বলিয়া দিয়াছি, একটি জিনিস যদি হারায় তাহা হইলে তোমাকে আস্ত রাখিব না।

সুন্দর স্টেজ হইয়া গেল। সেখানে বর্ষাকালে আমরা অবশ্য অভিনয় করিতে পারিতাম না। অন্যান্য ঋতুতে অভিনয় বেশ জমিত। অভিনয় প্রায় রবিবারে হইত। কারণ সাহেবগঞ্জের পার্টি আসিয়া অভিনয়ে যোগ দিত। তাহাদের অধিকাংশই চাকুরে। সোমবার সকালের স্টীমারে তাহারা ফিরিয়া যাইত।

আমাকে অবশেষে একদিন চাঁচল যাইতে হইল। তাঁহাদের সাগ্রহ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। চাঁচলের যিনি বড়বাবু তাঁহার সহিত ইতিপূর্বে আমার দেখা হয় নাই। গতবারে আমি যখন গিয়াছিলাম তখন তিনি কাশীতে ছিলেন। শুনিয়াছিলাম লোকটি ঘোর মদ্যপ। সব সময়েই মদ খান। এবার আমি যখন গিয়া পেঁছিলাম তখন রাত্রি দেড়টা। ট্রেন 'লেট' ছিল। স্টেশনে আমার জন্য ম্যানেজারবাবু পালকি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। জমিদারবাবুর প্রাসাদতুল্য ভবনে নীচের তলায় আমার জন্য একটি ঘর আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে দেখিলাম আমার জন্য একটি সুসজ্জিত শয্যা এবং একটি চাকর অপেক্ষা করিতেছে। আমি শুইতে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন, বড়বাবু আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য জাগিয়া আছেন। আপনার খাবার লইয়া ঠাকুর

এখনি আসিতেছে। আপনি হাত মুখ ধুইয়া ফেলুন। হাত মুখ ধুইবার প্রায় রাজকীয় ব্যবস্থা করাই ছিল। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ভাল সুগন্ধি সাবান, লোমওয়ালা তোয়ালে সবই ছিল। মুখ হাত ধোয়ার পরই একটি চাকর দুইটি দামী কার্পেটের আসন বিছাইয়া দিয়া গেল। তাহার পরই একটি কার্পেটের সামনে প্রকাণ্ড বড় থালায় গরম লুচি এবং অনেকগুলি বাটিতে নানারকম তরকারি লইয়া জন কয়েক মৈথীল ঠাকুর হাজির হইল। ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনি এবার খেতে বসে যান। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

আমি বলিলাম, "এত রাত্রে আমি আর কিছু খাব না ভেবেছিলাম—কিন্তু এত খাবার করিয়েছেন কেন! ম্যানেজার সংক্ষেপে বলিলেন, "বড়বাবুর হুকুম! ওই যে উনি আসছেন—।"

একটি নাতিদীর্ঘ কৃষ্ণকায় লোক প্রবেশ করিলেন। গায়ে জামা নাই। মাথার চুল কদম-ছাঁট। আসিয়া তিনি সসম্ভ্রমে আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনার অন্তরের পরিচয় আমি অনেকদিন আগে পেয়েছি। আজ বাইরের চাক্ষুষ পরিচয় করব। খেতে বসে যান। ঠাকুর একটি একটি করে গরম লুচি ভেজে নিয়ে এস—।" খাইতে বসিলাম। তিনিও আসনটা আমার আর একটু কাছে আগাইয়া আনিলেন। তখন টের পাইলাম তিনি মদ খাইয়া রহিয়াছেন। দেখিলাম চক্ষু দুইটি বেশ লাল। কিন্তু চক্ষুর দৃষ্টি ভয়ংকর নহে, দুষ্ট বালকের দৃষ্টির মতো। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, "আপনি যে মোটা দুজনকে সারিয়েছেন এতে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি। প্রায় অসাধ্যসাধন করেছেন আপনি। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে আছে। আমাদের বাড়ীর সামনে একবার প্রকাণ্ড একটা গাছ ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। গাছটা পড়েই ছিল। হঠাৎ একদিন একটা গাঁট্টাগোঁট্টা গোছের বেঁটে লোক বাবার কাছে এসে বলল—হুজুর গাছটা আমাকে যদি দান করেন তাহলে গরীবের বড় উপকার হয়।

বাবা বললেন—গাছটা দিতে তোমাকে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যখন গরীব তখন ওটাকে নিয়ে যাবে কি করে? ওর ডালগুলো কাটতে হবে, তার পর গাড়ি করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে সব পারবে কি? আমি ভেবেছিলাম নিজেই ওটাকে কাটিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। তুমিও এসে সে সময় কিছু নিয়ে যেও।

গাঁট্টাগোঁট্টা লোকটা বলল—হুজুর যদি হুকুম দেন আমি দাঁতে করে টেনে সমস্ত গাছটাকে নিয়ে যেতে পারি। শুনে বাবা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তা যদি পার, নিয়ে যাও। তার পরদিন লোকটা একটা মোটা শক্ত দড়ি এনে গাছটার গুঁড়িতে বাঁধল। তারপর দাঁত দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড গাছটাকে। বাবা তাকে এর জন্য দশ টাকা বকশিসও দিলেন। আপনিও প্রায় সেইরকম অসাধ্যসাধন করেছেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে দুষ্ট বালকসুলভ দৃষ্টিটি চকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—আমার অসুখটি সারাতে পারেন? জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার আবার কি অসুখ?

তিনি সংক্ষেপে বলিলেন—মদ। ভূতের মতো চব্বিশ ঘণ্টা ঘাড়ের উপর চড়ে আছে, কিছুতে নাবাতে পাচ্ছি না। আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, চেষ্টা করলেই পারবেন। মানুষের শক্তি অসীম, সে ইচ্ছা করলে সব করতে

পারে। আপনি কাল থেকেই যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে কিছুতেই আর মদ খাবেন না তাহলেই হয়ে গেল। প্রথম প্রথম একটু হয়তো কষ্ট হবে—। বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন —কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নেই। সেই হয়েছে মুশকিল। ঘোড়ার মুখে লাগাম টেনে ধরতে পারি, নিজের মনের মুখে লাগাম দিতে পারি না। ব্যাধি ওইখানেই। আবার তাঁহার চোখে সেই দুষ্টু-দুষ্টু দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—বেশ আমি আপনাকে একটা মিকশ্চার তৈরি করে দিয়ে যাব, যখন খুব কষ্ট হবে এক দাগ খাবেন। তাতেই অনেকটা ভালো বোধ করবেন। মদ কিন্তু কাল থেকে খাওয়া বন্ধ করে দিন।

অত রাত্রে সেদিন ভুরিভোজন হইল। বড়বাবু আমাকে খাওয়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া নিজে দাঁড়াইয়া মশারিটি ভালো করিয়া গুঁজাইয়া তবে গেলেন। মদে চুর হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটুও বেচাল দেখিলাম না। যাইবার আগে প্রশ্ন করিলেন, আপনার ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা কাল দেবেন? বলিলাম, না আমি প্রেসক্রিপশন দেব দেব না। নিজে হাতে ওষুধ বানিয়ে দেব। প্রেসক্রিপশন দিলে আপনি বার বার ওই ওষুধ বানিয়ে আনবেন। তখন মদের বদলে ওই প্রেসক্রিপশনই আপনার ঘাড়ে চড়বে। সেটি হতে দিচ্ছি না। আমি কুড়ি দাগ ওষুধ নিজে আপনাকে বানিয়ে দেব। দরকার হয় তো আবার আমার কাছে লোক পাঠাবেন। আবার তাঁহার চোখে সেই দুষ্টু-দুষ্টু হাসি ফুটিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন—বেশ, তাই হবে।

সকালে উঠিয়া দেখিলাম বাড়ীর সামনে একটা ভিড় জমিয়া আছে। কিন্তু অন্দর হইতে একটি ভৃত্য আসিয়া বলিল—আপনি আগে ভিতরে চলুন। আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। ভিতরে গিয়া দেখিলাম আমার পুরাতন রোগী-রোগিণীর সত্যই আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। যে স্থূলকায় ভদ্রলোকটি স্থবির চর্বির স্তূপ ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমি চিনিতেই পারি নাই। তিনি সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবকের চেহারা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আমাকে চিনতে পারছেন? আমি এখন রোজ দশ মাইল হাঁটি। ভাত রুটি চিনি ছেড়েছি! কেবল তরকারি, মাছ আর দুধ খাই।

একটি বৃদ্ধা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—আমার অসুখটি বাবা তোমাকে সারিয়ে দিতে হবে। অসুখের ইতিহাস ও বিবরণ শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল তাঁহার জরায়ুতে ক্যানসার হইয়াছে। বলিলাম—আপনি কলিকাতা চলিয়া যান, সেখানে কেদার দাসকে দেখান। আমি এ অসুখের ভার লইতে পারিব না। কারণ যে অসুখ বলিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে তাহা সারাইবার ঔষধ আমার কাছে নাই। কলিকাতার বড় ডাক্তাররা হয়তো অপারেশন (operation) করিয়া কিছু করিতে পারেন। আপনার কলিকাতায় যাওয়াই উচিত।

ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি কোথাও যাব না। তোমারই চিকিৎসায় থাকব। তুমি যা ওষুধ দেবার দাও, ভগবানের যদি দয়া হয় ওতেই ভালো হব, তা না হলে মরে যাব। মরতে আমার ভয় নেই। এই ধরনের অতি-বিশ্বাসী রোগী লইয়া মাঝে মাঝে বিপন্ন হইয়াছি। বলিলাম, ওষুধপত্র কিনবার জন্য কয়েকদিন পরে হয়তো আমাকে কলকাতা যেতে হবে, তখন আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। সেখানে বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করব। ততদিন একটা ওষুধ দিচ্ছি, খান। সেই ঔষুধ খাইয়াই বুড়ি ভালো হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে আর

কলিকাতা যাইতে হয় নাই। আমার ডাক্তারি-জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার চিকিৎসার কৃতিত্বের নমুনা হিসাবে এগুলিকে কখনও ধরি নাই। এগুলি সেই সব রহস্যময় ঘটনা যাহার কোন অর্থ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত।

ভিতরে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল। তাহার সদ্গতি করিয়া বাহিরে আসিলাম। ম্যানেজারবাবু বলিলেন, বড়বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন আপনার ঘরে। রাত্রে যে ঘরে শুইয়াছিলাম সেই ঘরে গেলাম। গিয়া দেখি বড়বাবু ছয় বোতল ব্র্যাণ্ডি লইয়া বসিয়া আছেন। পাঁচটি বোতল সীল্‌ড্‌ (sealed), ষষ্ঠটি অর্ধেক খালি। বড়বাবু বলিলেন—আমার যা কিছু স্টক ছিল আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার মিকশ্চার আজ তৈরি করে দিন। মদ খাওয়ার ইচ্ছা হলে মিকশ্চার একদাগ খেয়ে ফেলব। এই তো ? ম্যানেজারবাবু, ওগুলো আনতে বলুন। একটি মুণ্ডিত-মস্তক প্রকাণ্ড-শিখাসমন্বিত পুরোহিত একটি প্রকাণ্ড তাম্রকুণ্ডে কিছু গঙ্গাজল এবং গঙ্গাজলের ভিতর কিছু তুলসীপাতা লইয়া প্রবেশ করিল এবং বড়বাবুর সামনে সেগুলি রাখিয়া ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। বড়বাবুকে সবাই যমের মতো ভয় করিত। বড়বাবু আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই তাম্রকুণ্ড স্পর্শ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি আর স্বেচ্ছায় মদ স্পর্শ করব না। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন সত্যই আর মদ স্পর্শ করেন নাই। অবশ্য তাঁহার আয়ু বেশী ছিল না। বড় শিকারী ছিলেন। শিকার করিতে গিয়া বাঘের হাতে প্রাণ দেন। বাঘটাকেও রেহাই দেন নাই। শিকার-শিকারী উভয়েই মৃত্যুর ক্রোড়ে পাশাপাশি শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন।

চাঁচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম খুব শোরগোল করিয়া 'জনা'র রিহার্সাল হইতেছে। জগন্নাথবাবু বলিলেন, ডাক্তার তোমার রিহার্সাল দেওয়া হয়নি। এবার কিন্তু সাত দিন অন্ততঃ সন্ধ্যার পর তোমাকে ছুটি দেব না। ঘণ্টাখানেক আমাদের জন্যে দিও। তাতেই হয়ে যাবে।

সাত দিন খুব রিহার্সাল চলিল এবং আরও সাত দিন পরে মহাসমারোহে 'জনা' অভিনীত হইল। সকলেই খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। উৎফুল্ল ত্রিপুরা সিং ভালো পোশাক কিনিবার জন্য কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, নতুন পোশাক পরে আর একবার অভিনয় করতে হবে। জগন্নাথবাবু নিজে পোশাক আনিবার জন্য কলিকাতা চলিয়া গেলেন। খুব ধুমধাম করিয়া দ্বিতীয়বার অভিনয়ও হইয়া গেল। ও অঞ্চলের সমস্ত বাঙালী তো বটেই কাটিহার পুর্ণিয়া সাহেবগঞ্জ এমন কি রামপুরহাট হইতেও অনেক বাঙালী ভদ্রলোকরা থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত গ্রামেই যেন একটা উৎসব পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পরই বর্ষা নামিল। আমাদের থিয়েটার বন্ধ হইয়া গেল। অডিটোরিয়মে বানের জল ঢুকিয়া মৎস্যকুল নূতন অভিনয় শুরু করিয়া দিল। আমাদের স্টেজের চারিধারে বসিয়া গ্রামের মৎস্য-শিকারীরা ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিতে লাগিল।

সেবার চারিদিকে প্রবল বান হইয়াছিল। নৌকা ছাড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার উপায় ছিল না। কিছুদিনের জন্য আমার রোগীর ভিড়ও কমিয়া গেল।

কারণ অন্য গ্রামের মানুষ সহজে আসিতে পারিত না, আমিও সহজে কোথাও যাইতে পারিতাম না।

ত্রিপুরারি সিংহও স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ম্যানেজার একচক্ষু পীতাম্বর রায়ের বাড়ীও হরিশ্চন্দ্রপুরে। তিনি একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, তোমার তো এখন রোগীর তেমন ভিড় নাই, চল আমার সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরে। কাল পূর্ণিমা, আমাদের বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। চল আমার সঙ্গে। মালিকও ওখানে আছেন। গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকের সঙ্গেও তোমার পরিচয় করাইয়া দিব। তাছাড়া বড় তরফ অর্থাৎ মালিকের দাদা কংসারি সিংহও অতি মহৎ লোক। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াও সুখী হইবে।

তিনি নিজের জমিদারির ভার সব ছোটভাইয়ের উপর দিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্রও কাকার উপদেশ অনুসারে চলে। বড়ছেলেটি বোধহয় তোমার বয়সী। তাহার সহিত আলাপ করিলেও খুব খুশী হইবে। শৌখিন মার্জিত-রুচি ছোকরা। বাংলা সাহিত্যের সহিত সবিশেষ পরিচয় আছে। উহাদের সহিতও তোমার আলাপ হওয়াটা দরকার। কাছেই দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ। সেখানেও একজন অতিশয় বিদ্বান জমিদার আছেন—নিত্যানন্দ রায়। তাঁহার সহিত যদি আলাপ কর মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু, মৈথিলী এবং হিন্দী ভাষা জানেন। শিল্পী লোক। সংগীত-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য। চল, সকলের সহিত আলাপ করাইয়া দিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবে যাইবেন ? ট্রেনে ? রায় মহাশয় বলিলেন, না, নৌকায়। এখানে আহারাদির পর নৌকায় চড়িব। সন্ধ্যা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুরে পেঁছাইয়া যাইব। চারিদিক বানে ডুবিয়া গিয়াছে। কোনও অসুবিধা হইবে না।

তাহাই হইল, আহারাদির পর রায় মহাশয়ের নৌকায় দুর্গা বলিয়া চড়িয়া বসিলাম। ইতিপূর্বে বানের এমন বিরাট দৃশ্য আমি আর দেখি নাই। সে অপরূপ শোভার বর্ণনা করিতে পারি তেমন শক্তি আমার কোথায়।

গঙ্গার গৈরিক তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া আমরা বড় একটা বিলে ঢুকিলাম। বিলের জল নিকষকালো। মহানন্দার কালো জলে চতুর্দিক ডুবিয়া গিয়াছে। প্রান্তর বলিয়া কোথাও কিছু নাই। নীলাভ কালো জলের মধ্যে কেবল বড় বড় গাছগুলি জাগিয়া রহিয়াছে। পরে এরূপ দৃশ্য অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু সেইদিন প্রথম দেখিলাম। প্রকাণ্ড টাল জঙ্গল জলমগ্ন। জলের উপরই যেন বিশাল একটা অরণ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় হিজল গাছ। প্রত্যেক গাছে বহুরকম পাখী। অনেক ডালে সাপও জড়াইয়া আছে দেখিলাম। কিন্তু পাখীদের তাহারা কিছু বলিতেছে না। পাখীরাও নির্ভয়। মাঝে মাঝে ব্যাঙও আছে। বাদুড়ও ঝুলিতেছে। এক একটা গাছে দেখিলাম বহু পিপীলিকা বর্তুলাকারে গুচ্ছ গুচ্ছ হইয়া গাছের ডাল হইতে ঝুলিতেছে। নানাজাতীয় পানা। পানার ফুলও অপরূপ। দূরে দূরে মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো গ্রামগুলি দেখা যাইতেছে। গ্রামের ভিতর হইতে কোথাও কোথাও ধুঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া আকাশে উঠিতেছে। মাঝে মাঝে বন্য পাখীর চীৎকার নিস্তব্ধতা বিঘ্নিত করিতেছে। একটা কর্কশ খক্ খক্ খকর শব্দ প্রায়ই শুনিতেছিলাম।

একজন মাঝি বলিল উহা একপ্রকার মৎস্যাশিকারী পাখীর ডাক। দুই একটা দেখিলাম। দেখিতে অনেকটা গোদা চিলের মতো। অনেক উঁচুতে উড়িয়া উড়িয়া

বেড়াইতেছে। আর একটি অদ্ভুত জিনিস দেখিলাম যাহা আগে কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে এক একটা নৌকায় চারকাটি করিয়া মাছ ধরিতেছে দেখিলাম। চারকাটি আগে দেখি নাই। দেখিলাম একটা বাঁশ খড় দিয়া জড়াইয়াছে। শুনিলাম তাহার সহিত অনেক কেঁচোও নাকি জড়াইয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। সেই কেঁচো ও খড়-জড়ানো বাঁশটা জলের মধ্যে পোঁতা আছে। এই বাঁশটিই চারকাটি। নৌকার উপর কয়েকজন বসিয়া ছিপ ফেলিয়া সেই বাঁশের আশেপাশে ক্রমাগত নাড়িতেছে। ছিপের বড় বড় বঁড়শিতে কেঁচোর টোপ। সেই খড়-জড়ানো চারকাটির চারিপাশে বড় বড় মাছ কেঁচোর লোভে আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু খড়ের ভিতর হইতে কেঁচো খাইতে পারিতেছে না। নিকটেই কেঁচোর-টোপ-দেওয়া বঁড়শি দেখিয়া তাহাই তাহারা গপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলিতেছে এবং ধরা পড়িতেছে। দেখিলাম বড় বড় রুই কাতলা ছিপের মুখে উঠিয়া আসিতেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এক একটা নৌকায় নাকি আধমণ পর্যন্ত মাছ ওঠে।

একটি নৌকার মাঝি রায় মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল। তাহার পর নিজের নৌকা আমাদের নৌকায় ভিড়াইয়া চারটি বড় রুই মাছ উপহার দিয়া গেল।

রায় মহাশয় বলিলেন—ডাক্তার, মৎস্যযাত্রা শুভ। তোমার এই সফর হয়তো নিষ্ফল হইবে না।

আর একটু দূরে গিয়ে দেখিলাম অসংখ্য পদ্ম। লাল, শাদা দুই রকম পদ্মই অজস্র ফুটিয়া আছে। গ্রামের পুষ্করিণী আর বানের জল একাকার হইয়া মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অনেকটা কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের মতো। অনেক মধুকর পদ্মের উপর উড়িয়া উড়িয়া মধুসংগ্রহে ব্যস্ত। প্রাকৃতিক এই বিরাট বিপর্যয়কে সকলেই যেন মানিয়া লইয়াছে। মনে হইল অনিবার্যকে পশু-পক্ষী-গাছপালারাই সহজে মানিয়া লইতে পারে। মাঝে মাঝে জেলেরা চারকাটি ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহারা নাকি দৈনিক দশ পনেরো সের এমন কি আধ মণ পর্যন্ত মাছ এইভাবে ধরে এবং বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। এই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম।

রায় মহাশয় সঙ্গে প্রচুর খাবার লইয়া ছিলেন, সমস্ত দিন বেশ আনন্দে কাটিল। কত রকম জলচর পাখী যে দেখিলাম তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একজায়গায় দেখিলাম সারস-জাতীয় প্রকাণ্ড কয়েকটি পাখী জলের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝিরা বলিল—ইহাদের নাম গগন-ভেড়। ক্রমশঃ সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিমাকাশে মেঘেদের মধ্যে স্বর্ণোৎসব শুরু হইল। সোনা-রুপো-হলুদ-আলতা নীল-কালো নানা রং নানা ছন্দে মিশিয়া যে বর্ণসংগীত সৃষ্টি করিল তাহা সত্যই অবর্ণনীয়। আকাশের এই স্বর্গীয় ছবি জলেও প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিল। তাহার পর ক্রমশঃ অন্ধকার নামিতে লাগিল।

রায় মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। সমস্ত দিন বসিয়া জমিদারির কাগজপত্র দেখিতে ছিলেন। কয়েকটি পত্রও লিখিলেন। তাহার পর যখন দিনের আলো নিভিয়া গেল, তখন কাগজপত্র গুটাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'ডাক্তার ওদিকের খেলা শেষ হলো এবার এদিকে দেখ!'

দেখিলাম পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিতেছে। চতুর্দশীর প্রায়-পূর্ণচন্দ্র। দেখিতে দেখিতে

ঘনকালো জল জ্যোৎস্নার আলোয় অপরূপ হইয়া উঠিল। জলমগ্ন গাছগুলি ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সেই পাখীর খক্‌খক্‌ খকর শব্দ তো ছিলই কিছুদূরে গিয়া হুমো পাখির ডাকও শুনিলাম। দুই গাছে দুই পাখী হুম হুম শব্দ করিয়া যেন উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতেছে। কোন কোন গাছে অসংখ্য জোনাকি। মনে হইতেছে গাছেরা মাথায় হীরার মুকুট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে ঝিল্লীধ্বনি। মনে হইতে লাগিল রাজসভায় কনসার্ট বাজিতেছে। চারিদিকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জল। গ্রামের কোন চিহ্ন নাই। হাওয়া পড়িয়া গিয়াছে। দাঁড়ের জোরে নৌকা চলিতেছে আরও কিছুদূরে গিয়া আর কয়েকখানা লম্বা ধরনের নৌকা দেখিলাম। সেসব নৌকার ভিতর হইতে গানবাজনার শব্দও শোনা যাইতে লাগিল। কোনও নৌকা হইতে কীর্তন, কোন নৌকা হইতে থিয়েটারি গান। একটা নৌকা হইতে সমবেত নারীকণ্ঠের গানও শুনিতে পাইলাম।

রায় মহাশয় বলিলেন —ওই নৌকার দাঁড়ি মাঝিও মেয়েমানুষ। আশপাশের গ্রাম হইতে সকলে 'বাইচ' খেলিতে বাহির হইয়াছে। নৌকাগুলি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত লম্বা—এদেশে উহাদের নাম 'ছিপ'। গানে বাজনায় ঝিলীধ্বনিতে, জ্যোৎস্নায় আর প্রকৃতির রহস্যময় গাম্ভীর্যে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হইল। আমি নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। রায় মহাশয় নৌকার একধারে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। একটু পরেই হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘাট দেখা গেল। দেখিলাম ঘাটে আলো লইয়া কয়েকটি লোকও দাঁড়াইয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়া গেল। রায় মহাশয়েরই লোকজন আলো লইয়া তাঁহার জন্য ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা নৌকা হইতে নামিয়া একটি দুঃসংবাদ শুনিলাম। ত্রিপুরারি সিংহের দাদা কংসারি সিংহ নাকি খুবই অসুস্থ। চাঁচল হইতে ডাক্তার আনিতে গিয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিতে পারেন নাই। অগত্যা দুইজন কবিরাজকে ডাকা হইয়াছে। রায় মহাশয় একনজর আমার দিকে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। রায় মহাশয়ের বাড়ীতে যখন পেঁৗছিলাম তখন রায় মহাশয় বলিলেন, ডাক্তার তুমি হাত মুখ ধুইয়া জলটল খাও, আমি একবার কংসারিবাবুর খোঁজ লইয়া আসি। বাহিরের ঘরে একটা খাটে আমার জন্য বিছানা করা ছিল। জলখাবার খাইয়া আমি তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। যদিও দীর্ঘ নৌকাযাত্রায় কোনও দৈহিক পরিশ্রম হয় নাই তবুও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। নানারূপ বিচিত্র ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনটাই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিছানায় শুইবামাত্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। রায় মহাশয় যখন আসিয়া আমার ঘুম ভাঙাইলেন তখন বেশ রাত হইয়াছে। বলিলেন, তুমি খাইয়া আমার সঙ্গে চল। তুমি আসাতে মালিক খুব খুশী হইয়াছেন। তোমাকেই বোধহয় কংসারিবাবুর চিকিৎসার ভার লইতে হইবে। চাঁচলের ডাক্তারবাবুর আসিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ সেখানে রাজার ছেলে অসুস্থ। তাহাকে ছাড়িয়া তিনি আসিতে পারিবেন না। আমাদের সঙ্গে যে চারিটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছিল, খাইতে বসিয়া দেখিলাম, তাহারাই নানা ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার উপর 'ক্ষীরসা' এবং আম প্রচুর খাওয়া হইল। চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সবরকম।

আহারাদির পর ত্রিপুরারি বাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম।

আমি আসাতে সত্যই তিনি খুব খুশী হইয়া ছিলেন। বলিলেন, প্রবীরকে এবার নূতন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং তাহার বিশ্বাস এ যুদ্ধে প্রবীর বিজয়ী হইবে। আমি গিয়া কংসারিবাবুকে দেখিলাম। তিন দিন একজ্বরী আমি যখন গেলাম তখন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর। প্রলাপ বকিতেছেন। ঘরের মেঝেতে দুইজন কবিরাজ বসিয়া আছেন। একজন শাকলদ্বীপি ব্রাহ্মণ—নাম কাঞ্চন মিশ্র। কপালে তিলক-কাটা, মাথায় পাগড়ী, সৌম্য চেহারা। ইনি এ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কবিরাজ। আর একজনের নাম জগদ্দল মিশ্র। ইনিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু চেহারাটি নামেরই অনুরূপ। বিরাট চেহারা, কালো রং, মাথায় টাক, মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ দাড়ি এবং সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম। কংসারিবাবুর দুই পাশে দুই চাকর বড় বড় পাখা দিয়া ক্রমাগত হাওয়া করিয়া চলিয়াছে। কংসারিবাবু চোখ বুজিয়া আছেন, এবং বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতেছেন। নাড়ী দেখিলাম। প্রবল জ্বরের সবলা নাড়ী, কোন দুর্বলতা নাই। আমার মনে হইল টাইফয়েড জাতীয় জ্বর। যদি প্যারাটাইফয়েড হয়—কাল চতুর্দশ দিবস—হয়তো কালই জ্বর কমিয়া যাইবে।

আমি বাহিরে গিয়া ত্রিপুরারিবাবুকে বলিলাম—চাঁচলের এম, বি, ডাক্তার ইহার চিকিৎসা করিতেছেন। আমি ছোট ডাক্তার, তাঁহার রোগীকে হাতে লইতে আমার ভয় করিতেছে। যদি কিছু হইয়া যায়। তাছাড় দুজন বিখ্যাত বাঘা-বাঘা কবিরাজ আসিয়া বসিয়া আছেন এ অবস্থায় আমি উহার চিকিৎসার ভার লইতে ভয় পাইতেছি। তবে আপনারা যদি বলেন, অবশ্যই লইব এবং আমার যথাসাধ্য করিব।

ত্রিপুরারিবাবু বলিলেন—আচ্ছা বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি যাহা বলেন তাহাই হইবে। আপনি রোগীর কাছে গিয়া বসুন।

ভিতরে গিয়া বসিতেই কাঞ্চন মিশ্র প্রশ্ন করিলেন, আপনি বৈদ্য না চিকিৎসক? আমি প্রশ্নটির তাৎপর্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। তিনিই ব্যাপারটা ভাঙিয়া বলিলেন—আপুনি শতমারী, না, সহস্রমারী?

কথাটা শুনিয়া আমার একটু হাসি পাইল। বলিলাম, আমি বৈদ্য নই, চিকিৎসকও নই। আমি সেবক মাত্র। রোগীর দেখিলাম খুবই তৃষ্ণা। কিন্তু কবিরাজরা জল খাইতে দিবে না, মৌরির একটা ছোট পুঁটুলি জলে ডুবাইয়া তাহাই চুষিতে দিতেছে। রোগী জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে আমি বাহিরে আসিতেই রায় মহাশয়ের সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলাম, এ কঠিন রোগীর দায়িত্ব লইতে আমার ভয় হইতেছে।

রায় মহাশয় হঠাৎ আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কঠিন রোগীর দায়িত্ব লইতে যদি ভয় পাও তাহা হইলে ডাক্তারি শিখিয়াছিলে কেন। এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে রানীজির খাস চাকরানী আসিয়া প্রবেশ করিল। রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, রানীজি কবিরাজি চিকিৎসা করাইতে চান না, রায় মহাশয় যে ডাক্তারবাবুকে আনিয়াছেন তিনি এখনই ঔষধ দিন। মনে হইতেছে প্রলাপ বাড়িতেছে। কাল পর্যন্ত যদি কোন উপকার না হয় মালদহ হইতে সিভিল সার্জনকে আনিবার জন্য নৌকা যাইবে।

রায় মহাশয় বলিলেন—যাও, তুমি রোগীর ভার লও আর দ্বিধা করিও না। আমি বলিলাম—আমি সমস্ত রাত রোগীর কাছে থাকিব এবং নিজ হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইব। আমি যাহা যাহা বলিব তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে।

কবিরাজরা নাড়ী দেখিতে পারেন। তাঁহারা রাজী হইলেন। তখন আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এক খোরাক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। মাথায় গোলাপজল ও ওডিকোলন দিয়া জলপটি দিলাম, মাথাটি তাঁহার কামানোই ছিল। দুই ঘণ্টা পরে টেম্পারেচার ১০২ হইয়াছে দেখিলাম, রোগীও একটু ঘুমাইতেছে। প্রলাপটা কিছু কমিয়াছে। আর এক খোরাক ঔষধ খাওয়াইলাম। রাত্রি তিনটার সময় টেম্পারেচার ১০০ হইয়া গেল। দেখিলাম ঘাম হইতেছে এবং রোগী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। কবিরাজ দুইজন নাড়ী দেখিলেন এবং আমাকে ইশারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কাঞ্চন মিশির হিন্দীতে বলিলেন—কেয়া দেখতে হুঁয়, নাড়ী যে সরদ হোনে লাগা। ইনি মুঙ্গের জেলার লোক। জগদ্দল মালদহ জেলার। 'ন' উচারণ করিতে পারেন না। 'নাড়ী' কে লাড়ী বলেন। বলিলেন, লাড়ী বে শিটাং মেরে গেছে, এর পর সামলাবেন ক্যামনে। কফ বাড়ছে, আধঘণ্টার মধ্যে একেবারে সরদ হয়ে যাবে। বাঁচাতে পারবেন না। আমার ভয় হইল, আমি গিয়া নাড়ী দেখিলাম, ভালোই মনে হইল। জর 'রেমিশন' হইতেছে। এদিকে কবিরাজরা মকরধ্বজ মৃগনাভি মাড়িয়া প্রস্তুত, খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় ও রানীমা পাশের ঘরে ছিলেন, আমি তাঁহাদের বলিলাম, আমার জ্ঞান বুদ্ধি মতো রোগীর অবস্থা খুবই ভালো। জ্বর ছাড়িতেছে, নাড়ীর অবস্থাও ভালো। সকাল নাগাত রোগী বিজ্বর হইবেন। এখন আমি ওই সব উগ্র কবিরাজী ঔষধ খাইতে দিতে চাই না। তাঁহারা ভজমোহনবাবুকে খবর দিলেন। তাঁহার নাড়ীজ্ঞান নাকি খুব ভালো। তিনি নাকি রোজই আসিয়া একবার করিয়া নাড়ী দেখিয়া যান।

খবর পাইয়া তিনি আসিলেন। শুক চঞ্চু-নাসা খর্বাকার ব্যক্তি। বকের মতো পা ফেলিয়া ফেলিয়া হাঁটেন। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, কোনও ভয় নাই, এখন নাড়ী খুব ভালো আছে, জ্বর ছাড়িতেছে। যে ঔষধ চলিতেছে তাহাই চলুক, কবিরাজী ঔষধ দিতে হইবে না। শুনিলাম তিনি একজন উঁচুদরের পাখোয়াজী। কংসারিবাবু খুব ভালো ওস্তাদী গান গাহিতে পারেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার গান এবং ভজমোহনবাবুর পাখোয়াজ নাকি পাড়া সরগরম করিয়া তোলে। যাহা হউক তখন কবিরাজরা আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

সকালবেলা জ্বর ছাড়িয়া একেবারে সাবনরম্যাল (subnormal) হইয়া গেল। খুব ঘাম হইতেছিল, কবিরাজরা বলিলেন এ কালঘাম, এইবার সর্বনাশ হইয়া যাইবে। মৃগনাভি এবং মকরধ্বজ না দিলে শেষ রক্ষা হইবে না। আবার ভজমোহনবাবুকে খবর দিলাম। কবিরাজদের বলিলাম তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। জগদ্দল ভ্রূকুটি করিয়া রহিলেন, তাহার পর মন্তব্য করিলেন—বেশ তাহলে মারিয়া ফেলান। ভজমোহনবাবু আসিয়া আবার নাড়ী দেখিলেন, বলিলেন, কোন ভয় নাই, নাড়ী বেশ সুস্থ, কবিরাজী ঔষধ দিতে হইবে না। রানীজী ঘোমটা দিয়া তাঁহার পায়ের দিকে বসিয়া ছিলেন।

খানিকক্ষণ পরে রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং স্ত্রীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমি খুব ভালো আছি। এমন ঘুম আমি তেরো দিনের মধ্যে একদিনও ঘুমাই নাই। আমার ঘুমের ঘোরে মনে হইতেছে কে একটি ছোকরা আমাকে

ঔষধ খাওয়াইতেছে। কে সে? কোথা হইতে আসিল? উহাকে তো আগে দেখি নাই।

তখন রানীজি চুপিচুপি তাঁহাকে বলিলেন মনিহারী হইতে রায়জীর সহিত একজন ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন, গতরাত্রি হইতে তিনিই আপনার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন এবং সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া আছেন। চাঁচলের ডাক্তার আসিতে পারেন নাই।

কংসারিবাবু তখন বলিলেন, ডাক্তারবাবু কোথায়? আমি কাছেই ছিলাম। তিনি বলিলেন, আমার কাছে এস। আমি কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, আরও কাছে এস। আরও কাছে গেলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—বাঁচিয়া থাক। তেরো দিন বড় কষ্ট পাইয়াছি, তোমার চিকিৎসায় সুস্থ হইলাম। তেরো দিন পরে কাল ঘুমাইয়াছি। আমি তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলাম। তাহার পর নাড়ী দেখিলাম, নাড়ী প্রায় স্বাভাবিক। রোগী বলিলেন ক্ষুধা পাইয়াছে। দুধ সাগুর ব্যবস্থা করিলাম। ঔষধের সহিত একটু ব্র্যাণ্ডিও দিলাম। বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বেশ ভালো বোধ করিতে লাগিলেন। দিন চারেক পরে তাঁহাকে পথ্য দিলাম—পুরাতন চালের ভাত ও মাগুর মাছের ঝোল। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন ক্রমশঃ। আমি জানি ইহাতে আমার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নাই। প্যারাটাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ চৌদ্দ দিনের দিন আপনিই ছাড়িয়া যায়। আমার ভাগ্য ভালো তাই আমি তেরো দিনের দিন গিয়া কয়েক দাগ ঔষধ দিয়াছিলাম। ঔষধ না দিলেও ও জ্বর সেদিন ছাড়িয়া যাইত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে ওইরূপই হয়। আকাশ নির্মেঘ হইয়া যায়, অনুকূল বাতাস বহিতে থাকে।

কংসারিবাবুর পুত্র হংসমোহনের সহিতও আলাপ হইল, এ আলাপ পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। হংসমোহন বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত বাড়ীতে বসিয়াই ভালোভাবে শিখিয়াছিলেন। গানের সমঝদার ছিলেন, কিন্তু গান গাহিতে পারিতেন না। মৃদুকণ্ঠে, প্রায় চুপিচুপি কথা বলিতেন। গাছপালা ফুল ফলের খুব শখ ছিল। বিদেশ হইতে নানারকম গাছপালা আনাইয়া বেশ বড় একটি বাগান করিয়াছিলেন। আম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। শুধু যে নানারকম আমের নাম জানিতেন তাহা নয়, কোন্ আম কখন গাছ হইতে পাড়িতে হইবে এবং কতক্ষণ 'জাগ' দিলে তাহা 'তৈয়ার' অর্থাৎ খাইবার যোগ্য হইবে তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার বাগানেই আমি বিলাতী নানারকম ফার্ন এবং ক্যাক্‌টাস দেখিয়াছিলাম, নানাবিধ বন্য পরগাছারও তাঁহার একটি সংগ্রহ ছিল। চমৎকার চমৎকার 'অর্কিড' ছিল তাহাতে। তিনি শুধু যে বিদেশী 'অর্কিড' আনাইয়াছিলেন তাহা নয় এদেশেরও জঙ্গল হইতে নানারকম অর্কিড যোগাড় করিয়াছিলেন। তিনি নানারকম শাক, কাঁচা ফল, সরিষার গুঁড়া ও ভিনিগার দিয়া আমাকে কয়েক রকম 'স্যালাড'ও খাওয়াইলেন। ইহা আমি পূর্বে কখনও খাই নাই। প্রশংসা করিলে হংসবাবু বলিলেন, যত ভালোই হোক আমাদের দেশের শাকের ঘণ্ট এবং সুক্তোর কাছে সবাই হার মানে।

কংসারিবাবু যখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন তখন আমি মনিহারী ফিরিয়া যাইতে চাহিলাম। কিন্তু দেখিলাম কেহই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিতে চান না। কংসারিবাবু বলিলেন—তুমি এখানেই প্র্যাকটিস কর। তুমি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। আমি রাজী হইলাম না। বলিলাম,

মনিহারীতে বাড়ী ঘর করিয়াছি, সেখানেও আপনাদেরই আশ্রয়ে আছি। ত্রিপুরারিবাবু আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তিনি আমাকে স্নেহও করেন খুব, ও অঞ্চলে আমার প্র্যাকটিসও আপনার আশীর্বাদে জমিয়া গিয়াছে সেজন্য আর স্থান পরিবর্তন করিব না।

ইহার পরই দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ হইতে সেখানকার জমিদার নিত্যানন্দ রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণকিশোরবাবু খুব অসুস্থ। আমি যাইব কি যাইব না ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। রায় মহাশয় বলিলেন—যাও, এ সুযোগ ত্যাগ করিও না। মৎস্য-যাত্রা করিয়া আসিয়াছ তোমার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। নিত্যানন্দ রায় শুধু বড় জমিদার নন একজন প্রতিভাবান শিল্পী, তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইলে খুশী হইবে। আমিও তোমার সহিত যাইতাম, কিন্তু আমাকে ছুরি সংগ্রহ করিবার জন্য বেরিয়া যাইতে হইবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিলাম না। এতবড় জমিদারের ম্যানেজার ছুরি সংগ্রহের জন্য বেরিয়া যাইতেছেন কেন। ছুরির কি দরকার? একটা লোক পাঠাইয়া দিলে কি চলিত না? তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কিন্তু কোনও জবাব পাইলাম না। তাঁহার চক্ষুটি (আগেই বলিয়াছি, তিনি একচক্ষু ছিলেন) কেবল একটু হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা নাগাদ দিল্লী দেওয়ানগঞ্জে পেঁাছিয়া গেলাম। ঘাটে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক ছিল। নিত্যানন্দ রায়ের বাড়ীতে পেঁাছিতেই দেখিলাম একটি খর্ব গৌরবর্ণ ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। মাথার চুল কাঁচা-পাকা। গায়ে কোন জামা নাই, কাঁধে শুভ্র উপবীত, পরিধানে শাদা থান, পায়ে খড়ম। কানে একটা রুপার খড়কে গোঁজা রহিয়াছে। যে লোকটি আমার সঙ্গে আসিয়াছিল সেই নিম্নস্বরে বলিল, ইনিই নিত্যানন্দবাবু। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি নিজের উপবিতগুচ্ছ অঙ্গুষ্ঠসহযোগে প্রলম্বিত করিয়া আমার মাথায় রাখিলেন, তাহার পর কি একটা সংস্কৃত শ্লোক বলিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর বাংলায় বলিলেন—আপনার যশের সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আপনাকে অভ্যর্থনা করবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম। আমার ভগ্নীপতি খুব অসুস্থ, চলুন আগে তাঁকে দেখে আসি। কাছেই বাড়ী।

কৃষ্ণকিশোরবাবুও দেখিলাম অদ্ভুত লোক। মাথা ন্যাড়া, মাথায় প্রকাণ্ড একটা টিকি। তিনিও নগ্নগাত্র এবং প্রায় উলঙ্গ। একটা কৌপীনের মতো পরিয়া বাহিরের ঘরে খাটিয়ায় শুইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন। চোখ দুইটি বোজা, ভুরু কোঁচকানো, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। চীৎকারটা অত্যন্ত বেসুরা এবং বীভৎস। মনে হইল যেন একটা রুষ্ট ষাঁড় ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে। দুইটি চাকর দেখিলাম তাঁহার পেট ও পা দলাইমলাই করিতেছে। শুনিলাম চব্বিশ ঘণ্টাই তাহারা এজন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া কৃষ্ণকিশোরবাবু মধ্যে মধ্যে উচ্চতর গ্রামে হুংকার দিয়া উঠিতেছেন। শুনিলাম তিনি প্রত্যহ দুই গ্লাস করিয়া সিদ্ধি খান। মনে হইল খুব সম্ভবতঃ তাঁহার 'রেনাল' (renal) কলিক্ হইয়াছে। আমি একটা ঘুমের ঔষধ দিয়া বাহিরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলাম। সেখানে অনেক মাতব্বর প্রজা এবং ভদ্রলোকেরা বসিয়া ছিলেন। নিত্যানন্দবাবু তাঁহাদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিতেছেন এমন সময় উলঙ্গ কৃষ্ণকিশোরবাবু হুংকার করিতে করিতে বৈঠকখানায়

ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ডাক্তার তোমার ওষুধে কিছু হলো না। তুমি ছুরি দিয়ে পেটের এইখানটায় ভুঁকে দাও, অনেক বেসুর বদ সুর ভুল সুর ওখানে জমে আছে সেগুলো বেরিয়ে যাক—তাহলেই আমি সুস্থ হব। সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আবার ঘরে লইয়া গেল। আমি তখন তাঁহাকে একটা মরফিন্‌ (morphine) ইনজেকশন দিলাম। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাহার পর যেখানে তিনি ছুরি ভুঁকাইয়া দিতে বলিতেছিলেন সেইখানে একটা ব্লিস্টার (blister) দিয়া দিলাম। তখন কলিকের এইসব চিকিৎসাই ছিল।

নিত্যানন্দবাবু আমাকে জনান্তিকে বলিলেন—উনি একজন সুরেলা লোক। সর্বদাই গুনগুন করিয়া রাগরাগিণী আলাপ করেন। ভালো হইলেই ইহার কণ্ঠে গান জাগিবে। উহার ধারণা হইয়াছে শরীরে বেসুর জমিয়াছে তাই এই কষ্ট। আমি বলিলাম—আমি উঁহার কাছেই রাত্রে থাকিতে চাই।

নিত্যানন্দ রায় বলিলেন—পাশের ঘরেই আপনার শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আসুন—। গিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে অদ্ভুত রঙিন একটি খাট রহিয়াছে। নিত্যানন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন—এটি বাঁশ আর বেত দিয়া আমিই প্রস্তুত করিয়াছি। [illegible]রি পর্যন্ত বাঁশ এবং বেতের। চমৎকার হাওয়া ঢোকে, কিন্তু মশা ঢুকিতে পারে না। অনেকটা জাপানী ধরনের এই অপরূপ খাটটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল ঘরের ভিতর ছোট্ট রঙীন আর একটি ঘর। অনেকটা বড় পাল্কির মতো দেখিতে। বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইদিকে দুইটি কারুকার্যমণ্ডিত বাঁশও রহিয়াছে। দরজা আছে। তাহা খুলিয়াই খাটের ভিতর ঢুকিতে হয়। কৃষ্ণকিশোরবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, আমি নিত্যানন্দবাবুর বাড়ীতে খাইবার জন্য গেলাম। দেখিলাম খাওয়ার আয়োজন প্রচুর। তাহার আর বর্ণনা করিব না। একটি জিনিস কেবল মনে আছে, অন্যান্য নানাবিধ খাবারের সঙ্গে আলাদা একটি থালায় বিরাট একটি রোহিত মৎস্যের মুড়া ছিল। সবই আমি অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিলাম দেখিয়া নিত্যানন্দবাবু খুশী হইলেন। বলিলেন—আজ আপনি আমার গৃহিণীকে চরিতার্থ করিয়াছেন। এসব রান্না তাঁহারই। সুরসিক পাইলে কবি কৃতার্থ হন, সমঝদার পাইলে গায়ক বাদক পুলকিত হইয়া ওঠেন আর ভালো 'খাইয়ে' পাইলে রাঁধুনীর আনন্দের সীমা থাকে না।

পাশের ঘরের দ্বারে একটি পরদা টাঙানো ছিল। তাহার ওপার হইতে চুড়ির শব্দ পাওয়া গেল। নিত্যানন্দবাবু হাসিয়া বলিলেন—পরদার ওপারে উনি বসিয়া আছেন। খাওয়াদাওয়ার পর আমি বলিলাম—যদি অনুমতি দেন মাকে প্রণাম করি।

নিত্যানন্দ-গৃহিণী মাথায় আধঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি। হাতে একগোছা সোনার চুড়ি। একটু মোটাসোটা গোছের ভারিক্কী চেহারা। প্রণাম করিলাম। মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—বেঁচে থাকো, সুখী হও।

খাওয়াদাওয়া সারিয়া কৃষ্ণকিশোরবাবুর বাসায় গেলাম, দেখিলাম তিনি তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছেন। যে চাকরটি তাঁহার পা টিপিতেছিল তাহাকে বলিলাম—এখন পা টিপিবার দরকার নাই। পেটে হাত দিও না, ওখানে ওষুধ লাগাইয়া দিয়াছি। যদি বাবুর ঘুম ভাঙে তখন আমাকে জাগাইয়া দিও। আমি গিয়া নিত্যানন্দবাবুর

সেই অভিনব খাটিয়ায় ঢুকিয়া পড়িলাম। সমস্ত দিন ক্লান্ত ছিলাম, ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না। খুব ভোরে চাকরটা আসিয়া আমার ঘুম ভাঙাইল। বলিল - বাবু জেগেছেন। সমস্ত রাত ঘুমিয়েছেন খুব। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াই শুনিলাম মধুর কণ্ঠে তিনি গান করিতেছেন—কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই—। আমাকে দেখিয়াই তাঁহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, ক্ষমা চাইছি, কাল অসুরের প্রভাবে পড়ে আপনাকে হয়তো কটু কথা বলেছি। অসুখ মানেই তো অসুর, সুরের অভাব। আপনার চিকিৎসাগুণে সে এবার জব্দ হয়েছে, সুর এসে গেছে মনে। কিছুক্ষণ আমার দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলেন তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আরে তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমাকে আপনি বলব কেন। বলিয়াই আবার গান ধরিলেন—আপনজনারে 'আপনি' বলিয়া ঠেকায়ে রাখিনু দূরে দূরে সে গেল না এল ফিরে ফিরে বাঁশরীর সুরে সুরে। আবার নীরব হাসিতে তাঁহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন—পেটের উপর একটা বড় ফোস্কার গারদে অসুরগুলোকে বন্দী করে রেখেছ দেখছি। এখন ওখান থেকে ওদের তাড়াবে কি করে। বলিলাম—সব ঠিক হয়ে যাবে। কৃষ্ণকিশোরবাবু কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হইয়া উঠিলেন। আমি যেদিন চলিয়া আসিব সেদিন পাখোয়াজী ভজমোহনবাবুও আসিয়া হাজির হইলেন। সঙ্গে পাখোয়াজ। বলিলেন—কৃষ্ণকিশোর আজ গান করবে, আমি পাখোয়াজ বাজাব। যদি ঠিক ঠিক সমে এসে থামতে পারে তাহলে বুঝব ওর অসুখ সেরেছে। তার আগে ডাক্তার তোমার ছুটি নেই। সন্ধ্যার সময় সংগীতের আসর বসিল। কৃষ্ণকিশোরবাবু চমৎকার গান গাহিলেন। পাখোয়াজী ভজমোহনবাবু আমার পিঠে চাপড়াইয়া বলিলেন—হ্যাঁ, এইবার তোমার ছুটি। ওর অসুখ সেরে গেছে, আর বেতালা বেসুরো কিছু নেই।

কংসারিবাবু আমাকে নগদ তিনশত টাকা, একথান কাপড় (সেকালে একথান কাপড়ে চার জোড়া পরিবার ধুতি হইত), একটি চাদর এবং দশ সের ঘি দিলেন। কৃষ্ণকিশোরবাবুও আমাকে নগদ দুইশত টাকা দিয়া বলিলেন—মনিহারীতে আমার ছোট একটা আমবাগান আছে। বহুদিন আগে ওটা নিলামে কিনেছিলাম। কিন্তু ওর আম এখান পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না। ওই বাগানটাও তোমাকে দিলাম। আমার নায়েবমশাই গিয়ে লেখাপড়া করে দিয়ে আসবেন।

রায় মহাশয়ের সহিত আসিয়া শুধু যে আমার অর্থলাভ হইল তাহা নয়। আমি এমন কয়েকটি গুণী লোকের স্নেহলাভ করিলাম যাঁহাদের জোড়া আমি অন্ততঃ আর দেখি নাই। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায়ের সংস্রবে আসিয়া আমি বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট হই। তাঁহারই উৎসাহে আমিও পরে ক্রমশঃ একটি ভালো বাংলা লাইব্রেরী নিজের বাড়ীতে করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনেক বই এবং পুরাতন মাসিকপত্র দানও করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই বইগুলিই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। দূরের 'কল' আসিলে গরুর গাড়িতে কিংবা নৌকায় যাইতে হইত। তখন ওই বইগুলিই আমার প্রধান সঙ্গী ছিল।

মনিহারীতে ফিরিয়া দেখিলাম শঙ্করা হইতে খেতুমামা আসিয়াছেন এবং আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। খেতুমামা আমার মামার সম্পর্কে জ্ঞাতি ভাই ছিলেন। মামার শঙ্করার বিষয়পত্রের দেখাশোনা তিনিই করিতেন একথা আগেই লিখিয়াছি।

যদিও নিজে তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে মাতব্বরি মোড়লি করিয়া বেড়াইতে ভালোবাসিতেন। সন্তোষের বাবাও তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। সন্তোষের মাকে তিনি বৌদি বলিয়া ডাকিতেন। রাজলক্ষ্মী তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিল। তাহাকে তিনি 'ছোট বুড়ী' বলিয়া ডাকিতেন। একটু গোঁয়ার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি যে স্পষ্টবাদী, কাহারও তোয়াক্কা করেন না এই অহংকারও তাঁহার ছিল তাই যখন তখন মানী লোককেও অপমান করিয়া বসিতেন। বলিতেন—আমি বাপের কুপুত্তুর (কুপুত্র), উচিত কথা বলতে ডরাই না। আমার সহিত দেখা হইতেই তিনি ডালকুত্তার মতো খাঁ খাঁ করিয়া উঠিলেন।

"ব্যাপার কি তোমার ? তুমি বড় বংশের ছেলে, তোমার বাবাকে আমরা দেবতার মতো খাতির করতুম, তোমার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। তুমি সোনোর মাকে গাছে তুলে দিয়ে মইটি বগলে করে প্রাকটিস করে বেড়াচ্ছ ! তোমার কথামত সোনো (সন্তোষ) তোমার মামাকে একটি চিঠি লিখেছিল, কোনও উত্তর আসেনি। কিছুদিন পরে সোনোর মা নিজের জবানিতে অনেক কাকুতিমিনতি করে আর একটি চিঠি লেখে। তারও কোনও জবাব আসেনি। তোমার মামাটি তো চণ্ডাল। দুটো পয়সা হাতে এসেছে তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এদিকে পাশের গাঁয়ের এক বুড়ো শীতল চক্রবর্তী ছোট বুড়ীকে তৃতীয় পক্ষ করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। সে পণ তো নেবেই না, উপরন্তু সোনোর মাকেই এক হাজার টাকা দিতে চাইছে। ছোট বুড়ীকে সোনায় মুড়ে দেবে বলছে। শালার আট দশটা ছেলে মেয়ে। মুখে একটি দাঁত নেই। আমি বৌদিকে বলে দিয়েছি আমার প্রাণ থাকতে আমি ছোট বুড়ীকে হাত পা বেঁধে ওই পচা ডোবায় ফেলে দিতে পারব না। আমার বিঘে পাঁচেক জমি আছে, তাই বিক্রি করেই আমি ওর ভালো পাত্র খুঁজে বিয়ে দেব। বৌদি তখন আমাকে বললেন—সূর্য যখন কথা দিয়ে গেছে তখন তাকে জিগ্যেস না করে কিছু করা উচিত নয়। তাই আমি তোমাকে জিগ্যেস করতে এসেছি তুমি যে কথা দিয়ে এসেছ তা মরদ কা বাত কি না। হাতির দাঁতের সঙ্গে তার তুলনা চলে কি না।"

সতীশবাবু নিকটে বসিয়া ছিলেন। খেতুমামার কথাবার্তা শুনিয়া তিনি আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি খেতুমামাকে বলিলাম—"সতীশবাবু আমার একজন হিতৈষী বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমি আপনাকে এখনি জানাচ্ছি আমি কি করব।"

সতীশবাবুকে লইয়া আমি পাশের ঘরে গেলাম এবং তাঁহাকে আনুপূর্বিক সব খুলিয়া বলিলাম। কিছুই গোপন করিলাম না। সব শুনিয়া সতীশবাবু বলিলেন—"আপনি যখন কথা দিয়ে এসেছেন তখন ওখানে আপনাকে বিয়ে করতেই হবে। তবে তার আগে আপনার মামার মতটা নেবার চেষ্টা করা উচিত। উনি যখন চিঠির জবাব দেননি, তখন ওর সামনা-সামনি কথাটা পাড়া উচিত। আমার মনে হয় খেতুবাবু যদি মেয়ের মাকে নিয়ে সাহেবগঞ্জে চলে আসেন তাহলে ভালো হয়। আপনার মামার মতটা জেনে তারপর যা হয় করা যাবে। আপনার মামা যখন মেয়ের মায়ের জ্ঞাতি তখন স্বচ্ছন্দে উনি আপনার মামার বাসায় আসতে পারেন। তাছাড়া আপনার দিদিমা বেঁচে আছেন তাঁরও মতের একটা গুরুত্ব আছে।"

তাহাই ঠিক হইল। খেতুমামাকে আসিয়া তাহাই বলিলাম এবং পরে সসংকোচে আর একটি প্রস্তাবও করিলাম।

"যদি কিছু মনে না করেন আপনাকে আপনাদের যাতায়াতের খরচ বাবদ পঞ্চাশটি টাকা আমি প্রণামী দিতে চাই। প্রণামী না বলে জরিমানাও বলতে পারেন। দোষ আমারই। মামা যে এরকম ব্যবহার করবেন তা আমি বুঝতে পারিনি—"

খেতুমামা কয়েকটি হলদে দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শোলায় যখন জল ঢোকে, তখন শোলা মনে করে সে লোহা হয়েছে। বৌদিকে নিয়ে আসতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মামা যদি আমাদের অপমান করে তাহলে খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যাবে। আমি বাপের কুপুত্তুর—"

বলিলাম—"আপনি সাহেবগঞ্জে আসবার আগে আমাকে একটা চিঠি দেবেন। আমি ঠিক সেই সময় সাহেবগঞ্জে উপস্থিত থাকব। কোনও গোলমাল হবে না।"

খেতুমামা সেই দিনই চলিয়া গেলেন। টাকা লইতে আপত্তি করিলেন না। বরং টাকাটা লইয়া আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার উঁচু বংশ, উঁচু মন, উঁচু নজর—আশীর্বাদ করি রাজরাজেশ্বর হও।"

ইহার পর প্রায় দশ দিন অতীত হইয়া গেল কিন্তু খেতুমামা বা সইমার কোন পত্র আসিল না। আমি মনে মনে যখন বেশ অস্থির হইয়া উঠিয়াছি তখন হঠাৎ একদিন সকালে মন্মথ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "তুমি আজই সাহেবগঞ্জে চল। তোমার বিয়ে নিয়ে খুব হাঙ্গামা হচ্ছে। শংকরা থেকে সন্তোষের মা এবং খেতুমামা এসেছেন। তোমার মামা খুব রাগারাগি করছেন। তোমার দিদিমা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।" ইহার একটু পরেই শংকরা হইতে সন্তোষের মায়ের চিঠিটিও আসিল। দেখিলাম চিঠিটি ঠিক সময়েই লেখা হইয়াছিল, কিন্তু ডাকের গোলমালে ঠিক সময়ে আসিয়া পেঁছায় নাই। পরের স্টিমারেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া গেলাম। গিয়াই প্রথমে মামার সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "তোমার ষড়যন্ত্রেই এরা এখানে এসেছে। আমি তোমার জন্যে অন্য জায়গায় ভালো পাত্রী দেখেছি, তারা পণের কিছু টাকা অগ্রিমও দিয়েছে, আমি তাদের কথাও দিয়ে ফেলেছি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে তুমি হঠাৎ এই কাণ্ড করবে। তুমি ডাক্তারি পাশ করেই এমন লায়েক হয়ে গেছ? ভুলে গেছ যে আমি তোমার অন্নদাতা, আমি না থাকলে কোন অতলে তুমি তলিয়ে যেতে? তোমার অধঃপতন হয়েছে, কিন্তু এখনও নিজেকে সামলে নিতে পার। ওদের ডেকে এনেছ, বিদেয় করে দাও। আমি যেখানে বিয়ে ঠিক করেছি সেখানেই বিয়ে হবে, এখানে কিছুতেই আমি মত করব না। ওরা কোন্ সাহসে এসেছে বুঝতে পারছি না। ভিতরে ভিতরে তোমার সায় আছে। ওদের আজই চলে যেতে বল। আজই। যেখানে আমি বিয়ে ঠিক করেছি তাঁরা পরশু দিন আশীর্বাদ করতে আসবেন।" আমি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সন্তোষের মা ও খেতুমামা দিদিমার ঘরে ছিলেন। মামার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন।

সন্তোষের মা বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমরা তোমার জ্ঞাতি। সন্তোষের বাবা তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখতেন। কিন্তু তিনি আজ নেই, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত,

অর্থবলও নেই। তাই আজ তোমার দ্বারস্থ হয়েছি, তুমি আপন লোক বলেই হয়েছি। আমার মান তুমি যদি না রাখো তো কে রাখবে।"

খেতুমামার চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল। মামা বলিলেন, "বৌদি, তুমি তোমার মেয়ের অন্যত্র সম্বন্ধ কর। আমি কিছু টাকা সাহায্য করব। কিন্তু তোমার মেয়ে আমার এই দোতলা বাড়ীতে আসবে না।"

খেতুমামা এই কথায় ক্ষেপিয়া গেলেন। বলিলেন, "আমি পেচ্ছাপ করে দিই তোমার টাকায়। সোনোর মাকে তুমি টাকা দেখাচ্ছ। ও আজ গরীব হয়ে গেছে, কিন্তু ওরও একদিন ছিল যখন ওর জমির ধান চাল খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছিলে। তুমি হয়তো টাকার গরমে এ কথা ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার মা আশা করি ভোলেন নি। তোমার বাবা যখন মারা গেলেন তখন তুমি নাবালক, তোমার দিদি বারাহীর বয়স তখন পনেরো ষোলো। তোমাদের জমি তখন বাকী খাজনার দায়ে নীলাম হবার দাখিল হয়েছিল, তখন সন্তোষের ঠাকুর্দাই তোমাদের ভরণপোষণের ভার নিয়েছিলেন, তোমাদের জমির বিলিব্যবস্থা করেছিলেন। টাকার গরমে তুমি এসব কথা ভুলেছ। তারপর তুমি যখন গ্রামের বাড়ীতে মা বোনকে ফেলে সদ্য-বিয়ে-করা বউকে নিয়ে সাহেবগঞ্জে মজা ওড়াচ্ছিলে তখনও তোমার জমির রক্ষণাবেক্ষণ করেছে এই খেতু চাটুজ্যে। আমি না দেখলে কিচ্ছু থাকত না। আজ আমি একটি কথা বলে যাচ্ছি, আমি যদি সদব্রাহ্মণ হই তাহলে আমার একথা অক্ষরে অক্ষরে ফলবে। তোমার এই দোতলা বাড়ী, তোমার এই এত বাড়বাড়ন্ত কিছুই থাকবে না। অত বড় রাবণ রাজার থাকেনি, তুমি তো কোন্ ছার। তোমার নিজের দেমাক আর দুর্মতির আগুনে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে—এই বলে গেলুম। চল বউদি—এখানে আর একদণ্ড থাকব না—।"

অভুক্ত অবস্থাতেই তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দিদিমা বারবার তাঁহাদের ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আর ফিরিলেন না। আমিও তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। কিন্তু আমি যে তাহাদের অনুসরণ করিতেছি ইহা তাঁহারা সম্ভবত বুঝিতে পারেন নাই। রাত্রি তখন দশটা, মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারেই তাঁহারা স্টেশনের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন। একটু দূরে আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম খেতুমামা বলিতেছেন—"ট্রেনের এখনও দেরি আছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটাও বেশ বড়—ওইখানেই ঘণ্টা দুই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে ফাঁকা হাওয়ায়। শক্তির বাড়ীতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পাষণ্ড, পাষণ্ড—!"

সইমা বলিলেন, "কিন্তু ঠাকুরপো আমি শংকরায় মুখ দেখাব কি করে! আমি যে সবাইকে বড় মুখ করে বলে এসেছি সুষির সঙ্গে রাজুর বিয়ে হয়ে যাবে। এখন সবাই হাসবে। পাড়ার লোকদের চেনো তো! এর জন্যেই আমি আসতে চাইনি। সুষি আমাদের আসতে লিখেছিল কিন্তু মামার সামনে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথা বলল না। অথচ ওর ভরসাতেই আমরা এতদূরে ছুটে এলাম।"

খেতুমামা রূঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "ওই মামারই ভাগ্নে তো। শাস্ত্রে বলেছে—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। শক্তির মা-ও তো গুম হয়ে রইল। আগেই আমাদের অনুমান করা উচিত ছিল যে ঘেঁটুগাছে গোলাপফুল ফুটবে না।"

আমি উঁহাদের অলক্ষ্যে পিছু পিছু স্টেশনে প্রবেশ করিলাম। তাহার পর সইমাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মামার মত হলো না, কিন্তু আমার কথার নড়চড় হবে না। আপনারা ফিরে গিয়েই প্রথম যেটি বিবাহের দিন আছে ঠিক করবেন, আমি গিয়ে বিয়ে করে আসব।"

সইমা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না বাবা তুমি এ কাজ কোরো না।"

আমি উত্তর দিলাম, "যদি আমার এখানে বিয়ে না হয় তাহলে আমি আর বিয়েই করব না। আমার জন্যেই আপনারা এমনভাবে অপমানিত হয়েছেন, মামা যে এতটা নিষ্ঠুর হবেন তা বুঝতেই পারিনি। যাই হোক আপনারা আর অন্যমত করবেন না, গিয়েই বিয়ের দিন ঠিক করে আমাকে টেলিগ্রাম করবেন, আমি গিয়ে বিয়ে করে আসব। হয়তো একাই যাব—সঙ্গে কেউ যাবে না—"

সইমা বলিলেন, "কিন্তু বাবা—"

এক ধমক দিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন খেতুমামা।

"থাম না, ঘ্যানর ঘ্যানর করছ কেন! সুর্য যে দেবতুল্য কেদারনাথের আর দেবীতুল্য বারাহীর যোগ্য পুত্র এতক্ষণে তার প্রমাণ পেলাম। ওর কথা শুনে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। ছোট বুড়ীর ভালো নাম রাজলক্ষ্মী, আমি আশীর্বাদ করছি তুমিও রাজরাজেশ্বর হবে—আমরা গিয়েই বিয়ের দিন ঠিক করে মনিহারীর ঠিকানায় তোমাকে চিঠিও লিখব, টেলিগ্রামও করব। দেখি এবার শক্তি কি করে বিয়ে আটকায়। যদি আর বাগড়া দিতে আসে রক্তারক্তি হয়ে যাবে—"

বিজয়ী বীরের মতো খেতুমামা আমাদের পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন, যেন এ ব্যাপারের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁহারই।

তাঁহাদের ট্রেনে চড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন রাত বেশ হইয়াছে। দিদিমার ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেলাম। সন্তর্পণে তাঁহার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া শুনিলাম তিনি বলিতেছেন—"খেতু ওরকম করে শাপশাপান্ত করে গেল, সন্তোষের মা না খেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেল—আমার বুক কাঁপছে বাবা। মা মঙ্গলচণ্ডীর মনে কি আছে জানি না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে, তুমি আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছ, আমি তোমার মা আর গুরু। তাই আমি তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, মনে হয় আমার কথা যদি না শোন তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে। ঘরে বিধবা মেয়ে থাকতে তুমি জোর করে দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করলে এটা আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি জোর করে আমার কাছে মত আদায় করে নিলে। এ ব্যাপারেও আমি তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারলাম না। আমার সর্বদাই ভয় হয় আমার কথা তুমি যদি না শোন তাহলে তোমার অমঙ্গল হবে কারণ আমি তোমার মা আর গুরু। তাই তোমাকে জোর করে কিছু বলি না। কিন্তু এ কাজটা তোমার অন্যায় হলো বাবা। মনে রেখো ন্যায়ত ধর্মত ওদের কাছে আমরা ঋণী। তোমার ছেলেবেলায় তোমার বাবা যখন চলে গেলেন তখন সোনোর বাবা, সোনোর ঠাকুরদা না থাকলে তোমাকে আমি মানুষ করতে পারতাম না। খেতু ঠাকুরপো ঠিকই বলেছে। ওদের দেওয়া ধানই তখন আমার একমাত্র সম্বল ছিল। ওরা তোমাদেরই বংশের ছেলে, সোনোর বোনটিও শুনেছি সুন্দরী—ওর সঙ্গে

সুষিার বিয়ে হলে আমি খুবই খুশী হতাম বাবা। তুমি কথাটা আর একবার বিবেচনা করে দেখ।"

বুঝিলাম মামাকেই তিনি কথাগুলি বলিতেছেন। মামা বলিলেন—"কিন্তু মা আমি যে ওদের কথা দিয়েছি। ওরা অগ্রিম কিছু টাকাও দিয়েছে, এখন তো পিছোবার উপায় নেই। আমি বরং সন্তোষের মাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি—ওরা অন্য পাত্র দেখুক—"

দিদিমা বলিলেন—"ওরা ভিকিরি নয় বাবা—"

হঠাৎ পিছন দিক হইতে জামায় টান পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মামার বড় মেয়ে কমলা দাঁড়াইয়া আছে। সে চুপিচুপি বলিল—"মা তোমাকে ডাকছেন—"

গিয়া দেখিলাম মামীমা জাগিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখেমুখে একটা উৎকণ্ঠা ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন—"বাবা, এস বস আমার কাছে। সরে এসে কাছে বস। তোমাকে একটা কথা চুপিচুপি বলছি—"

তাঁহার কাছে বসিতেই তিনি চুপিচুপি বলিলেন—"তুমি তোমার মামার কথা শুনো না বাবা। তোমার সই-মার মেয়ে রাজুকেই বিয়ে কর তুমি—"

আমি এটা প্রত্যাশা করি নাই। বলিলাম—"আপনি একথা বলছেন কেন।"

"শুনলাম তুমি বিয়ে না করলে এক থুড়থুড়ে বুড়ো নাকি ওকে বিয়ে করবে। এ মহানরক থেকে ওকে বাঁচাও তুমি বাবা—"

মামার খড়মের শব্দ শোনা গেল। মামীমা ফিসফিস করিয়া বলিলেন—"আমি একথা বলেছি তা বোলো না যেন—"

মামীমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। বাহির হইয়া নীচে চলিয়া গেলাম। মামার সহিত মুখোমুখি হইবার সাহস হইল না। মামাকে চিরকালই ভয় করিয়াছি। নীচে গিয়া নির্জন রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—যদিও আমি আমার বিবেক অনুসারে ঠিক কাজই করিয়াছি, তবু—। ওই তবুটা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। মনে হইল, যে মামা আমাকে মানুষ করিয়াছেন আমার বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার কোনই হাত থাকিবে না, আমি নিজের খুশিমতো যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিব—এটাই কি উচিত হইতেছে? আমার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মামা ওই অন্য মেয়েটির বাবাকে কথা দিয়াছেন আমি সে বিশ্বাসের কোন মর্যাদাই দিব না, এটাই কি ন্যায়সংগত? নিজেকে মামার স্থলাভিষিক্ত করিয়া আমি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম মামা কোনও অন্যায় করেন নাই। কিন্তু আমি যখন কথা দিয়াছি তখন—। সহসা ঠিক করিলাম দিদিমার কাছে গিয়া সব খুলিয়া বলি। তিনি যদি বলেন আমি ঠিক কাজ করিয়াছি তাহা হইলে আমার মনের গ্লানি কাটিয়া যাইবে।

রাস্তা হইতে আবার সন্তর্পণে দিদিমার ঘরের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলাম।

"দিদিমা—"

"কে।"

"আমি সুষি্য। নেত্য কপাটটা খুলে দে তো—"

দিদিমার ঘরের কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নেত্য কপাট খুলিয়া দিল। দিদিমার ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন কমানো থাকিত। নেত্য সেটা বাড়াইয়া দিল।

"দিদিমা ঘুমিয়েছ ?"

"না দাদু, ঘুম আসছে না। সোনোর মায়ের কথাগুলো কেবল কানে বাজছে। তুই এখনও ঘুমুস্ নি ?"

"না। আমি ওদের তুলে দিতে স্টেশনে গিয়েছিলাম।"

তাহার পর তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"তুই একথা বলে এসেছিস ? খুব ভালো করেছিস, খুব ভালো করেছিস। আমি বাঁচলুম !"

"সোনোর মা কিন্তু বারবার আমাকে বলছিল তোমার মামা তোমার পিতৃতুল্য, তাঁর মতের বিরুদ্ধে এ কাজ কোরো না। তবু আমি বলেছি যে আমি এখানেই বিয়ে করব। এখানে যদি বিয়ে না হয় আমি আর কোথাও বিয়ে করব না—"

"তুমি এখানেই বিয়ে করবে। আমি আশীর্বাদ করছি, সুখী হবে তুমি।"

দিদিমার আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমি মনে অনেক বল পাইলাম। পরদিনই শঙ্করায় চিঠি লিখিয়া দিলাম—আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি আজ মনিহারী চলিলাম। বিবাহের দিন ঠিক করিয়া আপনি আমাকে টেলিগ্রাম করিবেন, আমি ঠিক সময়ে গিয়া হাজির হইব। আমি কোনও পণ লইব না, বরাভরণ প্রভৃতির জন্যও অর্থব্যয় করিবেন না। যেটুকু না করিলে নয়, তাহাই কেবল করিবেন। ইহার সহিত আমি একশত টাকাও মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিলাম সন্তোষের নামে। আমি মনিহারী আসিবার পরদিনই মন্মথ আসিয়া হাজির হইল এবং তাহার সহিত এমন একজন আসিলেন যাঁহার আগমন আমি প্রত্যাশা করি নাই। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। মামার বয়সী এবং মামার বন্ধু। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার ভয় হইল—মনে হইল ইনি মামার দূত হইয়া বিবাহ পণ্ড করিতে আসিয়াছেন। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও শঙ্করা। তাঁহার মতো কুচকুচে কালো এবং লম্বা লোক সাহেবগঞ্জে তখন আর ছিল না। তিনি রেলের গুদামের বড়বাবু ছিলেন। প্রথম যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ হওয়ার পর আর বিবাহ করেন নাই।

অজুহাত ছিল, কারণ তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, সুযোগও ছিল, কারণ এদেশে আবার পাত্রীর অভাব কি। কিন্তু তিনি আর বিবাহ করেন নাই। একটি প্রৌঢ়া দাই তাঁহার ঘরকন্না সামলাইত ! এমন কি তাহাকে সাহেবগঞ্জের পাহাড়ে চড়িয়া তাঁহার জন্য কুলও পাড়িয়া আনিতে দেখিয়াছি। অনেকে বলিত দাইটি মুকুজ্যে মশাইয়ের রক্ষিতা। অনেকে বলিত মুকুজ্যে মশাইই দাইটির রক্ষিত। মুকুজ্যে মশাই আসিয়াই যাহা বলিলেন তাহাতে আমি আরও অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, "তোমার সৎসাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার মামাকে বরদাবাবু, সুরথবাবু, আমি—সবাই অনুরোধ করেছি এই বিয়েতে মত দিতে। কিন্তু কিছুতেই সে মত দিচ্ছে না। যাই হোক আমরা তোমার পক্ষে আছি এই কথাটা বলতেই এলাম। তোমার বিয়েতে আর কেউ যাক আর না যাক আমি বরযাত্রী যাব। রাজুর বাবা যেদিন মারা যান সেদিন আমি শঙ্করাতে ছিলাম। তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম রাজুর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করব। একটি পাত্রের সন্ধান আমি করেছিলাম, কিন্তু পাত্রের বাবা একটি চামার, নগদ দুহাজার টাকা পণ চায়। এমন সময় সুখবরটি

শুনলাম তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছ। শুনে যে কি আহ্লাদ হলো তা আর কি বলব। এখন এই পুঁটুলিটা খুলে দেখ তো। মাগী তোমাদের জন্য কি যেন খাবার তৈরি করে দিয়েছে। মাগী পুয়া আর খাবৌনি চমৎকার করে।" মাগী মানে অবশ্য সেই প্রৌঢ়া দাইটি। পুঁটুলি খুলিতেই একটি লাল-নীল রঙের বেতের কৌটা বাহির হইয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার ভিতর সত্যই অনেক পুয়া খাবৌনি থরে থরে সাজানো। তাহার চেহারাটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। মোটাসোটা, কালোকোলো, দাঁতে মিসি, তালের মতো মুখখানা। তাহার সহিত কোনদিন তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, সে হঠাৎ এত খাবার পাঠাইতে গেল কেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম।

বাড়ীর ভিতর হইতে মধুয়া আসিয়া খবর দিল ঠাকুরটি সরিয়াছে। আমার বাড়ীতে তখন অনেক লোক খাইত। ঠাকুরটি চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। যদু মুকুজ্যে সোৎসাহে বলিলেন—"কুছ পরোয়া নেই। এবেলাটা আমি চালিয়ে দেব। যখন ভালো চাকরি জোটেনি তখন আমি রাঁধুনীগিরি করতাম। সব রকম রাঁধতে পারি আমি।"

কেশ মশাই পাশের ঘরে ছিলেন। সেখান হইতেই বলিলেন—"আমিও পারি। আপনি আমাদের অতিথি, এবেলা অন্ততঃ আপনাকে রাঁধতে দেব না। এবেলা আপনি ফরমাশ করুন, আমি রাঁধি—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লাল রোহিত মৎস্য লইয়া সতীশবাবু প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—"ডালাবিরের মাছ। মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার জন্য।" ঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছে শুনিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। বলিলেন—"ও বিয়ে করতে গেছে। মৈথীলদের কনে পাওয়া তো শক্ত। ও একটি ন'বছরের মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, মেয়েকে দুশো টাকা পণ দিতে হবে। এখানকার হরিবোল সা চড়া সুদে টাকাটা ওকে ধার দিয়েছে ওদের দেশের জমি বন্ধক রেখে কিন্তু এখানে রান্নার কি ব্যবস্থা হবে—"

কেশ মশাই বলিলেন—"সে ভার আমি নিয়েছি। আমি বেহালায় জয়জয়ন্তীটা বাজিয়ে তারপর রান্নাঘরে ঢুকব। আপনি বাঁয়া তবলাটা বার করুন। আপনিও আজ এখানে খাবেন—মধুয়া ততক্ষণ মাছটা কুটে ফেলুক—"

জয়জয়ন্তী শুরু হইয়া গেল। জয়জয়ন্তী শেষ হইলে সতীশবাবু বলিলেন,—"একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের দেওয়ানজী শ্বশুরবাড়ী থেকে এক অনাথা বুড়ীকে এনেছিলেন। এনে রাঁধুনী করে বহাল করেছেন তাকে। রাঁধুনীটি নাকি দূর সম্পর্কে দেওয়ানজীর মাসশাশুড়ী হন। মুশকিল হয়েছে বুড়ী এখন কেবলমাত্র আর রাঁধুনী হয়ে থাকতে চাইছে না, মাসশাশুড়ীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। দেওয়ানজী একটু বিপদে পড়েছেন। সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছে তাঁর। আপনি রাখবেন তাঁকে? বুড়ী কিন্তু খুব দজ্জাল, খুব দুর্মুখ।—"

কেশ মশাই বলিলেন—"নিয়ে আসুন তাঁকে। পায়ে ধরব তাঁর। তাতেও যদি তিনি প্রসন্ন না হোন পাঞ্জা ধরব। পাঞ্জা লড়তে পারে বুড়ী?"

"গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।"

"আমরা কেউ ভূত নই, আমরা রসিক। নবরসের যে কোন রস আমরা বরদাস্ত করতে পারব। আনুন আপনি বুড়ীকে—"

তাহার পর দিনই বামুনদিদি আমার বাড়ীতে ছোট এক পুঁটুলি লইয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহার পরিচয় আগেই দিয়াছি। আমরণ তিনি আমার কাছে ছিলেন।

যথাসময়ে সন্তোষের টেলিগ্রাম ও পত্র আসিল—২৭শে শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। ২৫শে শ্রাবণ আমি মনিহারী হইতে রওনা হইয়া গেলাম। সতীশবাবুরও বরযাত্রী যাইবার ইচ্ছা ছিল। আমি বলিলাম আপনি এখানেই থাকুন। ওই অনিশ্চয়তার মধ্যে আপনাকে লইয়া যাইতে চাই না। বিবাহ করিয়া বধূকে এখানে যদি লইয়া আসিতে হয় আপনাকে টেলিগ্রাম করিব। আপনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। এখানেই আপনার থাকা দরকার। সতীশবাবু রাজী হইলেন। সাহেবগঞ্জে গিয়া আমি গোপনে দিদিমার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম, বিবাহ করিতে যাইতেছি। কলিকাতায় গিয়া আমার পুরাতন মেসে পালিতবাবুর বাসায় উঠিব। তাহার পর সেখান হইতে শঙ্করায় যাইব। মন্মথ ও যদু মুকুজ্যে বরযাত্রী যাইতেছে। দিদিমাকে সব বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দিদিমা প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন —আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকত কি খুশীই না হতো সে। দিদিমাকে বলিয়া আসিলাম—আমি এখন বউ আনব না। পরে আনব।

কলিকাতায় পালিতবাবুর বাসায় গিয়া শুনিলাম শঙ্করা হইতে আমার আর এক জ্ঞাতিভ্রাতা আমার খোঁজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মামার দূরে সম্পর্কের খুড়া পটলকর্তাও নাকি ছিলেন। তাঁহারা আমার বিবাহের খবর শুনিয়াছেন। শুধু তাই নয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞও হইয়াছেন যে আমাকে তাঁহার বিবাহের দিন শঙ্করায় পেঁৗছিতে দিবেন না। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা গুণ্ডার সাহায্যও লইবেন। পালিতবাবুকে তাঁহারা বলিয়াছেন—"ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও যাতে এতবড় একটা অকর্তব্য না করে তা আমাদের দেখা উচিত। আপনি ওকে বিকেল পর্যন্ত আটকে রাখবেন। আমরা বিকেলে আবার আসব—।"

পালিতবাবু বলিলেন—"তুমি এখানে এসে পড়েছ। চাট্টি খেয়েই অন্যত্র চলে যাও। তোমার বঙ্কুমামার বাসায় যাওয়াই নিরাপদ। তিনি শক্ত লোক, তোমাকে ভালওবাসেন।" বঙ্কুমামা মামার এক জ্ঞাতিভাই। বঙ্কুমামার বাসায় গিয়া দেখিলাম মামার আর এক জ্ঞাতিভ্রাতা উদয় চাটুজ্যে বসিয়া আছেন। পাশেই একটি ছিপ। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ পুরুষ তিনি। আমার কথা আগেই শুনিয়াছিলেন, পরিচয় পাইয়া আনন্দে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন—"তোর মা বারাহী আমার ছোট বোনের মতো ছিল। কলকাতা থেকে ফিরবার সময় প্রতিবারই তার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হতো। কখনও চুলের ফিতে, কখনও রঙিন শাড়ি, কখনও গন্ধতেল। না নিয়ে গেলে ভারি অভিমান হতো তার। তুই ডাক্তারি পাশ করেছিস এ খবর পেয়েছি, কিন্তু তোর সঙ্গে দেখা আর হয়নি। তা এখানে কবে এসেছিস।"

তাঁহাকে তখন সব কথা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। "কারও সাধ্য নেই তোকে আটকাতে পারে। আমরা নিজে গিয়ে তোকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব। আজ আমি আর বঙ্কু ছুটি নিয়েছিলাম একজায়গায় মাছ ধরতে যাব বলে। সেটা দেখছি আজ আর হলো না। রামতাকৎ সিং—"

একজন বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল। বংকুমামার আপিসের চাপরাসী। উদয়মামা বলিলেন—"তুমি আমার বাসায় গিয়ে বোনোয়ারি সিংকে ডেকে নিয়ে এস।"

"জি হুজুর—"

উদয়মামা বলিলেন—"বোনোয়ারি আমার ঠাকুর, সে-ও খুব তাগড়া লোক। এই দুই সিংহ তোমাকে পাহারা দেবে। ওরা যদি গুণ্ডা আনে তাহলে তাদের মহড়া নিতে পারবে ওরা।"

মন্মথ তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়াছিল। যদু মুকুজ্যেও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি যাই নাই—কারণ আমি পুরাতন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পালিতবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পালিতবাবুর বাসাতেই আসিয়া উঠিয়াছিলাম। মন্মথ বলিয়া গিয়াছিল সে ঠিক সময়ে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইবে। উদয় মামা ও বংকু-মামা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিলেন। ঘোড়ার গাড়ির পিছনে বিশাল গুম্ফ-ধারী বোনোয়ারিলাল এবং গাড়োয়ানের পাশে শালপ্রাংশু-মহাভুজ রামতাকৎ সিং গাড়িটির শোভা বৃদ্ধি করিল। উদয়মামা, বংকুমামা এবং আমি গাড়ির ভিতরে বসিলাম। বংকুমামা বলিলেন—তুমি ভালোয় ভালোয় বিয়ে করে এস। তারপর আমি আর উদয় তোমার মনিহারীর বাড়ীতে যাব একবার।

হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিলাম মন্মথ যদু মুকুজ্যেকে লইয়া স্টেশনের গেটে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে পালিতবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার হাতে একটি ছোট রঙিন বাক্স দিয়া সসংকোচে বলিলেন—বউমার জন্য সামান্য আশীর্বাদী এটা। দেখিলাম এক ছড়া সোনার হার আনিয়াছেন তিনি। মনে পড়িতেছে সহসা আমার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল বিবাহ করিতে যাইবার সময় সেদিন যাঁহারা স্টেশনে সমবেত হইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমার রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না—সে হিসাবে তাঁহারা সবাই পর। পরে বহুবার প্রমাণ পাইয়াছি রক্তের সম্পর্ক লোককে আপন করে না, প্রাণের সম্পর্কই আত্মীয়তার একমাত্র বন্ধন। ভগবানের দয়া না থাকিলে সে সম্পর্কও হয় না। ভগবান আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

অনাড়ম্বরে এবং নির্বিঘ্নে আমার বিবাহ হইয়া গেল। যদু মুকুজ্যে বিবাহের পর কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। মন্মথ রহিল। আমি সই-মাকে বলিলাম—এখন আমি একাই ফিরিয়া যাই। ওখানকার কি ব্যাপার সব বুঝিয়া তাহার পর যাহা হয় ব্যবস্থা করিব। সই-মাও এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। খেতুমামা বলিলেন—তুমি সোজা ওকে মনিহারী নিয়ে চলে যাও। সেখানে তো শক্তি চাটুজ্যের জারিজুরি খাটবে না। যা দেখে এলাম সেখানে তো তুমি একাই একশ। বাড়ীটিও চমৎকার করেছ। লোকজনও সবাই তোমাকে খাতির করে। সেইখানেই নিয়ে যাও সোজা। আমি চুপ করিয়া রহিলাম ক্ষণকাল। তাহার পর বলিলাম—মামার রাগটা পড়ুক, তারপর যা হয় করব। মামা আমার পিতৃতুল্য, তাঁর আশীর্বাদ না পেলে আমার সংসার সুখের সংসার হবে না। খেতুমামা উত্তর দিলেন—কিন্তু তোমার মামা কি এরপর তোমায় আশীর্বাদ করবেন? মনে তো হয় না। ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। এইসব আলোচনা চলিতেছে এমন সময়

একটা টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত। সাহেবগঞ্জ হইতে দিদিমা টেলিগ্রাম করিতেছেন— বউকে লইয়া এস। আমার মনে হইল দিদিমা বোধহয় মামার মত করাইয়াছেন। খুব আনন্দ হইল। খেতুমামার মুখও হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বারবার বলিতে লাগিলেন—বাছাধন এইবার পথে এসেছেন মনে হচ্ছে। এতক্ষণে বোধহয় বুঝেছেন নিজের মান নিজের কাছে।

সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিলাম রাত্রি বারটায়। আকাশে ঘন-ঘোর মেঘ। বৃষ্টি পড়িতেছে। নববধূকে ওয়েটিং রুমে ঢুকাইয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম মামার দুইজন গোমস্তা স্টেশনে ঘোরাফেরা করিতেছে। ভাবিলাম বুঝি আমাদেরই লইতে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলাম। তারপরই বজ্রপাত। তাহারা বলিল মামা বলিয়া দিয়াছেন আমি যেন বউ লইয়া তাঁহার বাড়ীতে না যাই, গেলে জুতা মারিয়া গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলাম। ভাবিলাম শংকরাতে আবার ফিরিয়া যাই। দুই ঘণ্টা পরেই ফিরিবার ট্রেন আছে। কিন্তু মনে হইতে লাগিল—কি লজ্জা! কি লজ্জা! নববধূর কাছে এ প্রস্তাব করিব কোন্ মুখে! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। মন্মথর বাবা বরদাবাবু তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ের মধ্যে দেখিলাম আনুদা— মন্মথর দাদা—আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। চোখোচোখি হইতেই তিনি হাসিমুখে আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—বউ কই। বাবা আমাকে পালকি নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। শক্তিকাকা নাকি তোমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন না। তোমার দিদিমা আমাদের বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি এসেছি। গোমস্তা দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চল, আমাদের বাড়ী চল। আমার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না, চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, গলা খাঁকারি দিয়া বলিলাম—এত রাত্রে বউ নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। মন্মথ বলিল—খুব ঠিক হবে। তুই আমাদের পর মনে করিস নাকি। আনুদা হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার সে নীরব হাসির অর্থ, কোন আপত্তি টিকিবে না। অবশেষে যাওয়াই স্থির-হইল। বউ ওয়েটিং রুমে ছিল, সে কিছুই জানিতে পারিল না, ভাবিল শ্বশুর বাড়ীতেই বুঝি যাইতেছে। বরদাবাবুর গৃহদ্বারে পৌঁছিতেই ভিতর হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। আনুদার কিছুদিন আগে বিবাহ হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রী আসিয়া নববধূকে পালকি হইতে নামাইলেন এবং জলের ঝারা দিতে দিতে প্রথামতো তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ন্যাটা মাছ এবং দুধ ওতলানোর ব্যবস্থাও তাঁহারা রাখিয়াছিলেন। বরদাবাবু সকালে উঠিয়াই মামার কাছে গেলেন। কোন ফল হইল না। শুনিলাম মামা সাড়ে আটটার ট্রেনে পীরপৈঁতিতে 'কলে' চলিয়া যাইবেন, ফিরিবেন রাত্রি নটায়। আমি এ সুযোগ ত্যাগ করিলাম না। দিদিমার কাছে চলিয়া গেলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বলিলাম—আপনি টেলিগ্রাম করতে গেলেন কেন। কি মুশকিলে ফেলেছেন দেখুন তো। দিদিমা কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তুই রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে আয়। আমি চোখে তো দেখতে পাই না, তার গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দেখি একবার। আমি ইহাতে রাজী হইলাম না। বলিলাম এ বাড়ীতে আসিলে কেহ তাহাকে যদি অপমান করে। সে আশা করিয়া আছে এইবার বউভাত হইবে

খুব ধুমধাম হইবে সে সব তো হইবেই না, বরং চূড়ান্ত অপমানের ভয় আছে। আমি বউকে লইয়া আজই মনিহারী চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা আমি যাইব না, কারণ তাহা হইলে মামার সহিত চিরকালের মতো বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। আমি ওকে শংকরায় রাখিয়া আসি, তাহার পর নিজেই মামার সহিত বোঝাপড়া করিব। আজকালকার ছেলেরা হয়তো আমার এই আচরণে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আসল কথা—মামাকে আমি ভক্তি করিতাম, ভয়ও করিতাম। আমার বিবেক বারবার আমাকে বলিতেছিল—তুমি অন্যায় করিয়াছ। যে মামা তোমাকে মানুষ করিয়াছেন, ভদ্রসমাজে তাহাকে তুমি অপদস্থ করিয়াছ। যেমন করিয়া হোক মামাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। দিদিমা বলিলেন—তবে তাই রেখে আয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। শক্তি আর কতদিন রাগ করে থাকবে। আমি সেই দিনই বউকে লইয়া শংকরায় ফিরিয়া গেলাম। মন্মথ তাহাকে একটা মিথ্যা গল্প বানাইয়া বলিয়াছিল। বলিয়াছিল—আমাদের এক দূরে সম্পর্কের আত্মীয় হঠাৎ মারা গেছে। তাই এখন বউভাত হলো না। পরে হবে। রাজলক্ষ্মী বহুকাল পর্যন্ত জানিত না যে মন্মথর বাবা ও মা তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী নয়। তাঁহারা পূজার সময় রীতিমতো তত্ত্বও করিয়াছিলেন। উঁহাদের ঋণ জীবনে শোধ করিতে পারিব না। উঁহাদের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। মন্মথ আজ নাই, আনুদাও মারা গিয়াছেন। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও সাহেবগঞ্জে নাই—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাহাদের নূতন জীবনে নূতন সমস্যা লইয়া ব্যস্ত। আমাদের কথা হয়তো তাহারা একবারও ভাবে না। আমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের সহিত দেখা হইলে তাহারা সেই মনোভাব লইয়া আমাদের স্মরণ করিবে যে মনোভাব লইয়া আমরা ইতিহাস পড়ি বা গল্পের বই পড়ি। যে রামধনু আমাদের আকাশকে রঞ্জিত করিয়াছিল তাহা মুছিয়া গিয়াছে, যে ফুল আমাদের কাননে ফুটিয়াছিল তাহা ঝরিয়া গিয়াছে, যে পাখীর সুরলহরীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম সে পাখী উড়িয়া গিয়াছে।

শংকরা হইতে ফিরিয়া আমি মামার সম্মুখীন হইলাম। তাহার পায়ে ধরিয়া বলিলাম—"আমি অপরাধ করেছি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমা না পেলে আমি নতুন সংসার পাততে পারব না—"

মামা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ক্ষমা করতে পারি; কিন্তু একটি শর্তে। ও বউকে ত্যাগ করে আমি যেখানে বিয়ে ঠিক করেছি সেইখানে তোমাকে বিয়ে করতে হবে—"

"ত্যাগ করব ? তার কি অপরাধ—?"

"অপরাধ কিছু নেই ! কুলীনের ছেলেরা একাধিক বিয়ে হামেশাই করে। তোমার ঠাকুরদার তিনটি বিয়ে ছিল। তিনজনকে নিয়েই তিনি ঘর করতেন। তুমি আমার মান বাঁচাবার জন্যে এখন ওকে ত্যাগ করতে পার, পরে এ বিয়ে হয়ে যাবার পর আবার ওকে ঘরে নিও। তখন আমি আপত্তি করব না।"

মামার কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তুচ্ছ মানের জন্য তিনি একটা নিরপরাধিনী বালিকার জীবন বিষময় করিয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন না—অথচ সম্পর্কে তিনি তাঁহার কাকা হন ! বলিলাম—"আমাকে কি করতে হবে—"

"আমি যে রকম ভাবে বলব সেই রকম ভাবে ওদের একটা চিঠি লিখে দাও আগে—"

"দিদিমাকে জিগ্যেস করব না ?"

"কিছু দরকার নেই।"

"কি লিখব—"

"সন্তোষকে লিখে দাও যে দুর্বুদ্ধিবশে আমি আমার মামার মতের বিরুদ্ধে তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলাম। এখন আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। মামা আগে যেখানে আমার সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন সেখানেই আমাকে বিয়ে করতে হবে। বাস্, এইটুকু লিখলেই হবে। চিঠিটা লিখে এনে আমার কাছে দিয়ে যাও আমি পাঠিয়ে দেব—"

"আচ্ছা।"

মামা 'কলে' বাহির হইয়া গেলেন। মামার জন্য আমার সত্যই দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম মামা কতদূর যান শেষ পর্যন্ত আমি দেখিব। মামার নিষেধ সত্ত্বেও দিদিমাকে গিয়া সব কথা বলিলাম। ভাবিয়াছিলাম তিনি বুঝি আবার কান্না শুরু করিবেন। কিন্তু তাঁহার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডী, ওকে রক্ষে কর। আমাকে বলিলেন—"যে রকম বলছে সেই রকম লিখে দে। আর সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষকে আলাদা একখানা চিঠি লিখে দে তুই। তাতে লেখ যে বাধ্য হয়ে মামার পীড়াপীড়িতে তোমাকে ওরকম চিঠি লিখেছি। আমি অন্য কোথাও আর বিয়ে করব না। তুমি রাজলক্ষ্মীকে সাহেবগঞ্জে নিয়ে এস। নিয়ে এসে বল যে তোমাদের বউ তোমাদের কাছে দিয়ে গেলাম। আমি আর ওর ভার নিতে পারব না। যে অগ্নিসাক্ষী করে ওকে বিয়ে করেছে সেই ওর ভার নিক। আমি চললুম। এই বলে তুমি চলে যেও। তারপর সব ঝক্কি আমি বইব। চিঠির সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দে। গাড়িভাড়ার অভাবে যেন আসা বন্ধ না হয়ে যায়। তাহাই হইল। ইহার পরই নাটকটা জমিয়া গেল। আমার লেখা চিঠিটা মামা রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দিদিমার ফরমায়েশি চিঠিও আমি রেজেষ্ট্রি করিলাম। মনি-ওর্ডার যোগেও পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়া দিলাম। সন্তোষকে ইহাও লিখিয়া দিলাম দিন পনেরো পরে আমি সাহেবগঞ্জে আসিব। সেই সময়ই সে যেন আসে।

অবশেষে সন্তোষের চিঠি একদিন আসিল। কোন্ তারিখে কোন্ ট্রেনে সে সাহেবগঞ্জে পেঁাছিবে তাহা জানাইয়াছে এবং লিখিয়াছে আমি যেন সে সময়ে সাহেবগঞ্জে নিশ্চয় উপস্থিত থাকি। সাহেবগঞ্জে গিয়া দেখিলাম পটলকর্তা এবং পটলগিন্নী আসিয়াছেন এবং মামা খুব সমারোহ করিয়া তাঁহাদের খাতির যত্ন করিতেছেন। আমার দিকে একনজর চাহিয়া পটলকর্তা বলিলেন—"তুই খুব তুখোড় ছোকরা দেখছি। নিজে লুকিয়ে একটা বিয়ে করেছিস, আবার মামার জেদ বজায় রাখবার জন্যে আর একটা বিয়ে করতে যাচ্ছিস। মানে, দুটো ছুঁড়ী নিয়ে ফুর্তি করবি একসঙ্গে। তোর মামা বলছে বটে যে সোনার বোনকে তুই ত্যাগ করবি। কিন্তু বিয়ে-করা বউকে ত্যাগ করা কি সহজ ? সাত পাকের বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন।"

আমি কোনও উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করিলাম না।

পটলকর্তা বলিয়া চলিলেন, "তোর অদেষ্টটা ভালো। এবার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে-ও অপূর্ব রূপসী। আমি দেখে এসেছি। ষোলয় পা দিয়েছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। মেয়ের বাপ দারোগা, অনেক দেবে-থোবে। খাট-পালঙ্ক, রূপোর বাসনপত্র, সোনার ঘড়ি —"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। দিদিমাকে কেবল গোপনে বলিলাম, "সন্তোষ আজ বৌকে নিয়ে রাত্তিরের গাড়িতে আসবে। আমি বৌকে তোমার কাছে রেখে যাব, না মনিহারী নিয়ে যাব ?"

"এইখানেই দিন কতক থাকুক আমার কাছে। দেখি হাওয়া কোন্ দিকে বয়। পটলকর্তা এসেছে বলেই ভয় হচ্ছে, ও ক্রমাগত বাগড়া দিতে থাকবে। সম্বন্ধটি ওই এনেছে তো—হয়তো পাত্রীপক্ষ থেকে কিছু টাকাও খেয়েছে—"

আমি স্টেশনে যাই নাই। সন্তোষকে লিখিয়া দিয়াছিলাম আমি স্টেশনে যাইব না। তুমি সোজা বাড়ীতে চলিয়া আসিও। রাতদুপুরে সন্তোষ আসিয়া হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। মামা নিজেই উঠিয়া সিঁড়ির দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "কে তুমি।"

"আমি সন্তোষ, রাজুকে নিয়ে এসেছি। সূর্য্যকে পাঠিয়ে দিন। তার স্ত্রী তার হাতে দিয়ে আমি এই ট্রেনেই ফিরে যাব। সে নিজের স্ত্রীকে মারতে হয় মারুক, রাখতে হয় রাখুক। আমি আর ওর দায়িত্ব বইতে পারব না—"

"তুমি উপরে এস না—"

"না, আমি আপনার বাড়ীতে ঢুকব না—"

আমি জাগিয়াই ছিলাম, তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম। দিদিমা কমলাকেও পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের পিছু পিছু আড়ময়লা কাপড়-পরা রাজু ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। সন্তোষ স্টেশনে চলিয়া গেল। মামা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজু মামাকে যখন প্রণাম করিতে গেল তখন তিনি পা সরাইয়া লইলেন এবং রাগে গরগর করিতে করিতে নিজের ঘরে গিয়া দড়াম্ করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজু দিদিমার ঘরে গিয়া দিদিমাকে প্রণাম করিতেই দিদিমা তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহার মাথার উপর মুখটা রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সহসা তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মাথায় কি তেল মাখিস ?"

"নারকেল তেল"—অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল রাজু।

"তাই এরকম গন্ধ হয়েছে। কমলি আমার ফুলেল তেলের শিশিটা নিয়ে আয় তো।"

কমলি ফুলেল তেলের শিশি লইয়া আসিতেই বলিলেন—"এর মাথায় ভালো করে মাখিয়ে দে—"

"এত রাত্তিরে তেল মাখিয়ে কি হবে। কাল বরং চানের সময়—"

"যা বলছি. তাই কর। ফাজিল কোথাকার।"

নেত্যও উঠিয়া আসিয়াছিল। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"দাও আমাকে দাও, আমি মাখিয়ে দিচ্ছি—"

দিদিমা আদেশ করিলেন—"তার আগে আমার কুলুঙ্গি থেকে দুটো সন্দেশ বার করে বউকে খেতে দে। আর শাঁখ বাজা। নতুন বউ বাড়ীতে এল—"

নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তাহার পরদিন ভোরেই আমি মনিহারী চলিয়া গেলাম। অনুভব করিলাম দিদিমা যখন আছেন তখন ভয়ের কোনও কারণ নাই।

মনিহারীতে চলিয়া গেলাম বটে, কিন্তু সেখানে কিছুতেই মন বসিল না।

সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন—"বৌমা কোথা ?"

"মামার কাছেই আছে এখন—"

"এখানে কবে আসবেন ?"

"দেখি—"

সতীশবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না। হাবুমামা আমাকে আড়ালে একদিন বলিলেন—"তোমার মামার কাছে বউমাকে রেখে আসার মানেটা কি বুঝতে পারছি না। এত অপমানের পরও তুমি মনে করছ উনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। সে লোকই উনি নন। তুমি যাও ওকে নিয়ে এস গিয়ে—"

কি করিব, কি করা উচিত, যে মামা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহাকে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিয়া আমার নূতন সংসার পাতিব ? মামার আশীর্বাদ না পাইলে আমার সংসার কি সুখের সংসার হইবে ? এই সব চিন্তার দোলায় মন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। ত্রিপুরারি সিং ভালুকা চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সমস্যার কথা ভোলেন নাই। কারণ কয়েকদিন পরেই রায় মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সাধারণতঃ জমিদারির বিভিন্ন কাছারিতে কাছারিতে ঘুরিয়া বেড়ান, এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ডাক্তার তুমি আমাকে বন্দী করে আর কতদিন রাখবে ? মহালে মহালে ঘুরে বেড়ানোই আমার স্বভাব। কখনও নৌকোতে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও হাতীর পিঠে, কখনও গরুর গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছি আমি সারাজীবন। না বেড়ালে আমার ভালো হজম হয় না, রাত্রে ঘুমও হয় না। তাছাড়া যদিও আইনগত জমিদারির মালিক ত্রিপুরারি সিং, কিন্তু জমিদারির আসল মালিক আমি। চারদিকে চারটে বাঘা বাঘা জমিদার ওত পেতে আছে, কি করে আমাদের বিপদে ফেলবে। তাদের নানারকম কুচক্রী মন্ত্রীও আছে, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে জমিদারি রক্ষা করবার সামর্থ্য মালিকের নেই। আমিই তাঁর জমিদারি রক্ষা করি। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে রক্ষা করতেন—আমি ত্রিপুরারি সিংকে রক্ষা করি। চাণক্যের দুটো চোখ ছিল, আমার মাত্র একটা চোখ। তাই আমাকে খাটতে হয় বেশী। চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। কিন্তু তুমি আমার পায়ে দড়ি বেঁধে রেখে দিয়েছ।"

অবাক হইয়া গেলাম।

"আমি আপনাকে বেঁধে রেখেছি ! কি রকম ?"

"মালিক হুকুম দিয়ে গেছেন—বৌমাকে এখানে এনে তবে যেন আমি বাইরে বেরুই। বৌমাকে কবে আনতে যাবে ?"

"এখন তো ঠিক করিনি।"

"ঠিক করে ফেল। আমি আমাদের একজন কর্মচারীকে পাঠিয়েছি সাহেবগঞ্জে। সে তোমার বন্ধু মন্মথর সঙ্গে দেখা করে আসবে। মন্মথবাবুকে একটা চিঠিও দিয়েছি

আমি। লিখেছি তোমার মামার বাড়ীর হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে তার একটু আভাস যেন আমাদের দেন। আর কথাটা গোপন রাখেন। আশা করি এটুকু সাহায্য তিনি করবেন। খবর যদি খারাপ হয় তাহলে আমার বিবেচনায় তুমি আর কালবিলম্ব না করে বৌমাকে নিয়ে এস। এখান থেকে গোটা দশেক সিপাহী তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। কোনও অসুবিধা হবে না।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলাম—"মামার বাড়ী থেকে বউকে লুট করে আনতে বলছেন? তা আমি পারব না।"

রায় মহাশয় আমার দিকে তাঁহার একচক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার মাতুল-প্রীতি অসাধারণ দেখছি। ভালো। দেখা যাক কি খবর আসে ওখান থেকে—তারপর ঠিক করা যাবে—"

সেদিন সন্ধ্যায় স্টীমারে মন্মথ নিজেই আসিয়া পড়িল।

বলিল—"তুমি চল। সন্তোষের মা-ও এসে পড়েছেন। পটলকর্তা আর পটল-গিন্নীর পায়ে ধরাধরি চলছে এখন। নাটক খুব জমে উঠেছে—"

"কি রকম—"

"তোমার মামা খুব খলিফা লোক। তিনি বলছেন পটলকর্তা আমার পূজনীয় কাকা, তিনিই অন্য জায়গায় তোমার ভালো সম্বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে লুকিয়ে সন্তোষের বোনকে বিয়ে করে ফেলাতে তাঁর মানহানি হয়েছে। তিনি অতবড় একটা মাননীয় লোক, তিনি খেপে ছিঁড়ে শাপশাপান্ত করছেন। বলছেন সন্তোষের বোনকে দূর করে দিয়ে তুমি ওঁর মনোনীত মেয়েকে বিয়ে কর। তোমার বউ তাঁর আর তাঁর গিন্নীর পায়ে ধরে কাঁদছে আর বলছে আমাকে ক্ষমা করুন। তোমার মামা বলেছেন আমার কাকা যদি ক্ষমা করেন তাহলেই সব মিটে যাবে। কিন্তু তোমার মামার কাকা কিছুতেই ক্ষমা করছেন না। তোমার দিদিমা লুকিয়ে টেলিগ্রাম করে তোমার শাশুড়ীকে আনিয়েছেন। পটলকর্তারা একদিন তাঁদের বাড়ীতেই খেয়ে মানুষ হয়েছেন। তোমার দিদিমার বিশ্বাস তিনি নিজে এসে বললে হয়তো কাজ হবে। তিনি কাল এসেছেন। আমার বিশ্বাস কিছু হবে না। তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস এখানে—"

আমি সেই দিনই মন্মথর সহিত সাহেবগঞ্জে চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম অবস্থা জটিল। পটলকর্তা আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। পটলগিন্নীও গম্ভীর হইয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। রাজলক্ষ্মী দিদিমার বিছানায় শুইয়া ছিল, আমাকে দেখিতে পাইয়াই সে উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইল। সন্তোষের মা বলিলেন—"বাবা এতো নাকাল হতে হবে জানলে তোমার সঙ্গে রাজুর বিয়ে দিতাম না। গুরুজনের প্রতি ভক্তি থাকা ভালো, কিন্তু সব জিনিসের একটা সীমা আছে। তুমি যাকে ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করেছ—"

দিদিমা তাঁহাকে এক ধমকে থামাইয়া দিলেন।

"এই থাম্‌! সব ঠিক হয়ে যাবে—"

একটু পরে আমি নীচে নামিয়া গেলাম মামার সহিত দেখা করিবার জন্য। মামা কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রাস্তা হইতে

সতীশবাবুর ডাক শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সতীশবাবু দেখিলাম একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম স্টেটের কোন কাজে হয়তো সাহেবগঞ্জ আসিয়াছেন।

"কি ব্যাপার, আপনি এখানে!"

"একটু কাজে এসেছি। এদিককার খবর কি? বউমাকে নিয়ে কবে ফিরছেন?"

"তার এখনও ঠিক নেই। মামার এক কাকা এসে জুটেছেন, তিনি নাকি আমার জন্যে অন্যত্র একটি সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। তিনি ভয়ানক রাগারাগি করছেন। মামা বলছেন তিনি যদি ক্ষমা করেন তাহলেই সব মিটে যাবে। কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষমা করছেন না, আমার বউ তাঁর পায়ে ধরেছিল তিনি লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছেন। আমার শাশুড়ীও এসে পড়েছেন। তাঁর অনুরোধও রাখেন নি তিনি। অথচ ওঁদের যখন খুব দুরবস্থা ছিল আমার শ্বশুরবাড়ী থেকেই ভরণপোষণ হতো ওঁদের। এখন উনি সে সব কথা ভুলে গেছেন। ওই যে ওই ভদ্রলোক—"

পটলকর্তা গঙ্গাস্নান সারিয়া ফিরিতেছিলেন। আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না। দোতলায় উঠিয়া গেলেন। দেখিলাম সতীশবাবু নীচের ঠোঁটটিকে উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া পটলকর্তাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। মনে হইল এখনই যেন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। তাঁহার এরূপ হিংস্র মুখভাব আগে কখনও দেখি নাই।

"উনি রোজ গঙ্গাস্নান করেন?"

"রোজ—"

"হুঁ। আচ্ছা, আজ তো সোমবার। আগামী বৃহস্পতিবার আপনি বৌমাকে নিয়ে আসুন। লক্ষ্মীবারেই গৃহলক্ষ্মী গৃহপ্রবেশ করুন, আমরা সেই রকম বন্দোবস্ত রাখব। আশা করি, ক্ষমা চাওয়া-চাইর ব্যাপার ততদিন মিটে যাবে—"

"যদি না যায়—"

"আমি বলছি, যাবে। আর যদি না যায় আপনি বৌমাকে নিয়ে চলে আসুন। একটা নিরপরাধ বালিকাকে এভাবে কতদিন নির্যাতন করবেন আপনি? এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমি এখন চলি। বৃহস্পতিবার দিন সন্ধ্যার স্টীমারে ঘাটে লোকজন থাকবে —নিশ্চয় যাবেন সেদিন—"

সতীশবাবু পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মামার সহিত সেই দিন বৈকালেই আমার কথাবার্তা হইল। বলিলাম—"আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি—"

"কেন—"

"আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমি আপনার কথামতো সন্তোষকে চিঠি লিখেছিলাম যে আমি এ বউকে পরিত্যাগ করে আপনাদের মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করব। কিন্তু ভেবে দেখলাম তা আমি করতে পারব না। আমিই সন্তোষকে চিঠি লিখেছিলাম তার বোনকে এখানে দিয়ে যেতে। এখন আপনি আমাদের ক্ষমা করে আশীর্বাদ করুন। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনার আশীর্বাদ না পেলে—"

আবেগবশে আমি মামার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিলাম। মামা শান্তকণ্ঠে বলিলেন —"আমি ক্ষমা করবার মালিক নই। মালিক কাকা। তিনিই এ সম্বন্ধ এনেছিলেন—

এখন তুমি যদি বিয়ে না কর তিনি অপমানিত হবেন। তিনি যদি তোমাদের ক্ষমা করেন আমার কোনও আপত্তি নেই ! তুমি যদি সন্তোষের মাকে বল তিনি যদি পায়ে ধরে ও'র কাছে ক্ষমা চান তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"উনি তো কোন দোষ করেন নি, উনি ক্ষমা চাইবেন কেন। তাছাড়া এ-ও শুনেছি পটলকর্তা নাকি ও'দের বাড়ী খেয়ে মানুষ হয়েছেন, উনি কি করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন ! আর চাইবেনই বা কেন, তা-ও তো বুঝতে পাচ্ছি না—"

মামার সম্মুখে এ ধরনের বাচালতা আর কখনও প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মামা একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ, যা খুশি কর। এখন তোমার ডানা গজিয়েছে এখন মনের আনন্দে উড়ে বেড়াও। আমার মান-সম্ভ্রমের দিকে চাইবার দরকার যদি না বোঝ চেও না—"

মামা রাগিয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহাকে আর কিছু বলিবার অবসর আমি পাইলাম না। এক হিসাবে ভালোই হইল। পাইলে হয়তো একটা অশোভন বচসা হইয়া যাইত। সন্তোষের মাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এ অবস্থায় কি করতে বলেন ? মামার অমতেই রাজুকে নিয়ে মনিহারী চলে যাব ?"

"আমার কথায় মামার অমতে তুমি কিছু কর এটা আমারও ইচ্ছে নয়। আমি মুখ ফুটে তা তোমাকে করতে কখনও বলব না। তবে মনে হচ্ছে তোমার মামা কিছুতেই মত দেবেন না। ওই পটলকর্তাকে তিনি শিখণ্ডী খাড়া করেছেন। বলছেন উনি যদি মাপ করেন তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ও'র পণ উনি কিছুতেই মাপ করবেন না। সন্দেহ হয় এর জন্যে উনি টাকাও খেয়েছেন। অনেকে বলছে আমি যদি ও'র পায়ে ধরে ক্ষমা চাই তাহলে হয়তো উনি ক্ষমা করবেন। যে লোকটা একদিন আমাদের রান্নাঘরের বারান্দায় দিনের পর দিন ভাত খেয়েছে উবু হয়ে বসে—আমিই যাকে রোজ ভাত বেড়ে দিয়েছি—তার পায়ে ধরতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—তবু তুমি যদি বল—তাও না হয় করব, কিন্তু আমার মনে হয় তাতেও কোন ফল হবে না—উনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না—"

"না আপনাকে তা করতে হবে না—দেখি কি হয়—আমি নিজে ও'কে আর একবার বলি।"

একটু পরেই পটলকর্তার সহিত দেখা হইল। তিনি তখন পুজা শেষ করিয়া জলযোগ করিতেছিলেন। নূতন মামীমা (মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) সামনে বসিয়া হাওয়া করিতেছিলেন তাঁহাকে। আমিও তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রূর দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মুখে একটা মেকী হাসি ফুটাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কি হে নবাব সাহেব মাটিতে বসে পড়লে কেন !"

"নবাব তো আমি নই, নবাব তো দেখছি আপনি। সবাই আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে, আপনার খোশামোদ করছে, কিন্তু আপনি অটল হয়ে রয়েছেন—"

পটলকর্তা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

"কাকে আমি ক্ষমা চাইবার জন্যে সেধেছি, কাকেই বা বলেছি আমার খোশামোদ কর—যে যা করছে নিজের গরজে করছে। নিজেরা পাপী—মনে করছে আমি ক্ষমা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তা কি কখনও যায় ? বিষ্ঠাকে চন্দন করা যায় না—"

"তা জানি। তবু আপনি একবার বলুন না, আমি ক্ষমা করলাম, তাতে আর ক্ষতিটা কি, আপনি তো পবিত্রই থাকবেন, আপনি তো আর বিষ্ঠা হয়ে যাবেন না—"

"কী—আমাকে এত বড় অপমান—"

জলখাবারের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সবাই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। আমি উঠিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম সত্যই বিষ্ঠাকে চন্দন করা যাইবে না। মামীমা এবং মামার দুই মেয়ে আবার অনেক খোশামোদ করিয়া পটলকর্তাকে আর এক প্রস্থ জলখাবার খাওয়াইলেন। আমার মামীমা একটু পরে আমাকে আড়ালে ডাকিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

"তুমি এদের মন কখনও পাবে না। রাজুকে নিয়ে তুমি মনিহারী চলে যাও। এদের মতামতের তোয়াক্কা কোরো না।"

তাহার পর মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"তারপর একদিন এসে আমাকেও নিয়ে যেও। তোমার সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসব। বেশ বেড়িয়েও আসব, কেমন?"

"মামা তোমাকে কি যেতে দেবেন?"

"ইস্, দেবেন না আবার! আমি কারও তোয়াক্কা করি নাকি। তুমি ব্যবস্থা কোরো, আমি ঠিক চলে যাবো—রাজুকে আমার ভারী ভালো লেগেছে। কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ তো, কিচ্ছু বোঝে না, ওর মাথার উপর এমন তুমুল মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তবু ফিক-ফিক করে হাসছে কেবল, আর মায়ের কাছে বকুনি খাচ্ছে। ও কি সংসার করতে পারবে? আমি গিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে আসব—"

মামী রাজুর অপেক্ষা বড়জোর বছর দুই বড়। তাঁহার 'গিন্নীপনা' দেখিয়া মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করিলাম। তিনি যে আমার পক্ষে এ কথাটা জানিয়া কিন্তু বড় ভালো লাগিল। একটু আশ্চর্যও হইলাম।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটিল তাহার পর দিন। সকালবেলা পটলকর্তা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য দ্বিতল হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। সেই সময় সন্তোষের মা নিজের মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া তাঁহার পায়ে ধরিতে গিয়াছিলেন, পটলকর্তা তাঁহাকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দেন। লাথিটা বোধহয় জোরেই মারিয়াছিলেন, কারণ সন্তোষের মা সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মাথার খানিকটা কাটিয়া রক্তে কাপড়চোপড় ভিজিয়া গেল। তাঁহার আর্তনাদ শুনিয়া আমরা সবাই ছুটিয়া গেলাম। পটলকর্তা কিন্তু দাঁড়াইলেন না, তিনি হনহন করিয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের দিকেই চলিয়া গেলেন। আমি সন্তোষের মায়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলাম।

"কেন আপনি এ কাজ করতে গেলেন—"

"আমি ভাবলুম—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, ক্রন্দনাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। আমারও কান্না পাইতে লাগিল। অবশেষে মনঃস্থির করিয়া ফেলিলাম। সন্তোষের মাকে বলিলাম—"কাল বৃহস্পতিবার। কালই আমি আপনাদের মনিহারী নিয়ে চলে যাব। আজকের দিনটা কোনও রকমে এখানে কাটান।"

আশ্চর্য ঘটনাটির কথা এখনও লিখি নাই। পটলকর্তা সেই যে গঙ্গাস্নান করিতে

গেলেন আর ফিরিলেন না। প্রথম ঘণ্টা দুই তাঁহার অনুপস্থিতি কেহ তেমন লক্ষ্য করেন নাই। যদিও পটলগিন্নি বার বার বলিতে লাগিলেন—এত দেরি তো কোনও দিন হয় না আজ এত দেরি হচ্ছে কেন—কিন্তু তাঁহার কথা কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল পটলকর্তা ফিরিলেন না, তখন সকলে বেশ চিন্তিত হইয়া উঠিল। মামা বেলা একটার সময় কল হইতে ফিরিলেন। গঙ্গার ঘাটে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সেখানে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। পটলগিন্নী কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার আশংকা হইল হয়তো তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। মামা কয়েকজন ছেলে ডাকাইয়া গঙ্গার ঘাটে ঘাটে জাল ফেলাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। পটলকর্তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। পটলগিন্নীর ফিট হইতে লাগিল। অ্যামোনিয়া শুঁকাইয়া তাহার ফিট ভাঙাইতে হইল। ফিট ভাঙিতেই তিনি দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া তারস্বরে বলিতে লাগিলেন—"সতী-লক্ষ্মীর অভিশাপ লেগেছে। নিরপরাধ মেয়েটার উপর গঞ্জনা—সে কি ভগবান সইতে পারেন? পইপই করে বারণ করেছিলাম টাকার লোভে এসব ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না তুমি—। সতীলক্ষ্মীর চোখের জল, জল নয়, আগুন—পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে সব—।"

তাহার হাহাকারে সকলেই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মামা থানায় খবর দিলেন। তখন থানার একজন কনস্টেবল বলিল যে সে এখনই বুড়া বাবুর একটি চিঠি লইয়া আমাদের বাড়ী আসিতেছিল। সকরিগলি হইতে একটি কুলি আসিয়া তাহাকে চিঠিটি দিয়া গিয়াছে। দেখা গেল চিঠিটি পটলকর্তাই লিখিয়াছেন। কাহাকে লিখিয়াছেন তাহা বোঝা গেল না। কারণ চিঠিতে কোন পাঠ বা ঠিকানা ছিল না। কেবল লেখা ছিল—তোমরা আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি মনিহারী চলিলাম। সেখানে সূর্যসুন্দরের বাড়ীতে উঠিব। বধূমাতাকে লইয়া সূর্যসুন্দর বৃহস্পতিবার যেন মনিহারী পেঁছায়। আমি স্বয়ং তাহাদের অভ্যর্থনা করিব। সূর্য যেন রাগ না করে। আমি এতদিন শুধু একটা অভিনয় করিতেছিলাম মাত্র। ইতি পটল—

এই পত্র পাওয়ার পর সমস্ত ব্যাপারটার রঙই বদলাইয়া গেল। মামা সম্ভবতঃ মনে মনে মুষড়াইয়া পড়িলেন—বাইরে কিন্তু তাঁহাকে প্রফুল্লভাব দেখাইতে হইল। আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পটলকর্তা এরূপ মারাত্মক অভিনয়ে কেন লিপ্ত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পটলগিন্নী জিদ ধরিলেন, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে মনিহারী যাব'। মামীমাও যাইতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু মামা সম্মত হইলেন না।

বৃহস্পতিবার যখন স্টীমার হইতে নামিলাম তখন দেখি এক তুমুল কাণ্ড। ত্রিপুরা সিংহ বধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘাটে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং আসিয়াছেন তিনি। স্টীমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র দুমদুম করিয়া কয়েকটা বন্দুক আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল অনেক ঢাক, ঢোল, বাঁশী ও রামশিঙা। দেখিলাম দশজন সশস্ত্র সিপাই সুসজ্জিত দশটি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। দেখিলাম বাজিও পুড়িতেছে। আকাশে নানারঙের তারা-বাজি ছুটিতেছে, অনেক তুবড়ি পুড়িতেছে। তাহার পর ত্রিপুরারি সিংহ হাতী হইতে নামিয়া রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন। আমি বলিলাম—"এ কি করছেন আপনি। ও যে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, তাছাড়া সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ।" ত্রিপুরারি সিংহ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কিন্তু উনি ব্রাহ্মণী

তাছাড়া উনি আমার মা।" কিংখাবে মোড়া একটি পালকি রাজলক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, ত্রিপুরারি সিংহ স্বয়ং রাজলক্ষ্মীকে সেই পালকিতে চড়াইয়া দিলেন। আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে হাতীতে আসুন।"

বলিলাম—"পটলকর্তার স্ত্রী এসেছেন। তিনি কিসে যাবেন?"

"আরও পালকি এসেছে।"

ভিড়ের মধ্য হইতে আর একখানা পালকি আসিয়া পড়িল। পটলগিন্নী তাহাতেই চড়িলেন। মহাসমারোহে শোভাযাত্রা আমার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। একটু পরেই আমরা যখন বাড়ীর কাছে পৌঁছিলাম তখন উলুধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া সতীশবাবু নিজেই একটা শাঁখ বাজাইতেছেন দেখিলাম। গ্রাম হইতে অনেক মেয়েও আসিয়া শাঁখ বাজাইতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল ভিড়ের মধ্যে পটলকর্তা দাঁড়াইয়া আছেন। বিষণ্ন গম্ভীর মুখ, চোখের দৃষ্টি হইতে রোষ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইতেছে। চিঠিতে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাঁহার চেহারাতে ও ভাবভঙ্গীতে তাহার কোন আভাস পাইলাম না। চিঠিতে লিখিয়াছিলেন তিনিই আমাদের অভ্যর্থনা করিবেন কিন্তু তিনি গুম হইয়া একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি হাতী হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি একটি কথাও বলিলেন না।

সতীশবাবু দেঁতো হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন—"কর্তার শরীরটা আজ ভালো নেই। চলুন আপনি ভিতরে একটা ঘরে শুয়ে পড়বেন চলুন—।"

"আমি আজই দেশে ফিরে যেতে চাই। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।"

"আপনার গিন্নীও তো এসে গেছেন। দেশে ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। ভোজটোজ খেয়ে তারপর যাবেন—।"

"না, আমি আজই যেতে চাই।"

"মালিকের সঙ্গে দেখা করুন তাহলে। তিনি যা বলেন তাই হবে। এখানে তাঁর হুকুম ছাড়া চলবার উপায় নেই। আসুন—"

পটলকর্তাকে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমার দিকে ফিরিয়া একটু মুচকি হাসিলেন। আমার নিকট ব্যাপারটা ক্রমশঃ রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। বহুকণ্ঠের উলুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আমি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম গ্রামের মেয়েরা রাজলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিতেছে। সে অপরূপ দৃশ্য আজও মানসপটে আঁকা আছে। রাজলক্ষ্মী একটি প্রকাণ্ড দুধে-আলতায় ভরতি থালার উপর নতনয়নে দাঁড়াইয়াছিল; নায়েব মহাশয়ের স্ত্রী, দেওয়ানজির স্ত্রী, স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, দারোগা সাহেবের স্ত্রী, গ্রামের আরও অনেক বর্ষীয়সী মহিলা সকলেই একে একে রাজলক্ষ্মীকে বরণ করিতেছিলেন। বরণ করিয়া প্রত্যেকেই একটি ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছিলেন তাহাকে। মালার স্তূপের মধ্যে তাহার মুখটি প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। সন্তোষের মা একটু দূরে একধারে উদ্ভাসিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছিল। আমি গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"সই মা, আমি আমার কথা রেখেছি। আপনি আশীর্বাদ করুন রাজলক্ষ্মী যেন সুখী হয়। শত চেষ্টা করেও তো মামার আশীর্বাদ পেল না। পটলকর্তা এসেছেন কিন্তু তাঁর চিঠির সঙ্গে ভাবভঙ্গী মিলছে না—"

সন্তোষের মায়ের চোখে একটা হাসির ঝলক খেলিয়া গেল।

"ওকে কিছু টাকা দাও, ও তোমার পা চাটবে—"

ঠিক এই সময় খুব জোরে জোরে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল বাহিরে। ঢাক ঢোল সানাইও বাজিয়া উঠিল। ত্রিপুরারি সিংহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছু পিছু রায় মহাশয়, তাঁহার পিছনে তাঁহাদের পুরোহিত বশিষ্ঠ নারায়ণ এবং তাঁহারও পিছনে কয়েকজন ভৃত্য কয়েকটি রূপার পরাত বহন করিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলাম প্রত্যেক পরাতে নানাবিধ উপহার সজ্জিত রহিয়াছে। ত্রিপুরারি সিংহ পুনরায় রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি। তাড়াতাড়িতে ভালো জিনিস পাওয়া গেল না"—তাঁহার চোখে মুখে একটা কুণ্ঠিত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

পরাতগুলি রাজলক্ষ্মীর সামনে নামাইয়া দিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। বহুকণ্ঠের উলুধ্বনিতে চতুর্দিক কম্পিত হইতে লাগিল। সেদিন সেই উৎসব-কোলাহল মুখরিত সন্ধ্যায় রাজলক্ষ্মী সগৌরবে যে সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল সে সংসারের মর্যাদা সে আমরণ রক্ষা করিয়াছে। সেদিনের সেই ছবিটাই—তাহার সেই শরম-শঙ্কিত-মাল্য-বিভূষিত রূপটাই এখন আমার চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার পর আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু সে সব আমি লিপিবদ্ধ করিব না। মনিহারীতে আমার পারিবারিক জীবন স্থাপনের দিনটিই এই ডায়েরিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক।

পটলকর্তা ও পটলগিন্নীও শেষ পর্যন্ত প্রসন্ন হইয়া রাজুকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এজন্য অবশ্য একটু কৌশল করিতে হইয়াছিল। সন্তোষের মায়ের কথাই ঠিক হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত। কিছু টাকা পাইয়াই পটলকর্তা নম্র হইয়া গেলেন এবং সোচ্ছ্বাসে আমাদের আশীর্বাদ করিলেন। টাকা দিয়া আশীর্বাদ কিনিবার বাসনা আমার ছিল না, কিন্তু যখন সতীশবাবুর মুখে শুনিলাম যে তাঁহার সিপাহীরা পটলকর্তাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল তখন বড়ই কষ্ট হইল। নিজেকেই অপরাধী মনে হইতে লাগিল। পটলকর্তা যখন গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন তখন গঙ্গার ঘাটে আর কেহ ছিল না। একজন সিপাহী ডুব-সাতার কাটিয়া আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে জলের ভিতর লইয়া যায়। কিছুদূরে সতীশবাবুর নৌকাটি বাঁধা ছিল। সেই নৌকায় তুলিয়া পটলকর্তাকে মুখ বাঁধিয়া মনিহারীতে আনা হয়। তাহার পর জোর করিয়া তাঁহাকে দিয়া চিঠিটি লেখানো হয়। প্রথমে তিনি নাকি লিখিতে চান নাই, সিপাহীর হাতের একটি চপেটাঘাত খাইবার পর লিখিয়াছিলেন।

ব্যাপারটা শুনিয়া খুব খারাপ লাগিল—নিজেরই আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল যেন। কিন্তু বলিবার কিছু ছিল না। সতীশবাবু ত্রিপুরা সিংয়ের আদেশে যাহা করিয়াছেন তাহা আমারই হিতার্থে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীশবাবুকে বলিলাম —"আমাকে কুড়িটি মোহর যোগাড় করে দিতে পারবেন ?"

"তা পারি। কেন, মোহর নিয়ে কি করবেন—"

নতুন বউ পটলকর্তা আর পটলগিন্নীকে প্রণাম করবে।

সতীশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ভস্মে ঘি ঢালবেন ?"

"ভস্ম হোক যাই হোক ও'রা আমার আত্মীয় এবং গুরুজন। ও'দের অভিশাপ নিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারব না। ও'দের প্রসন্ন করতে হবে—"

সতীশবাবু একটি মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া পা দোলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পা দোলাইয়া তাহার পর বলিলেন, "বেশ তাই হবে।"

পরদিন রাজলক্ষ্মী পটলকর্তার ও পটলগিন্নীর পায়ের কাছে দশটি করিয়া মোহর রাখিয়া প্রণাম করিল। আমার ভয় হইতেছিল পটলকর্তা হয়তো মোহরে লাথি মারিয়া উঠিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সহসা তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং সোচ্ছ্বাসে বলিলেন—"দিদি তুমি রাজরাজেশ্বরী হও। একটা কথা মনে রেখো, তোমাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছি তা অভাবের তাড়নায়। আমরা বড় দুঃখী, বড় অসহায়। আশীর্বাদ করছি তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর—তোমার সংসারে সুখ উথলে পড়ুক। আমাদের ক্ষমা কর তুমি—"

পটলগিন্নীও অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন—"সুখী হও, সুখী হও তোমরা। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

আজ অনুভব করিতেছি তাঁহাদের আশীর্বাদ নিষ্ফল হয় নাই।

এইখানেই ডায়েরী শেষ হইয়াছে।

ডায়েরি শেষ করিয়া কুমার স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। যে মা আজ নাই তাঁহারই নববধূরূপটি চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল যেন। বিস্মিত পুলকে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল সে। তাহার পর সহসা সে চমকাইয়া উঠিল—হাঁসের ডাকে। আকাশে হাঁস উড়িয়া যাইতেছে। মহাশূন্য হইতে কলকণ্ঠের একটা কোলাহল সহসা ভাসিয়া আসিয়া আবার সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। কুমারের মনে হইল একটা অট্টহাসি সহসা মূর্ত হইয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল যেন। ইহার পর গঙ্গা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল।

"কুমার কুমার শীগগির বাড়ী চল—বাবা মারা গেছেন—"

"সে কি—"

"হ্যাঁ হঠাৎ! মেজদা একটু আগে এসেছিলেন। বাবার পায়ের কাছে বসে ছিলেন। বাবা তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—তুই ছেলেবেলায় তোর মাকে যে গানটা শোনাতিস সেটা বেহালায় বাজাতে পারবি? কোন্ গানটা? জিগ্যেস করলেন মেজদা। বাবা বললেন—'আমায় নিয়ে চল হাত ধরে'—এই গানটা। মনে নেই তোর? মেজদা বললেন—আছে। তারপর মেজদা নিজের বেহালায় সেই গানটা বাজাতে লাগলেন। বাবা চোখ বুজে শুনতে লাগলেন। মেজদাও চোখ বুজে বাজাচ্ছিলেন। এর মধ্যে কখন যে বাবার নিশ্বাস থেমে গেছে তা কেউ টের পায়নি। ছোটবৌমাই প্রথম টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হইচই পড়ে গেছে চতুর্দিকে। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য।…"

॥ ৪১ ॥

বাড়ীতে সত্যই লোকে লোকারণ্য। গ্রামের লোক সবাই আসিয়াছে। দূরের গ্রাম হইতেও ক্রমাগত লোক আসিতেছে। বাড়ীর সামনে একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

বৃহস্পতি সর্বসুন্দরের বুকের উপর মুখ রাখিয়া শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন। সুবাতালি তহশিলদার নীরবে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। তাঁহারও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

স্টেশন হইতে একটি ছোকরা আসিয়া বলিল—"স্টেশন মাস্টার মশাই বড়দাকে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন—"

নূতন যে স্টেশন মাস্টারটি আসিয়াছিলেন তিনি কলেজে বীরুর সহপাঠী ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই আসিয়াছেন এখানে। বীরু চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন।

ভাই বীরু,

এইমাত্র দুঃসংবাদটি পেয়ে মর্মাহত হলাম। ভগবানই শোক দেন, তিনিই আবার সান্ত্বনাও দেবেন। তোমার বাবা মহৎ লোক ছিলেন, তাঁর মহত্ত্বের জন্য তিনি মানুষের মনে অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। এখান থেকে হাঁটা পথে গঙ্গা অনেক দূর। মাঝে কুশী নদী পেরিয়ে যেতে হয় বলে গঙ্গার ঘাটে পেঁছানো মোটেই সহজসাধ্য নয়। আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি। সন্ধ্যার ট্রেনটা বেরিয়ে গেলে এখান থেকে একটা বগি গাড়ি এবং ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি সেই ব্যবস্থা করে দেব। তোমার যদি মত থাকে তাহলে আমি কাটিহারে টেলিগ্রাম করে D. T. S.-এর অনুমতি নেব। ইতি—অনিল।

সুবাতালি তহশিলদার জানিতে চাহিলেন স্টেশন মাস্টার কি লিখিয়াছেন। বীরুর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া তিনি গোবিন্দ মণ্ডলের দিকে চমকলালের দিকে এবং নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। তাহার পর ধীরকণ্ঠে হিন্দীতে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই—আমার ইচ্ছা ডাক্তারবাবুকে আমরা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইব। তিনি যে পথ দিয়া মনিহারী গ্রামে হাঁটিয়া ঢুকিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া গ্রামের লোকের কাঁধে চড়িয়া তিনি চলিয়া যাইবেন। আপনাদের কি মত?"

সকলেই তহশিলদার সাহেবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চমকলাল বলিলেন—"ডাক্তারবাবু ট্রেনে যাবেন না, আমাদের কাঁধে চড়েই যাবেন। তাঁকে আমরা রাজার মতো নিয়ে যাব—"

নিখিলবাবু তখন বীরুবাবুকে বলিলেন—"তুমি স্টেশন মাস্টার মশাইকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা চিঠি লিখে দাও। লিখে দাও—গ্রামের লোকেরা কাঁধে করেই নিয়ে যাবে, ট্রেনের দরকার নেই। তিনি যদি কষ্ট স্বীকার করে আমাদের সঙ্গে যান আমরা খুব খুশী হব।"

উত্তর লইয়া ছোকরাটি চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করিল সোমেন্দ্রবালা। সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"কাকাবাবু চলে গেলেন! এমন করে হঠাৎ যাবেন তা ভাবিনি। আমার সঙ্গে শেষ দেখাটা আর হলো না।"

সোমেন্দ্রবালার সঙ্গে একটি চাকর একটি বড় ঝুড়ি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ঝুড়িতে ফুল ছিল। ফুলের ভিতর হইতে একটি তামার ছোট ঘটি বাহির করিয়া সোমা বিছানার উপর বসিল। ঊর্মিলা কাঁদিতেছিল। তাঁহাকে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বলিল—"কাঁদছিস কেন? ওঠ। খানিকটা চন্দন ঘষে নিয়ে আয়। কাকাবাবুকে ভালো করে

সাজিয়ে দিই। আর একটা চামচও আনিস। অনেক তীর্থ থেকে জল এনেছিলাম এই ঘটিতে। এই জল কাকাবাবুর মুখে দিয়ে দিই একটু—"

ঊর্মিলা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। বাহিরের বারান্দায় কবিরাজ মহাশয় মাটিতে লুটাইয়া শিশুর মতো কাঁদিতেছিলেন। পৃথ্বীশ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। কবিরাজ মহাশয় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা কান্না থামাইয়া উঠিয়া পড়িলেন তিনি। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সূর্যসুন্দরের পায়ে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল। এখন সব অন্ধকার। আমি শ্মশানে চললুম। সেইখানেই অপেক্ষা করব—"

কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলেন। বাহিরে অনেক লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভিড়ের ভিতর হইতে ক্রন্দনরোল উঠিতেছিল। একটু পরে কীর্তনীয়ার দল মাদল বাজাইয়া হরিনাম করিতে করিতে আসিয়া হাজির হইল। ক্রমাগত লোক আসিতে লাগিল। চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বৃহস্পতি, পৃথ্বীশ এবং কুমার তিনজনেই বুঝিতে পারিল শুধু তাহাদেরই পিতৃবিয়োগ হয় নাই—এ অঞ্চলটারই পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। সূর্যসুন্দরের শেষকৃত্য কিভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা ইহারাই ঠিক করিবে, তাহাদের কোন মতামত এখানে চলিবে না। নানাদিক হইতে প্রচুর ফুল আসিয়া পড়িল। আর একদল কীর্তনীয়া আসিল। শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে গ্রামের একদল মেয়ে আসিয়া সূর্যসুন্দরের ঘরের সম্মুখে ফুল, খই ও বাতাস ছড়াইতে লাগিল। নিখিলবাবু বাহির হইয়া আসিয়া একজন সিপাহীকে আদেশ দিলেন দুইটি গরুর গাড়ি করিয়া শুকনো কাঠ এখনই যেন শ্মশানের দিকে পাঠানো হয়। মাঝে কুশী নদী আছে, নৌকায় করিয়া কাঠ ওপারে লইয়া যাইতে হইবে। গাড়ির বলদরা খালি গাড়ি লইয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে পারিবে। তিনি আরও আদেশ দিলেন —হাতীর পিঠেও একবোঝা কাঠ লইয়া মাহুতটা রওনা হইয়া যাক। হাতী অনায়াসেই কাঠ লইয়া নদী পার হইতে পারিবে। দেখিতে দেখিতে কয়েকটা নূতন বাঁশ আসিয়া পড়িল। গ্রামের পুরাতন ছুতার মধু মিস্ত্রী নিজেই করাত 'বাসুলা' লইয়া বসিয়া গেল সূর্যসুন্দরের শেষযাত্রার শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য। তাহার চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চুলগুলি সব শাদা।

রমেশবাবু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"মধু তুমি পারবে তো ?"

"পারব। আমিই বরাবর ডাক্তারবাবুর বসবার চেয়ার বানিয়েছি। এখনও উনি যে খাটে শুয়ে আছেন তা আমারই বানানো। এ খাটিয়াও আমি বানাব।"

"মনে রেখো এটা মামুলী খাটিয়া হবে না। পুষ্পকরথ হবে। দেবতা যাবেন ওতে চড়ে।"

"জানি।"

হঠাৎ মধু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর বাঁশ চিরিতে শুরু করিল। পুষ্পকরথ কেমন তাহা কেহ দেখে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে শালু দিয়া, পতাকা দিয়া, ফুলের মালা দিয়া মধু যাহা গড়িয়া তুলিল তাহা সত্যই অপরূপ। ধনুকধারী সিংয়ের আদেশে কয়েকজন ধুনকর নূতন তোশক তৈয়ারী করিয়া দিল। তোষকের

উপর একটি সুদৃশ্য রেশমী চাদর বিছানো হইল। চাদরটি সোমেন্দ্রবালা কাশ্মীর হইতে আনিয়াছিল। ধনুকধারী সিং একজোড়া নূতন গরদও আনিয়া দিলেন। সোমেন্দ্রবালাকে বলিলেন—"এইটে পরে কাকাবাবু যাবেন।"

একটু পরেই বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। বীরুবাবু, পৃথ্বীশ এবং কুমার প্রথমে 'কাঁধ' দিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কাঁধে সূর্যসুন্দর পাঁচ মিনিটও থাকেন নাই। বিরাট জনতার কাঁধের উপর দিয়াই তিনি ফুলের নৌকার মতো ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

॥ ৪২ ॥

গঙ্গার কলকলধ্বনির পটভূমিকায় সূর্যসুন্দরের চিতা জ্বলিতেছিল। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল বিরাট জনতা। কীর্তনীয়ারা পর্যন্ত থামিয়া গিয়াছিল। সকলে যেন অনুভব করিতেছিল অনিবার্যের এই সুমহান সমুজ্জ্বল প্রকাশকে শ্রদ্ধা করিবার ভাষা মানুষের নাই। নীরবতাই সে শ্রদ্ধার ভাষা। লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়াছিল সকলে। প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। বায়ু-বেগে গঙ্গার কলকলধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল ক্রমশঃ। মনে হইতেছিল মা গঙ্গাই স্বয়ং যেন স্তোত্রপাঠ করিতেছেন। ঘিয়ের এবং চন্দনের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা কয়লার উনুনে লুচি ভাজা হইতেছিল। বীরুবাবুর ইচ্ছা যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে এখানেই তিনি গরম লুচি তরকারি খাওয়াইয়া দিবেন। কয়েক বোঝা শালপাতা এবং প্রচুর মিষ্টান্নও আনানো হইয়াছিল। রমেশবাবু প্রথমে একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন —"এত লোককে এত রাত্রে এই গঙ্গার চরে খাওয়ানো কি সম্ভবপর হবে?"

বীরুবাবু উত্তর দিলেন—"কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, বাবার আত্মার এতে ভারী তৃপ্তি হবে। তিনি সবাইকে খাওয়াতে এতো ভালোবাসতেন। সম্ভবপর হবে না বলছেন?"

"নিশ্চয়ই হবে।"

রাধানাথ গোপ ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি এখুনি যাচ্ছি—সব ব্যবস্থা করে আনছি—"

তিনিই হাতী করিয়া চলিয়া গিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

চিতা যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল তখন সকলেই তাহাতে একে একে জল ঢালিয়া গঙ্গায় স্নান করিল। সেই শেষকৃত্যে শুধু বীরু, পৃথ্বীশ, কুমার নয় সকলেই যোগ দিল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া সকলে যখন ফিরিলেন তখন পূর্বদিগন্ত উষারাগে রঞ্জিত। বাড়ীতে ফিরিয়া বীরু একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। শাঁখ বাজিতেছে কেন? গঙ্গা বাড়ীতেই ছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"গগনের ছেলে হয়েছে। কি সুন্দর ছেলে। বাবাই যেন ছোট হয়ে ফিরে এসেছেন আবার—"